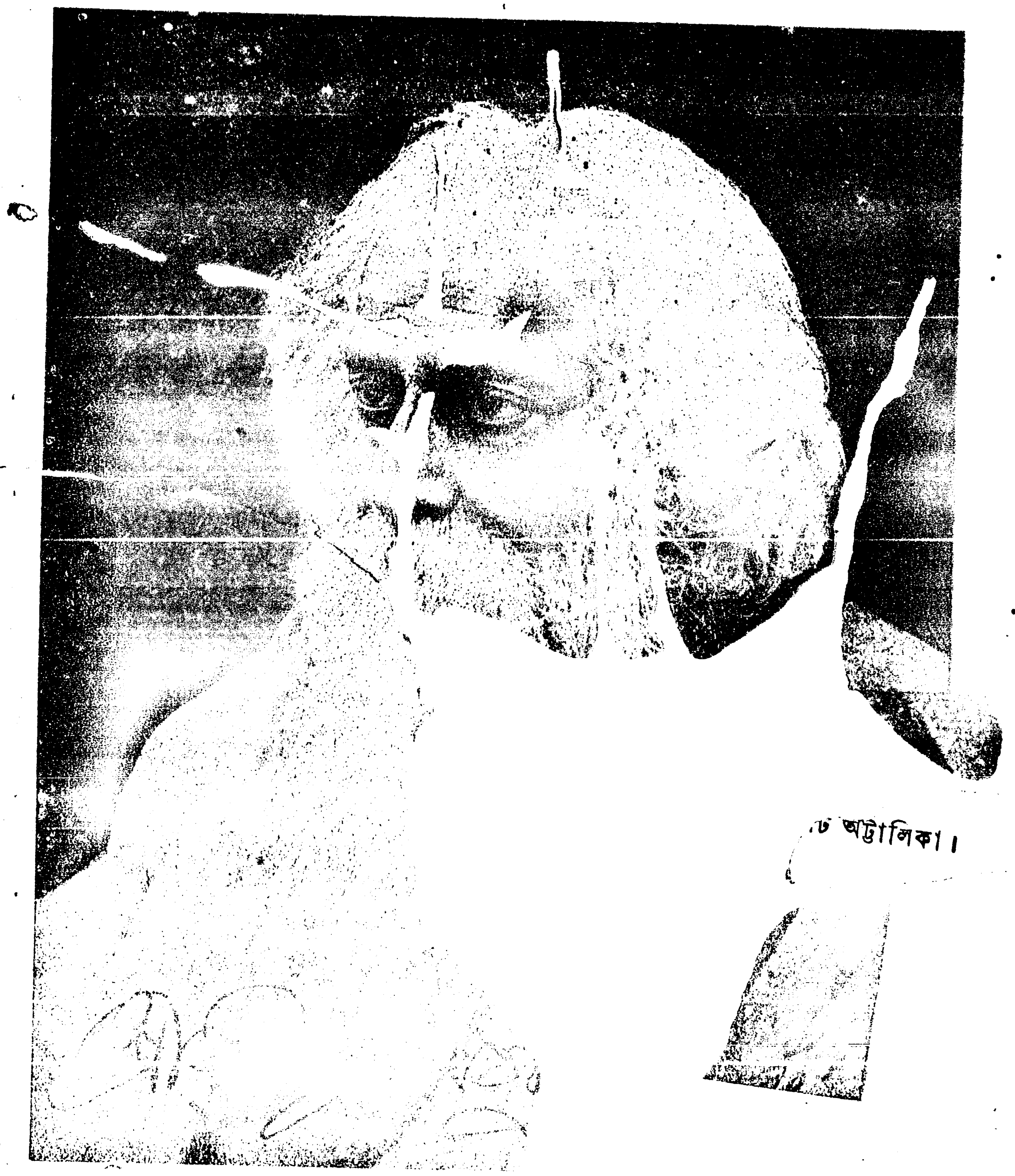

ট অট্টালিকা।

দ্বারে আ

চে

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচা প্রতি ষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জ ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৪শ বর্ষ } বৈশা ১৩৫৮ { ১ম সংখ্যা

হাট্ট

ার ত্র

লক্ষ ল ইতে)

গল্পটি f ার্য্য

খে

তাদের মধুময়,

রে মধু তটিনী নিচয়।

মোদের উপর

ওষধি নিকর।

হাক্

মভাবে মধুর আধার,

ধন্ব হোক্ মধুময়,
পিতৃসম অন্তরীক্ষ আর।
বনস্পতি মধুময়,
মধুময় হোক দিনপতি,
যত গা ভী আমাদের
হোক সব—হোক মধুমতী।
দিন মিত্র আমাদের,
দিন আনি বরুণ কুশল,
অর্যমা ম দিন,
ইন্দ্র দিন অ নি। মঙ্গল।
কুশ। করুন বৃহস্পতি,
বিষ্ণু—যাঁর দীর্ঘপদে গতি। *

একটি চে

হেন্‌রী ফোর্ডের নাম সবাই শু
কল-কারখানা নিয়েই ছিল তাঁর কাজ। ন
ক'রে জীবিকা উপার্জ্জন করত। ফোড য়েদের
একবার ফোর্ড সাহেবের খেয়াল বি
একটি বাড়ী তৈরী করবেন।

যা ভাবা তাই। দেখতে দেখতে
গৃহপ্রবেশের দিন ফোর্ড সাহেব বন্ধুবান্ধবের নি
বাড়ীর সামনে বিরাট দরজা, কিন্তু বন্ধু
"অনুগ্রহ ক'রে ঘুরে খিড়কির দরজা দিয়ে আস্থন।"
খাবার সময় কথাটা উঠল। একজন কৌতু
করলেন ফোর্ডকে। ফোড সলজ্জ ভাবে জবাব দিলেন,
ফাটকে একটা ছোট্ট চড়াই পাখী ডিম পেড়েছে,
লোকজনের ভিড়ে হয়তো সে ভয়ে ঘাবড়ে যাবে, তাই

* মিত্র, বরুণ, অর্যমা, ইন্দ্র, বিষ্ণু—ইঁহারা বৈদিক যু
অন্ত দেবতারা প্রাধান্য পাইয়াছেন।

গারখানার
বেনিয়ূ

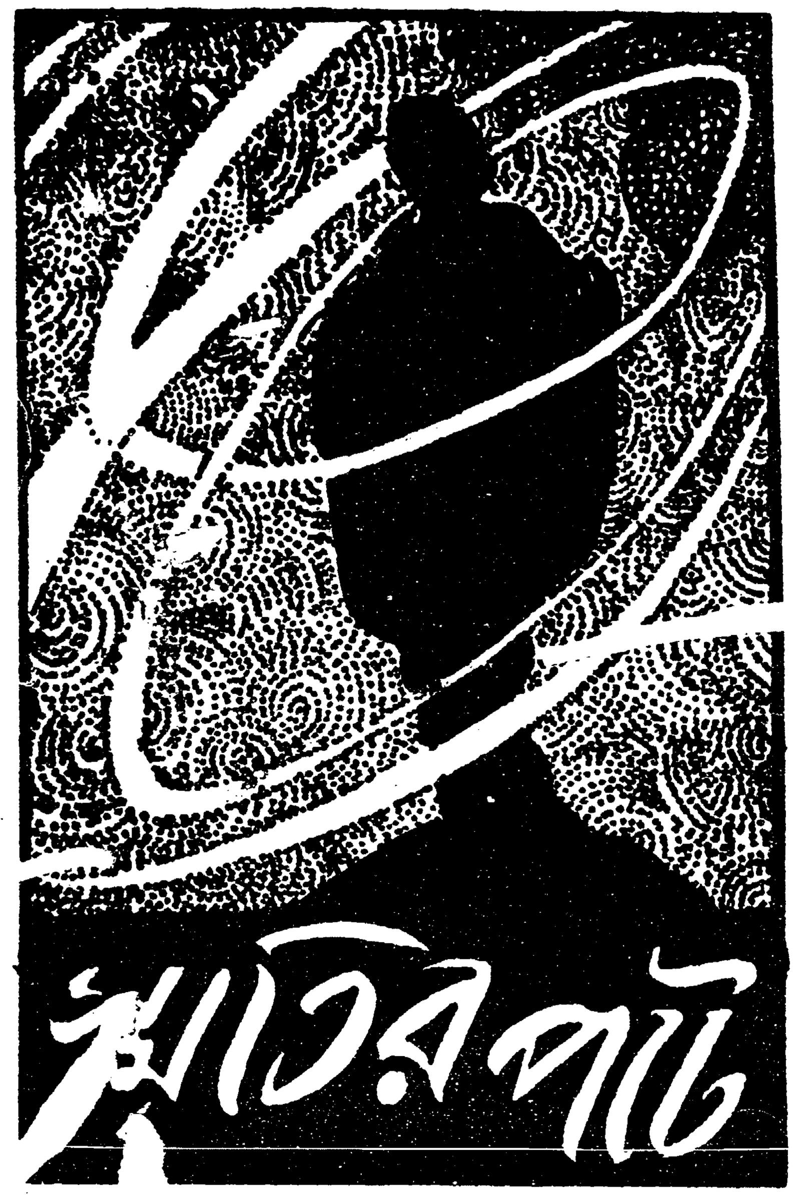

সেকালের গল্প

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সেকালের গল্প বলিতে বসিয়া মনে
তেছে আমাদের গ্রামের বহুরূপী
চুপচ কথা।
পড়িতেছি,
বাঘের ডাক য় আমরা, ছেলেরা, যখন
ডাকিতেছে! সিয়া আছি, কেহ বা
অস্থির। গৃহি সময় শোনা গেল
কপাট বন্ধ করির পেছনে বাঘ
হইতে তাড়াতা সব লোক য়ে
কোন বাড়ী আ বধূরা রান্না রের
ন। পথ
ছাট ছেলেমেয়ে
রে য় সিয়া
তে গিয়া হইতেছে ছাট
আসিতে
কটিতর ারা
াক। াজ
াঙ্গে
তে

চুল। চক্ষু দুঃ
হইতেছে; সঙ্গে স
দিদিমাকে জড়াইয়া
ধমক দিয়া বলিতে
চিন্তা অমনি হাসিয়া ব
শুনলেন কেমন? ভয়ে
সহজ মানুষ চিন্ত

হো! বিকট হাস্য
দিয় আগুন
ও চীৎকা
সাহসের
ভূত-প্রে

টানিতে টানিতে বলিত—"পূজার পার্ব্বণ দিবেন না?" তখন দিদিমা ঘর হইতে খই, চিঁড়া, মোয়া প্রভৃতি আনিয়া দিতেন, সঙ্গে একজোড়া নারিকেল। সে সব খাইবার পর আবার মহা আহ্লাদে সে অন্য রূপ ধরিয়া অন্য গ্রামে চলিয়া যাইত। সাধারণতঃ দুর্গোৎসবের পরই চিন্তাহরণ বহুরূপী গ্রামে গ্রামে তামাসা দেখাইয়া পয়সা

...ৎসবের একটি কীর্ত্তি—রাজা...নীর মঠ

ও পার্ব্বণী আদায় করিত্ তাহার মুখে যেমন দেখি কুকিদের গান, ...দ, সে শুনিয়াছি, ম গ... দেখিয়াছি তেমন ...াই। সেই সময়ে উৎসব ...উৎসব কোথায় ... দুর্গোৎস... ...বের পক্ষে ...ক্ষ্মীপূজার ... ছিল ...স ...ছিল সা... কেহ ...া, ...

...রিতে যেমন সবর ...রী ও বধূরা ... ...বাড়ী ঢাক ...ীর, পায়স ...ৎস্না-... ...সাদ

বাড়ীতেই জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। অতি যে গরীব সেও সংবৎসরের এই একটি বিশেষ দিনের কথা মনে করিয়া মনের আনন্দে লক্ষ্মীপূজা করিত এবং তাহার সাধ্যানুযায়ী সকলকে জলযোগ করাইয়া তৃপ্তি বোধ করিত।

সত্যবাদী চোর

শ্রীবিমলচন্দ্র সেন

চোর আবার সত্যবাদী ...মনে করে হয়! কিন্তু সময় বিশেষে তা হ'তেও পারে; তবে পরস্পর-বিরোধ... দিক্, অর্থাৎ চোর হওয়া ও সত্যবাদী হওয়া, বেশী দিন হয়তো এক সঙ্গে ... পারে না। যা হোক, এ সম্পর্কে একটি কাহিনী তোমা... শোনাচ্ছি।

কোন ... এক ...বাস করত। এ লোকটি পূর্বে চোর ছিল না, বরং নিরীহ ...ব্যবহারের জন্য সবারই প্রিয় ছিল। পর পর ...বে পড়ে ... ধীরে ধীরে ওর স্বভাব বিগড়ে গেল—ও চুরি করল। ... ছিল ব'লে ধরা না পড়ে চুরি দ্বারা সে দিব্য ...র সং... চুরি ক'রেও কিন্তু ওর সম্পদ বাড়ল না, ...কো... বাইরে সে চোর সাজলেও অন্তরের অন্তরতম ...টি শুভ্র শতদলের ন্যায় বিরাজ করত। ...সন্দেহের চোখে দেখত না, কারণ ওর নম্র-মধুর ...রাখত। তা ছাড়া লোকটি অবসর-ক্ষণে তার ...ও অভ্যস্ত ছিল। দেখতে দেখতে এ ভাবে

চুল। চক্ষু দুহ... হইতেছে; সঙ্গে স... দিদিমাকে জড়াইয়া ধমক দিয়া বলিতে ... চিন্তা অমনি হাসিয়া ব... শুনলেন কেমন? ভয়ে ... সহজ মানুষ চিন্তা...

...ও ওর অভাবের তাড়না প্রায় আগের মতই ...রিক্ত চুরি ক'রে নিজেকে ধনবান্ করবার ...খতে পেয়েও একটা চাপা অশান্তির আগুন ...ছিল। এমনি ভাবে যখন দিন কাটছে, ...শ দূরে গঙ্গাতীরে বিখ্যাত এক সন্ন্যাসী এসে

সাময়িক ভাবে আশ্রয় নিয়েছেন, আর দলে দলে লোক তাঁর কাছে গিয়ে অন্তরের ব্যথা নিবেদন ক'রে নানা ব্যবস্থা ও নানা উপদেশ নিয়ে ধন্য হচ্ছে!

চোরটিও একদিন এসে সাধুর চরণপ্রান্তে কেঁদে পড়ে অনাবৃত ভাবে সব গোপন কথা তাঁকে জানাল আর তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করল।

সন্ধ্যাকাল। নির্জন কুটীর। গঙ্গার প্রশান্ত বক্ষে অস্তগামী সূর্যের শেষ আলোক-রশ্মি যেন অপূর্ব এক রঙের মাধুরী ঢেলে দিয়েছে। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মৌনী হয়ে বসে আছেন, তাঁর সম্মুখে একটি অনুতপ্ত হৃদয় অকপট সরলতায় নিজ অপরাধ স্বীকার ক'রে তাঁর নির্দেশের আশায় উদাস দৃষ্টিতে তাঁর মুখপানে তাকিয়ে আছে।

সাধু মৌন ভঙ্গ ক'রে সস্নেহে ওর দিক তাকিয়ে ওকে ধু বললেন, 'যে-কোন অবস্থায়ই তুমি পড় না কেন, আজ থেকে তুমি কেবল সত্য কথা বলবে। তোমার প্রতি আমার আর কোন উপদেশ নেই। শান্ত মনে ঘরে ফরে যাও।'

—'কিন্তু প্রভু, আমার জীবিকা চলবে কেমন র?'

—'সত্য কথার মধ্য দিয়েই স ব্যবস্থা হ বে; আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমার কথায় বিশ্বাস ন্ধে আর কোন

অল্প ক'দিন পরের কথা। চোরটি স্থির ক'রে দীর্ঘদিনের জন্য সে নিশ্চিন্ত হ, আর দের কিছু চলবে। অমাবস্যার কাজল-কালো গভীর রাত্রি া কাজ ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের কাজ স্বচক্ষে দেখবার বাড়ীর এক নিভৃত অংশে দাঁড়িয়ে গোপনে সব পর্যবে শ চুরি করতে এসে দৈবাৎ ছদ্মবেশী রাজার স উভয়ে উভয়কে চোর বলে তক্ষুণি বুঝে নি পর স্থির হ'ল যে দ্বিতীয় চোর (ছদ্মবেশী কামরার রত্নের সন্ধান বলে দেবে এবং চ আর প্রথম চোর সে রত্নালঙ্কার চুরি ক'রে ত সমান সমান ভাগ হবে।

চোরটি একটা সিন্দুক খুলে তিনটি কিন্তু চুরি ক'রে আনল মাত্র দু'টো, সমান ছদ্মবেশী রাজা ওকে শুধালেন, 'সিন্দুকে ব

উত্তরে তিনি জানলেন যে চোরটি তিনটি রত্নহারই দেখেছে, কিন্তু সমান ভাগ সম্পর্কে নিজ কথা রাখবার জন্য একটা ছেড়ে দিয়ে দু'টো চুরি ক'রে এনেছে। রাজা শুনে অবাক্-বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে নিজের ভাগ গ্রহণ ক'রে চিন্তাক্লিষ্ট ভাবে ঘরে ফিরলেন।

পরদিন রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডেকে বললেন, 'দেখ, আমার রত্নগৃহে চোর ঢুকবার প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাই সেখানকার অলঙ্কার-প্রকোষ্ঠের সিন্দুকগুলো পরীক্ষা ক'রে আমায় অবিলম্বে সব জানাও।'

রাজাজ্ঞানুযায়ী কোষাধ্যক্ষ পরীক্ষা ক'রে দেখল যে একটা সিন্দুকে রক্ষিত তিনটি অলঙ্কারের একটা রেখে দু'টো নিয়ে কোন বোকা চোর তার কাজ শেষ ক'রে পালিয়েছে! কিন্তু এটা বিচিত্র ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার বুঝতে পেরে চতুর কোষা তৃতীয়টা নিজে সরিয়ে ফেলল এবং রাজাকে জানাল যে একটা সিন্দুকের তিনটি অলঙ্কারই চুরি হয়ে গেছে।

রাজা স বুঝলেন এব তাঁর আদেশে কোষাধ্যক্ষ কর্মচ্যুত হ'ল। তারপর সেই দরবারে এনে হাজির করা হ'ল। রাজা অভয় দি প্রভৃতি যথাযথ বলে কোষাধ্যক্ষের ব্যাপারটাও সবটুকু জ তার সং ও সত্যবাদিতার জন্য ভূয়সী ক'রে তা দে বহাল করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

বিস ক্ষণ কি ভাবল; তারপর রাজার ঐকান্তিক হ'ল—কিন্তু দু'টি সর্তসাপেক্ষে। প্রথম মার ভিতর থেকে বের ক'রে সর্বসমক্ষে নিও তা গ্রহণ করলেন। দ্বিতীয় সর্তে সে প্রার্থ ক'রে এক সপ্তাহের পূর্বে কার্যে

চুল। চক্ষু দুহ হইতেছে; সঙ্গে স দিদিমাকে জড়াইয়া ধমক দিয়া বলিত চিন্তা অমনি হাসিয়া ব শুনলেন কেমন? ভয়ে

ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে রাজী হলেন। তারপর ই কোষাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করতে এল করলেন যে হঠাৎ এককালীন অতগুলো নীচু ক'রে রাজাকে জানাল, নেহাৎ র্থে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অপহরণ করেছে, পেটের

সহজ মানুষ চিন্ত

দায় ঘুচল বলে তাদের গোপন ঋণ ঐ টাকা দিয়ে নিঃশেষে সে পরিশোধ ক'রে এল। রাজা শুনে অসম্ভব খুসী হলেন।

তারপর বিনীত ভাবে সেও রাজাকে একটি প্রশ্ন ক'রে জানতে চাইলে যে, যার অতীত ইতিহাস এতটা কলঙ্কিত, তাকে তিনি বিশ্বাস ক'রে এত বড় দায়িত্বের পদ দিলেন কি ক'রে। রাজা উত্তরস্বরূপ সহাস্যে ওকে শুধু এই ক'টি কথা বললেন, 'যে লোক সত্য বলবার অগ্নি-পরীক্ষায় এমন অদ্ভুত ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে, যে এমন কঠিন লোভ অবহেলায় জয় করেছে, তার দুর্বলতা ক্ষণিকের মাত্র; অন্তরের দিক্ দিয়ে সে অবিলম্বে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক হয়ে যেতে বাধ্য। তার জন্য প্রয়োজন শুধু উপযুক্ত ক্ষেত্রের; আজ আমি তাকে সেই ক্ষেত্রটি প্রস্তুত ক'রে দিলম।'

লাল কুঠি

(বড় গল্প)

শ্রী ... বিহারী ...

আমার পুরোনো বন্ধু ডাক্তার প্রমোদ মুখার্জি ... পেলাম পত্রপাঠ বর্দ্ধমানে চলে আসবার জন্য। মন ... একটু নাম হয়েছিল, সেই জন্যই এই আহ্বান।

রায় বাহাদুর বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর নাম এ... হ'ল তাঁর মৃত্যু হয়েছে, এবং ছেলে অবিনাশই তাঁ... রকম একটা খবর আগেই শুনেছিলাম। ... যাবার পর তিনি আবার বিয়ে করেছিলেন।

ষ্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে কম্পাউণ্ড ... লোকেদের কাছে বাড়ীটা লালকুঠি নামে পরিচিত। ... তৈরী করেছিলেন এবং এখানেই তিনি বাস ক... করেছিল।

ষ্টেশনেই প্রমোদের সঙ্গে দেখা হ'ল ... এল, বললে, "বাঁচালে ভাই, যা দুর্ভাবনায় পড়েছিলাম!

আমার সামান্য বিছানা আর স্যুটকেস্ একটা সাইকেল-রিক্সায় চাপিয়ে দিলাম, আর একখানা রিক্সায় চেপে বসলাম আমরা দু'জনে।

চলতে চলতে প্রমোদ বললে, "ভারী অদ্ভুত ব্যাপারটা। রায় বাহাদুরের ছেলে অবিনাশের কথা হয়তো শুনেছ। বয়স বছর পঁচিশেক হবে। বেশ চমৎকার ছেলে। সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, ভদ্র ও শিক্ষিত। ছোট বেলা থেকেই দেখে আসছি ওকে। একদিন রাতে ঘুমোতে গেল যেমন ঘুমোয় অন্যান্য দিন। ব্যস্, তার পরের দিন দেখা গেল আধ-পাগলের মত গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিজের আত্মীয়-বান্ধবদের পর্য্যন্ত চিনতে পারছে না। ... বল তো?"

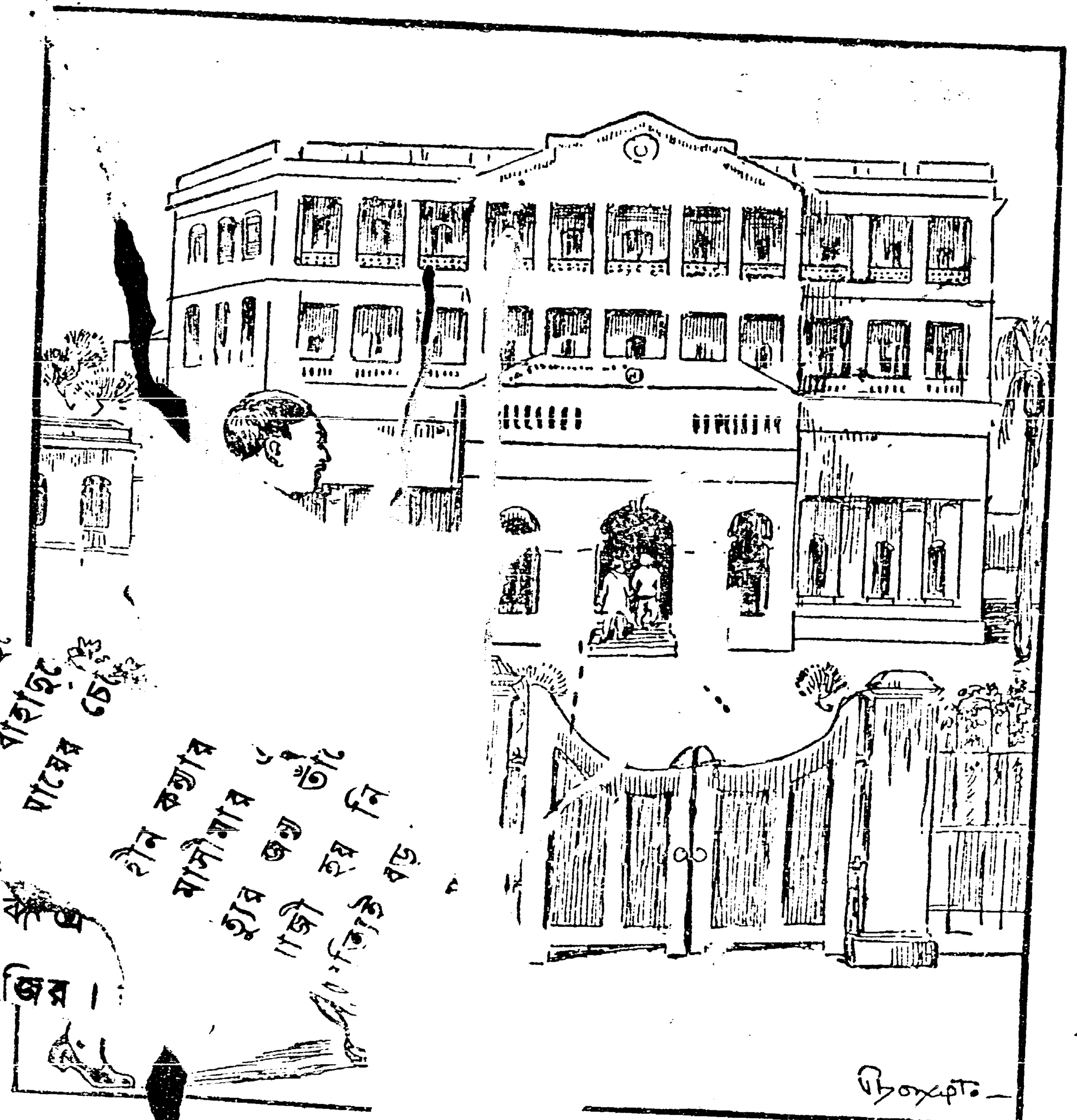

লাল ... অট্টালিকা—

আমি বললাম, "একস্মাৎ কোন মানসিক আঘাতই হয়তো এর মূল কারণ!"

"না, না, কোন মানসিক আঘাতই সে পায় নি।"—বললে প্রমোদ।

প্রমোদের কথার ধরণে আমার সন্দেহ বেড়ে গেল, বললাম, "তুমি কি কিছু লুকোবার চেষ্টা করছ আমার কাছ থেকে?"

প্রমোদ জোরে মাথা নাড়ে ... না তো!"

আমার সন্দেহ ঘনীভূত হ... দেখ প্রমোদ, আমার সব কিছুই জানা দরকার।"

প্রমোদ বললে, "অবিনাশে... জগত জীবনের সাথে বাস্তবিকই এর কোন সম্পর্ক নেই।

যত গণ্ডগোল ঐ বাড়ীটা নিয়ে। বাড়ীটায় অশরীরী কোন শক্তির আবির্ভাব হ'য়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।"

বলতে বলতেই কিছুটা দূরে একটা লাল রঙের সুরম্য অট্টালিকা চোখে পড়ল আমাদের। আমার দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করে প্রমোদ বললে, "এ-ই হ'ল রায় বাহাদুরের বাড়ী—লালকুঠি। বাস্তবিক সুনীল, এমন সুন্দর বাড়ীটা—কোন দিনই এ রকমটি ছিল না। হঠাৎ কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'য়েছে বাড়ীটার চারদিকে! একটা অজানা আশঙ্কা যেন প্রতিনিয়তই হানা দিচ্ছে বাড়ীটার উপর! আমরা যেন এটা অনুভব করতে পারি। অথচ বিশ্বাস কর, আমি মোটেই কুসংস্কারাপন্ন নই।"

আমি বললাম, "ব্যাপারটা আর একটু খুলে বললে ভাল হ'ত না?"

প্রমোদ বললে, "তবে শোন। একটু গোড়া থেকেই বলি। রায় বায়বাহাদুরের দুই বিয়ে। অবিনাশ হ'ল তাঁর প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান। বছর দশেক আগে প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর রায় বাহাদুর দ্বিতীয় বার বিয়ে করেন। দ্বিতীয়া পত্নী নমিতা দেবী বড় লোকের মেয়ে। আধুনিকা ও উচ্চশিক্ষিতা। কিন্তু তাঁকে আমি আজও ঠি[ক] বু[ঝে] উঠতে পারি নি।"

প্রমোদ একটু থামলে; তার পর বললে, "রায় বা[হা]দুরের প্রথমা স্ত্রী ছিলেন আমার মাসীমা। দ্বিতীয় বারের বিয়ের কথা শুনে যখন দ্বিতীয়া মাসীমা ক[ে] দেখতে [গেলাম]। তখন থেকেই কেন জানি না, নমিতা দেবীকে আমরা [তে]মন ভাল লাগ[ে] নি—কেমন [...] অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। সে যাই হোক, বিয়ের বছর দুই পরে নমিতা [দেবী]র একটু[...] হয়। ছেলেটি এখনও বেঁচে আছে এবং ভাল আছে। বছর তিনে[ক] [...]টি ছে[...] মৃত্যু হয়েছে[...] নমিতা দেবী এখানেই আছেন। অবিনা[শ] তাঁকে তার [...]য় বাহাদু[র...] [...]ও অধিক ও ভক্তি করে।

[...]মায়ের চো[...]

"রায় বাহাদুর তাঁর জীবদ্দশায় তাঁরই এক বন্ধুর [...]হীন কন্যার [...]ভার নিয়ে[...] মেয়েটি এখানে এ বাড়ীতেই মানুষ হ'য়েছে। রায় বাহা[দুর ...] কাস্ত[...] যে, অবিনাশের সাথে তার বিয়ে দেন। কিন্তু হঠাৎ [...] মাসীমার [...] কার্য্যে পরিণত হয় নি। অবিনাশ অবশ্যি প্রথম দিকে এ[...] [মৃ]ত্যুর জন্য তাঁ[...] মনে হচ্ছে, তার মত পরিবর্তন হ'য়েছে। [তা] ছাড়া, অ[...] [...]রাজী হয় নি [...]

আমরা ইতিমধ্যে রিক্সা থেকে নেমে ফটক [...] [...]উঁওড়[...] [...]রেছে। দু'দিকে খানিকটা করে ঘাসে ছাওয়া জমি, তার চা[র]দি[কে ...] [...]লেতী নানা [...]ম ফুলের গাছ। একধারে ঠাকুর-বাড়ী। লক্ষ্য করলাম, একটি অ[...] [...] বছরের মে[য়ে] মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সদ্যভেজা একরাশ কালো চুল [...]ময় ছড়িয়ে পড়েছে। পরনে একখানা সাদা তসরের কাপড়। একটি ধূসর র[ঙের] [...]দাটা বিড়াল তার পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের দু'জনকে ভিত[রে ...] [...]খে মেয়েটি একটুখানি থমকে দাঁড়াল। আমি পরিষ্কার লক্ষ্য করলাম, বিড়াল[টা ...] [...] পিটপিট করে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। আমার আবার বিড়াল পুষবার ভারী [...]!

আমি প্রমোদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই সে উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, এই মেয়েটাই অপর্ণা। আমার মাসীমার মৃত্যুর পর অপর্ণাই এখন গৃহদেবতার ভার নিয়েছে। সত্যিই ভক্তিমতী মেয়েটা।"

"ঠিকই বলেছ, মেয়েটীকে দেখে ভক্তিমতী বলেই মনে হয়। রায় বাহাদুরের স্নেহ অপাত্রে পড়ে নি।"—বললাম আমি। "বিড়ালটীও ভারী চমৎকার; অপর্ণার পোষা বুঝি?"

একটা অস্ফুট চীৎকার করে উঠল প্রমোদ। তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার সমস্ত মুখমণ্ডল ছাইএর মত সাদা হয়ে গেছে। আমিও বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম, বললাম, "কি হ'ল তোমার?"

বুঝলাম, অনেক চেষ্টা করে প্রমোদ তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনছে; শুষ্ক ভাবে জবাব দিলে সে, "কই, কিছুই না তো!'

প্রমোদ আমাকে সরাসরি ভিতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে। এখানে নমিতা দেবীর সাথে আলাপ হ'ল। [...]মধ্যবয়স্কা মহিলা, [ত]বে অতিশয় সুশ্রী। তীব্র তাঁর চোখের দৃষ্টি—অস্বাভাবিক রকম একটা গাম্ভীর্য্য তাঁর সর্ব্বাঙ্গে। চোখে-মুখে একটা হাসির আভাস টেনে আমার নমস্কারের জবাবে তিনি বললেন, "ডাক্তার বোসকে আমি 'তুমি' বলেই সম্বোধন করব; আমাদের প্রমোদের বন্ধু যখন তুমি, [ত]খন তো আমাদের ঘরের ছেলের মত।"

তাঁর এই আন্তরিকতা ঠিক [...]ত হয়তো গ্রহণ করতে পারি নি, কিন্তু তাঁর দৃষ্টির সামনে, [কে]ন জানি না, নি[জে]কে অত্য[...] [...]মনে হ'ল।—একান্ত অজ্ঞানতে যেন একটা শীতল [...]ণ জেগে উঠল আমার মনের [...]

[প্র]মোদকে লক্ষ্য করে [...] [ন]মিতা দেবী, "তুমিও বস বাবা, তোমার বন্ধুর সকাল [থে]কে খাওয়া-দাওয়া হয় নি [...] চা এনে দি[চ্ছি]।"

[...]পাশের টেবিলে চায়ের [...] [প্র]স্তুতই ছিল। একটা চাকরকে খাবার আনতে বলে [...] দেবী নিজেই চা তৈরী কর[তে ...] নির্দ্দেশ করলেন।

একটু পরে ঘরে প্রবেশ কর[ল ...]। এখন তাকে যেন আরও মহিমময়ী দেখাচ্ছিল; কপালে তার একটা চন্দনের টিপ। [...]সে পূজোর ঘর থেকে ফিরে এসেছে।

প্রমোদ পরি[চয়] করি[য়ে ...] একটা [...] প্রয়োজন, তাই বললাম, "বস মা, পূজোর কাজ সে[রে ...] বুঝি?"

অপর্ণা ঘাড় নেড়ে নীরবে সম্ম[তি ...]

তার অমন সুন্দর বিড়ালটী[কে ...] সাথে দেখতে না পেয়ে বললাম, "কিন্তু তোমার পোষা বিড়ালটী তো দেখছি না এবা[র ...]"

বিস্ময়াভিভূতের মত অপর্ণা [...]ল আমার দিকে। বললে, "কই, আমি তো বিড়াল পুষি না!"

আমিও ভারী অবাক হলাম, [...] সে কি, একটু আগে তোমার সাথেই তো দেখেছি [...] বিড়ালটী—যখন তুমি মন্দিরে যাচ্ছিলে, তোমার পায়ে পায়েই তো চলছিল সে!"

হঠাৎ কাপ-প্লেট ভাঙ্গার শব্দে পিছনে তাকিয়ে দেখি নমিতা দেবী চায়ের সরঞ্জাম সব উল্টে ফেলেছেন। কেটলী থেকে গরম জল মেঝেময় ছড়িয়ে পড়ছে, আর নমিতা দেবী যেন অসম্ভব রকম ঘাবড়ে গেছেন। (ক্রমশঃ)

সাগরপারে আ[illegible]

শ্রীঅরুণকুমার ব[illegible]্যোপাধ্যায়, [illegible]. এল্

আন্দামানের গল্প এবার ভাল ক'রে সুরু [illegible] ।

আন্দামানের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ার[illegible] দিক্‌টায়। এর উত্তরে মধ্য আন্দামান, তা[illegible] আরও দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি দ্বীপ র[illegible] কল্‌কাতা থেকে এর দূরত্ব ৬৭৮ মাইল, কিন্তু জলপথে নেহাৎ মন্দ নয়! তা ছাড়া রেঙ্গু[illegible] দুর্গম পথে,— বিলেত থেকে ইংলিশ চ্যানে[illegible] ফ্রান্সে। কিন্তু আন্দামান সে দিক্‌ [illegible] ছাড়া উপায় নেই। জাহাজ না হ'লে [illegible] ডিঙ্গিতে পার হবার বাসনা না হয়। [illegible] দিকে দ্বীপগুলো তিন দিক্ ঘিরে আছে, তা[illegible]

আন্দামানের দক্ষিণ-পশ্চিম[illegible] নর্থ বা উত্তর আন্দামান। [illegible]র নাম [illegible]টল্ আন্দামান। [illegible] নেই য[illegible] সে দূরত্বটা [illegible]টেও আস[illegible] যায় ভারতবর্ষে[illegible]র ওস্তাদ্ সাঁতারুরা এসেছেন [illegible]বারে মধ্যসমুদ্রে। জলযান [illegible] পড়ে সেখানে, যদি অবশ্য [illegible]রের কাছে উত্তর-পশ্চিম[illegible]র সমুদ্র অনেকটা শান্ত ছেলের

মত হয়েছে। একটু বেরোও পূব দিকে, তা হ'লেই দেখবে কেমন লাগে মজাখানা!

পোর্ট ব্লেয়ার পাহাড়ী জায়গার মত। খানিকটা শিলং আর পুরী মেশালে যা দাঁড়ায়,—"যাই না বলুক নিন্দুকে।" হাজার বারো লোক আছে এ সহরে। দোকানপাট আর সিনেমা হল্ আছে। তবে নদীর মাছ বা ফুলকপি, বাঁধাকপির তরকারী খাওয়া মুশকিল। উদ্ভিদ্‌বিদ্‌রা বলেন বিংশ শতাব্দীতে হয় না এমন জিনিষ নেই, যাই হোক্, যতদিন না তাঁরা কিছু একটা করছেন ওখানে, ততদিন কপি আর আলুর জন্য ওই জাহাজের ভরসায়ই থাকতে হবে। কপিকে তাজা নিয়ে যাওয়া কঠিন। ফ্রিজিডেয়ারে না নিলে শেষ পর্য্যন্ত 'ভোক্তব্য' থাকতে চায় না।

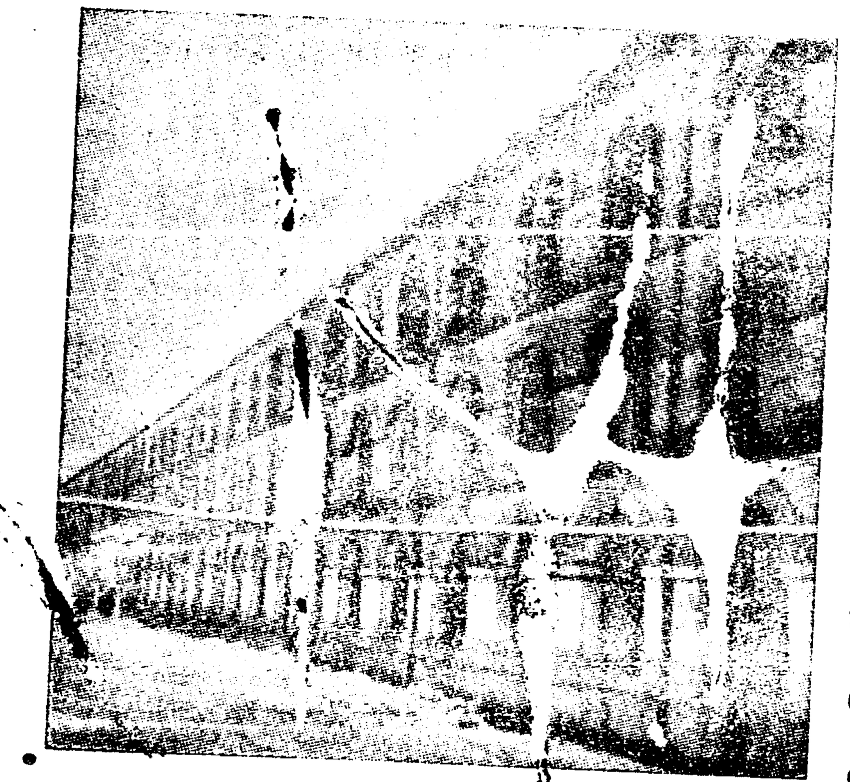
সেলুলার জেলের একাংশ, আন্দামান

কিন্তু ঢ্যাঁড়শ, মিষ্টি আলু, অজস্র নারকেল, কলা, কয়েক রকমের ডাল, কোন কোন শাকসব্জী, সমুদ্রের মাছ এখানকার বাজারে পাওয়া যায়। করিৎ-কর্ম্মা লোকেরা যোগাড়-যন্ত্র ক'রে সস্তায় বাইরে থেকে আনান। বাকীরা বাজারে একটু বেশী দাম দিয়েই কেনেন। আর এমনি জিনিষপত্র কলকাতা থেকে যায় বলে দাম একটু বেশী পড়ে। তেমনি আবার বাজে খরচ কম। আর সমুদ্রের মাছ বাজারে পাঁচ সিকে দেড় টাকা সের, [illegible]কট সমুদ্রে[illegible] ধারে [illegible] গে[illegible] সস্তা[illegible] সওদা করা যায়। তোমাদের দেখলে পয়[illegible] [illegible]নবে ন[illegible] হয়তে[illegible]। [illegible]াক্, বাজার নিয়ে তোমাদের মাথাব্যথা নেই।

পোর্ট ব্লেয়ারে ছোট [illegible]টর [illegible]াট সংস্করণ চিফ্ কমিশনার আছেন। তাঁর অফিস্ আর তাঁর অফিসের ক[illegible]রী[illegible] ছাড়া অন্য সব সরকারী অফিস্ রয়েছে। বাঙ্গালী ছেলেরা খুব হল্লা[illegible] করে,—অতুল-স্মৃতি সমিতি নামে একটি সমিতিও গড়ে তুলেছে। [illegible] লাইব্রেরী হয়েছে একটি। কালীপূজোয় ওখানে প্রবাসী ছোট ছোট [illegible]য়েরা বেশ নাচ, গান ও থিয়েটারও করল।

হ্যাঁ, ভাল কথা, আন্দামানের সব চেয়ে বড় জিনিষ জেলখানার কথাই ত' বলি নি। ওখানে বাড়ীঘর কাঠ-কাচের, কিন্তু জেলখানা বিরাট ব্যাপার!—ইটের তেতালা—অনেকগুলো সারি দিয়ে। ওপরে একটি জায়গা থেকে পাহারা দিলে সমস্ত জেলখানা দেখা যায়। কিছুটা অংশ এর ভেঙ্গে গেছে। কয়েদী খুবই কম রয়েছে। কিন্তু চেহারাটা জেলখানার গম্‌গমে। জেলখানা বেশ ওপরে। ছাদ থেকে দৃশ্য মনোরম। পোর্ট ব্লেয়ার—রস্ দ্বীপ—সমুদ্র—মাউণ্ট হ্যারিয়েট। চোখ জুড়িয়ে যায়! কিন্তু যারা ওর ভেতরে যেত তাদের চোখ ত' জুড়োত একবার, তারপর অবস্থাটা বোঝ। পালিয়ে যাবে কতদূর? রাজনৈতিক বন্দীরা সাহেবদের খুবই বেগ দিতেন। ওখানকার পুলিশরা খুব সেই সব গল্প করে। খানিক জ্ঞান ও খানিক অজ্ঞানতা দিয়ে লোভনীয় রসসৃষ্টির চেষ্টা করে। সোৎসাহে দেখায় যে সব সেলএ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীরা থাকত, ফাঁসির মঞ্চ এবং বেত মারার জায়গাটা। জেলখানাটি বেশ মজবুত তার সাবাস্ জেলখানা। এখন স্বাধীনতার স্মারক একটি ছোট স্তম্ভ তৈরী করা হয়েছে জেলের পাশে।

পূর্ব্ব বাংলা থেকে বাস্তুহারারা এসে আন্দামানে ঘর বেঁধেছে। ছবিতে দেখ, একজন বাঙ্গালী চাষী তার ক্ষেতে কেমন ধান ফলিয়েছে।

রস্ দ্বীপে সরকারী কর্ম্মচারীরা থাকতেন আগেকার ভ মন্ধে। এখন ভয় কেটে যাওয়ায় ও জায়গাটি বাড়িঘর সমেত পড়ে রয়েছে ছবির মত।

পোর্ট ব্লেয়ারে হাসপাতালের বৈশিষ্ট এই, সরকারী ডাক্তার ছাড়া বেসরকারী ডাক্তার নেই ওখানে। সমস্ত আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ডাক্তার বা ওষুধের জন্য কাউকে খরচ করতে হয় না। সরকার ও কাজটা বিনি পয়সায় করে থাকেন। মায় ওষুধের শিশি পর্য্যন্ত। তবে গ্রামে গ্রামে এখনও তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয় নি—ডাক্তারখানার জন্য খানিকটা দূরে যেতে হয়। ধীরে ধীরে ব্যবস্থা হবে আশা করা যাচ্ছে। গ্রামগুলো ত' অল্প ... গেও জঙ্গল ছিল—এর মধ্যে তা'তে মানুষ বসিয়ে ফসল গজান হচ্ছে। ... পূরোপূরি ব্যবস্থা হ'তে কিছু সময় লাগাটাই স্বাভাবিক।

তোমরা নিশ্চয়ই জান যে পূর্ব্ব বাংলা থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কিছু পরিবারকে আন্দামানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘর হারিয়ে কলকাতার ফুটপাথে বা এখানে ওখানে দিশেহারা হয়ে না ঘুরে তারা যে পেয়েছে ঘর—কিছু জমি, মোষ আর গোড়ার দিক্‌টায় টাকার সাহায্য, এ যে কিছু নয় তা বলা খুবই ভুল হবে। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে কোন গ্রাম পাঁচ-ছয় মাইল, কোনটা দশ-এগারো মাইল দূরে। দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে এসে আবার নতুন ক'রে ঘর বেঁধে ও ফসল ফলিয়ে তারা আর দু'-এক বছর আরও একটু ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করলে এবং উপযুক্ত শ্রম করলে হয়তো ভবিষ্যতে একদিন নিজেদের ও পরিবারের সকলকার মুখে খানিকটা হাসি ফোটাতে পারবে। তাদের মধ্যে বেশ সবল কাউকে হয়তো দেখলাম প্যান্‌প্যান্ করবার ইচ্ছা প্রবল—আবার অন্য কাউকে দেখলাম তাদের নতুন পরিবেশে খুবই সন্তুষ্ট। ৭৫ বছরের এক বৃদ্ধকে দেখলাম, নয়াসহর গ্রামে তাঁর মাঠের শস্য—বিশেষ করে কলার ছড়া দেখাবার জন্য খুবই ব্যগ্র। কোথাও বা দেখলাম একটি ১৩ বছরের ছেলে ৬ জনের দায়িত্ব নিজের মাথায় নিয়ে নির্ভীক্ দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে। তাকে বলা হ'ল, "এই জঙ্গলটা কেটে নিতে পারবি?—তোর আছে কে?"—বল্‌ল, "কাকীমাকে মায়ের মত দেখি, মা নেই। আমি এ জঙ্গল সাফ করে চাষ করব।" বড় আশ্চর্য্য লাগল অতটুকু ছেলের ওই দূর দেশে অমন নির্ভীক্ মনোভাব দেখে।

নানা গ্রাম পত্তন করা হয়েছে। কোথাও জমি একটু ভাল, কোথাও খারাপ। কোথাও কাছে ঝরণার জল থাকায় সুবিধা আছে, কোথাও জলের কষ্ট আছে। কোন কোন জায়গায় সমুদ্রের নোনা জলে ক্ষতি করায় বাঁধ বেঁধে জল সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে দেখলাম। স্বাস্থ্য ভালই বলতে হবে। নাম-করা রোগেরা বাসা বাঁধতে পারে নি এখনও। জায়গাগুলির নাম বিবিধ,—মথুরা, বৃন্দাবন, হাম...গঞ্জ, ওয়াণ্ডুর, কেকাবাদ, নয়াসহর, মঙ্গলুটান্, মেমিও ইত্যাদি অর্দ্ধ বঙ্গ অর্দ্ধ বর্ম্মী নাম।

অবশ্যি কাঁকড়া বিছে বা জোঁকের উৎপাত আছে এখানে। কিন্তু আমাদের পল্লীগ্রামেও তো ... বেশ দর্শন মেলে। বিষাক্ত সাপ বিশেষ নেই বলেই শুনলাম—আর হিংস্র জন্তু-জানোয়ারও নেই। বন-বিভাগের বড় আস্তানা আন্দামান। অর্জ্জুন গাছের ...াই করে। আর আছে প্যাডক্, সিল্‌ভার গ্রে ও নানা রকম পোষাকী ও সাধারণ গাছ। আর রয়েছে অজস্র নারকেলের

বাগান—যা ওখানকার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। এ ছাড়া রবারের চাষও ওখানে কিছুটা হয়। ওখানে চিরবসন্ত। পুরীর সমুদ্রতীরের চাইতে সামান্য একটু বেশী গরম মনে হ'ল।

পরের বারে এ সম্বন্ধে আরও বলবার ইচ্ছে রইল।

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

এক

প্রথম পরি ়য়

প্রথমেই আমরা পাঠককে নিয়ে যাবো আমে‌েকার যুক্ত ট্রে পশ্চিম প্রান্তে, মিসৌরী ন ও তার শাখা-প্রশাখার জলে ধোয়া সেই বন্য দেশে, আধুনিক সভ্যতা যেখ র প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। রেড ইণ্ডিয়ানদের যে সব জাতি এ দেশে বাস করে তাদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হ'ল পনি, সিয়াই, পেইগান, দেলাওয়ায়ার, ক্রো, ব্ল্যাকফিট প্রভৃতি। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যতই মানুষ বন-জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন ক ়, এই রেড ইণ্ডিয়ানরা ততই একটু একটু করে 'রকি' পাহাড়ের দিকে পেছিয়ে যেতে াধ্য হা ,

মানুষ ছাড়াও এ অঞ্চলে বাস করে বুনো ঘোড়া, গর্দ্দভ, হরিণ, মোষ আর ব্যাজার। মুক্ত প্রাণের আবহাওয়ায় প্রকৃতির কোলে গ'ড়ে ওঠা এ দেশের পশুপাখী, মানুষ—সবাই সর্ব্বান্তঃকরণে স্বাধীন, উদ্দাম, প্রাণচঞ্চল।

মিসৌরীর শাখা-প্রশাখা-ধৌত ঐ দেশের এক বিশেষ অঞ্চলে প্রকৃতি যেন তার সমস্ত ঐশ্বর্য্য-সম্ভার ঢেলে দিয়েছে। বহুদূর বিস্তৃত প্রান্তরের পর প্রান্তর, কোথাও বা বনের পর বন। যেই সঘন সবুজের বুকে এক অপূর্ব্ব সরোবর যেন মুক্তোর মত ঝলমল করছে। এ জায়গার নাম মাস্তাং উপত্যকা। এই সুদূর উপত্যকায় আজ পর্য্যন্ত সাদা মানুষের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এখানে আজও নেকড়ে বাঘ এবং ভালুকের অধিপত্য বজায় রয়েছে।

যখনকার কথা আমরা লিখছি, তার কিছু দিন পূর্ব্বে কয়েক ঘর বিশ্রামপ্রার্থীর দল এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিলো। সভ্য জগতের হট্টগোল থেকে অব্যাহতির আশায় তারা এখানে এসে বসবাস শুরু করে। বন্য জন্তু এবং বন্য মানুষের অস্তিত্বের কথা তাদের অজানা ছিলো না, এবং তারা সে জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলো।

প্রথম যখন তারা বসতি স্থাপনের জন্য এ দেশে আসে, এ উপত্যকা তখন ছিল একদল মাস্তাং হরিণের চারণ-ভূমি। অশ্বারোহী শ্বেতাঙ্গ মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বন্য হরিণগুলি আর্ত্ত চীৎকার তুলে, কেশর দুলিয়ে, হাওয়ার বেগে কোথায় মিলিয়ে গেল। এই ঘটনা থেকেই এ উপত্যকার নাম হয়েছে মাস্তাং উপত্যকা।

চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার পর আর বিশ্রামপ্রার্থীদের তাদের আশ্রয়-স্থান খুঁজে নিতে সময় লাগলো না। সঙ্গে সঙ্গেই বসতি নির্ম্মাণের কাজ শুরু হ'লো। একে একে গাছপালা কাটা পড়তে লাগলো, এখানে ওখানে মাথা তুলতে লাগলো ছোটখাটো শিবির। সেই নির্জ্জনতা সচকিত ক'রে শিকারীদের বন্দুক থেকে থেকে জানিয়ে দিলো—শিবিরে ভোজের ব্যবস্থাটা নিতান্ত হতাশাজনক হবে না। কিছুদিনের মধ্যেই মাস্তাং উপত্যকা এক বর্দ্ধিষ্ণু উপনিবেশে পরিণত হ'লো।

সংবাদ পেতে অবশ্য রেড ইণ্ডিয়ানদের দেরী হ'লো না। বন্য পশুর চর্ম্মের বিনিময়ে তারা শ্বেতাঙ্গদের ছুরি, কাঁচি, মালা, পেতল, টিন গ্রহণ করতো; কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতো এই "ফ্যাকাশে-মুখোদের", কারণ তারা এসে উপনিবেশ স্থাপন করার ফলে তাদের শিকারের পরিধি এখন অনেকটা সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। শ্বেতাঙ্গরা যদি সংখ্যায় এবং ক্ষমতায় তাদের সমকক্ষ না হ'তো তো কোন্ কালেই তারা এদের হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হ'তো!

এই শ্বেতাঙ্গদের সমাজপতি ছিলেন মেজর হোপ। মেজর হোপ ছিলেন প্রথম শ্রেণীর শিকারী, অব্যর্থ তাঁর লক্ষ্য। এই নতুন উপনিবেশে তাঁর প্রথম কাজ ছিল একটা ছোটখাটো দুর্গ তৈরী করা, যাতে রেড ইণ্ডিয়ানদের আকস্মিক আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়তে না হয়। শ্বেতাঙ্গ সমাজের ত্রাণকর্ত্তা হিসেবে মেজর হোপ এই দুর্গেই বসবাস ক'রতেন।

এইবার আমাদের গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেই। প্রথমেই বল্‌ব ক্রুসোর কথা, কেন না এই দুর্গই হ'লো ক্রুসোর জন্মস্থান! তার শৈশবের কয়েকটা দিন সে এখানেই নেচে-কুঁদে হেসে খেলে কাটিয়েছে। ক্রুসোর পিতামাতা উভয়েই

ছিলো বনেদী নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড বংশের কুকুর। তার বাপের নামও ছিলো ক্রুসো, আর মায়ের নাম 'ফ্যান'।

ক্রুসোর জন্মের সময় তার সঙ্গে তার এক ভাই আর দু'টি বোনও জন্মগ্রহণ করেছিলো, কিন্তু তাদের তিন জনের একসঙ্গে অপঘাত মৃত্যু ঘটে। মায়ের অনুমতি না নিয়ে একদিন তারা চারজন একসঙ্গে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিলো, হঠাৎ সবাই একসঙ্গে জলে প'ড়ে যায়। ওদের বয়স তখন মাত্র এক মাস। ফ্যান দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে প'ড়ে প্রথমে ক্রুসোকে উদ্ধার করে। পরে অন্য বাচ্চাগুলোকেও সে ডাঙায় তুলেছিলো বটে, কিন্তু ততক্ষণে তারা সবাই শেষ হয়ে গেছে।

এর কিছুদিন পরে ক্রুসো আর এক দুর্ঘটনা থেকে নিতান্ত ভাগ্যক্রমে রক্ষা পায়। এক সুন্দর অপরাহ্ণের কথা বলছি। একদল সিয়াউ ইণ্ডিয়ান মাস্তাং উপত্যকায় কি কাজে এসে দুর্গের কাছেই তাঁবু খাটিয়েছিলো। রেড-ইণ্ডিয়ানরা মেজর হোপের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ ক'রে খাবারের আয়োজন করছে। এক তরুণ শিকারী নীরবে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে তাদের। তাঁবুর সামনে আগুন জ্বালা হয়েছে, একটি রেড ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক কেটলি ক'রে কি একটা তাতে গরম করছে। তার ছোট ছেলেটা কয়েকটা রেড ইণ্ডিয়ান কুকুর-বাচ্চার সঙ্গে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী ক'রে খেলা করছে। তাঁবুর সর্দ্দার আর তার দুই ছেলে মোষের চামড়ার ওপরে ব'সে অলস ভাবে পাইপ টানছে আর তাদের লক্ষ্য করছে। ছেলেটার অদ্ভুত হাবভাব দেখে তরুণ শিকারী বেশ মজা উপভোগ করছিলো।

মাস্তাং উপত্যকার সাধারণ শিকারীর সঙ্গে এই তরুণটির সাদৃশ্য খুব বেশী নয়। পুরুষোচিত দৈর্ঘ্য ও শক্তির অধিকারী হ'লেও তার চেহারায় বলিষ্ঠতার থেকে বেশী ক'রে চোখে পড়তো কমনীয়তা ও কর্ম্মনিপুণতা। নির্জ্জন বনে বনে একা ঘুরে বেড়ানো ছিলো তার প্রধান বিলাস। তার মাথার চুল বাদামী, চোখের রঙ উজ্জ্বল নীল। ওদেশী শিকারীদের মত তারও মাথায় ছিলো হরিণের চামড়ার টুপি, পরনে চামড়ার শার্ট।

"রেড ইণ্ডিয়ানদের দেখে তোমার খুব হাসি পাচ্ছে দেখছি ডিক ভার্লে!" দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে তাকে লক্ষ্য ক'রে একজন বললো।

"সত্যি তাই, জো ব্ল্যাণ্ট!" যুবক তার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললো।

"সাবধান কিন্তু, ওদের নিয়ে বেশী হাসাহাসি ক'রো না; একটুতেই ওদের মেজাজ চড়ে যায়। জানো তো, একবার ক্ষেপে গেলে ওরা সহজে শান্ত হয় না।"

"না না, ওই রেড ইণ্ডিয়ান বাচ্চাটার রকম-সকম দেখে হাসছি। তুমিই বলো, ওর কাণ্ড দেখে না হেসে থাকা যায় কি?"

বাচ্চাটা তখন একটা ছোট কুকুরছানার সঙ্গে খুব হৈ-চৈ করছিলো।

হঠাৎ সেই স্ত্রীলোকটি এক হাতে কুকুরছানাটাকে পেছনের পা ধরে টেনে তুলে অপর হাতে একটা কাঠের টুকরো দিয়ে তাকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করতে শুরু করলো। কুকুরছানাটাকে একেবারে না মেরে ফেলে সেটাকে সে আগুনের ওপরে তুলে ধরলে,—উদ্দেশ্য, এ ভাবে লোমগুলো

পুড়ে যাওয়ার পর তাকে রান্না করার জন্য কড়ায় ফেলবে। কুকুর-বাচ্চাটা তার বজ্রমুষ্টির ভেতরে প্রাণপণে মুক্তির চেষ্টা করছে।

ডিক ভার্লের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হ'তেই সে বুঝলো, এ কুকুর-বাচ্চাটা মেজর হোপের ক্রুসো ভিন্ন আর কেউ নয়। সঙ্গে সঙ্গে ডিক ক্রুদ্ধ চীৎকার ক'রে এমন ভাবে স্ত্রীলোকটির কাছে লাফিয়ে এলো যে সঙ্গে সঙ্গে রেড ইণ্ডিয়ান তিনটে চমকে উঠে তাদের 'টোম্যাহক' বাগিয়ে ধরলো। টোম্যাহক হচ্ছে রেড ইণ্ডিয়ানদের এক রকম যুদ্ধের অস্ত্র। অস্ত্রটি হালকা, দরকার হ'লে ছুঁড়েও মারা যায়।

জো ব্ল্যাণ্ট এক পা-ও অগ্রসর হ'লো না বটে, কিন্তু তার স্থির, কঠোর দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে ওরা আর অগ্রসর হ'তে সাহস করলো না। ডিক ভার্লেও ক্রুসোকে স্ত্রীলোকটির কবল থেকে উদ্ধার ক'রে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো, তারপর বাচ্চাটাকে কোলে ক'রে অগ্রসর হ'লো দুর্গের দিকে।

ও অঞ্চলের শিকারী বলতে যা বোঝায়, জো ব্ল্যাণ্ট হ'লো মনেপ্রাণে তাই। তার আকৃতি ছিলো যথার্থ শিকারীসুলভ; বন্দুকের লক্ষ্য প্রায় অব্যর্থ। জো অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। হাসিঠাট্টা সে পারতপক্ষে ভালো বাসে না। ডিক ভার্লের এই ব্যাপার দেখে সে বিশেষ সন্তুষ্ট হয় নি; মনে মনে বললো, নাঃ, এই গোঁয়ার্ত্তুমির জন্যে কোন্ দিন ছেলেটা বিপদে পড়বে দেখছি!" বলে সে আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে গেলো।

বেচারা ক্রুসো! তার শরীরের প্রায় সমস্ত লোম পুড়ে গিয়েছিলো। ডিক ভার্লের কোলে আশ্রয় পেয়ে সে কাতর কণ্ঠে কেঁা কেঁা ক'রে অভিযোগ জানালো। কি উপায়ে ফ্যান তাকে সারিয়ে তুললো জানি না, কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ক্রুসো আবার আগের মতোই বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠলো।*

(ক্রমশঃ)

*একটি বিখ্যাত বিদেশী উপন্যাসের মর্ম্মানুবাদ।

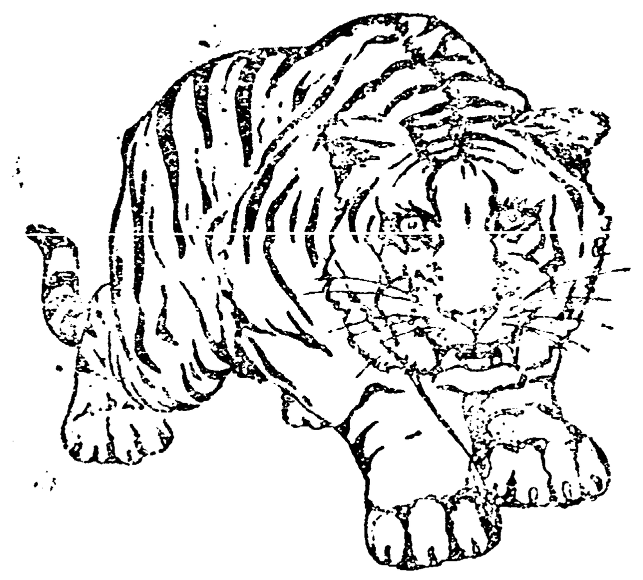

চিত্রশালা

—রাণীর সাজ—

অজন্তা গুহা-চিত্র

—শিবাজীকে ভবানীর অস্ত্র দান—

শুভ বৈশাখে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সৌরাষ্ট্রেতে সোমনাথ লাগি পাঠায়ে দিলাম ডাকে,
ধুস্তুর আর আকন্দমালা গলায় পরাতে তাঁকে।
সদ্য গব্য ঘৃত,
দেখিয়া হবেন প্রীত,
আমার মাধবী ফুলের মধু যা ছিল শাখে মৌচাকে।

পাঠালাম প্রিয় অজয়ের জল, হাসিবেন প্রভু পেয়ে,
কোনো অংশেই ন্যূন নহে তাহা গঙ্গার জল চেয়ে।
একশত আট পাতা
বিল্বপত্র গাঁথা
নীলকণ্ঠকে একটী গোলাপ দিয়াছে আমার মেয়ে।

আমার গাছের আম্রের শাখা, বৃন্ত সহিত আম,
শ্যামলতা বেল আঁকরের ফুল শতদল অভিরাম।
পাঠালাম কর্পূর,
নূতন আকের গুড়,
'গোবিন্দ-ভোগ' আতপ পাঠানু, পূর্ণ মনস্কাম।

পাঠালাম লিখে ব্যোম ব্যোম হর বুকের রক্ত দিয়া,
কুঙ্কুম আর আবীরের সাথে উল্লাস মিশাইয়া।
অশ্রু-মুকুতা দু'টি—
দিয়েই নিলাম ছুটি,
দিনরাত শুধু তোলপাড় করি তাহারি কাহিনী নিয়া।

এসেছেন তিনি, এসেছেন তিনি নয় শ' বছর পর,
সর্ব্বস্ব যে আমার তিনিই সেই শিব সুন্দর।
আজিকে মুক্তিস্নান,
আজি পুনরুত্থান,
এলো ভারতের জ্যোতিঃ-প্রপাত, অমৃতের নির্ঝর।*

* এই বৈশাখে শ্রীশ্রীসোমনাথ জিউর অভিষেক।

নববর্ষের গান

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আঙিনা তোমার শ্যামল কোমলে
সাজালে হে নব-বর্ষ,
লক্ষ বক্ষে প্রীতি-করুণায়
দিলে সখ্যের স্পর্শ।
স্বপ্নজড়িমা চক্ষে
চির পুরাতন এলো নবীনের
রূপের মাধুরী বক্ষে।
দূর দিগন্তে ওঠে জয়—জয়!
কেন এত ব্যথা, কেন এত ভয়?
অতীতেরে দাও করিয়া বিলয়—
হৃদয়ে জাগাও হর্ষ।
প্রলয় বিষাণে—রুদ্র নিশানে
এলে আজি নববর্ষ!

নবীন উষার উদয় বিশ্বে—
কেটে যায় অমা রাত্রি,
দূর দিগন্তে পেয়েছে পন্থা
গৃহ-হারা শত যাত্রী।
এসেছে কি শুভ লগ্ন?
নবসৃষ্টির দাও হে দীক্ষা
পুরাতনে করি ভগ্ন।

এসো হে কিশোর, দিক্ দিক্ হ'তে
নব আনন্দে দুর্ব্বার স্রোতে—
বিশ্ব যে চির বীরেরি ভোগ্যা,
নহে করুণার পাত্রী;
নব প্রভাতের মন্ত্র লহ গো,
কাটে পুরাতন রাত্রি।
জাগিছে এশিয়া—নবীন এশিয়া
নব বরষের লগ্নে,
নব বিশ্বের সৃজন-প্রয়াসে
বিশ্বসুপ্তি ভগ্নে।
চীন ও জাপান, ইন্দোনেশিয়া,
ইরাণ, ইরাক উঠিবে হাসিয়া,
ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল, শ্যাম
মিলন-আশায় মগ্নে;
পৃথিবীর আশা এশিয়া জাগিছে—
নব বরষের লগ্নে।

বীর কবি নজরুল

শ্রীনবগোপাল সিংহ

বাংলা মায়ের বিপ্লবী কবি বিদ্রোহী নজরুল
যুগসঞ্চিত প্রতিভায় রচা প্রকৃতির বুলবুল।
জীবনের শুভ প্রত্যূষ হ'তে উদার কণ্ঠ নীড়ে
গানের বিহগী মূর্ত্ত করিল সুরের জাহ্নবীরে।
সপ্ত সাগর মন্থন করি অমৃত-কণিকা লভি
শ্যাম, শ্যামা আর আল্লার ভেদ ভাঙ্গিলে হে বীর কবি!
রক্ত জবার গোপন সাধনা মূর্ত্ত হইল গানে,
সৃষ্টির মাঝে সাম্য দেখালে হিন্দু মুসলমানে।

পরাধীনতার শিলায় পিষ্ট সুপ্ত তরুণ দলে
শিকল ভাঙার মন্ত্র শিখালে শিকল পরার ছলে।
"অগ্নিবীণার" অগ্নিমন্ত্র, "বিষের বাঁশীর" সুর
বিস্ময়ঘন গণ দেবতায় করিল স্বপ্নাতুর।
সহসা তোমার মুখর কণ্ঠ মূক হ'ল কেন আজি,
দেশ জননীর বন্দনা-গীতি কণ্ঠে ওঠে না বাজি!
জানি না তোমার এ কোন্ সাধনা একান্তে নিরালাতে,
জাগো জাগো কবি, জাগাও বিশ্বে সুরের মূর্চ্ছনাতে।

ডাক ও খনার বচন

শ্রীসুনীল ঘোষ, এম্. এ

প্রাচীন বাংলা "কথাসাহিত্যের" গল্প তোমরা রামধনুতে পড়েছ। এগুলির দাম আজকের দিনে যাই হোক, একদিন এরাই ছিল বাংলার জনসাধারণের অতি আদরের জিনিষ। সেদিক্ থেকে এদের বাংলার জাতীয় সম্পদ্ বললেও অত্যুক্তি হয় না। কোন দেশের কোন সাহিত্য রাতারাতি ম্যাজিকে গ'ড়ে উঠতে পারে না; তার জন্য চাই চেষ্টা, সাধনা আর জনসাধারণের সহানুভূতি।

৮০০ থেকে ১২০০ সাল—এই যুগটাই হচ্ছে বাংলা সাহিত্য-সৃষ্টির আদি পর্ব্ব। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ভাল ক'রে জানতে হ'লে এই যুগটাকে ভাল করে জানা দরকার। এই যুগের নানা ধরণের লোকের নানা রকম চিন্তাধারার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একালের সাহিত্য। ধর্ম্ম কলহের ভেতর দিয়েই এই সাহিত্য রচনার চেষ্টা সার্থক হয়েছিল। তখনকার দিনে এ দেশের প্রাকৃতিক অবস্থাটা ছিল ভয়াবহ। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সুন্দরবন; তারও নীচে সমুদ্র। এখানে সভ্যতা বিস্তার করতে গিয়ে মানুষকে অনেক দাম দিতে হয়েছে। সাপের মুখে

মরতে হয়েছে, বাঘের মুখে মরতে হয়েছে, আর মরতে হয়েছে জল-ঝড়-বৃষ্টিতে। এখানকার অধিকাংশই চাষী, কৃষিকার্য্যের চেষ্টাতেই প্রাকৃতিক দুর্যোগকে এড়িয়ে তাদের বাঁচতে হয়েছিল।

তা হ'লেই দেখা যাচ্ছে, সাহিত্যটা নেহাৎ অবসর সময় কাটাবার জন্য সৃষ্টি হয় নি। বাস্তবিক, জীবনের সঙ্গে যে সাহিত্যের সম্বন্ধ নেই তাকে ঠিক সাহিত্য বলা যায় না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন• সাহিত্য-সৃষ্টির গোড়ার কথা হচ্ছে রসসৃষ্টি। সেই রস হচ্ছে জীবনের রস, জীবন ধারণের জন্যে সংগ্রাম।

'ডাক' অথবা 'খনার' গল্প অনেকটা প্রবাদের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে,—ইংরেজীতে যাদের বলা হয় 'লিজেণ্ড'। অথচ এঁরা কেউ ঠিক খাঁটি বাংলা দেশের নয় বলে কেউ কেউ মনে করেন। অনেকের মতে 'ডাক' ছিলেন গোয়ালা।

খনার কথা তোমরা কিছু কিছু শুনে থাকবে। উজ্জয়িনীর সম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একটি রত্ন ছিলেন বরাহ। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বরাহ ছিলেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। তাঁর পুত্র মিহির। অনেকে মনে করেন খনা ছিলেন সিংহলের রাজতনয়া; পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মিহিরকে স্বামিত্বে বরণ করে তিনি দেশ ত্যাগ করেন। ইনিও জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন; এমন কি তাঁর প্রতিভায় বরাহের জ্যোতিঃও নাকি ম্লান হয়ে যায়। গল্প আছে, এঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সম্রাট্ বিক্রমাদিত্য বরাহকে নবরত্ন-সভা থেকে অবসর দিয়ে তাঁর জায়গা খনাকে দান করেন। এতে বরাহ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। সেই জন্য খনা নিজের হাতে নিজের জিভ কেটে ফেলেন।

গল্প যাই হোক, ডাক ও খনার বচনগুলি তখনকার পল্লীর ঘরে ঘরে এত বেশী প্রচলিত হয়ে পড়েছিল যে সবারই প্রায় তা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

ডাকের বচন জ্যোতিষ শাস্ত্র নিয়ে হ'লেও মানুষ নিয়েই বেশী। এই মানুষকে নিয়েই তো সংসারে চলতে হয়, তাই মানুষকে চেনার দাম যেমন বেশী, তেমনি প্রয়োজনীয়; আর তার চেয়েও বেশী কঠিন। মানুষকে বিচার করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল "ডাকের"। কয়েকটা উদাহরণ দেই:

"ঘরে আখা বাইরে বাঁধে।
অল্প কেশ ফুলাইয়া বাঁধে॥
ঘন ঘন চায় উলটি ঘাড়।
ডাক বলে এ নারী ঘর উজাড়॥"

অর্থাৎ যে নারী নিজের সাজ-পোষাক নিয়েই ব্যস্ত থাকে, আর সব সময় ঘরের চেয়ে বাইরের দিকেই যার আগ্রহ বেশী, সে নারী ভাল নয়।

আবার,

"রাঁধে বাড়ে গায় না লাগে কাতি।
অতিথি দেখিয়া মরে লাজে ॥

* * *

রৌদ্রে কাঁটা কুটায় রাঁধে।
খড় কাট বটাকে বাঁধে ॥

* * *

যেন যায় তেন আইসে।
ডাক বলে গৃহিণী সে ॥"

গৃহিণীপনাই ছিল সে যুগের বাঙ্গালী সমাজে মেয়েদের আদর্শ।

'খনার' কতকগুলি বচন বিশেষ করে কৃষকদের জন্য। অবশ্য গ্রহাচার্য্যের নজিরও যথেষ্ট আছে। কৃষকদের উদ্দেশ্যে যে বচনগুলি লিখিত সেগুলি পড়লেই বুঝবে কথাগুলি হচ্ছে কৃষকদের নিজস্ব সম্পত্তি। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে চাষের সম্বন্ধে তারা যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছে তারই সংকলন রয়েছে এই বচনগুলিতে ; যেমন—

"খনা ডেকে বলে যান।
রোদে ধান ছায়ায় পান ॥"

অর্থাৎ ধানের জন্যে চাই রোদ, আর পানের (পান গাছ) জন্যে চাই ছায়া!

আবার— "দিনে রোদ, রাতে জল।
তাতে বাড়ে ধানের বল ॥
কাতিকের উন জলে।
খনা বলে দুন ফলে ॥"

তা হ'লেই দেখ, বচনগুলির মধ্যে কল্পনার স্থান নেই—নিছক সত্য কথা।

তখনকার বাঙ্গালীরা সংসার যেমন করতো তেমনি হাঁচি-টিকটিকির ভয়েও

জড়সড় হয়ে থাকতো। এটা অবশ্য হয়েছিল এই কারণে যে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের জন্যে বোরোনো বড় ঝামেলার ছিল। তাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল তারা বেশী।

"হাঁচি, টিকটিকি বাধা।
যে না মানে সে গাধা ॥"

এ ছাড়া ছিল কাকের ডাক। কাকের ডাক কখনও শুনেছো? আমরা আজকাল তোয়াক্কা না করলেও তখনকার প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ করতো। হয়ত কোনও শুভ কাজে কেউ বেরোচ্ছে, বাড়ীর কাছে খাবারের লোভে বসে আছে একটা কালো মিশমিশে কাক। আপনার মনেই সে ডেকে উঠলো: "কঃ কঃ" কিংবা "কৌলো কৌলো"। ব্যস্, অমনি যাওয়া বন্ধ। নিশ্চয় ভাবছো এর আবার মানে কি? মানে কি আমরাও জানি নে। কাকের ভাষা—কাকই বোঝে। হয়ত তার ক্ষিদে পেয়েছে, কিংবা এমনি ডাকছে। কিন্তু তখনকার বাঙ্গালীরা এই ডাকের মধ্যে অমঙ্গল ভবিষ্যৎবাণী খুঁজে পেতো। এইখানে কয়েকটা পাখীর ভাষা দিয়ে দিই—এ সবের অর্থ তাদের কাছে কেমন মজার ছিল দেখ:

"কঃ কঃ"—যাও না, বুঝবে ঠেলাটা ; রাজা তোমায় শাস্তি দেবেন।
"কেতং কেতং":—তোমার টাকাপয়সা নষ্ট হবে।
"কৌলো কৌলো":—যে জন্যে যাচ্ছ তা সফল হবে না মশাই!
"করকো করকো":—ঝগড়া হবে।

পাখীরা যে সব সময় ভয় দেখাতো তা নয় ; ভাল কথা, আশার কথাও তারা বলতো। যেমন:

"করকং করকং:—বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে।
"ক্ক ক্ক":—তোমার মঙ্গল হবে।
"ক্রেং, ক্রেং, ক্রেং":—তোমার লাভ হবে।

এই সব পাখীর ভাষার অর্থও খনার বচনে পাওয়া যায়। অবশ্যি এ সব ভবিষ্যৎবাণী যে সব সময়ে ফলতো তা মনে করলে ভুল হবে।

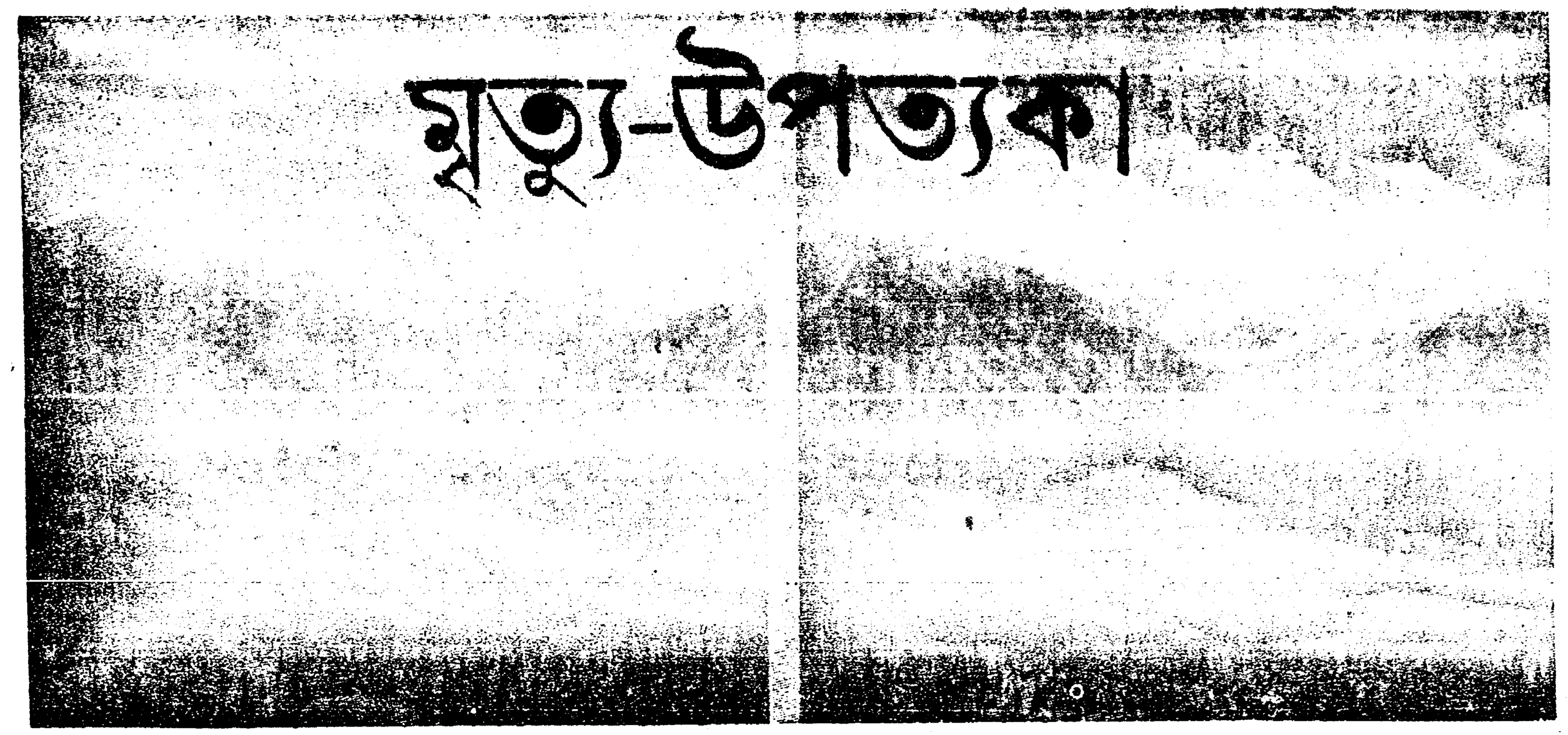

মৃত্যু-উপত্যকা

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

মৃত্যু-উপত্যকা নাম শুনলেই হয়তো মনে হবে এ বুঝি কোন রহস্যময়—রোমাঞ্চ-উপন্যাসের কাহিনী শোনাতে বসেছি আমি। রহস্যময় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, এবং রোমাঞ্চকর বললেও হয়তো ভুল হবে না; কিন্তু আমার এ কাহিনী উপন্যাসের কল্পনা নয়, সত্যি সত্যিই এই মৃত্যু-উপত্যকা আজও পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্যালিফোর্ণিয়া দেশের নাম তোমরা সবাই শুনেছ। এই ক্যালিফোর্ণিয়ায় ইনিও ব'লে একটি জায়গা আছে। মৃত্যু-উপত্যকা হচ্ছে তারই একটি অংশ। চারদিকে পাহাড়-ঘেরা জায়গাটি, মাঝখানটা বিরাট একটা শুকনো হ্রদের মত নেমে এসেছে। কিন্তু নেহাৎ ছোটখাট বলা চলে না। লম্বায় প্রায় ১৪০ মাইল হবে। চওড়ায়ও ১৫।১৬ মাইল। জায়গায় জায়গায় ২০।২৫ মাইলও আছে। আসল উপত্যকাটি (প্রায় ৫০০ বর্গ মাইল) সমুদ্রের চাইতেও নীচু। একটা জায়গা সমুদ্র থেকে ২৮০ ফুট নীচু। ও অঞ্চলে অর্থাৎ পশ্চিম গোলার্দ্ধে ওর চাইতে নীচু জায়গা আর নেই।

কিন্তু নীচু বলেই জায়গাটার ঐ রকম নামকরণ হয় নি। ওর বিশেষত্ব হচ্ছে ওখনকার দারুণ গরম। পৃথিবীর মধ্যে অত গরম জায়গা আর নেই।

আমাদের দেশে সব চেয়ে গরম জায়গা হচ্ছে জাকোবাবাদ। গ্রীষ্মকালে এখানে ১১৪ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ দেখা দেয়। কিন্তু মৃত্যু-উপত্যকায় গরমের দিনে কত ডিগ্রী তাপ ওঠে জান?—১৩৪ ডিগ্রী। তাও ছায়ায়। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এর মধ্যে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে মাঝে মাঝে ১৭০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপ ওঠে। কিন্তু নিয়মিত ভাবে সেখানে গিয়ে তাপ পরীক্ষা করার সাহস কারোই হয় না।

জায়গাটা যে শুধু অসম্ভব গরম তাই নয়,—শুকনোও অসম্ভব। গ্রীষ্মকালে ওখানকার বাতাস এত তেতে ওঠে যে শরীরের সমস্ত জল পর্য্যন্ত শুকিয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। মৃত্যু-উপত্যকা নামের কারণও তাই। অনেক দিন আগে একবার এক দল ভ্রমণকারী ঐ অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে রোদের তাপে এমন ভাবে ঝলসে যায় যে তাদের কেউ আর শেষ পর্য্যন্ত ফিরে আসতে পারে নি। সেই থেকে ওটি এক রকম বিভীষিকার রাজ্য হয়ে পড়ে—আর কাছাকাছি অঞ্চলের লোকেরা ওর নাম দেয় "মৃত্যু-উপত্যকা"।

উপত্যকার কাছাকাছি রুক্ষ মরু-অঞ্চল

কিন্তু গরমই হোক আর শুকনোই হোক্, জায়গাটির আকর্ষণও কম নয়। আশপাশের পাহাড় ধুয়ে যত ঝরণা আর নদী গিয়ে পড়েছে ঐ শুক্‌নো উপত্যকায়, তার পর রোদের তাতে শুকিয়ে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু জলধারা মিলিয়ে গেলেও ঐ সব জলস্রোতের সঙ্গে ভেসে-আসা নানা খনিজ পদার্থ মিলিয়ে যেতে পারে নি। ফলে ঐ সব খনিজ পদার্থ স্তরে স্তরে জমে জায়গাটিকে ভাগ্যান্বেষীদের কাছে

পরম লোভনীয় ক'রে তুলেছে ;—বিশেষ ক'রে সোহাগা এবং সোরা সংগ্রহকারীদের কাছে। এ ছাড়া ব্যবসায়ে লাগে এমন অন্য রাসায়নিক দ্রব্যও কিছু কিছু রয়েছে।

৫০।৬০ বছর আগেও ও অঞ্চলে ভাগ্যান্বেষীরা হামেশাই যাতায়াত করত। সোহাগা সংগ্রহ ক'রে ওখানেই তা সংশোধন ক'রে নিতে পারলে আনবার খরচ অনেক কম পড়ে, তাই কেউ কেউ ওখানেই ছোটখাট কারখানা বসিয়ে কাজ সুরু ক'রে দিত। কেউ বা মাটীতে গভীর গর্ত্ত খুঁড়ে খনিজ-মেশান জল সংগ্রহ করত। আজও ও অঞ্চলে সেই সব ভাঙ্গাচোরা কারখানা, পরিত্যক্ত অস্থায়ী কাঠের ঘর, এমন কি বালির মধ্যে অব্যবহার্য্য অবস্থায় সেকালের বাষ্পে চলা ঠেলা-গাড়ী, মালগাড়ী ইত্যাদি খুঁজে পাওয়া যায়।

ভূতাত্ত্বিক সম্পদ্ হিসাবেও জায়গাটি পরম মূল্যবান্। প্রচণ্ড গরমের জন্য ওখানে গাছপালা গজায় না—গজালেও গ্রীষ্মকালে টিকতে পারে না। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্দের কাছে লোভনীয় এত অজস্র জিনিষ ওখানে ছড়িয়ে আছে যার তুলনা মেলা ভার। তা ছাড়া জায়গাটির দৃশ্যও খুব মনোরম। চারদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়। বরফে ঢাকা তাদের শুভ্র চূড়া প্রখর সূর্য্যালোকে ঝলমল করে। কখনও বা পাহাড়গুলি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে রং বদলায়। মাটির রূপই বা কত না বিচিত্র! কোথাও ধূসর রুক্ষ পাথরের কুচি গড়াগড়ি যাচ্ছে, কোথাও বা পাথুরে নূনের গাদা রোদে আর জলে ফোঁপরা হয়ে সাদা স্পঞ্জের মত রমণীয় রূপ ধারণ করেছে। কোথাও বা দূর থেকে মনে হচ্ছে টলটলে নদীর জল, কাছে গেলে দেখা যাচ্ছে, কোথায় জল, শূন্য নদী!—শুকনো ফেনা মাটির ওপর জমে সূর্য্যের আলোয় চিক্ চিক্ করছে! এই রকম আরও কত কি!

এই সব দেখে স্থানীয় সরকার জায়গাটিকে একটি প্রাকৃতিক উদ্যান ব'লে ঘোষণা করেছেন আর ওর নাম দিয়েছেন "ন্যাশনাল পার্ক" বা "জাতীয় উদ্যান"। ওখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ্ আজ জনসাধারণের জাতীয় সম্পত্তি ব'লে গণ্য হচ্ছে।

ফলে মৃত্যু-উপত্যকা আজ ও দেশের একটি দর্শনীয় বস্তু। প্রতি বছর লক্ষাধিক লোক বেড়াবার জন্য ওখানে হাজির হয়। এ জন্য সরকার থেকে চমৎকার চমৎকার রাস্তা তৈরী ক'রে দেওয়া হয়েছে, পথের নিশানা ক'রে দেওয়া হয়েছে, জলের ব্যবস্থা হয়েছে। ভ্রমণকারীদের সুখ-সুবিধার জন্য রাখা হয়েছে একদল শিক্ষিত কর্ম্মচারী। মরু অঞ্চলের আবহাওয়া সম্বন্ধে এঁরা বিশেষজ্ঞ। কি ক'রে ঐ রকম জায়গায় ভ্রমণ করতে হয়, ওখানকার তাপ এবং অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কি ক'রে আত্মরক্ষা করতে হয়, কি অবস্থায় কতটা তাপ লোকে সহ্য করতে পারে ইত্যাদি হরেক রকম শিক্ষায় এঁরা শিক্ষিত। এঁদের কাজ হচ্ছে ভ্রমণকারীদের ঠিক মত নির্দ্দেশ দেওয়া এবং বিপন্ন হ'লে তাঁদের উদ্ধার করা—সাহার্য্য করা।

শীতকালে মৃত্যু-উপত্যকার আবহাওয়া বেশ সুন্দর, বেড়াবার পক্ষে চমৎকার বললেও দোষ হয় না। শতকরা নব্বই জন পর্য্যটক এই সময়টাতেই ওখানে বেড়াতে যান। সেখানে তাঁদের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলি দেখাবার ব্যবস্থা আছে। কোথায় গেলে পশ্চিম-পৃথিবীর সব চেয়ে নীচু জায়গায় পৌঁছান যাবে, কোথা থেকে সব চেয়ে মজার মজার দৃশ্য চোখে পড়বে, কোথায় গেলে পরিত্যক্ত সোহাগার খনি এবং প্রাচীন ভাগ্যান্বেষীদের পরিত্যক্ত আরও নানা ধরণের চিহ্ন (যা নাকি এখন ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে) দেখা যাবে,—সব। প্রায় সব পর্য্যটকই মোটরকারে যান, নইলে ঘুরে ফিরে দেখা সম্ভব হয় না।

কিন্তু গ্রীষ্মকালেও ও অঞ্চলে যাবার সখ হয় এমন লোকের অভাব নেই। অবশ্য তাঁদের সংখ্যা কম—সব শুদ্ধ বছরে হাজার দুই-তিনের বেশী নয়। এঁদের মধ্যে কেউ যান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে, কেউ যান খনিজ সম্পদ্ আবিষ্কারের লোভে, আবার কেউ কেউ যান নেহাৎই সখ মেটাতে—বাহাদুরী করবার লোভে। গ্রীষ্মকালেই পরিদর্শক কর্ম্মচারীদের কাজ যায় বেড়ে। কেন না বাহাদুরী করতে গিয়ে বা তাঁদের ভাষায় "অভিজ্ঞতা সঞ্চয়" করতে গিয়ে অনেক সময় অনেকে নানা বিপদে পড়েন। সময় থাকতে সাবধান না ক'রে দিলে সময় সময় সত্যি সত্যি তাঁদের মৃত্যু-উপত্যকার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান কঠিন হয়ে পড়ে। এই সময় বড় রাস্তা ছেড়ে ছোটখাট রাস্তায় ঘোরা বারণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে বড় রাস্তায় মোটর দাঁড় করিয়ে হেঁটে হেঁটে এদিক্ ওদিক্ ঘুরে আসেন। ফলে হামেশাই তাঁরা বিপদে পড়েন এবং পরিদর্শকদের তাঁদের খুঁজে বার করতে হয়। একবার একটি ভ্রমণকারী এই ভাবে মোটর রেখে প্রায় ১৬ মাইল চলে গিয়ে-ছিলেন, তার পর অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। 'উদ্যানে'র কর্ম্মচারীরা পর দিন তাঁকে যখন খুঁজে বার করল তখন তাঁর প্রাণটা শুধু কোন রকমে ধুকধুক করছে। গরমে শরীরের জল সব প্রায় শুকিয়ে গেছে। এক রাত্রের মধ্যে শরীরের ওজন পূরো এক মণ কমে গেছে।

এই সব কর্ম্মচারীদের অভিজ্ঞতার গল্প শুনলে অবাক্ লাগে। গ্রীষ্মকালটা তাঁদের এক মূহূর্ত্ত বিশ্রাম নেই। সর্ব্বদাই বিপন্ন এ্যাডভঞ্চার-পিয়াসীদের সন্ধানে ঘুরতে হয়। সন্ধানের ব্যাপারে অবশ্যি একটা জিনিষ প্রায়ই খুব সাহায্য করে। আর কিছু না, ভ্রমণকারীদের পরিত্যক্ত জুতো, মোজা, শার্ট ইত্যাদি পোষাক। দারুণ গরমে দিশেহারা হয়ে তাঁরা একে একে জামাকাপড় খুলে ফেলতে সুরু করেন। শেষটা এমন হয়, যে, তাঁদের স্বাস্থ্যজ্ঞানও লোপ পেয়ে বসে, পরনের শেষ কাপড়টুকুও খুলে ফেলতে তাঁদের বাধে না। জলের খোঁজে পাগলের মত তাঁরা ছুটতে থাকেন। পরিদর্শকেরা প্রায়ই এই রকম অর্দ্ধোন্মত্ত ২।১ জন পর্য্যটকের দেখা পান এবং তাঁদের ধরে এনে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন। অনেক সময় পর্য্যটকেরা মোটর সমেত চোরাবালিতে আটকে যান। তাঁদেরও উদ্ধার করবার প্রক্রিয়া এঁদের জানা আছে। শুধু তাই নয়, ছোট ছোট এরোপ্লেন নিয়েও এঁরা তৈরী থাকেন,—কোন পথপ্রান্ত ভ্রমণকারী বিপথে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেললে এরোপ্লেনের সাহায্যে তাঁকে খুঁজে আনবার জন্য। এ রকম নাকি তাঁদের প্রায়ই করতে হয়। অনুসন্ধানের কাজে বেতার এবং নানা রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যও নেওয়া হয়ে থাকে প্রচুর।

বেশী জানার বিপদ্

(কুড়ান গল্প)

শ্রীশান্তা দেবী

গাঁয়ের শেষ প্রান্তে মস্ত বড় এক তেঁতুল গাছ। তারই কাছাকাছি এক গর্ত্তে বাস করে শেয়াল পণ্ডিত। চালাক-চতুর ব'লে অন্যান্য পশুরা তাকে খুব খাতির করে। শেয়ালেরও মনে মনে তাই বেশ একটু অহঙ্কার আছে।

একদিন ভিন্ গাঁ থেকে এক বেড়াল এসে সেই গাঁয়ে আস্তানা গাড়ল। তেঁতুল-তলায় বেড়াতে গিয়ে শেয়াল পণ্ডিতের সঙ্গে তার আলাপও হয়ে গেল।

সেই থেকে প্রায় রোজই সে আসে, শেয়ালের সঙ্গে গল্প করে, শেয়ালের কাছে নানা গল্প শোনে। অনুগত শ্রোতা পেয়ে শেয়ালও খুব খুসী। দু'জনের মধ্যে নানা সুখ-দুঃখের কথাও হয়।

একদিন বেড়াল বললে, "আচ্ছা, এ গাঁয়ের কুকুরগুলো নিয়ে কি করা যায় বল তো? এমন দুষমণ কুকুর আমি দুনিয়ায় আর কোথাও দেখি নি। কারণে অকারণে দেখতে পেলেই তেড়ে আসবে! প্রাণ নিয়ে পালানো দায়।"

বেড়াল গাছের উপর থেকে... দেখছিল

শেয়াল স্বীকার করলে যে গাঁয়ের কুকুরগুলো বাস্তবিকই বড় বদ্‌রাগী। দুষমণই বটে। "কিন্তু," শেয়াল এবার বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বললে, "কৌশল জানা থাকলে ওদের ফাঁকি দেওয়া কিছুই নয়।"

বেড়াল বললে, "আমি তো কেবল একটি কৌশলই জান, দৌড়ে গিয়ে গাছে ওঠা। তুমি আর কিছু জান নাকি?"

শেয়াল তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, "ফুঃ, একটা? হাজার রকম কৌশল জানি। তার যে কোনটা খাটিয়ে কুকুরদের ফাঁকি দেওয়া চলে।"

শেয়ালের কথা শেষ হ'তে না হ'তে দূরে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা গেল। যেন কাদের মিলিত ক্রুদ্ধ গর্জ্জন! বেড়াল কান খাড়া ক'রে বল্‌লে, "ঐ রে, আজও বুঝি কুকুরগুলো দল বেঁধে বেরিয়েছে! এখনই হয়তো এসে পড়বে!"

বলতে বলতে কোলাহল আরও স্পষ্টতর হয়ে উঠল এবং চোখের পলকে কোথা থেকে একপাল কুকুর তাদের লক্ষ্য ক'রে ছুটে এল। বেড়াল বেগতিক দেখে তার জানা একমাত্র কৌশলটি কাজে লাগাতে দেরী করল না—বিদ্যুৎ-বেগে সে একটা গাছের উপর গিয়ে উঠল।

শেয়াল পণ্ডিত কিন্তু হাজার রকম কৌশল জানে। সে ভাবতে লাগল, কোন্ কৌশলটা এখন কাজে লাগাবে,—কোন্ কৌশলে সব চেয়ে সহজ ভাবে কুকুরদের আক্রমণ এড়াতে পারা যাবে। ফলে সে চট্ ক'রে কিছু ক'রে উঠতে পারল না।

কিন্তু কুকুরেরা আর তাকে ভাববার সময় দিল না। তার আগেই তারা শেয়াল পণ্ডিতের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলল।

বেড়াল গাছের উপর থেকে সবই দেখছিল। ব্যাপার দেখে সে মনে মনে ভাবল, বাপ্, কি বাঁচাটাই সে আজ বেঁচে গেছে! ভাগ্যিস তার মাত্র একটি কৌশলই জানা ছিল! নইলে, শেয়াল পণ্ডিতের মত অত বেশী জানা থাকলে, কি অঘটনটাই না ঘটত!

জীবজন্তুর চিকিৎসা

আজকাল চিকিৎসার খরচ দিনকে দিন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। নিত্য নতুন রোগও যেমন দেখা দিচ্ছে, ওষুধও তেমনি বেরুচ্ছে নিত্য নতুন। কিন্তু তার দাম যোগাতে সাধারণ লোকের দফা সারা।

জীবজন্তুদের বেলা কিন্তু এত হাঙ্গামা নেই। তবে কি তাদের অসুখ হয় না? অসুখ হয় বৈকি মাঝে মাঝে, কিন্তু তার চিকিৎসা তারা নিজেরাই ক'রে নেয়, ওষুধও তারা প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকেই যোগাড় করে।

বিড়ালকে ঘাস খেতে দেখেছ কখনও? ঘাস বিড়ালের খাদ্য নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে তাকে ঘাস খেতে দেখা যায়। পেটের গোলমাল হ'লে জোলাপ হিসাবে সে ঘাস ব্যবহার করে। এ রকম অন্যান্য জীবজন্তুরাও,—এমন কি মাংসাশী জন্তুরাও, অনেকে অসুস্থ হ'লে ঘাস, গাছের পাতা—এই সব খেয়ে পেট পরিষ্কার করে। খাওয়া-দাওয়ার গোলমালই হচ্ছে বেশীর ভাগ অসুখের কারণ। ঠিক মত খাওয়া এবং হজম না হ'লে শরীরে নানা বিষাক্ত জিনিষ জমে শরীরকে অসুস্থ ক'রে তোলে। তাই জীবজন্তুরা অসুস্থ হ'লে প্রথমেই চেষ্টা করবে কি ক'রে পেট পরিষ্কার রাখা যায়।

অসুস্থ অবস্থায় গোড়ার দিকে 'লঙ্ঘন' অর্থাৎ উপোস করা একটা বড় রকম চিকিৎসা। প্রায় সব জীবজন্তুই এ নিয়মটি জানে এবং মেনে চলে। তা ছাড়া জীবজন্তুর মুখের লালা তাদের পক্ষে একটা কার্য্যকরী ওষুধ। অনেক সময় শরীরের কোথাও কাটা, ছেঁড়া কিংবা ঘা হ'লে তারা সেই ক্ষতস্থানে মুখের লালা লাগিয়ে দেয় এবং বেশ সহজেই সে ঘা শুকিয়ে যায়।

কিন্তু আসল কথা, মানুষের তুলনায় জীবজন্তুর অসুখ-বিসুখ অনেক কম হয়। প্রকৃতির নিয়মে থাকে ব'লেই এমনটা হয়। আমাদের জীবনযাত্রা খাওয়া-পরা ইত্যাদির মধ্যে নানা রকম কৃত্রিমতা ঢুকেই অবস্থাটা জটিল ক'রে তুলেছে। এ সম্বন্ধে একটি গল্প শোন।

অনেক দিন আগেকার কথা। দক্ষিণ আমেরিকার এক জায়গায় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রেল লাইন বসানো হচ্ছিল। হঠাৎ দেখা গেল কর্ম্মচারী, কুলি—সকলের মধ্যেই এক রকম অদ্ভুত রোগ দেখা দিয়েছে। শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে, দেহ রক্তশূন্য হয়ে পড়ছে। অনেক ক'রেও যখন কিছু হ'ল না তখন ডাক্তারেরা বললেন, "এ জায়গা মানুষের বাসের অযোগ্য। এখান থেকে পাততাড়ি গুটোনোই সব চেয়ে মঙ্গল।" কিন্তু একজন তরুণ ডাক্তার এ কথা মানতে রাজী হলেন না। তিনি দেখালেন, মানুষ সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়ছে বটে কিন্তু ও জায়গায় সুস্থদেহ পশুপাখীর অভাব নেই। তারা দিব্য হৃষ্টপুষ্ট দেহে, বহাল তবিয়তে বনে বনে ঘুরে বেড়ায় এবং সংখ্যায়ও তারা নেহাৎ কম নয়। বানর হচ্ছে মানুষের কাছাকাছি

জীব। তিনি সেই অঞ্চলের কতকগুলি স্বাস্থ্যবান্ বানরের গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে দেখলেন, তারা বনের টাটকা ফল, পাতা এই সব খেয়েই দিব্যি সুস্থ রয়েছে। তিনি বললেন, "আমরাও টিনে-ভরা শুকনো খাবার আর আমদানী-করা মুখরোচক খাবার না খেয়ে এই রকম টাটকা ফল, টাটকা শাকসব্জী খেয়ে দেখি না কেন! তখন সকলকে তাঁর পরামর্শ মত খাবার দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল আগেকার সে রোগটি আর দেখা যাচ্ছে না, লোকেরা ক্রমেই সুস্থ এবং স্বাস্থ্যবান্ হয়ে উঠছে। কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হয়ে আবার রেলের কাজ সুরু করলেন। এই ভাবে পশুপাখীর কাছে থেকে মানুষ সেদিন প্রকৃতির সম্পদ্ সম্বন্ধে একটি মূল্যবান্ তথ্য সংগ্রহ করল।

টাটকা ফল-তরকারির মধ্যে যে প্রচুর ভিটামিন থাকে এ খবর হয়তো তোমরা জান। শুকনো কৃত্রিম খাবারে ও জিনিষ দুর্ল্লভ। আর এই ভিটামিন আমাদের শরীর সুস্থ রাখার পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়।

প্রবাদের গল্প

প্রায় সব দেশেই জন সাধারণের মধ্যে কতকগুলি প্রচলিত কথা আছে যার রচয়িতার নাম বড় কেউ জানে না কিন্তু কথাবার্ত্তায় সেগুলি হামেশাই ব্যবহৃত হয়। এগুলিকে বলা হয় প্রবাদ-বাক্য। কতকগুলি প্রবাদ ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর ভিত্তি ক'রে তৈরী। এই ধরণের কয়েকটি প্রবাদের নমুনা এখানে দেওয়া হ'ল। এদের ঠিক মত আসল অর্থ হয়তো তোমাদের সকলকার জানা নেই, তাই অর্থও বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল।

কেঁচে গণ্ডুষ করা ঃ—ব্রাহ্মণেরা খেতে বসে এক গণ্ডুষ জল মুখে দিয়ে খাওয়া শুরু করেন। খাওয়া হয়ে গেলে পরে কেউ যদি ফের নতুন ক'রে এক গণ্ডুষ জল মুখে দেয় তবে মনে হবে সে নিশ্চয়ই নতুন ক'রে খাওয়া সুরু করছে। সেই থেকে কোন কাজ একবার শেষ হয়ে গেলে আবার সুরু করার নাম কেঁচে গণ্ডুষ করা।

অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ি ঃ—গল্প আছে রাজা বল্লাল সেন যখন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করতে যান তখন দত্ত বংশের কোন লোক খুব অহঙ্কার ক'রে তাঁকে বলেছিলেন যে তাঁরা, অর্থাৎ দত্তরা, কারও ভৃত্য নয়।—"একত্র বসতি মোরা করি চিরকাল।" এবং তারই ফলে নাকি তাঁরা কৌলীন্য-মর্য্যাদা পেলেন

না। অভিমান অর্থাৎ অহঙ্কারের ফলে তাঁদের এই পতনকেই জনৈক কবি গড়াগড়ি খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন। অহঙ্কারের ফলে কেউ প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হ'লে তার সম্বন্ধে এই প্রবাদ-বাক্যটি বলা হয়।

হরি ঘোষের গোয়াল ঃ—সেকালের কলকাতায় হরি ঘোষ নামে একজন ধনী লোক ছিলেন। তাঁর ছিল বিরাট এক বৈঠকখানা এবং সেখানে বহু নিষ্কর্ম্মা লোক প্রত্যহ জড় হয়ে পান-তামাক-গাঁজার শ্রাদ্ধ করত আর গল্প-গুজব ক'রে সময় কাটাত। সেখানে কারও ঢুকতে বাধা ছিল না, যে আসত সেই জায়গা পেত; এমন কি খাওয়া-দাওয়ার জন্যও ভাবতে হ'ত না। সেই জন্য ঠাট্টা ক'রে সেই আড্ডাকে বলা হ'ত 'হরি ঘোষের গোয়াল'। নিষ্কর্ম্মা মানুষ-গুলোকে গরুর সঙ্গে তুলনা ক'রেই এই নামকরণ হয়। সেই থেকে যেখানে বহু লোক একত্র হয়ে বাজে কাজে সময় নষ্ট করে তাকেই বলা হয় হরি ঘোষের গোয়াল। কলকাতায় এই হরি ঘোষের নামে একটি বিখ্যাত রাস্তা আছে।

খোসগল্প

(সংগ্রহ)

জাহাজের ক্যাপ্টেন নতুন শিক্ষার্থী নাবিককে প্রশ্ন করলেন, "মনে কর জাহাজের পেছন দিক্ থেকে প্রচণ্ড একটা ঝড় এল। তখন তুমি কি করবে?"

"একটা নোঙ্গর ফেলে দেব।"—শিক্ষার্থী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল।

"আচ্ছা, মনে কর, জাহাজের পাশের দিক্ থেকে একটা ঝড় উঠল, তখন?"

"আর একটা নোঙ্গর ফেলে দেব।"

ক্যাপ্টেন এবার একটু বিচলিত ভাবে প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, মনে কর জাহাজের সামনের দিক্ থেকে একটা ঝড় আসছে, তখন কি করবে?"

"কেন, আরও একটা নোঙ্গর নামিয়ে দেব।"—শিক্ষার্থী তেমনি বিনা দ্বিধায় উত্তর দিল।

"রোস রোস," ক্যাপ্টেন এবার উত্তেজিত ভাবে বললেন, "অত নোঙ্গর তুমি পাচ্ছ কোথা থেকে?"

"কেন, যেখান থেকে এতগুলো ঝড় পাচ্ছি সেখান থেকেই।"

* * * *

রেল-দুর্ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। রেল-কোম্পানীর বড় সাহেব প্রত্যেক ষ্টেশনে হুকুম পাঠালেন, প্রত্যেকটি ঘটনার খবর, তা সে যত ছোটই হোক্ না কেন, এক মুহূর্ত্ত দেরী না ক'রে তাঁর কাছে পাঠাতে হবে।

পর দিন সকালে খবর এল, "অমুক ষ্টেশনে একটি লোক প্ল্যাটফর্ম্ম থেকে পা পিছলে পড়ে গেছে একেবারে চলন্ত এঞ্জিনের সামনে। পরবর্ত্তী সংবাদ পরে জানাচ্ছি।"

বড় সাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মনের মধ্যে নানা রকম চিন্তা। উঠে তিনি পাগলের মত ছট্ফট্ করতে করতে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সন্ধ্যাবেলা পরবর্ত্তী সংবাদ এল। "কেউ আহত হয় নি। কারণ এঞ্জিনটা তখন সামনের দিকে যাচ্ছিল না, পেছন দিকে ব্যাক্ করছিল।"

ভ্যা-জাল!

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

যেমন গাধার মত চলেছে ট্রেন্‌টা, তেমনি যাত্রীর গাদাগাদি। তিল ধরণের ঠাঁই নেই কোথাও। গাড়ির দোর-গোড়াতেই দাঁড়িয়ে ছিল জনান্তিক, ভিড় ঠেলে এগুতে পারে নি। আপিস্ টাইমের কলকাতা-লোক্যাল্, লোকাধিক্য হবেই। জানা কথা।

জনান্তিক রায়। নামটাই খালি নয়, জনান্তিকের বেশভূষা, চালচলন সবই আধুনিক। আপাদমস্তক ফিটফাট্। কেতাদুরস্ত পূরোপূরি। আর তার কাজ? কাজটা তো একালের বটেই, বলতে গেলে রীতিমতই একালীন এবং এককালীন। সব দিক্ দিয়ে একেবারে একেলে সে!

নামের মত, কাজটাও তার জনান্তিক। বদনামের কিছু নেই—ধরা না পড়লে। পকেট মারার পেশা তার। এক একজনের অন্তিম দশা তার হাতে।

আর এই ভিড়ের মধ্যেই তার সুবিধে বেশি। জনসমুদ্রের মধ্যে যে একটা অদ্ভুত নির্জনতা থাকে তার ফাঁকেই তার কাজটা ভালো চলে। সর্বজনের অগোচরে, জনান্তিকেই সে সারতে পারে। কাঁচির কাজ হ'লেও নেহাৎ কাঁচা কাজ হয় না। পাকাপাকি উপায় হয়। মোটামুটি মন্দ নয়। গভীর জলের মাছ আমাদের জনান্তিক।

জনান্তিকের সামনেই দাঁড়িয়েছিল এক ছোক্‌রা। বছর সতের আঠারোর, বেশ স্মার্ট ছেলেটি। চকচকে চামড়ার হাতব্যাগটা বুকের কাছে আঁকড়ে ব্যগ্রভাবে সে দাঁড়িয়ে ছিল। পাছে কেউ তার ব্যাগটা ছিনিয়ে নেয় সেই ভয়ই যেন তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল মনে হয়।

নজর এড়ায় নি জনান্তিকের। সবজান্তা চোখ তার। যেমন পাকা তেমনি চোখা। হাত সাফাইয়ের এই কারবার তো তার কম দিনের নয়! কম খাটুনি আর বিনা মূলধনের এই ব্যবসা। বেশ উপায়, বেশি রোজগার। রোজ ঘাড় ভাঙা অপরের। আজ এই কচি ঘাড়টার ওপরেই কোপ বসাতে হবে তাকে।

ব্যাগটার মধ্যে মোটামুটি মন্দ নেই, ছেলেটার হাবভাবেই সে টের পেয়েছিল। একশো টাকার নোটে দশকের দশ কেতায়। হাজার দশেক টাকা তো বটেই। ব্যাগটাকে অটুট রেখে, ছেলেটার হাতে রেখেই, তাকে একটুও জানতে না দিয়ে ভেতরের মাল যদি সে বাগাতে পারে তা হ'লে কিছু দিনের জন্মে নিশ্চিন্তি। কিছু কাল তার দিব্যি আরামেই কাটবে এখন। আমোদে আর প্রমোদে।

টাকাটা সে কলকাতার কোনো ব্যাঙ্কে জমা দিতেই নিয়ে যাচ্ছে, মনে হয়। মফঃস্বলের কোনো জমিদারের ছেলেই কি? কিংবা বড় কারবারী কারো আপিসের বেয়ারা-টেয়ারাই হবে বুঝি? যেই হোক্ গে, আর যতই তুখোড় হোক্, জনান্তিকের ধনান্তিক কবল থেকে ত্রাণ নেই আজ ছোকরার।

ছেলেটি সভয় নেত্রে তাকাচ্ছিলো—তার দিকে নয়, আর দিকে! তাদের কাছাকাছিই খাড়া ছিলো মুশকো চেহারার একটা লোক—লোকটা যেন ছোকরার ঘাড়ে পড়বার তালে রয়েছে মনে হয়। ওপর চড়াও হয়ে চেপে আসছিলো ছেলেটার দিকে সে।

জনান্তিক দু'জনের মাঝখানে হাইফেনের মত হয়ে দাঁড়ালো। অযাচিত চাপ থেকে বাঁচালো ছেলেটাকে।

ছেলেটা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে। মিষ্টি করে হাসলো।

"ইস্! ভারী ভিড় আজ গাড়ীটায়।"

"হ্যাঁ, আরেকটু হলেই তুমি চাপা পড়ছিলে।" জনান্তিক দুর্জনান্তিকে কটাক্ষ করে। দুশ মন্-লোকটার চেহারাই শুধু শমনসদৃশ না, ওজনেও দু'শো মণের ধাক্কা!

"দামী কিছু আছে বুঝি তোমার ব্যাগে?" জনান্তিক বলে, কথাচ্ছলেই: "যেমন করে আঁকড়ে রয়েচো?"

"আপিসের টাকা। আমাদের কারখানার।" ছেলেটি জানায়: "কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা দিতে যাচ্ছি।"

কারখানার কাণ্ড তো অদ্ভুত! চিন্তা করে জনান্তিক। এইটুকু ছেলের উপর বিশ্বাস করে এতগুলো টাকা ছেড়ে দিয়েছে? আশ্চর্য্য! খুব বাড়িয়ে ধরলেও, বছর কুড়ির বেশি বয়স হবে না ছেলেটির। এমন আনাড়ি? কাছ থেকে টাকাটা কুড়িয়ে বাড়িয়ে নেয়া কতই সোজা!

আর একটু ধার ঘেঁষে এলেই তো হয়! ওকে জানতে না দিয়েই ধারালো ব্লেড চালিয়ে

দেয়া যায় ব্যাগের তলায়। ওর অজান্তেই নোটগুলো বেরিয়ে আসে—জনান্তিকের মুঠোয়। একজনও টের পায় না। ছেলেটা তো নয়ই—তার হাতের ব্যাগ হস্তগতই থাকে—যেমনকার তেমনি। দ্বিধান্বিত ব্যাগ নিয়ে বিনা দ্বিধায় সে চলে যায়, কলকাতায়—তার গন্তব্য স্থানে। টের পায় সেই ব্যাঙ্কে গিয়ে একেবারে—

ব্যাঙ্কের সোনালি রেলিংওয়ালা কাউণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ব্যাগের মুখ ফাঁক করে তলার ফাঁকি তার নজরে পড়ে যখন—।

"তুমি এক কাজ করো ভাই! আমার ধার ঘেঁষে দাঁড়াও।" ছেলেটিকে সে বাৎলায়: "একেবারে আমার গায়ে এসে লেপটে যাও—বুঝেচো? সেইটেই নিরাপদ। আমাদের দু'জনের ডবোল চাপের ভেতর থেকে কেউ আর খপ করে ওটা ছিনিয়ে নিতে পারবে না তা হ'লে।"

বলতেই ছেলেটি তার গায়ে এসে লাগে, ব্যাগ সমেত। একটু বুঝি তার ব্যগ্রতাই দেখা যায় সাঁটবার। খামের মতন এঁটে যায়—লেফাফাদুরস্ত একেবারে। অবশ্যি, সেই ভিড়ের ভেতর কারো গায়ে ঘেঁষা এমন কিছু কঠিন কাণ্ড নয়, এক জায়গায় দাঁড়িয়েই একাধিক লোকের গায় পড়া যায়।

ছেলেটি তার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতেই জনান্তিক সক্রিয় হয়ে ওঠে। তার ব্লেডের কাজ চলে—ব্যাগের তলে তলে—বেমালুম। তার যোগাযোগ-নৈপুণ্যে অল্পক্ষণেই ভেতরের মাল বেরিয়ে প'ড়ে তার পকেটের মধ্যে স্থান লাভ করে—বামালরূপে।

ছেলেটি চাপা গলায় বলতে থাকে—"এই প্রথম চাকরিটা পেয়েছি দাদা! কারখানার বেয়ারার কাজ। বড় সাহেব ভালোবাসেন খুব। বিশ্বাস করেন আমায়। ব্যাঙ্কে-ট্যাঙ্কে যেতে হ'লে—টাকাকড়ি দিতে-আনতে আমাকেই পাঠান। কিন্তু এই ব্যাগ হাতে নিয়ে যেতে আসতে এত ভয় করে আমার—য্যাতো টাকা নিয়ে! কী বলবো মশাই! সব জায়গাতেই যা পকেটমার আজকাল!"

"যা বলেছো ভাই! কখন যে ফাঁক হয়ে যায় টেরও পাওয়া যায় না। যাকে বলে—চিচিংফাঁক!"

হেসে হেসেই বলে সে। বেশ অম্লানবদনে। গায়-পড়া কচি ছেলেটার দিকে তাকিয়ে একটুও কি তার মায়া হয় না? কিসের মায়া? মায়াদয়া সব কচু। বিবেকের কোনো দংশন—কিছু কচকচি তার মনে নেই, কোনো কচি-কাঁচার প্রতি দরদ নেই হৃদয়ে। ব্যাঙ্কে গিয়ে ছেলেটা যখন দেখবে তার তবিল উধাও, স্বচক্ষে দৃশ্যটা দেখতে সে চেষ্টা করে। কেঁদে ককিয়ে উঠবে—চাকরি তো যাবেই তার, নির্ঘাত, থানাপুলিসে না টানাটানি করে। কিন্তু তার মনে একটুও দুঃখ জাগে না। ব্যথা লাগে না প্রাণে। কত গরীব কেরাণীর সারা মাসের মাইনে সে মিনিটের মধ্যে সরিয়েছে, কত আপিসের বেয়ারার ভবিষৎ পিষে ফেলেছে তার হাতের মুঠোয়। এক মুহূর্ত্তেই। এই প্রথম নয়।

বালি আসতেই গাড়ি খালি হোলো খানিক। জনান্তিক বল্লে—"এইবার আমায় নামতে হবে ভাই! নামবো আমি এখানেই। কলকাতা আর কতক্ষণ? এইটুকু পথ তুমি একলাই যেতে পারবে—নিরাপদেই? কেমন?"

"হ্যাঁ।" হাসি মুখে ঘাড় নাড়লো ছোকরা।

"তা হ'লেও খুব হুঁসিয়ার থেকো, বুঝলে?" হুঁস্ দিতে সে কসুর করে না তা হ'লেও।

ছেলেটা ব্যগ্র নমস্কার জানায়—হাত তুলে—সহাস্যে। বেহুঁস্ আর বলে কাকে!

ষ্টেশনের এলাকা পেরিয়ে জনান্তিক পকেটে হাত পোরে। নোটগুলোর গায় হাত ঠেকায়। এক গোছা নোট। খস্‌খসে, মসৃণ! ফিতে বাঁধা, কেতাদুরস্ত। দশ হাজারের কম হবে না, তার আন্দাজ ভুল নয়। হাত দিয়েই আঁচ পায়। ব্যস্, এখন কিছু দিনের জন্যে নিশ্চিন্ত। চৌরঙ্গীর সাহেবী হোটেলে গিয়ে ওঠো, ফূর্তি করে কাটাও। রঙীন হয়ে থাকো দিন-রাত।

কোনো তাড়া নেই, পরের ট্রেনে সুবিধে মত গেলেই চলবে। চৌরঙ্গীন স্বপ্নে মশগুল হয়ে সে হাওয়া লাগাচ্ছে গায়ে, এমন সময়ে পেছন থেকে কার যেন শক্ত হাত তার কাঁধে এসে লাগলো। সবল মুষ্টিতে কে যেন এসে পাকড়ালো তাকে।

পেছন ফিরে তাকাতেই—সেই লোকটাই না? দুশমন্ চেহারার নেই মুশকো লোকটা ট্রেনের!

অ্যাঁ? এ কেন? এখানে কেন? তার পেছনে কেন? জনান্তিক অবাক্ই হয় একটু। এর তো সেই ছোঁড়াটার পিছু পিছু লেগে থাকার কথা। কলকাতা যাবার কথা তার সাথে সাথে। তবে এ ব্যক্তি—এই অতিব্যক্তি—এখানে কেন?

মুশকোর পেছনে আরো দু'জনা ছিল। মুশকো বল্ল—"আমরা পুলিশের লোক। সি. আই. ডি-র। দাঁড়াও, সার্চ করব তোমায়।"

"সার্চ? কিসের সার্চ?" জনান্তিক আরো অবাক্ হবার চেষ্টা করে।

"জাল নোট আছে তোমার কাছে। তোমার জিম্মায়। টের পেয়েছি আমরা।" বলতে বলতে সি. আই. ডি.টা সটান তার পকেটের মধ্যে হাত পূরে দেয়। নোটগুলোকে বের করে আনে এক টানে।

"জাল নোট?" এবার জনান্তিকের বিস্ময়টা সত্যিই সত্যিকার—"জাল নোট এগুলো? অ্যাঁ?"

"ন্যাকা? জানো না?" ধম্‌কে উঠলো মুশকো লোকটা—"ছেলেটা গা ঘেঁষে দাঁড়ালো তোমার—তা কি দেখি নি? তুমি ব্যাগের তলায় ব্লেড চালিয়ে নোটগুলো বার করে নিলে তাও কি নজরে পড়ে নি আমার? দু'জনেই এক দলের লোক। এ রকম যোগসাজসের কাজ ঢের ঢের আমরা দেখেছি।"

"যোগসাজসের কাজ!" জনান্তিক যেন জনান্তিকেই জানায়।

"তুমি যখন ব্যাগ কাটছিলে তখন কি আমি দেখি নি? ছোঁড়াটা আড় চোখে সব দেখছিল আর হাসছিল। মুখ টিপে টিপে—তা কি আমার চোখে পড়ে নি ভেবেছো? তাইতেই তো ধরা পড়ে গেলে। ছেলেটা তার ব্যাগের নোটগুলো তোমাকে পাচার করে দিয়ে খালি ব্যাগ নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। আবার ন্যাকা সাজা হচ্ছে!"

ও, তাইতেই! তাইতেই না বলতেই ছেলেটা এগিয়ে এসে গায়ে পড়েছে, দাঁড়িয়েছে গা ঘেঁষে। ব্যাগ সমেত আগিয়েছে। তারপর ওকে ঝগিয়ে—বোকা পেয়েই—নোটগুলোর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। যত ভাগাড়ের মাল ভাগিয়েছে গায়ে গা লাগিয়ে। তারপরে কাজ সেরে—জঞ্জাল সাফ করে হাসিমুখে বিদায় নিয়েছে—বিনা ব্যাগাড়ম্বরে। ইস্, কী ভয়ানক ছেলেরে বাবা! কী ভয়ানক!

"কোথথেকে যে এই সব আপদ জোটে!" ভারী বিরক্তি বোধ করে জনান্তিক: "এ কি রকম বদ্ ছেলে বাপু! এই কি আপিসের বেয়ারা? এ রকম বেয়াড়াপনা আমি জন্মে দেখি নি। ছিঃ!" এই বলে সে ধিক্কার দেয়—সেই বেয়ারাকে, কি নিজেকেই—কে জানে!

সি. আই. ডি-র লোকটি নোটগুলি গুণে দেখে—একে একে—দশখানা করে একশো টাকার নোট প্রত্যেক কেতায়—দশ কেতায় মোট দশ হাজার। জনান্তিকের আন্দাজ একটুও ভুল নয়! পাকা লোকের হিসেব।

"দূর! দুর! কে যে এই সব ভ্যাজাল জোটায়!" ডুকরে ওঠে জনান্তিক।

"ধুত্তোর!" বলে সে হাত ওঠায়—

হাতকড়া পরার জন্যই।

শ্রীঅমলেন্দু সেন

এর আগে যা বেরিয়েছে: আমাদের গাঁয়ের অদূরে রায়পাহাড়ীর বিরাট পরিত্যক্ত রাজ-প্রাসাদ। লোকে বলে, রাজা অবনীনাথ ছোট ভাই ধরণীনাথকে খুন করে পালিয়ে যান, ধরণীর প্রেতাত্মা প্রতিশোধ নেবার জন্য আজও ওখানে ঘুরে বেড়ায়। আমার বন্ধু, হরিশ কর্ম্মকারের বাপমা-মরা ভাইপো লালুর পাল্লায় পড়ে একদিন রাতে সেখানে গিয়ে সত্যি ছায়ামূর্ত্তি চোখে পড়ল এবং সে মূর্ত্তি আশ্চর্য্য ভাবেই চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল। ইতিমধ্যে বাবা রেঙ্গুনে চাকরী পাওয়ায় আমি কলকাতায় আমার এক দুর সম্পর্কের মামা অবিনাশ বাবুর কাছে থেকে পড়াশোনা করব ঠিক হ'ল। মামা এলে তাঁর কাছে ধরণীনাথের হত্যার কাহিনী শুনলাম। তিনি ও অবনীনাথের উকিল-বন্ধু গগন মিত্তির সেদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। মামার পুরোনো চাকর রঘু বাবা-মার সঙ্গে রেঙ্গুন গেল। পূজোর ছুটীতে লালুকে নিয়ে আমিও রেঙ্গুন রওনা হলাম। জাহাজ-ঘাট থেকে গগন মিত্তিরের পরিচিত অনাদি বাবুও আমাদের সঙ্গী হলেন। ইতিমধ্যে গগন মিত্তিরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এবং তাঁর কাছে লালুর বাবা অনাথবন্ধু দাসের সম্বন্ধেও অনেক কথা শুনেছিলাম। জাহাজে লালুর হাতের মাদুলীটি খোয়া গেল। রেঙ্গুনে বাবা অসুখে পড়লে ডাঃ নিশীথ দত্ত এসে চিকিৎসা করলেন। বাবা একটু ভাল হ'লে রঘু হঠাৎ কলকাতায় চলে এল, কিন্তু পরে জানা গেল, সে মামার কাছে আসে নি। আমরা ফিরলে মামা লালুর নামে ডাকে-আসা একটা পার্শেল দিলেন। মোড়ক খুলতেই ঠক্ ক'রে কি একটা জিনিষ মাটীতে পড়ল। তার পর পড়।

১০

আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম, লালুর সেই হারানো মাদুলী! সেই কালো সুতোয় বাঁধা, রূপোর মাদুলীটা! একটু যেন টোল খেয়েছে দু'-তিন জায়গায়। কোথা থেকে আর কে পাঠিয়েছে, তা কিন্তু কিছু বোঝা গেল না। লালু তো মাদুলীটা পাওয়া গিয়েছে, এতেই খুসী।

সে বললে, কেউ বোধ হয় কুড়িয়ে পেয়েছিল, ফেরৎ পাঠিয়েছে।

আমি বললাম, তা হ'তে পারে না। রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া জিনিষের মালিকের ঠিকানা কিংবা নাম সে পাবে কি করে? এটা চুরি গিয়েছিল, আর চোর আমাদের চেনা লোক, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

লালু বললে, এটা কি চুরি করবার মত একটা জিনিষ? তা ছাড়া, চোরে কষ্ট ক'রে চুরি করে কি জিনিষটা ফেরৎ দেবে বলে?

'মামা বললেন, রোস, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। মাদুলীটা দামী না হ'তে পারে, কিন্তু ওর ভিতরে বোধ হয় দামী কোনও জিনিষ ছিল। মাদুলীটা খুলে দেখলে ব্যাপারটা বোঝা যেতে পারে।

তাই করা হ'ল। মাদুলীর একটা মুখ খুলতেই বের হ'ল সরু করে পাকানো ছোট একটু কাগজ। মামা সেটার পাক খুলে ধরতেই আমরা দু'জনে ঝুঁকে পড়লাম। দেখলাম, বিবর্ণ কালিতে খুব ছোট ছোট অক্ষরে অস্পষ্ট ভাবে লেখা আছে—

লালু,

তোমাকে এই শেষ আশীর্ব্বাদ তোমার বাবার। এ জীবনে তোমাকে আর কখনও দেখব কিনা কে জানে!

তোমার জন্য কিছু টাকাকড়ি রেখে গেলাম। কলকাতার বেলেঘাটা পাড়ায়

'লাল-বাংলা' ব'লে একটা বাড়ীতে আমি কিছুদিন ছিলাম। তার উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরের ছাদে কাঠের কড়ি-বরগাগুলির ঠিক মাঝখানের কড়িকাঠের একেবারে পুব মাথায় একটা গর্ত্ত করে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি আমার যা কিছু ছিল। তুমি বড় হয়ে তা উদ্ধার ক'রো।

আমার প্রাণভরা স্নেহ জেনো। ইতি—

আশীর্ব্বাদক তোমার বাবা

এর তলায় বড় বড় অক্ষরে স্পষ্ট কালিতে লেখা আছে—

সব বাজে কথা।

তা দেখে মামা বললেন, আরে, লালুর বাবা দেখছি একেবারে গরীব লোক ছিল না। কিন্তু, লালুর কপালে টাকাটা পাওয়া লেখা নেই। মাদুলী-চোরের আগেই কেউ সেটা সরিয়ে ফেলেছে বোঝা যাচ্ছে। গুপ্তধনের সন্ধান এত কষ্ট করে জেনেও তার নিজের কোনও লাভ হ'ল না।

লালু ভাল-মন্দ কিছুই বলল না।

আমি বললাম, কিন্তু মাদুলীটা ফেরৎ দেবার কি কারণ হ'তে পারে?

মামা বললেন, নিজে ঠকেছে, তাই হয়তো তার ইচ্ছে হয়েছে যে কথাটা জেনে লালুও কষ্ট পাক।

তখন লালু চুপ করে রইল। কিন্তু রাত্রিতে শুতে যাবার সময় সে আমাকে চুপি চুপি বললে, রতন, মামা যাই বলুন না কেন, আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে একবার দেখে আসি ব্যাপারটা।

আমি বললাম, তাতে আর লাভটা কি হবে? হয় টাকাটা সেখানে কোনও দিনই ছিল না, নয় কেউ না কেউ নিয়ে গেছে।

লালু বললে, লাভ আছে বই কি! আর কিছু না হোক, যে বাড়ীতে আমার ছেলেবেলা কেটেছে, যেখানে আমার বাবা-মার শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে, সে বাড়ীটা তো দেখা হবে। তুই না আসিস তো আমি একাই যাব।

কাজেই আমিও যেতে রাজী হলাম।

১১

দু'জনে নানা ফন্দী এঁটে পরদিন আমরা বেলেঘাটা গেলাম।

'লাল-বাংলা' বাড়ীখানা খুঁজে পেয়ে গেলাম সহজেই। একতলা বাড়ী, রাস্তার ঠিক গায়েই। ফটকে নাম লেখা রয়েছে। বাড়ীর দেওয়ালে একখানা কাঠের তক্তায় লেখা—

ভাড়া দেওয়া যাইবে

শ্রীমহাদেব বিশ্বাস, বেলপুকুর, বেলেঘাটা।

ঠিক পাশেই আর একখানা বাড়ীর গায়েও ঐ একই কথা লেখা আর একখানা তক্তা ঝুলছে। সেটার নাম 'কৈলাস-ধাম'। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা ভিতরে ঢুকে সে বাড়ীখানা।

সেখান থেকে গেলাম বেলপুকুর, বিশ্বাস মশায়ের খোঁজে। বিশ্বাস মশাই তখন রোদে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। আমাদের দেখেই হুঁকোয় পুরোদমে একটা সুখটান লাগিয়ে প্রশ্ন করলেন, কোথা থেকে আশা হচ্ছে বাবুদের?

লালু বললে, আমরা আসছি হাটখোলা থেকে। আপনার একখানা বাড়ী ভাড়া নিতে চাই আমরা।

বিশ্বাস মশাই বললেন, আবার হাটখোলা? না বাবা, হাটখোলার লোককে আর বাড়ী ভাড়া দেব না।

আমি বললাম, কেন, বিশ্বেস মশাই? হাটখোলার কোনও লোক আপনার কোনও ক্ষতি করেছে নাকি?

—করে নি? এই তো মাসখানেক আগে একটা লোক এসে লাল-বাংলাখানা ভাড়া নিল, তারপর বলা নেই কওয়া নেই, কবে যে পালিয়ে গেল জানি না।

—ভাড়া-টাড়া না দিয়েই?

—না, ভাড়াটা তো আগেই নিয়ে নিছলাম, কিন্তু লোকটা চলে যাবার পরই দেখি যে সব ঘরেরই কড়িকাঠগুলোকে নানা ভাবে জখম করে দিয়ে গেছে হতভাগা।

এই কথাটাই শুনতে চাইছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটা কে, বলুন তো? হাটখোলার লোক হ'লে চিনতেও পারি।

—নামটা কেমন জানি ভুলে যাচ্ছি। চেহারাটা ঢ্যাঙা, চিমসে, কটা মতন চোখ, আর থেকে থেকে মুখ ভেঙচে ওঠে।

শুনে চমকে উঠলাম। এ তো গগন বাবুর কথা শুনছি। গগন বাবুই তা হ'লে মাদুলীটা চুরি করবার জন্য অনাদি বাবুকে আমাদের সঙ্গে জাহাজে পাঠিয়ে

ছিলেন। অনাদি বাবু যে লাইট হাউস দেখবার জন্য লালুকে ওঠাবার ছল করে মাদুলীটা খুলে নিয়েছিলেন, তাও এখন বুঝলাম।

বিশ্বাস মশাই ওদিকে আপন মনেই বলে যেতে লাগলেন: কত রকম ভাড়াটেই না দেখলাম। বাড়ীখানা তো আজকের নয়!

লালু জিজ্ঞাসা করল, অনাথবন্ধু দাস বলে কোনও ভাড়াটের কথা আপনার মনে পড়ে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ছিল বটে একজন। সে অনেক দিনের কথা। কেন, তার কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

—আমি তাঁর ছেলে।

—ও, তাই নাকি? বেশ বেশ! কত বড়টী হয়েছ এখন! তোমায় একেবারে ছোট্টটী দেখেছিলাম। তোমার বাবা তো গোটা বাড়ীটাই ভাড়া নিয়েছিল। তখনও দু'টো বাড়ীকে আলাদা করি নি কিনা!

—কোন্ দু'টো বাড়ীর কথা বলছেন?

—কেন? লাল-বাংলা আর কৈলাস-ধাম। এখন যেটা 'লাল-বাংলা' দেখছ সেটা আগে ছিল চাকর আর মালী-টালী থাকবার ঘর। সেটুকুকে আলাদা করে নিতেই দু'টো আলাদা বাড়ী হয়ে গেল।

আমার মনে হঠাৎ একটা কথা যেন বিদ্যুতের মত খেলে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, তা হ'লে কি 'কৈলাস-ধাম' বাড়ীখানাই 'লাল-বাংলা'র আসল বাড়ীটা?

—ঠিক তাই। এদিক্‌কার নামটা যেখানে ছিল, সেখানেই রইল। ওপাশে একটা গেট করে দিয়ে নতুন নাম-লেখা একখানা পাথর লাগিয়ে দিলাম—'কৈলাস-ধাম'। ঠিক নামটী দিয়েছি, কি বল? মহাদেবের বাড়ী, 'কৈলাস-ধাম'। হাঃ, হাঃ!

মনের উত্তেজনা অতি কষ্টে চেপে বললাম, আমরা ঐ কৈলাস-ধামখানাই ভাড়া নেব। ওর জন্যে কত ভাড়া দিতে হবে?

বিশ্বাস মশাই বললেন, উঁহু, ও বাড়ী তো ভাড়া হয়ে গিয়েছে! পরশু হ'ল গিয়ে পয়লা তারিখ। সেই দিন থেকেই নতুন ভাড়াটে আসবে। (ক্রমশঃ)

ভুল ছাপা হয়েছে:

পৃঃ ১২—পোর্ট ব্লেয়ার আন্দামানের 'দক্ষিণ-পূর্ব্ব' দিকে, 'দক্ষিণ-পশ্চিমে' নয়।

পৃঃ ১৫—শেষ লাইনের উপরের লাইনে 'অর্জ্জুন' গাছের বদলে 'গর্জ্জন' গাছ হবে।

এশিয়ান্ গেম্‌স্

সম্প্রতি দিল্লীর নবনির্ম্মিত জাতীয় ষ্টেডিয়ামে সমারোহের সঙ্গে এশিয়ান্ গেম্‌স্ বা সর্ব্ব এশিয়া ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হয়ে গেল, সে খবর তোমরা রামধনুতেই পড়েছ। অবশ্য উদ্যোগীরা কতকগুলি ব্যাপারে অলিম্পিক্ প্রতিযোগিতার বড় বেশী অনুকরণ করায় কেউ কেউ একটু বিরূপ সমালোচনাও করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এশিয়ায় এ রকম ব্যাপার যে আর কখনও হয় নি সে কথা অস্বীকার করবার যো নেই। তা ছাড়া নবজাগ্রত এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের পক্ষেও এ ধরণের খেলাধূলার আয়োজনের সার্থকতা আছে।

এশিয়ান গেম্‌স্‌এর পরিকল্পনা কিন্তু ধরতে গেলে হয়েছিল অলিম্পিকেরই মাঠে। ১৯৪৮ সনে লণ্ডনে বিশ্ব অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সময় ভারতের পক্ষ থেকে প্রফেসার সোন্ধি এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে তখন এই বিষয়ে একটি আলোচনা-বৈঠক বসান এবং প্রস্তাবটি সকলেরই বেশ মনঃপূত হয়। তারপর অবশ্য নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য ব্যাপারটা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু প্রফেসার সোন্ধি ছাড়বার পাত্র ন'ন, এশিয়ান্ কন্‌ফারেন্সে যোগ দেবার জন্য যখন এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা দিল্লীতে এলেন তখন তিনি কথাটা আবার পাড়লেন এবং তখনই ব্যাপারটা প্রায় পাকাপাকি হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড ঘটল। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দল এলেন ভারতে ক্রিকেট খেলতে। তাঁদের অধিনায়ক গডার্ড সাহেবের সঙ্গে ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী শ্রীযুক্তা অমৃত কাউরের কথাবার্ত্তা হচ্ছিল; কথা প্রসঙ্গে গডার্ড এ দেশে ভাল ষ্টেডিয়ামের অভাবের কথা উল্লেখ করলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মনে কথাটা বড় লাগল। রাজকুমারী প্রথম জীবনে যখন বিলেতে পড়াশোনা করতেন তখন ভাল মহিলা-খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর নাম ছিল। এখন বয়স হ'লেও খেলাধূলার প্রতি তাঁর রয়েছে তেমনি ঝোঁক। যে ভাবেই হোক, দিল্লীতে একটা ষ্টেডিয়াম্ বসাতেই হবে,—এই হ'ল তাঁর সংকল্প। ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ডের শ্রীযুক্ত ডিমেলোও এ বিষয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন।

যোগাযোগও ঘটে গেল। জওহরলালজী প্রতিশ্রুতি দিলেন সরকারী সাহায্যের অভাব হবে না। প্রধান সেনাপতি শ্রীযুক্ত কারিয়াপ্পা দিল্লীর পুরানো কেল্লার পাশে সুবিরাট মিলিটারী ব্যারাক আর প্যারেডের মাঠ ষ্টেডিয়ামের জন্য ছেড়ে দিলেন। দেখতে দেখতে বিরাট ষ্টেডিয়াম্ তৈরী হয়ে গেল—সারা এশিয়ার মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ ষ্টেডিয়াম্।

তার পরে ডাক পড়ল এশিয়ান্ গেম্‌স্ প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার। ইরাণ থেকে সুরু ক'রে আফগানিস্থান, সিংহল, ব্রহ্ম, নেপাল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড—এগারোটি দেশ থেকে মোট ৪৭০ জন প্রতিনিধি এসে হাজির হ'লেন দিল্লীতে। যোগ দিল না পাকিস্তান। চীনও সময় মত নাম না পাঠনোয় বাদ পড়ে গেল। তবে চীন থেকে একদল প্রতিনিধিকে ব্যাপারটা ভাল ক'রে বুঝে যাবার জন্য পর্য্যবেক্ষক হিসেবে যোগদান করতে পাঠানো হ'ল।

৪ঠা মার্চ খেলা সুরু হ'ল। ক্রীড়ামোদীদের সেদিন সে কী উত্তেজনা! অলিম্পিকের অনুকরণে সূর্য্যালোক থেকে মশাল ধরিয়ে নিয়ে প্রতিযোগিতার সাত দিন তা জ্বালিয়ে রাখা হ'ল। বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীরা নিজের নিজের রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা নিয়ে মার্চ ক'রে এলেন। ষ্টেডিয়ামে আর লোক ধরে না।

সাত দিন ধরে চলল খেলা। খেলার ফলাফল তোমরা আগেই শুনেছ। সব চেয়ে কৃতিত্ব দেখালেন জাপানী খেলোয়াড়েরা। মোট ১৬৮ পয়েণ্ট পেয়ে তাঁরা ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করলেন। ২য় হ'ল ভারত, (১১৬ পয়েণ্ট), ৩য় ইরাণ। জাপানের ভাগ্যে জুটল ২০টি স্বর্ণপদক, ভারতের ১২টি। কোন বিষয়ে প্রথম হ'লে তবেই এই স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। দলগত ভাবে কিন্তু ভারতই প্রথম হ'ল।

৮টি রাষ্ট্রের প্রতিযোগীরা কোন-না-কোন খেলায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিছু করতে পারেন নি শুধু থাইল্যাণ্ড, নেপাল আর আফগানিস্থানের প্রতিযোগীরা। এর পরের বারে এঁরা নিশ্চয়ই আমাদের নিরাশ করবেন না।

ফুটবল বাংলা দেশের জনপ্রিয় খেলা। বেশীর ভাগ বাংলার প্রতিনিধি নিয়ে গড়া ভারতীয় ফুটবল দল ফাইনালে ইরাণকে হারিয়ে হয়েছে প্রথম। বাস্কেট বলে প্রথম হয়েছে ফিলিপাইন দল।

'ওয়েট লিফটিং' অর্থাৎ ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় কিন্তু ইরাণের সঙ্গে কেউ পাল্লা দিয়ে পারে নি। সাঁতারে বাংলার শচীন নাগ ভারতের হয়ে সর্ব্বপ্রথম স্বর্ণ পদক লাভ ক'রে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু সিঙ্গাপুরের নিওচিউকঙ্কের কৃতিত্ব দেখে সবাই অবাক্ হয়ে গেছে। ৪০০, ৮০০ এবং ১৫০০ মিটার সাঁতারের তিনটেতেই তিনি প্রথম হয়েছেন। এঁর বয়স মাত্র ১৭, এখনও ইনি স্কুলে পড়েন।

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন বাংলার শ্রীপরিমল রায়। এশিয়ার শ্রেষ্ঠ দেহী হিসাবে তাঁকে নাম দেওয়া হয়েছে 'মিঃ এশিয়া'। এ ছাড়া বোম্বাইএর পিণ্টো ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছেন, আর ম্যারাথন দৌড়ে (২৬ মাইল) প্রথম হয়েছেন ছোটা সিং।

জাপানী খেলোয়াড়দের মধ্যে লং জাম্পে তাজিমা মামাজি ২৩ ফুট ৫½ ইঞ্চি এবং পোল ভল্টে শোয়াদা বুভকিচি ১৩ ফুট ৬ ইঞ্চি লাফিয়ে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছেন। জাপানী মেয়েরা প্রায় সব বিষয়েই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যেমন ধর, লং জাম্পে শুগিমুরা কিওকো (১৭

ফুট ৫ ইঞ্চি), বর্শা ছোঁড়ায় ওশিনো টয়োকি (১১৮ ফুট ৯¾ ইঞ্চি), দৌড়ে ওকামিটে কিহিকো এবং আরো অনেকে।

আসছে বছর হেলসিঙ্কিতে অলিম্পিক্ খেলা হবে। তাতে জাপানের এই সব খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে অনেকেই খুব উচ্চাশা পোষণ করছেন। এর আগের অলিম্পিকে জাপান ও জার্ম্মানীকে যোগ দিতে দেওয়া হয় নি। পরবর্ত্তী এশিয়ান্ গেম্‌স্ ম্যানিলা সহরে হবে বলে ঠিক হয়েছে, চার বছর পরে।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

আমাদের নববর্ষের প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ ক'র। তোমাদের শুভেচ্ছার পাথেয় নিয়ে 'রামধনু' এ মাসে ২৪ বছরে পা দিল। এবারেও রামধনুর জন্মদিনে তোমাদের শুভেচ্ছাসূচক অজস্র চিঠি আমরা পেয়েছি। এই সুযোগে তার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

কিন্তু বাধারও যেন শেষ নেই! খাদ্য এবং বস্ত্রের মত কাগজও আবার দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে। দামও চলেছে অগ্নিমূল্যের দিকে। পাকিস্তানে ভি. পি. পাঠানো বা পাকিস্তান থেকে মনি অর্ডার পাঠানো সম্পর্কে চুক্তির পর উভয় সরকার যে আশ্বাস দিয়েছিলেন এখন পর্য্যন্ত তা কার্য্যকরী ক'রে কোনও সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় নি। কাজেই পাকিস্তানের গ্রাহক-গ্রাহিকাদের আরও কিছুদিন অনিশ্চিতের মধ্যে কাটানো ছাড়া উপায় নেই।

এবারে তোমাদের ব্যক্তিগত কয়েকটি চিঠির জবাব দেই। শ্রীবেণু ঘোষ (দিনাজপুর) তোমাদের ওখানকার দোল পূর্ণিমার উৎসবের বর্ণনা পড়ে বেশ মজা লাগল। তুমি লিখেছ ওখানকার অনেক মুসলমানও সমান উৎসাহে দোল খেলেছিল। হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের উৎসব-অনুষ্ঠানে পরস্পরের যোগদান শুভ ভবিষ্যতের পরিচায়ক সন্দেহ নেই। রামধনুর ভাইবোনদের উদ্দেশে প্রেরিত তোমার আবীর পেয়ে খুব ভাল লাগল। শ্রীকাশীনাথ সরকার (ফরবেশগঞ্জ, পূর্ণিয়া) —তোমার প্রশ্ন কোনও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বিক্রয়-প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠালেই ভাল হ'ত।

তবু তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি—একটি টেবিল ফ্যানের দাম কম পক্ষে ৭৫৲। ভাল জিনিষ নিলে আরও বেশী। শ্রীরমাপদ রায় (শিশুমঙ্গল)—তুমি ডাকটিকেট সংগ্রহকারী বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছুক? কেউ রাজী হ'লে তোমাকে জানাব। কুমারী দীপালি সেনগুপ্তা (গৌহাটী)—পুরস্কারের বই আশা করি ইতিমধ্যে পেয়েছ। তুমি ওখানকার কলেজের সুকুমার কলা প্রতিযোগিতায়ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়ে কাপ পেয়েছ? সুখবর সন্দেহ নেই। শ্রীমহেন্দ্র নাথ বিশ্বাস (বোম্বাই)—প্রবাসে বসে অল্প কয়েকটি বাঙ্গালী ছেলেমেয়ে মিলে তোমাদের এই সাহিত্য সাধনা সর্ব্বাংশে সফল হোক এই কামনা করি। শ্রীরমা বসু ও শ্রীদীপ্তি রায় (নিউ দিল্লী) —তোমাদের সমিতির মুখপত্র হাতে-লেখা "কিশোরী" দেখে সুখী হলাম। রূপসজ্জা তো ভালই, কয়েকটি লেখাও বেশ উচ্চাঙ্গের। কিন্তু তোমাদের সমিতির মুখপত্র সদস্যাদের লেখা দিয়েই পূর্ণ করা উচিত, আমাদের টানাটানি-করলে পত্রিকার বিশেষত্ব রইল কি?

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক বিভাগটির জন্য প্রেরিত তোমাদের লেখাগুলি সম্বন্ধে নিয়মিত ভাবে মতামত সম্ভবতঃ আগামী বার থেকে সুরু করা যাবে। বিতর্ক-সভায় (চৈত্র, ১৩৫৭ দেখ) তোমাদের আরও সক্রিয় ভাবে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। জয় হিন্দ। ইতি—রাঃ সঃ

প্রাপ্তি স্বীকার

বাঙ্গালীর পাঁজি—শ্রীযুক্ত শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়. এম. এ সম্পাদিত। ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা।

গত বছরের মত এবারেও ক্যাল্‌কাটা কেমিক্যাল কোং এই সুদৃশ্য বাংলা ডায়েরীটি প্রকাশ ক'রে বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এতে দৈনিক ডায়েরী ছাড়া অল্প কথায় আরও প্রচুর প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবিষ্ট হওয়ায় জিনিষটি খুবই মূল্যবান্ হয়েছে। বিশেষ ক'রে প্রত্যেক পাতার নীচে সুনির্ব্বাচিত কোটেশন, বাংলার উল্লেখযোগ্য নানা স্থানের ও নানা লোকের পরিচয়, বাংলার শিল্প, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পাদনার কৃতিত্বের পরিচায়ক।

এ ছাড়া উক্ত কোম্পানী একটি সুদৃশ্য বাংলা ক্যালেণ্ডার প্রকাশ ক'রেও সকলকার ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

কিরীট এডভার্টাইজিং এজেন্সী—কিরীট এডভার্টাইজিং এজেন্সী গত জানুয়ারী মাসে একটি সুদৃশ্য ইংরেজী ক্যালেণ্ডার প্রকাশ করেছিলেন। আমরা দেখে সুখী হলাম, এরা শুধু ইংরেজীই নয়, বাংলা নববর্ষেও একটি চমৎকার বাংলা দেয়ালপঞ্জী প্রকাশ করেছেন। দেয়ালপঞ্জীটি দেখতেই শুধু মনোজ্ঞ নয়, এর ভিতরের লেখাগুলিও বেশ তথ্যবহুল।

ভারতের লোকসংখ্যা

সম্প্রতি সমস্ত ভারত যুড়ে যে লোক গণনা হয়ে গেল তার প্রাথমিক হিসাব ভারতীয় পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়েছে। তাতে দেখা যায় ভারতের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা হচ্ছে ৩৬ কোটি ১৮ লক্ষ ২০ হাজার। অবশ্য এর মধ্যে কাশ্মীর ও জম্মুর লোকসংখ্যা আনুমানিক ৪০ লক্ষ ৩৭ হাজার এবং উপজাতি অঞ্চলের লোকসংখ্যা আনুমানিক ৫৬ লক্ষ। এদের বাদ দিয়ে বাকি ৩৫৬৮৯১৬২৪ জনের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই কিছু বেশী—১৮৩৩৮৪৮০৭; মেয়েদের সংখ্যা হচ্ছে ১৭৩৫০৬৮১৭।

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী

প্রসিদ্ধ বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো সম্প্রতি ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। এক সময়ে বিপ্লবী হিসাবে রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং দেশের জন্য দীর্ঘ দিন তাঁকে আন্দামানে বন্দী-জীবন কাটাতে হয়েছিল। শেষ বয়সে তিনি গ্রামেই বাস করতেন এবং অবসর সময় শিল্পচর্চ্চায় কাটাতেন।

ম্যাক্‌আর্থারের পদচ্যুতি

সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান কোরিয়ার রণাঙ্গনে আমেরিকান্ বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাক্‌আর্থারকে তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁর জায়গায় অপর লোক নিযুক্ত করেছেন। আমেরিকার পররাষ্ট্র-নীতির সঙ্গে ম্যাক্‌আর্থার নাকি নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না এবং দিন কয়েক আগে মূল চীনে গিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করা সম্পর্কে তিনি একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন; তাইতেই এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। এই ব্যাপারে কেউ কেউ কোরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে একটা শান্তি স্থাপিত হবার আশাও করছেন।

হোলকারের জয়

এ বছরের রণজী ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ফাইনালে হোলকার দল গুজরাট দলকে ১৮৯ রানে হারিয়ে তৃতীয় বারের জন্য চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছে। হোলকার দল ১ম ইনিংস্‌এ করে ৪২৯, ২য় ইনিংস্‌এ ৪৪৩। গুজরাট দল ১ম ইনিংস্‌এ করে ৩২৭, ২য় ইনিংস্‌এ ৩৫৬। এই খেলার শেষ মুহূর্ত্তে গুজরাট দলের প্যাটেলের দৃঢ় ব্যাটিং

খুবই উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। তিনি নাখুদার সঙ্গে দশম উইকেটের জুটিতে ১৩৮ রান্ তোলেন। ২য় ইনিংস্‌এ তাঁর মোট রান্ হয় ১৫২।

হকি

কলকাতার হকি মরশুম শেষ হয়ে এল। প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতা কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হবে। অবশ্য কোন্ দল চ্যাম্পিয়ন্ হবে এখনও বলা কঠিন—তবে মোহনবাগান এবং ভবানীপুর এই দুই দলের এক দল যে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গত বারের বিজয়ী কাষ্টম্‌স্ দল বরাবর ভাল খেলে শেষ দিকে কয়েকটি খেলার ত্রুটীতে তাদের সকল আশা নষ্ট করেছে।

বাইটন্ হকি প্রতিযোগিতাও সুরু হচ্ছে; ওদিকে বোম্বাইএ আগা খাঁ প্রতিযোগিতাও চলছে।

আবার হাতীর ছানা

ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলালজী কয়েক বার একাধিক হাতীর ছানা উপহার পাঠিয়ে দেশবিদেশের ছেলেমেয়েদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। সম্প্রতি খবরের কাগজে প্রকাশ, তিনি জার্ম্মানীর ছেলেমেয়েদের জন্যও একটি হাতীর ছানা উপহার পাঠাচ্ছেন।

হয়েছে সময়

শ্রীজয়ন্তকুমার দাশ

পূর্ণিমা-ঘন ব্যাকুল বোশেখী মৌন বিবশ রাতে,
স্বপ্ন নেমেছে কুঞ্জকুটীরে উছল দখিন বাতে।
আজকে তোমার বাঁশী বাজাবার হয়েছে সময় বুঝি,
অজানা সুরের লীলা চপলতা পথ কি পেয়েছে খুঁজি।

এখন দূরেতে তরুবীথি-তলে গভীর হতাশ্বাসে,—
জমা-হয়ে-আসা গাঢ় আঁধারেতে রাত্রি ঘনায়ে আসে।
দূর দিগন্তে পূর্ণ চাঁদের স্তব্ধ মদির মায়া
নদী প্রান্তরে অকৃপণ হাতে ফেলে জ্যোৎস্নার ছায়া।

এখন বুঝি বা কুসুম-শাখায় কুঁড়িরা মেলেছে দল,
মধুর সুবাসে মদির বাতাস হয়ে ওঠে চঞ্চল!
স্বপ্ন নেমেছে তাই কি তোমার ব্যাকুল আঁখির পাতে,
বাঁশী বাজাবার হয়েছে সময় আজকে নিবিড় রাতে?

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(ক)	(১)	ম	গ	ধ	(খ)	(১)	ল	ল	না	(গ)	(১)	ন	খ	র	(ঘ)	(১)	গি	রি	ডি
	(২)	গ	র	ব		(২)	ল	ণ্ড	ন		(২)	খ	দ্যো	ত		(২)	রি	জি	য়া
	(৩)	ধ	ব	ল		(৩)	না	ন	ক		(৩)	র	ত	ন		(৩)	ডি	য়া	র

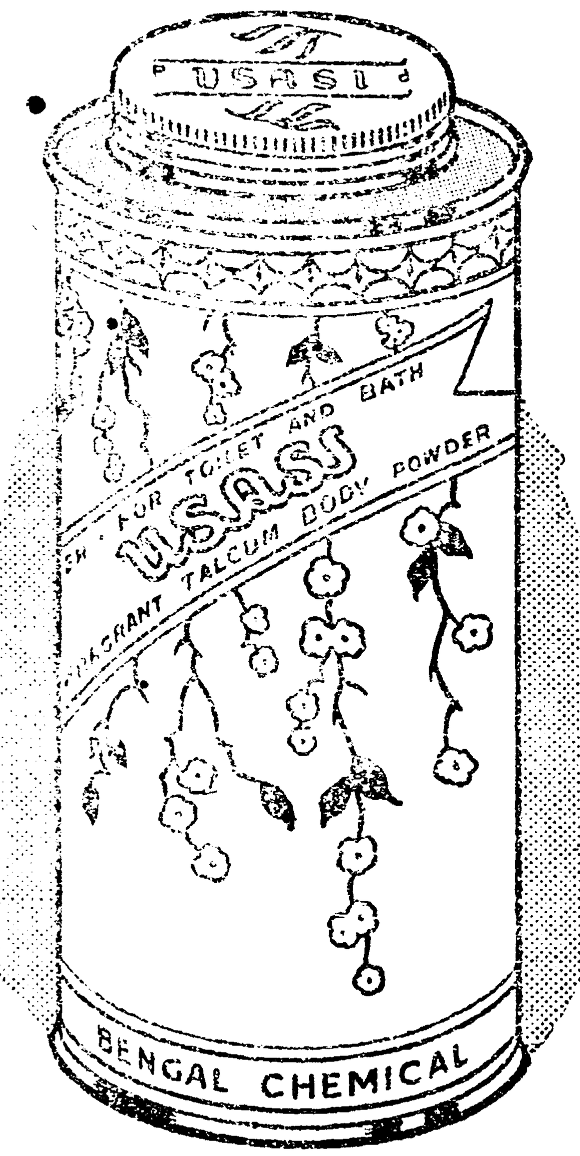

উষসী
অভিজাত প্রসাধন-রেণু
লুপ্ত ও সুপ্ত
দেহ সৌন্দর্যকে জাগ্রত করে
শিশুর কোমল অঙ্গেও নির্ভয়ে
ব্যবহার চলে
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা :: বোম্বাই

উত্তরদাতাদের নাম : শ্রীরত্না, জয়ন্ত, স্বপ্না ও ছন্দা রায় (বাঁকীপুর) ; শ্রীসঞ্জীব গঙ্গোপাধ্যায় (দমদম্) ; শ্রীবিভাসবিহারী বসু (পাটনা) ; শ্রীদীপককুমার ধর (সোনালী—পূর্ণিয়া) ; শ্রীমঞ্জুলা ও বাণী মজুমদার (বহরমপুর) ; শ্রীসোমেশ রায় (কলিকাতা) ; শ্রীনীপা ও নীতা (এলাহাবাদ) ; শ্রীমন্দিরা দাশগুপ্তা (নিউদিল্লী) ; শ্রীঅজয় বসু (কলিকাতা ২৯)।

নির্ভুল উত্তর কেউ দিতে পারেন নি।

নূতন ধাঁধা

ঝর্ণা, অপা, দীপা এবং গোপা চার বোন। চার জনেই ফল খেতে ভালবাসে। সেদিন তাদের কাকা কিছু আম, কিছু লিচু, কিছু কলা আর কিছু আপেল এনে বললেন, "এই ফলগুলো চারজনে ভাগ ক'রে নে, কিন্তু এক-একজন এক-এক রকম ফল নিবি, এক রকমের ফল কিন্তু দু'জনে নিস্ নে।"

ঝর্ণা বললে, "আমি আপেল নেব না।" দীপা বললে, "আমি লিচু চাই নে।" ঝর্ণা আবার বললে, "দীপা যদি আপেল নেয় তা হ'লে আমিও লিচু নেব না।" দীপাও ফের বললে, "আর যদি গোপা লিচু নেয় তা হ'লে আমিও আম নিচ্ছি না।" গোপা বললে, "বাঃ, ঝর্ণা লিচু নিলে আমিই বা কলা নেব কেন?" শুধু অপা কিছু বললে না। কাকা বললেন, "বেশ বেশ, তোদের যার যেমন ইচ্ছে তাই হবে।"

বল তো শেষ পর্য্যন্ত কে কোন্ ফল বেছে নিল?

নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

বিষয় : হাতের লেখা।

এবারকার রামধনুর প্রথম পৃষ্ঠায় যে কবিতাটি ছাপা হয়েছে (বৈদিক স্তোত্র) সেটি একটি কাগজে পরিষ্কার ভাবে স্বাভাবিক হাতের লেখায় লিখে পাঠাতে হবে। কষ্ট ক'রে ছাপার অক্ষরের মত ক'রে লিখতে হবে না। যাদের লেখা আমাদের বিচারে সব চেয়ে সুন্দর মনে হবে তাদের মধ্যে থেকে ১ম ও ২য় ২টি পুরস্কার দেওয়া হবে। লেখা আগামী ১০ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে রামধনু-সম্পাদকের কাছে পৌঁছান চাই। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে কিন্তু প্রত্যেকটি লেখার সঙ্গে নীচের কুপনটি কেটে পূরণ ক'রে পাঠাতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না।

রামধনু

নাম

বয়স

ঠিকানা

রা। পু ১।৫৮

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক পত্র

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৩শ বর্ষ

১৩৫৭

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

রামধনু কার্য্যালয়

১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫

বার্ষিক মূল্য ৪৲ প্রতি সংখ্যা ।৵০ ষাণ্মাসিক ২।০

রামধনু

সূচীপত্র

২৩শ বর্ষ (বৈশাখ— চৈত্র, ১৩৫৭)

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
অবনীন্দ্রের জন্মদিনে (কবিতা)	শ্রীদুর্গাদাস সরকার	২৩৭
অভিজ্ঞ (ঐ)	শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ	৫৩৩
অলৌকিক (ব্যঙ্গচিত্র)	শ্রীরবীন ভট্টাচার্য্য	৩২৮
অ্যাক্‌সিডেণ্ট (গল্প)	শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্. এ	১৫
আত্মোন্নতি সমিতির গল্প (সচিত্র প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি. এস্-সি	২১, ৬৫, ১২১
আন্দামানের পথে (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ, বি.এল্	৫০৪
আপন-ভোলা (কবিতা)	শ্রীঅরুণিমা সেনগুপ্তা	২৪১
আবার যদি যুদ্ধ বাধে (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্.এ	১৭২
আমরা দামাল ছেলে (কবিতা)	শ্রীতারকেশ্বর রায়	৪৩৮
আমাদের ভোলা বাবু (ঐ)	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	৪২৮
আমাদের সংবাদপত্র বিভাগ		৫৭, ১০১, ১৫৬, ১৯৪, ২৫৩, ২৯৫, ৩৫৪, ৩৯৪, ৪৩৭, ৪৮০, ৫২৩, ৫৬৩
আমার গ্রাম (কবিতা)	শ্রীসুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়	১৪৮
আমার বাল্যস্মৃতি (জীবন-স্মৃতি)	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৫৩০
আমার ব্যাঘ্রপ্রাপ্তি (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	২২৫
আমি দেখেছিলাম (কবিতা)	শ্রীসুনির্ম্মল বসু	২৯৯
আমি বিক্রী হইয়া গিয়াছিলাম (গল্প)	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি. এ	৫২৮
আমেরিকায় যা দেখলুম (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীকনককুমার পাল	৩৭৮, ৫৫০
আর একটি চিঠি	শ্রীঅমরেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীগোপারাণী সাহা	৫৫৮
আলমোড়ার চিঠি (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীদ্বিজেন মল্লিক	৩
ইন্দ্রনীলের পরীক্ষা (গল্প)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৯৪
ইন্‌স্‌পেক্টর চক্রবর্ত্তী (ঐ)	শ্রীকমলা দত্ত	১৩৫
উদাসীন (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৩৫৯
উল্টো খেয়াল (ঐ)	শ্রীনবগোপাল সিংহ	৫৪৭
একখানি অতি প্রাচীন বাংলা বই (প্রবন্ধ)	শ্রীজয়দেব রায়, এম্. এ	৩১৮

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
একটি অপ্রকাশিত সংবাদ (গল্প)	শ্রীঅরবিন্দ গুহ	৪৭০
একটি চৌরিক কাহিনী (ঐ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৫১১
একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী (ঐ)	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্	৭৭
একা নয় (গল্প)	শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র	৩৬০
এপার ওপার ডাকাডাকি (কবিতা)	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০৩
এবারকার বিজ্ঞান-কংগ্রেস (প্রবন্ধ)	শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি.এস্-সি	৪৬৫
এলো নব বৈশাখ (কবিতা)	শ্রীনবগোপাল সিংহ	৩৬
এলো শরৎরাণী (ঐ)	কুমারী দীপালি সেনগুপ্তা	৩৫০
কবির আশা (ঐ)	শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ	৩৮৩
কলকাতায় তৃতীয় টেষ্ট (খেলাধূলা)	শ্রীঅমলকুমার মিত্র, বি.এ	৪৬৩
কলের মগজ (বিজ্ঞান)	শ্রীঅরুণমোহন চক্রবর্ত্তী	২৭০
কী থেকে কি হয় (ঐ)	ঐ	৪৪৪
কুমারী সান্ত্বনা বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৪৩৬
কৃত্রিম বৃষ্টিপাত (বিজ্ঞান)	শ্রীঅরুণমোহন চক্রবর্ত্তী	১২৪
ক্রমবিকাশের তত্ত্ব (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ	২৮০
খুকু (ঐ)	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	২০৭
খেলাধূলা		৩২, ২৭১, ৪৩৯, ৪৬৩, ৫০৯
খোকন ও কালো মেঘ (কবিতা)	শ্রীপ্রভাকর মাঝি	১৭৮
গাছেরা খায় কি (বিজ্ঞান)	অধ্যাপক শ্রীমুরারিমোহন রায় চৌধুরী, এম্.এস্-সি	৩৮৩
গুণী (গল্প)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	৩৪২
গৃহহারা (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৫৯
ঘুমানো রাতেতে জাগে পরীদের দল (কবিতা)	শ্রীকমলা দত্ত	২৩৮
চতুর্থ ও পঞ্চম টেষ্ট (খেলাধূলা)	শ্রীঅমলকুমার মিত্র, বি.এ, সাহিত্যভারতী	৫০৯
চন্দ্রিমা-বাসর (কবিতা)	শ্রীতরুণকুমার সান্যাল	৫২১
চাঁদনী রাতে (ঐ)	কুমারী দীপালি সেনগুপ্তা	২০৩
চাঁদের দেশে যাবে (বিজ্ঞান)	শ্রীঅরুণমোহন চক্রবর্ত্তী	৩৩৮
চিঠি	শ্রীরুণু বসু	২৯০
চিঠিপত্র		৫০, ৯৮, ১৫৫, ২০১, ২৪৭, ২৯৪, ৩৫১, ৩৯৬, ৪৪০, ৪৭৬, ৫২২, ৫৬৫
চিত্রশালা (চিত্র)	...	১০০, ১৪৭, ১৭১
চিত্রে দেশবিদেশ (চিত্র)	...	৩৭৫, ৪১৯
ছাত্রদের প্রতি শ্রীঅরবিন্দ	...	৫২৯

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
ছিটেফোঁটা (কবিতা)	শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ	২৪৮
ছেলেটা (ঐ)	শ্রীপূর্ণেন্দু মল্লিক	৫৪৮
ছোটদের চিত্রশালা (চিত্র)	...	৪৯
ছোট্ট যোগী (জীবন-কথা)	শ্রীকনককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫
ছোট্ট সবুজ পাখী (কবিতা)	কুমারী দীপালি সেনগুপ্তা	৪৪
জি. বি. এস্ (জীবনী)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	৩৯০
জ্যৈষ্ঠ দুপুরে (কবিতা)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্.এ	৮৩
ডাক্তারখানা (স্বাস্থ্য)	শ্রীমতী বাণী রায়	৫১৬
তপোবন (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪৪৩
তাঁতিয়া টোপী (ইতিহাস)	অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্.এ	৪০৮
তোতলা (বিজ্ঞান)	শ্রীঅমলশঙ্কর রায়	১৬০
তোমার সাহিত্য ও ভাষাজ্ঞান পরখ কর	শ্রীকৌটিল্য	৫৫১
দরদী লেখক (জীবন-কথা)	শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত	২০৩
দশভুজা (কবিতা)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি.এ	৩৩৫
দিনে দুপুরে (গল্প)	শ্রীঅরবিন্দ গুহ	২৭৩
দু'টি কবিতা-কণা (কবিতা)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৩৩৭
ধাঁধা ও ধাঁধার উত্তর		৫৯, ১১০, ১৫৮, ২০৫, ২৫৫, ২৯৭, ৩৫৮, ৪০২, ৪৪২, ৪৮২, ৫২৫, ৫৭১
ধূসর ঝোড়ো গোধূলি (কবিতা)	শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৩১
নতুন ডাক্তার (গল্প)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি. এস্-সি	২১৮
নতুন বই (সমালোচনা)	...	৪৮, ১৪৫, ২৩৮, ৩৫৩, ৫১৭
নতুন ভোরের দেশ—কোরিয়া (দেশ-বিদেশ)	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্	২২২
না খেয়ে নেমন্তন্নে যেয়ো না (গল্প)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৯
নানা প্রসঙ্গ	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্	১২৬, ২৭৭, ৪৫৪
নিখিল বঙ্গ শিশুসাহিত্য সম্মেলন	...	২৮৫
নীড়হারা (গাথা)	বন্দে আলী মিয়া	১২৯
নৃত্যবিলাসী ধরণী (কবিতা)	শ্রীনবগোপাল সিংহ	১৮০
নেপালের জাতীয় কবি ভানুভক্ত (জীবনী)	শ্রীঅমলকুমার মিত্র	২৮৪
পতঙ্গের দান (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীঅরুণমোহন চক্রবর্ত্তী	২১৫
পবিত্র গাছ (সত্য ঘটনা)	শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বি.এ	৬২
পর্ব্বত (কবিতা)	শ্রীঅচ্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	৪৭৫

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
পরাজয় (গল্প)	শ্রীশান্তা দেবী	৫৫৯
পরাণ মাঝির ছেলে (গল্প)	শ্রীশামুক	৪৯৩
পাঁচমিশেলী	...	৩৭, ৮৫, ১৪২, ১৮৯, ২৪৪, ২৮২, ৩২৯, ৩৮৬, ৪৩০, ৪৬৫, ৫১৮, ৫৪৯
পুরস্কার-প্রতিযোগিতা (গল্প)	শ্রীমতী দীপালি সেনগুপ্তা	৫৪২
পুরস্কার-প্রতিযোগিতা ও ফলাফল	...	৪৯, ৫৯, ৯৯, ১৪৬, ৩৫৭, ৪৭৫, ৪৮৩, ৫৭১
পৃথিবীতে অপ্রয়োজনীয় কিছু নেই (গল্প)	শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী	১৮০
প্রাচীন নালান্দা (ইতিহাস)	অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম্.এ	২০৮
প্রিয়ঙ্গু (উপন্যাস)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	২৫, ৭৪, ১১৬, ১৬৮, ২১১, ২৫৯, ৩৬৬, ৪০৫, ৪৪৮, ৫০২, ৫৩৪
ফাগুনে (কবিতা)	শ্রীআদিত্যনাথ মিশ্র, বি.এ, সাহিত্যশাস্ত্রী	৫০৮
ফাল্গুন (ঐ)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্.এ	৫০৭
বন মহোৎসব (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	১৮২
বল তো কিসের ছবি (চিত্র)	...	২৬৯
বল্‌বো নাকি ? (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ	৮৪
বর্ষা (ঐ)	শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্.এ	১৭৯
বড়দিনের ছুটীতে (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীসুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়	৯১
বাগমারির গপপো (কবিতা)	শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী	৪৭৩
বাণী-বন্দনা (ঐ)	শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক, এম্.এ	৪৮৫
বাণীবিনোদ নির্ম্মলেন্দু (জীবন-কথা)	শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়	৪১
বাবলা-বনের মিনতি (কবিতা)	শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী	২৮১
বাংলা গান (প্রবন্ধ)	শ্রীজয়দেব রায়, এম্.এ	২৩২
বিজয়া (কবিতা)	শ্রীমুকুলরাণী মণ্ডল	৪৩৯
বিতর্ক সভা (আলোচনা)	...	৫৯, ২০৪, ২৪৩, ৫২৫
বিতস্তার বন্যা (গল্প)	শ্রীগৌরী দেবী	৪৫
বিদ্যালাভ (ঐ)	শ্রীসুবোধ বসু	৩২১
বিনিপাত (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১১১
বিভূতিভূষণ (জীবন-কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	৪২৪
বিলাতী গল্প (গল্প)	শ্রীকাত্তিক মজুমদার	৩১২
বীরনগর বা উলা (দেশবিদেশ)	...	৪৩৩
বুদ্ধির দৌড় (গল্প)	শ্রীকালিদাস রাউৎ	২৯১
বুড়োদের কথা (প্রবন্ধ)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি.এ	৫৪৪
বৈশাখী ভোর (কবিতা)	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
ভরা ভাদরে (ঐ)	শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী	২৩৬
ভূতের ওঝা (মনোবিজ্ঞান)	ক্যাপটেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এস্-সি, এম্.বি	৩৭৬
মঞ্চের ইন্দ্রজাল (ম্যাজিক)	যাদুকর শ্রী এস্. কে. ভাদুড়ী	৩১৫, ৪৫৬, ৫৩৬
মথুরার মোটা মানুষ (গল্প)	শ্রীশামুক	৪১৪
মনের ভাষা (মনোবিজ্ঞান)	ক্যাপটেন ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি.এস্-সি, এম্.বি	১১৯
মনোরঞ্জন-চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা ও ফলাফল	...	৯৯, ৫৭১
মহাশূন্যের রহস্য-সন্ধানে (বিজ্ঞান)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	২৮
মাঝ রাতে (কবিতা)	শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী	৫৫৮
মাসিমা (ঐ)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৩৩৫
মেঘেন্দ্রলাল (জীবন-কথা)	শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়	৪৯৮
রাজ-পিপলার জঙ্গলে (গল্প)	শ্রীশামুক	১৬৩
রাজা ও পিতা (ইতিহাস)	শ্রীবিমলচন্দ্র সেন	৩৬৯
রায়পাহাড়ীর নিশাচর (উপন্যাস)	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্	৩৯৭, ৪১০, ৪৭৭, ৪৮৮, ৫৬৬
রুণু-টুনুর এডভেঞ্চার (উপন্যাস)	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৫১, ১০৩, ১৪৯, ১৯৬, ২৪৯, ২৬২
রেশমের আত্মকথা (প্রবন্ধ)	শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি.এস-সি	২৮২
লঙ্কাকাণ্ড (গল্প)	শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্.এ, বি.এল্	৩৭১
লেটার বক্স (ঐ)	শ্রীঠাকুরপ্রসাদ বসু	১৭৪
শরৎ মেলা (কবিতা)	শ্রীসুনীতি চৌধুরী	৩৫১
শান্তিবাণী (ঐ)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি.এ	৩৫
শিশুসাহিত্য-সংবাদ (সমালোচনা)	...	৪৪১, ৪৬৭
শেষের দিকে (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৫২৭
শ্রাবণ-সাঁঝে (ঐ)	শ্রীঅচিন্ত্য মিত্র	১৭৭
শ্রীঅরবিন্দ (জীবনী)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি	৪৫৮
সঙ্গীতাচার্য্য সুরেন্দ্রনাথ (ঐ)	শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়	৩২৫
সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল (ঐ)	...	৪৬৮
সন্দেশ ...	...	১০৯, ৩৫৬
সন্ধানী ঠাকুরের কথা (গল্প)	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি	৪২০, ৪৫০

বিষয় (বর্ণানুক্রমিক)	লেখক	পৃষ্ঠা
সপ্তগ্রাম (দেশবিদেশ)	শ্রীগৌরী দেবী	১৩৮
সবেরই একটা সীমা থাকা উচিত (গল্প)	শ্রীশামুক	১১২
সমুদ্রের আগাছা (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি	৫৫৩
সাগরতলার রহস্য (বিজ্ঞান)	অধ্যাপক ডাঃ দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ডি. এস্-সি	৩০২
সাগরপারে আন্দামান (ভ্রমণ-কাহিনী)	শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্.এ, বি.এল্	৫৩৮
সূর্য্য ও জোনাকী (গল্প)	শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪০
সোনার ভোর এই আশ্বিনে (কবিতা)	শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫৭
সোনালী পরী (গল্প)	শ্রীগৌরী দেবী	৪৩৫
সোহ রাব-রুস্তম (ঐ)	শ্রীকমলা দত্ত	৩০৮
সৃষ্টি (কবিতা)	শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী	৪২৯
হকি-যাদুকর ধ্যানচাঁদ (জীবন-কথা)	শ্রীঅমলকুমার মিত্র	৩২
হাইড্রোজেন বোমা (বিজ্ঞান)	শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি.এস্-সি	৬৯
হাসির ফসল (কবিতা)	শ্রীআদিত্যনাথ মিশ্র, বি.এ, সাহিত্যশাস্ত্রী	৩৮২
হিন্দী দোঁহা	অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্.এ, বি.এস্-সি	৫৪৯
হিম ঋতু এল ফিরে (কবিতা)	শ্রীনবগোপাল সিংহ	৩৮১

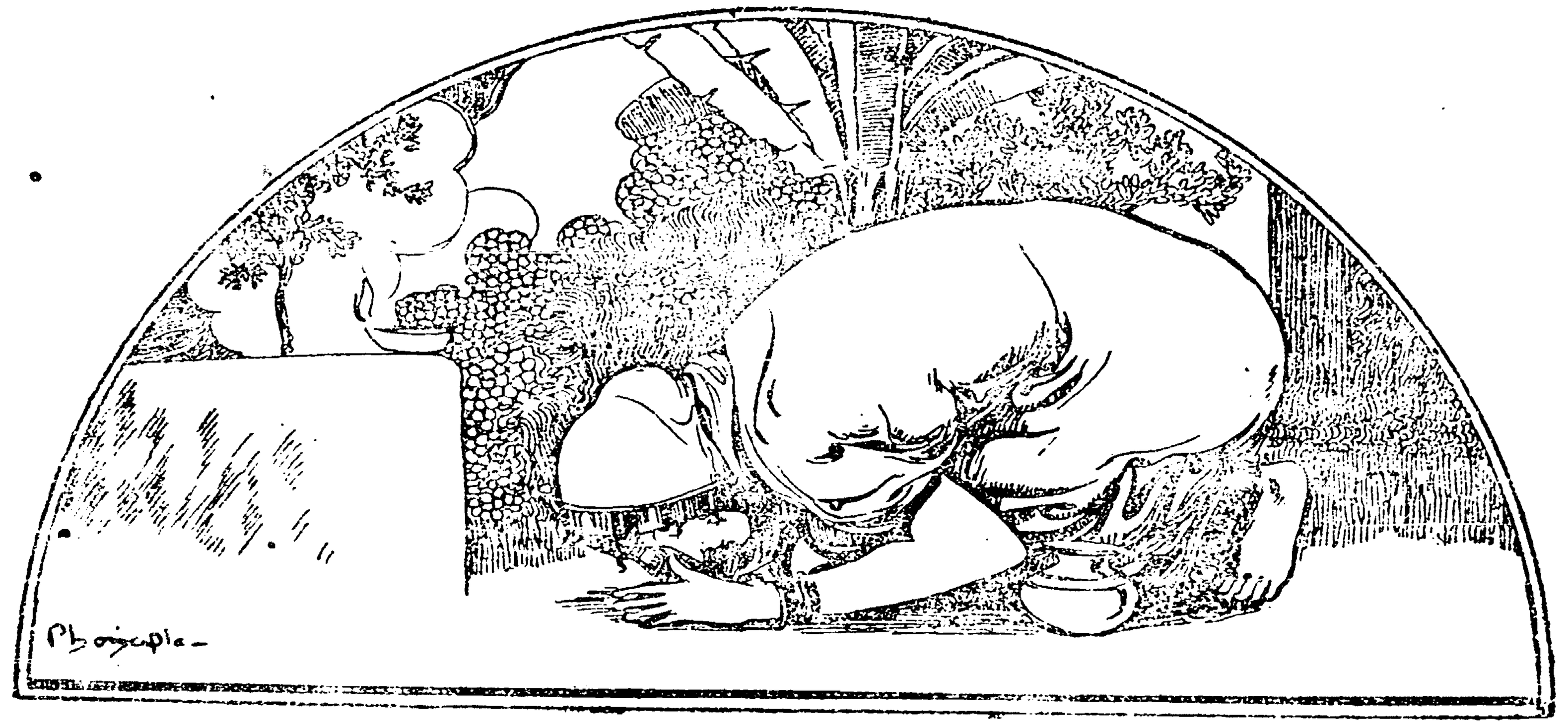

রামধনুর নিয়মাবলী

১। রামধনুর বাষিক মূল্য ৪৲, ষাণ্মাসিক ২।•, প্রতি সংখ্যা ।৵•। ভি. পি. তে লইলে আরও অতিরিক্ত ।৵০ লাগে। বৈশাখ হইতে বৎসর গণনা করা হয়।. সকলকেই হয় বৈশাখ, না হয় কাত্তিক হইতে গ্রাহক হইতে হয়।

২। কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া তাঁহাদের উত্তর সহ মাসের ২• তারিখের মধ্যে আমাদের জানাইবেন, নচেৎ কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে।

৩। গ্রাহকগণ পত্র লিখিবার সময় 'গ্রাহক নং' বা 'নূতন গ্রাহক' কথাটি অবশ্য উল্লেখ করিবেন।

৪। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং টাকাকড়ি প্রভৃতি ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন। চিঠির উত্তরের জন্য রিপ্লাই কার্ড বা উপযুক্ত ডাকটিকেট না থাকিলে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। বিজ্ঞাপনের হারের জন্য কার্য্যাধ্যক্ষকে পত্র দিবেন।

—ম্যানেজার, রামধনু।

১৬, টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫। টেলিফোন নং সাউথ ১২৬।
শাখা কার্য্যালয়—ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি, রসা রোড, কলিকাতা-২৫।

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

—শুকতারা—

স্বাধীনতা-উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি প্রগতিশীল দেশেই শিশু-সাহিত্যও নূতনভাবে গড়িয়া উঠে। কারণ, সদ্যোমুক্ত পরাধীনতার রেশ সারা দেশে তখনও যে জড়তার প্রশ্রয় দিতে উন্মুখ হয়ে থাকে, একমাত্র সাহিত্যই তাহা দূরীকরণে সমর্থ।

এই গভীর সত্য অনুধাবন করার ফলেই শিশু-মাসিক "শুকতারা"র আত্ম-প্রকাশ।

স্বাধীন বাংলার ছেলেমেয়েদের জীবন আকাশের শুকতারার মতই নির্ম্মল ও দীপ্তিমান হয়ে উঠুক, এই কামনাই করি। কামনা করি, কীর্ত্তিমান সন্তানদের গর্ব্বে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুন বাংলার জনক-জননীরা! জয় হিন্দ্!

কবিতা

নাটক

জীবনী

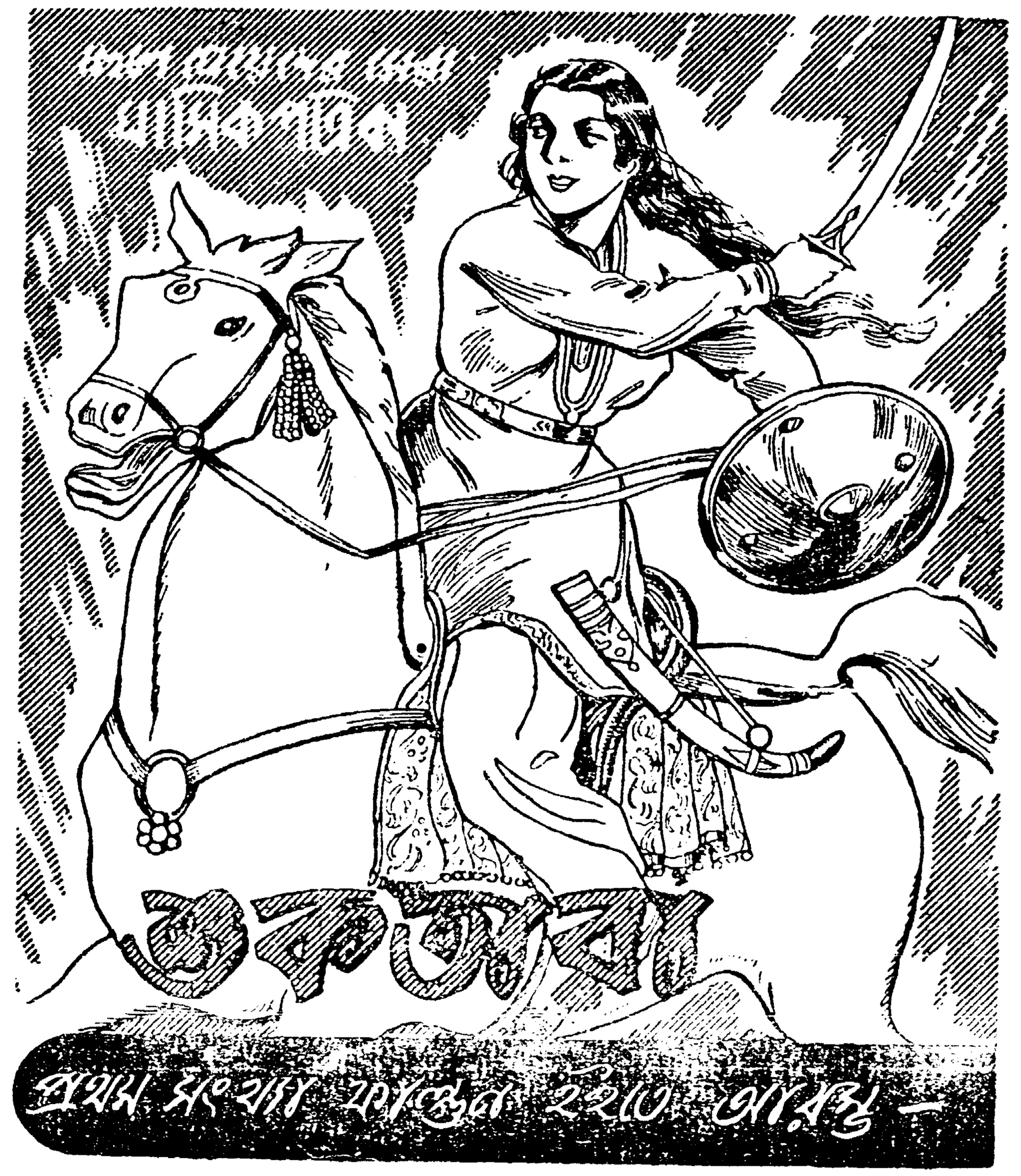

গল্প

উপন্যাস

শিকার

প্রতি সংখ্যা ।৶ বার্ষিক ৪৲ টাকা

দেব সাহিত্য কুটীর

—চতুর্থ বর্ষ—

প্রতি বৎসর ফাল্গুন হইতে বর্ষারম্ভ

প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা ও বার্ষিক মূল্য সডাক ৪৲ টাকা মাত্র।

দেব সাহিত্য কুটীর ❋ ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা	১৲
বিজ্ঞান-বুড়ো	১৲
আকাশের গল্প	১।০
আবিষ্কারের গল্প	৸০
ধূমকেতু	৸০
অয়েল পেন্টিং (নাটক)	।০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১৲

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা	১॥০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর

ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি	৸০

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

অনুসন্ধানী	১॥০

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি	১।০
পদ্মরাগ	১॥০
সোনার হরিণ	১॥০
নূতন পুরাণ	৸৵০
হাস্য ও রহস্য	৸৵০
চায়ের ধোঁয়া	৸০
দমাদম্ দামোদর (নাটক)	।৶০

শ্রীঅমলশঙ্কর রায়ের

যে জার্ম্মানী হেরে গেছে	২৲

ছোটদের বিশ্বসাহিত্য গ্রন্থমালা

লাষ্ট অফ্ দি মোহিকান্স্	॥৵০
অলিভার টুইষ্ট	॥৵০

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের

মহাভারতের গল্পগুচ্ছ (১ম)	৸০
ঐ (২য়)	৸০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি রমা রোড, কলিকাতা ২৫

লিলি বিস্কুট

রকমারিত্বায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

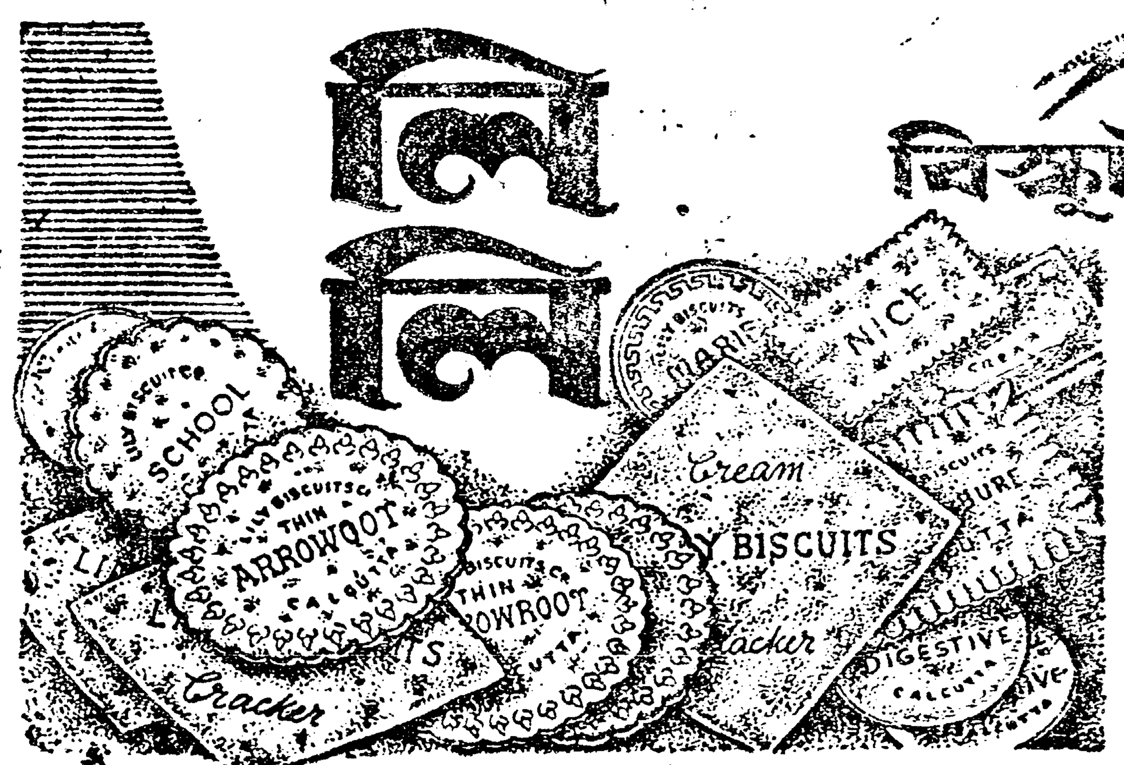

কয়েকটী মনোরম

ও

স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন-ক্রীম,
ক্যানিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ

৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

২য় সংখ্যা

রামধনু

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম্. এস-সি

কার্য্যালয় :
১৬, টাউনসেণ্ড রোড,
কলিকাতা ২৫

কিশোর পরিচালিত ছোটদের
সচিত্র মাসিক

"সোনার কাঠি"

সম্পাদক—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

মাসিক পত্রিকা অনেক বেরিয়েছে—কিন্তু ঠিক এ রকমটি আর কোথাও বেরোয় নি। গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধে, সমালোচনায় ঠিক যেমনটি তোমরা চাও।

মূল্য— বার্ষিক
প্রতি সংখ্যা সডাক চাঁদা
৵০ আনা ২৲ টাকা

একমাত্র ঠিকানা :—
কার্য্যাধ্যক্ষ, সোঃ কাঃ—৪-এ, বম্পাস রোড
কলিকাতা-২৯

বড়দের প্রীতি-উপহারের
একখানি সেরা বই

কথাশিল্প

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবোধ সান্যাল, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ বসু, সরোজ রায় চৌধুরী, গজেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী ও বাণী রায় প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকদের লেখা গল্প-সংগ্রহ। প্রত্যেক লেখকের রেখাচিত্র ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্বলিত। সুন্দর বাঁধাই, বিরাট বই।

মূল্য ৩৷৷০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড
১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রামধনু—

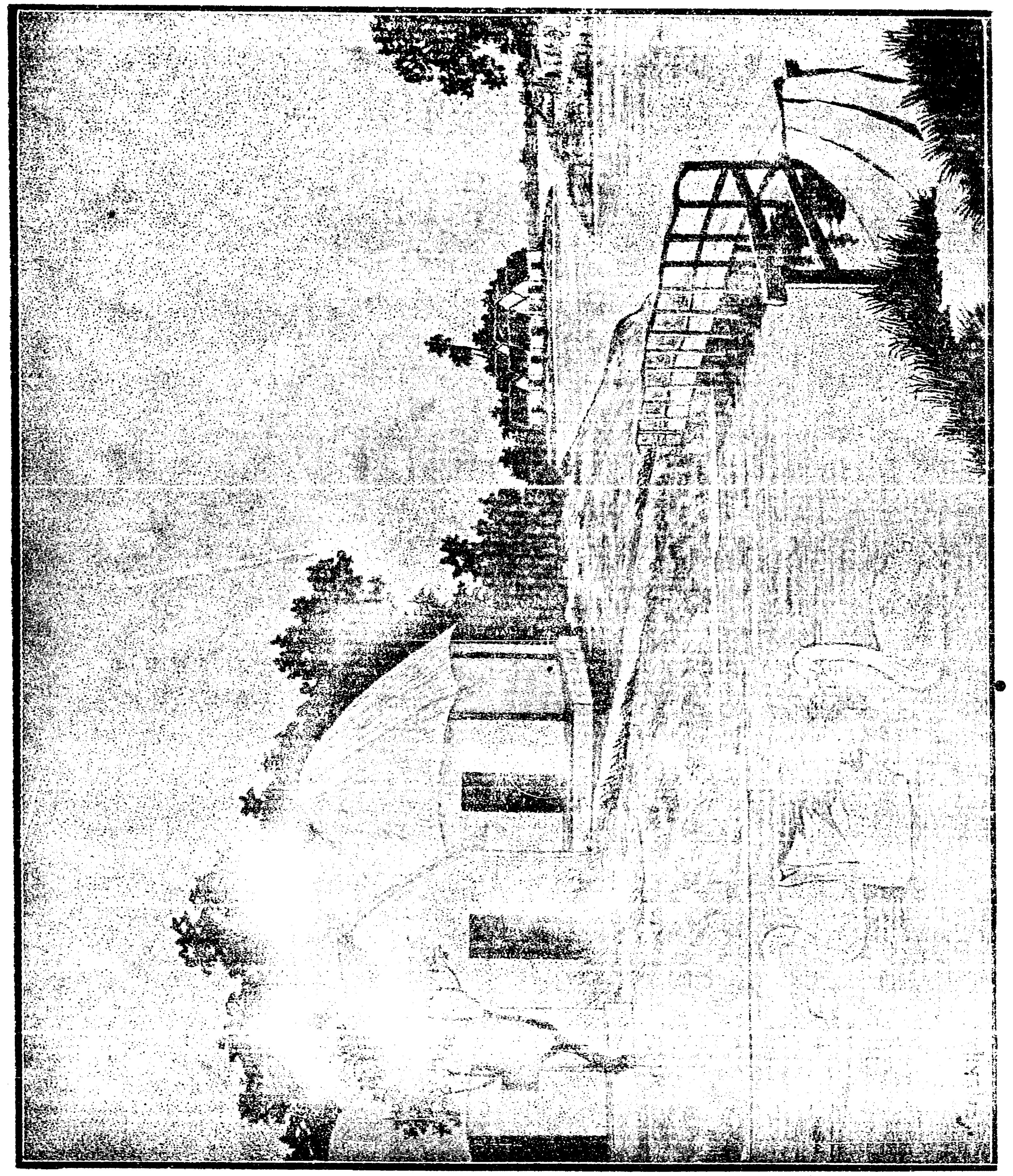

পল্লীদৃশ্য

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৪শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮ { ২য় সংখ্যা

কি শুনাবো !

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমি তোমাদিকে শুনাইতে চাই
সেই গল্প ও কথা,
বিন্দুকে বায়ু শুনায় যেমন
সিন্ধুর বিশালতা।
বালক তরুরে জানাবো কি তুই পাবি,
কত সৌরভে, কত গৌরবে দাবী,
ভাবী পুষ্পের কি সুরভি হবে,
ফলের কি মধুরতা।

যে শুক্তি আছে গভীর গুহায়
লবণ-জলেতে লীন
তাহারে বলিব, ওঠো—জাগো তুমি,
নহ নহ তুমি দীন।
মুক্তা—যুগের শোভা আনন্দ যাহা—
বুকে ধরে তুমি হইবে ধন্য তাহা,
রাজার অঙ্গে লাবণ্য দিবে
পুণ্য সে অমলিন।

বাঙালীর ছেলে, হও যত দীন
তুলনা তোমার নাই,
খোলামকুচি কি কাচ নহ তুমি—
হীরার টুক্‌রা, ভাই!
মাটি মাখা হও,—তোমরা পদ্মরাগ,
মর্ত্তের শিশু, স্বর্গ দেয় সোহাগ,
কোহিনূর করে তোমাদের শিরে
ওঠার আকাঙ্ক্ষাই।

আমি জানিয়াছি তোমাদের আছে
বিরাট সম্ভাবনা,
জেনো তুচ্ছ কি ক্ষণিকের লাগি
নহে তব আনাগোনা।
এই যে জীবন হবে অমৃতময়,
তোমরা হইবে জগতের বিস্ময়;
গোটা এ ভারত মন্দির হবে—
বিশ্বের আরাধনা।

লাল কুঠি

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্ সি

২

নমিতা দেবী নিজেকে সামলে নিলেন। প্রমোদ তারপর উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বললে, তুমি কি তোমার রোগী এখনই দেখতে চাও, সুনীল?

আমি বললাম, মন্দ কি?

চা তখনকার মত তোলা রইল। নমিতা দেবী অস্ফুটভাবে কি যেন বলতে গেলেন, আমি তা বুঝতে পারলাম না। আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

বরাবর তিনতলায় উঠে আমরা একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। প্রমোদ তার পকেট থেকে একটা চাবি বার করে বললে, অনেক সময় অবিনাশ নিজের খেয়াল-খুসী মত বেরিয়ে যায় বলেই এ ব্যবস্থা।

দরজা খোলা হ'লে ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, একটী যুবক জানালার কাছে একান্ত গুটিগুটি মেরে বসে আছে। আমার প্রথমে মনে হ'ল, সে বোধ হয় আমাদের উপস্থিতিই জানতে পারে নি; কিন্তু পরক্ষণেই লক্ষ্য করলাম তার চোখ দু'টী স্থিরদৃষ্টিতে আমাদের গভীর ভাবে পাহারা দিচ্ছে। আমার চোখে চোখ পড়তেই সে চোখ নামিয়ে ফেললে এবং পিট্ পিট্ করে আড়চোখে তাকাতে লাগলে। তবে নড়লে না একটুও, বা নড়বার চেষ্টাও করলে না।

প্রমোদ তাকে উদ্দেশ করে বললে, অবিনাশ, আমার একজন বন্ধু তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।

কিন্তু অবিনাশের কোন ভাবান্তর হ'ল বলে মনে হ'ল না।

ছোট ছেলের সঙ্গে লোকে যে ভাবে কথা বলে ঠিক তেমনি ভাবে প্রমোদ বললে, এটা খেয়ে নাও, ভাই! বলে এক কাপ্ দুধ রাখলে প্রমোদ টেবিলের উপর।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম প্রমোদের দিকে; সে বললে, ভারী অদ্ভুত ব্যাপার সুনীল, দুধ ছাড়া ও আর কিছুই স্পর্শ করে না।

ধীরেসুস্থে অবিনাশ হাত-পা ছড়িয়ে বসলে এবং এক পা এক পা করে এগিয়ে এল টেবিলের কাছে। অতি সংগোপনে তার প্রতি পদক্ষেপ। টেবিলের একান্ত নিকটে এসে সে তার এক পা এগিয়ে দিলে সম্মুখের দিকে, তারপর একটি দীর্ঘ হাই তুললে; লোকে যে এত বড় হাই তুলতে পারে তা জীবনে কোন দিন দেখি নি। এরপর সে আস্তে আস্তে তার মুখ নত করলে টেবিলের উপর এবং জিভ দিয়ে চুক্ চুক্ করে দুধ খেতে লাগল। আমার ভারী আশ্চর্য্য লাগল। প্রমোদের দিকে তাকাতেই সে বললে, হাতের ব্যবহার ও যেন একদম ভুলেই গিয়েছে!

দুধ খাওয়া শেষ হ'লে অবিনাশ আবার নিঃশব্দে তার জানালায় গিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে আমাদের দিকে তাকাতে লাগল।

অগত্যা আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। অবিনাশ সম্বন্ধে আমার দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল।

ক্রমে রাত হ'ল। খাওয়াদাওয়ার পর আমরা ড্রইং রুমে বসে গল্প করছিলাম। অনেকক্ষণ থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম, ঘরের বাইরে একটি বিড়াল মিউ মিউ করছে। আগেই বলেছি যে আমি বিশেষ বিড়াল-ভক্ত। তা ছাড়া এই শীতের রাতে বেচারী ভিতরে ঢুকবার কোন পথ না পেয়েই হয়তো আবেদন জানাচ্ছে। তাই নমিতা দেবীকে উদ্দেশ করে বললাম, দরজা খুলে বিড়ালটীকে ভিতরে ঢুকতে দেব মাসীমা ?

হঠাৎ নমিতা দেবীর সমস্ত মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করল, কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনি তা সামলে নিয়ে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালেন। আমি তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে দিলাম, কিন্তু কোন বিড়ালেরই দেখা পাওয়া গেল না।

নিজের চেয়ারে ফিরে এসে বললাম, ভারী আশ্চর্য্য ! বাজী রেখে বলতে পারি, একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই আমি একটা বিড়ালের মিউ মিউ ডাক শুনতে পেয়েছি। তারপর চেয়ে দেখলাম, সকলেই একান্ত ভাবে আমারই দিকে তাকিয়ে আছে। ভারী অস্বস্তিকর লাগল আবহাওয়াটা।

সে রাত্রে বিছানায় শুয়ে শত চেষ্টায়ও বিড়ালের চিন্তাটা মন থেকে তাড়াতে পারছিলাম না। ঘুমোতে চেষ্টা করলাম; পারলাম না। হঠাৎ মনে হ'ল বাইরে একটা বিড়াল করুণ স্বরে ডাকছে। বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সামান্য একটু চাঁদের আলো পড়েছিল বারান্দার ওপর। কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না, অথচ বেশ পরিষ্কার ভাবেই শুনতে পাচ্ছিলাম শব্দটা। আমার মনে হ'ল বিড়ালটা হয়তো কোথাও আটকা পড়েছে, মুক্তির জন্য চেষ্টা করছে হয়তো বেচারী ! বাঁ-দিকে বারান্দার শেষ প্রান্তে নমিতা দেবীর ঘর, কাজেই ডান দিকেই পা বাড়ালাম। অল্প কয়েক পা যেতেই মনে হ'ল পেছন দিক থেকে আসছে শব্দটা। মুহূর্ত্ত মধ্যে পেছন ফিরলাম, কিন্তু এবার মনে হ'ল শব্দটা আসছে ঠিক ডান দিক্ থেকেই।

জানি না কি জন্যে আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল—হয়তো ঠাণ্ডা হাওয়াটার জন্যেই। অপেক্ষা করলাম না আর, ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন একটু দেরী করেই ঘুম ভাঙ্গল আমার। ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথেই জানালা থেকে লক্ষ্য করলাম, একটি ধূসর রংএর বিড়াল মাঠের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে। বুঝলাম, এই আমার নিদ্রার ব্যাঘাতকারী। এক দল ছোট পাখী চরে বেড়াচ্ছিল মাঠের উপর। কিন্তু আশ্চর্য্য, বিড়ালটা ওদের একেবারে গা ঘেঁষে চলে গেল, কিন্তু ওরা উড়ে গেল না !"

ব্যাপারটা এমন ভাবেই আমার মনে লেগেছিল যে চায়ের সময় সকলের কাছে উল্লেখ

করলাম ঘটনাটা। নমিতা দেবী খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন, কাপ ও প্লেটের দ্রুত নাড়াচাড়া শুনলাম কিছু সময়ের জন্য এবং তারপর অনেকটা অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে রুক্ষভাবেই জবাব দিলেন তিনি,—আমার মনে হয় তুমি ভুল দেখেছ, সুনীল ! এখানে তো কোন বিড়াল পোষা হ'চ্ছে না আর হয়ও নি কোন দিন !

বুঝলাম, ঘটনাটা অপ্রিয়, কাজেই বিষয়ান্তরে কথার মোড় ঘোরালাম।

কতগুলো ব্যাপার আমার মনে বিশেষ খটকার সৃষ্টি করেছিল। নমিতা দেবী কেন এত রুক্ষভাবে জবাব দিলেন ? কেনই বা অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে প্রচার করলেন যে এ বাড়ীতে কোন বিড়াল নেই বা ছিল না ? বিড়ালের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেই সকলে এত বিস্ময় প্রকাশ করে কেন ? যত দূর মনে হয়, বিড়ালটী অপর্ণারই পোষা। তবে কি নমিতা দেবীর তা জানা নেই ? অনেকের যেমন বিড়াল-কুকুরের উপর ঘৃণা থাকে নমিতা দেবীরও তাই আছে নাকি ? সম্ভব-অসম্ভব নানা প্রশ্নই মনের ভিতর তোলপাড় করতে লাগল।

অবিনাশের কোন পরিবর্ত্তনই হ'ল না এ কয় দিনে। নিঃশব্দ চাল-চলন, ভাসা ভাসা অর্থহীন দৃষ্টি, গুটিশুটি মেরে বসা, জিভ দিয়ে চুক্ চুক্ করে একমাত্র দুধ খাওয়া, কাউকে দেখলে পিট পিট ক'রে তাকান ! তবে একটা নতুন জিনিষ আবিষ্কার করেছি, যে, অবিনাশ তার জ্ঞানবিস্মৃতির মধ্যেও নমিতা দেবীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। প্রমোদের কাছে শুনলাম, বাস্তবিকই অবিনাশ নমিতা দেবীকে নিজের মায়ের মতই সম্মান দেখিয়ে আসছে চিরদিন।

দিন কাটছিল, কিন্তু কোন কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। নানাভাবে ভাবতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু রহস্য রহস্যই রয়ে গেছে। বিড়ালের ব্যাপারটাই যা একটুখানি অভিনব ! বলতে কি, বিড়ালের রহস্যটা আমি মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলতে পারি নি। একদিন হঠাৎ বাড়ীর একটি পুরোনো চাকরকে জিজ্ঞেস করলাম এ ঘটনা সম্বন্ধে। লোকটী প্রথমে অবাক হয়ে বললে, এ বাড়ীতে বর্ত্তমানে কোন বিড়াল নেই ; তবে গিন্নী-মা, মানে নমিতা দেবীর, একটি ধূসর বর্ণের মোটাসোটা বিড়াল ছিল। কিন্তু তিনি মাত্র সাত দিন আগে নিজেই সেটাকে মেরে ফেলে পাঁচীলের বাইরে বড় তেঁতুল গাছটার নীচে পুঁতে রেখেছেন। লোকটী জানালে, বড় লোকের খেয়াল, বোঝাই দায় !

আমি ভাবতে বসলাম, নমিতা দেবী কেন জোর ক'রে একটা মিথ্যার আশ্রয় নিলেন আমার কাছে !

প্রমোদকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি করে বল প্রমোদ, এ বাড়ীতে তুমি কোন বিড়াল দেখতে পাও কি না ?

প্রমোদের মুখ শুকিয়ে গেল। বললে, ডাক শুনেছি, তবে কোন দিন দেখি নি।

ভারী আশ্চর্য্য কিন্তু !

অনেকটা ভীতভাবে বললে প্রমোদ, বিড়ালের ডাকটা যে শুনতে পাই সেটা যেন কোন ভীষণ অমঙ্গলের সূচনা করছে !

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কার অমঙ্গলের কথা বলছ তুমি ?

প্রমোদ শুধু বললে, তা জানি না।

সে দিন রাতেও অনেক চেষ্টা করেও ঘুম আসছিল না। অবশেষে যখন তন্দ্রার মত একটু এল, তখনই একটা অদ্ভুত শব্দে আমার তন্দ্রা ছুটে গেল। মনে হ'ল কে যেন রাগের মাথায় কোন কাপড় বা পর্দা ছিঁড়ে ফেলছে। এক লাফে উঠে বাইরের বারান্দায় উপস্থিত হলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রমোদ অন্য একটি দরজা খুলে বেরিয়ে এল। শব্দটা আসছিল আমাদের বাঁ দিক্ থেকে।

আমরা দু'জনে ছুটে নমিতা দেবীর ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হলাম। আমাদের পাশ কাটিয়ে কাউকে যেতে দেখলাম না বটে, কিন্তু শব্দটা তখন থেমে গিয়েছিল। প্রমোদ অস্ফুটভাবে আমাকে বললে, তোমার কি মনে হচ্ছে ?

বললাম, কোন বিড়াল তার থাবা দিয়ে কোন কিছু ছিঁড়ে ফেললে যেমন শব্দ হয় তেমনই ছিল শব্দটা। অনুভব করলাম, আমার সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল দেয়ালে হেলান চেয়ারখানার দিকে। টর্চের আলো সে দিকে ঘুরিয়ে ফেলতেই আমার চক্ষুস্থির। প্রমোদকে বললাম, এই দেখ !

চেয়ারের চামড়ার ঢাকনাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা হ'য়েছে সত্যই—হয়তো কোন বিড়ালের থাবাই এটা করেছে। সভয়ে আবিষ্কার করলাম, চেয়ারের গায়ে কয়েকটী ধূসর ছোট লোম লেগে রয়েছে ! কোন কথাই বার হ'ল না আমার কণ্ঠ থেকে !

এ কথা ঠিকই বুঝছি যে একমাত্র নমিতা দেবীই সমস্ত রহস্যের পরিসমাপ্তি করতে পারেন। তিনি যতটুকু জানেন বলে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করছেন তার চাইতে অনেক বেশী জানেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এটাও বুঝছি, অমঙ্গল তাঁরই বেশী।

পরের দিন নমিতা দেবীকে দেখলাম। সমস্ত মুখে তাঁর সীমাহীন মলিনতা বিরাজ করছে। কেমন একটা জড়তা এসেছে তাঁর ব্যবহারের মধ্যে। ভাল ভাবে কথা পর্য্যন্ত বলতে পারলেন না কারোর সাথে। বুঝলাম, তিনি প্রাণপণে নিজেকে সংযত রাখবার চেষ্টা করছেন।

গত রাতের ব্যাপারটার একটুখানি ইঙ্গিত দিতেই নমিতা দেবী মলিন হাসি হাসলেন; বললেন, তোমাদের মাথা খারাপ হয়েছে, সুনীল ! আমার আবার অমঙ্গল কেন হ'বে ?

বুঝলাম তাঁর কাছ থেকে কিছু বার করা অসম্ভব। কাজেই সে চেষ্টা ত্যাগ করলাম। কিন্তু একটা কিছু করাও দরকার। কি করা যায় ? (ক্রমশঃ)

সাগর পারে আন্দামান

শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ, বি. এল্

আন্দামানের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ার। পোর্ট ব্লেয়ারের উত্তর-পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকে দেখবার অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। পাহাড় আর সমুদ্র পাশাপাশি থাকায় দৃশ্য মনোরম। ওখান থেকে অল্প কয়েক মাইলের মধ্যেই করবাইনস্ কোভ—যেখানে সবাই স্নান করতে যায়। দিব্যি নারকেলের বাগান আর সমুদ্রের বেলাভূমি, যাকে ইংরেজীতে বলে 'বীচ্'। তবে পুরীর মত অত বড় ব্যাপার নয়—কিন্তু অনেক নিরাপদ। ঢেউগুলো দাপটে ও আকারে অনেক ছোট হওয়ায় বেশ আরামে স্নান করা যায়। আনাড়িদের পক্ষে স্বর্গ! দূরে দেখা গেল স্নেক আইল্যাণ্ড! বন-ভোজন করতে চাইলে করবাইন্ দিব্যি জায়গা! দু'-একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবারকে ছোট লঞ্চে স্নেকের দিকে এগোতে দেখা গেল।

সমুদ্রের ধারে নারকেল গাছ যথেষ্ট থাকায় স্নান করে প্রাণ ঠাণ্ডা করা যায় ডাবের জল খেয়ে। একটা ছোট ঘরও রয়েছে—আর আছে তোমাদের প্রিয় 'স্লিপ্ বা ছড়ছড়ি। এ ছাড়া অনেকে ব্রুক্সাবাদেও স্নান করতে যান। তবে ওখানকার জলে পোকার আধিক্য থাকায় জায়গাটা সকলকার তত পছন্দসই নয়। অবশ্য ঝিনুক কুড়োতে হ'লে ওটি খুব ভাল জায়গা। ব্রুকসাবাদের দৃশ্যও খুব সুন্দর। কাছে গ্রামে বর্ম্মীরা আছে, আর কিছুটা দূরে পাহাড়ের পাথর ডিনামাইট দিয়ে ফাটিয়ে

খোয়া তৈরি হচ্ছে রাস্তা বা সেতু বানাবার জন্য। এ ছাড়া রঙ্গুচঙ্গ প্রভৃতি অনেক দর্শনীয় জায়গা রয়েছে সমুদ্রের ধারে ধারে।

পোর্ট ব্লেয়ার থেকে দেখা যায় নারকেলের বাগানে ভর্ত্তি মাউণ্ট হ্যারিয়েট। লম্বা কামান নামধেয়ী একটি মোটর বোট রোজ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে ফেরীর কাজ করে—ডাণ্ডাস্ পয়েণ্ট, ব্যাম্বু ফ্ল্যাট ইত্যাদি কাছাকাছি জায়গাগুলোয়।

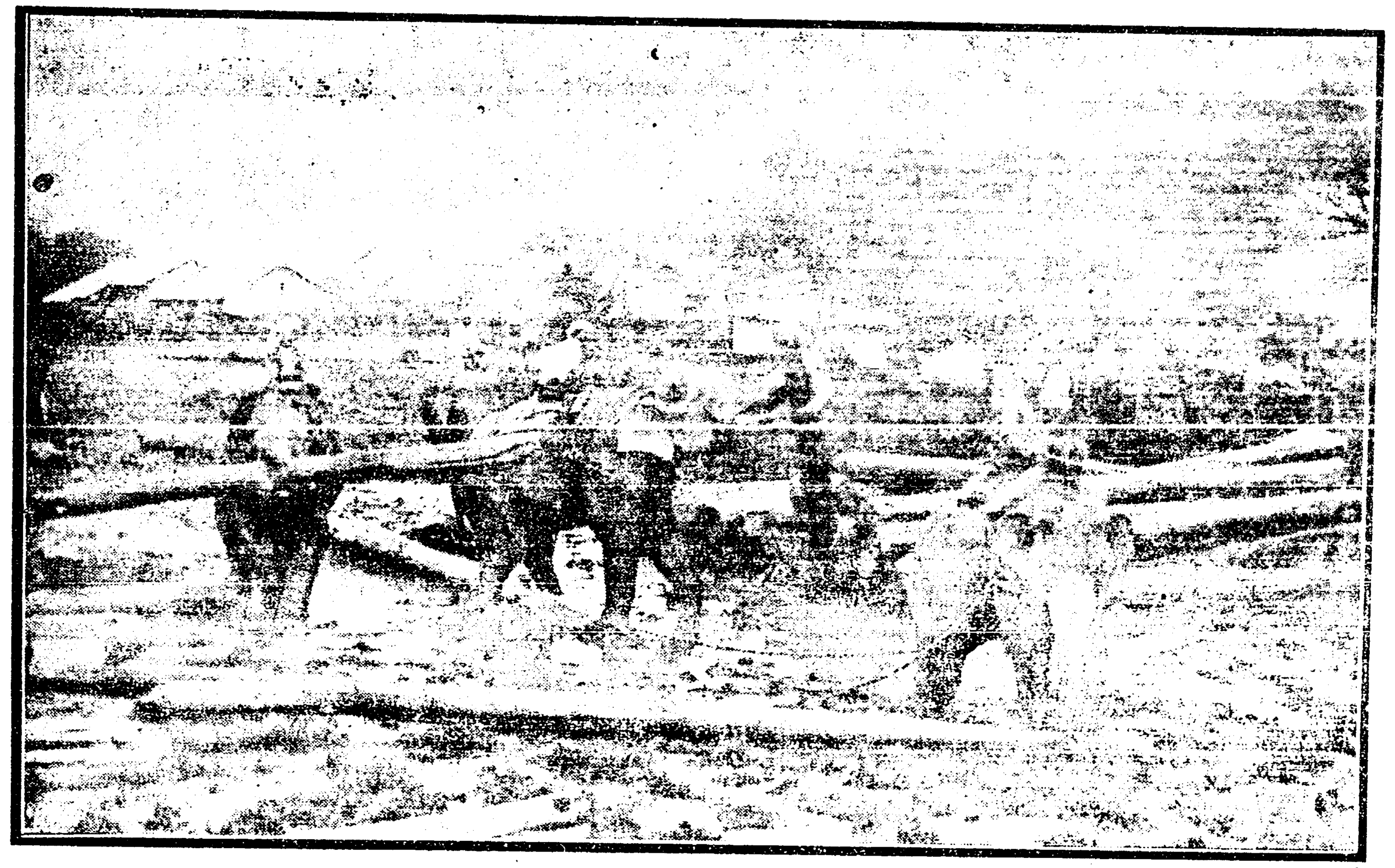

হাতীকে কি ভাবে কাঠ টানবার কাজে লাগান হয়।

পোর্ট ব্লেয়ার থেকে মোটর-রাস্তায়ও যাওয়া যায়-এ সব জায়গায় তবে অনেক ঘুরে যেতে হয়। সমুদ্র এখানে দ্বীপমালা দিয়ে তিন দিক্ ঘেরা—কাজেই জল শান্ত আর মোটর বোটে বেশ তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়। তা ছাড়া সমুদ্রের জলে বোটে চেপে দ্বীপপুঞ্জগুলি ছবির মত দেখতে লাগে, চোখ জুড়িয়ে যায়। পোর্ট ব্লেয়ার ও তার বিভিন্ন অংশও সমুদ্র-বক্ষ থেকে লোভনীয় দৃশ্য মনে হয়। এর মধ্যে ভাইপার আইল্যাণ্ডটি আবার বিচ্ছিন্ন—জলের মাঝখানে, জলযান ছাড়া যাওয়া চলে না। ওখানেই আগে জেল ছিল, এখন নানা রকম ফলে-ফুলে ভর্ত্তি।

কাছেই ডাণ্ডাস্ পয়েণ্ট আর এলিফ্যাণ্ট পয়েণ্ট (যেখানে পশুদের বিশ্রামকেন্দ্র রয়েছে)।

পোর্ট ব্লেয়ার আর কাছাকাছি জায়গায় কলের জল মেলে। দিলখামান্ ট্যাঙ্ক বলে একটা বেশ বড় জলের ট্যাঙ্কে বর্ষার জল জমা ক'রে পরে তাকে পরিশ্রুত ক'রে চালান দেওয়া হয়। জাহাজগুলো জল নেয় মাউণ্ট হ্যারিয়েটের একটি অংশ থেকে— যার নাম "হোপ্ টাউন্"। সেখানেও জল জড় করে রাখা হয়েছে। তারপর বালিতে ফিলটার করে নল দিয়ে জাহাজে সরবরাহ করা হয়।

আন্দামানে বন-বিভাগের কাজের মধ্যে বিশেষ করে চোখে পড়ে হাতীর কাজকর্ম্ম। জঙ্গল থেকে গাছের গুঁড়িগুলোকে ভেলায় চাপিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় খাল দিয়ে। তার পর হাতীর কাঁধে চেন বেঁধে দেওয়ার পর হাতী সেগুলো টেনে আনে কাঠের তৈরী একটা জায়গার উপর। তারপর চলেছে আঁকাবাঁকা পথে রেল লাইন। হাতী দিয়ে সব গাড়ি ভর্তি করার পর আবার হাতীই হয় এঞ্জিন। বেশ ২।৩ মাইল টানবার পর সেই হাতী-এঞ্জিন একটি জায়গায় হাজির হয় যেখান থেকে লাইন নেমে গেছে সোজা ঢালু নিচের দিকে। হাতী ভায়া ঠেলে দিলে কাঠের গাড়ীটি চলে যায় জলের ধারে। সেখানে আবার হাতী দিয়েই সেই কাঠগুলোকে জলে নামিয়ে ভেলায় চাপিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারে পাঠান হয়।

• দক্ষিণ আন্দামানের ধারণাও হ'ল। সেখান থেকে মাসে তু'বার দিন তিনেকের জন্য একটি মোটর বোটে মধ্য ও উত্তর আন্দামানে যাওয়া যায়। আমাদের যাবার ব্যবস্থা প্রথম করলেন ওখানকার বন-বিভাগের খ্যাতনামা অন্যতম কর্ত্তা মিঃ চাঙ্গাপ্পা,—প্রধান সেনাপতির অতি নিকট আত্মীয়। খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করায় কিঞ্চিৎ ফ্যাসাদ ঘটল। তাঁর আশ্বাস অনুসারে আমি, আমার একটি বন্ধু ও তার ভাগিনেয়—তিন বামুনে রওনা দিলাম রাত ১০টা নাগাদ চ্যাথাম জাহাজঘাটিতে। সেখানে গিয়ে দেখি কালো একটি বেড়াল। বলা বাহুল্য কুসংস্কার বাজে এবং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় প্রমাণ করার জন্য আমরা ব্যগ্র হলাম। গিয়ে দেখি বোটে তিল ধারণের স্থান নেই। বোটের সর্দার জানেও না কিছু। যা হোক্, খানিকটা বাদে জানা গেল চাঙ্গাপ্পা সাহেবের উপদেশ পেয়ে আমরা যাব এ খবরটা এসেছে তাঁর হেড ক্লার্ক মারফৎ, কিন্তু কেবিনে কোনও ব্যবস্থা নেই। যা হোক্, ডেকে বসে পড়লাম ; বেঞ্চিতে নয়, হোল্ডলের উপর। ডান দিকে দেখি মোষ, বেঞ্চিতে বর্ম্মী, চারিধারে সার্ভে পার্টির লোক। রাত বারোটায়

বোট ছাড়বে—ঝির ঝির করে একটু বৃষ্টিও চল্‌ছে। আমার সঙ্গী রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। আমিও যে খুব আনন্দ বোধ করছিলাম না এ কথা বল্‌লে সাহসিকতা না হ'লেও অসাধুতা হবে না। কিন্তু এর পর যখন ভোজপুরী গানে বেঞ্চির হু'-একটি সঙ্গীতদরদী পশ্চিম দেশীয় যাত্রী আকাশ-বাতাস মুখরিত করতে সুরু করলেন তখন আমরা বোট ত্যাগ করলুম—কেন না এর পর কি আছে দেখার খুব বেশী সখ কারও ছিল না। আর আতিথেয়তায় বিশেষ মুগ্ধও বোধ করছিলাম না। পরের দিন মিঃ চাঙ্গাপ্পা অত্যন্ত লজ্জিত,—তাতে আমরা আরও অধিক লজ্জিত।

যা হোক্, শেষ পর্য্যন্ত আমরা গিয়েছিলাম মধ্য ও উত্তর আন্দামানে; বন-বিভাগের আতিথেয়তা মুগ্ধ করেছিল তা স্বীকার করছি। ওখানকার বন-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা শ্রীযুক্ত বোস মশাইয়ের সাহায্যও স্মরণ করতে আমরা বাধ্য।

সকাল ১০টা নাগাদ মধ্য আন্দামানের লং আইল্যাণ্ডে রওনা দিলাম। আমাদের বাহনটি জাহাজ নয়, এমন কি ষ্টীমারের মত বড় কিছু নয়—একটি বড়-সড় মোটর বোট মাত্র। কেবিন হু'টো, খানিকটা খোলা জায়গা, আর নীচে পাতাল প্রবেশ করলে ডেক্। পাতালের সাথে কোনও তফাৎ নেই—এমনি অন্ধকার এবং অপরিষ্কার। নবনিযুক্ত ওয়্যারলেস্ অপারেটার সেখানে কাজ করছিল। —করুণ দৃশ্য!

লং আইল্যাণ্ড যেতে লাগল আট ঘণ্টা। বোটে কেবিন ছাড়া খানিকটা খোলা জায়গা রয়েছে—সেখানে বেঞ্চ পাতা। নানা দ্বীপপুঞ্জের ধার দিয়ে চল্‌ল লঞ্চটি। সোল্‌বে—নীল—হ্যাভেলক ও অনেক ছোট বড় দ্বীপমালা চোখ মেল্‌লেই দেখা যায়। ঢেউয়ের তোড় ক্রমবর্দ্ধমান, কারণ গাতটা উত্তর-পূর্ব্ব দিক্ দিয়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দোদুল্যমান বোটে সমুদ্র আর দ্বীপমালার দৃশ্য চোখে পড়ে। ইতিমধ্যে কেবিনে ঘুমের চেষ্টা করছি, হঠাৎ শুনলাম একটি বড় মাছ ধরা পড়েছে। ক্যামেরাটি নিয়ে তৎক্ষণাৎ বাইরে গিয়ে মৎস্যবিজয়ী খালাসী সহ সুদীর্ঘ মাছটিকে লেন্সে প্রতিফলিত করে নিলাম। একটু নড়তে চড়তে ইচ্ছা হ'ল। বেঞ্চে বস্‌তে গিয়ে দেখি একটি ভদ্রলোক বসে আছেন। প্রশ্ন করলাম, 'বসতে পারি?' উত্তর হ'ল, 'স্বচ্ছন্দে।' ভদ্রলোকটি অত্যন্ত অমায়িক। বিনা চেষ্টায়ই আলাপ জমে উঠল। জান্‌তে পারলাম তাঁর নাম ডাঃ তুকারাম। তিনি ছিলেন বর্ম্মা দেশে (যদিও মলয়ালমের অধিবাসী বোধ হয়) বহু দিন। বাড়ি-ঘর, ডাক্তারি

সব ছেড়ে গত যুদ্ধের সময় তিনি পায়ে হেঁটে চলে আসেন বাংলা দেশে। অনেক কষ্টকর পথ পায়ে হেঁটে তাঁর স্ত্রীও ওই ভাবেই আলাদা চলে এসেছিলেন। তাঁদের কাছে যা শুনলাম তা শুনলে বিশ্বাস হ'তে চায় না। জোঁকের কামড় খেয়ে, রোগে ভুগে, রাতে জড়াজড়ি করে থেকে সকালে সহযাত্রীকে অসাড় ও মৃত অবস্থায় পেয়ে, ফেলে রেখে, আবার দুর্গম পথে রওনা হ'তে হ'ত। তাঁদের কাহিনীতে পাষাণ হৃদয়েও বোধ হয় অশ্রুধারা ছোটে। ভদ্রলোক ঘটনাচক্রে আন্দামানে ডাক্তারী নিয়ে আসেন। এখন লং আইল্যাণ্ডের ডাক্তার।

আর শোনা গেল তাঁর কাছে, সুভাষ বোসকে ও অঞ্চলের লোকে কী শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে দেখেন।

আন্দামানের বাকি গল্প আর একদিন শোনাব।

এই ঠিক পিকনিক

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি.এল্

আমাদের সুদাসকে এক নজর দেখলেই আর সন্দেহ থাকত না যে সে-ই আমাদের পালের গোদা। আমাদের আড্ডা বসত তাদেরই বৈঠকখানায়।

একদিন বর্ষার সন্ধ্যা, আড্ডা জমেছে। চায়ের কেটলি আর মুড়ির থালা প্রায় খালি হয়ে এসেছে। এ-কথা সে-কথার মধ্যে ভূপতি হঠাৎ বলে উঠল, চ', এই রোববার একটা পিক্‌নিক করে আসা যাক!

কথাটা চট করে অনেকেরই মনে ধরে গেল। কিন্তু বরাবরই দেখে এসেছি যে সুদাস সহজে কোনও কথায় সায় দেয় না। কোনও কথার প্রথম ধাক্কায় তাকে টলানো শক্ত, কিন্তু একবার টলেছে তো আর রক্ষা নেই,—পাহাড়ে ধ্বস্ নামবার মত করে সে আশপাশের সব জিনিষের আগে গড়িয়ে চলে যাবে।

ভূপতির কথায় সে প্রথমে বললে, তবেই হয়েছে! এই বাদলায় চড়ুইভাতি? তুই একবার কবরেজ দেখা রে, পতে! তোর বায়ু চড়ে গেছে।

কানাই অমনি পোঁ ধরলে, হবেই তো! শাস্ত্রেই লিখেছে, প্রাবৃষি বায়ুঃ।

ভূপতি তখন সুদাসকে বোঝাতে লাগল: শরৎকালে যখন আকাশে ধুন্ধুলার চিহ্নমাত্র নেই, তখন কে না দিগ্বিজয়ে বেরোতে পারে? কিন্তু বর্ষার দিনে বনভোজনে যে অজানার আকর্ষণ আছে—

বাধা দিয়ে সুদাস সংক্ষেপে বললে, তোর অজানার কাঁথায় আগুন!

আরও কিছুক্ষণ বোঝাবার পর সে খানিকটা রাজী হয়ে বললে, বেশ, তোরা তা হ'লে যে ঘাটে ইচ্ছে হয় মর গে যা, আমাকে আর ডাকিস নি এর ভেতর কাঁধ দিতে।

কিন্তু, কবি যে বলেছেন, 'উৎসাহে কি না হয়, কি না হয় চেষ্টায়?'—সে কথাটা বড় মিথ্যে নয়। কেননা আরও কিছুক্ষণ লেগে থাকবার ফলে সুদাস ভেবে-চিন্তে বললে, আচ্ছা, কারু বাড়ীতে-টাড়ীতে হয় তো না হয় আমি যেতে পারি, বনে-বাদাড়ে জলে-কাদায় যাওয়া আমার পোষাবে না বলে দিচ্ছি। তা হ'লে আগে বল, কি খাওয়া হবে?

বুঝলাম যে এতক্ষণে ধ্বস্-এর ফাটল দেখা দিল।

কি খাওয়া হবে? পোলাও-কালিয়া খেতে তো কারু আপত্তি নেই, কিন্তু গোড়ায়ই যে গলদ! নিজেরা রেঁধে খেতে হবে তো, অথচ বন্ধুরা সবাই সে বিদ্যেয় একেবারে মহা-পণ্ডিত। কাজেই, অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করা হ'ল—লুচি আর বেগুন ভাজা। লুচিও অবশ্য কেউ কখনও নিজের হাতে ভাজে নি, কিন্তু কে না জানে যে ঘি, ময়দা আর চেষ্টা থাকলেই লুচি বানানো যায়?

এখন, সুদাস মানুষটা একটু পে—, মানে, এই খাওয়াদাওয়া ব্যাপারটা একটু পছন্দ করে, আর কি! কিন্তু সে বিষয়ে কারু কিছু বলাটা সে পছন্দ করে না, তাই আমিও সে কথা তোমাদের বলছি না। সে প্রায়ই দুঃখ করে বলত যে তার পেটের ভেতর আজে-বাজে নাড়ীভুঁড়ি বত্রিশ হাত না থেকে যদি পেটের থলিটা আর একটু বড় হ'ত, তা হ'লে সাধ মিটিয়ে খাওয়া যেত! কিন্তু ভগবানের কি একটা বিবেচনা আছে?

কাজেই আমাদের খাওয়ার ফর্দ্দ শুনে সে নিতান্ত মর্ম্মাহত হয়ে বললে, খে—লে কচুপোড়া! যত্তো সব অপদাৰ্থ বৈরিগীর দল জুটেছে, এরা করবে পিকনিক! যা, যা, ঘাস ছিঁড়ে খে গে যা গড়ের মাঠে! একটা ফূর্ত্তি করতে যাওয়া হচ্ছে, কোথায় দু'টো ভাল-মন্দ জিনিষ দাঁতে কাটতে পাবো, তা নয়, খালি পান্তাভাত আর পুঁই-চেঁচকির যোগাড় হচ্ছে। রাঁধতে হবে, এই ভয়েই ব্যাটারা মোলো!

তাকে তেতে উঠতে দেখে ভরসা পেয়ে আমরা বললাম, বটে, বটে? বলি, ম্যাও ধরে কে? তুই পারবি রাঁধতে?

সুদাস বীরদর্পে বলে উঠল, আল-বাৎ! দে না ছেড়ে এবার আমার ওপরে সব! তোদের এবার লুচি-পাঁঠা খাইয়ে তবে ছাড়ব।

কথাটা শুনে সকলের তাক লেগে গেল। দেবেশ বললে, সে কি রে? মাংস রান্নার কি জানিস তুই?

সুদাস অবলীলাক্রমে জবাব দিল, য্যা-য্যাঃ! জানতে আবার কি হাতী-ঘোড়া লাগবে? বাড়ীতে একটু জিগ্‌গেস করে নিলেই হবে 'খন। হ্যাঁ, ভাল কথা! চাঁদা-টাঁদাগুলো সব আমার হাতেই দিয়ে যাস। দেখে-শুনে সব কিনতে হবে তো আমাকেই! কাঁচা মালই হ'ল গিয়ে আসল কথা, রান্নাটা কিছু নয়, বুঝলি? গোড়া বেঁধে কাজটা হ'লেই, ব্যস্!

বুঝলাম যে এইবার ধ্বস্ নামতে সুরু হ'ল। উঠে পড়লাম।

বনভোজনের জায়গা ঠিক করা হয়েছিল গঙ্গার ধারে এক বাগানে। রবিবার যথাসময়ে সেখানে পৌঁছে দেখি যে সুদাস তখনও আসে নি, বোধ হয় ধীরেসুস্থে গোড়া বাঁধছে। আর সবাই হাজির, তাস, সতরঞ্চি, গ্রামোফোন ইত্যাদি সুদ্ধ। গ্রামোফোনের পিন আনা হয় নি, কিন্তু তাই বলে কি গান শোনা হবে না? এই ভেবে গ্রামোফোনের বাক্স চাপড়ে গান ধরেছে পরিতোষচন্দ্র। তাস খেলছে চারজন, তাদের পরামর্শ দিচ্ছে ন'জন। আগেকার দানে কি না খেললে কি হ'তে পারত অথবা না পারত, তাই নিয়ে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর একবার করে হাতাহাতির উপক্রম হচ্ছে।

কিন্তু সবাই তো আর কুঁড়ে মানুষ নয়, মাংস রান্নার কাজ এগিয়ে রাখতে ব্যস্ত রয়েছে চার-পাঁচজন। হাতা আর খুন্তির তফাৎ না জানলে কি হয়, তারা কোমর বেঁধেছে যে সবটা বাহাদুরী একা সুদাসকে নিতে দেবে না।

লুচির আয়োজন যেখানে, সেখানে আর এক বিপর্য্যয় ব্যাপার। একখানা কাঠের পরাতে ময়দা ঢেলে নিয়ে মাখতে বসেছে পালোয়ান সুবলচন্দ্র। ঝড়ে-উপড়ে-আসা দুই তালগাছের মত তার দুই পা সেই পরাতের দু' পাশে ছড়ানো। ময়দায় জল দিচ্ছে মাণিক, আর সুবলের মাথায় বুদ্ধি দিচ্ছে বৈজ্ঞানিক দেবেশ। জল, পরামর্শ এবং চেষ্টার বিরাম নেই, তবু কিছুতেই আর মনের মত করে মাখা হচ্ছে না ময়দাটুকু। বিরক্ত হয়ে শেষটায় দেবেশ বললে, আরে বাবা, এ কি ছেলের হাতের মোয়া পেয়েছ? যেদো-মোধো যাকে তাকে দিলেই হ'ল ময়দা মাখতে? এ হচ্ছে গিয়ে যাকে বলে একটা দস্তুর মত সায়েন্স—আহা হা, ও কি?

মানে, মাণিক ততক্ষণে বুঝেছে যে এ সব কাজ ছিটেফোঁটা জলের কর্ম্ম নয়, তাই সে একেবারে ঘটী উপুড় করে ধরেছে। জলে ময়দায় একেবারে থৈ-থৈ! ময়দা ভেসে যায় দেখে সুবল, আর খাওয়া ভেসে যায় দেখে বাদ বাকী সবাই, মহা তম্বি করতে লাগল মাণিককে। সে তাতে কিছু মাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বললে, থাম্, থাম্, তোরা ঘাবড়াচ্ছিস কেন অত? ঐ তো একটুখানি জল, দেখ না এখুনি চোঁও করে টেনে যাবে।

যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত কোনও রকমে ময়দা মাখা আর লেচি পাকানো হ'ল। তারপর লুচি বেলতে বসলাম আমি। ভেবেছিলাম যে এ অতি সোজা কাজ, বেলন দিয়ে লেচির বাছাকে একবার চেপে ধরতে পারলেই কাজ ফতে। কিন্তু চাপতে গিয়ে দেখি যে আর সব রকমই হচ্ছে, কিন্তু লুচির মত হয় না কিছুতেই! তাই দেখে বন্ধুরাও নানা কথা বলতে লাগল। এ একবার বলে, 'এই আফ্রিকার ম্যাপ হ'ল,' ও আর একবার বলে, 'দিল্লীকা দরবার দেখো'। হিংসুটে লোক তো, বোঝে না যে 'রূপেতে কি করে তার গুণ যদি থাকে?'

আমি তাই সে সব কথায় কান না দিয়ে নিজের কাজ করে যেতে লাগলাম। কিন্তু তারপর লুচিখানা তুলতে গিয়ে দেখি যে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেল। তাই এর পরের বার চাকীর ওপর শেষ করে খানিকটা তেল ঢেলে নিয়ে তার ওপর লেচিটিকে বসালাম। তারপর……

তারপর উবু হয়ে বসে লেচিটিকে সজোরে চেপে ধরতে যেতেই লেচির সবেগে প্রস্থান, আমার হুমড়ি খেয়ে পতন, আর পুলকিত বন্ধুদের 'সামাল্ !' 'সামাল !' বলে একযোগে চীৎকার। আমি পাছে নিজেই নিজেকে সামলে নিই, তাই বন্ধুরা তাড়াতাড়ি আমাকে উলটানো তেলের বাটী আর ময়দার ঠোঙার ওপর দিয়ে হিঁচড়ে টেনে তুলল। মাণিক তাড়াতাড়ি কলসীর বাকী জলটুকু আমার মাথায় থাবড়ে দিয়ে বললে, চ্চ, চ্চ গরমে ভিরমী লেগে গিয়েছিল বুঝি? একটু ভাল বোধ করছিস তো এখন?

সাঁতারু কার্ত্তিকচন্দ্র আহ্লাদে গদগদ হয়ে বললে, যা ফাস্ ক্লাস্ একখানা ডাইভ নিয়েছিলি, ওফ্ !

আর কানাইটা চেঁচিয়ে বাগান মাথায় করে ফেললে,—এ ক্যামেরা! এ ক্যামেরা! এ কিংডম ফর এ ক্যামেরা!

আরও কিছুক্ষণ হয়তো চলত, কিন্তু সকলের দৃষ্টি এই সময়ে ফিরে গেল পরিতোষচন্দ্রের ধোপা-চমকানো চীৎকারে,—'এসেছে! এসেছে!'

চেয়ে দেখি যে সুদাস থপ থপ করে ঘরে ঢুকছে, মুটের মাথায় তার কাঁচামালের ঝুড়ি। দেরী হয়েছে বলে লজ্জা পাওয়া দূরে থাকুক. সে এসেই বললে, এই মরেছে! সব ভণ্ডুল করে রেখেছিস তো, বাওয়া? যত্তো সব গাবের ঢেঁকি! যেটা আমি নিজে না দেখব, সেই কাজটাই গড়বড় করে ফেলবি, তা আর জানি নে! যাক, এসে যখন পড়েছি, তখন আর ভাবনা নেই। 'সরল বাদশাহী রসুই পদ্ধতি' থেকে সব নোট করে নিয়ে এসেছি একেবারে। এই যে—

রান্না শেষ হ'তে হ'তে প্রায় দু'টো বাজল। জুতোর সুকতলার মত লুচি, কাঁচা অথবা পোড়া বেগুন ভাজা, আর সুদাসের সরল বাদশাহী মাংস। অশোক বললে যে খাওয়াটা গঙ্গার ধারে বসে হোক। নিবারণও বললে, গঙ্গার ঘাটে নইলে এ পিণ্ডি-গেলা মানাবে কেন? যাই হোক, পাতা ফেলবার সুবিধে হবে, এই ভেবে গঙ্গার ধারেই খেতে বসা হ'ল। খেতে বসে জানা গেল যে মাংসের জন্য কোটা পেঁয়াজ ভুলে মাংসেতে দেওয়া হয় নি। সুদাস তা নষ্ট হ'তে দিল না, সকলের পাতে দিয়ে গেল।

এই অপূর্ব্ব খাওয়ার খবর কি করে রটে গেল জানি না, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই মেঘেরা দলে দলে এসে আমাদের মাথার ওপর ভিড় করে দাঁড়িয়ে আমাদের খাওয়া দেখতে লাগল। সে দৃশ্য দেখে মেঘেদের কষ্ট হয়েছিল নিশ্চয়. কেন না দেখতে দেখতে তারা চোখের জল ফেলতে সুরু করল। কাজেই ভিজতে ভিজতে বারান্দায় এসে খাওয়া শেষ করলুম।

নিজের হাতের রান্না খেয়ে সুদাস নিজেই এতটা মর্ম্মাহত হয়ে গেল যে সে আর কখনও কোনও পিকনিকের রান্না রাঁধতে চায় নি। চাইলেও যে আমরা দিতুম না, সে কথা বোধ হয় বলতে হবে না।

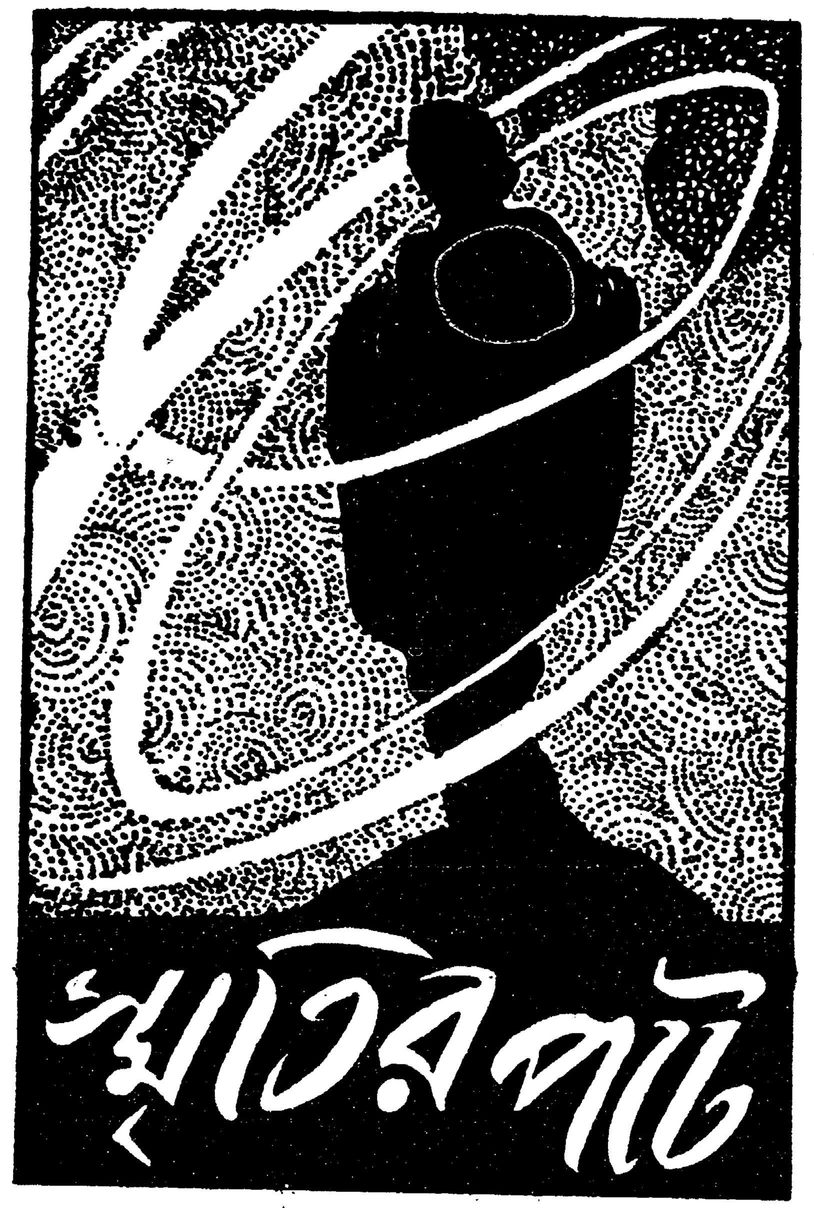

সেকালের গল্প

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,
এম্.এ, বি এস্-সি.

প্রথমেই আমার গল্প সম্বন্ধে একটু ভূমিকা প্রয়োজন মনে করি। অনেক বৃদ্ধ বলেন, সেকালে অর্থাৎ যে কালে তাঁহারা ছোট ছিলেন— ছাত্র ছিলেন সেটা সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের কোনও একটা কাল ছিল, দুষ্ট কলিকাল ছিল না। অর্থাৎ সে সময়ে তাঁহারা আদর্শ ছাত্র ছিলেন, আদর্শ পুত্র ছিলেন এবং সে সময়ের শিক্ষক ও শাসকবর্গও আদর্শ ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের কাহিনী ভুলিয়া যান। ভুলিয়া যান— তাঁহারা যাহা করিয়াছিলেন বা দেখিয়াছিলেন বা শুনিয়াছিলেন তাহার অনেকখানিই প্রকাশের যোগ্য নহে। মানুষের ছয় রিপু তখনও ছিল, এখনও আছে! ভালর সংখ্যা সে কালেও কম, একালেও কম। ভীষ্ম, যুধিষ্টির সেকালেও বেশী ছিল না। কখনও নিজেদের এবং নিজেদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে মন্দ ভাবিবে না। জীবন-সংগ্রামে কৃতকার্য্য হইতে হইলে এই সকলের মধ্য দিয়াই বড হইতে হইবে। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে 'মন্দ কারিগর তাহার যন্ত্রকে নিন্দা করে।'

যাক্, আজ কোনও গুরুগম্ভীর কথার অবতারণা না করিয়া সেকালের অর্থাৎ প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার আমাদের ছাত্রজীবনের শিক্ষক, ছাত্র এবং পরীক্ষা সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলিব।

আমাদের কয়েক বছর পূর্ব্বে যাঁহারা ছাত্র ছিলেন তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ইউরোপীয় অধ্যাপকদের প্রতি গদগদ ভক্তিমান্ দেখিয়াছি। আমরা কিন্তু ছিলাম বাংলা দেশের বৈপ্লবিক যুগের ছাত্র, কাজেই আমাদের ও সকল মোহ

ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আর এমটি কারণে আমার প্রাচীনের প্রতি অহেতুক শ্রদ্ধা-ভাব কমিয়া গিয়াছিল। আমাদের স্কুলের এক শিক্ষক মহাশয় সময়ে ও অসময়ে বলিতেন, "আজকালকার ছেলেদের লেখাপড়া কেমন ক'রে হবে? এখন আর সে লেনির গ্রামারও নেই, বার্ণার্ড স্মিথের পাটিগণিতও নেই।" ঐ দুই বই তাঁহারা বাল্যকালে পাঠ করিয়াছিলেন। উহাদের অভাবেও যে পণ্ডিত হওয়া যায় তাহা তাঁহারা ভাবিতে পারিতেন না।

সেকালের কয়েকটি অধ্যাপকের চিত্র উল্লেখ করিলে হয় তো মন্দ লাগিবে না। (নামগুলি দিলাম না, কারণ যদি কেহ ভক্তিমান্ থাকেন তাঁহাদের হয়তো আঘাত লাগিবে)।

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ক—সাহেব ছিলেন পথার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক। ইঁহাকে দেখিতাম ক্লাসে আসিয়াও প্রায় দশ-পনের মিনিট ধরিয়া বই পড়িতেন। সহকারী অর্থাৎ য়্যাসিষ্টাণ্ট সেই সময়ে ছাত্রদের দেখাইবার পরীক্ষাগুলি সাজাইতেন। সাহেবের নিজের স্মরণ-শক্তির উপর বোধ হয় তেমন আস্থা ছিল না। পাছে ভুলিয়া যান এই ভয়েই বোধ হয় পড়াইবার বিষয়গুলি আবার পুনরভ্যাস করিতেন। এই অধ্যাপকটি অত্যন্ত কোপন-স্বভাব ছিলেন। সহকারীর সামান্য ত্রুটি হইলেই চেঁচামিচি করিতেন। ফলে সে ভদ্রলোক অত্যন্ত নার্ভাস হইয়া পড়িতেন, আর পরীক্ষাও অকৃতকার্য্য হইত।

আর একজন অধ্যাপকের কথা মনে পড়িতেছে। ইনিও ছিলেন পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক। সাহেব ন'ন—বাঙ্গলী। ভাল পণ্ডিত বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল। গলায় বেশ জোর ছিল। ছেলেরা কিন্তু তাঁহার ক্লাসে বড় গোল করিত। তিনি ভাবিতেন উচ্চৈঃস্বরে পড়াইয়া ছেলেদের গোলমাল ডুবাইয়া দিবেন। ফলে

তিনিও যত চেঁচাইতেন ছেলেরাও তত চেঁচাইত। সমস্ত ক্লাস জুড়িয়া এক প্রবল হট্টগোল উপস্থিত হইত। ইনি পরে এক মফঃস্বল কলেজে গিয়া নাম করেন।

আর একজন অধ্যাপকের কথা বলিব। ইনি ছিলেন গণিতের অধ্যাপক। ছোটখাট মানুষটি, প্রথম বয়সে সুকুমার-আকৃতি ছিলেন। একজন নূতন অধ্যাপক ক্লাসে অপমানিত হইয়া উক্ত অধ্যাপকের কাছে বিলাপ করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "ওহে বাপু, দিন কতক সবুর কর, ক্রমশঃ সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে গোড়ার দিকে একদিন ছেলেদের কাছে চাঁটি পর্য্যন্ত খেতে হয়েছিল।" এ গল্পটি আমার এক বিশ্বাস্য সহপাঠীর কাছে শোনা।

মফঃস্বলের এক অধ্যাপকের কথা মনে পড়িতেছে। বছর খানেক তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই। দেখিলাম ইতিমধ্যে তাঁহার প্রকাণ্ড দাড়ি গজাইয়া গিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তর হইল, "একবার কলেজের একটা ফুটবল ম্যাচ দেখছি, এমন সময় আমার কাঁধের উপর একটি হাতের চাপ অনুভব করলাম। মুখ ফেরাতেই দেখি একটি ছাত্র। সে অবশ্য অপ্রস্তুত হয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু মনে হ'ল তার এই কাঁধে হাত রাখা নিতান্তই ভুল করে নয়। কাজেই যাতে পরে আর এ রকম ভ্রান্তি না হয় সে জন্যই এই দাড়ির চাষ করছি।"

সেকালকার পরীক্ষা গ্রহণ-প্রণালীও যে খুব আদর্শ ছিল এমন মনে করিবার কারণ নাই। নীচের ঘটনা কয়টি হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। এগুলি ফিজিয়লজি বা শারীর বিধান বিভাগের ঘটনা। আমার নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ।

(ক) একটি ছেলে ভাল পড়াশুনা করিত না। টেষ্টের পরে তাহাকে অনার্স ছাড়িয়া দিতে বলা হয়। একদিন ছেলেটি আমার কাছে উপস্থিত। তাহাকে 'অনার্স' পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিতেই হইবে—একেবারে নাছোড়বান্দা। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার বাড়ীর অবস্থা কি রকম?" সে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কথা বলছেন কেন?" বলিলাম, "একবার ফেল হওয়ার পর আর পড়া চালাবার মত সঙ্গতি আছে কিনা?" সে বলিল, "তা আছে।" তাহাকে বই আনিতে বলিলাম। কতকগুলি জায়গায় দাগ দিয়া সেগুলি মুখস্থ করিতে বলিলাম। ছেলেটি অনার্স লইয়া পাশ হইল। অথচ সে ইহার একবারেই উপযুক্ত ছিল না।

(খ) একবার একজন পরীক্ষক এমন সব প্রশ্ন করিলেন যে সব ছেলেই পরীক্ষায় খারাপ করিল। পর বৎসর পরীক্ষকের মনস্তত্ত্ব অধ্যয়ন করিলাম। দেখিলাম, যত কিছু নতুন বা কুটকচালে তাহারই দিকে তাঁহার ঝোঁক। বিশেষতঃ গণিত সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উপর মমতা যেন বড় বেশী। ছেলেদের সেই সকলগুলির

প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে বলিলাম। অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনীয় জ্ঞান বাধ্য হইয়া অনেকখানি বর্জ্জন করিতে হইল। ছেলেরা ফিজিয়লজি কিছুই শিখিল না, কিন্তু সকলেই পরীক্ষায় ভাল করিল।

(গ) এম্. এস্-সি পরীক্ষায় একটি ছেলে দু'বৎসর কিছুই প্র্যাক্‌টিক্যাল করে নাই। শেষে মাস দুই থাকিতে আসিয়া কাজ করিবার উৎসাহ দেখাইল,—কর্ম্ম-নির্দ্দেশ চাহিল। কতকগুলি কাজ করিতে বলিলাম। ভাবিলাম, উহা করিতে পারিলে কোনও রকমে পাশ হইয়া যাইবে। পরীক্ষার দিন। সব চেয়ে যে ছেলেটি ভাল প্র্যাক্‌টিক্যাল করিত সে এমন মুখ নিয়া পরীক্ষা-গৃহে উপস্থিত যেন পরীক্ষায় মন্দ করিলে সর্ব্বনাশই হইবে। অত্যন্ত নার্ভাস। কিন্তু আগে যে ছেলেটির কথা বলিয়াছি সে বেপরোয়া ভাবে কাজে করিতে লাগিল। পরীক্ষার ফল দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। সে-ই সব চেয়ে বেশী নম্বর পাইয়াছে।

(ঘ) একটি ছেলে ডাক্তারী পড়িত ও সেই সঙ্গে ফিজিয়লজিতে এম্. এস্-সি পড়িত। সে বলিল তাহার বেশী সময় নাই, একটা সহজ পড়া বাতলাইয়া দেওয়া হউক, যাহাতে সে এম্. এস্-সি পাশ হয়। ছেলেটি ভাল, বি. এস্-সিতে অনার্স পাইয়াছিল। তাহাকে বি. এস্-সির বইখানিই আবার ভাল করিয়া পড়িতে বলিলাম। সেও আর কিছু না পড়িয়া সেইটি লইয়া রহিল ফল বাহির হইলে দেখা গেল সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে।

(ঙ) আর একটি ছেলে, সে কয়েক বছর হইল মারা গিয়াছে বলিয়া নামটি করিতেছি। নগেন দাস। ফিজিয়লজিতে এম্. এস্-সি পাশ করিয়া ট্যানারী বিভাগে চাকরী পাইয়াছিল। ঐ বিভাগের একজন বড়কর্ত্তার নিকট শুনিয়াছিলাম সে ঐ বিভাগের বেশ ভাল কর্ম্মী হইয়াছিল। নগেন দাস ছাত্রাবস্থায় অধ্যাপকদের সন্ত্রাসের কারণ ছিল। কলেজ লাইব্রেরীর ফিজিয়লজি ও তৎসম্পর্কীয় বিষয়ের সকল বইই সে পড়িয়া ফেলিয়াছিল, এবং সেই সব পুস্তকের দুরূহ অংশের আলোচনা করিয়া অধ্যাপকদের ব্যতিব্যস্ত করিত। ফিজিয়লজি সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান দেখিয়া অবাক্ হইতে হইত। অথচ, পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, ছেলেটি পরীক্ষায় কিছুই করিতে পারে নাই। পাশ করিয়াছে তৃতীয় শ্রেণীতে, তাহাও নীচের দিকে।*

---

* প্রেসিডেন্সী কলেজ শারীরবিধান বিদ্যার (ফিজিয়লজি) ছাত্রগণের বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ (সামান্য পরিবর্ত্তিত)।

জীব-জগৎ

ছবির জন্তুগুলিকে চিনতে পার?

এদের কি এখনও দেখতে পাওয়া যায়? মনে মনে জবাব ঠিক ক'রে শেষ পৃষ্ঠার সঙ্গে মিলিয়ে দেখ।

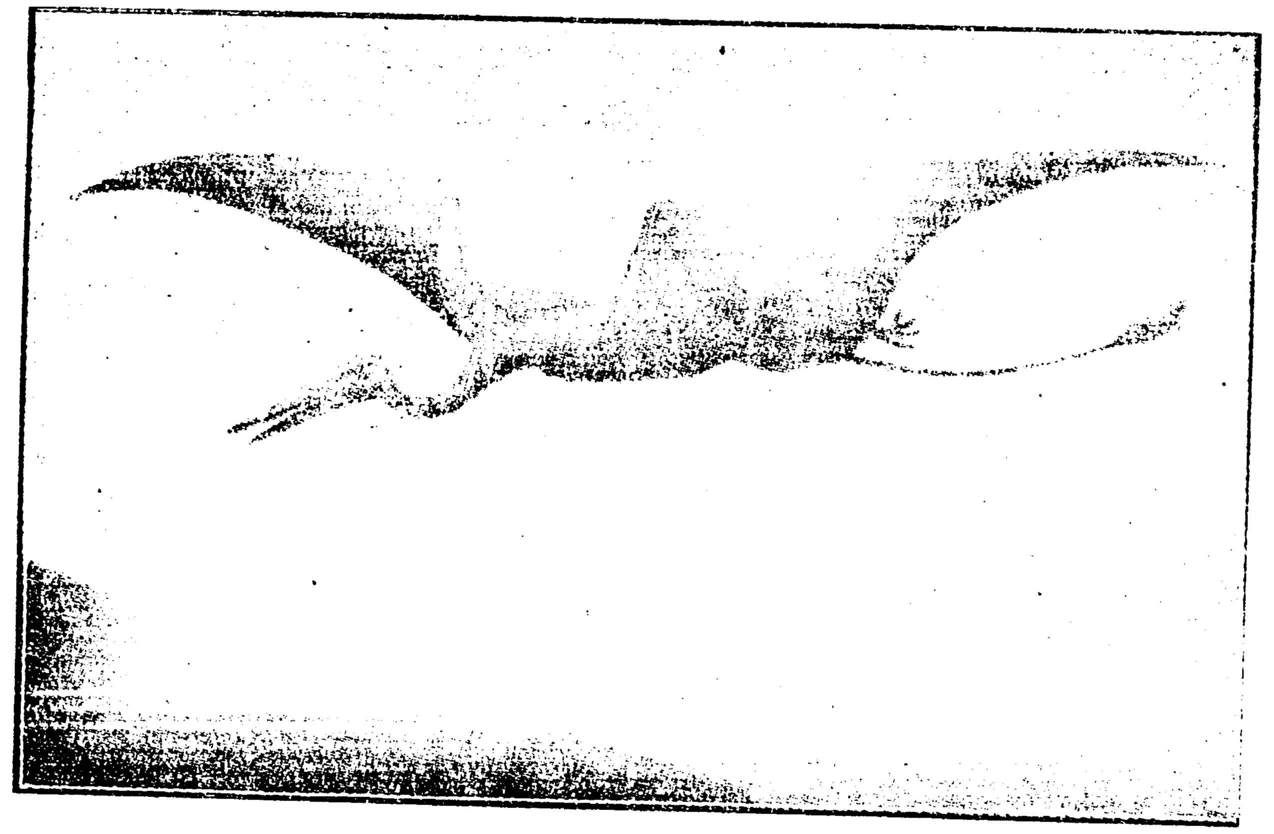

পঞ্চাননের বিড়ম্বনা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ছোট ভাই এককড়িকে নিয়ে পঞ্চানন বড় মুশকিলে পড়েচে। পড়াশুনোর দিকে ছেলেটার মন তো নেই-ই, তার ওপর খুব পাকা পাকা কথা! প্রত্যহ বড়দের মুখে ফাঁকা কথা শুনে শুনে লোকে এমনিতেই অস্থির, ছোটদের মুখে পাকা কথা যে অসহ্য হবে এর মধ্যে আশ্চর্যের কি আছে? তাই এককড়ি ধমক খায়, চড়-চাপড়ও তার পায়ে ও পিঠে পড়ে মন্দ নয়। তবুও ছেলেটা শোধরায় না, যেন ও শোধরাবার নয়।

একদিন সন্ধ্যার পর সে ফিরে এল, হাতে একটা মাছ।

পঞ্চানন তখন সবে আফিস থেকে ফিরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে চা ও মুড়ি খেতে বসেছে। এককড়িকে দেখেই সে চায়ের চেয়েও গরম হয়ে উঠলো; বললে, "আজ সারাদিন কি করেচো?"

এককড়ি হাতের মাছটি ঘরের সামনে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললে, "মাছ ধরেচি—"

"মাছ ধরলেই চলবে?"

"সকালে মাছ আসে নি। সকলের খাওয়া চলবে।"

এ কথায় কার না রাগ হয়? পঞ্চাননও রেগে উঠলো; বললে, "শূয়ার! মুখে মুখে চোপা? মাছ আসে নি কেন, তার খোঁজ রাখো?"

"রাখি। পয়সায় কুলোয় নি বলে।"

"মাছ ধরলেই পয়সা আসবে?"

"এই মাছটা বেচে আমি এখনই তিন টাকা আনতে পারি—যদি আমার হাতে দাঁড়ি-পাল্লা থাকে।"

পঞ্চাননের রাগ একটু কমে গেল, বললে, "মানে?"

"যে মাছের সত্যিকারের ওজন এক সের, বাজারের মেছোদের পাল্লায় চাপালেই তা হয় এক সের পাঁচ ছটাক।"

ইতিমধ্যে এককড়ির বউদি এসে বললে, "কত বড় মাছ! বেশ হয়েচে। আজ-কাল দু'-দিন হবে।"

পঞ্চানন বললে, "ওর মাথাটা খেলে তুমিই—"

এককড়ির বউদি কোন উত্তর না দিয়ে বঁটি ও ছাই এনে পঞ্চাননের সামনেই মাছটি কুটতে বসলো। বঁটিতে ধার কম। একটু জোর দিয়ে একটি ফিঁচে কাটতে কাটতে বললে, "ছিপ রেখে, হাত-মুখ ধুয়ে ঐ তোমার চা-মুড়ি ঢাকা আছে, খেয়ে নাও। সারা দিন রোদে রোদে—"

এককড়ি তবুও গেল না, ছিপখানা ধরে পঞ্চাননের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো।

একগাল মুড়ি ও এক ঢোক চা মুখে নিয়ে গিলতে গিলতে চিবোতে চিবোতে পঞ্চানন বললে, "তোমার পরীক্ষা কবে?"

"এপ্রিল মাসে।"

"এমনি করে চললে পাস করতে পারবে?"

"পড়লেও যে পাস করতে পারবো তার ঠিক নেই। কত ভাল ভাল ছেলে গাড্ডু মেরেছে! আর পাস করেই বা কি হবে? আমাদের তো বড় চাকরিওয়ালা আত্মীয়-স্বজন নেই যে চাকরি করে দেবে—"

কথাগুলো শুনে পঞ্চানন কেমন যেন হয়ে গেল; চা খেতেই তার ভুল হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই বললে, "এই যে এত লোক চাকরি করছে ওদের সকলেরই কি খোঁটার জোর আছে? পড়াশুনো না করলে খাবে কি করে?

"খেটে।"

পঞ্চানন ধমক দিয়ে উঠলো; বললে, "কুলিগিরি করবে?"

এককড়ি বললে, "চাষী-মজুরদেরই যখন রাজত্ব হবে তখন ভয় কি? আর কিছু না পারি তাই করবো।"

"কি! এত বড় কথা তোমার? বেরোও—বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।"

এককড়ির বউদি মাছ কোটা রেখে বললে, "কি করচো? ছেলেটা সারাদিন রোদে তেতে-পুড়ে এল! ও তো সংসারে-সাশ্রয় করেচে।"

"রেখে দাও তোমার ছাইয়ের সংসার!"

এককড়ি ততক্ষণে দেওয়ালের গায়ে ছিপগাছি হেলান দিয়ে রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেচে।

এককড়ির বউদি মানুষটি যেমন হিসেবী তেমনি ঠাণ্ডা; বললে, "ভর সন্ধ্যাবেলা, ছেলেটাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বল্‌লে! বুঝিয়ে বললেই তো ও কথার অবাধ্য হয় না।"

"রেখে দাও তোমার বুঝিয়ে বলা। ওর ভালর জন্যে বলি, না, আমার ভালর জন্যে বলি?"

"বড়রাই নিজেদের ভাল-মন্দ বুঝতে পারে না, ও তো বাচ্চা!"

"ব্যাচ্চা!" বলে পঞ্চানন একটা বিড়ি ধারালো।

এককড়ির বউদি আর কিছু বল্‌লে না, মাছটি কুটে কলতলায় চুপড়ি শুদ্ধু ধুতে গেল। চুপড়ি, বঁটি ও মাছ ধুয়ে এনে বললে, "যদি আজ না ফেরে তো এ মাছ কি করবো?"

এককড়ি সে রাতে আর ফিরলো না। পঞ্চানন অনেক রাত্রে তাকে এদিক্‌-ওদিক্‌ খানিক খুঁজে বেড়ালো। কিন্তু কোথায় তাকে পাবে?

ইতিমধ্যে এককড়ির বউদি তিন ভাগ মাছ ওপরের ভাড়াটেদের দেড় টাকায় বেচে এল। তাদের আবার সেদিন বাড়িতে হঠাৎ জামাই এসেছিল। ওপরতলায় ভোজ ও আনন্দোৎসব হ'ল, নিচের তলায় অন্ধকার। এককড়ির দাদা-বউদির মুখে অন্ন উঠলো না।

পরদিন পঞ্চাননের সঙ্গে আমার দেখা হতেই সে সমস্ত ঘটনাটি বললে। তার সঙ্গে

আমিও এককড়িকে সম্ভব-অসম্ভব জায়গায় খুঁজে বেড়ালাম। পঞ্চানন সেদিন আফিস কামাই করলে, আর আমি তো বেকার। তবুও এককড়ির সন্ধান পেলাম না। শেষে স্থির করলাম, বেতার-কেন্দ্র মারফৎ "নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা" খাতে খবরটি সারা বাংলা দেশে ঘোষণা করে দেবার ব্যবস্থা করবো। যাদের বাড়িতে রেডিও আছে এমন কারো না কারো চোখে এককড়ির চেহারা পড়বেই। আর, যখন শুনবে এককড়ির "মাতৃভাষা বাংলা", তখন তার পিতৃভাষা যাই হোক তাকে দিয়ে কথা কইয়ে "লালবাজারে" খবর দিয়ে তবে ছাড়বে।

আমার পরামর্শ পঞ্চাননের মনঃপূত হ'ল। তবে সে একবার বললে, "কোন পত্রিকার 'নিরুদ্দেশ' কলমে দিলে হয় না, 'ভাই এককড়ি, ফিরে এস। টাকার দরকার হ'লে জানিও। —ইতি তোমার অনুতপ্ত দাদা পঞ্চানন!' তবে ওর বউদির নাম দিলে আরও ভাল হয়।"

বললাম, "হয়। কিন্তু যার লেখা-পড়ায় মন নেই সে কি খবরের কাগজ পড়বে? তা ছাড়া, তার কাছে কাগজ কেনবার পয়সা না থাকাই সম্ভব। আজকাল একখানা খবরের কাগজের দাম মানে প্রায় সাত ছটাক আলুর দাম। কিন্তু রেডিও,—বেতার-কেন্দ্র, ওর দ্বারা কি না হয়?"

"ঠিক, ঠিক।"

"তা হ'লে আজকের দিনটা দেখে কাল দুপুরে বেতার-কেন্দ্রের সবজান্তা হুজুরদের শরণ নেওয়া যাবে, কি বল?"

"বেশ।" বলে পঞ্চানন শুষ্ক মুখে চলে গেল।

বেচারী! এ দেশে অভিভাবক হওয়াও বিড়ম্বনা।

পরদিন সকালে থলি হাতে বাজারে যাচ্ছি। দেখি, কেশব সেন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে ছোট বকুল গাছটির তলায় ফুটপাথে বসে একটি ছেলে নিমের দাঁতন বেচছে। আমার চশমার পাওয়ার বাড়ানো দরকার। তাই ছেলেটিকে ঠিক চিনতে পারলাম না, আবার অচেনা বলেও মনে হ'ল না। কেমন খটকা লাগলো। তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে দেখি, এককড়ি!

বললাম, "কিরে এককড়ি? এ কি করচিস্‌? পরশু থেকে পালিয়েছিস্‌ আর তোর দাদা কত খুঁজে বেড়াচ্ছে! বাড়ি চল্‌—"

এককড়ির সামনে একটি খরিদদার এসে বসে দাঁতন বাছতে লাগলো।

এককড়ি তাকে বললে, "ওর একটা চার পয়সা, এর একটা দু'পয়সা।" তারপর আমাকে বললে, "আমি পালাই নি, দাদা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েচে।"

এদিকে তার সঙ্গে যে দাঁড়িয়ে কথা বলবো তারও উপায় নেই। কারণ খুড়োমশায়ের ভাত সাড়ে আটটার মধ্যে চাই-ই। তাঁরই অন্নধ্বংস করি। তাড়াতাড়ি বাজার সেরে বাড়ি ফিরতেই হবে। আবার, সামনেই হারানিধি। এ রকম সমস্যায় বোধ হয় মন্ত্রীরাও পড়েন না। কি করি? কার সাহায্যে ছেলেটাকে ধরে নিয়ে যাই? চেঁচামেচি করলে রাস্তায় ভিড় জমবে, একটা কেলেংকারী হওয়ার সম্ভাবনা। স্থির করলাম তাড়াতাড়ি বাজারটা সেরে পঞ্চাননকে সঙ্গে নিয়ে এসে ওকে ধরবো। ও ততক্ষণ দাঁতন বেচুক।

তবে ওকে একটু উপদেশ দেওয়া দরকার; বললাম, "তুমি ভদ্রলোকের ছেলে। এখানে বসে দাঁতন বেচছো দেখলে তোমার আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত বন্ধুবান্ধবরা কি বলবে? ছিঃ!"

এককড়ি বললে, "কত ভদ্রলোক যে জাল-জোচ্চুরি, চুরি-খুন করে দু'-হাতে পয়সা লুটচে, গাড়ি হাঁকাচ্ছে, তার চেয়ে দাঁতন বেচা কি খারাপ? তাদের তো লোকে সম্মান করে, কিছুই তো বলে না! তবে আমায় নিন্দে করবে কেন?"

দেখলাম, ছোঁড়াটা কেবল ডেঁপো নয়, একেবারে গোল্লায় গেচে।

তবুও বললাম, "দাঁতন বেচে কি লোকের পেট ভরে?"

"শুনেচি মুড়ি বেচতে বেচতে লোকে লক্ষপতি হয়েচে—"

নাঃ! এ রকম এঁচোড়ে পাকা ছেলের সঙ্গে কথা বলা মানেই নিজের মান খোয়ানো।

ছুটলাম বাজারের দিকে; কিন্তু যত ট্রাম-বাস কি এই সময়েই ছুটে এল? সেগুলোর জন্য বিশ হাত চওড়া রাস্তা পার হতে আমার লাগলো অন্ততঃ পাঁচ মিনিট।

বাজারে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাজার সেরে বাড়ি গিয়ে থলেটা ধপ্ করে নামিয়ে ছুটলাম পঞ্চাননের বাড়ি। সে থাকে নারকোলডাঙা।

তার বাড়ি গিয়ে দেখি, সে আফিস যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে। বললাম, "শীগ গির চল্। তোর ভাইয়ের সন্ধান পেয়েচি। সে ঐ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের মোড়ে বসে দাঁতন বেচছে।"

"অ্যাঁঃ। বলিস্ কি? চল্—চল—

এককড়ির বউদি বললে, "আমিও যাবো—"

পঞ্চানন বললে, "তুমি? তুমি কোথায় যাবে? তাকে ধরে নিয়ে এলাম বলে।"

ছুটলাম দু'জনে। কিন্তু রাজাবাজার থেকে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট পর্যন্ত রাস্তাটা একেবারে মরুভূমি—না চলে বাস, না চলে ট্রাম। জোরে হাঁটতে গেলে পায়ে পায়ে যায় জড়িয়ে। তবুও যত জোরে পারি হেঁটে দু'জনে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের মোড়ে এলাম। কিন্তু কোথায় এককড়ি? বকুলতলায় পড়ে আছে কেবল নিমের ডালের কতকগুলি কাটা আগা।

পঞ্চাননকে কি বলে সান্ত্বনা দেবো? জাহান্নমে যাক দন্তরোগীর দল। তারা কি ধীরে-সুস্থে দাঁতন কিনতে পারলো না?

তবুও বললাম, "ও আসবে। যাবে কোথায়?"

"না রে!" বলে পঞ্চানন নিশ্বাস ফেলে ট্রাম ধরতে হ্যারিসন রোডের দিকে চলে গেল।

একজন ইংরেজ ভদ্রলোক ভারতবর্ষে বেড়াতে এসেছিলেন। দেশে ফিরে গেলে বন্ধুরা জিজ্ঞেস করলেন, "ভারতবর্ষে শীত-গ্রীষ্মে তফাৎ কি?" "তফাৎ এই, যে, গ্রীষ্মকালে ওখানকার দরজার পেতলের হাণ্ডেলগুলি গরমে গলে যায় আর শীতকালে গলে না।" —ভদ্রলোক জবাব দিলেন।

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

—দুই—

হে বিজয়ী বীর

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

এই ঘটনার কিছু দিন পরেই মাস্তাং উপত্যকাবাসীরা তাদের অধিনায়ককে হারালো। মেজর হোপ একদিন জানিয়ে দিলেন, বিশেষ কারণে তাঁকে চিরদিনের জন্য উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। তিনি যাবার আগে তাঁর যা কিছু সব উপত্যকাবাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। বিলিয়ে দিলেন না কেবল ফ্যান, ক্রুসো আর তাঁর সুবিখ্যাত রাইফেলটা। এগুলো তিনি তাকেই দেবেন, ঘোষণা করলেন, যার লক্ষ্য সবার থেকে ভালো ব'লে প্রমাণিত হবে।

নদীর ধারের এক প্রশস্ত সমতল ভূমি বেছে নেওয়া হ'লো। যথা সময়ে দলে দলে প্রতিযোগীরা এসে যোগ দিলো।

যথাস্থানে পৌঁছে ডিককে দেখতে পেয়ে জো ব্লাণ্ট বললো, "এই যে সবার আগেই ঠিক এসে গেছো দেখছি!"

"প্রায় ঘণ্টাখানেক হ'লো আমি এসেছি। কি একটা নতুন রকমের ফুল, জ্যাক মর্গ্যান বললো, এখানে দেখেছে, তাই খুঁজছিলাম। খুঁজে পেয়েওছি, এই দেখো। এ ফুল তুমি আগে দেখেছো কখনো?"

রাইফেলটা একটা গাছে হেলান দিয়ে রেখে ফুলটা ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে জো ব্লাণ্ট বললো,—"হ্যাঁ, 'রকি' পাহাড় অঞ্চলে অনেক দেখেছি। কিন্তু

এখানে এর আগে কখনো দেখি নি। এটা কেমন ক'রে এখানে এসে পড়েছে কে জানে! যতদূর মনে পড়ে, এ ফুল আমি শেষ বার দেখেছিলাম ইয়োলোষ্টোন নদীর উৎসের কাছে, ঠিক যে জায়গায় আমি একটা গ্রিজলি ভালুক শিকার করেছিলাম।"

"এ কি সেই ভালুক—যেটার কথা তুমি সেদিন বলছিলে?"

"হাঁ, সেইটে। ছয়টা গুলি আর দশ বার ছোরার আঘাত খেয়ে তবে কাবু হয়েছিলো ভালুকটা। আমাকেও সে রীতিমতো কাহিল ক'রে এনেছিলো।"

"গ্রিজলি ভালুক শিকারের সুযোগের জন্য আমি আমার রাইফেলটা পর্য্যন্ত দিয়ে দিতে রাজী।"—হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ডিক বলে উঠলো।

"তোমার রাইফেলটা যে পাবে সে নিজেকে বিশেষ ভাগ্যবান্ ব'লে না-ও মনে ক'রতে পারে।"—এক গাঁট্টাগোট্টা শিকারী এগিয়ে আসতে আসতে বললো!

কথাটা রূঢ় হ'লেও সত্যি। ডিকের রাইফেলের যা অবস্থা, তাতে তার ওর ওপরে কোন মতেই নির্ভর করা চলে না। ঘোড়া টিপলেই গুলি বেরোবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। এবং যে ক্ষেত্রে লক্ষ্য অব্যর্থ হবার কথা, তেমন অবস্থাতেও অনেক সময়ে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হ'তে দেখা গেছে!

ইতিমধ্যে আরো অনেক প্রতিযোগী উপস্থিত হওয়ায় এ বিষয়ে আর কেনো কথা হ'লো না। কয়েক মিনিট পরে মেজর হোপ এসে উপস্থিত হলেন; তাঁর কাঁধে রাইফেল। তাঁর পেছনে পেছনে এলো ফ্যান আর ক্রুসো। ছুটতে ছুটতে মহা আনন্দে ডিগবাজী খেতে খেতে ক্রুসো মায়ের পেছনে পেছনে এসে হাজির হ'লো।

সঙ্গে সঙ্গে সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো রাইফেলটার ওপর। এ অঞ্চলে এত চমৎকার রাইফেল আগে কেউ দেখে নি। সাধারণ রাইফেলের চেয়ে লম্বায় এটা কিছু ছোট, এবং এর নলের ছিদ্রটা কিছুটা বড়। রাইফেলটার গঠনকার্য্য অপূর্ব্ব। তার ওপরে হাতলটা আবার রূপোয় মোড়া।

যেখান থেকে লক্ষ্য পরীক্ষা করা হবে সেখানে এসে মেজর হোপ বললেন, "গর্ত্তগুলো মনে রাখবে সবাই। প্রথমে যে ওই পেরেকটা ঠিক বসাতে পারবে তারই জিত। প্রত্যেকে নিজের নিজের রাইফেল ব্যবহার করবে।"

"রাজী।" সকলে একবাক্যে বলে উঠলো।

"বেশ, তা হ'লে বন্দুক পরিষ্কার ক'রে প্রস্তুত হয়ে থাকো। হেন্‌রী পেরেক লাগিয়ে দেবে। এই নাও, হেন্‌রী।"

যে লোকটি এসে পেরেকটা হাতে নিলো, তার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যা লক্ষ্য করবার মতো। অন্য সকলের মতো সে-ও আধা-চাষী, আধা-শিকারী; তার পোষাকেও অভিনবত্ব কিছু নেই। আকৃতিতে অন্য সবার থেকে বিপুল এবং প্রচুর শক্তির অধিকারী হ'লেও হেন্‌রীর চলা-ফেরা, দৌড়-ঝাঁপ হাসিরই উদ্রেক করে। বন্দুকের লক্ষ্যও তার মোটেই ভালো নয়। কিন্তু তবুও হেন্‌রী সবারই প্রিয় পাত্র, এবং সে তার মিষ্টি স্বভাবের জন্যে।

এ ভাবে পেরেক বসানোর প্রতিযোগিতা ও অঞ্চলের শিকারী-মহলে বহুদিন থেকে চলে আসছে। একটা বড় মাথা-ওয়ালা পেরেক কোনো গাছ বা কাঠের টুকরোর ওপরে খানিকটা-গাঁথা অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়, আর শিকারীরা পঞ্চাশ-ষাট গজ দূর থেকে গুলি ছোঁড়ে সেই পেরেক লক্ষ্য ক'রে। এদের লক্ষ্য ভালো ক'রে বিচার করবার উদ্দেশ্যে মেজর হোপ এ ক্ষেত্রে দূরত্বটা পঁচাত্তর গজ ক'রেছেন।

বৃদ্ধের দলে দু'-একজন ঘাড় নেড়ে মন্তব্য করলো, "দূরত্বটা বড় বেশী হয়ে গিয়েছে। এত দূর থেকে লক্ষ্য ভেদ করা এক রকম অসম্ভব।"

"একমাত্র হাড়গিলে জিম্‌ই যদি এ লক্ষ্য ভেদ করতে পারে!"—কে একজন বললো।

রোগা, লম্বাটে, কুৎসিত চেহারার জন্য লোকে জিমকে হাড়গিলে ব'লে ডাকতো এবং কেউই তাকে পছন্দ করতো না। তার রাইফেলের গুলি খুব ছোট ছোট হলেও তার বন্দুকে নির্ভুল লক্ষ্যের জন্য তার কিছু সুনাম ছিলো।

পরীক্ষা শুরু হ'লো। একে একে চেষ্টা করলো অনেকে; এবং পেরেকের চারদিকে অসংখ্য ছিদ্রের সৃষ্টি হ'লো, কিন্তু কেউ লক্ষ্য ভেদ করতে পারলো না। এরপর এলো জো ব্লান্টের পালা। জো-র গুলি পেরেকের গা ঘেঁষে গাছে প্রবেশ করলো।

মেজর বললেন, "সে কি জো, তুমিও ব্যর্থ হ'লে? আমি তো আশা করেছিলাম তুমিই জয়ী হবে!"

"সে আশা আমারও ছিলো। কিন্তু স্যর, এত দূর থেকে ঐটুকু পেরেকের মাথা আমি ঠিক দেখতেই পাই নি।"

"তোমার চোখ নেই বলেই তুমি দেখতে পাও নি।" বিদ্রূপের স্বরে কথাগুলো ব'লে হাড়গিলে জিম এগিয়ে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে সব কোলাহল থেমে গেলো। ওস্তাদের লক্ষ্যবেধ দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলো সবাই। জিমের গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হর্ষধ্বনি উঠলো, কারণ জিমের গুলি পেরেকের মাথায় এক ধারে লেগেছিলো।

"এর থেকে ভালো লক্ষ্যভেদ কেউ না ক'রতে পারলে একেই পুরস্কার দেবো।"—কণ্ঠস্বরের হতাশার সুর অতি কষ্টে চেপে রেখে মেজর বললেন। "আচ্ছা, এর পরে কে আসছে?"

"ডিক ভার্লে! ডিক ভার্লে!" একসঙ্গে অনেকে বলে উঠলো।

"অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডিক এগিয়ে এলো। যেতে যেতে ফিস ফিস ক'রে জো-কে বললো, "আমার চেষ্টা করা বৃথা। আমার এই মান্ধাতার আমলের বন্দুকের ওপরে আমার একটুও বিশ্বাস নেই।"

"তা হোক, ডিক, হাল ছেড়ো না।"—জো তাকে আশ্বাস দিয়ে বললো।

লক্ষ্য স্থির ক'রে ডিক ঘোড়া টিপলো, কিন্তু তার এমন দুর্ভাগ্য যে বন্দুকের গুলি পর্য্যন্ত বেরোলো না।

"ওকে আর একটা বন্দুক দেওয়া হোক।"—এককণ্ঠে অনেকে বললো।

"মেজর হোপের সর্ত্ত অনুসারে তা' হতে পারে না।"—জিম বললো।

"হ্যাঁ, ঠিক বলছো। আচ্ছা ডিক, তুমি ঐ বন্দুকেই আর একবার চেষ্টা করো।"

এবারে আর ডিকের রাইফেল বিশ্বাসঘাতকতা করলো না। ডিকের গুলি পেরেকের মাথার এক পাশে গিয়ে আঘাত করলো।

সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হাততালি পড়লো এবং জিম আর ডিকের মধ্যে কার লক্ষ্য ভালো হয়েছে এই নিয়ে দর্শকদের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হ'লো।

"এখনো অনেকে বাকী রয়েছে, চীৎকার থামাও।" মেজর বললেন।

কিন্তু বাকী যারা এসে পরীক্ষা গ্রহণ করলো তারা কেউ এদের কাছেও ঘেঁষতে পারলো না।

তখন ঠিক হলো, জিম আর ডিকের মধ্যে আবার পরীক্ষা হবে। ডিককে জো ব্রাণ্টের রাইফেলটি ব্যবহার করতে দিতে এবার আর কেউই আপত্তি করলো না।

টসে ডিকের নাম আগে উঠতে সে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে ভালো ক'রে লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টিপে দিলো।

এবার দেখা গেলো, গুলির অর্দ্ধেকটা পেরেকের মাথায় লেগে কেটে গেছে। ডিকের বন্ধুমহলে আনন্দ-গুঞ্জন শুরু হলো। কিন্তু যারা তার অন্তরঙ্গ, তাদের মনে দুর্ভাবনা দেখা দিলো, কারণ তাদের ভয় হ'লো, জিম হয়তো আরো ভালো ভাবে লক্ষ্য ভেদ ক'রতে পারবে।

জিম এগিয়ে এলো। ধীরে ধীরে বন্দুক তুলে লক্ষ্য স্থির ক'রতে লাগলো সে।

অনেকক্ষণ আমরা ক্রুসোর কোনো খোঁজ করি নি। এতক্ষণ ধ'রে মা-কে জ্বালাতন ক'রে ক্রুসো এবার নতুন কোনো দুষ্টুমির সন্ধান করছিলো। এমন সময় হঠাৎ হেন্‌রী তার সামনের পা মাড়িয়ে দিতেই সে তীব্র চীৎকার করে উঠলো। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই জিম তার ঘোড়া টিপছিলো,—এই অতর্কিত চীৎকারে তার হাত একটু কেঁপে গেলো। দেখা গেলো, সামান্য এক চুলের জন্য সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়েছে।

রাগে অন্ধ হ'য়ে জিম ক্রুসোকে লক্ষ্য ক'রে সজোরে লাথি ছুঁড়লো। সঙ্গে সঙ্গে হেন্‌রী তার রাইফেল দিয়ে বাধা দিতে ক্রুসো সে যাত্রা নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেলো। পায়ে আঘাত পেয়ে জিম যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠলো।

"মাপ করো ভাই!" সহানুভূতি-মাখা স্বরে কথাগুলো বললেও হেন্‌রী তার মনের আনন্দ চেপে রাখতে পারছিলো না।

আর কোনো কথা না ব'লে মন-মরা জিম সে স্থান ত্যাগ করলো।

রূপোলী রাইফেলটা ডিকের হাতে দিয়ে মেজর হোপ বললেন, "যোগ্যতম ব্যক্তির হাতেই আমি আমার রাইফেল দিয়ে যাচ্ছি। তুমি যে এর সম্মান রক্ষা ক'রতে পারবে এ বিশ্বাস আমার আছে। জেনে রাখো, লক্ষ্য স্থির হ'লে এ রাইফেলের গুলি কখনো ব্যর্থ হবে না। রাইফেলটার একটু যত্ন নিয়ো, এ তোমার চিরকালের সাথী হয়ে থাকবে।"

(ক্রমশঃ)

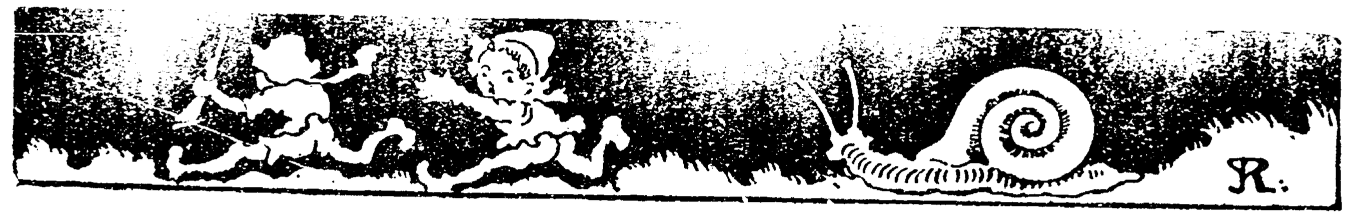

কলকাতার দক্ষিণে

শ্রীগৌরী দেবী

সহরের বদ্ধ হাওয়ায় যখন মন-প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে তখন একবার সহরের বাইরে কাছাকাছি ঘুরে আসতে পারলে অনেকটা শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু অনেকেই হয়তো বলবে যাব কোথায়? সেই একঘেয়ে বোটানিক্যাল্ গার্ডেন, নয় দক্ষিণেশ্বর, না হয় বেলুড়। ইডেন গার্ডেনের যা হাল হয়েছে তার কথা না তোলাই ভাল। অবশ্যি যারা কলকাতায় থাকো তাদের কথাই আমি বলছি। যারা মফঃস্বলে থাকো তারা এদিক্ দিয়ে অনেক ভাগ্যবান্।

কেউ কেউ হয়তো বলবে, শুধু খোলা জায়গা হ'লেই তো হয় না। একটা কিছু দেখবার জিনিষ থাকা চাই তো! নইলে ছন্নছাড়ার মত মাঠে-ঘাটে কে ঘুরে বেড়াতে পারে! কথাটা ঠিক, তবে সব জায়গাতেই যে একটা ক'রে তাজমহল বা লাল কেল্লা বা হিমালয় পাহাড় থাকবে এ আশা করা অন্যায়। অভ্যস্ত সাধারণ জায়গায়ও দেখবার জিনিষ থাকতে পারে—তবে তা খুঁজে নিতে হয়। তা ছাড়া সহরের অভ্যস্ত দৃশ্যের বাইরে আসতে পারলে, দেখবে, নিতান্ত তুচ্ছ জিনিষগুলোও কেমন ভাল লাগছে চোখে।

আচ্ছা, কলকাতার দক্ষিণ দিকেই সামান্য কয়েক মাইল ঘুরে আসা যাক্ না। শেয়ালদহ দক্ষিণ ষ্টেশন বা বালীগঞ্জ থেকে ট্রেনে চাপা যাক্,—যে কোন গাড়ীতে, বজ্ বজ্ ছাড়া। সেটার কথা আর একদিন হবে। বালীগঞ্জ ছাড়ালে প্রথমেই ঢাকুরিয়া। কিন্তু ঢাকুরিয়া এখন কলকাতারই সামিল হয়ে গেছে, কাজেই ওখানে না নেমে পরের ষ্টেশন যাদবপুরে নেমে পড়।

ষ্টেশন থেকেই দেখা যাবে যাদবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের বিরাট বাড়ী। কলেজ, ল্যাবরেটরী, ওয়ার্ক্‌শপ্, হষ্টেল, অধ্যক্ষ বা অধ্যাপকদের গৃহ ইত্যাদি। স্বদেশী যুগের জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্ থেকে এই কলেজের সৃষ্টি। শিক্ষা-পরিষদের

আর সব কবে উঠে গেছে, কিন্তু এই কলেজটি ছোট থেকে ক্রমে ক্রমে মহীরুহে পরিণত হচ্ছে। এখন আর 'বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল্ইস্কুল' বলে একে কেউ তাচ্ছিল্য দেখাতে পারে না। নানা আধুনিক সাজসরঞ্জাম পূর্ণ, সুযোগ্য অধ্যাপকবৃন্দ পরিচালিত এই "কলেজ অব্ এঞ্জিনীয়ারিং য়্যাণ্ড টেক্‌নলজি' এখন বাংলার একটি গৌরবের বস্তু।

শুধু এঞ্জিনীয়ারিং কলেজই নয়, এরই অনতিদূরে ভারত সরকারের সহায়তায় যে নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারটি তৈরী হয়েছে সেটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। শুধু তার সুরম্য ভবনটিই নয়, তার ভেতরে যে গবেষণার আয়োজন হয়েছে তার কথাই বলছি।

যাদবপুরকে এখন আর কেউ গ্রাম বলবে না, যাদবপুর এখন সহর—এবং বৃহত্তর কলকাতারই অঙ্গ বলা চলে। এখানে জায়গা-জমি কিনে যাঁরা বাড়ী তৈরী করতে যাবেন তাঁরাই কথাটা বুঝতে পারবেন। যাদবপুরের যক্ষ্মা-হাসপাতাল নাম-করা, কিন্তু সে দিকে তোমাদের যাবার দরকার নেই। যাদবপুরের আশে পাশে আর একটা নতুন জিনিষ সম্প্রতি বিশেষ ভাবে চোখে পড়বে। সেগুলি হচ্ছে 'উদ্বাস্তু-উপনিবেশ", যার ইংরেজী নাম হয়েছে "রিফিউজী-কলোনী"। ভারত বিভাগের পর পূর্ব্ব বঙ্গ থেকে যে সব লোক নিজেদের পিতৃপুরুষের ঘরবাড়ী, ভিটে মাটী ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে তাদের অনেকে এইখানে ছোট ছোট কুটীর তৈরী ক'রে নতুন উপনিবেশের সৃষ্টি করেছে। বেশীর ভাগই টালীর ছাদ, বেড়ার দেয়াল, কিন্তু তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। কোন কোনটার সঙ্গে রয়েছে তারিতরকারির বাগান। যারা একটু রুচিবাগীশ তারা ওরই মধ্যে কিছু ফুলের গাছও লাগিয়েছে; দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। উদ্বাস্তুরা ঐখানে শুধু কুটীরই তৈরী করে নি, রাস্তাঘাট, দোকানপাট, বাজার, ছেলেমেয়েদের স্কুল, খেলার মাঠ, এমন কি ক্লাব, লাইব্রেরী প্রভৃতিও তৈরী করে নিয়েছে। কোন কোন উপনিবেশ এদিক্ দিয়ে আদর্শ বলা যেতে পারে। এই সব নতুন-গড়া পল্লীর ভিতর দিয়ে ঘুরে বেড়াতেও দেখবে কত আনন্দ!

আরও কিছু এগিয়ে এস। যাদবপুরের পরের ষ্টেশন গড়িয়া। যাদবপুর থেকে দূরত্ব মাইল তিনেক। ষ্টেশনের গা বেয়ে একটা খাল চলে গেছে। তার ওপর রেলওয়ে ব্রীজ। খাল অবশ্যি শুকিয়ে এসেছে, কোন কোন জায়গায় জল খুবই কম।

ষ্টেশনের কাছেই উল্টো দিকে বিরাট্ একটা বিল। বর্ষার পরে যখন জল বেড়ে ওঠে তখন এটিকে একটি দিগন্তপ্রসারী হ্রদ ব'লে ভুল হয়। এপার ওপার দেখা

যায় না। অতি চমৎকার সে দৃশ্য। এই বিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। তা ছাড়া যে সব শিকারী পাখী (বাঘ নয়) শিকারে উৎসাহ পায় তাদের কাছে এটি একটি উপাদেয় শিকার-ভূমি। নানা জাতের পাখীর আড্ডা হওয়ায় শিকারীর দল বন্দুক নিয়ে শালতি (ছোট ডোঙ্গা) চেপে বিলের ভিতর বা আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ দৃশ্য অনেক সময় চোখে পড়ে। যারা পাখী শিকার পছন্দ করে না (আমিও তার মধ্যে একজন) তাদের হয়তো ও দৃশ্য ভাল লাগবে না কিন্তু যাদের মতে শিকার (পাখী শিকারও!) হচ্ছে একটা "ম্যান্‌লি গেম্" অর্থাৎ কিনা পৌরুষের খেলা, তাদের হয়তো ও দৃশ্য কৌতুককরই হবে।

হাটের সময়ে পৌঁছলে গড়িয়ার হাটে অনেক নতুন নতুন জিনিষ চোখে পড়বে যা নাকি কলকাতায় মেলা ভার। আর যদি আর একটু বেড়াতে আপত্তি না থাকে তবে চলে এস বোড়াল গ্রামে, গড়িয়া থেকে তিন মাইলও হবে না এই গ্রাম।

বোড়াল খুব প্রসিদ্ধ ও পুরোনো ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত গ্রাম। সেন রাজাদের আমলেও এর খ্যাতি ছিল। সুযোগ্যসেন নামে এই বংশের এক রাজা এখানে একটি বিরাট দীঘি এবং দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, প্রায় সাত শ' বছর আগে। দীঘিটির কিছু কিছু এখনও আছে। আর আছে সে আমলের কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ—নানা আকারের ইট! তার মধ্যে কত রকম কারুকার্য্য, দেখলে আশ্চর্য্য লাগে।

সুযোগ্যসেনের তৈরী মন্দিরটিও ধ্বসে পড়ে গেছে কিন্তু সেই পীঠস্থান এখনও আছে। 'ত্রিপুরাসুন্দরীর পীঠ' নামে সেটি খ্যাত। এখন অবশ্যি ওখানে একটি নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ত্রিপুরাসুন্দরীরই বিগ্রহ—অষ্ট ধাতুর তৈরী। এই প্রতিমাটিও দেখতে চমৎকার, প্রতিমার পাদপীঠটিও। প্রতি বছর মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে এখানে ঘটা ক'রে একটি উৎসব হয়।

বাংলার সুবিখ্যাত পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও সমাজব্রতী রাজনারায়ণ বসুর নাম কে না জানে? ঋষি শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ। তাঁরও বাড়ী ছিল এই বোড়ালে। জঙ্গলের মধ্যে তাঁর পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা আজও দেখতে পাওয়া যায়! এইখানেই তিনি জন্মেছিলেন। বোড়াল গেলে মহাপুরুষের সেই পুণ্য জন্মস্থানটিও দেখে আসতে ভুল না।

মিষ্টি মেয়ে

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

মিষ্টি মেয়ে কে?
লজেঞ্জুসের বখরাটুকু খোকনকে দেয় যে।
আলতো ভাবে তুলতে পারে দাদুর পাকা চুল,
কচি হাতের সুড়সুড়িতে আনতে পারে ঢুল।
'বাপির' কাছে ধমক খেয়ে নালিশ করে মায়,
'জুজুমোনা'র গল্প শুনেও একটু না ঘাবড়ায়।

মিষ্টি মেয়ে কে?
খেলনা-শালে বিনি দুধের পায়েস রাঁধে যে।
নিজের ভাগের মাছটা সে রোজ হুলোকে দেয় ফেলে,
কেঁদে কেটে একসা করে ময়নাটা না খেলে।
চৌপর দিন হৈ-হল্লায় মাতিয়ে রাখে পাড়া,
কাজলা জলে ঝাঁপাই জুড়ে এক ডাকে দেয় সাড়া।

মিষ্টি মেয়ে কে?
সিঁড়ি ভাঙার অঙ্কগুলো কষতে পারে যে।
ঠিক ঠিক ঠিক করতে পারে নতুন স্বরের পড়া,
রুমালে ফুল তুলতে হ'লে মেলে না যার জোড়া।
লাল টুক টুক বেলুন পেলে ভাঙবে আড়ি যে,
মিষ্টি মেয়ে—লক্ষ্মী মেয়ে—শান্ত মেয়ে সে।

জ্যৈষ্ঠে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

ওই দেখ রে আজকে আবার ঘূর্ণি উঠেছে,
শুকনো পাতা পথের ধূলো শূন্যে জুটেছে!
বিদ্যুতেরি ঝিলিক জ্বলে মেঘের বুকেতে,
বুকের জ্বালা গুমরে মেঘের তাই কি মুখেতে?
বজ্র ডাকে কড় কড়িয়ে রোজ যে বিকেলে,
সৃষ্টিনাশা এমন খেলা নিত্য কে খেলে!
পাখীর বাসা ঝড়ের বেগে পড়ছে যে উড়ে,
ডাঁশা পাকা আমগুলো সব ফেললে কে ছুঁড়ে!
ভাঙলে শাখা, ছিঁড়লে পাতা সর্বনাশী কে?
এক নিমেষে লাগায় দাপট বিশ্ববাসীকে।
টস্ টসিয়ে পড়ছে রে ঘাম, ঝরছে বেয়ে গা,
জল, সরবৎ, বেলের পানায় তৃষ্ণা মেটে না।
উসখুসানি দুপুর বেলা, ছটফটানি হায়,
গভীর রাতেও গর্মি লেগে প্রাণটা বুঝি যায়!
জ্যেষ্ঠ দিনের ডামাডোলে কাঁপছে বসুধা,
কে হরেছে তাহার বুকের সবটুকু সুধা?

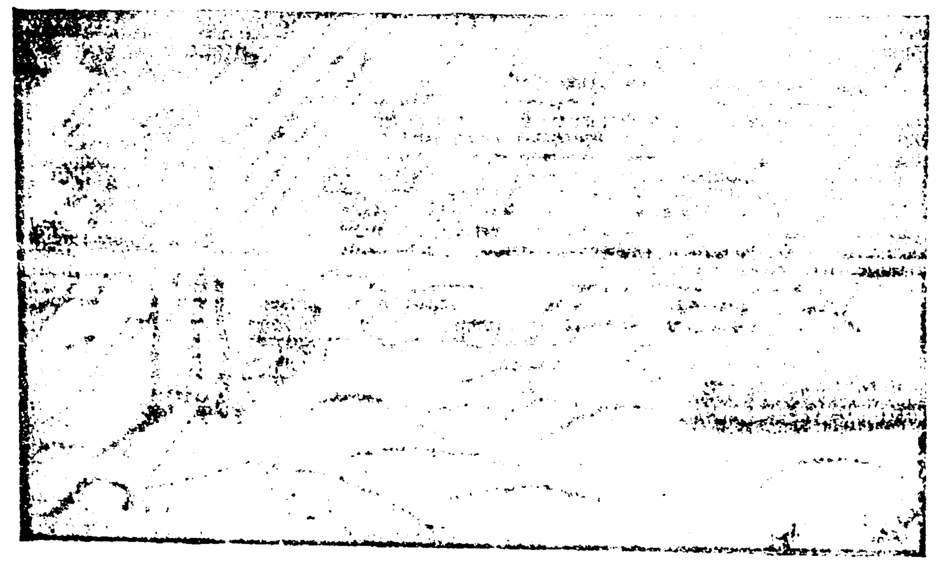

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

একটি 'পাগলের' কাহিনী

কয়েকটি চাষার মেয়ে গ্রামের পথ দিয়ে হাটে যেতে যেতে দেখল একজন বয়স্ক ভদ্রলোক একটা পিঁপড়ের গর্ত্তের পাশে ঠায় বসে একমনে কি যেন দেখছেন, কোন দিকেই তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। চাষার মেয়ে ক'টি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্য দেখতে লাগল, তারপর হাসতে হাসতে চলে গেল।

বিকেল বেলা হাট থেকে ফিরবার পথে সেই মেয়ে ক'টি আবার সেই জায়গায় এসে দেখে, ভদ্রলোক তখনও ঠিক তেমনি সেই গর্ত্তের পাশে বসে এক মনে উপুড় হয়ে কি দেখছেন! লোকটি কি তবে পাগল!

চাষার মেয়েরা গ্রামে গিয়ে কথাটা রাষ্ট্র ক'রে দিল। পর দিন সকালে হাটের পথে আরও কয়েকটি কৌতূহলী লোক ব্যাপারটা দেখবার জন্য এসে হাজির। দেখা গেল সেই ভদ্রলোকটি ভোর না হ'তেই আবার সেখানে এসে জুটেছেন এবং তেমনি নিশ্চল নয়নে গর্ত্তটির দিকে চেয়ে আছেন। পাগল আর কাকে বলে?

একজন বলল, "ও মশাই, বলি ও মশাই। ওখানে কি খুঁজছেন? হীরার খনির খোঁজ পেয়েছেন বুঝি ওর তলায়?" সবাই হো-হো ক'রে হেসে উঠল। পাগলের কিন্তু সে দিকে হুঁশ নেই। একজন বললে, "চল, থানায় খবর দিই গে। পাগলা-গারদে নিয়ে যাবে এখন।" একদল ডেঁপো ছেলে হাততালি দিতে দিতে চেঁচাতে লাগল—"এই পাগল—এই পাগল! এই পাগলা—এই পাগলা!" পাগল কিন্তু তখনও তন্ময় হয়ে গর্ত্তের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যেন কোন যোগ নেই তার!

এইবার পাগলের পরিচয়টা শোন। এঁর নাম হচ্ছে ফেবর—বিখ্যাত কীটতত্ত্ববিদ—বৈজ্ঞানিক ফেবর। পোকামাকড়ের জীবনযাত্রা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক'রে ইনি অমর হয়ে আছেন। পোকামাকড়ের চালচলন নিয়ে পরীক্ষা করা ব্যাপারটা যে খুব সহজ নয় ওপরের গল্পটা থেকেই তার পরিচয় পাবে। এ জন্য কি অসম্ভব ধৈর্য্য আর একাগ্রতার দরকার তা

কল্পনা করা যায় না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা—দিনের পর দিন একই জায়গায়, সময় বিশেষে রোদ-বৃষ্টি তুচ্ছ ক'রে, ঠায় বসে বসে তাদের লক্ষ্য করতে হবে। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হ'তে পারলে তবেই এ কাজ সম্ভব। ফেবর ছিলেন সেই প্রকৃতির লোক। মূর্খ গ্রামবাসীর কাছে এ ব্যাপার একেবারেই অবিশ্বাস্য। কাজেই এর যা সব চেয়ে সহজ ব্যাখ্যা তাই তারা করে নিয়েছিল। তাদের চোখে ফেবর পাগল ছাড়া আর কি হ'তে পারেন?

কিন্তু সত্যিকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে হ'লে কি রকম একাগ্রচিত্ত হওয়া দরকার এই গল্পটি তার একটি চমৎকার উদাহরণ। ফেবর যে সত্যিই পাগল ছিলেন না তা বোধ হয় বলে দিতে হবে না।

তোমার সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা কর

এই প্রশ্নগুলি প্রথমে নিজেরা বার করার চেষ্টা কর। না পারলে পাঁচমিশেলীর শেষে উত্তর দেখ।

(১) এগুলি বলতে কি বোঝায়?—

(ক) পরগাছা (খ) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (গ) নোতর্‌দাম্ (ঘ) আরোরা বোরিয়ালিস্ (ঙ) জি. আই. পি.।

(২) নীচের লাইনগুলি কোন্‌টি কার লেখা?—

(ক) "মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!"

(খ) "এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে?"

(গ) "আবার আবার সেই কামান-গর্জ্জন।"

(ঘ) "মা আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত?"

(ঙ) "বরবটী ফুল ফোটে, ফুল ফোটে ঘাংড়ার, মটরশুঁটির ক্ষেতে গান ওঠে ভোমরার।"

(চ) "তিন বুড়ো পণ্ডিত টাকচুড়ো নগরে, চড়ে এক গামলায় পাড়ি দেয় সাগরে।"

(ছ) "দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে?"

(জ) "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

(৩) কোনটা ঠিক?—

(ক) দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করেন—ন্যানসেন, শ্যাকল্‌টন্, ক্যাপটেন কুক, আমুণ্ডসেন, লিভিংষ্টোন।

(খ) স্পঞ্জ—এক রকম সামুদ্রিক প্রাণী, এক রকম জলজ উদ্ভিদ, এক রকম গাছের আঠা, এক রকম পাথর।

(গ) হীরোগ্লীফ বলতে বোঝায়—একজন বড় গ্রীক বীর, ব্যাবিলনের একটি প্রাচীন মন্দির, প্রাচীন মিশরে ব্যবহৃত ছবির অক্ষর, বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র বিশেষ।

(৪) এই খৃষ্টাব্দগুলি কোন্ কোন্ ঘটনার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে?—

(ক) ১১৯৩ (খ) ১৬৭৪ (গ) ১৮১৫ (ঘ) ১৮৫৭ (ঙ) ১৯১৪

(৫) এই শব্দগুলির অর্থ কি? এদের কোনটার বানান ঠিক লেখা না হয়ে থাকলে শুদ্ধ ক'রে লেখ।

(ক) তাম্রশাসন (খ) দ্রোণকাক (গ) নিসূদন (ঘ) তক্র (ঙ) নক্র (চ) নৈঋত।

ইতিহাসের নাম না নামের ইতিহাস!

একটাকিয়া ভাদুড়ী

খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর কথা। শামসুদ্দীন ইলিয়াস্ শাহ্ গৌড়ের সুলতান হয়েছেন। পুরোনো গৌড় থেকে কিছু দূরে পাণ্ডুয়া সহরে তিনি নতুন রাজধানী বসিয়েছেন। দিল্লীর বাদশাহকে মানতে রাজী ন'ন তিনি।

কিন্তু স্বাধীনতা ঘোষণা করলেই হয় না, স্বাধীনতা বজায় রাখতে হ'লে চাই সৈন্যবল। ইলিয়াস শাহ তাই প্রতিপত্তিশালী জমিদারদের কাছে সাহায্য চাইলেন। সুবুদ্ধিরাম ভাদুড়ী আর শিখিবাহন সান্যাল নামে দু'জন হিন্দু জমিদার তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে রাজী হ'লেন। তাঁরা সুলতানকে নানা ভাবে সাহায্য তো করলেনই, উপরন্তু তাঁর সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার হিন্দু সংগ্রহ ক'রে দিলেন।

সৈন্যবলে বলীয়ান্ সুলতান দিল্লীশ্বরকে গ্রাহ্য না ক'রে স্বাধীন ভাবে পাণ্ডুয়ায় রাজত্ব করতে লাগলেন। কিন্তু অসময়ের বন্ধুদের তিনি ভুললেন না। তাঁদেরকে দুই বিস্তৃত অঞ্চলের জমিদারী দিয়ে দিলেন নাম মাত্র খাজনায়। সুবুদ্ধিরাম ভাদুড়ী তাঁর বিরাট জমিদারীর জন্য বছরে মাত্র এক টাকা খাজনা দিতেন। তাঁর বংশধরাও। তাই লোকে এঁদের বলত "একটাকিয়া ভাদুড়ী"। সেই থেকে ঐ বংশেরই নাম হয়ে গেল একটাকিয়া ভাদুড়া বংশ।

গোপাল সিংহের বেগার

গোপাল সিংহ ছিলেন বিষ্ণুপুরের রাজা, এবং পরম বৈষ্ণব। তাঁর সম্বন্ধে এই রকম গল্প আছে যে তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ বার হরিনাম জপ করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি নাকি হুকুম দিয়েছিলেন যে তাঁর রাজ্যের সমস্ত সাবালক প্রজাকে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় খানিকটা সময় হরিনাম করতে হবে, নইলে সাজা হবে।

রাজাজ্ঞা ঠিক মত পালিত হচ্ছে কিনা দেখবার জন্য তাঁর অনেক কর্ম্মচারী ছিল। একদিন এক ছুতোর সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর বাড়ী এসে শুয়ে পড়ল—হরিনাম না ক'রেই। অনেক রাতে ঘুম ভাঙ্গলে হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল, তাই তো, হরিনাম তো জপ করা হয় নি! সে স্ত্রীকে ডেকে বল্‌ল, "ওগো, তাড়াতাড়ি জপের মালাটা দাও তো, 'গোপাল সিংহের বেগারটা' সেরে নি।"

রাজার একজন কর্ম্মচারী ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে কথাটা শুনতে পেল, এবং সটান গিয়ে রাজাকে জানাল। পরদিন ছুতোরের তলব পড়ল রাজ-দরবারে। গোপাল সিংহ জিজ্ঞেস করলেন, "শুনলাম তুমি আমার আদেশ পালনকে বেগার ঠেলা বলেছ! সত্যি?"

ছুতোর হাতযোড় ক'রে বল্‌ল, "মহারাজ, আমি বড় গরীব, সারাদিন পেটের জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হয়। সামান্য যেটুকু সময় বিশ্রামের জন্য পাই তাও আপনার হুকুম মানতেই কেটে যায়—এবং তার জন্য পারিশ্রমিক তো পাই-ই না, উপরন্তু আমার একান্ত নিজস্ব সময়-টুকুও ব্যয় করতে হয়। তাই আমি এটাকে বেগার ঠেলা বলেছিলাম।"

গোপাল সিংহ হেসে বললেন, "ভগবানের নাম করাকে বেগার ঠেলা বলা উচিত নয়। যাই হোক, তোমাকে যাতে আর ও ভাবে বেগার না খাটতে হয় তার ব্যবস্থা করব। কিন্তু হরিনাম জপ বন্ধ করা চলবে না।"

গোপাল সিংহের আদেশে ছুতোরকে অনেকখানি জমি দান করা হ'ল। এর পর ঐ জমির আয় থেকে সংসার চালাতে তার আর কোন কষ্ট হ'ত না। কাজেই সে নিশ্চিন্ত মনে হরিনাম করবার অবসর পেল। সেই থেকে 'গোপাল সিংহের বেগার' কথাটি একটি প্রবাদ বাক্যের মত হয়ে গেছে।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

(১) (ক) যে গাছ অপর গাছের শরীর থেকে রস শোষণ ক'রে টিকে থাকে; (খ) ১১৭৬ সালে বাংলা দেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় তারই নাম; (গ) প্যারিসের বিশ্ব-বিখ্যাত গীর্জ্জা; (ঘ) মেরু প্রদেশের কাছাকাছি জায়গায় আকাশে সূর্য্যাস্তের পর যে অদ্ভুত রঙ্গিন আলো দেখা যায়। (চ) ভারতের একটি বড় রেলপথ—পূরো নাম গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্‌সুলা রেলওয়ে। (২) (ক) অতুলপ্রসাদ সেন (খ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত (গ) নবীনচন্দ্র সেন (ঘ) রামপ্রসাদ (ঙ) সুনির্ম্মল বসু (চ) সুকুমার রায় (ছ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (৩) (ক) আমুণ্ডসেন (খ) এক রকম সামুদ্রিক প্রাণী (গ) প্রাচীন মিশরে ব্যবহৃত ছবির অক্ষর। (৪) (ক) তরাইনের ২য় যুদ্ধ—মহম্মদ ঘোরীর কাছে পৃথ্বীরাজের পরাজয়। (খ) শিবাজীর রাজ্যাভিষেক (গ) ওয়াটালু'র যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়। (ঘ) সিপাহী-যুদ্ধ (ঙ) প্রথম মহাযুদ্ধ। (৫) (ক) তামার পাতে লেখা রাজশাসন লিপি। (খ) দাঁড়কাক (গ) বধ বা যে বধ করে। শুদ্ধ বানান নিসূদন বা নিষূদন। (ঘ) ঘোল (ঙ) কুমীর, জলজন্তু। (চ) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের অধিপতি; সাধারণতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের বা কোণেরই ঐ নাম। শুদ্ধ বানান নৈঋত।

নতুন বই

তোমাদের ট্রট্‌স্কী—চিত্ত মিত্র। সাংস্কৃতিক, কলিকাতা। দাম ১৷০

রুশ-বিপ্লবের অন্যতম নায়ক, লেনিনের সহকর্ম্মী ও দক্ষিণ হস্ত ট্রট্‌স্কীর জীবন-কথা ছোটদের জন্য লেখা। ভাগ্যচক্রের বিড়ম্বনায়, রাশিয়ায় জার-শাসনের উচ্ছেদ হ'লেও, ট্রট্‌স্কীকে কেমন

ক'রে সুদূর মেক্সিকোয় গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় এবং সেখানে কি ভাবে গুপ্ত ঘাতকের হাতে এই প্রতিভাবান্ বিপ্লবীকে জীবন দিতে হয় লেখক গল্পের মত ক'রে সে কাহিনী লিখেছেন। ট্রট্‌স্কীর কর্ম্মময় জীবনের কথাও বাদ যায় নি। ভাষা কোন কোন জায়গায় একটু সংবাদপত্র-সুলভ প্রচার-গন্ধী হ'লেও বইখানা ছোটদের ভাল লাগবে এবং অনেক কথা তারা জানতে পারবে। ছাপা-কাগজ ভাল, তবে কালি নির্ব্বাচনের দোষে মলাটটি চিত্তাকর্ষক হয় নি।

রক্তপিপাসু—রবি সেন। অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির। ৯এ, লেক রোড, কলিকাতা ২৯। দাম ১৲

আজকাল 'এ্যাডভেঞ্চার' বা রোমাঞ্চকর উপন্যাস বলতে যা বোঝায় এ বইটি তারই একটি। এর নায়ক 'রক্তপিপাসু' নানা অপকীর্ত্তির পর শেষ পর্য্যন্ত কি ভাবে নিজেরই সৃষ্টির হাতে প্রাণ হারাল তারই গল্প। বইখানিতে আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত নানা রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। রোমাঞ্চপিয়াসী পাঠকদের কাছে এ ধরণের বই ভালই লাগবে।

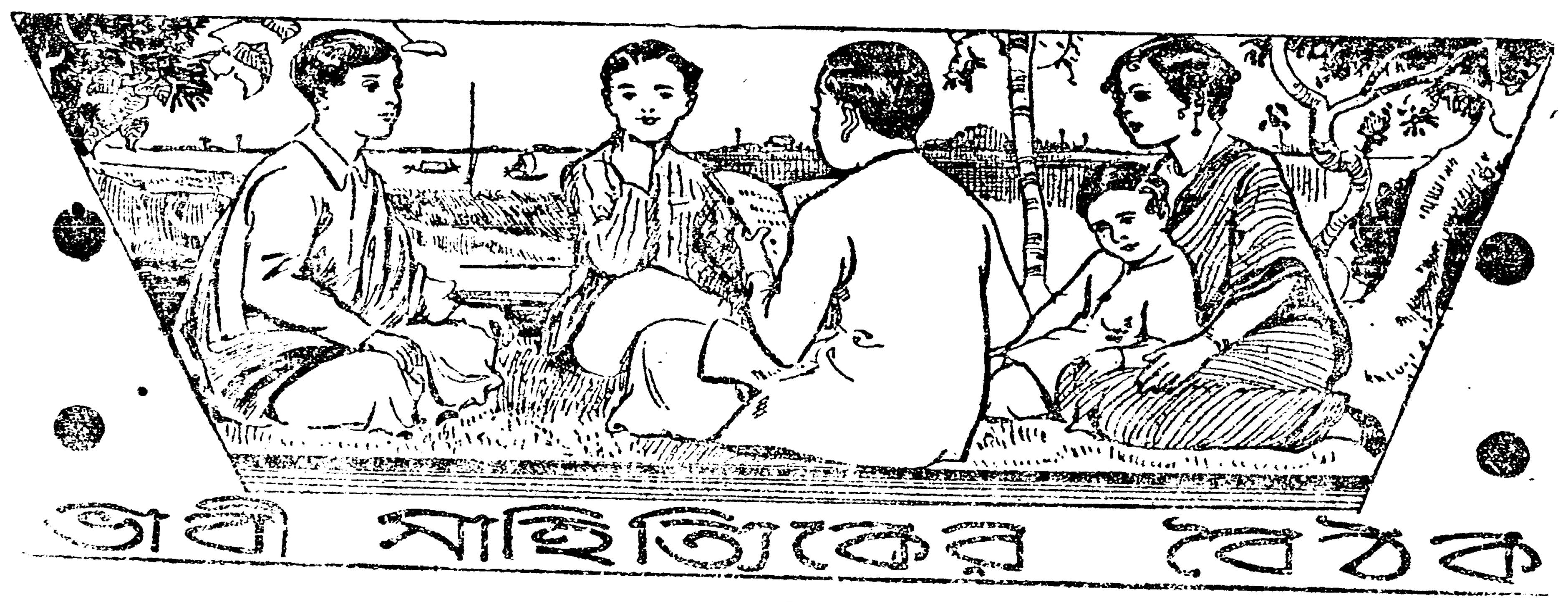

তবু কেন পেটুক বলো?

কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়

কতটুকুই খাই বা এমন,
কিই বা এমন খাবার মেলে?
পেটুক বলার মতন খাওয়া
কবেই বা আর দেখতে পেলে?

সের তিনেকের ছোলার ডাল আর
গণ্ডা পঁচিশ ফুলকো লুচি,
ডজন সাতেক পটল ভাজা,—
ওটায় আমার বড্ড রুচি।

সেদিন ওদের বে-বাড়ীতে
আদর করে ডাকল এসে,
সবার আগে বসেও তবু
উঠতে হ'লো সবার শেষে।
পাতে ফেলার স্বভাব আমার
নেইকো ছেলেবেলার থেকে,
বালতি খানেক মাছের ঝোলও
দিলাম নাকের তলায় রেখে।
চাটনি, পায়েস, দই ও বোঁদে
ওজন কে আর করলো অত,
অল্প করে নিলে পরেও
হবে তা সের দশের মত।

বেগুন ভাজাও খান তিরিশেক
খেলাম কিছু কষ্ট করে,
বাঁধাকপির তরকারীটাও
দিলো ওরা গামলা ভ'রে।
সের তিরিশেক মিহিদানা,
গণ্ডা বিশেক পান্তুয়া সে,
ওদের অনুরোধেই শুধু
তুলে নিলাম কয়েক গ্রাসে।
হজম করার শক্তি তো নেই
বয়েসটা যে অনেক হ'লো,
কম করে তাই খেলাম কিছু
তবু কেন পেটুক বলো?

খবর শোন

শ্রীসুদেষ্ণা মৈত্র

আমাদের দেশে সব চেয়ে বড় পোল কোন্‌টি জান?—শোণ নদের পোল। লম্বায় এটি ১০,০৫২ ফুট। গোদাবরী নদীর পোল লম্বায় ৯০৯৬ ফুট এবং মহানদীর পোল ৬৯০২ ফুট।

কলিকাতার উপকণ্ঠে হাওড়ায় যে নূতন পোল হইয়াছে উহা লম্বায় ১৫০০ ফুট। এটি তৈয়ারী করিতে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা পড়িয়াছিল।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে পদ্মার উপর যে পোল আছে (সারাঘাটের হার্ডিঞ্জ ব্রীজ) তাহা লম্বায় ৫৩৮০ ফুট।

মনোরঞ্জন-চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

১৩৫৭ সালের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত মনোরঞ্জন-চিরস্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল নীচে দেওয়া হ'ল :—

পুরস্কার পেলেন—শ্রীসঞ্জীবকুমার মুখোপাধ্যায় (বনারস)।

নিম্নলিখিত প্রতিযোগীদের লেখাও ভাল হয়েছে :—শ্রীনন্দলাল বড়ুয়া, শ্রীঅজিত চট্টোরাজ, কুমারী দীপ্তি সেনগুপ্তা, শ্রীমনোতোষ সেনগুপ্ত, শ্রীনমিতা দাম, কুমারী নূরজাহান বেগম, শ্রীঅমল কুমার মিত্র।

রায় পাহাড়ীর নিশাচর

শ্রীঅমলেন্দু সেন

১২

গুপ্তধন তা হ'লে এখনও পাওয়া যেতে পারে?

গগন উকিল লাল-বাংলার ইতিহাস না জানায় ভুল জায়গায় খুঁজেছে, তাই পায় নি কিছুই।

আমরা খুঁজব ঠিক্ জায়গায়। আর, যা করবার করতে হবে আজই রাত্রিতে।

সন্ধ্যার পরেই কয়েকটা দরকারী জিনিষপত্র নিয়ে দুই বন্ধুতে বেলেঘাটা রওনা হ'লাম।

যখনকার কথা বলছি তখন বেলেঘাটার দিক্‌টা খুব ফাঁকা ফাঁকা মত ছিল। তার এক্ প্রান্তে ছিল লাল-বাংলা বাড়ীটা। তার কাছাকাছি যখন গিয়ে পৌছলাম তখন পথে লোক-চলাচল খুব কমে এসেছে। কৈলাস-ধামের গেটের কাছে এসে ভাল করে চারদিক্ দেখে আমরা ঢুকে পড়লাম। লালু আগে, আমি তার পিছনে।

বাড়ীটা দক্ষিণমুখো। কাজেই উত্তর-পশ্চিমের ঘরটা হবে পিছন দিকে। চারিদিক্ ঘুরে দেখলাম, ঢুকবার দরজা সবই বন্ধ। খিড়কীর দিকে একটা সরু গলি আছে, দেখা গেল।

বললাম, কি করে ঢুকবে, লালু? এ বাড়ীতে তো ভাঙ্গা কোনও জানলা দেখছি না রায়পাহাড়ীর মত!

লালু একটু হেসে বললে, নেই যখন, তখন ভেঙ্গে নিতে হবে কষ্ট করে। তা আর কি করা?

এই ব'লেই লালু একটা জানলার উপর উঠে পড়ল। তার পর জানলার দু'টো গরাদে দু'হাতে ধরে একে একে সে দু'টোকে বাঁকিয়ে উপড়ে ফেলল অবলীলা-ক্রমে। ঘরে ঢুকবার পথ হয়েছে দেখে আমিও জানলার উপর উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু লালু আমাকে বারণ করল।

ঘরের মধ্যে নেমে পড়ে সেখান থেকে সে আমাকে বললে, না রতন, দু'জনেই ভেতরে আসাটা ঠিক হবে না। তুই বরং বাড়ীর সামনের দিক্‌টায় পাহারায় থাক্‌।

আমারও মনে হ'ল, সেই ভাল। বাড়ীর গেটের কাছে এসে একটু আড়ালে বসে পথের দিকে নজর রাখলাম।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট পার হয়ে গেল; বেলেঘাটার উপোসী মশার ঝাঁক ইতিমধ্যে আমার সন্ধান পেয়ে গিয়েছে। তারা এসে ছেঁকে ধরল আমাকে। প্রাণ যায় আর কি। উঠে পায়চারী করতে লাগলাম। মশারাও সানাই বাজিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে উড়তে লাগল।

হ'তে হ'তে প্রায় আধঘণ্টা হ'তে চলল, তবু লালুর দেখা নেই। ব্যাপারটা কি তা দেখবার জন্য ফিরে গেলাম সেই জানলাটার কাছে। কান পেতে শুনলাম, ভিতরে কোনও সাড়াশব্দ নেই।

জানলায় উঠে পড়লাম। ঘরের মেঝেয় লালুর আনা মোমবাতিটা কাৎ হয়ে পড়ে আছে, প্রায় নিবু-নিবু। কতকগুলি যন্ত্রপাতি আর একটা দড়ির সিঁড়ি এলোমেলো ছড়ানো। ঘর খালি। অথচ ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও লালু যখন এল না, তখন ব্যস্ত হয়ে তাকে খুঁজতে লাগলাম। বাড়ীর ভিতরে কিংবা বাগানে কোথাও লালুর কোনও চিহ্ন নেই।

লালু কি তা হ'লে গুপ্তধন নিয়ে একাই পালিয়ে গেল? এ কথা বিশ্বাস করতে চাইল না আমার মন। আর কি হ'তে পারে তা ছাড়া? তা হ'লে কি লালুর কোনও বিপদ্‌ হয়েছে? এ কথা ভাবতে আমার মাথাটা যেন ঘুরে উঠল। এর মধ্যে আমি গগন মিত্তিরের আর একটা শয়তানী যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আপশোষ হ'তে লাগল, কেন লালুর সঙ্গে থাকলাম না।

ভাবনায় কাতর আর পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সারা পথটা হেঁটে যখন বেলেঘাটা থেকে হাটখোলা পৌঁছলাম তখন রাত প্রায় দুপুর।

১৩

ছটফট করে কাটল সারাটা রাত। পরদিন ভোরবেলা মামাকে সব কথা বললাম। শুনে ব্যস্ত হয়ে তিনি তখনই আমাকে নিয়ে আগে গেলেন গগন মিত্তিরের বাড়ী। সেখানে গিয়ে শুনলাম যে তিনি আগের দিনই কোন এক মক্কেলের কাজে বহরমপুর গিয়েছেন, ফিরতে দু'-তিন দিন দেরী হবে।

বাড়ী ফিরে এলাম। তারপর সব কথা জানিয়ে হরিশ কাকাকে একখানা চিঠি লিখে দেওয়া হ'ল। সারাদিন ঘুরে ঘুরে কত জায়গায় লালুর খোঁজ করলাম; একবার বেলেঘাটার ওদিক্‌টাও ঘুরে আসা হ'ল। কিন্তু কোন খবরই আর পাওয়া গেল না।

খবর পাওয়া গেল তার পরের দিন। সকাল বেলা হঠাৎ হরিশ কাকা নিজেই এসে উপস্থিত।

মামা আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি হরিশ! তুমি এর মধ্যে আমার চিঠি পেলে কি করে?

হরিশ কাকা বললেন, আমাকে কোনও চিঠি লিখেছিলেন নাকি আপনি?

—নয় তো তুমি হঠাৎ কলকাতায় এলে কেন?

—চিঠি তো পেয়ে আসি নি, নিয়ে এসেছি।

এই বলে হরিশ কাকা একখানা কাগজ দিলেন মামাকে। চিঠিখানা হাতে নিতে নিতে মামা জিজ্ঞাসা করলেন, চিঠি আবার লিখল কে? আরে, এ যে দেখছি লালু লিখেছে! শোন রতন!

চিঠিখানা তিনি চেঁচিয়ে পড়তে লাগলেন—

শ্রীচরণেষু,

মজুমদার মহাশয়, এই চিঠি পেয়ে দয়া করে অতি অবশ্য রতনকে নিয়ে রায়পাহাড়ীর রাজবাড়ীতে আসবেন। অনেক নতুন কথা শুনতে তো পাবেনই, পুরোনো চেনা লোককেও দেখতে পাবেন। আমার প্রণাম নেবেন।

ইতি—

প্রণতঃ লালু

আমরা তখনই তৈরী হয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সারা রাস্তা হরিশ কাকা চুপ করে রইলেন। লালুর যে কি ব্যাপার, সে কথা তাঁকে দিয়ে কিছুতেই বলানো গেল না।

১৪

রায়পাহাড়ীর রাজবাড়ীর সামনে এসে যখন দাঁড়ালাম, তখন সূর্য্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। তার রূপালী আলোয় এই হানাবাড়ীটাকে নতুন আর এক রূপে দেখলাম। কি এর রহস্য, কে জানে?

সেই ভাঙা দেউড়ীটার নীচে দাঁড়িয়ে ছিল লালু।

এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরলাম। তারপর মামা আর আমি তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলাম। কিন্তু লালু সে সব কথার উত্তর না দিয়ে খালি একটু হেসে বললে, আগে ভেতরে চলুন, সব বলছি।

এই বলে সে এগিয়ে চলল। আবার সেই বাড়ী। এবার দেখলাম সদর দরজাটা খোলা আছে, মরচে-ধরা প্রকাণ্ড তালাটা আংটার গায়ে ঝুলছে। মামাকে নিয়ে লালু আগে ঢুকল, তার পিছনে হরিশ কাকা আর আমি।

দেখলাম, সে রাত্রিতে সব যেমন দেখেছিলাম, তেমনই আছে। ফাটা মেঝে, বালি-খ্বসা দেওয়াল, খসে-পড়া দরজা-জানলা, উইয়ে-খাওয়া আসবাব-পত্র, আর সর্ব্বত্রই ঝুল আর এক পুরু ধুলো।

সামনেই সেই নড়বড়ে কাঠের সিঁড়িটা।

লালুর পিছনে আমরা দোতালায় উঠলাম। উঠেই বাঁ-হাতে প্রথম যে ঘরখানা, তার সামনে এসে লালু থামল। এ সেই ঘর যে ঘরে ধরণীনাথকে হত্যা করা হয়েছিল।

ঘরের দরজাটা ভেজানো। লালু তাতে আস্তে টোকা মারল।

অমনি শুনতে পেলাম, ভিতর থেকে কে যেন বললে, এসো! খুব ক্লান্ত দুর্ব্বল সেই স্বর।

দরজা খুলে আমরা চারজন একে একে ঘরে ঢুকলাম। ঘরে ঢুকে প্রথমে কিছুই দেখতে পাই নে। দরজা-জানলা সব বন্ধ, ঘর অন্ধকার। ক্রমে ক্রমে অন্ধকারটা চোখে সয়ে এল, একটু একটু করে সব দেখতে পেলাম।

ঘরখানা মস্ত বড়। এক পাশে একখানা জরাজীর্ণ খাট পড়ে রয়েছে। আর একদিকের দেওয়ালে প্রকাণ্ড একটা আলমারী। ঘরের ও-মাথায় একখানা টেবল আর খানকতক চেয়ার। তারই একখানায় বসে আছেন এক ভদ্রলোক, আমাদের দিকে মুখ করে। জীর্ণশীর্ণ চেহারা, চুল সব সাদা, ফ্যাকাসে মুখ আর ক্লান্ত দু'টি চোখ। দেখলেই মনে হয় যে জীবনে অনেক কষ্টই পেয়েছেন, সারা শরীরে সেই দুঃখের ছাপ পড়েছে।

(ক্রমশঃ)

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

আজ ২৫শে বৈশাখ। আজ থেকে ৯১ বছর আগে এই দিনে কলকাতার এক ছোট্ট গলির মধ্যে আবির্ভাব হয়েছিল এমন একজন মহামানবের যাঁর প্রতিভার কাছে শুধু আমাদের দেশই নয়, সভ্যতা-গর্ব্বী সুদূর পাশ্চাত্য দেশগুলিও মাথা নত না ক'রে পারে নি। পৃথিবীকে তিনি আমাদের কাছে আরও সুন্দর—আরও মধুর—আরও প্রাণময় ক'রে দিয়ে গেছেন। আজ এই পুণ্য দিনে সেই মহাকবিকে স্মরণ করি, প্রণাম জানাই তাঁকে।

কী অসম্ভব গরম পড়েছে কলকাতায়! দুপুরে বাইরে বেরোবার কথা ভাবলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ঘরের দরজা-জানলা ভেজিয়ে পাখা খুলেও প্রাণ হাঁসফাঁস করে। থার্মোমিটার নাকি ১০৭ ডিগ্রী ছাপিয়ে গেছে।

কিন্তু তবু তোমাদের জন্য কলম নিয়ে বসতে হ'ল। সময় মত তোমাদের হাতে রামধনু পৌঁছে দিতে পারলে যে হাসিটুকু ফুটবে তোমাদের মুখে তারই কথা ভেবে অসাধ্য সাধনই করতে হবে।

এবারে চিঠির জবাব দেই। কুমারী দীপ্তি সেনগুপ্তা (গৌহাটী)—তোমাদের ওখানে এখনও বেলা ৯টা অবধি শীতের কুয়াসার কথা শুনলে আমাদের অবাকই লাগে। লিখেছ "বাংলা দেশের কথা শুনি আর কল্পনা করি।" কেন, বাংলা দেশ কি কখনও দেখ নি? বড় হয়েও ছোটদের পত্রিকা ভাল লাগা না লাগা মনের ওপর নির্ভর করে। রামধনুর গ্রাহকদের মধ্যে ৬।৭ বছরের গ্রাহক যেমন আছে, তেমনি ১০।১৫, ২০।৩০, এমন কি ৬০।৭০ বছর বয়স্ক গ্রাহকও আছেন। তা ছাড়া রামধনু বাড়ী এলে আসল গ্রাহকের সঙ্গে তাদের দাদা-দিদি, মা-বাবা, এমন কি দাদু-দিদিমারাও যে টানাটানি করেন এ খবর তো তোমাদের কাছ থেকেই পেয়েছি! শিশুপত্রিকা প্রকাশ এবং তার আপিস সংক্রান্ত রহস্য বছর কয়েক আগে একবার "বার্ষিক শিশুসাথী"তে লিখেছিলাম। সব পত্রিকা সম্বন্ধেই ওটা খাটে। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (সোনাতোড়—বীরভূম) তোমার অনুরোধ মত বৈশাখ সংখ্যা গেছে। চিত্রশালা দিতে তো বাধা নেই কিন্তু 'আইভরি ফিনিশ' কাগজ না পেলে যে ছবিগুলির ওপর অবিচার হয়! শ্রী[illegible] সিংহ (রামগোপালপুর)—তোমাদের রাম-ব্যায়ামাগারের কথা শুনে সুখী হ'লাম।

বই দেখে ব্যায়াম শেখা যায় না এমন নয়, কিন্তু হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলে আরও ভাল হয়। ব্যায়ামবীরদের গল্প শীগ্‌গিরই শোনাব। শ্রীশমিলা সরকার (কলিকাতা-৪)—তোমার সুন্দর চিঠিখানি এবং সুদৃশ্য কাগজে লেখা নববর্ষের বাণী চমৎকার লাগল। শ্রীশিবশঙ্কর মণ্ডল (গদাবেড়ো)—নতুন রামধনুর আসরে ঢুকে তোমার যেমন ভাল লেগেছে, তোমার ছোট্ট চিঠিখানি পেয়ে আমাদেরও তেমনি ভাল লেগেছে। শ্রীনমিতা দাম (গৌহাটী)—নতুন বছরের রামধনু সম্পর্কে তোমার স-প্রশংস ও স-অনুযোগ চিঠি খুব ভাল লাগল। ত্রুটী নিশ্চয়ই দেখাবে, নইলে সংশোধন করা যাবে কি ক'রে?

"ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক" বিভাগটির জন্য তোমাদের কাছ থেকে যে সব লেখা পাই এবার থেকে সেগুলি সম্বন্ধে একটু মতামত দেব বলেছিলাম। অনেক লেখা, অল্প অল্প ক'রে করতে হবে, কাজেই অধৈর্য্য হ'লে চলবে না। "বৃষ্টির দিন"—শ্রীপ্রকৃতি পণ্ডিত (কালিম্পং)—মন্দাক্রান্তা ছন্দে লেখা তোমার বর্ষার কবিতাটি সুন্দর হয়েছে। তবে একটু-আধটু ত্রুটী যে নেই এমন নয়। যেমন ধর, ১ম ও ২য় লাইনে যেখানে যতি পড়েছে, পরবর্ত্তী দু' লাইনে তা হয় নি। শেষের দিকটাও ঐ রকম হয়েছে। যাই হোক, সামান্য সংশোধন ক'রে এটি ছাপা চলবে। তোমার অপর কবিতাটিতে ছন্দে ত্রুটী নেই কিন্তু আগেরটিই ভাল। "বাঁকুড়া-ভ্রমণ"—কুমারী রেখা চক্রবর্ত্তী—তোমার লেখায় কোথায় কি করলে এই সব সাধারণ কথাই লিখেছ, বাঁকুড়া সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লেখ নি তো! ওতে পাঠকদের কৌতূহল মিটবে কেন? "দু' পিঠ"—এ. এস্. নূর মহম্মদ (ঢাকা)—তোমার এই কবিতাটি অনেক দিন মনোনীত হয়ে আছে, কিন্তু দীর্ঘ হওয়ায় বেরোতে দেরী হচ্ছে। ২য় পৃষ্ঠায় কিন্তু ছন্দটিও মাঝে মাঝে অন্য রকম হয়ে গেছে, সামান্য সংশোধন দরকার। "অসমভূমি"—কুমারী দীপালি সেনগুপ্তা—কবিতাটি খুব ভাল হয়েছে, অবশ্যই ছাপা হবে। তবে অন্য কবিদেরও স্থান দিতে হবে তো, তাই একটু সবুর করতে হবে। "রামধনু"—শ্রীবিনয়তোষ রায়—তোমার হাতের লেখাটি সুন্দর কিন্তু কবিতাটি অচল। ছন্দ, যতি, মিল—এ সব সম্বন্ধে তোমার তেমন ধারণা নেই মনে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই খুব ভাল ক'রে প'ড়। আর একটা কথা সবাইকে বলি—লেখা যতটা সম্ভব ছোট করবার চেষ্টা করবে। বড় লেখা, পছন্দ হ'লেও, স্থানাভাবের জন্য অনেক দিন পড়ে থাকে।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। জয় হিন্দ। —ইতি রাঃ সঃ

এ মাসের নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

রাজনীতিজ্ঞ, দার্শনিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, সৈনিক, সাংবাদিক, শিল্পী, খেলোয়াড়, চিকিৎসক—এদের মধ্যে তোমার মতে বর্ত্তমানে কার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী, কার তার পর, এই ভাবে পর পর লিখে পাঠাও। সকলের ভোট নিয়ে আমরা একটি তালিকা প্রস্তুত করব এবং যাদের তালিকা সেটার সব চেয়ে কাছাকাছি হবে তারাই পুরস্কার পাবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় দু'টি পুরস্কার দেওয়া হবে। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত ব'লে ধরা হবে। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে কিন্তু প্রত্যেক তালিকার সঙ্গে 'রামধনু' লেখা কুপনটি কেটে কালি দিয়ে পূর্ণ ক'রে পাঠাতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না। পৃথক টুকরো কাগজে ছাপা কুপন এই সংখ্যার সঙ্গে যুড়ে দেওয়া হ'ল। লেখা রামধনু-সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। পাঠাবার শেষ তারিখ ১০ই আষাঢ়, ১৩৫৮।

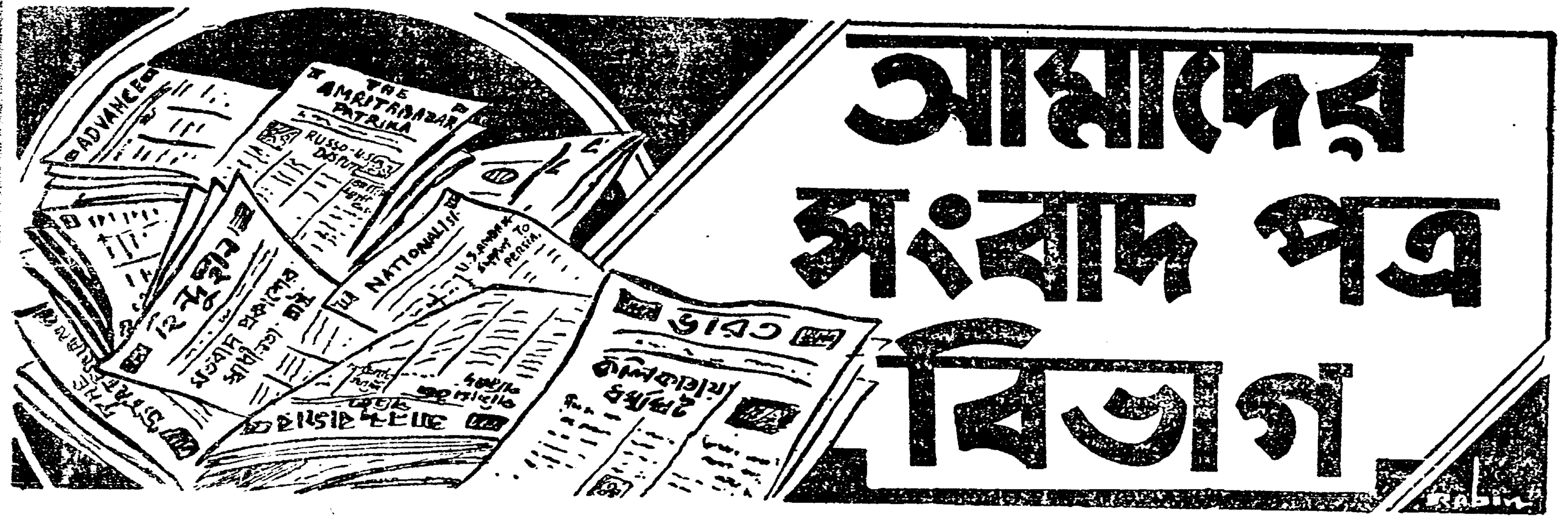

সোমনাথ

২৭শে বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ইতিহাসবিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরে নতুন ক'রে আবার সোমনাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হ'ল। গজনীর মামুদ কর্ত্তৃক সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠনের কাহিনী তোমরা ইতিহাসে পড়েছ। ন'শ' বছর পরে আবার সেই বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, এও এক ঐতিহাসিক ঘটনা হয়ে থাকবে। মহা সমারোহে এই উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে ভারত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। সঙ্গে সঙ্গে ১০১টি তোপধ্বনি সোমনাথজীর অভিনন্দন ঘোষণা করে।

বিশ্বভারতী

সম্প্রতি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীটিকে একটি সর্ব্বাঙ্গীণ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আইনও পার্লামেণ্টে পাশ হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হ'লেও বিশ্বভারতীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যটুকুকে যথাসম্ভব বজায় রাখা হবে—সরকার থেকে এই রকম আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কবিগুরুর স্বপ্ন সার্থক হোক।

পণ্ডিচেরীতে

এই সঙ্গে ভারতে আর একটি আন্তর্জ্জাতিক

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তোড়জোড় চলছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় হবে শ্রীঅরবিন্দের তপঃক্ষেত্র পণ্ডিচেরীর আশ্রমে। ঋষি অরবিন্দের পুণ্য স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য তাঁর গুণ-মুগ্ধেরা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করছেন।

খেলাধূলা

কলকাতার হকি মরশুম শেষ হয়েছে। প্রথম বিভাগ লীগ্ প্রতিযোগিতায় মোহন-বাগান ও ভবানীপুর দল সমান সংখ্যক পয়েণ্ট পাওয়ায় এই দুই দলে আবার একটি খেলা হয়। এই খেলায় মোহনবাগান বিজয়ী হওয়ায় এ বছরের হকি লীগ্ বিজয়ের গৌরব তারাই অর্জ্জন করেছে।

বাইটন্ কাপ প্রতিযোগিতায় এবার বাইরে থেকে অনেক শক্তিশালী দল এসে যোগ দিয়েছিল। মোহনবাগান সেমি-ফাইনালে বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্ট্ দলের কাছে এবং ভবানীপুর পাকিস্তানের বাটা সু কোম্পানী (লাহোর) দলের কাছে পরাজিত হয়। ফাইনাল হয় হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট্ আর বাটা কোম্পানীর মধ্যে। শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট্ দল অতিরিক্ত সময়ে গোল দিয়ে জয়লাভ করেছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

ঝর্ণা নিল আম, অপা লিচু, দীপা কলা আর গোপা আপেল নিল।

উত্তরদাতাদের নাম: দীপঙ্কর ঘোষ (বিষ্ণুপুর); রত্না, জয়ন্ত, স্বপ্না ও চন্দ্রা রায় (বাঁকীপুর); দিলীপ ও কল্যাণকুমার সমাজদার (কলিকাতা-৪); নমিতা দাম (গৌহাটি); শম্ভুনাথ সিংহ (রামগোপালপুর); নীরদ, তিমির, দুর্গা, হিমাংশু, সুধাংশু, দীপ্তা ও নীণ্টু ঘোষ (হাওড়া); ছায়া, আরতি, জয়ন্ত বসু (কলিকাতা ২৯); সুনীলকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী (বহরমপুর); অসীমা পাল, অপূর্ব্ব, গৌরী, নন্দন ও মেজদি (করিমগঞ্জ); সরিৎ দত্ত (গুড়াপ); শর্মিলা সরকার (কলিকাতা); সংযুক্তা, মঞ্জুলিকা, সুজিত, সুমিত্রা, শান্তনু, সুচিত্রা, শীলা, বেলা ও প্রবীর দাশগুপ্ত (কলিকাতা-২৬); বিভাসবিহারী বসু (পাটনা); মঞ্জুলা ও বাণী মজুমদার (বহরমপুর); সঞ্জীবকুমার গাঙ্গুলী (দমদম্); মঞ্জু, অঞ্জু, রঞ্জু, গৌরী ও মীনাক্ষী (দিল্লী); বেণু ঘোষ (কাটিহার); মালবিকা দত্ত, বৌদি, বাপন, ফণীবাবু, গৌতম (করিমগঞ্জ)।

নূতন ধাঁধা

মণি, ননী, চুনী, অপু, দীপু আর ইন্দিরা পাঁচ ভাই আর এক বোন, সব একসঙ্গে পড়ে। সেদিন মাষ্টার মশাই সকলকে পরীক্ষা করেছেন, কে কত নম্বর পেল ভাইবোনে তাই নিয়ে খুব জটলা হচ্ছিল। শেষে ইন্দিরা আর থাকতে না পেরে মাষ্টার মশাইকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল সে

কত নম্বর পেয়েছে। মাষ্টার মশাই বললেন, "ও ভাবে বলব না, তুমি কত পেয়েছ বুদ্ধি ক'রে বার করবে। পরীক্ষায় পুরো নম্বর ছিল ৫০। তোমাদের মধ্যে একজন পেয়েছ ঠিক পাশ নম্বর। একজন পেয়েছ পাশ নম্বরের চেয়ে ১ বেশী, একজন ২ বেশী, একজন ৩ বেশী, একজন ১০ বেশী। আর বাকি জন পেয়েছ পাশ নম্বরের ঠিক দ্বিগুণ। সকলের নম্বর একত্র ক'রে হচ্ছে ১২১। আবার ৫টি ভাইয়ের মধ্যে কয়েকটি ভাই মিলে যা পেয়েছে বাকি কয়েকটি ভাই পেয়েছে তার ঠিক দ্বিগুণ। তা হ'লে হিসেব ক'রে বল তুমি কত পেয়েছ।"

তোমরা বলতে পার ইন্দিরা কত নম্বর পেয়েছে?

চিত্র-পরিচয়

৭৩ পৃষ্ঠার প্রথম ছবি—য়্যাণ্ট-ইটার বা পিপীলিকাভুক; এখনও দেখা যায়। ২য় ছবি—ওকাপি; দুষ্প্রাপ্য জীব। ৭৪ পৃষ্ঠার প্রথম ছবিটি একটি ডাইনোসরের, ২য়টি একটি টেরোডাকটাইলের। দু'টিই পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে।

উপন্যাস
(বড়দের জন্য)

মনের মতো মেয়ে ২৲
মন নিয়ে খেলা ২৲
মহীয়সী নারী ২৲
প্রিয়ার রূপ ২৲
জীবন-সঙ্গিনী ২৲
অমর প্রেম ২৲
মনের মিল ২৲
বর কনে ২৲
ছিনিমিনি ১॥০
নেপথ্য ১॥০
মুক্তিস্নান ১॥০
স্বয়ম্বরা ১॥০
মিলন শঙ্খ ১॥০
মিছিল ১॥০
বৌদিদি ২৲
বন্ধুর বউ ১॥০
বড়ঘরের মেয়ে ১॥০
সোনার বাংলা ১॥০
সুখের বাসর ২৲
মধুমিলন ১॥০
মিলন-প্রতীক্ষা ১॥০
গরীবের মেয়ে ১॥০

ছোটদের বঙ্কিম গ্রন্থাবলী

যুগলাঙ্গুরীয়	১৲	আনন্দমঠ	১৲
দেবী চৌধুরাণী	১৲	কপালকুণ্ডলা	১৲
বিষবৃক্ষ	১৲	চন্দ্রশেখর	১৲

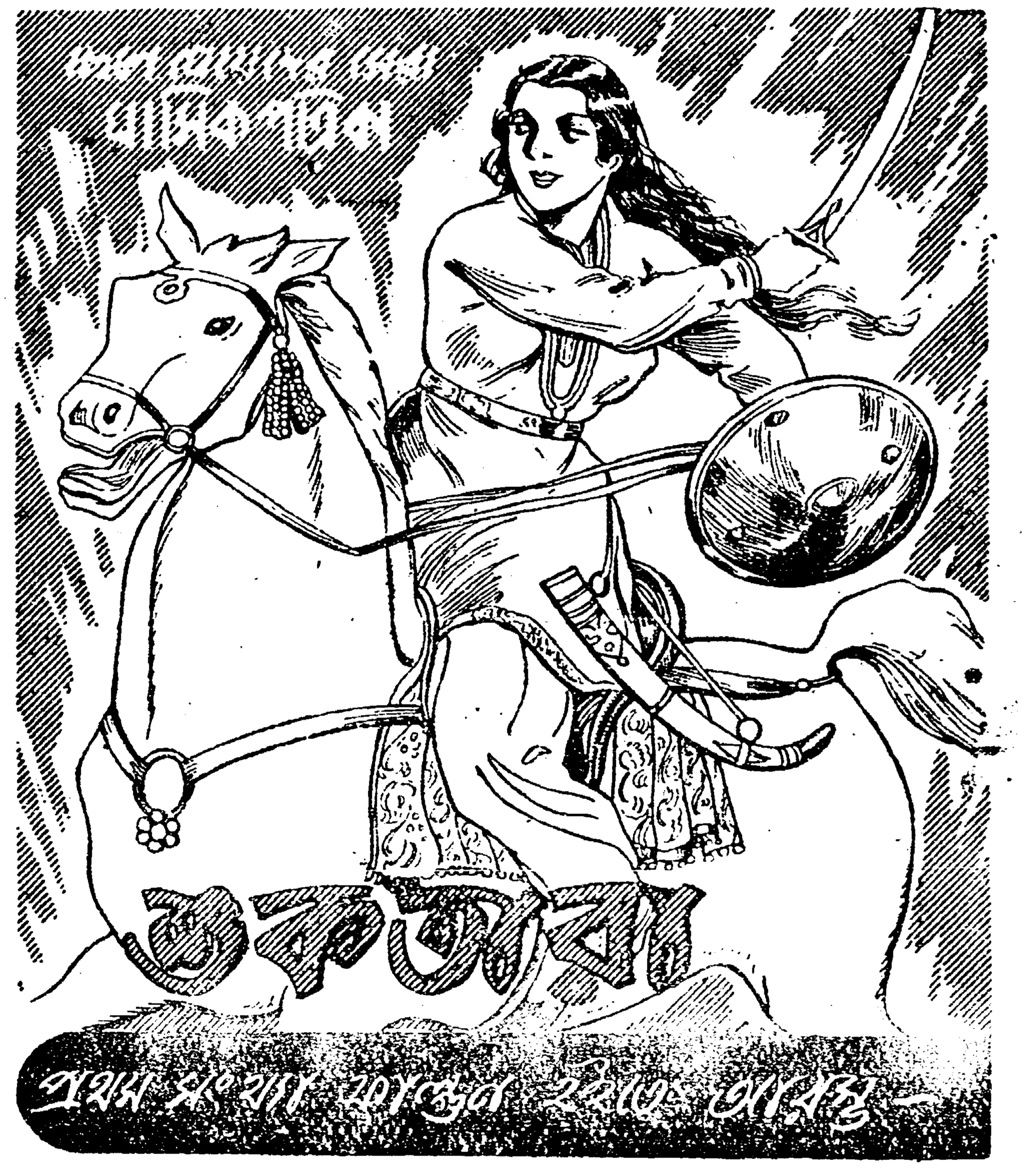

প্রতি সংখ্যা ।৵ বার্ষিক ৪৲ টাকা

দেব সাহিত্য কুটীর

দুর্গেশনন্দিনী	১৲	মৃণালিনী	১৲
কৃষ্ণকান্তের উইল	১৲	রজনী	১৲
সীতারাম	১৲	রাজসিংহ	১৲

রাধারাণী ও ইন্দিরা ১৲

সম্পাদক : শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

রোমাঞ্চকর ও ভয়াবহ ডিটেকটিভ কাহিনী

অন্ধকারের বন্ধু ৸০
মৃত্যুদূত ১৲
হত্যার প্রতিশোধ ১৲
লাল দলিল ১৲
ব্যথার দান ১৲
রাত্রির যাত্রী ১৲
গুপ্ত ঘাতক ১৲
হারানো বই ৸০
ভূতের মত অদ্ভুত ৸০
স্বর্গের সিঁড়ি ৸০
সোনার খনি ১৲
ব্লাড হাউণ্ড ১৲
মুখোশের অন্তরালে ১৲
মুখ আর মুখোশ ৸০
নীল আলো ৸০
ঘোর প্যাঁচ ৸০
শেষ বলি ১৲
দেশের ডাক ১৲
রাতের আতঙ্ক ৸০
স্বপ্ন হলো সত্যি ১৲
কালের কবলে ১৲
জীবন্ত সমাধি ৸০

দেব সাহিত্য কুটীর ❋ ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা ৯

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানেরজয়যাত্রা	১৲
বিজ্ঞান-বুড়ো	১৲
আকাশের গল্প	১।০
আবিষ্কারের গল্প	৸০
ধূমকেতু	৸০
অয়েল পেন্টিং (নাটক)	।০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১৲

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি	১।০
পদ্মরাগ	১॥০
সোনার হরিণ	১॥০
নূতন পুরাণ	৸৶০
হাস্য ও রহস্য	৸৶০
চায়ের ধোঁয়া	৸০
দমাদম্ দামোদর (নাটক)	।৶০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি রসা রোড, কলিকাতা ২৫

লিলি বিস্কুট

রকমারিতায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

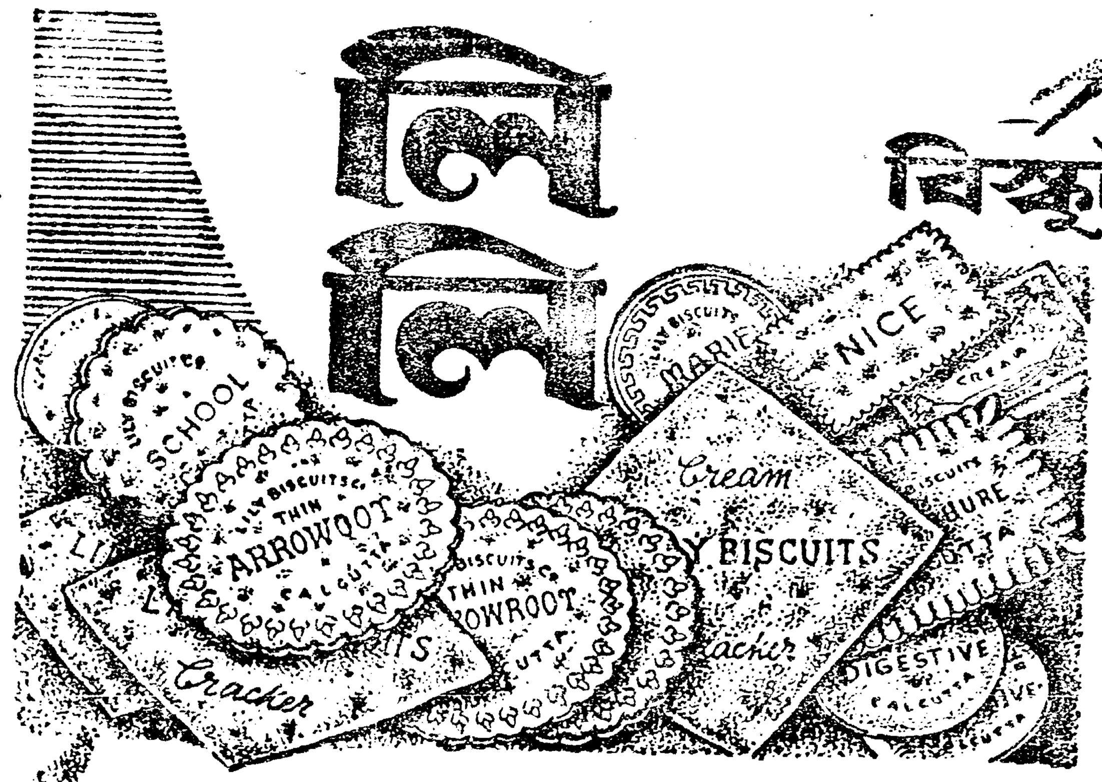

কয়েকটী মনোরম

ও

স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন-ক্রীম,
ক্যাণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ
৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

রামধনু

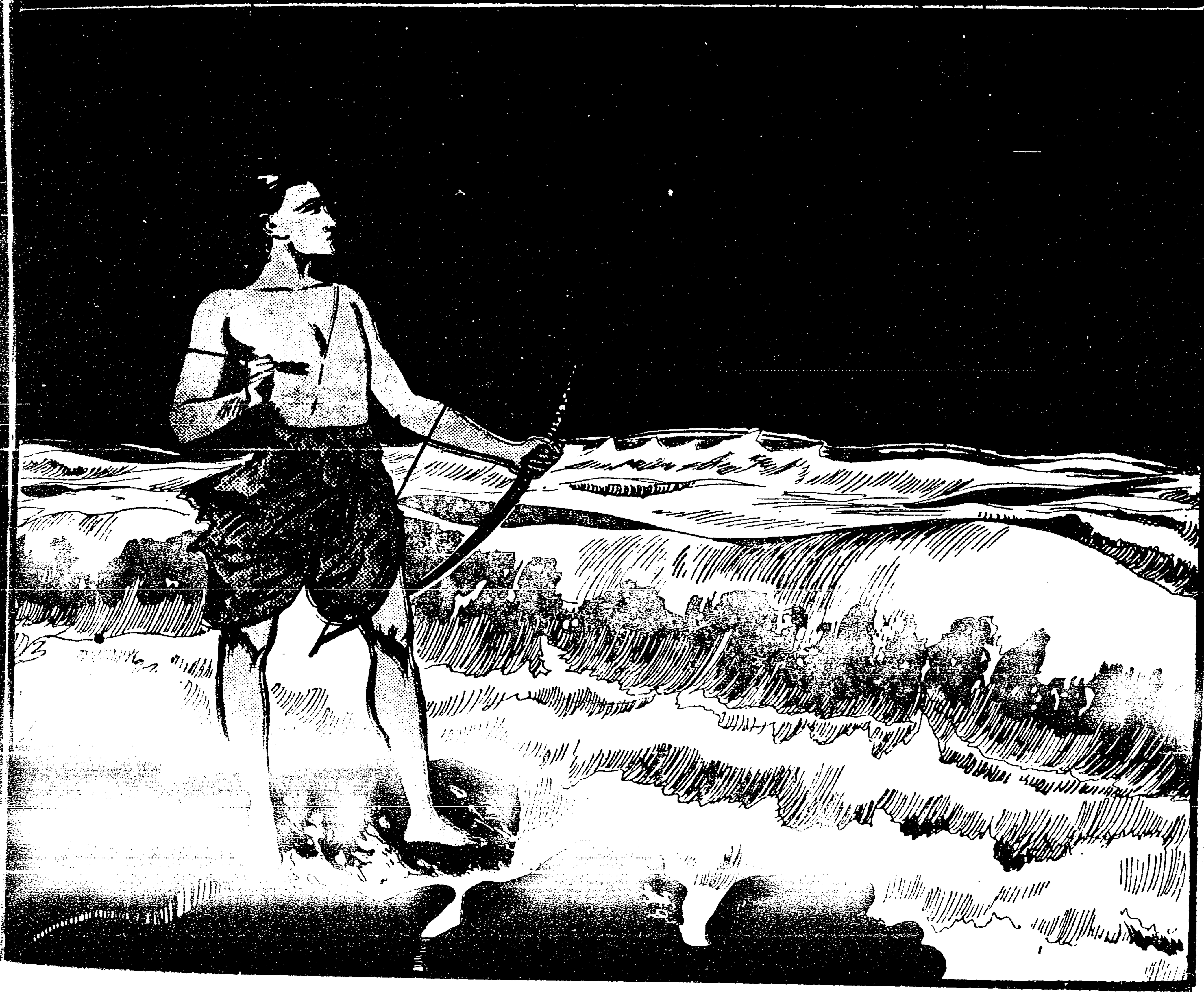

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস-সি.

ার্ষিক ৪.
াসিক ২।০
তি সংখ্যা ।৵০

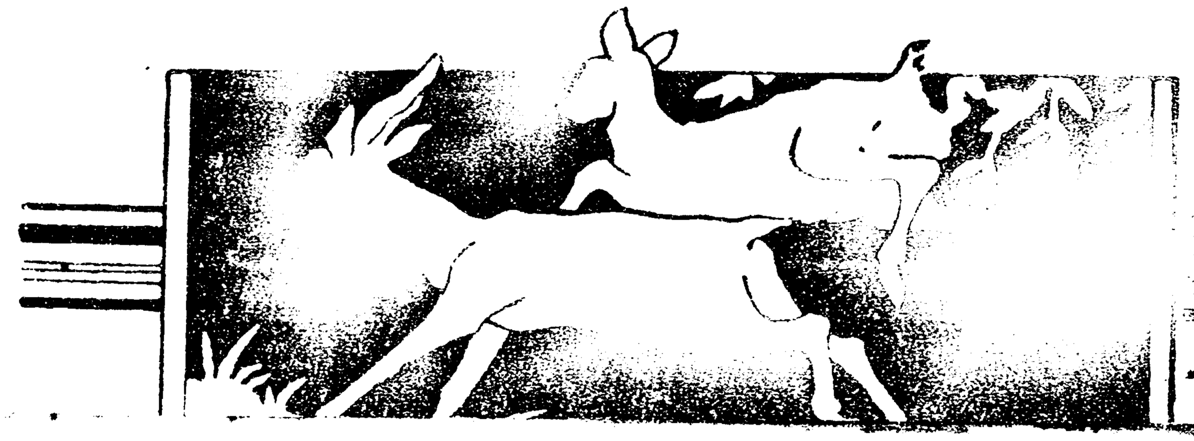

কার্য্যালয় :
১৬, টাউনসেণ্ড রোড
কলিকাতা ২৫

কিশোর পরিচালিত ছোটদের
সচিত্র মাসিক

“সোনার কাঠি”

সম্পাদক—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

মাসিক পত্রিকা অনেক বেরিয়েছে—কিন্তু ঠিক এ রকমটি আর কোথাও বেরোয় নি। গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধে, সমালোচনায় ঠিক যেমনটি তোমরা চাও !

মূল্য— প্রতি সংখ্যা	বার্ষিক সডাক চাঁদা
৶৹ আনা	২৲ টাকা

একমাত্র ঠিকানা :—
কার্য্যাধ্যক্ষ, সোঃ কাঃ—৪-এ, বস্পাস রোড,
কলিকাতা-২৯

বড়দের প্রীতি-উপহারের
একখানি সেরা বই

কথাশিল্প

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবোধ সান্যাল, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ বসু, সরোজ রায় চৌধুরী, গজেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী ও বাণী রায় প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকদের লেখা গল্প-সংগ্রহ। প্রত্যেক লেখকের রেখাচিত্র ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্বলিত। সুন্দর বাঁধাই, বিরাট বই।

মূল্য ৩৷৹

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড
১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নবাব

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৪শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৫৮ { ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় এসো এসো

শ্রীপূর্ণেন্দু মল্লিক

আষাঢ় এসো এসো, আকাশখানি জুড়ে,
আশার বাণী আনো চাষার হৃদিপুরে ;
নদীর হারানিধি নদীরে ফিরে দাও,
উধাও গতি দাও দু'ধার ভেঙেচূরে।

কাননে বারি ঢালি' আননখানি তার
সুহাস করি' তোলো সুবাসে চারিধার ;
কাজল কালো মেঘে সজল করো বায়ু,
উজ্জল রোদখানি আজিকে থাক দূরে।

রবি তো রোজই আসে আজিকে এসো তুমি ;
আকুল হ'য়ে এসো অকূল নভ চুমি'—
মাঠের শেষে যেথা সবুজ নীলে মেশে,
সেথায় এসো তুমি ও পথ দিয়ে ঘুরে।

মেদুর মেঘে মেঘে মধুর মায়া নিয়ে,
গভীর গিরি-বনে নিবিড় ছায়া দিয়ে,—
নগরে বাটে ঘাটে মাদল-ধ্বনি তুলে,
বাদল এসো এসো, অঝোর গীতি-সুরে।

লালকুঠি

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

৩

সেদিন রাতে ঘুমের মধ্যে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম।

একটা ধূসর রংএর বিড়াল আমার বিছানায় পায়ের কাছে বসে আছে এবং আমাকে যেন তার নীরব চাহনি দিয়ে অনুসরণ করতে কাকুতি জানাচ্ছে। আমি তার অনুসরণ করলাম। সে আমাকে সিঁড়ির গোড়ায় যে লাইব্রেরী-ঘর রয়েছে সেখানে নিয়ে গেল। সে ঘরের এক কোণায় একটি বইএর শেলফের কাছে এসে বিড়ালটা তার থাবা দিয়ে শেলফের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে দিলে। তারপর বিড়াল ও লাইব্রেরী-ঘর মিলিয়ে গেল।

পরের দিন প্রমোদকে আমার স্বপ্নের কথা বললে সে বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হ'ল। তার সঙ্গে লাইব্রেরী-ঘরে গিয়ে দেখলাম যে, স্বপ্নে যা যা দেখেছি তার সবটাই যেন মিলে যাচ্ছে! এমন কি বিড়ালটা যেখানে থেমেছিল সে জায়গটি পর্য্যন্ত আমি চিনতে পারলাম। আমার মনে হচ্ছিল, এ ঘরে আমি অনেক বার এসেছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, স্বপ্ন দেখার আগে এ বাড়ীতে কোন লাইব্রেরী আছে কিনা তাইই আমি জানতাম না।

হঠাৎ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, বিড়ালটা তার থাবা দিয়ে শেলফের যে স্থানটা দেখিয়ে দিয়েছিল সেখানটা ফাঁকা—একখানা বই সেখানে থেকে তুলে নেওয়া হ'য়েছে।

প্রমোদকে জিজ্ঞেস করলাম, এখান থেকে একখানা বই হয়তো কেউ পড়তে নিয়েছে।

প্রমোদ পরীক্ষা করে দেখলে; তারপর হঠাৎ বললে, এই দেখ, যে বইখানা নেই তারই এক টুকরো ছেঁড়া কাগজ পড়ে রয়েছে এখানে! কাছেই একটা বিড়ালের নখও দেখা গেল।

টুকরো কাগজটুকু খুলে দেখলাম, তাতে লেখা রয়েছে—বিড়ালটা............।

প্রমোদকে বললাম, এখান থেকে যে বইখানা পাওয়া যাচ্ছে না তার নাম জানবার কোন উপায় আছে কি?

প্রমোদ বললে, নিশ্চয়ই, ক্যাটালগ খুঁজলেই পাওয়া যাবে। ক্যাটালগ রয়েছে মাসীমার কাছে।

আমি বললাম, তোমার মাসীমা এ সম্বন্ধে কিছুই বলবেন না, জেনে রাখ।

প্রমোদ প্রশ্ন করলে, তোমার এ রকম মনে হওয়ার কারণ?

বললাম, তা জানি না। তবে এ কথা ঠিক তিনি তাঁর নিজের স্বার্থের জন্যেই এ কথা প্রকাশ করবেন না। কোন ভীষণ বিপদ্ উপস্থিত হ'লেও তিনি মুখ বুজেই থাকবেন, এই আমার বিশ্বাস।

সেদিন কাটল। আমার মনে হ'ল কোন ভীষণ ঝড়ের পূর্ব্বাভাস পাচ্ছি আমি। গভীর অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে মরছি সত্যি, কিন্তু শীঘ্রই হয়তো আলো দেখতে পাব।

সত্যি সত্যিই সমস্যার সমাধান হ'ল, কিন্তু তা এক অদ্ভুত উপায়ে।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর আমরা সকলে নিঃশব্দে বসেছিলাম ড্রইং রুমের ভিতর। কারোর মুখে কোন কথাটী ছিল না—ঘরখানা যুড়ে একটা থম্‌থমে ভাব! হঠাৎ একটা ছোট্ট ইঁদুর মেঝের উপর দিয়ে পালিয়ে গেল। আমাদের সকলেরই দৃষ্টি পড়েছিল সে দিকে, কিন্তু অবিনাশ একটা অদ্ভুত কাজ করে বসলে। হঠাৎ সে তার চেয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ল মাটীতে, তার পর তীব্রগতিতে ইঁদুরটীর পশ্চাদ্ধাবন করলে সে। ইঁদুরটি ইতিমধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। লক্ষ্য করলাম, অবিনাশের সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে।

এ রকম কল্পনাতীত ব্যাপারের সম্মুখীন দ্বিতীয় বার হই নি জীবনে। অবিনাশের অদ্ভুত আচরণে, তার হাবভাবে আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, অভাবনীয় ব্যাপার! এও কি সম্ভব? একে একে সকলকার মুখের দিকে একবার তাকালাম। অশরীরী একটা ভয়ের ভাব সুস্পষ্ট সকলের মুখে। কিন্তু নমিতা দেবী!...

বিছানায় শুয়ে সমস্ত ঘটনাটা গোড়া থেকে একবার ভেবে নিচ্ছিলাম। হঠাৎ প্রমোদের চীৎকারে উঠে বাইরে এলাম।

দেখলাম, প্রমোদ তার সমস্ত শক্তি দিয়ে নমিতা দেবীর ঘরের দরজার উপর আঘাত করছে। আমাকে দেখেই বললে, মাসীমাকে খুন করছে সে, শুনতে পাচ্ছ না কি?

ভিতর থেকে একটা বিড়ালের ক্রুদ্ধ আক্রোশের গোঙানীর শব্দ শোনা গেল, আর তার পরই অন্য একটা আর্ত্তনাদ—হাঁ, কণ্ঠস্বর নমিতা দেবীরই!

উত্তেজিত ভাবে বললাম, দরজা আমাদের ভাঙতে হবে; এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা দু'জনে কঠিন আঘাত করতে লাগলাম দরজার উপর। খানিক পরে দরজা ভেঙ্গে গেল।

ঘরের মধ্যে রক্তাক্ত দেহে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন নমিতা দেবী। তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া এখনো বন্ধ হ'য়ে যায় নি, তবে তাঁর গলার সমস্ত মাংসই কে ছিঁড়ে নিয়েছে। এ দৃশ্যে আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। ফিস্ ফিস্ করে বললাম, বিড়ালের ধারাল নখই…

তখনই নমিতা দেবীর ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম। ঠিক করলাম, ক্ষতের ব্যাপারটা আপাততঃ গোপন রাখতে হবে।

প্রত্যূষের অন্ধকার তখনও সরে যায় নি। প্রমোদকে সঙ্গে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। মালীদের কাছ থেকে একখানা কোদাল যোগাড় ক'রে আমরা পাঁচীলের বাইরের তেঁতুল গাছটার তলায় একটা জায়গা খুঁড়ে একটা বিড়ালের মৃতদেহ আবিষ্কার করলাম। আজ এক সপ্তাহের উপর বিড়ালটা কবরস্থ করা হ'য়েছে, কিন্তু মৃতদেহটা একটুও পচে নি বা কোন দুর্গন্ধযুক্ত হয় নি। তা ছাড়া, আমি প্রথম দিন এসেই মাঠে যে ধূসর রংএর বিড়ালটা দেখেছি, এটা যে তারই মৃতদেহ তাতেও কোন সন্দেহ নেই। এটাকে আরও বহুবার দেখেছি আমি নানাস্থানে।

একটা পচা বাদামী তেলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল মৃতদেহটা থেকে। প্রমোদ বললে প্রুসিক এসিডের গন্ধ, নয় কি?

বললাম, হ্যাঁ।

প্রমোদ বললে, কিন্তু এ যে একেবারে অসম্ভব! এ যে সমস্ত রকম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে! হ্যাঁ, তবে কালকের রাতের ইঁদুরটা—কিন্তু না, না, অসম্ভব…।

বললাম, অত ব্যস্ত হয়ো না। নমিতা দেবী অদ্ভুতশক্তিসম্পন্না। তাঁর মোহাবিষ্ট করবার বিশেষ ক্ষমতা আছে তা আশা করি তুমি জান। অবিনাশের মত শান্ত, ভাল ছেলেদের উপরই এই সব শক্তি বিশেষ কার্য্যকরী হয়। এ কথা তুমি ভুলে যেয়ো না প্রমোদ, অবিনাশ যদি এই রকম একটা বোকা, মূর্খ, জড় হয়ে থাকে তবে বিষয়-সম্পত্তি সবই যে হবে নমিতা দেবীর আর তাঁর ছেলের। তা ছাড়া অবিনাশ এখন বিয়ে করতে যাচ্ছে।

প্রমোদ হয়তো বুঝলে ব্যাপারটা। বললে, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?

বললাম, নমিতা দেবীর ক্ষতটা একটু শুকিয়ে উঠলেই তাঁকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে কিছুদিনের জন্য। তারপর যা হয় দেখা যাবে। আজ তিনি নিজের হাতে বোনা বিষবৃক্ষের ফল নিজেই গলাধঃকরণ করতে যাচ্ছেন। এখান থেকে অন্যত্র গেলে হয়তো তিনি বেঁচেও যেতে পারেন এবারকার মত।

এর পর আরও দু'টো অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হ'ল যার জন্যে আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।

প্রথমতঃ অবিনাশ একদিন গ্রামের একটা পুকুরে আকস্মিক ভাবে ডুবে গেল। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে তোলা হ'লে পর আমরা কৃত্রিম উপায়ে তার প্রাণ ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে থাকি। অপর্ণা কাছেই দাঁড়িয়েছিল, এ দৃশ্যে সে নিজেকে সংযত রাখতে পারলে না এবং 'অবিনাশ দা' বলে চীৎকার ক'রে অবিনাশের পাশেই সংজ্ঞাহীন হ'য়ে পড়ে গেল। সম্ভবতঃ এই প্রাণ দিয়ে ডাকটার ফলেই আত্মবিস্মৃত সংজ্ঞাহীন অবিনাশের জ্ঞান ফিরে এল আর সঙ্গে সঙ্গে

তার পূর্ব্বের মত স্বাভাবিক অবস্থা দেখা দিল। এতদিন ধরে যে কি সব ঘটেছে তা সে মনে করতে পর্য্যন্ত পারলে না। শুধু বললে, যে, সে একটা মজার স্বপ্ন দেখেছে, সে যেন একটা বিড়ালে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়তঃ সেইদিনই নমিতা দেবী অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেলেন। আমার মনে হয়, অবিনাশকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে দেখে যে আকস্মিক আঘাত তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁর দুর্ব্বল শরীর সহ্য করতে পারে নি।

নমিতা দেবীর মৃতদেহের কাছে বসে জিজ্ঞেস করলে প্রমোদ, ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝতে পারছি না, সুনীল!

বললাম, একটা জীবনের পরিবর্ত্তে আর একটা জীবন। অবিনাশ বেঁচে উঠেছে নিতান্ত অসঙ্গত ভাবে—তার বাঁচবার কোন কথাই ছিল না। তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল।

প্রমোদ একটু ভাবলে, বললে, প্রুসিক এসিড দিয়ে?

বললাম, হ্যাঁ, প্রুসিক এসিড দিয়েই।

আমি ও প্রমোদ আমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে কাউকে কিছু প্রকাশ করি নি। লোকে শুনলে হয়তো বলবে অবিনাশের সাময়িক ভাবে বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল, নমিতা দেবী সাময়িক মস্তিষ্কবিকৃতির জন্যে নিজের গলা নিজেই কেটেছিলেন! আর ধূসর রংএর বিড়ালটা? ওটা নিতান্তই মন-গড়া!

কিন্তু দু'টো জিনিসের ব্যাখ্যা বোধ হয় তারা দিতে পারবে না। একটা হ'ল বারান্দায় অবস্থিত চেয়ারখানা ছিন্নভিন্ন করবার কোন সদুত্তর, দ্বিতীয়টা হ'ল লাইব্রেরীতে যে বইখানা পাওয়া যাচ্ছিল না সেটা হচ্ছে এমন একখানা বই যার ভিতর মানুষকে কোন পশুতে রূপান্তরিত করবার উপায় বর্ণিত আছে।*

* বিদেশী গল্প থেকে।

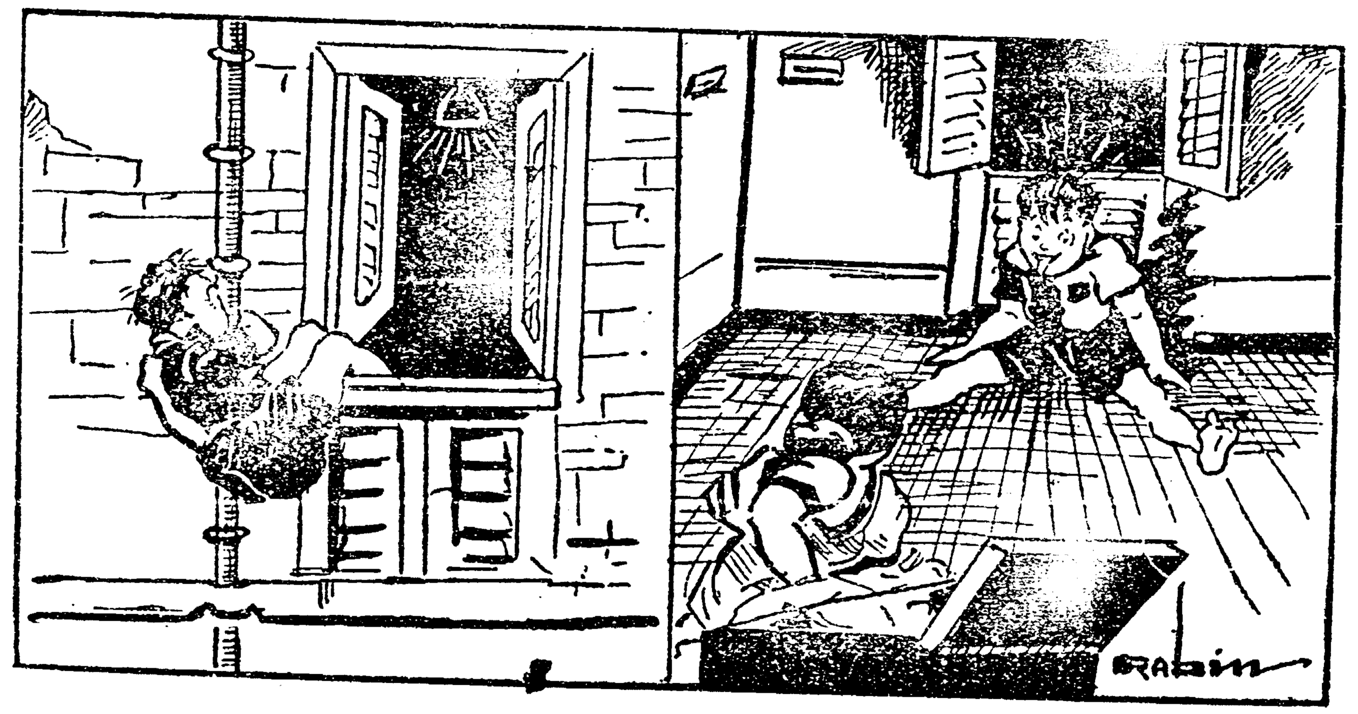

চিত্রশালা

ভুবনেশ্বর

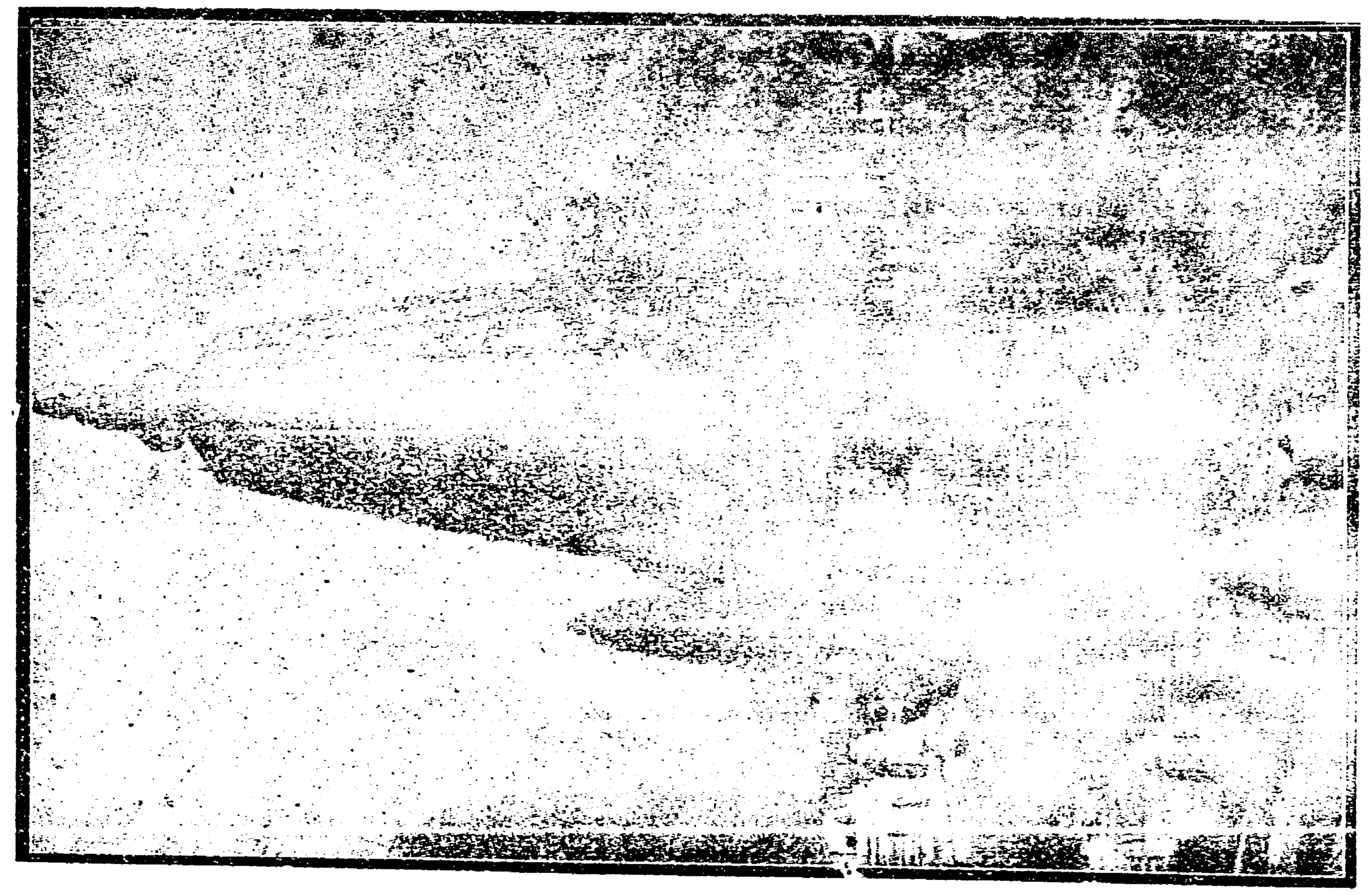

বুদ্ধগয়া

দু'টি ইতিহাস-বিখ্যাত মন্দির

জয় সোমনাথ !

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্

সুলতান মাহ্‌মুদ কাঁদছেন...

এক শতাব্দীর এক তৃতীয়াংশ ধরে যাঁর পদভরে পারস্যের পশ্চিম প্রান্ত থেকে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত থরথর করে কেঁপেছে, সেই দুর্দ্ধর্ষ, অপরাজিত সম্রাট্ গজনীর মাহ্‌মুদ মৃত্যুশয্যায় বসে আছেন, তাঁর দুই চোখ দিয়ে আঝোরে নেমে আসছে অশ্রুধারা। তাঁর সামনে সাজানো রয়েছে থরে থরে রত্নরাশি। দিক্‌বিদিক্ জয় করে লুঠে নিয়ে আসা পঁয়ত্রিশ সের মণিমাণিক্য।

মাহ্‌মুদ কাঁদছেন, আর অতীত ছবি এক এক করে ভেসে উঠছে তাঁর মনে। কত ভস্মীভূত নগরী, কত বিধ্বস্ত মন্দির, কত রক্তপ্লাবিত যুদ্ধক্ষেত্র, ভয়ার্ত্ত নরনারীর আর্ত্তনাদ, আহতদের করুণ চীৎকার,—আর তার উপর সব ছাপিয়ে উঠছে তাঁর বিজয়ী সৈন্যদলের উল্লাসধ্বনি।

খোরাসান...ঘুর...ইস্পাহান...সিস্তান...মকরান...

ওদিকে পূবে সোনার দেশ ভারতবর্ষ। পেশাওয়ার···বৈহন্দ···কাশ্মীরের ভূস্বর্গ···কাংড়ার নগরকোট···মূলতান, সহরের দরজা দিয়ে রক্তস্রোত গড়িয়ে বাইরে যাচ্ছে, নিহতদের রক্ত শুকিয়ে তলোয়ারের মুঠিতে সুলতানের হাত এঁটে বসে গিয়েছে! তারপর থানেশ্বর···মথুরা···কনৌজ···কালিঞ্জর···গোয়ালিয়র···

সোমনাথ। সোমনাথ! সাগর-কূল প্রভাসতীর্থে আকাশ-ছোঁয়া শিব-মন্দির সোমনাথ!

১০২৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী। বৃহস্পতিবারের বারবেলায় মাহ্‌মুদ এসে পৌঁছলেন সোমনাথ মন্দিরের বন্ধ দরজার সামনে।

পাথরের উঁচু দেওয়াল-ঘেরা বিরাট্ মন্দির। পিছনে সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে সেই দেওয়ালের উপর। ভিতরটা একটা ছোটখাট সহরের মত। হাজার হাজার লোক বাস করে সেখানে। মন্দিরের পুরোহিতই তো এক হাজার জন। নর্ত্তকী আর গায়িকার সংখ্যা সাড়ে তিনশ', দাসদাসীর সংখ্যাও পাঁচশ'র কম নয়। আরও কত লোক, সব সোমনাথের সেবায় নিযুক্ত। সবাই বাস করে এই মন্দিরের প্রাচীরের ভিতরে।

আর ঠিক মাঝখানে সোমনাথ দেউল। তার চূড়া ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে তের-তলা পর্য্যন্ত, মাথায় চৌদ্দটী সোনার গোলক বসানো। সূর্য্যের আলো তাতে ঠিকরে এসে চোখ ধাঁধিয়ে দিল মাহ্‌মুদের। মন্দিরের ঘেরা-বারান্দায় ছাপ্পান্নটী সীসা-ভরা সেগুন কাঠের থাম, তার গায়ে হীরামাণিক বসানো।

এই কুবেরের ঐশ্বর্য্য লুঠ করবেন বলেই তো উত্তর থেকে ভীষণ মরুভূমি পার হয়ে এসেছেন মাহ্‌মুদ। গজনী থেকে মূলতান, সেখান থেকে ত্রিশ হাজার উটের পিঠে শুধু খাদ্য আর পানীয় নিয়ে তাঁর ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ঝড়ের মত চলে এসেছে যশল্মীর আনহিলওয়ারার পথে সাগরতীরে সোমনাথে।

শুধুই কি ঐশ্বর্য্যের লোভ? তা নয়। হিন্দুর দেবমন্দির ধ্বংস করাও তো মাহ্‌মুদের জীবনের একটী ব্রত। আর, মন্দিরই যদি ভাঙতে হয়, তা হ'লে সোমনাথের মত মন্দির আর কোথায় আছে?

মথুরা লুঠ করবার সময়েই মাহ্‌মুদ শুনে গিয়েছিলেন মরুভূমির ওপারে পশ্চিম-সাগরের কোলে সোমনাথ মন্দিরের কথা। সোমনাথের পূজারীরা নাকি দম্ভ ক'রে বলেছিলেন যে প্রভু সোমনাথ রুষ্ট হয়েছেন বলেই অন্য দেবতারা শাস্তি পাচ্ছেন, তাঁদের মন্দির ধ্বংস হচ্ছে। কিন্তু মাহ্‌মুদ সোমনাথের দিকে পা বাড়াতে সাহস পাচ্ছেন না।

এ কথা শুনেও মাহ্‌মুদ মথুরা থেকে ফিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু কাঁটাটা তাঁর মনে রইল। তাই আবার আজ এসেছেন শত শত ক্রোশ পথ পার হয়ে গজনী থেকে সোমনাথ-পত্তনে। মনে যেমন ক্রোধ, তেমনি কৌতূহল।

কে এ দেবতা? এ কথা কি সত্য যে চন্দ্রদেব নিজেই এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, আর দু'বেলা সাগর-জলে জোয়ার তুলে এঁর পা ধুইয়ে দিয়ে যান? তাই বুঝি এঁর নাম সোমনাথ? প্রথমে নাকি এঁর মন্দির ছিল সোনার, পরে হয় রূপোর, শেষে এই মন্দির নাকি তৈরী করে দিয়েছেন রাজা ভীমদেব?

মাহ্‌মুদ এগিয়ে আসছেন সোমনাথ মন্দিরের দিকে, আর ভাবছেন এই সব কথা। তিনি আর একটী কথাও শুনেছেন। সোমনাথ নাকি মোটেই হিন্দুর দেবতাই নয়। আরব দেশে যখন মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল, তখন মক্কার কাবা-মন্দিরে ছিল 'মনাৎ' বলে একটী মূর্ত্তি। মুসলমান ধর্ম্ম সে দেশে প্রচলিত হওয়ার পর মনাৎ-এর ভক্তরা মূর্ত্তিটিকে নিয়ে ভারতে পালিয়ে এসে সৌরাষ্ট্রের উপকূলে একে

স্থাপন ক'রে এর নাম দেয় 'সো-মনাৎ'। ক্রমে হিন্দুরা এর পূজো আরম্ভ ক'রে একে ক'রে নেয় তাদের দেবতা—সোমনাথ।

কে জানে কোন্ কথাটা ঠিক? তাতে অবশ্য মাহ্‌মুদের কিছু এসে যায় না। তিনি এসেছেন মূর্ত্তি ভাঙতে আর মন্দির লুঠতে, তা সে মনাৎ-এরই হোক আর সোমনাথেরই হোক।

মন্দির আক্রমণের আদেশ দিলেন সুলতান। মুসলমান বাহিনী অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ল মন্দির-প্রাচীরের উপরে। আর সোমনাথের রক্ষক কারা? কোনও সেনাদল নয়,—স্বয়ং সোমনাথ এই দুর্ব্বৃত্ত বিধর্ম্মীকে ধ্বংস করবেন এই বিশ্বাসে তাঁর পুরোহিত-ভক্ত-পরিচালক দল যা অস্ত্রশস্ত্র পেল তাই নিয়ে এসে দাঁড়াল মন্দিরের প্রাচীরের উপর। তাদের কিছুতেই হটাতে পারল না সুলতানের সৈন্যেরা—বাল্‌খ্-খ্বারিজ্‌ম্-হমাদানবিজয়ী গজনীর দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধাদল। ৬ই জানুয়ারী কেটে গেল।

পরদিন আবার আক্রমণ সুরু হ'ল। শুক্রবার, জুম্মার নামাজের সময় মুসলমান সৈন্যেরা মন্দিরের প্রাচীর অধিকার করল। তখন হিন্দুরা দলে দলে মন্দিরে গিয়ে দেবতাকে স্পর্শ ক'রে এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল তাদের উপর। প্রাচীর ছেড়ে হটে এল মুসলমানরা।

সেই শেষ। পরদিন আর হিন্দুরা ঠেকিয়ে রাখতে পারল না শত্রুদের। শনিবার, ৮ই জানুয়ারী, গজনীর সৈন্য মন্দিরের আঙিনায় নেমে পড়ল। তার পর সুরু হয়ে গেল অবর্ণনীয় হত্যাকাণ্ড। পঞ্চাশ হাজার হিন্দুর বুকের রক্তে মন্দিরের আঙিনা লাল হয়ে গেল, তবু দেবতাকে রক্ষা করা গেল না।

সোমনাথের দেউলে প্রবেশ করলেন গজনীর সুলতান মাহ্‌মুদ।

মন্দিরের কারুকার্য্যময় চন্দনকাঠের দরজা পার হ'তেই—সামনেই বিরাট্ শিবলিঙ্গ সোমনাথের। সাত হাত উঁচু, আর বেধ তিন হাত। অপূর্ব্ব কারুকার্য্য করা একখানা বহুমূল্য আচ্ছাদন দিয়ে সেটী ঢাকা, তার উপরে মন্দিরের ছাদ থেকে ঝুলানো হীরা-মোতি-বসানো সোনার একটী মুকুট। রত্নবেদী ঘিরে আর চারিদিকের দেওয়ালে রয়েছে অসংখ্য সোনারূপার মূর্ত্তি, অন্য সব দেবদেবীর। দেওয়ালে সারি সারি সোনার বাতিদান, প্রত্যেকটীতে মণিমুক্তা-দেওয়া। আর রয়েছে ছাদ থেকে ঝুলানো আড়াই মণ ওজনের একটী সোনার শিকল, তাতে সোনার ঘণ্টা বাঁধা। আরতির সময় বাজানো হয় সেই ঘণ্টাটীকে।

এই সেই সোমনাথ, দেবাদিদেব সোমনাথ। মাহ্‌মুদের মন উল্লাসে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। হুকুম দিলেন বিগ্রহ ভাঙতে। অমনি তাঁর অনুচরেরা কুঠারের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিল বিগ্রহটীকে। তারপর তার চারদিক্ ঘিরে আগুন জ্বেলে দিল। সেই উত্তাপে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল শিবলিঙ্গটী।

ওদিকে সোমনাথের রত্নাগার লুঠ হচ্ছে। দুই কোটী স্বর্ণমুদ্রা! যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত অগাধ ধনরত্ন। ভক্তদের প্রণামী, আর মন্দিরের সেবার জন্য রাজাদের দেওয়া দশ হাজারখানা গ্রামের আয় থেকে উদ্বৃত্ত বিপুল বিত্তরাশি। সব লুঠে নিচ্ছে বিজয়ী সৈন্যদল।

তার পর আবার আগুন জ্বালা হ'ল। এবার পুড়ছে সোমনাথের মন্দির। নীল আকাশ ছেয়ে গেল কাল ধোঁয়ায়, অগ্নিদেব গ্রাস ক'রে নিলেন রাজা ভীমদেবের কীর্ত্তিকে।

সোমনাথ থেকে সুলতান মাহ্‌মুদ নিয়ে গেলেন সেই চন্দনদ্বার, শিবলিঙ্গের খণ্ডগুলি, অসংখ্য বন্দী আর অপরিমেয় ধনরত্ন, যা দেখে মুসলমান ঐতিহাসিক বলেছেন যে সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য একত্র করলেও সোমনাথ থেকে লুঠ ক'রে আনা সম্পদের সমান হবে না। হিন্দু রাজারা সৈন্য নিয়ে তাঁর ফেরবার পথের ধারে অপেক্ষা করে আছেন শুনে মাহ্‌মুদ অন্য দিক্ দিয়ে অজানা পথে মরুভূমি পার হ'তে গিয়ে প্রায় প্রাণ হারিয়েছিলেন আর কি! অনেক কষ্ট পেয়ে, শেষে তিনি গজনীতে এসে পৌঁছলেন ২রা এপ্রিল তারিখে

সোমনাথ ধ্বংস ক'রে সমস্ত মুসলমানদের চক্ষে মাহ্‌মুদ একজন অলৌকিক মানুষ বলে গণ্য হ'লেন। তাঁর বিষয়ে নানা রকম কাহিনী প্রচলিত হ'তে লাগল।

তার মধ্যে একটী এই যে, তিনি যখন মন্দিরে গিয়ে ঢুকলেন, তখন সোমনাথের পুরোহিতরা তাঁর কাছে অনেক অনুনয় করে বলেন যে বিগ্রহটীকে তিনি যেন না ভাঙেন, তার বদলে তাঁকে দু' কোটী স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে। কিন্তু মাহ্‌মুদ তা নিলেন না, বললেন যে তাঁর কাজ হচ্ছে প্রতিমা ভাঙা, প্রতিমা বিক্রী করা নয়। এই বলে তিনি গদা দিয়ে আঘাত করতেই প্রতিমা ফেটে গেল, আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল লুকানো ধনরত্ন, যার দাম কুড়ি কোটী স্বর্ণমুদ্রা। সুলতান তা দেখে বললেন, এই আমার সৎকাজের পুরস্কার। কেউ কেউ বলেন যে ধনরত্নগুলি বেদীর নীচে পাওয়া গিয়েছিল।

আর একটী কাহিনীতে বলে যে মাহ্‌মুদ যখন ছোট তখনই ভারতের

জ্যোতিষীরা গণনা ক'রে জেনেছিলেন যে তিনি একদিন সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করবেন। তাই তাঁরা গিয়ে বালক মাহ্‌মুদের থেকে এই কথা আদায় ক'রে নিয়ে আসেন যে সোমনাথ দখল করলেও তিনি বিগ্রহটী পুরোহিতদের দিয়ে দেবেন, তার বদলে পাবেন দু'কোটী স্বর্ণমুদ্রা।

তারপর মাহ্‌মুদ যখন সত্যিই সোমনাথে এলেন তখন তাঁকে সেই কথা মনে করিয়ে দেওয়া হ'ল। মাহ্‌মুদ তখন করলেন কি, না, গোপনে শিবলিঙ্গটীকে পুড়িয়ে চূণ ক'রে নিয়ে তাই দিয়ে পান সেজে খাইয়ে দিলেন পুরোহিতদের। আর, তাঁদের বলে দিলেন যে সোমনাথকে তাঁরা পেয়ে গিয়েছেন,—অবশ্য হাতে নয়, পেটের মধ্যে।

আসলে কিন্তু মাহ্‌মুদ সোমনাথ দেবের বিগ্রহ খণ্ড খণ্ড ক'রে নিয়ে এসে গজনীর জুমা-মস্‌জিদের চত্বরে ছড়িয়ে দেন, যেখানে থানেশ্বর থেকে নিয়ে আসা চক্রস্বামীর মূর্ত্তির খণ্ডগুলিও ফেলে রাখা হয়েছিল।

কিন্তু চন্দনদ্বার যে কোথায় গেল তা জানা যায় নি। এই ঘটনার প্রায় আটশ' পঁচিশ বছর পর মাহ্‌মুদের কবরের দরজাখানা খুলে নিয়ে এসে আগ্রার দুর্গে রাখা হয়, কেন না তখন শোনা গিয়েছিল যে সেটাই সেই চন্দনের দরজা। পরে জানা গিয়েছে যে সে কথাটা ভুল।

সোমনাথ থেকে ফিরে এসে আর চার বছর বেঁচে ছিলেন সুলতান মাহ্‌মুদ। মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এল, তখনও মাহ্‌মুদ তার কাছে মাথা নোয়াতে চান নি, বিছানায় বসে মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তারপর যখন সময় হয়ে এল, তখন তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত হীরক-বৈদুর্য্য-মরকত-নীলকান্ত মণির রাশি সামনে নিয়ে বসে বালকের মত কাঁদতে লাগলেন দিগ্বিজয়ী সুলতান আবুল কসিম মাহ্‌মুদ।

সেই অবস্থাতেই বিছানায় বসে তিনি মারা গেলেন।

* * * *

আজও কি আবার কাঁদছেন সুলতান মাহ্‌মুদ?

সোমনাথের মন্দির তিনি ধ্বংস করেছিলেন, বিগ্রহ তিনি চূর্ণ বিচূর্ণ করেছিলেন, কিন্তু সোমনাথ দেবকে কি তিনি পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে পেরেছেন?

মাহ্‌মুদের ভাঙা মন্দিরের জায়গায় আবার প্রকাণ্ড মন্দির গড়ে দিয়েছিলেন

চৌলুক্যরাজ কুমারপাল ! সে মন্দিরও নেই। বার বার নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আবার গড়া হয়েছে সোমনাথের মন্দির।

স্বাধীন ভারত আবার নতুন ক'রে গড়ছে তাকে। পাঁচ বৎসর লাগবে সেই মন্দির গড়তে, খরচ হবে এক কোটী টাকা। মন্দিরের মণিকোঠাটী তৈরী হয়ে গিয়েছে, গত ১১ই মে তারিখে নতুন সোমনাথ-শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হয়েছে সেখানে।

আজও আবার কাঁদছেন সুলতান মাহ্‌মুদ। তাঁর কীর্ত্তি তো ব্যর্থ হয়ে গেল বার বার ! সোমনাথ তো ধ্বংস হ'ল না, হবার নয়।

শাশ্বত সোমনাথ। জয় সোমনাথ।

একুস্

শ্রীশামুক

জায়গাটির নাম কলোল। ভোরের ট্রেনে পৌঁছে নোংরা সহরের যতটুকু চোখে পড়লো মোটেই ভাল লাগলো না। তারপর 'লজ্', মানে হোটেলে, উঠে কানে যা সব চীৎকার শুনলাম আর নাকের ভেতর যে সমস্ত মিশ্রিত ও অবিমিশ্রিত গন্ধ গেল তাতে মন বিগড়ে গেল বেদম। কিন্তু উপায় কি, কাজের জন্যে থাকতেই হবে কিছু দিন। আর এই ছোট্ট জায়গায় লাট সাহেবের বাড়ির আরাম আমায় দেবে কে ?

হোটেল-মালিক আমার কোঁচকানো কপালের ওপর চোখ বুলিয়ে মনের ভাব আন্দাজ করে নিল। কালো চিরকুট গেঞ্জির ওপর দিয়ে পেটে হাত বুলাতে বুলাতে আশ্বাস দেয় যে খাবার-দাবার যা দেবে একেবারে 'হাই কেলাস', আর বেশী দিন থাকতে হ'লেও মন-মরা হবার কোন কারণ নেই, কেন না আট-দশ ঘর বাঙালী বাবুরা আছেন চারপাশে, মেলামেশা চলতে পারে।

ঘরের মধ্যে ভাল লাগলো না। জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখে রাস্তার ধারে একটু রোয়াকের মত ছিল সেখানে গিয়ে বসলাম।

দেখি, বছর নয়েকের একটি নাদুস-নুদুস বাঙালী ছেলে গুড়গুড় করে পথ দিয়ে চলেছে একলা। ফুলপাড় পাটভাঙা কোঁচানো ধুতি পরনে, গায়ে পাতলা পাঞ্জাবী, আর কপালে চন্দনের গোল ফোঁটা। গলায় তারে গাঁথা অনেকগুলি বড়-ছোট মাদুলি জামার ভেতর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠেছে বুকে, বাহুতে বাঁধা কবচটিও পরিষ্কার দেখা যায় দূর থেকে।

—কোথায় যাচ্ছ গো, এত সকালে ?

—আজ আমার জন্মদিন কিনা, মা বললে ঐ শিব ঠাকুরকে পেন্নাম করে আয়।

—কোথায় থাকো ? বাবার নাম কি ?

—ঐ যে হলদে রঙের আমাদের বাড়ি।

—বাবার নাম কি ?

—শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুনাথ রায়।

খাসা বুদ্ধিমান্ ছেলে, কেমন চটপট কথার জবাব দেয়। এবারে একটু তামাসা করে অতি সাধারণ প্রশ্নটি করে বসলাম। তখন কে জানতো যে অমন অসাধারণ উত্তর এসে পৌঁছাবে ও তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আমায় এখন বাঁদর নাচ নাচাবে ? তামাসা যেন জলে-পড়া বাতাসার মতন চট্ অদৃশ্য হয়ে গেল।

—তোমার নামটি কি গো ? খোকন ? না সোনামাণিক ?

—আমার নাম নেই, নাম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেই জন্যেই তো ইস্কুলেও ভর্ত্তি হ'তে পারছি না।

ছেলেটির মুখে বড় দুঃখ ও লজ্জার ভাব ফুটে ওঠে। গলার স্বর ভারী হয়, প্রায় কেঁদে ফেলার মত। অসহায় সুন্দর চোখ দিয়ে আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে চলে গেল মন্দিরে। সত্যি বড় বেচারী। পৃথিবীতে যার কিছু নেই, কাঠিকুঠি কানাকড়িও নেই, সারাদিন হাত পেতে ভিক্ষে করেও যে এক মুঠো ভাতের যোগাড় করতে পারে না—তারও আছে একটা নাম। ভাল হোক, খারাপ হোক, নাম তো বটে ! আর এই বাচ্চাটির জন্যে সামান্য একটি নামও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ? এমন অলক্ষুণে অদ্ভুত ব্যাপার আমি শুনি নি জীবনে। যদি ওর এক শ' বছর বয়স পর্যন্ত কোন নাম আবিষ্কার না হয় তো ইস্কুলে যেতে পাবে না—বাড়িতে বসে ধাড়ি মূর্খ্য হয়ে থাকবে ? দেখ না, একটা নাম না হ'লে ইস্কুলে যায় কি করে ? দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে, নয়তো সংগীদের টিটকারিতে পাঁচ মিনিটের বেশী টিকতে পারবে না।

আরে বাপু, বাংলা ভাষায় যুৎসই নামের সন্ধান না পাও তো একটা উড়িয়া, সিন্ধী, মাদ্রাজী নাম দাও। ফরাসী, ইংলিশ, ইন্দোনেশিয়ানেই বা আপত্তি থাকবে কেন ? নেই মামার চেয়ে কানা মামা তো ভাল ? এদিকে নাম না হয়ে বাচ্চার জান গেল যে ! মনে হ'ল শুধু ওর মা-বাবা নয়, কলোলের বাঙালী অবাঙালী সমস্ত বাসিন্দারাই যাকে বলে একেবারে খাজা। ছোট্ট বাচ্চার সামান্য দু'-অক্ষরেও নাম খুঁজে পাচ্ছে না ত্রিভুবনে ?

সারাদিন নিজের কাজ করে সন্ধ্যেবেলায় শম্ভুবাবুর বাড়ি গেলাম আলাপ করতে। আসল শম্ভুনাথের মতনই চেহারা বটে। ভুঁড়ির বহর দেখে বাহবা দিতে হয়। তবে বেশ অমায়িক ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ। গিন্নীও খুব আলাপী। দু'-চার কথার পর, সকাল থেকে মনে যা খচ্ খচ্ করছিল, পেড়ে বসি।

TIGHT BINDING

—অমন সোনার চাঁদ ছেলে, একটি নাম দেন নি কেন? বেচারা বড্ড মন-মরা হয়ে আছে, ইস্কুলে যেতে পারে না। নয় বলুন, আমিই একটি ভাল নাম ভেবে-চিন্তে লাগিয়ে দি।

ইলেকট্রিকের অমন জলন্ত আলোতে দু'জনার মুখই ঘোর অন্ধকার হয়ে গেল। অপ্রীতিকর কোন ব্যাপার মনে পড়লো বুঝি? নিতান্ত হতাশার মধ্যেও এক শেষ চেষ্টা করার মত খানিকটা উৎসাহ জোর করে টেনে এনে দু'জনে এক সংগে বলে ওঠেন,—দিন না, দয়া করে একটি ভাল নাম দিন না ওর—আমরা সারা জীবন আপনার কেনা হয়ে থাকব—

দুঃখের ভারে কথা শেষ হয় না। গিন্নীর চোখে জল এসে যায়। কর্তা মাথা নীচু করে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটি টানতে থাকেন।

ওদের দুর্বলতা, অক্ষমতা, মনের ঐ পংগুত্তা দেখে অবাক হয়ে যাই। কোন্ গ্রহের মানুষ? ছেলে বড় হয়ে গেল, এত বছরে বিশ্ব দুনিয়ায় একটা নামের সন্ধান হ'ল না? তুচ্ছ নামের জন্যে আমার মত অপরিচিতের পায়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়তে যায়, কেনা হয়ে থাকতে চায় বাকি জীবন? ধ্যেৎ। তাচ্ছিল্যের সংগে গড়গড় করে বলে দিলাম দশ-বারোটা নাম—ভাল নাম—পোষাকী নাম—বাংলা দেশে ভদ্র সমাজে যে সব নামের তারিফ আছে।

ওঁরা নামগুলি শুধু কান দিয়ে নয়, সারা শরীর দিয়ে যেন গিলে নিলেন; মনে মনে বাজিয়ে ভেবে দেখলেন। তারপর গিন্নী মাথা নেড়ে জানালেন,—ঐ নামগুলিও দেবার কথা উঠেছিল কিন্তু চললো না, আপত্তি আছে ভয়ানক।

আরো এক ডজন ছাড়লাম। বাছা বাছা বাঁকাচোরা নাম, সহজে যা শুনতে পাওয়া যায় না। হ'ল না, চলবে না—আপত্তি আছে।

আচ্ছা, আর এক ডজন। এবারে শক্ত শক্ত বিদঘুটে নাম, বলতে গেলে দাঁত ভেঙে যায়, লিখতে হ'লে কলমের দফা রফা। উঁহু, চলবে না—আপত্তি আছে।

এ যে ভয়ানক আপত্তি! মনের সাহস কমে এল। বুকের ভেতর দুর দুর করে, তবু মনকে শক্ত করে যেন নামতা পড়ে যাই। নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব যে যেখানে আছে যা ছিল, এমন কি চাকর-বাকরদেরও নামগুলি। হ'ল না। এবারে মারয়া। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ হাতড়ে বেড়াই, যত গল্পের বই পড়েছি মনের সে মহাসমুদ্রে ডুবুরি নামাই, শেষে রামধনুর ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম যতগুলো মনে পড়ে একসংগে, ধাঁধার মত শুনতে লাগলেও, বলে দিলাম। কিন্তু—কিন্তু দারুণ হতাশার সংগে নিতান্ত ক্লান্ত মনে শুনতে হ'ল আবার সেই সৃষ্টি-ছাড়া কথা—ঐ নামগুলিও দেবার কথা উঠেছিল কিন্তু চললো না—আপত্তি আছে ভয়ানক।

মাথার ভেতর গুলিয়ে বন্‌বন্ করে ঘুরে গেল। বাস্, আর কোন মানুষের নাম মনে আসতে চায় না, মনে পড়ে শুধু বিশাল ভীষণ অরণ্যের নিষ্ঠুর নৃশংস জানোয়ারদের নাম—চোখের সামনে যেন দেখতে লাগলাম তাদের। হঠাৎ মনে প্রবল বাসনা হ'ল জানবার—নিজের নিজস্ব পিতৃদত্ত নামটি কি—দেখি,—ভুলে গেছি—বেবাক ভুলে গেছি—স্মরণ করতে পারলাম না কিছুতেই।

তোমরা ভাবছো আমি কী আবোল তাবোল বকে যাচ্ছি এতক্ষণ! এ কাহিনীর বুঝি মাথামুণ্ডু নেই! কিন্তু তা নয়। এবারে একটু গোড়ার দিকে বলি, তখন বুঝবে আসলে

গলদ কোথায়, মুশকিলের সুরু হ'ল কি করে। আর এর গোড়ার কথা অনেকটা তোমাদের রূপকথার রাজারাণীর গল্পের মতনই। শোন।

কর্তা'গিন্নীর ভারি দুঃখ। সংসারে সব আছে কিন্তু একটি জিনিষের বড় অভাব। সাতটি মেয়ে পর পর, কিন্তু ছেলে নেই। সাত বোন পারুলদের চম্পা ভাই না হ'লে চলে কি করে? পূজা-পার্বণ, মানত পুরোদমে চলে। শম্ভু বাবু সহরে যতগুলি মন্দির, দেবালয়, সিঁদুর-মাখানো পাথর, অশথ বা বটগাছ আছে প্রতি সন্ধ্যায় প্রদক্ষিণ করে করে প্রণাম করে বেড়ান। শেষে প্রার্থনার চাপে আর নৈবেদ্যের ভারে দেবতাদের ধ্যান ভঙ্গ হ'ল, প্রসন্ন হলেন তাঁরা। ফলে ঐ ছেলেটি, যার নাম নেই, সে জন্মালো। রায়বাড়িতে সে যা ধূমধাম—সে যা সমারোহ তা লিখে শেষ করা যায় না। সকলে ভাবে অষ্টম গর্ভে স্বয়ং ধিনিকেষ্টই এসে আবির্ভাব হলেন বা!

পাড়ার বোসগিন্নী নামজাদা মানুষ। ডাকতে হয় না, ডাক শুনতেও হয় না, তবু সব'ঘটে আছেন। নিঃশব্দে নিঃসাড়ে এসে হাজির হ'ন। অতি বিনয়ী, অতি মিষ্টভাষী, সবেতেই দরদের চোখের জল; কোন কাজ করে দিতে বললে যেন বর্তে যান। এই অন্তরংগতা মাত্র একটি জিনিসের বদলে। অপরের সকল কথা, এমন কি পেটের গোপন কথাও, ওঁর জানা চাই।

শুনেছি কেউ কেউ দিনে আট-দশখানা খবরের কাগজ পড়ে তবে তৃপ্তি পায়। সারা দুনিয়ার সমস্ত খবর তাদের চাই, না হ'লে ভাত হজম হয় না, রাত্রে ঘুম আসে না। বোসগিন্নী কাগজ নয়, মানুষ পড়েন, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একেবারে আগাপাশতলা।

সহরে অনুপস্থিত ছিলেন, ফিরে এসে শুনলেন এই জবর খবর। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে আলগোছা দু'টো পান আর একটু দোক্তা মুখে ফেলেই ছুটলেন রায়েদের বাড়ি।

খোকা হাসে কি ভেচংায় বোঝা যায় না কিন্তু বোস গিন্নী হেসে গড়িয়ে যান।

—কি নাম রাখলেন দিদি খোকার?

—উনি দিয়েছেন নির্মল—পাশের ঘরের দিকে চোখ ফিরিয়ে সলজ্জ হেসে রায়গিন্নী ওনার উপস্থিতি জানিয়ে দেন।

কিন্তু এদিকে হ'ল কী? বোসগিন্নী ডুকরে কেঁদে বলেন,—হায় হায়, আমার ছোট ভায়ের কত সাধ করে ঐ নামটি রাখা হয়েছিল কিন্তু তিনটি বছরও পেরুলো না, হঠাৎ মারা গেল।

রায়গিন্নী শিউরে উঠে মনে মনে বলেন—ষাট ষাট। কর্তা দম আটকে কেসে ফেলেন কয়েকবার, কত বড় অপরাধই না করা হয়েছে অজানতে!

এই থেকে হ'ল মুশকিলের সুরু—ঐ বাড়িটি ও তার বাসিন্দাদের ঘিরে বছরের পর বছর নিদারুণ দুর্ভাবনার সূত্রপাত। এর পর নাম রাখবার আগে খুব ভেবে-চিন্তে অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে এগুতে হয় বৈকি। ধর, প্রস্তাব হ'ল কোন নাম। তখনি অনুসন্ধান চলে ঐ নামধারী আগে কেউ দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে কিনা, অসুখে-বিসুখে ভুগেছে কিনা, অপঘাতে বা দুর্ঘটনায় তার ভবলীলা সাংগ হয়েছে কিনা।

এর ফলে ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়। কোন কষ্ট পায় নি, অসুখ করে নি, আর শেষ পর্যন্ত

কোন না কোন কারণে মারা যায় নি এমন মানুষ আমাদের এই গ্রহটিতে আছে বুঝি কেউ? কিন্তু অবুঝ মা-বাপের অন্ধ পুত্রস্নেহ এই সহজ কথা মানতে চায় না। তাঁদের ধারণা কোন অশুভ নামের বোঝা ছেলেটির ওপর চাপিয়ে তার বিশেষ অকল্যাণ করা হবে।

স্বভাবতঃই ভীতু মন থেকে বোসগিন্নীর বোকার মতন ব্যবহার সাহসের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে দিয়েছে। সবজান্তা একা তিনিই বিশদ বিবরণ যুগিয়ে দু' হাজার তিন শ' সাতান্নটি নাম নাকচ করে দিয়েছেন। উনি ছাড়া দরদী অন্য প্রতিবেশিনীরা আছেন, আর বাংলা দেশের পরম হিতৈষী কুটুম্বরাই বা বাদ পড়েন কেন? আসলে ভয় পাবার জন্তে যে মন তৈরি তার কি কখনও ভয়ের অভাব হয়?

এদিকে দেখ না আমার কি অবস্থা! রাত্রে ভাল ঘুম নেই, দিনে কাজে মন নেই, হোটেলের 'হাই কেলাস' খাওয়া বিনা বিচারে গলার ভেতর ঢোকাচ্ছি। দিনরাত খালি ভাবছি আর ভাবছি, হাতড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি একটি মাত্র উদ্ভট সৃষ্টিছাড়া নাম যা কেউ কোন দিন শোনে নি, যা মানুষের নাম হিসাবে ব্যবহার হয় নি কোন দিন। সে নামে কোন মানুষ ছিল না, সুতরাং তার দুর্ভাগ্যও ছিল না। তার দুঃখ-কষ্ট হয় নি, পেট কামড়ায় নি, মাথা ব্যথা করে নি—সে জলে ডোবে নি, আগুনে পোড়ে নি, কলার খোসায় চড়ে সড়াৎ হয় নি। এক কথায় তার পটল তোলবার কোন সুযোগ বা দুর্যোগ মেলে নি কোন উপায়ে। এমনি একটি নাম আমি খুঁজছি, খুঁজে বার করে নিয়ে যাচ্ছি ওদের কাছে আর শুনে ফিরে আসছি—আপত্তি আছে। এমন সর্বনেশে আপত্তি ভূ-ভারতে আগে কেউ শুনেছে বলে মনে হয় না। আমিও যেন এই সর্বনেশে খেলায় মেতে গেছি, যদিও ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হবার যোগাড়।

তোমরা হাসছো?—হাস। ভাবছো হেরে গেলাম বুঝি? কিন্তু মহাভুল তোমাদের। হারবার পাত্র আমি নই। একটি নাম তৈরি আছে হাতের মুঠোয়, যদি অন্য কোনটা না লাগে তো এইটি ঠুকে দিয়ে চলে যাবো শেষ দিনে, আর আসবো না কোন দিন কলোলে।

এ একেবারে নামের সেরা নাম। আর কি যুৎসই মানে, ঐ ছেলেটির সংগে চমৎকার খাপ খেয়ে যাবে। এবং, শপথ করে বলতে পারি, কোন মানুষের নামে আজ পর্যন্ত ব্যবহার হয় নি।

ঐ নাদুস-নুদুস মাদুলি-তাবিজ পরা আদুরে ছেলেটির নাম দিয়ে যাবো 'একস্'। ইংলিশ বর্ণমালার চব্বিশ নম্বরের অক্ষর। একস্ মানে সব কিছুই, আবার কিচ্ছু নয়—শূন্য। বীজ-গণিতের অংক কষ নি? আর বড় হয়ে যদি সাহেবী কায়দায় লিখতে চায় তো লিখবে শম্ভুনাথ রায়ের ছেলে X Ray! বেড়ে শোনাবে। তোমরা কি বল?

সাগরপারে আন্দামান

শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ, বি. এল্

আন্দামানের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ার থেকে লং আইল্যাণ্ড রওনা হয়েছি সমুদ্রপথে। তার কিছু বিবরণ তোমাদের আগের বারেই দিয়েছি। এবারে বাকিটুকু শোন।

বিকেলে এলিফ্যান্ট হারবার দেখা গেল। সেখানে জাহাজে (ভারতখণ্ড) কাঠ বোঝাই করা হয়। আর একটু পরেই গীটার আইল্যাণ্ড,—দেখতে অনেকটা গীটার বাদ্যযন্ত্রের মতই। তারপর দেখা গেল লং আইল্যাণ্ড—সুন্দর বেলাভূমি, আর পাহাড়ের মত দ্বীপটি। ফরেষ্ট অফিসার, তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদেরও ডাক্তারবাবুর বাসগৃহ দেখা গেল। ডাঃ ...কারাম কাশী-হরিদ্বার ক'রে সস্ত্রীক ও সপুত্রক ফিরলেন সেদিনই—কিন্তু সেদিনই আমাদের টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। গরম জলে স্নান ও আহারের ব্যবস্থা হ'ল। আহার্য্য পরিপাটি, হরিণের মাংস সমেত। পথে ফরেষ্ট অফিসার এবং বিশেষ ক'রে ফরেষ্ট রেঞ্জার মিঃ করিয়াপ্পার গৃহে মিষ্টি সমেত মধুর আপ্যায়ন অত দূর দেশে কি যে উপভোগ্য তা ঘরে বসে বোঝা কঠিন। লং আইল্যাণ্ডে ফেরার পথেও নেমেছিলাম। ওখানে বনবিভাগের অনেক কাজ। হরিণ প্রচুর। বর্ম্মা থেকে টিক্ (সেগুন) এনে তার বন তৈরী হয়েছে। সমুদ্রের পাশে বেলাভূমি দেখতে বেশ ভাল লাগে। আর যখন ১৫ দিন বাদে বাইরের জগতের একমাত্র প্রতিনিধি মোটর-বোটটি জেটির দিকে এগোয় তখন সমস্ত লং আইল্যাণ্ড সেখানে ভেঙ্গে পড়ে—সুদূরের বার্ত্তাবহক বা মনুষ্য-বাহককে অভ্যর্থনা করতে।

রাত দু'টোয় বোটের কেবিনের বার্থে টের পেলাম এবার যাত্রা আবার হ'ল সুরু। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ক্রমশঃই অবস্থাটা যেন বিপজ্জনক বোধ হ'তে লাগল। অতটুকু বোট দুলতে লাগল প্রবল ভাবে, আর সমুদ্রের আর একদিক্ এখন একদম খোলা— যাকে বলে 'ওপ ন্ সী'। বার্থে বোটের মাঝি আর নারায়ণ স্মরণ ক'রে ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। একে তো দুলুনি, যাকে বলে 'রোলিং', তারপর রাতের শেষে দু'জন খালাসীর মধ্যে লাগল তুমুল তর্ক ও অত্যন্ত মিষ্টি সম্ভাষণ, আর সেই সাথে বোট-দড়ি ইত্যাদি নিয়ে ঘটাঘট। আমাদের কেবিন একদম পেছন দিকে, বার্থ্ থেকেই সমুদ্রের আলোড়ন দেখা যেতে লাগল। বড় মোহন মনে হচ্ছিল না— কাব্য করার ইচ্ছাও প্রবল হচ্ছিল না। ভাবছিলাম ভালয় ভালয় এই সিন্ধু পার কর বাবা! অভিজ্ঞতার আনন্দ কিছুটা ছিল, কিন্তু তার বেশী ছিল শঙ্কা। তবু আমি এখনও, যাকে বলে সংসারী, তা নই; কোনও পিছুটানও নেই। আমার সঙ্গী কিন্তু বল্লেন, "দেখ দেখি, ব্যাটারা ওপ ন্ সী দিয়ে এইটুকু নৌকোয় যাচ্ছে, ব্যাটাদের সাহসের বলিহারি!" খানিক পরে বল্লেন, "ছেলেটার জন্য মনটা কেমন করছে!" (সহযাত্রী রামধনু হাতে নিশ্চয়ই পাবেন—আর আমায় এই বিশ্বাসঘাতকতায় চটবেন আমার উপর)। জাহাজের খালাসীদের কথায় বুঝলাম এ সবে তারা এত অভ্যস্ত সারা বছর যে তাদের কাছে এ ছেলেখেলার সামিল।

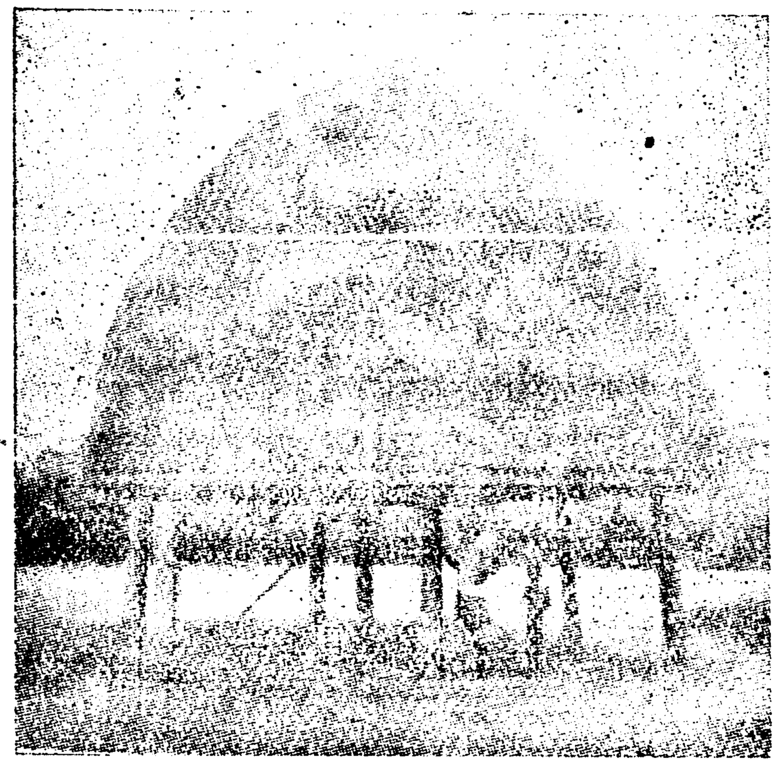

নিকোবরীদের বাড়ি

যা হোক্, খুব সকালে কারবাইন্ বে ব'লে একটি জায়গার কাছে নোঙ্গর করা হ'ল আর সেখানে কয়েক ট্রিপে ফরেষ্ট সার্ভে (জরিপ) বিভাগের লোকেরা গেল। এর থেকেই বুঝতে পারছ ওখানে কোন সভ্য জগৎ বা বসতি নেই ওদের দলের কর্ত্তা কিছু লোক ও বন্দুকাদি সহ নামলেন। জারোয়ারা দেখলে পরে রামায়ণের কোন নামজাদা বাণ ছুঁড়ে দিলেই তো কর্ম্ম ফতে। আমাদের সৌভাগ্য-ক্রমে ও একটি হরিণের দুর্ভাগ্যক্রমে বেচারা জল খেতে যখন ব্যস্ত তখন ধরা পড়ল পার্টির টেরিয়ার কুকুরের কবলে। সেই হরিণ উত্তর আন্দামানে চল্ল আমাদের সঙ্গে।

কেউ কেবিনে, কেউ শায়িত সকরুণ নয়নে। আমি জাহাজের মাষ্টারের (লোকটি আন্দামানিজ্, এর ভাই শোভন আলী নারকেলের বড় ব্যবসায়ী) সাথে গল্প ক'রে সময় কাটিয়ে দিলাম বাইরে বেঞ্চে বসে। সমুদ্র তখন রীতিমত উত্তাল। বোটে দাঁড়ান যায় না একদম—বেদম এদিক্ ওদিক্ করছে। নতুন বেতার-কর্ম্মী বমি ক'রে জাহাজের সারেংকে বল্ল। উত্তর পেল কাঠখোট্টা —"ওআপোস যানে বোলো"—বমিকে ফিরে যেতে বল। আই. এন. এ ফেরৎ বেতারকর্ম্মী ভদ্রলোক অগত্যা আত্মনির্ভরেই মন দিলেন। এই মাষ্টারের কাছেই গল্প শুনেছিলাম যে জাপানী আক্রমণের সময়ে সাহেবদের মধ্যে কয়েকজন বাকী ক'জনকে ফেলে এর সাথে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিল মোটর-বোটে। 'যঃ পলায়তে স জীবতি।'—খালি দোষটা নন্দ ঘোষদেরই!

উত্তর আন্দামানে ছিলাম সেদিন রাত পর্য্যন্ত। ওখানকার বিলাত-প্রত্যাগত ফরেষ্ট অফিসার মিঃ বার্ম্মা লোকটি বেশ ধর্ম্মপরায়ণ ও খুব সাদাসিধে। ডাক নিতে ও দিতে কেটে গেল অনেক সময়, তারপর হরিণের মাংস, মাছ এবং ট্যাপিয়োকার কেক্ খাওয়ালেন। জাপানীরা আলুর অভাবে চাষ করেছিল ট্যাপিয়োকার। খেতে অনেকটা আলুর মতই লাগল—রাঁধলে ভালই লাগে। তারপর এক গ্লাস কমলা লেবুর রস। মিঃ বার্ম্মার সাথে বেরোলাম। পথে দেখলাম অতি সুন্দর একটি বুদ্ধমূর্ত্তি। তারপর গুটি দুই গ্রামে গেলাম—ফুকাডেরা ও দানাপুর। দানাপুরে গাছ থেকে পাড়া কমলা লেবু আর সুবৃহৎ ডাবের জল হাঁটার ক্লান্তি মুছে নিল। তবে ডাবটা শেষ করা গেল না—এত প্রচুর জল ছিল তাতে। আরও কয়েকটি গ্রাম আছে পর পর—হেঁটে বা নৌকোয় (বোটে) যাওয়া যায়। সেখানে বর্ম্মার কারেনরা আছে দিব্যি—ঘর বেঁধে, ধান, মধু, কমলা লেবু ইত্যাদির চাষ ক'রে, মুরগী পেলে। কমলা লেবুর বাগান অসংখ্য। রাতে দেখি বোট ভর্ত্তি মুরগীর চাঙ্গারী আর কমলা লেবুর ঝুড়ি। দক্ষিণ আন্দামান থেকে উত্তর আন্দামানে অনেক সস্তা ও সুপ্রচুর এ সব জিনিষ। আর এর জন্য কারেনদেরও বাহাদুরী আছে। হঠাৎ দেখে বোটটার চেহারা যেন বদলে গেছে মনে হ'ল;—পেটুক মানুষের পক্ষে দস্তুর মত উৎসাহ ও উত্তেজনার ব্যাপার। কবি ঈশ্বরচন্দ্রের মত কেউ হ'লে বলে উঠতেন হয়ত, "ইচ্ছে হয় কাঁচা খাই হাড়ে মাংসে দিয়ে।"

আবার সমুদ্র-বক্ষে রাত কাটল। লং আইল্যাণ্ড হয়ে পোর্ট ব্লেয়ার ফেরা হ'ল। লং আইল্যাণ্ডে বোট ছাড়বার পর দেখি আমার অজ্ঞাতসারেই ডাঃ তুকারাম টিফিন-ক্যারিয়ার ভর্ত্তি খাবার রেখে গেছেন আমাদের জন্য। এ আতিথ্যের কি আমরা দাম দিতে পারি? ফরেষ্ট অফিসারের বাড়ীতে প্রাতরাশ ও স্নান সারার পর ভদ্রলোক একটি হরিণের বাচ্চা উপহার দিতে চেয়েছিলেন। মাদ্রাজ হয়ে আসব বলে ও সব হাঙ্গাম করি নি—বাড়িতে আমাদের ভৃত্যটি তার জন্য রোজ আমাকে অনুযোগ দিচ্ছে।

এরপর কলকাতা ফেরবার তোড়জোড়। পথে নিকোবর ও মাদ্রাজ। বিকেলে রওনা হ'লাম 'মহারাজা' জাহাজে। জাহাজ-ঘাটিতে সবাই দল বেঁধে এসেছিলেন; জাহাজ আসা-যাওয়া ওখানকার প্রাণ। পরদিন ভোর বেলা ঝির ঝির বৃষ্টি ও বাতাস। নিকোবরে নোঙ্গর ক'রে রইল জাহাজ। নিকোবরী প্রসিদ্ধ নারকেল-ব্যবসায়ী আফুজীর নৌকো এসে সুপুরি আর নারকেল বোঝাই করতে লাগল জাহাজে। কিন্তু আমাদের যাওয়া নিয়ে হ'ল হাঙ্গামা। ওখানকার বিশপ আমাদের সহযাত্রী ডেপুটি কমিশনারকে বল্লেন যে এ রকম খারাপ আবহাওয়ায় আমাদের ওখানে যাওয়া উচিত নয়—আর জাহাজের ক্যাপ্টেন বললেম তাঁকে, যে, আবহাওয়া খারাপ, তাই জাহাজ তাড়াতাড়ি ছাড়তে পারে। গুরুজনদের বাক্য লঙ্ঘন করতে বাধ্য হলাম—কারণ রোজ রোজ তো আর এখানে আসছি না! য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট এঞ্জিনীয়ার শ্রীশিবরামন্ (ইনি মাদ্রাজের লোক) যাচ্ছিলেন নিকোবরে সরকারী অর্থ পৌঁছে দিতে, কাজেই তাঁকেই মহাজন গণ্য ক'রে—তাঁর পথ লক্ষ্য করলাম। জাহাজের গা দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে, সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে হ'ল জলে ভাসমান আর একটি বোটে—কিঞ্চিৎ সাবধান হয়ে। ঠিক জায়গায় না নামতে পারলে সমুদ্রের জলে হাবুডুবু খাওয়ার সম্ভাবনা। গলায় ছিল ক্যামেরার দড়ি, আর সোয়েটারের ওপর ক্যামেরা—নামবার সময় সেই দড়িতে আটকে গিয়ে ফ্যাসাদ আর কি! তারপর সোজা সোয়েটারের ভেতরে গলিয়ে দিলাম ক্যামেরাকে। ঠেকে শিখতে দোষ নেই।

মোটর-বোট ডাঙ্গার কাছে গেলে আমরা উঠলাম ডিঙ্গিতে। ডিঙ্গি বড়ই ছোট—দু'জন ক'রে চেপে ঢেউয়ের সাথে তাল দিয়ে (পা খালি ছিল—আর ছিল মালকোঁচা) ডিঙ্গি-অভিযান সংক্ষিপ্ত হ'লেও রোমাঞ্চকর। হাতে সময় কম, বিদ্যুৎবেগে অতি পুরাতন এবং ঝরঝরে বাসে (এটাই ওখানকার 'রোলস্ রয়েস')

হেড কোয়ার্টার্সে (যেখানে গভর্ণমেন্ট হাউস) গেলাম। রাস্তা ঝিনুক-প্রবালের গুঁড়োয় তৈরী, কাজেই সাদা। চাঁদের আলোয় নাকি ঝক্‌ঝক্ করে! আমার তো লাভের মধ্যে রেন-কোটে আচ্ছাসে সাদা ছিট লেগে গেল। চোখে পড়ল সেখানকার নারকেলের বনরাজি, বড় সাইজের বাবুই পাখীর বাসার মত বাড়ি, আর হাসিতে ভর্ত্তি, কিঞ্চিৎ খ্যাঁদা খ্যাঁদা মুখ নিকোবরীদের। নিকোবরীরা নাকি মোটের ওপর কলা, নারকেল আর পেঁপে খেয়েই থাকে। যারা একটু সভ্য তারা হাফ্‌প্যাণ্ট প'রে ঘুরছিল, অন্যদের নেংটি-পরিহিত দেখলাম। এরা কিন্তু বেশ ফুটবল্ খেলে, আর, জীবন-নির্ব্বাহ নিয়ে মোটেই চিন্তা-ভাবনা বা হুড়োহুড়ি করে না। টাকা-পয়সার কারবার নেই; ওদের দিয়ে নারকেলের কাজ করিয়ে নিয়ে বা ওদের কাছ থেকে প্রচুর নারকেল নিয়ে হাফ্‌প্যাণ্ট পরতে দিলেই ওদের স্বর্গলাভ—আমি তো তাই শুনেছি!

এর পর তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরে আসতে হ'ল। জাহাজ ছাড়ল একটু পরে। তার পর পথে এল দারুণ দুর্য্যোগ। সমস্ত জাহাজটি একবার সামনে একবার পেছনে উঠছে নামছে, আর একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে দুলছে। অনেক বাহাদুর নাবিক (ইংরেজীতে যাদের বলে 'গুড্ সেলার') মহোদয়রা ও মহোদয়ারা কেবিনে প্রায় অসূর্য্যম্পশ্য (ও পশ্যা) হয়ে রইলেন। য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ ক্যাপ্‌টেন্‌টি জাহাজের কাজে পাকা আর কথাবার্ত্তায় অতি রোখা (চোখা ন'ন)। ভদ্রলোক জাহাজটিকে কুড়ি মাইল দক্ষিণে নিয়ে গেলেন বিপদ্ এড়িয়ে, তার পর আস্তে আস্তে ফিরে এলেন। খাওয়ার টেবিলে বসে আমার পাশের ভদ্রলোকের দিকে লক্ষ্য করে কাঁটাচামচ, ছুরি—এরা, হঠাৎ জাহাজ কাৎ হওয়ায়, হাসিরাশির কবিতার রসগোল্লাদের মত ধাবিত হ'ল—যার ফলে তিনি উঠে গেলেন বিরক্ত হয়ে।

চারদিন জাহাজে কাটিয়ে দূর থেকে মাদ্রাজ দেখা গেল। কাজেই এর পর "আমার কথাটি ফুরোল।"

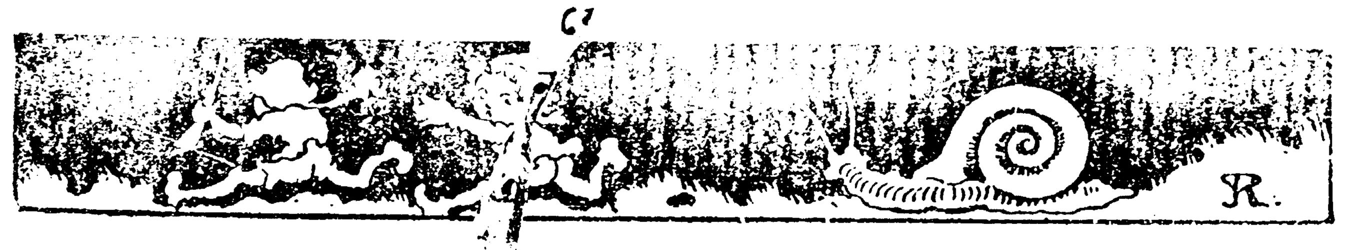

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

—তিন—

"আমি আজ কানাই মাষ্টার"

সকলে এসে ডিককে তার সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানালো। এই আকস্মিক সৌভাগ্যে ডিকের আর আনন্দ ধরে না। সবার অকুণ্ঠ প্রশংসায় সে লজ্জিত হয়ে উঠলো। তারপর সে হঠাৎ সেখান থেকে উঠে গিয়ে একটি তেরো বছরের ছেলের কাছে এসে তার কাঁধে হাত দিয়ে বললো, "এই নাও মার্শটন, আমার পুরোনো রাইফেল। নতুন রাইফেল কেনার সামর্থ্য হ'লেই আমি তোমাকে এটা দিয়ে দেবো, কথা দিয়েছিলাম। নিতান্ত ভাগ্য ভালো যে ইতিমধ্যেই আমি সে কথা রাখতে পারছি।"

মহা আনন্দে মার্শটন ডিককে জড়িয়ে ধরলো। নিতান্ত শৈশব থেকেই সে রাইফেলের স্বপ্ন দেখে আসছে। ডিকের পুরোনো রাইফেল পেয়ে তার যা আনন্দ হ'লো রূপোলী রাইফেলটা জয় ক'রে ডিকেরও ততটা আনন্দ হয়েছিল কিনা সন্দেহ।

কিন্তু এবার দেখা দিলো এক নতুন বিপদ। ফ্যান কিছুতেই তার পুরোনো প্রভুকে ছেড়ে যাবে না। মেজর বললেন, "ডিক, তোমাকে হয়তো দিন কতক ওকে বেঁধে রাখতে হবে।"

"না স্যর, তার দরকার হবে না।"—বলে ডিক ক্রুসোকে তুলে নিয়ে কোটের নীচে রাখলো, তারপর রূপোলী রাইফেলটা কাঁধে ফেলে এগিয়ে চললো তাড়াতাড়ি। ফ্যানের দিকে একবার ফিরেও তাকালো না।

ফ্যানের একগুঁয়েমি সঙ্গে সঙ্গে কোথায় চলে গেলো। আর কোন রকম ইতস্ততঃ না ক'রে সে ডিকের অনুসরণ করলো।

ডিকের বাড়ী গ্রামের আর পাঁচজনের বাড়ীর মতই কাঠের তৈরী। বাড়ীটা ছোট হ'লেও তাতে তার আর তার বিধবা মায়ের বেশ স্বচ্ছন্দে চ'লে যেতো।

ডিককে লাফাতে লাফাতে বাড়ী ঢুকতে দেখে তার মা বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি রে ডিক! এত তাড়াহুড়ো কিসের? আর ঐ বন্দুকটাই বা কোথায় পেলি?"

"জিতেছি, মা!"

"জিতেছিস!"

"হ্যাঁ, মা! পেরেকটায় ঠিক গুলি লাগিয়েছি, জো'র রাইফেলে আর একটু অভ্যস্ত হ'লে পেরেকটা একেবারে বসিয়েই দিতাম।"

পুত্রের গর্ব্বে মায়ের বুক ফুলে উঠল। ডিক রাইফেলটা টেবলের ওপরে রেখে তাদের লক্ষ্যবেধের কাহিনী এক নিঃশ্বাসে ব'লে শেষ করলো।

"তা' বেশ করেছিস বাবা!" ডিকের মাথায় হাত বুলিয়ে মা বললেন।—"কিন্তু বাইরের দরজায় ও কিসের আঁচড়ানোর শব্দ হচ্ছে বল্ তো?"

"ওঃ, আমি একেবারে ভুলে গেয়েছি মা! ও ফ্যান।—আয় রে ফ্যান, আয়, আয়!" ব'লে ডিক উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

"আরে, এ যে মেজরের কুকুর! এ কোথা থেকে এলো?"

"ওকেও যে জিতেছি, মা!"

"ওকেও জিতেছিস!"

"হ্যাঁ, মা! ওকে আর ওর এই বাচ্চাটাকেও!" ব'লে ডিক কোটের ভেতর থেকে ক্রুসোকে বার করলো।

ডিকের বুকের কাছে এতক্ষণ আশ্রয় পেয়ে ক্রুসো ঘুমিয়ে পড়েছিল; এ ভাবে তার ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সে বিরক্ত হয়ে কেঁউ কেঁউ ক'রে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ফ্যান এক লাফে তার কাছে এসে হাজির।

"যা ফ্যান, ওকে নিয়ে ঐ কোণে আরাম ক'রে বোস্।—মা, ওকে কিছু খেতে দাও, ওর খিদে পেয়েছে। দেখছো না, কেমন ভাবে তাকাচ্ছে!"

ডিকের এবার একটা নতুন কাজ জুটল—ক্রুসোকে শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু এই শিক্ষাদানের প্রথম কয়েকটি দিন তাকে অত্যন্ত হতাশার মধ্যে কাটাতে হ'লো।

এ ক'দিন ডিক ক্রুসোকে নিজের হাতে খাইয়েছে। উদ্দেশ্য—ক্রুসোর হৃদয় জয়। তারপর একদিন বিকেলে ডিক তাকে সরোবরের ধারে নিয়ে গেলো।

কুকুরের স্বভাব সম্বন্ধে একটা কথা এখানে ব'লে রাখি। খাবার দিলেই যে সাধারণতঃ কুকুরের হৃদয় জয় করা যায় এ কথা সত্যি হ'লেও কুকুরের ভালবাসার মধ্যে মহত্ত্ব আছে, সব সময়েই তা স্বার্থপ্রণোদিত নয়। এমনও দেখা গেছে, অনেক প্রহারেও সে প্রভুর সান্নিধ্য থেকে দূরে যেতে চায় না। যদি বা কখনো প্রহার সহ্য করতে না পেরে দূরে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে, তার পরেও সামান্যতম ইঙ্গিতেই তাকে আবার প্রভুর কাছে ফিরে আসতে দেখা গেছে।

ডিক ডাকলো, "ক্রুসো, ক্রুসো, আয়তো বাচ্চু!"

নিজের নাম অবশ্য ক্রুসো ইতিমধ্যে শিখেছিলো; কিন্তু তার ধারণা ছিলো যে তার নাম ধ'রে ডাকলেই তাকে খাবার দেওয়া হবে, কারণ এতদিন শুধু খাবার দেবার সময়েই তাকে ডাকা হ'তো।

অদ্ভুত ভাবে লাফাতে লাফাতে ক্রুসো ডিকের কাছে এসে হাজির। কান খাড়া ক'রে ল্যাজ নাড়তে লাগলো সে।

"শোন্ ক্রুসো, আজ থেকে তোর শিক্ষা শুরু হবে, বুঝলি?"

ক্রুসো বুঝলো কিনা জানি না; ডিকের কথা শুনে সে কান দু'টো খুব খাড়া করলো, তারপর মাথাটা একটু একটু ক'রে একদিকে যতদূর সম্ভব বেঁকালো। তারপর ঠিক তেমনি ভাবেই আবার উল্টো দিকে বেঁকালো। ডিক আর থাকতে না পেরে হো-হো করে ক'রে হেসে উঠতেই ক্রুসোর সে কী ভীষণ চীৎকার!

সঙ্গে সঙ্গে হাসি বন্ধ ক'রে ডিক বললো, "না ক্রুসো, খেলা নয়, এখন কাজের সময়।"

হাত থেকে একটা দস্তানা খুলে নিয়ে ডিক সেটা ক্রুসোর নাকের কাছে কিছুক্ষণ ধরলো। তারপর সেটা কিছু দূরে ছুঁড়ে দিয়ে স্পষ্টস্বরে বললো, "যা, নিয়ে আয়।"

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে ক্রুসো দস্তানাটার দিকে ছুটে গেলো; তারপর প্রাণপণে সেটাকে আঁচড়াতে কামড়াতে লাগলো। নিয়ে আসার ব্যাপারটা ও বুঝলোও না, আর তা নিয়ে মাথা ঘামাতেও চাইলো না।

দস্তানাটা ক্রুসোর কবল থেকে উদ্ধার ক'রে ডিক আবার গিয়ে সেই পাথরের ওপরে বসলো।

"ক্রুসো, এখানে আয়।"

'যাবো বৈকি ডিক, নিশ্চয় যাবো!'—ক্রুসো বললো। ঠিক যে এই কথাগুলোই ক্রুসো মুখ ফুটে বললো তা অবশ্য নয়, কিন্তু সে যে ঠিক এই কথাগুলোই বলতে চাইছিলো, এ তার হাবভাব দেখে খুব সহজেই বোঝা গেল। শুধু তাই নয়, সে যেন আরো বলতে চাইলো, "আবার ঐ খেলা খেলো, ডিক, আমার খুব মজা লাগছে, সত্যি বলছি!'

ডিক তার কথা শুনলো, এবং ক্রুসো আগের মতই আবার এক লাফে দস্তানাটা নিয়ে মহা আনন্দে খেলা শুরু করলো। কিন্তু ওটা নিয়ে আসার ব্যাপারে তাকে বিশেষ উৎসাহিত মনে হ'লো না।

এই ব্যাপার আরো অনেক বার চললো, কি তবুও 'যা নিয়ে আয়' ক্রুসোর বোধগম্য হ'লো না।

এর পরেও ডিক কয়েক দিন ক্রুসোকে 'নিয়ে আয়' শেখাতে চেষ্টা করলো; কিন্তু কোনও ফল হ'লো না। দস্তানাটা নিয়ে খেলা করা ভিন্ন ক্রুসোর যেন আর কোনো কাজ নেই! ডিক রোজ পকেটে ক'রে মাংসের টুকরো নিয়ে যেতো; ক্রুসো 'নিয়ে আয়' শিখলেই ওকে

উপহার দেবে ব'লে। কিন্তু এ উপহারের কথা ক্রুসোর জানা না থাকায় তার আর কিছুতেই ওটা নিয়ে আসা হ'য়ে উঠলো না।

শেষ পর্য্যন্ত ডিক দেখলো, এ ভাবে হবে না। তখন সে অন্য পন্থা অবলম্বন করলো। একদিন সকাল থেকে ক্রুসোকে কিছু খেতে না দিয়ে যথাসময়ে সে ওকে নিয়ে সরোবরের ধারে গেলো। এই অদ্ভুত ব্যবহারে ক্রুসো বেশ একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেছলো; যেতে যেতে থেমে পড়ে পেছন ফিরে একবার তাকালো বাড়ীর দিকে। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডিকের মুখের দিকে তাকালো। ডিক কিন্তু নাছোড়বান্দা; সে এগিয়ে চলতে লাগলো।

এক টুকরো মাংস ক্রুসোকে শুঁকতে দিতেই সে তা খাবার জন্যে ছটফট করতে লাগলো; কিন্তু ডিক খেতে না দেওয়ায় অত্যন্ত বিরক্ত হ'লো সে। তারপর যখন ডিক দস্তানাটা তার সামনে ছুঁড়ে দিলো তখন ক্রুসো বিশেষ উৎসাহ দেখালো না; সে ফিরে দাঁড়ালো।

"যা, নিয়ে আয়!" মাষ্টার মশায় বললেন।

"না।" অবাধ্য ছাত্র নীরব ভাষায় উত্তর দিলো।

তখন ডিক উঠে দস্তানাটা নিয়ে তার মুখে দিয়ে দু'-এক গজ সরে এসে মাংসের টুকরো দেখিয়ে বললো, "যা, নিয়ে আয়!"

সঙ্গে সঙ্গে দস্তানাটা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে ক্রুসো মাংস লক্ষ্য ক'রে লাফিয়ে উঠলো। কিন্তু এবারেও তাকে হতাশ হ'তে হলো। ততক্ষণে ডিক সেটা সরিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু দ্বিতীয় বার ক্রুসো দস্তানাটা মুখে ক'রেই এনে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে ডিক তাকে অনেক আদর ক'রে মাংসের টুকরো খেতে দিলো। তখনই ডিক আবার তাকে পরীক্ষা করলো, পাছে সে ভুলে যায়। ক্রুসো বুঝেছিলো যে দস্তানাটা না আনলে ডিক তাকে মাংসও দেবে না, আদরও করবে না। ডিক এবারে আর দস্তানাটা তার মুখে দিয়ে দিলো না, পাশে ফেলে রাখলো! তারপর খানিকটা দূরে গিয়ে বললো, "নিয়ে আয়!"

এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ ক'রে ক্রুসো তক্ষুণি দস্তানাটা তুলে নিয়ে প্রভুর পায়ের কাছে রাখলো।

এতক্ষণে তার শিক্ষা সম্বন্ধে ডিক নিশ্চিন্ত হ'লো। তখনই ডিক পকেট থেকে সমস্ত মাংস ফেলে দিলো, এবং ক্রুসোও সঙ্গে সঙ্গে ল্যাজ দুলিয়ে তাদের সদ্ব্যবহার করতে বিলম্ব করলো না। মহা আনন্দে শিষ দিতে দিতে ডিক একটা পাথরের ওপরে গিয়ে বসলো।

(ক্রমশঃ)

ফুটবলের গোল-রক্ষক

শ্রীঅমলকুমার মিত্র, বি, এ, সাহিত্যভারতী

এখন কলকাতার ময়দান ফুটবল আবহাওয়ায় সরগরম। লীগ্ খেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন্ খেলোয়াড় কোন্ দলে কেমন খেলছেন, কোন্ দল শেষ পর্য্যন্ত সকল দলের উপর টেক্কা মারতে পারবে, এ সব আলোচনাই চলছে ক্লাবে, রেস্তোরাঁয়, স্কুল-কলেজে। চারদিকের আবহাওয়া যখন এ রকম ফুটবলময়, তখন রামধনুর পাতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোলকীপারদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা তোমাদের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে।

তোমরা কোন মাসিক পত্রিকা কিংবা সংবাদপত্রের খেলাধূলা বিভাগের পৃষ্ঠা খুললে হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে, প্রায় শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রে গোল-রক্ষকের ক্রীড়াচাতুর্য্যের ছবিই প্রকাশিত হয়েছে।—হয় গোল-রক্ষক ঘুঁষি মেরে বারের উপর দিয়ে বল 'পাঞ্চ' করে দিচ্ছেন, নয় বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের পায়ের উপর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে বল তুলে নিচ্ছেন, নয় তো (আহা বেচারা) কাঁচুমাচু চোখে তাকিয়ে দেখছেন, বল সোঁ করে পাশ কাটিয়ে নেটের ভিতর ঢুকে পড়ছে।

একজন ভাল গোল-রক্ষক না থাকলে একটি শক্তিশালী আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল দল গঠন করা কোন মতেই সম্ভব নয়। তোমাদের প্রথমেই ইংল্যাণ্ড দলের বিখ্যাত গোল-রক্ষক বার্ট উইলিয়াম্স্ সম্বন্ধে কিছু বলি। তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের একটি সময় খুবই অন্ধকারময় ছিল। তখন কে বা ভাবতে পেরেছিল তিনি গোল-রক্ষক হিসাবে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারবেন? ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ওয়েম্বলী ষ্টেডিয়ামে সর্ব্বপ্রথম আন্তর্জাতিক খেলায় ইংল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করেন তিনি ফ্রান্সের বিরুদ্ধে। খেলা ২—২ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। বার্টের মাথার উপর দিয়ে একটি বল গোলের মধ্যে যদি প্রবেশ না করত তা হ'লে ইংল্যাণ্ড সেই খেলায় বিজয়ী হ'তে পারত।

পরের বছরই বার্ট আবার ইংল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করেন।— এবারেও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে, তবে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ওয়েম্বলী ষ্টেডিয়ামে নয়, প্যারিসের ষ্টেড কলম্বেসে। বার্টের দুর্ভাগ্য, তিনি বল সহ গোলের মধ্যে ঢুকে পড়েন, ফলে ফ্রান্স ২-১ গোলে জয়লাভ করে।

১৯৪৮। আবার ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের খেলা হচ্ছে, প্যারিসের সেই ষ্টেড কলম্বেস ষ্টেডিয়ামে। খেলা শুরু হওয়ার আধ মিনিটও হয় নি, বার্টের হাত থেকে বল ফসকিয়ে ফ্রান্সের আউটসাইড লেফট মরেলের পায়ের কাছে গিয়ে পড়ল। তিনি গোল করতে কোন ভুলচুক করলেন না। কিন্তু বার্ট তারপর যে খেলা দেখালেন তা কেউ কোন দিন ভুলতে পারবে না। সব রকমের কোণ থেকে সব রকমের বল তিনি আটকে ফেলতে লাগলেন। একটু বিচলিত না হয়ে তিনি সিংহবিক্রমে আক্রমণের পর আক্রমণ ব্যর্থ করে দিলেন। সেই থেকে বার্ট হলেন আন্তর্জাতিক খেলায় ইংল্যাণ্ডের স্থায়ী গোল-রক্ষক।

বার্ট গত নভেম্বর মাসে ইটালীর বিরুদ্ধে যে খেলা দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না। তাঁর সেদিনের খেলার কাছে অন্য সকলের খেলা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। বলতে গেলে তাঁর একলার চেষ্টায় ইংল্যাণ্ড সেদিন পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়।

টটেনহাম হটস্পার দলের টেড ডিচবার্ন ইংল্যাণ্ডের আর একজন নাম-করা গোল-রক্ষক। তিনি ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ওয়েম্বলী ষ্টেডিয়ামে সব প্রথম আন্তর্জাতিক খেলায় স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করেন। বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক খেলায় স্কটল্যাণ্ডের গোল রক্ষা করেন জিমি কোয়ান।

তিরিশ বছর বয়স্ক আব্দের ইবরির বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক খেলায় ফ্রান্সের গোল রক্ষা করেন। লম্বা-চওড়া, শ্যামবর্ণ লোকটি; কালো কুচকুচে গোঁফের জন্য সবাই তাঁকে সহজেই চিনে ফেলে। তিনি এ পর্য্যন্ত ছয় বার আন্তর্জাতিক খেলায় ফ্রান্সের পক্ষ সমর্থন করেছেন। খুব জোরে বল কিক করতে পারেন আব্দের ইবারির।

বর্ত্তমানে ইটালীর গোল-রক্ষক হচ্ছেন গিওসেপ মরো। তিনি ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে সব প্রথম আন্তর্জাতিক খেলায় ইটালীর পক্ষ সমর্থন করেন। লম্বা, লিকলিকে গিওসেপের হাত থেকে সহজে বল ফস্কে যায় না। তাঁর বল ধরার কায়দাও বড় অদ্ভুত। মাথার উপর তিনি বল ধরেন না, মাথার লেভেলের সঙ্গে তাল রেখে তিনি বল 'কাট' করেন।

পর্টুগালের আন্তর্জাতিক গোল-রক্ষক আর্সেটো কিন্তু বাস্কেট বলেও একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়। ইনি খুব লম্বা এবং উঁচু করে এঁকে গোল দেওয়া এক রকম অসম্ভব।

চার্লটনের বিখ্যাত গোল-রক্ষক স্যাম বারট্রাম সম্বন্ধে দু'টি কথা বলে আজকের মত প্রবন্ধটি শেষ করব। এঁর মত 'ষ্টাইলিশ' গোল-রক্ষক আর দু'টি নেই। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ইনি চার্লটনের গোল রক্ষা করে আসছেন। সকলে এঁর নাম দিয়েছে "রেড্ হেডেড্ জায়ান্ট" অর্থাৎ "লাল মাথা দৈত্য"। এঁর সম্বন্ধে কিন্তু দর্শকদের মত দু'রকম। একদলের মত তিনিই একা চার্লটনকে প্রথম ডিভিসনে টিকিয়ে রেখেছেন। একাই তিনি একশ'। অপর দলের মতে বারট্রাম গোল রক্ষার কিছুই বোঝেন না; তিনি কেবল জানেন কি ক'রে কারণে অকারণে লাফালাফি করে চট্ চটাচট্ দর্শকদের হাততালি লাভ ক'রে নিতে হয়। এ কথা অবশ্য ঠিক যে

অনেক সময় সোজা বল তাঁর হাত ফস্কে গোলে ঢুকে পড়ে; কিন্তু আবার তিনিই এমন সব শক্ত শক্ত বল আটকে দেন যা সচরাচর চোখে দেখা যায় না। অনেকটা আমাদের দেশের বিখ্যাত গোল-রক্ষক কে. দত্তর (হারাধন) মত, নয় কি? বারট্রামকে ইংল্যাণ্ডের লোকেরা আদর ক'রে নাম দিয়েছে "প্রিন্স য়্যামং এন্টারটেইনার্স" অর্থাৎ "আনন্দদাতাদের রাজকুমার"।

এপার আষাঢ়—ওপার আষাঢ়

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এপার বাদল—ওপার বাদল—
পদ্মা বহে মাঝখানে,
মাঠ ভরেছে—বাট ভরেছে—
বাঙলা দেশের আজ গানে।
পদ্মা বহে মাঝখানে।
ঝরছে আষাঢ় অঝোর ঝরণ,
দূর গ্রামটী কাজল বরণ;
কাঁপছে নদী—এপার—ওপার—
গুরু গুরু মেঘ-তানে!
এপার আষাঢ়—ওপার আষাঢ়—
পদ্মা বহে মাঝখানে।

বাঙলা এপার—বাঙলা ওপার—
আষাঢ় নামে চর ঘিরে,
কাজল মেঘের কোমল মায়া
ঢাকল মোদের গ্রামটীরে।
নামল সোনার চর ঘিরে।
চলছে ডিঙা—অকূল কূলে
শুভ্র বরণ পালটী তুলে;

নামল আশীষ স্বর্গ হ'তে
বাঙলা মায়ের মন্দিরে;
এপার—ওপার—নামল আষাঢ়—
বাঙলা মায়ের গ্রাম ঘিরে।

পদ্মা ছোটে—মেঘনা ছোটে—
ছুটছে গড়াই, যমুনা,
সবার ঘরে থরে থরে
বিলায় অগাধ করুণা।
বাদল-ঝরা সজল বনে
কদম ফোটে ফুল্ল মনে;
বকুল যূথী বেল ফুটেছে
গ্রামটী ঘিরে 'বরুণা';
এপার আষাঢ়—ওপার আষাঢ়—
ঢালছে অগাধ করুণা।

বর্ষাগম

শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়

নিদাঘ-রবির কর জ্বালাময় খরতর,
সব অগ্নিময়;
শুকাল তড়াগ-নদী, সরোবর বাপী আদি,
যত জলাশয়।
ধরার হৃদয় টুটি' তাম্ররক্ত ধূলি উঠি'
ভরিল গগন,
তরুলতা, তৃণ জীর্ণ, নীরস কপিশ বর্ণ
করিল ধারণ।

তৃষিত সকল প্রাণী উর্দ্ধে করি যোড়পাণি
কাতরে জানায়,
"নিদাঘ প্রচণ্ড নব, ধ্বংস করে সৃষ্টি তব,
ওগো দয়াময়!
ঢালিয়া করুণা-ধারা রক্ষা কর বসুন্ধরা"—
শুনি নারায়ণ
"রক্ষা কর মোর সৃষ্টি' ঝরায়ে শীতল বৃষ্টি",
মেঘে ডাকি' ক'ন।

দিগন্তের প্রান্ত হ'তে চড়িয়া পবন-রথে,
আসে ত্বরা করি,
ঘন নীল পয়োবাহ, বিদ্যুৎ বনিতা সহ
অম্বর আবরি'।
নাশিয়া তপন-বীর্য্য, বাজাইয়া নিজ তূর্য্য
গভীর নিঃস্বনে,
বিসারি' বিশাল ছায়া, স্নিগ্ধ করি ভূমিকায়া
অভয় প্রদানে।
মিলি শ্যাম মেঘ-অঙ্গে হাসিছে চপল রঙ্গে
কনক বিজলী,
তরল মধুর হাসি—ক্ষণতরে দশ দিশি
উঠিছে উজলি'।
হেরি নীল ঘনকান্তি দূর হ'ল তাপ, ক্লান্তি
শীতলে জীবন,
ইন্দ্রধনু পুচ্ছ মেলি, দ্বিধা কেকাধ্বনি তুলি
ডাকে শিখীগণ।
ঝরঝর ঝরে জল, স্নিগ্ধধারে অবিরল
বারি-স্নান করে,
সিক্ত হ'ল ধরাতল, তৃণলতা তরুদল
পুলকে শিহরে।

চুম্বকের গল্প

শ্রীচৈতন্যঘোষ ভট্টাচার্য্য

অনেক—অনেক দিন আগেকার কথা। গ্রীস দেশের এক রাখাল যাচ্ছিল ভেড়া চরাতে, পথের ধারে পড়ে ছিল কতকগুলো কালো কালো পাথর। হঠাৎ সে অবাক্ হয়ে লক্ষ্য করল, তার লাঠির নীচের দিক্‌টা, যেটা নাকি লোহা দিয়ে বাঁধানো ছিল,—সেটাকে সেই পাথরগুলো যেন টেনে টেনে ধরছে। রাখাল ছেলেটি প্রথমটা এই ভূতুড়ে কাণ্ড দেখে অবাক্ হয়ে গেল; তার পর অনুসন্ধান ক'রে আবিষ্কার করল ঐ পাথরগুলির গুণই ঐ রকম। শুধু তাই নয়, এ রকম পাথর তখন গ্রীস দেশের অনেক জায়গায়ই পাওয়া যেত, ম্যাগনাস্ নামক জায়গায় পাওয়া যেত সব চেয়ে বেশী; তাই এর নাম দেওয়া হ'ল "ম্যাগনেট"।

এই হ'ল ম্যাগনেটের আবিষ্কারের গল্প। এই ম্যাগনেটকেই বাংলায় বলা হয় চুম্বক। গল্পটা কতটা সত্য বলার উপায় নেই, কারণ এটি গল্পই,—ঐতিহাসিক বিবরণ নয়। যাই হোক, প্রাচীন গ্রীসে যে চুম্বক-পাথরের অদ্ভুত গুণের বিষয় অজানা ছিল না এই থেকে তা বোঝা যায়। তবে জিনিষটা তখন কৌতূহল

মেটাবার সামগ্রী ব'লেই গণ্য হ'ত, আর ওর ঐ গুণটাকে মনে করা হ'ত ঈশ্বরদত্ত একটা অলৌকিক ক্ষমতা।

এর পর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পিটার পেরেগ্রিনাস্ নামে এক ভদ্রলোক চুম্বকের অদ্ভুত শক্তি দেখে ঐ নিয়ে পরীক্ষা সুরু করেন। তিনি আবিষ্কার করলেন, এক টুকরো কাঠকে জলে ভাসিয়ে তার উপর একটা চুম্বক পাথর নিয়ে যে কোন অবস্থাতেই ফেলে রাখা যাক্ না কেন, সেটা সর্ব্বদাই উত্তর-দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে ভাসতে থাকবে। শুধু তাই নয়, চুম্বক পাথরকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো ক'রে ফেললেও সেই ভাঙ্গা টুকরোগুলিও মূল চুম্বকের গুণ লাভ করবে। অবশ্য তিনি দিগ্‌দর্শন যন্ত্র আবিষ্কার করেন নি, তার অনেক আগে থেকেই চীন ও আরবীয় নাবিকেরা জাহাজের দিক্ ঠিক রাখবার জন্য চুম্বক পাথর ব্যবহার করত। অর্থাৎ চুম্বক পাথরের গুণের কথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও তখন অজানা ছিল না।

পিটার পেরেগ্রিনাসের পর অনেক দিন চুম্বক নিয়ে আর কোনও গবেষণার কথা শোনা যায় নি। ১৬শ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংল্যাণ্ডের উইলিয়াম্ গিলবার্ট্ নামে এক চিকিৎসক চুম্বক নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা এবং গবেষণা করেন,—যার ফলে ওর সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ তথ্য জানা যায়। তিনি একটি লোহার সূচকে চুম্বক দিয়ে ঘষে তার মধ্যে চুম্বক-শক্তি সঞ্চারিত করেন এবং আবিষ্কার করেন যে লোহা ছাড়া অন্য জিনিষে ঐ শক্তি সঞ্চারিত করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া আরও একটা মস্ত কথা তিনি বলে যান—আমাদের এই পৃথিবীটাই হচ্ছে একটা বিশাল চুম্বক।

এর পর হেনরী অয়েষ্টার্ড, যোসেফ হেনরী, মাইকেল ফ্যারাডে প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা চুম্বক নিয়ে আরও গবেষণা করেন, চুম্বকের সঙ্গে বিদ্যুতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও তখন ধরা পড়ে।

এখন চুম্বকের গুণ নিয়ে একটু আলোচনা করি। চুম্বক লোহা, ইস্পাত প্রভৃতিকে আকর্ষণ করে। এক টুকরো লোহা বা ইস্পাতকে যদি ক্রমাগত একই দিকে একটি চুম্বকের উপর ঘষা যায় তা হ'লে সেই লোহা বা ইস্পাতের টুকরোটার মধ্যেও চুম্বক-শক্তি সঞ্চারিত হবে। এই ভাবে আরও কয়েক রকম প্রক্রিয়ায় এক চুম্বকের সাহায্যে আর এক চুম্বক তৈরী করা যেতে পারে। যদি একখণ্ড চুম্বকের মাঝখানে সূতো বেঁধে সেটিকে ঝুলিয়ে দেওয়া যায় বা কোন কিছুর সাহায্যে জলের উপর ভাসিয়ে রাখা যায় তবে দেখা যাবে যে সমস্ত অবস্থায়ই চুম্বকটি উত্তর-দক্ষিণমুখী হয়ে ঝুলবে বা ভাসতে থাকবে। অবশ্য চুম্বকের উত্তর-

দক্ষিণ ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণ থেকে সামান্য পৃথক্। চুম্বকের এই বিশেষ গুণের কারণ এই যে আমাদের পৃথিবীটাও একটা বিশালকায় চুম্বক—যা নাকি পৃথিবীর উপরকার সমস্ত চুম্বককেই আকর্ষণ করে। প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর উত্তর মেরু পৃথিবীর উপরকার চুম্বকের দক্ষিণ মেরুকে এবং পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু চুম্বকের উত্তর মেরুকে আকর্ষণ করে। চুম্বকের এই গুণ কাজে লাগিয়েই দিগ্‌দর্শন যন্ত্র তৈরী সম্ভব হয়েছে।

একটা ছোট দিগ্‌দর্শন যন্ত্র কিন্তু সহজেই তৈরী ক'রে নেওয়া যেতে পারে।

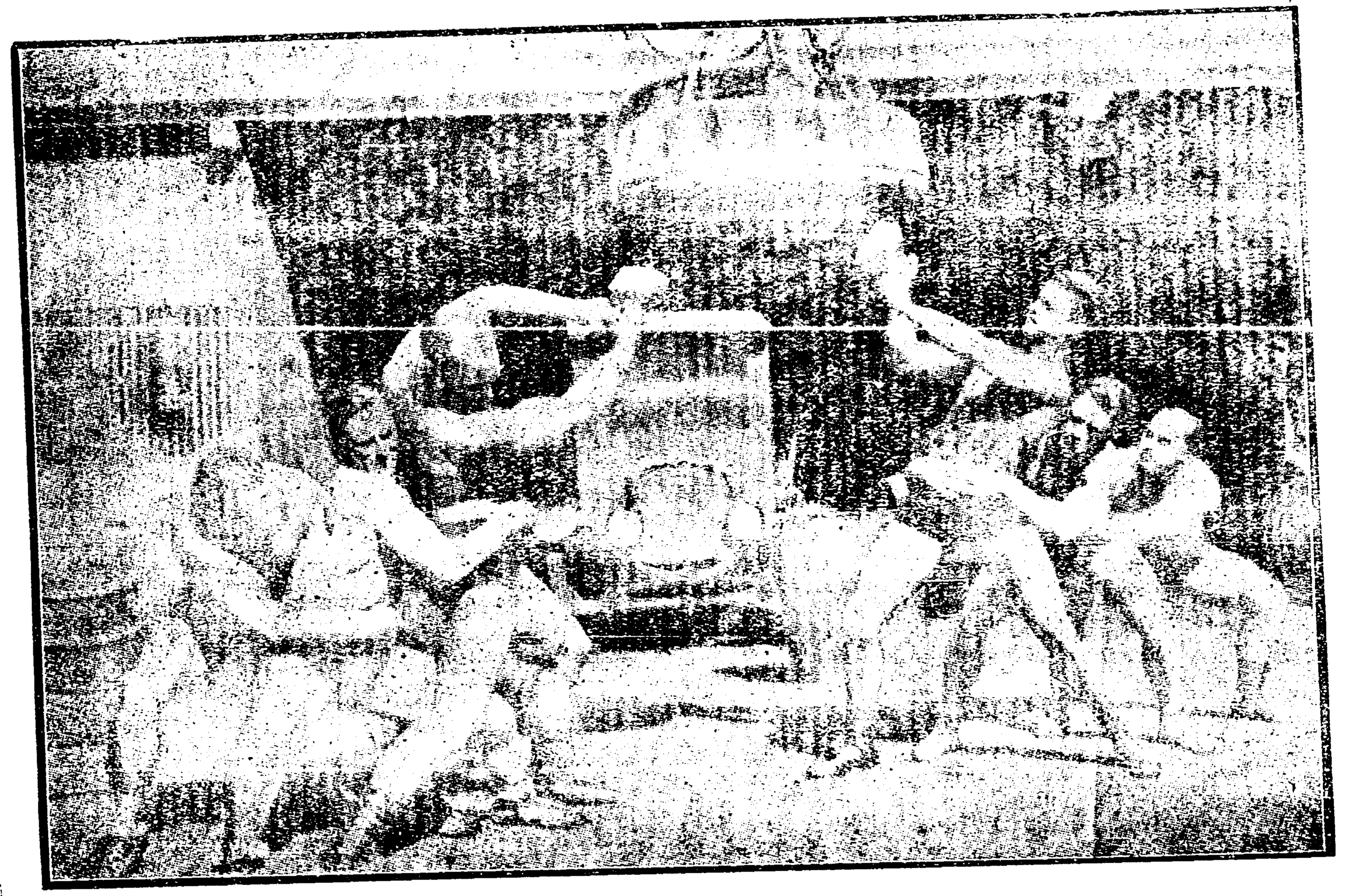

বৈদ্যুতিক চুম্বকের টান কি অসম্ভব দেখ! ৩।৪ জন পালোয়ান মিলেও হাতুড়ী দু'টিকে টেনে নামাতে পারছে না।

কেমন ক'রে বলছি। প্রথমে একটা চুম্বক লোহা যোগাড় কর। এইবার একটা মোটা লোহার স্যূচ নিয়ে সেই চুম্বকের উপর ক্রমাগত একই দিকে ঘষতে থাক। একটু পরেই স্যূচটিও চুম্বক-শক্তিসম্পন্ন হয়ে পড়বে। এইবার এই স্যূচটিকে একটি কর্কের ভিতর এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ঢুকিয়ে দিয়ে সেটাকে একটা জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ছেড়ে দাও। দেখবে, ওটি একটি দিগ্‌দর্শন যন্ত্রে পরিণত হয়েছে—স্যূচের মুখ সব অবস্থাতেই হয়ে আছে উত্তর-দক্ষিণমুখী।

চুম্বক কিন্তু এ ছাড়া আরও এক রকমের হয়—তাকে বলে 'ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেট' বা বৈদ্যুতিক চুম্বক। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে অয়েষ্টার্ড নামে একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন যে একটি নরম লোহার টুকরোর গায়ে যদি বৈদ্যুতিক তার জড়িয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালানো যায় তা হ'লে ঐ লোহার টুকরোটি চুম্বকে পরিণত হয় এবং যতক্ষণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলতে থাকে ততক্ষণ তার চুম্বক-শক্তি স্থায়ী হয়। বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ ক'রে দিলেই আবার যে লোহা সে লোহা। আধুনিক বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারটাকে কলকারখানার নানা কাজে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় নানা বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামে কাজে খাটাতে কসুর করেন নি। ধর, এক জায়গা থেকে কতকগুলো বড় বড় লোহার চাঁই সরাতে হবে। লোহার সামনে একটি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক চুম্বক নামিয়ে দিতেই চুম্বক তাদের টেনে নিল। এর পর সে চুম্বক স্থানান্তরিত ক'রে তার বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করলেই লোহার চাঁইগুলি আলগা হয়ে খসে পড়বে।

এই বৈদ্যুতিক চুম্বকও ঘরে খুব সহজে তৈরী করা যেতে পারে। এক টুকরো নরম লোহার গায়ে দুই স্তর সরু ইন্‌সুলেটেড্ বৈদ্যুতিক তার জড়িয়ে তারের দু'টি মুখ একটি ব্যাটারীর দু'টি মুখের সঙ্গে যুড়ে দিলেই হ'ল। তারে বিদ্যুৎ-প্রবাহ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ লোহার টুকরোটি চুম্বকে পরিণত হবে এবং যতক্ষণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলবে ততক্ষণ সে চুম্বক-শক্তি নষ্ট হবে না।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়

বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের নাম তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর একটি কবিতায় কলকাতার বর্ণনা দেবার সময় লিখেছিলেন—"দক্ষিণে এর দক্ষিণ রায় ঘোড়েতে বাঘের গুল্ম পিয়া।" কে এই এই দক্ষিণ রায়?

দক্ষিণ রায় কিন্তু আসলে একজন মানুষ। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি ছিলেন রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি। কপোতাক্ষ নদের ধারে ব্রাহ্মণনগরে ছিল মুকুট রায়ের রাজধানী। গাথা-সাহিত্যে এই দক্ষিণ রায়ের সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। একটি গল্প আছে, সুবিখ্যাত মুসলমান বীর গাজী একবার ব্রাহ্মণনগর আক্রমণ করেন। তিনি সঙ্গে সুন্দরবনের অনেক বাঘও নিয়ে আসেন। দক্ষিণ রায় গাজীকে প্রবল ভাবে বাধা দেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে না পেরে সুন্দরবনে পালিয়ে যান। গাজী ব্রাহ্মণনগর অধিকার করেন। মুকুট রায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করলে তাঁর মেয়ে চম্পাবতীর সঙ্গে গাজীর বিয়ে হয়। এদিকে দক্ষিণ রায় সুন্দরবনে এসে গাজীর সঙ্গে তাঁর আবার সখ্যতা হয়—তিনি ঐ অঞ্চলের অনেকখানি জায়গার ওপর প্রভুত্ব করতে থাকেন, এবং পরবর্ত্তী কালে বনদেবতা রূপে পরিচিত হ'ন।

বিখ্যাত রায়মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণ রায় সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। এখানে কিন্তু গল্পটা অন্য রকম। প্রভাকর নামে এক পরাক্রান্ত রাজা সুন্দরবনে বন কাটিয়ে এক বিরাট রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি মহাদেবের আরাধনা ক'রে দক্ষিণ রায়কে পুত্ররূপে পেয়েছিলেন। দক্ষিণ রায় সুন্দরবনের বিস্তৃত অঞ্চল যুড়ে রাজত্ব করতেন। তখন সেখানে বাঘের খুব উপদ্রব ছিল, কিন্তু দক্ষিণ রায়ের প্রতাপে বাঘেরাও শেষ পর্য্যন্ত কারো অনিষ্ট করতে পারত না। প্রজারা বল্‌ত, দক্ষিণ রায় বাঘেরও রাজা, এমন কি তাঁর বাহনও বাঘ,—বাঘে চড়েই তিনি যুদ্ধ করেন। যাই হোক, এ থেকে সুন্দরবনে দক্ষিণ রায়ের যে প্রবল প্রতাপ ছিল তা অনুমান করা যায়। বড় খাঁ গাজীর সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধের কথা রায়মঙ্গল কাব্যেও আছে এবং শেষে বন্ধুত্বের কথাও আছে—

"বড় খাঁ গাজীর সাথে মহাযুদ্ধ খনিয়াতে
দোস্তানি হইল তার পর।"

ক্রমে দক্ষিণ রায় সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প প্রচলিত হ'ল এবং তাঁকে দেবতার অংশ মনে ক'রে পূজো করাও সুরু হ'ল। বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে দক্ষিণ রায়কে ব্যাঘ্র-দেবতা এবং খুব জাগ্রত দেবতা ব'লে মনে করা হ'ত। রায়মঙ্গল কাব্যে দক্ষিণ রায়ের যে বন্দনা আছে তা থেকে কয়েক লাইন তুলে দিচ্ছি:

"করযোড়ে মহাকায় বন্দিলাম দক্ষিণ রায়
ঠাকুরের চরণ কমল;
সঙ্গে নীলাবতী রাণী পঞ্চ পাত্র সাথে আনি
উরঘটে ভকত বৎসল।

* * * *

পূজা করে এক মনে কাঠ কাটে গিয়া বনে
বাউল্যা বউল্যা কত ঠাঁঞি,
পাইলে নাহিক খায় বাঘেরা বিমুখ যায়
তোমার কৃপায় ভয় নাঞি।"

কলকাতা থেকে মাইল বিশেক দক্ষিণে ধপধপি ব'লে একটা গ্রাম আছে। এখানে দক্ষিণ রায়ের মন্দির ও বিরাট মূর্ত্তি আছে। যারা সুন্দরবনের জঙ্গলে মোম, মধু, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে যায় তাদের ধারণা এখানে ভক্তি ভরে পূজো দিয়ে গেলে বাঘের ভয় থাকে না। এক সময়ে নাকি এখানে নরবলিও প্রচলিত ছিল।

শিশুজগৎ

পৃথিবীর যে সব দেশ নানা দিক দিয়ে এগিয়ে চলেছে—অর্থাৎ সাধু ভাষায় যাদের আমরা বলি 'প্রগতিশীল', তাদের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দেওয়া। ছোটদের ঠিকমত গড়ে তুলতে না পারলে, তাদের 'হেলা-ফেলা' ক'রে মানুষ করলে তারা বড় হয়ে সত্যিকার নাগরিক হয়ে উঠতে পারে না—এ সত্য এ সব দেশের কর্ত্তারা বুঝতে পেরেছেন। মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরাও তাই এই শিশুমনস্তত্ব নিয়ে আজকাল প্রচুর গবেষণা করছেন।

শিশুদের একটা স্বতন্ত্র জগৎ আছে, নিজেদের সুখ-দুঃখ আছে, নিজস্ব প্রতিভা আছে। এগুলোকে তুচ্ছ না ক'রে সত্যিকার সম্মান দিতে হবে। অকারণে শাসন আর তাড়না না করলে নিয়মানুবর্ত্তিতায় তারা যে কারো চাইতে কম নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। শিশুদের সম্বন্ধে এই উপলব্ধি, যতটা শুনেছি, প্রথম হয় জাপানে। জাপানের ছেলেমেয়েদের জীবন এক সময়ে কী চমৎকার ছিল সে গল্প তোমরা অনেক দিন আগে রামধনুতেই পড়ে থাকবে। অবশ্য, সে মহাযুদ্ধের আগেকার কথা। যুদ্ধে পরাজিত হবার পর জাপানের ভিতরকার অবস্থা এখন কি রকম সে বিষয়ে ভাল ক'রে জানবার উপায় নেই।

বর্ত্তমানে যে সব দেশ ছেলেমেয়েদের জন্য সত্যি সত্যি ভাবে তাদের মধ্যে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, সুইট্জারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের নাম করা যায়, কিন্তু সব চেয়ে বেশী ক'রে বলতে হয় সোভিয়েট রাশিয়ার নাম। সে দেশে রাষ্ট্র থেকে ছেলেমেয়েদের জন্য যে সব ব্যবস্থা করা হয় তার বিবরণ শুনলে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেতে হয়। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

রাশিয়ায় ছেলেদের জন্য কম ক'রে ৮০০ শিশুপাঠাগার আছে। গত পাঁচ বছরে সেখানে রাষ্ট্রীয় শিশুসাহিত্য প্রকাশনা-ভবন থেকে ছেলেমেয়েদের জন্য ১৫ কোটি কপি বই ছাপা হয়েছে,—১৭০০ রকমের বই। রাশিয়ায় ছোটদের জন্য ১৪০টি নাট্যশালা আছে। এই সব জায়গায় ছোটদের উপযোগী ক'রে লেখা নাটক নিয়মিত ভাবে অভিনীত হয়। দেশের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারেরা ঐ সব নাটক রচনা ক'রে দেন। মস্কো সহরে ছোটদের জন্য 'সেন্‌ট্রাল থিয়েটার' নামে যে বিরাট থিয়েটার হল্‌টি তৈরী হয়েছে অনেক দেশে বড়দের জন্যও অমনটা নেই।

গরমের দিন সেখানে পার্কে পার্কে ছেলেমেয়েদের মেলা বসে। বিরাট্ বিরাট্ মেলা—এক সঙ্গে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে তাতে যোগ দেয়। অনেক সময় ছোটদের সঙ্গে দেশের বড় বড় লোকেরাও এসে জোটেন। দেশের নাম-করা কবিরা ছোটদের জন্য কবিতা লিখে এনে তা পড়িয়ে শোনান, সাহিত্যিকেরা শোনান তাঁদের স্বরচিত রচনা, বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার-কাহিনীর গল্প বলেন।

শুধু আমোদ-প্রমোদই নয়, ছেলেমেয়েদের নানা বিষয় হাতে-কলমে শেখাবার জন্য কত রকম প্রতিষ্ঠান যে সেখানে আছে তা গুণে শেষ করা যায় না। রাশিয়ায় ছোটদের পরিচালিত রেলওয়ের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ, ছোটদের পরিচালিত সংবাদ পত্রের কথাও। এ ছাড়া ছোটদের জন্য সেখানে নানা রকম সৌখীন কলকারখানা আছে, কারিগরী বিদ্যা শিখবার প্রতিষ্ঠান আছে, ছোটদের উপযোগী বিজ্ঞান চর্চ্চার ল্যাবরেটরী আছে, ক্ষুদে ক্ষুদে এরোপ্লেন, মোটর ইত্যাদি তৈরী ক'রে চালাবার প্রতিষ্ঠান আছে। তা ছাড়া আছে ছোটদের জন্য পৃথক্ বটানিকাল গার্ডেন—কৃষি-উদ্যান, পশুশালা, চিত্রশালা, নৃত্যশালা, ক্লাব, বিতর্কসভা—কত কি! আর খেলাধূলা বা ব্যায়াম চর্চ্চার যে কত ব্যবস্থা আছে তার তো কথাই নেই!

গরমের ছুটী হ'লে লক্ষ লক্ষ শিশু সহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে থাকেন শিক্ষক, শিক্ষিকা—অভিভাবকের দল। দিকে দিকে সুরু হয় কিশোর-অভিযান। পাহাড়ে, পর্ব্বতে, উপত্যকায়, সমুদ্রতীরে ছোটদের অসংখ্য শিবির বসে যায়। গত বছর এই ভাবে যে সব ছেলেমেয়ে দেশভ্রমণে বেরিয়েছিল তাদের সংখ্যা হবে কম ক'রে ৫০ লক্ষ।

আর এর সব কিছুই পরিচালিত হয় রাষ্ট্রের টাকায়।—তাই 'টাকা কোথায় পাব' বা 'টাকা নেই' এ কথা কখনও ওঠে না।

স্বামী বিরজানন্দ

গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ দেহত্যাগ করেছেন। মাত্র সতেরো বছর বয়সে কলেজে পড়বার সময়ে তিনি সংসার ছেড়ে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি প্রেরণা পান তাঁরই কলেজের এক অধ্যাপকের কাছে। (এই অধ্যাপকেরই অমর কীর্ত্তি "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত"।) প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী সারদা দেবীর কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। তার পর স্বামী বিবেকানন্দের কাছে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। স্বামীজীর শিক্ষা তাঁর জীবনে আনে আর এক বিরাট

প্রেরণা। দীর্ঘ দিন কঠোর সাধনা ও তপশ্চর্য্যার পর বিরজানন্দ মঠের পরিচালনায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন এবং অবশেষে সর্ব্বোচ্চ পদ—অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হ'ন। তাঁর তিরোধানে শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের নয়—সমস্ত ধর্ম্ম-জগতে একটা মস্ত আসন শূন্য হয়ে গেল।

খেলাধূলার খবর—ফুটবল

কলকাতায় ফুটবল লীগ্ পুরো দমে চলছে। ১৪ই জুন তারিখের খবর—প্রথম বিভাগের শীর্ষ স্থানে রয়েছে এখন মোহনবাগান দল। ৯টি ম্যাচ্ খেলে তাদের পয়েন্ট হয়েছে ১৬। এ পর্য্যন্ত তারা কোন খেলাতেই পরাজিত হয় নি, তবে ২টি খেলায় ড্র করেছে। ই. আই. আর এবং ইষ্ট বেঙ্গল দলও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। ই. আই. আর ১১টি ম্যাচ খেলে পেয়েছে ১৬ পয়েন্ট, আর ইষ্ট বেঙ্গল ১০টি খেলে পেয়েছে ১৫ পয়েন্ট। মোহনবাগানের কাছে প্রথম খেলায় ৩-০ গোলে পরাজিত না হ'লে তাদের অবস্থা আরও ভাল হ'ত। এর পর যথাক্রমে বি. এন. আর (১৪), ভবানীপুর (১৪), রাজস্থান (১৩), এরিয়ানস্ (১৩) প্রভৃতি দল স্থান পেয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং এবারে তেমন সুবিধা ক'রে উঠতে পারছে না। প্রথম বিভাগের তালিকার সব চেয়ে নীচে রয়েছে ক্যালকাটা গ্যারিসন্ দল। তারা এখন পর্য্যন্ত ১০টি ম্যাচ খেলে একটি পয়েন্টও পায় নি।

সুবিখ্যাত ক্যালকাটা দল এবারে দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে বাধ্য হয়েছে। তবে ২য় বিভাগে এখন পর্য্যন্ত তারাই শীর্ষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। আশা করা যায় আসছে বারে তারা আবার হয়তো ১ম বিভাগে খেলতে পারবে।

নৃত্যশিল্পী অরুন্ধতী

কুমারী অরুন্ধতী রামধনুর একটি ছোট্ট গ্রাহিকা, বয়স মাত্র ৯ বছর। কিন্তু এরই

কুমারী অরুন্ধতী ভট্টাচার্য্য

মধ্যে সে নৃত্যশিল্পে বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ক'রে ফেলেছে—বিশেষ ক'রে কথাকলি ও ভারত-নাট্যম্ নৃত্যে। সম্প্রতি রাজ্যপাল-ভবনে এবং

শ্রীরঙ্গম্‌, কালিকা প্রভৃতি বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন নৃত্যভূমিকায় অংশ গ্রহণ ক'রে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ইতিপূর্ব্বেও, মাত্র ৬ বছর বয়সে, সে বালীগঞ্জ সঙ্গীতসঙ্ঘে মণিপুরী-নৃত্য-প্রতিযোগিতায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে 'ট্রফী' লাভ করেছিল।

শ্রীমতী অরুন্ধতী বালীগঞ্জ মুরলীধর বালিকা-বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রী। তা ছাড়া বেঙ্গল মিউজিক্‌ কলেজেও সে ৫ম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। বিখ্যাত নৃত্যপরিচালক শ্রীযুক্ত ব্রজবাসী সিংহ তাকে নৃত্যশিক্ষা দিয়ে থাকেন। শ্রীমতী অরুন্ধতী বালীগঞ্জনিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্যের কন্যা।

রাজনীতিতে নতুন বিরোধী দল

কংগ্রেস থেকে যে সব নেতা ও সদস্য বেরিয়ে এসেছেন তাঁদের অনেকে এবং কংগ্রেস-বিরোধী অন্যান্য কয়েকটি দলের সদস্য ও নেতারা মিলে সম্প্রতি একটি বড় রকমের সম্মিলিত নতুন দল গড়ে তুলছেন। পাটনা সহরে এই নিয়ে একটি সম্মেলন হচ্ছে। এই নতুন দলের নাম দেওয়া হয়েছে কিষাণ প্রজা মজদুর দল—সংক্ষেপে প্রজা দল। আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে এঁরা কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

রায় পাহাড়ীর নিশাচর

শ্রীঅমলেন্দু সেন

১৫

টেবলের উপর দুই কনুই রেখে, দু'হাতে মাথাটা তুলে ধরে ভদ্রলোক আস্তে আস্তে বললেন, এসো অবিনাশ! কত কাল পরে আবার দেখা হ'ল।

তাঁর কথা শুনেই মামা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। তারপর বলে উঠলেন, রাজা অবনীনাথ! তুমি?

যাঁর কথা এত শুনেছি, ধরণীনাথের হত্যাকারী এই সেই রাজা অবনীনাথ রায়? অবাক্‌ হয়ে চেয়ে রইলাম বৃদ্ধের দিকে।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবিনাশ, আমিই। আঠারো বছর লুকিয়ে ছিলাম। আজ আমার লুকিয়ে থাকবার দরকার ফুরিয়েছে, তাই তোমাকে খবর দিয়েছি।

তার পর রাজা অবনীনাথ তাঁর কাহিনী সুরু করলেন ঃ

"আঠারো বছর ধরে এই বাড়ীতে আমি লুকিয়ে আছি। আমিই রায়পাহাড়ীর নিশাচর।

"কি অবস্থায় পড়ে আমি ভূত সেজে এত কাল কাটাতে বাধ্য হ'লাম, সে কথা বলছি।

"ধরণীনাথ যে রাত্রিতে খুন হ'ল, সেদিন আমাদের তাস খেলার কথা মনে আছে তোমার? তাস খেলার পর তোমরা উঠে গেলে। দেখে গেলে যে আমি স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। কেন, তা তোমরা বুঝতে পার নি নিশ্চয়।

"ধরণী তার ঘরে চলে যাবার পর তাসগুলো পরীক্ষা করে দেখলাম যে সব তাসে বিশেষ ভাবে চিহ্ন দেওয়া আছে। ধরণীর এই নীচতা দেখে আমার মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। এই জুয়াচুরী করে রেখেছিল বলেই সে সব বাজী জিতছিল। সে কথা বুঝেও তোমাদের বললাম না, ভাবলাম আগে ধরণীর সঙ্গে কথা বলে দেখব। উঠে ধরণীর ঘরে গেলাম।

"এই সেই ঘর। এই টেবলে, এইখানে ধরণী বসে ছিল। সামনে তার বাজী জেতা টাকাগুলি। আমি এসেই তাকে বললাম যে তার জুয়াচুরী আমরা ধরে ফেলেছি। অনেক ধমকধামক করলাম তাকে। আর বললাম যে সে যদি ভালয় ভালয় সব টাকাকড়ি ফিরিয়ে না দেয়, আর সেই রাত্রিতেই রায়পাহাড়ী ছেড়ে চলে না যায়, তা হ'লে গগন আর তুমি পুলিসে খবর দেবে বলেছ।

"প্রথমে ধরণী খুব তেড়ে উঠেছিল, কিন্তু শেষটার আর কোনও উপায় নেই দেখে সে আমার কথায় রাজী হয়ে গেল। টাকার থলিটা আমি নিলাম, আর খতগুলি সে আমার সামনেই পুড়িয়ে ফেলল। তারপর সে আমার কাছে টাকা চাইল তার জুয়ার দেনা শোধ করবার জন্য।

"আমার ভয়ানক রাগ হয়েছিল। আমি কথা না বলে চলে আসছিলাম,

ধরণী আমার হাত ধরে ফেলল। আমি জোর করে হাত ছাড়িয়ে চলে আসতে আমার গায়ের জামার আস্তিন খানিকটা ছিঁড়ে তার হাতে থেকে গেল।

"তারপর আর আমি কিছুই জানি না। আমার ছোরা আর ধরণীর রক্তমাখা কাপড়চোপড় একসঙ্গে দেখে আমি তোমাদের চেয়ে কম অবাক্ হই নি। তারপর যখন দেখলাম যে সব প্রমাণই আমার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়াতে লাগল, তখন বুঝলাম যে আমি যে নির্দ্দোষ সে কথা এখন কেউ বিশ্বাস করবে না। কোথায় কেউ একটা গভীর ষড়যন্ত্র করেছে আমার বিরুদ্ধে।

"পালিয়ে যাব ঠিক করলাম। তার কারণ ছিল। প্রথমতঃ, ধরণীর যথার্থ হত্যাকারী শেষটায় ধরা পড়বেই, ততদিন আমি কেন হাজত বাস করব? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে আমার স্ত্রী আর ছোট একটী ছেলে ছিল।"

১৬

ততক্ষণে সন্ধ্যা উৎরে গেছে। অন্ধকার ঘর আরও অন্ধকার হয়ে এল। হরিশ কাকা ছোট একটা মোমবাতি জ্বেলে এনে রাজা অবনীনাথের পিছনে জানলার উপর রাখলেন। তাতে আলো হ'ল এমন কথা বলা যায় না। তবে জমাট আঁধারটা সামান্য একটু ফিকে হ'ল এই মাত্র।

একটু ম্লান হাসি হেসে অবনীনাথ বললেন:

"অনেক দিন অন্ধকারে থেকেছি কিনা, তাই আলো সয় না চোখে।

"আমার স্ত্রী আর ছেলের কথা বলছিলাম। তোমরা জানতে যে আমি বিয়ে করি নি। কিন্তু কলকাতায় থাকার সময়েই আমি গোপনে একটী খুব সাধারণ ঘরের মেয়েকে বিয়ে করি। কাউকে সে কথা জানাই নি, কেন না কোনও ক্রমে বাবা-মার কানে কথাটা উঠলে মহা বিপদ্ হ'ত। তাই, মা মারা না যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'ল।

"বিয়ের পরই আমার স্ত্রীকে কলকাতার বেলেঘাটায় একখানা বাড়ী ভাড়া করে সেখানে রেখে দি। বেশীর ভাগ সময়েই আমাকে রায়পাহাড়ীতে থাকতে হ'ত, তাই পাড়ার লোকদের বলেছিলাম যে ব্যবসার খাতিরে আমাকে বাইরে থাকতে হয়। রায়পাহাড়ী থেকে খরচের টাকা পাঠালে জানাজানি হয়ে যেতে পারে, এই ভয়ে গগনকে শেষে সব কথা খুলে বলি। আর, তার কাছে কিছু টাকা রেখে দি। কিন্তু, ঠিকানাটা তাকে জানাই নি।

"বছর দুই বাদে আমাদের একটি ছেলে হ'ল। লালুই আমার সেই ছেলে।

"গগন সবই জানত। আরও একটা বিষয়ে তার সাহায্য নিয়েছিলাম। বাবার মৃত্যুর পর আমি যখন সম্পত্তির মালিক হ'লাম, তখন গগনের সাহায্যেই লাখখানেক টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখি। তারই পরামর্শে রসিদটা এমন ভাবে করিয়ে নেওয়া হয় যাতে সেটা নিয়ে যে যাবে সে-ই কাগজগুলি তুলে আনতে পারবে।

"মাও যখন মারা গেলেন তখন আমার স্ত্রী-পুত্রকে রায়পাহাড়ীতে নিয়ে আসার পক্ষে কোন বাধা রইল না। আগে তোমাদের সব কথা বলব ভাবলাম। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন যে আমার আর বিশেষ কেউ ছিল না তা তো জানই।

"কিন্তু সে কথাটা আর বলা হ'ল না। ধরণীর ব্যাপারটা মাঝখানে পড়ে সব গোলমাল হয়ে গেল। এখান থেকে পালিয়ে সোজা গেলাম বেলেঘাটার বাড়ীতে। সঙ্গে টাকাকড়ি সামান্যই নিতে পেরেছিলাম, কিন্তু রসিদখানাকে নিতে ভুলি নি।

"টাকাকড়ি ফুরিয়ে গেল দু'-তিন মাসের মধ্যেই। তারপর বড় কষ্ট পড়ে গেলাম। ব্যাঙ্ক থেকে কাগজগুলি অথবা গগনের কাছ থেকে টাকা আনবার কোন ব্যবস্থা করতে সাহস হ'ল না; তখন পুলিশ আমাকে খুঁজছে।

"ইতিমধ্যে লালুর মার অসুখ হ'ল। টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারলাম না। এক রকম বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন রায়পাহাড়ীর রাণী। তখন মহা বিপদ্ হ'ল ছেলেটাকে নিয়ে। ওর একটা ব্যবস্থা করতে পারলে আমি না হয় অন্য কোনও দেশে পালিয়ে যেতে পারতাম।

"ভেবে ভেবে দেখলাম যে হরিশ হয়তো এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারে। মরীয়া হয়ে তাকে খবর দিলাম। হরিশ রাজী হয়ে লালুকে নিয়ে গেল। আর, রসিদখানা নিজের কাছে রাখা ঠিক হবে না ভেবে সেটার একটা ব্যবস্থা করলাম। সে সব কথা তোমরা এখন জেনেছ, আমি আর বলব না।" (ক্রমশঃ)

বৈশাখ মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রথম পুরস্কার—শ্রীনির্ম্মলকুমার গুহ রায় (এলাহাবাদ)

দ্বিতীয় পুরস্কার—শ্রীমতী অজিতা দাশগুপ্তা (কলিকাতা)

যাঁদের লেখা ভাল হয়েছে: শ্রীবাবলু পাইন (ঘাটশিলা), শ্রীরবি মজুমদার (দিল্লী), শ্রীসুস্নাত গংগোপাধ্যায় (কলিকাতা ২৬), শ্রীমতী নমিতা বসু (কলিকাতা ২০), শ্রীজগন্নাথ দাস (পুরী), শ্রীকুন্তলা চট্টোপাধ্যায় (নাগপুর)।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

পঞ্জিকার হিসাবে বর্ষাকাল শুরু হয়েছে। হাওয়া-অফিসের খবরেও প্রকাশ, সাগর-বক্ষ থেকে মৌশুমী বাতাস যথা সময়ে নির্দ্দিষ্ট পথে রওনা হয়ে গেছে। তার কিছুটা আভাস ইতিপূর্ব্বে পেলেও এই চিঠি লিখবার সময়ে গরমে ত্রাহি ত্রাহি করছি। উল্টে কলকাতার সম্পদ্ দক্ষিণ-হাওয়াটুকুও কে যেন বেমালুম সরিয়ে নিয়েছে। এমন গুমট গরমে কি কেউ চিঠি লিখতে পারে ?

সরকারী নিয়মকানুন হামেশাই বদলাচ্ছে—বিশেষতঃ স্বদেশী সরকারের আমলে। চিঠির মাশুল কখন বাড়বে কখন কমবে কিছুই বলা যায় না। সম্প্রতি কিছু দিন হয় স্থানীয় ডাকের মাশুল (খামের চিঠির) এক আনার বদলে আবার দু' আনা হয়েছে। ফলে আমাদের কাছে এত বেয়ারিং চিঠি আসতে আরম্ভ করেছে যে এ বিষয়ে না লিখে থাকা গেল না। আমাদের কাছে প্রত্যহ এত বাজে চিঠি আসে যে সমস্ত বেয়ারিং চিঠি রাখার প্রশ্নই উঠতে পারে না। ফলে বেয়ারিং চিঠি এলেই তা অফিস থেকে ফেরৎ যায়। এতে কাজের চিঠিও ফেরৎ যেতে পারে। তাই আশা করি এ বিষয়ে তোমরা খুব সতর্ক হবে। তা ছাড়া বেয়ারিং সম্বন্ধে আরও কয়েকটা নিয়ম অনেকেই জান না মনে হচ্ছে : (১) খামের মুখ বন্ধ ক'রে দিলে তা বুক পোষ্ট হয় না—বেয়ারিং হয়ে যায়। (২) খামের মুখ খুলে দিলেও তার মধ্যে যদি কোন চিঠি থাকে তা হ'লে তা বুক পোষ্ট হয় না—বেয়ারিং হয়। বুক পোষ্টে কবিতা বা প্রবন্ধ খামের মুখ খুলে পাঠাতে পার কিন্তু তার সঙ্গে যেন কোন চিঠি না থাকে। বুক পোষ্টে একমাত্র ছাপানো চিঠিই যেতে পারে। (৩) খামের চিঠি ৵০ য় এক তোলা পর্য্যন্ত যায়, তার ওপর প্রতি তোলা বা ভগ্নাংশের জন্য ৴০ ক'রে অতিরিক্ত টিকেট লাগে, দু' পয়সা নয়। (৪) বুক পোষ্টে ৫ তোলা পর্য্যন্ত ৫১৫ (৫১০ নয়), তার পর প্রতি আড়াই তোলার জন্য ৫৫ ক'রে অতিরিক্ত লাগে। (৫) পোষ্ট কার্ডের গায়ে আঠা দিয়ে কোন কাগজ এঁটে দিলে তা বেয়ারিং হয় (৬) পোষ্ট কার্ডে ঠিকানা লিখবার দিকটায় চিঠির অংশ যদি অর্দ্ধেকের বেশী জায়গা যুড়ে থাকে তা হ'লেও তা বেয়ারিং হয়। আশা করি চিঠি লিখবার আগে তোমরা ভাল ক'রে এ সব বিষয়ে দৃষ্টি রাখবে।

শ্রীঅসীমা পাল (করিমগঞ্জ)—তোমাদের ওখানকার বর্ষণের কথা শুনে আমাদের হিংসা হয়, গরমে যা কষ্ট পাচ্ছি আমরা! কুমারী দীপালী সেনগুপ্তা (গৌহাটী)—রামধনুর [illegible]

সম্বন্ধে তোমার অনুযোগ উপলব্ধি করলাম। বৈশাখের তুলনায় জ্যৈষ্ঠ বোধ হয় একটু ভাল হয়েছে, অন্ততঃ সবাই-ই সে কথা লিখেছে। শ্রীঅশোক চৌধুরী (নবদ্বীপ)—খাদ্য-বস্ত্রসঙ্কট সম্পর্কে তোমার পরিকল্পনা বেশ সুন্দর, কিন্তু এ কি পণ্ডিত জওহরলালজী ছাড়া আর কারও সাধ্য ? শ্রীশিবাজীপ্রসাদ সোম (হাওড়া)—তোমার দাদাকে ব'লো, ফটো পাঠাতে কোনই আপত্তি নেই, কিন্তু ফটো ছাপবার মত কাগজ পাচ্ছি না যে! কুমারী দীপ্তি সেনগুপ্তা (গৌহাটী)—তোমার দীর্ঘ পত্র খুবই উপভোগ্য। বাংলার প্রতি তোমার অসীম ভালবাসা এবং আসামের প্রতি গভীর স্নেহ কোনটাই তুচ্ছ করবার নয়। 'বাংলাকে জানি কিন্তু চিনি না'—এই কথাটির মধ্যেই তোমার সব কথা বলা হয়েছে।

এবারে কয়েকটি লেখার আলোচনা করি। চিঠি (কুমারী নমিতা দাস)—বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইএর নাম দিয়ে লেখা তোমার চিঠিটা বেশ ভাল হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বইএর নাম দিয়েও এ রকম চিঠি বেরিয়েছে—কাজেই এখন এটা বার করলে একটু একঘেয়ে লাগবে না কি ? রবি-আবাহনী (সঞ্জীবন)—কবিতাটির শব্দচয়ন সুষ্ঠু হয় নি, স্থানে স্থানে অর্থ গ্রহণেও কষ্ট হয় যে! ছদ্মনাম গ্রহণের তাৎপর্য্য বুঝলাম না। আশীর্ব্বাদ (শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ) এ গল্পটির সঙ্গে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি গল্পের এত বেশী মিল আছে যে তা অবহেলা করা যায় না। যা নিজে লিখতে পার তাই লিখ। এ ভাবে কখনও নকল করার চেষ্টা ক'র না। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। জয় হিন্দ —ইতি রাঃ সঃ।

এ মাসের নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

"একদিনের জন্য যদি তোমাকে তোমাদের বাড়ীর কর্ত্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়া যায় তবে তুমি কি করবে ?"—এই বিষয়ে লিখে পাঠাতে হবে। লেখার সঙ্গে যুক্তিতর্কও থাকা চাই—যা তুমি করতে চাও তা কেন করতে চাও লিখতে হবে। লেখাটি যেন এক হাজার শব্দের (রামধনুর ৩ পৃষ্ঠা) বেশী না হয়। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে কিন্তু প্রত্যেক লেখার সঙ্গে এ সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় আঁটা কুপনটি পূর্ণ ক'রে পাঠাতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না। কুপনটি যেন লেখার সঙ্গে পিন বা আঠা দিয়ে আঁটা থাকে। রামধনু-সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। পাঠাবার শেষ তারিখ ১০ই শ্রাবণ, ১৩৫৮।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

বৃষ্টির দিনে

কুমারী প্রকৃতি পণ্ডিত

স্নিগ্ধ অম্বর ফেলেছে ছেয়ে আজ কৃষ্ণ চিক্কণ মেঘের ভার,
আকাশ বিগলিয়া পড়িছে ঝরি' যেন মুক্তা-উজ্জ্বল বৃষ্টিধার।

TIGHT BINDING

শ্যামল বনানীর শিখরদেশ ঘিরি' জমেছে ঘন কালো মেঘের স্তূপ,
মুগ্ধ চোখ মেলি' হেরিনু চেয়ে তার কৃষ্ণ সুন্দর ভয়াল রূপ।
দীপ্ত বিজলীর আড়ালে থাকি থাকি কে যেন করিতেছে আর্ত্তনাদ,
চাতক খুসী বড়, মিটেছে তৃষা তার লভিয়া বারে বারে বারির স্বাদ।
মানস-ঝুলনায় লেগেছে দোলা আজ, তুলিছে ঘন ঘন দোদুল দোল,
সুপ্ত অন্তর তুলিছে শিহরিয়া রিমিঝিমি রিমিঝিমি গভীর রোল।
বহিছে ঝোড়োহাওয়া শ্যামল ধরা তায় শিহরি' উঠিতেছে বারম্বার,
উছল কলরোলে মাতিয়া উঠে নদী, আবার নামি আসে বৃষ্টিধার।

তাজমহল

শ্রীমতী কল্পনা ঘোষ

বহিছে ক্লান্ত শিশির-সমীর যমুনার তট বহি,
মোগল-দুহিতা প্রেমগর্ব্বিতা মমতাজ আজ নাহি।
আজ শুধু আছে যমুনার কূলে ওই মর্ম্মর-স্মৃতি,
মরণের মাঝে হারায় নি যাহা—সেই ভালবাসা—প্রীতি।
কবির কবিতা 'মমতাজ' গেছে, রেখে গেছে তার স্নেহ,
যৌবন দিয়া রাঙ্গায়ে গিয়াছে ধরণীর এই গেহ।
শত্রুতা আজ হয়েছে শান্ত করুণার কণা মাখি,
স্নেহের কোলেতে ঘুমায়ে পড়েছে হিংসা অরুণ আঁখি।
পূর্ণিমা রাতে জ্যোৎস্না-আলোতে ভেসে ওঠে তার ছবি,
আঁধার রজনী ভেদিয়া সে গেছে আর ফিরিবে না কবি।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

ইন্দিরা ২৫ নম্বর পেয়েছিল। (১৬ হ'লেও ঠিক হয়।)

উত্তরদাতাদের নাম: দীপককুমার ধর (সোণালী—পূর্ণিয়া); রুবি, ছবি, পিনাকী, সোমেশ্বর, মীনু মিত্র (মেদিনীপুর); জয়া, বিজয়া ও ছন্দা রায় (আইজটনগর); লব, কুশ, বাপ্পা, নেবু, পম্পা, রত্না (ভবানীপুর); শিবশঙ্কর মণ্ডল (গদাবেড়ো); বেণু ঘোষ (কাটিহার); কর্ম্মমন্দির, মণিমেলা (মধুতটী); অনিলকুমার দাস ও সুনীলকুমার চৌধুরী (আরাপুর—মালদহ); চিত্রলেখা গ্রন্থাগারের সভ্যবৃন্দ (কলিকাতা); হেনা, মাণিক, ফণীবাবু ও মালবিকা দত্ত (করিমগঞ্জ); ঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান); বিভাসবিহারী বসু (পাটনা); অপু, দীপু, বাচ্চু, বেবী (জামসেদপুর); আলো ও অনীশ চক্রবর্ত্তী (বহরমপুর); হেমেন, নথু, শান্তি, গৌরী, পুষ্প, তপু, তুতুল ও বেবী (বালিগঞ্জ); আরতি বসু (কলিকাতা-২৯);

দিলীপকুমার সমাজদার (কলিকাতা-৪); নমিতা দাম (গৌহাটী); সঞ্জীবকুমার গাঙ্গুলী (দমদম); সরিৎকুমার দত্ত (গুড়াপ); অসীমা পাল, অপূর্ব্ব, নন্দন, গৌরী, মেজদি, দিদিমণি (করিমগঞ্জ); বিশ্বক ভট্টাচার্য্য (বিষ্ণুপুর); দীপি, তিপি, নিপি, ছোট্টি, শঙ্কা, মণি, কুনু, বিনু, রিণু, টোকোন (কালাপাহাড়—গৌহাটী); টাটা, টুটু, টিটি, টিটো, টোটা, টৈটু (জামসেদপুর); অমলকুমার মিত্র (গৌহাটী); বীথি দাসগুপ্তা (বালিগঞ্জ); বাণী, সুজিত, সুমিত্রা, শান্তনু ও মঞ্জুলিকা দাশগুপ্তা (কলিকাতা-২৬); নূরজাহান বেগম (বহরমপুর); শৈলেন্দ্র প্রামাণিক (লক্ষ্ণৌ); আশা ও মণীশ (নূতন দিল্লী); সেবা মুখোপাধ্যায় (বনারস)।

নূতন ধাঁধা

শিব ঠাকুরের দেশের মত কেষ্ট ঠাকুরের দেশেও 'আইন-কানুন সর্ব্বনেশে।' সে দেশে 'তিন' লিখতে মানা। ছেলেরা এক-দুই লিখবার সময় ৩ এলেই সেটা বাদ দিয়ে টপকে পরেরটায় চলে যায়—ফলে আমাদের এক-দুইএর সঙ্গে তাদের এক-দুই মোটেই মেলে না।

সে দেশের কোনও ছেলেকে ৩৩ লিখতে বললে সে কত লিখবে?

উপন্যাস
(বড়দের জন্য)

মনের মতো মেয়ে ২৲
মন নিয়ে খেলা ২৲
মহীয়সী নারী ২৲
প্রিয়ার রূপ ২৲
জীবন-সঙ্গিনী ২৲
অমর প্রেম ২৲
মনের মিল ২৲
বর কনে ২৲
ছিনিমিনি ১।।০
নেপথ্য ১।।০
মুক্তিস্নান ১।।০
স্বয়ম্বরা ১।।০
মিলন শঙ্খ ১।।০
মিছিল ১।।০
বৌদিদি ২৲
বন্ধুর বউ ১।।০
বড়ঘরের মেয়ে ১।।০
সোনার বাংলা ১।।০
সুখের বাসর ২৲
মধুমিলন ১।।০
মিলন-প্রতীক্ষা ১।।০
গরীবের মেয়ে ১।।০

ছোটদের বঙ্কিম গ্রন্থাবলী

যুগলাঙ্গুরীয়	১৲	আনন্দমঠ	১৲
দেবী চৌধুরাণী	১৲	কপালকুণ্ডলা	১৲
বিষবৃক্ষ	১৲	চন্দ্রশেখর	১৲

প্রতি সংখ্যা ।৵ বার্ষিক ৪৲ টাকা

দে ব সা হি ত্য কু টী র

দুর্গেশনন্দিনী	১৲	মৃণালিনী	১৲
কৃষ্ণকান্তের উইল	১৲	রজনী	১৲
সীতারাম	১৲	রাজসিংহ	১৲

রাধারাণী ও ইন্দিরা ১৲

সম্পাদক : শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

রোমাঞ্চকর ও ভয়াবহ ডিটেকটিভ কাহিনী

অন্ধকারের বন্ধু ৸০
মৃত্যুদূত ১৲
হত্যার প্রতিশোধ ১৲
লাল দলিল ১৲
ব্যথার দান ১৲
রাত্রির যাত্রী ১৲
গুপ্ত ঘাতক ১৲
হারানো বই ৸০
ভূতের মত অদ্ভুত ৸০
স্বর্গের সিঁড়ি ৸০
সোনার খনি ১৲
ব্লাড হাউণ্ড ১৲
মুখোশের অন্তরালে ১৲
মুখ আর মুখোশ ৸০
নীল আলো ৸০
ঘোর প্যাঁচ ৸০
শেষ বলি ১৲
দেশের ডাক ১৲
রাতের আতঙ্ক ৸০
স্বপ্ন হলো সত্যি ১৲
কালের কবলে ১৲
জীবন্ত সমাধি ৸০

দেব সাহিত্য কুটীর ❀ ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা ৯

রামধনু

নাম
বয়স
ঠিকানা

রা। পু ২।৫৮

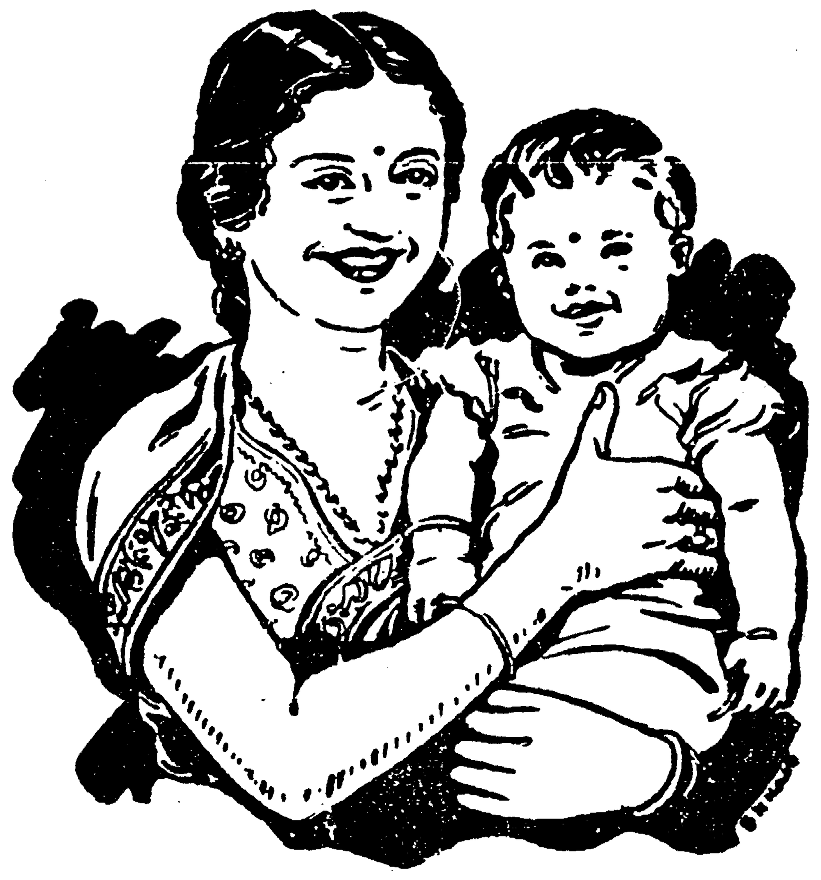

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানেরজয়যাত্রা	১৲
বিজ্ঞান-বুড়ো	১৲
আকাশের গল্প	১।০
আবিষ্কারের গল্প	৸০
ধূমকেতু	৸০
অয়েল পেন্টিং (নাটক)	।০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১৲

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি	১।০
পদ্মরাগ	১॥০
সোনার হরিণ	১॥০
নূতন পুরাণ	৸৵০
হাস্য ও রহস্য	৸৵০
চায়ের ধোঁয়া	৸০
দমাদম্ দামোদর (নাটক)	।৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি রসা রোড, কলিকাতা ২৫

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

স্বকমাব্বিতায়, স্বাদে ও গুনে অনুপম

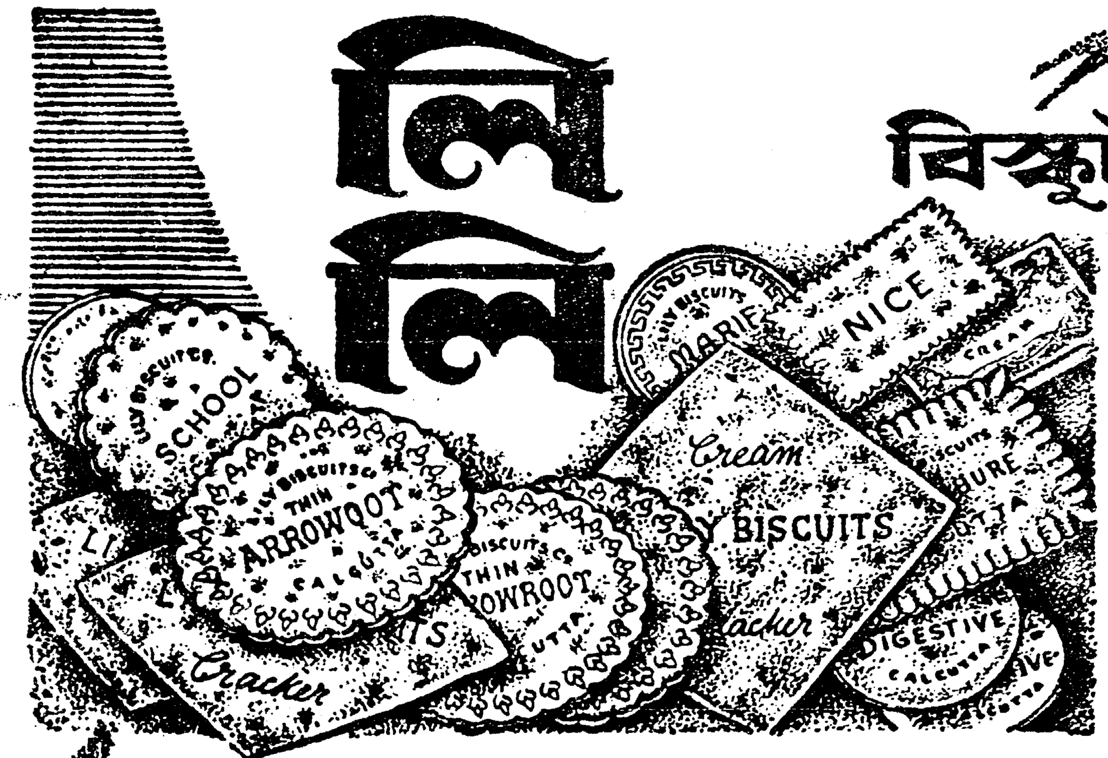

কয়েকটী মনোরম

ও

স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন-ক্রীম,
ক্যাণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ

৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

রামধনু

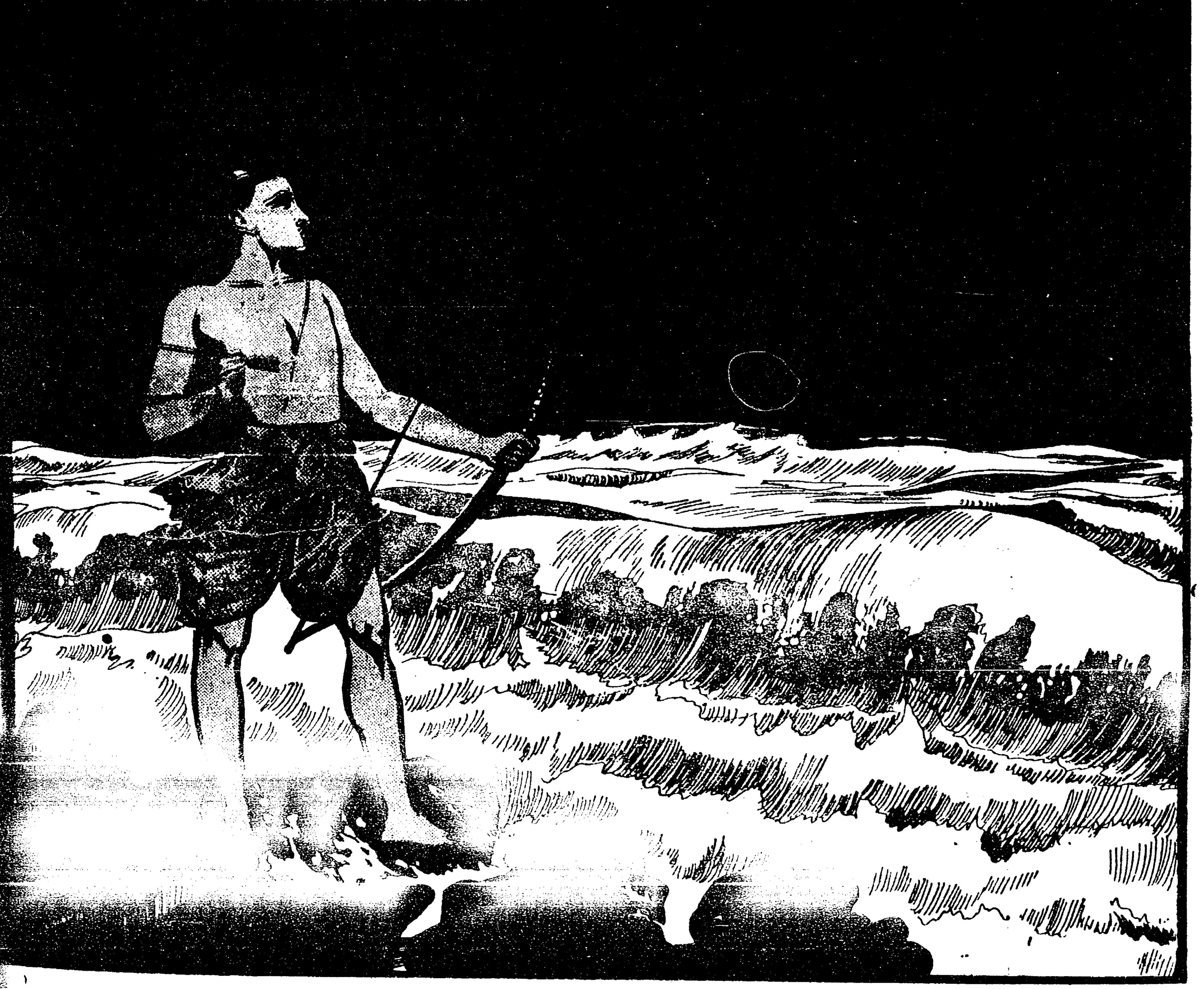

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস-সি.

ষিক ৪৲

মাসিক ২।০

াত সংখ্যা ।৶০

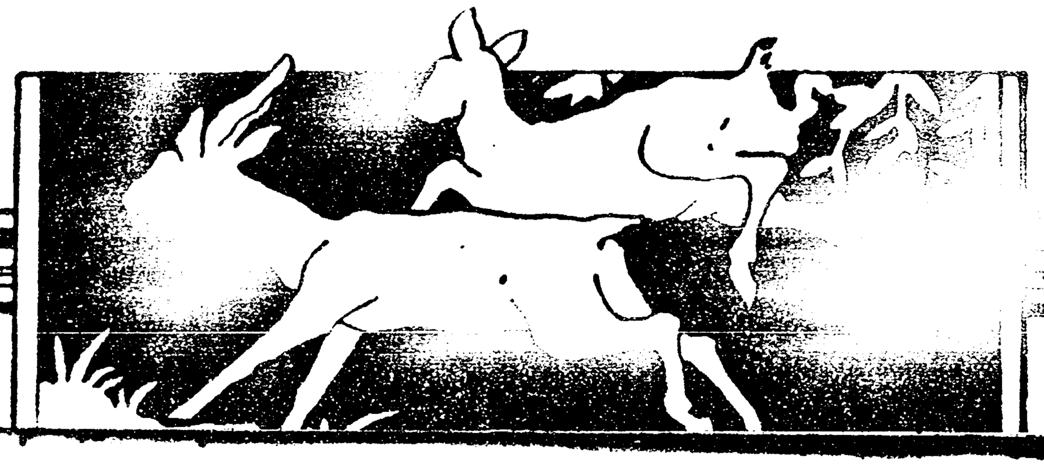

কার্য্যালয় :

১৬, টাউনসেণ্ড রোড,

কলিকাতা ২৫

স্ুবোধ বস্থ-র

প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'পদ্মা প্রমত্তা নদী'র
কিশোর সংস্করণ

পদ্মা নদীর ডাক

পদ্মা নদী ও বীর বালক রাজার
দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার

পুরু অ্যান্টিকে ছাপা, সুন্দর বাঁধাই

মূল্য — ১৸৵০

গ্রন্থাগার : পি৫৮ ল্যান্সডাউন রোড,
কলিকাতা ২৯

বড়দের প্রীতি-উপহারের
একখানি সেরা বই

কথাশিল্প

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবোধ সান্যাল, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ বসু, সরোজ রায় চৌধুরী, গজেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী ও বাণী রায় প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকদের লেখা গল্প-সংগ্রহ। প্রত্যেক লেখকের রেখাচিত্র ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্বলিত। সুন্দর বাঁধাই, বিরাট বই।

মূল্য ৩৷০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড
১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

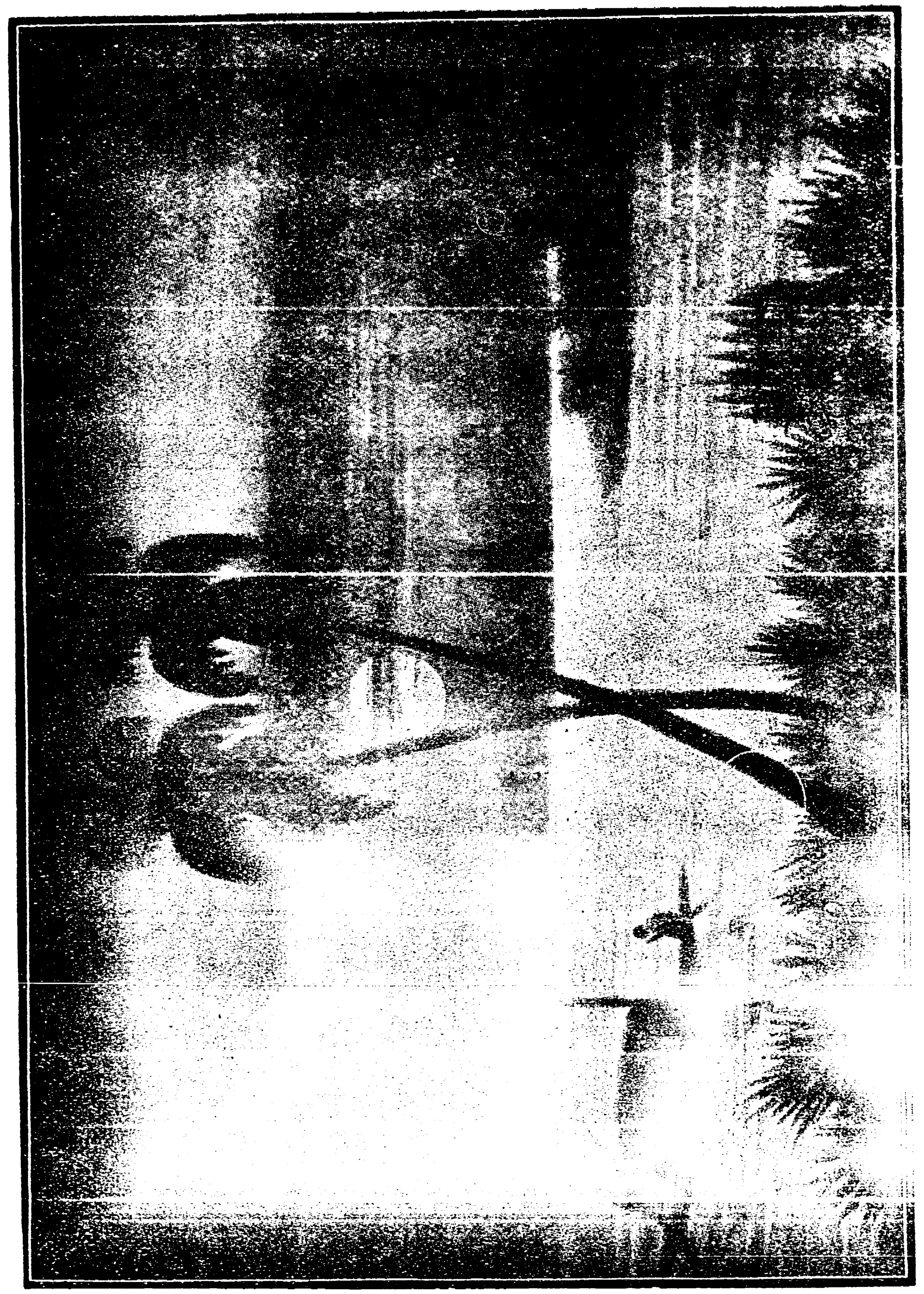

শ্রাবণের ভরা নদী

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৪শ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৫৮ { ৪র্থ সংখ্যা

পূজার ফুল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তাঁহার পূজার ফুল জেনো তুমি—
তাঁহার পূজার ফুল,
ক্ষুদ্র কিন্তু, কাহার ভাগ্য
বল তব সমতুল?
এ ভুবন আলো করা—
তুমি যাঁর হাতে গড়া,
ও সুরভি তাঁরি অঙ্গ-সুরভি
বুঝিতে ক'রো না ভুল।

তোমার ও তনু বর্ণ গন্ধ
তাঁহাকে যে নিবেদিত,
তাঁহার পূজার সামগ্রী দিয়ে
তাঁহাকেই কর প্রীত।
তুমি যে অকূল হ'তে
এসেছ অমৃত স্রোতে,
তুমি অনন্ত মূর্ত্ত মন্ত্র
হয়ো নাক' বিস্মৃত।

তুমি জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য,
তুমি ধ্রুব প্রার্থনা,
জগতের যত ভক্তের সাথে
তোমারি যে চেনাশোনা।
ধরাকে পুণ্য ভূমি
করিয়া রেখেছ তুমি,
স্বর্গের কথা শুনাতে মর্ত্যে
-কর তুমি আনাগোনা।

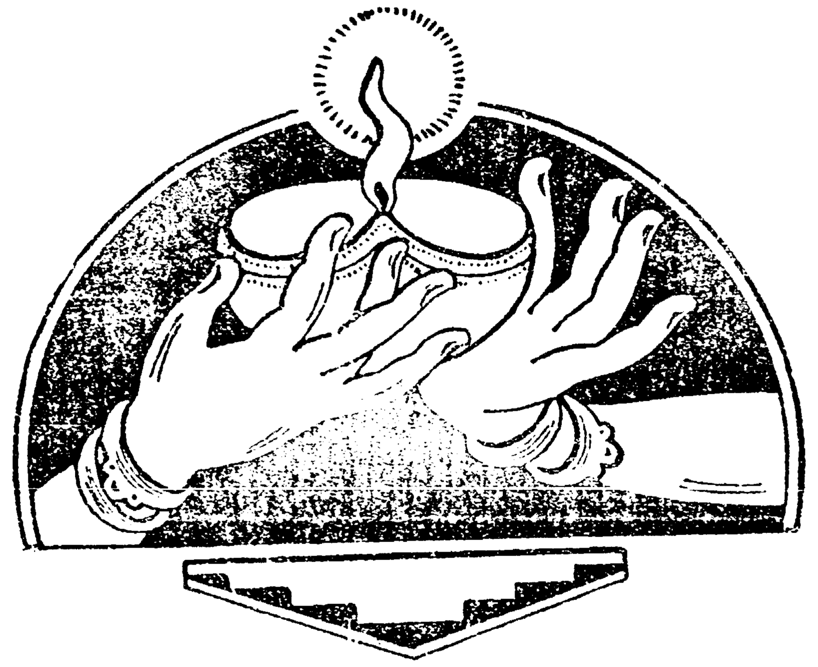

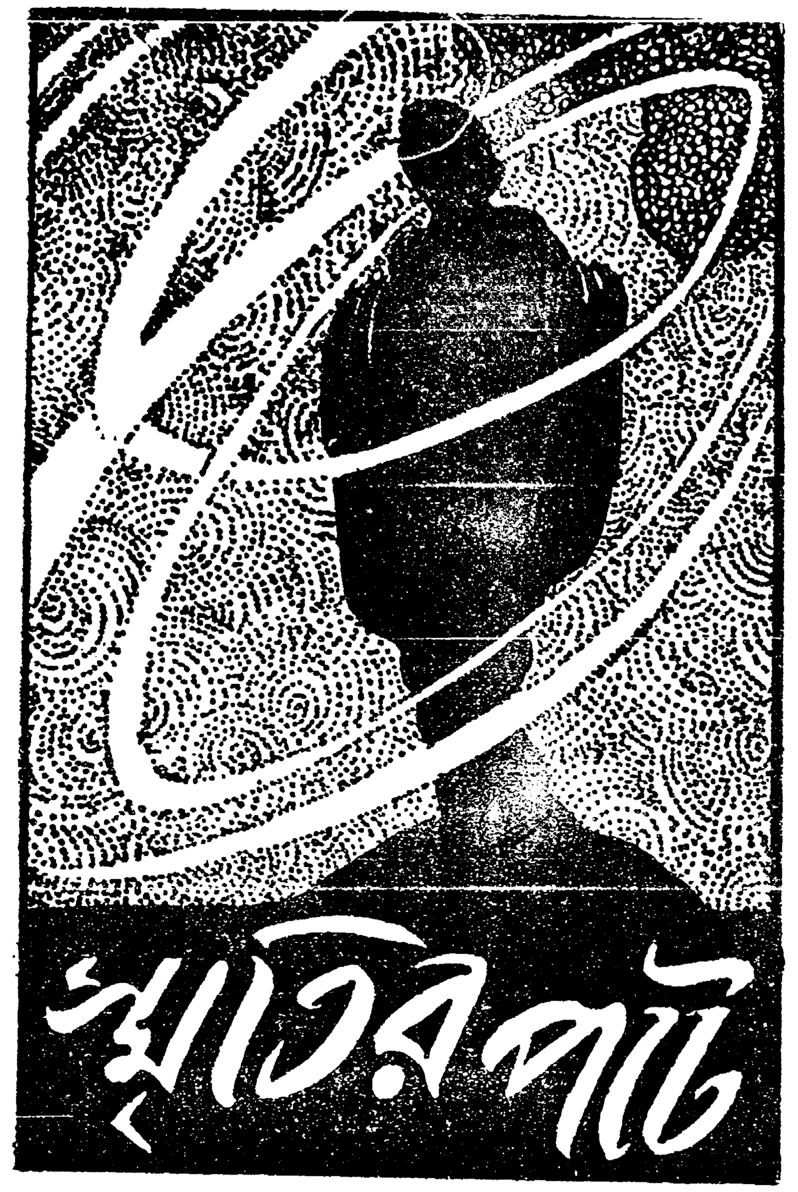

সেকালকার বিক্রমপুর

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সেকালকার—অর্থাৎ ৫০।৬০ বছর আগেকার বিক্রমপুরের কিছু কিছু গল্প তোমাদের ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। আজ আরও কিছু বলি, শোন :

আমাদের পাশের একটি ছোট গ্রামের নাম ছিল কান্দার বাড়ী। কান্দার বাড়ী অর্থে বোধ হয় কাঁধের অর্থাৎ সম্মুখের বাড়ী বা কোণের বাড়ী বুঝাইত। ঐ গ্রামের মধ্য দিয়া একটি খাল বহিয়া গিয়াছিল। তাহার দুই পাড়ে ছিল কুমোরদের বাড়ী। এই কুম্ভকার-বাড়ী ছিল আমার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। আমাদের সহপাঠী এক কুমোর বালক ছিল, তাহার নাম জলধর। জলধর আমাকে তাহাদের বাড়ী লইয়া গিয়াছে বহু বার। সেখানে দেখিতাম, কুমোরদের পুরুষ ও নারী, বালক-বালিকা সমান ভাবে পরিশ্রম করিতেছে। মাটির জিনিষের তখন কত আদর ছিল। হাঁড়ী, কলসী, সরা, গ্লাস, ঘটি, বাটি, প্রদীপের গাছা, প্রদীপ, কলসী, জালা, শ্রীকলসী—কত জিনিষই না তাহারা তৈরী করিত।

আমার কাছে ভাল লাগিত মাটির পুতুল। কত পুতুলই না তাহারা তৈরী করিত।—মাটির নৌকা, আহ্লাদী পুতুল, ছোট ছোট অদ্ভুত ধরণের পুতুল। মহেঞ্জো-দারোতে যে সব পুতুল পাওয়া গিয়াছে সেইরূপ অদ্ভুতাকৃতি পুতুল কুমোরেরা গড়িত অসংখ্য। মাটির ছই দেওয়া নৌকা, পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে বিবিধ দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া পুতুল ও প্রতিমা গড়িতে উৎসাহিত হইতাম। লক্ষ্মীপূজার সময়ে বিক্রমপুরের কুমোরেরা সুন্দর সুন্দর সরা (কতকটা ঢালের মত) গড়িয়া তাহার উপর তূলির আঁচড়ে যে সব মূর্ত্তি আঁকিত তাহার তুলনা মিলে না। বাজারে সে সব হাজারে হাজারে বিক্রয় হইত। সে সময়ে মুসলমানেরাও অনেকে লক্ষ্মীপূজার

জন্য সরা কিনিয়া নিত। লক্ষ্মীপূজার প্রতি তাহাদেরও শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। আমি এইরূপ মুসলমান বন্ধুর বাড়ী তাঁহার স্ত্রীর হাতের তৈরী মোয়া, নারিকেলের নাড়ু প্রভৃতি পরম পরিতোষের সহিত খাইয়াছি। লক্ষ্মীর সরা যেমন প্রচুর বিক্রয় হইত তেমনি কার্ত্তিক পূজার সময় ময়ূরের উপর আরোহিত হাজার হাজার ছোট বড় কার্ত্তিক তৈরী হইত। কত নামই না তাহাদের ছিল! —রাজ কার্ত্তিক, কোকাই কার্ত্তিক, পিপি কার্ত্তিক প্রভৃতি। মোট কথা আমি কুমোরদের শ্রীদুর্গা প্রতিমা হইতে কালী, জগদ্ধাত্রী, গণেশ, জ্বরাসুর, শীতলা, মনসা, গঙ্গা, এমন কি ওলাচণ্ডী, চণ্ডী প্রভৃতি প্রত্যেক দেব-দেবীর বিচিত্র গড়নের ধ্যানানুমোদিত মূর্ত্তি তৈরী করিতে দেখিয়াছি।

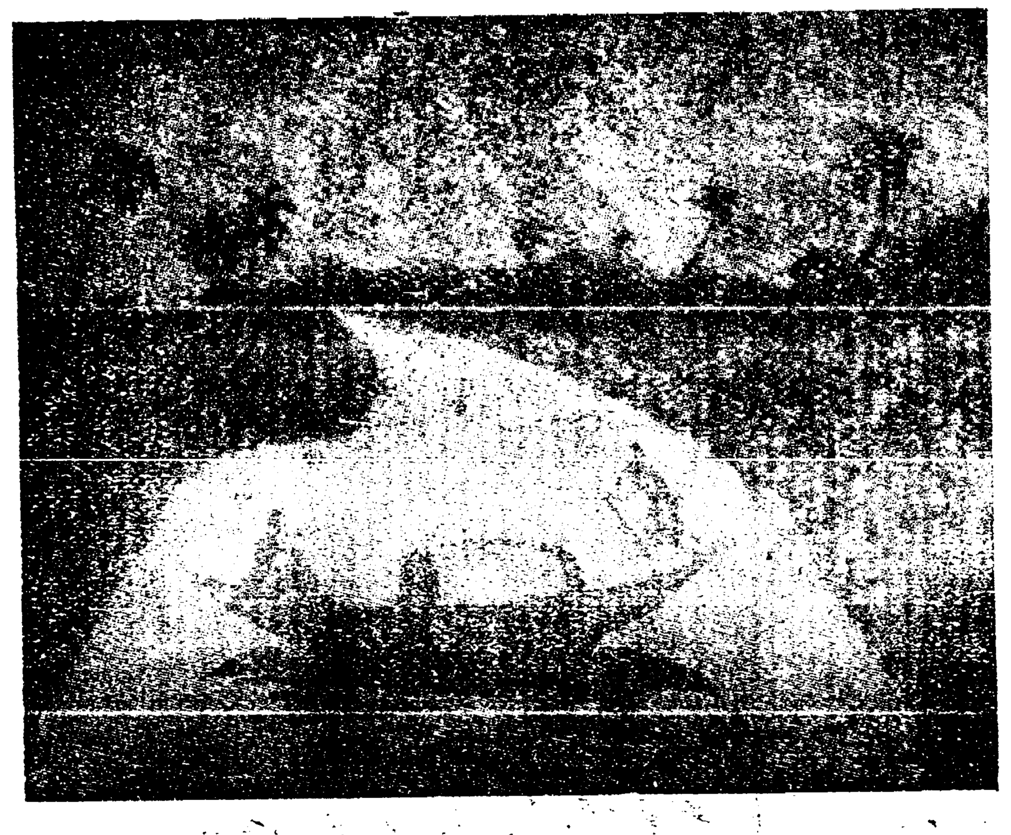
গ্রামের খাল

তাহাদের বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকারা দিবারাত্র মাটী ছানিয়া, জল ঘাঁটিয়া নানারূপ মূর্ত্তি, গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় সমুদয় দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করিত। তাহারা কেহই দরিদ্র ছিল না। হিন্দু মুসলমান সর্ব্বশ্রেণীর ধনী, নির্ধন, ছোট, বড় সকলেই কুমোরদের কাছ হইতে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ কিনিয়া নিত। এ জন্য তাহাদের অভাব-অভিযোগ ছিল না। কিন্তু যে দিন হইতে

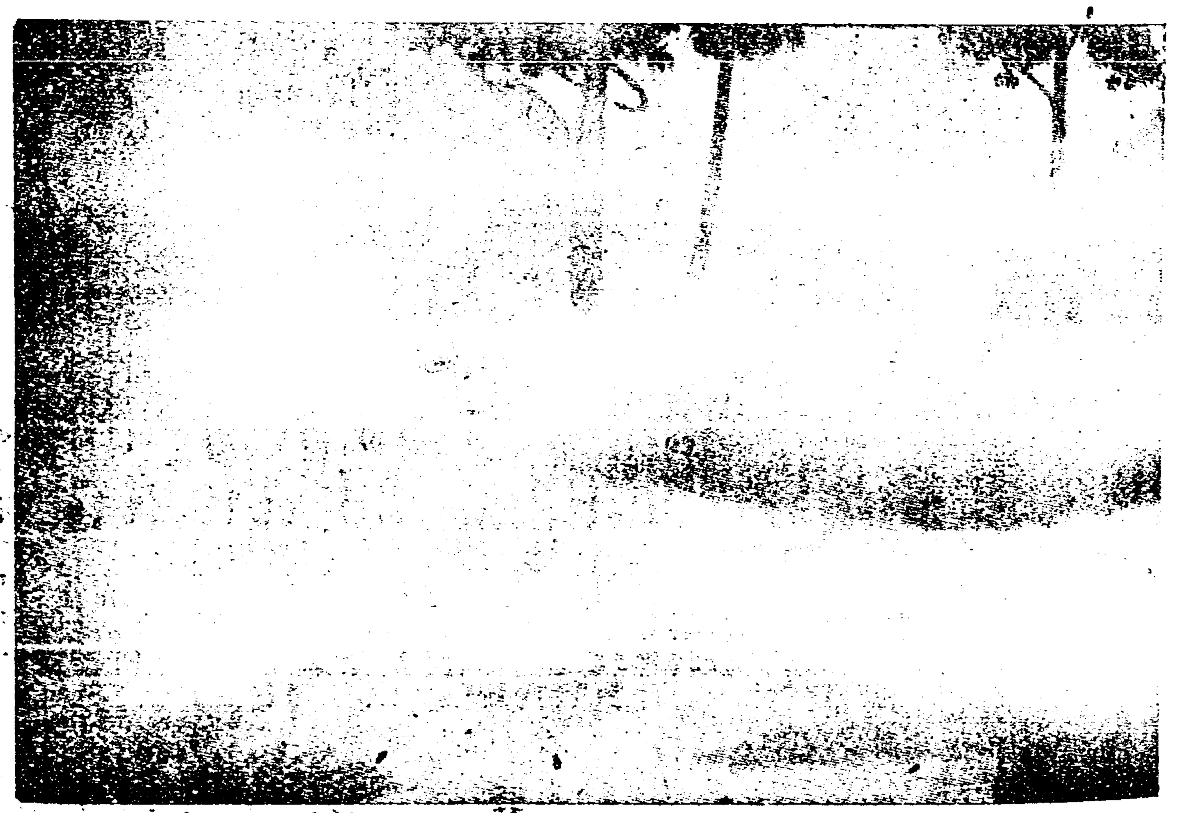
বিক্রমপুরের পল্লীদৃশ্য

কলাই করা বাসনকোসন এবং চীনা মাটির দ্রব্যাদির প্রচুর পরিমাণে প্রচলন সুরু হইল সে দিন হইতে কুমোরদের ব্যবসায়েও মন্দা পড়িল।

আর মনে পড়ে চৈতন ও মহিম পালের কথা। তাঁহারা আমাকে খুবই স্নেহ করিতেন। দিদিমার শিব গড়িবার জন্য কুমোর-বাড়ী হইতে 'শিব মাটি' আনিতাম। কার্ত্তিক পূজার সময় বাড়ী বাড়ী গৃহস্থের পুত্র-সংখ্যানুসারে কার্ত্তিক আনিয়া পূজা করা হইত। চৈতন পাল ও মহিম পাল দুই জনেই ছিলেন আসাধারণ শিল্পী। তাঁহারা যে কোন মানুষকে দেখিয়া তাহার অর্দ্ধাবয়ব মূর্ত্তি এক ঘণ্টার মধ্যে মাটি দিয়া তৈরী করিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহাদের পুত্র ও পৌত্রদের সংবাদ জ্ঞাত নহি।

বিক্রমপুরের এই কুমোরেরা অর্থাৎ রুদ্রপাল সম্প্রদায় মূর্ত্তি গড়িতে যেমন সুদক্ষ ছিলেন, তেমনি ইঁহাদের ব্যবহার, আচার-অনুষ্ঠান ছিল অতি চমৎকার। এমন নির্বিবাদী, শান্ত, ভদ্র ও বিনয়ী শিল্পী সম্প্রদায় সেকালে যেমন দেখিয়াছি তেমনটি আর চোখে পড়ে না। আজ সেই সব বন্ধুগণ কোথায়! পৃথিবীর বুকে লক্ষ কোটি বৎসর হইতে যে মানুষের যাত্রা চলিয়াছে, তাহাদের স্মৃতি কোথায়? তাহাদের গড়া বাড়ীঘর, লোকজন, আত্মীয়স্বজন সহ তাহারা যে একটি জগৎ রচনা করিয়াছিল তাহার স্মৃতি কি আজ পৃথিবী ধরিয়া রাখিয়াছে? তেমনি সে কালের অন্ধকার যবনিকার আড়ালে যাহা অবলুপ্ত তাহার পুনরুজ্জীবন লাভের কথা স্মরণও যে অর্থহীন কল্পনা মাত্র! তাই পূর্ব্বপুরুষের জন্মভিটার মাটিতে —পূর্ব্ব পাকিস্তানে গিয়া যখন দাঁড়াই তখন মনে হয়, এই কি সেই বাস্তুভিটা! কত প্রিয়জনের সুখ, দুঃখ, ভালবাসা ও শোকের জ্বালা এখানে জ্বলিয়াছে ও নিভিয়াছে। আজ তাহারা কোথায়? যাহাদের ক্রীড়াকৌতুকে, হাসি ও আনন্দে নিত্য মুখরিত হইত এই বাড়ীর গৃহের প্রতিটি কক্ষ—প্রতিটি প্রাঙ্গণ, আজ তাহারা কোথায়? সেই নদী, সেই খাল-বিল, সেই গাছপালা তেমনি বাঁচিয়া আছে, তালগাছটি তেমনি মাথা উঁচু করিয়া আছে—শুধু নাই তাহারা, যাহারা ছিল পল্লীর জীবন। ইহাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ লীলা!

কাঁদুনে বাড়ি

শ্রীশামুক

আমাদের বাড়ি থেকে ট্রাম-রাস্তায় পৌঁছাতে ঠিক বারো মিনিট লাগে। কিন্তু ডান দিকের মধু বোসের লেন পেরিয়ে নোংরা চোরা গলির ভেতর দিয়ে ফুড়ুৎ করে তিন কি চার মিনিটে পৌঁছানো যায়। হাত-ঘড়ি চোখের সামনে রেখে ঐ পথটুকু পার হয়েছি কত বার, সুতরাং বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

আজ দু'টি মাস ও-মুখো হই নি, এক রকম প্রাণভয়েই বলতে পারো। যত তাড়া থাক, জল-ঝড়-বাজ পড়ুক মাথায়, এমন কি বাঘে তাড়া করলেও, উঁহু, ও-পথে পা বাড়াই নি। কিন্তু সেদিন যে কি হ'ল মতিভ্রম—এই গত বৃহস্পতিবার, কোন রকম ব্যস্ততা ছিল না, সময় মত বাড়ি ফেরবার জরুরী তাড়া ছিল না, তবু হঠাৎ মাথায় খেয়াল চাপলো কি বিদ্‌ঘুটে—ঐ পথে আসতে গেলাম আর পুলিসে ধরলো খপ্‌ করে।

গ্রহের ফের বলে কোন কিছু মানি না, বৃহস্পতির বারবেলাকেও আমোল দিই নি এতদিন, তবে এই ঘটনার পরে একটা জিনিস স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি যে মানুষ বহু সময়ে বিনা কারণে এবং সম্পূর্ণ বিনা প্রয়োজনে বিপদের মুখে এগিয়ে যায় নিজেই। তা না হ'লে এতদিন পরে এই হালফিল ঐ পথে আবার পা দেবার দরকার কি ছিল বল দেখি?

পুলিস জমপেশ জাপটে ধরে বলে, থানায় চল, সন্দেহজনক ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ। দেখ মজা!

ঐ পথে যাওয়া-আসা করতে আমার নিজের মনে দারুণ সন্দেহ আসতে পারে, এবং তার জন্য নির্দিষ্ট ভয়ানক কারণও আছে। কিন্তু আমি পথ দিয়ে চলেছি নির্বিবাদী নিরীহ পথিক, এতে অন্যের সন্দেহের সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু ওদের ঐ ব্যাপার। যখন ভয়ানক দরকার, প্রাণ নিয়ে টানাটানি, কোন পুলিসের ইসে পর্যন্ত ত্রিসীমানায় খুঁজে পাবে না। আর যখন কোন রকম প্রয়োজন নেই, মহাপ্রভুদের ছায়াটুকুও মনে আসে নি, পিছন থেকে নিঃসাড়ে এসে তোমার দেহ-মন একেবারে অসাড় করে দেবে। বলবে, তুমি এই করেছ, তাই করেছ—সে সব সাত সতেরো সাতাশ ব্যাপার! বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা আর পুলিসে ধরলে আটান্ন। ভাই, বন্ধু, বাপ-মা বললেও ছাড়বে না, সোজা থানায় নিয়ে যাবে।

থানায় পৌঁছে জামা-কাপড়, জুতোর ভেতর প্রভৃতি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে—যদি কোন মারাত্মক জিনিষ লুকানো থাকে। ট্রামের একটা পুরোনো ডেলা পাকানো টিকিট মাটিতে ফেলে দিতে যেন য়্যাটম্ বম্ পড়লো। লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে তুলে নিয়ে আতসী কাচ দিয়ে উলটে পালটে দেখে তবে হ'ল আশ্বস্ত। একজন তো আগাগোড়া আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে ধরে ছিল, যদি ঐটি খপ্‌ করে গিলে ফেলি। এমন রাগ হচ্ছিল! শরীরটি কিঞ্চিৎ স্থূল বটে কিন্তু তা বলে কি আমার পেটটা ছেঁড়া কাগজ ফেলার টুকরি যে সামনে যা পাবো

ভেতরে ছুঁড়ে দেবো? যাই হোক, অনুসন্ধানের উৎসাহে যে গায়ের চামড়াখানি খুলে নেয় নি এই পরম সৌভাগ্য। তল্লাস করে যখন আপত্তিকর কিছু পেলে না তখন প্রশ্ন করে,—সত্যি বল, নোংরা গলি দিয়ে বেরিয়ে চারিদিকে উঁকিঝুঁকি মারতে মারতে অমন চোরের মতন পা টিপে টিপে যাচ্ছিলে কেন?

—মোড়ের ওপর আঠারো নম্বর বাড়ির কোন বাসিন্দা না দেখতে পায় সেই জন্যে।

—তার কারণ?

—ঐটি কাঁদুনে বাড়ি। বিনা কারণে কেঁদে কেঁদে ওরা মানুষকে হাবুডুবু খাইয়ে আধ-মরা করে দেয়—মাত্র ভুক্তভোগীই তা হাড়ে হাড়ে জানে।

ধমক দিয়ে বলে,—খবরদার, আমাদের সংগে তামাসা নয়। আগাগোড়া সমস্ত গুছিয়ে বল, নইলে ভীষণ বিপদ্ হবে।

নির্দোষী মানুষকে শকুনির মত এতক্ষণ টানা-ছেঁড়া করার পরও আর নতুন বিপদ্ কি হ'তে পারে বোধগম্য হ'ল না। তবু গোড়া থেকেই সব বলে গেলাম যেমনটি ঘটেছিল।

ঐ পথ দিয়ে তাড়াতাড়ি ট্রাম-রাস্তায় পৌঁছবার জন্যে ছোটবেলা থেকে আসা-যাওয়া করছি। আঠারো নম্বরের পুরোনো ইট-বার-করা বাড়িতে কত ভাড়াটে আসে ও উঠে যায়—নজর পড়বার মত ঘটে নি কিছু এতদিন। দু' মাস আগে একদিন মাঠে খেলা দেখতে চলেছি, বাড়িটির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। চৌকাঠে বসে একটি ছোট ছেলে কাঁদছে একলা। ছোটদের মত হাত-পা ছুঁড়ে রাগের বা দুঃখের কান্না সে নয়, বড়দের মত গড় গড় করে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, থরথর করে ঠোঁট কাঁপছে আর হাপুস কাঁদছে। বড্ড মায়া হ'ল। বললাম,—ও খোকন ভাই, লক্ষ্মী সোনা, কাঁদছো কেন—চাই কি?

বাইরের ঘর থেকে কচ্ছপের মত মুণ্ডু বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। বলেন,—আমার নাম ভবদেব দত্ত, ও আমার ছেলে। কী করি বলুন তো? মিনিটে মিনিটে খাওয়া চাই আর না দিলে ঐ রকম করে কাঁদে। চোখে দেখে কষ্ট হয় বুঝি, কিন্তু—

ভবদেব দত্তর গলা বুজে গেল, বড় বড় গোল চোখ দু'টি জলে ভাসতে লাগলো—যেন তালশাঁস।

—আসুন না, একটু ঘরে এসে বসুন না। আমায় কোন সুমতলব দিন এ ছেলেকে কি করে মানুষ করি। বয়স তো আমার মাত্র বত্রিশ—সব রকম বুদ্ধি মাথায় আসে না সব সময়ে। আসুন আসুন, দয়া করে।

বয়স মাত্র বত্রিশ শুনে মুখের দিকে তাকালাম। না, তামাসা করছেন না। আমি যে ওঁর বয়সের অনেক ছোট সে খেয়ালও নেই। ভদ্রলোক ডাকছেন সুতরাং গেলাম ভেতরে। দু'মিনিট বসেই পালাতে হবে, নইলে মাঠে খেলা আরম্ভ হয়ে যাবে।

আঁতুড় থেকে আজ পর্যন্ত উনি যত রকম রোগে কষ্ট পেয়েছেন—ইস্কুলের ইতিহাসের মত নীরস ভাষায় ও কর্কশ কণ্ঠে সে সমস্ত সন তারিখ দিন ঘণ্টা দিয়ে বর্ণনা করে বলতে সুরু করেন। আর বিবরণীর প্রকৃতি অনুযায়ী নানা ভংগীতে মুখ বিকৃত করে কাঁদতে থাকেন। এ কি শেষে

পাগলের পাল্লায় পড়লাম! ওঠবার জন্যে উসখুস করি আর হাত চেপে ধরেন, হাঁটু দু'টি জড়িয়ে ধরেন, বলেন,—একটু বসুন দয়া করে। একজন লোক নেই যে মনের কথা বলি, কেউ আসে না—আসে তো বসতে চায় না।

বলে, একে রামে রক্ষে নেই সুগ্রীব সহায়। তক্তপোষের ওপর থেকে দরজার দূরত্ব মাপছি মনে মনে, যে, এক ঝটকায় ছিটকে পালাবো এবারে—আর আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে গৃহিণী ঘরে এসে ঢুকলেন। ভাঙা গলায় সুর দিয়ে হ'ল সুরু,—কার সংগে কথা কইছো গা?—ও, আপনি এয়েছেন—আজ কার মুখ দেখে উঠেছি গো!—এ পোড়া পৃথিবীতে একটাও দরদী মনিষ্যী নেই যে বোঝে—ভগবান, আমার কি কষ্ট—

বাস্, আর কি! পুরুষের যখন এ অবস্থা তখন মেয়েমানুষের দুঃখের তল পায় কে? দু'জনে এক সংগে একতাড়া কথা বলে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

সামনে অফুরন্ত চোখের জল আর গরমে গায়ে মাথায় দুর্দান্ত ঘাম—মনে হ'ল যেন প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় হাবুডুবু খাচ্ছি।

লাঠি ঠক্ ঠক্ করতে করতে ভবদেব বাবুর বুড়ো বাবা এসে হাজির।—কে? কে এসেছে রে?—দিন কাল সব হ'ল কি!—মানুষে মানুষের কথা শুনতে চায় না, দুঃখ বুঝতে চায় না! আমি যে এত বুড়ো হয়েছি, হাড়ে হাড়ে গাঁটে গাঁটে অসহ্য!—হু হু করে কেঁদে ওঠেন। একটিও দাঁত ছিল না সুতরাং বাধা না পেয়ে মুখ থেকেও জল গড়াতে থাকে।

প্রায় জ্ঞান হারিয়ে বুদ্ধুর মত নিশ্চল বসেছিলাম। হঠাৎ চোখে আঙুলের খোঁচা খেয়ে দেখি পিসিও এসেছেন। অন্ধকার হয়ে এসেছিল, তাই পিসির হাত আদর করে আমার চিবুক ধরবার আগে চোখের ওপর এক চাবুক কষিয়ে দিল।

চিবুকটি পাঁচ আঙুলে চটকে ধরে রামায়ণী সুরে বলেন,—আহা, বাছারে, তোর ভাল হবে। এমন ছোটলোকের পাড়ায় এসেছি যে পড়শীরা কেউ দু'বার আসে না—ডাকাডাকি করলেও না। আমি যে সেদিন অম্বুবাচীর নিরম্বু উপোস করে একাজ্বরী হয়ে—

গলার ঘড়ঘড়ে আওয়াজে বাকি কথাগুলি বোঝা গেল না।

দেখি খুদে বাচ্চাটিও গুটি গুটি এসে হাজির। বেচারীর অবস্থা মর্মান্তিক। অনেকক্ষণ খাবার পায় নি কিনা—কেঁদে যেন ভেপসে উঠলো। অভিমন্যুকে সপ্তরথী বেড়েছিল, আমাকে সাড়ে চারজনই খাবি খাইয়ে দিলে! নাভিশ্বাস যে কেন সুরু হয় নি তাই ভাবি। থুতনি ছেড়ে হাত যেই চাবী-বাঁধা আঁচল ধরেছে নাক মোছবার জন্যে, পিসিকে পাশ কাটিয়ে এক লাফ—লংকা ডিঙাবার মত। পাঞ্জাবীর ঝুলটি ঠিক তালে ভবদেব বাবু ধরেছিলেন, সেটা তাঁর মুঠোতেই থেকে গেল।

মাঠে খেলা দেখা চুলোয় গেল। রাত্রের অন্ধকারে কাছের পার্কে গিয়ে পাক দিয়ে দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করি। ইচ্ছা হচ্ছিল ফিরে গিয়ে ঐ সব ক'টাকে খুন করে সাবাড় করে দি। পুলিসের সামনে 'খু' উচ্চারণ করেই জিভ কেটে চট্ থেমে গেলাম—একেবারে ভ্যাকম ব্রেক্।

বড় কর্তা ইজি-চেয়ারে চোখ বুজিয়ে শুয়ে একটা দেশলায়ের কাঠি কানের ভেতর ঘোরাতে

ঘোরাতে শুনছিলেন, এবারে চোখ চেয়ে আমার দিকে আঙুল তাগ করে বলেন,—মাথার মাপটা নিয়ে ছেড়ে দাও। মানুষটা আধপাগলা, বয়সকালে পাগলা-গারদে গিয়ে কাটাতে হবে।

ছোট কর্তা বিষম নারাজ। বলেন,—উঁহু, শঠ—আসল ধড়িবাজ, সব মিথ্যে বানিয়ে বলছে। আমি একবার ওর সঙ্গে গিয়ে আঠারো নম্বর বাড়ীটি দেখে আসি।

পুরো সাজপোষাক পরা, কোমরে পিস্তল আঁটা ছোট কর্তা বন্ধ দরজায় কড়া নাড়লেন কড়াকড়—যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। দেখলাম আমার চেনা সব ক'টি মুখ ওপরের জানলা দিয়ে এক একবার উঁকি মেরে নেমে এল। দরজা খুলতেই বিনা অভ্যর্থনায় ছোট কর্তা গটগট করে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন এবং টেবিলের উপর জাঁকিয়ে বসলেন তক্তপোষে পা তুলে। সিংহাসনে বসার ভংগীটি রপ্ত আছে বেশ। এদিকে চাপা গলায় ফোঁস ফোঁস তখন আরম্ভ হয়ে গেছে—পুলিস! আমাদের বাড়িতে পুলিস এল কেন?

বজ্রকণ্ঠে ধমকে প্রশ্ন হয়—একে আপনারা চেনেন? এসেছিল কোন দিন এখানে? এসে কি করেছিল? কান্নাকাটি আমি পছন্দ করি না, সোজা উত্তর চাই।

—আমাদের কোন দোষ নেই হুজুর! ওকে আমরা আসতে বলি নি। ও নিজে থেকেই ছোট বাচ্চার সংগে কথা বলছিল তাই—ওরে বাপ্ রে, কি সর্বনেশে লোক রে!—বদমাস বোম্বেটে নিশ্চয়—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—দোহাই ধর্মাবতার—

এ সমস্ত এক সংগে নানা স্বরে বলতে বলতে হাউমাউ করে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কান্নার বান ডেকে গেল, ফোঁসফোঁসানির ঝড় উঠলো প্রবল। ধর্মাবতার ব্যাপার দেখে অবস্তার বনে হতভম্ব বসেছিলেন এক সেকেণ্ড কি দু' সেকেণ্ড, আক্রমণ কাছে এসে হাত-পা কাড়াকাড়ি খামচাখামচি করতেই ঝটকা মেরে ঠেলেঠুলে পথ করে নিয়ে ঠিক ক্যাংগারুর দৌড়! একটু দৌড়ে হঠাৎ মনে হয় ঐ এসে পড়লো বুঝি!—আবার দৌড়। আমি কিন্তু এতটুকু দোষ দিই না। পুলিস হ'লেও মানুষ তো! এ অবস্থায় মাথার ভেতর যে কি হয় তা মাত্র ভুক্তভোগী বলেই জানি।

এতক্ষণ পুলিসের হেপাজতে নিরাপদে ছিলাম, অতঃপর একলা দাঁড়িয়ে আবার বিপদ্ ডেকে আনা কেন? আমিও ছোট কর্তাকে বেদম তাড়া করে তাঁর আগেই পৌঁছে গেলাম বাড়ি।

নাঃ, ওদিকে আর নয়, কোন দিন কোন অবস্থাতেই নয়। স্বয়ং ট্রুম্যান সাহেবও যদি বলেন, সংগে লাখ লাখ আমেরিকান লস্কর দিচ্ছি আর ভোটে পাশ হয়ে গেলেই সারিবন্দী উড়োজাহাজ ভর্তি 'লাফিং গ্যাস' পাঠাচ্ছি—নাঃ, তবুও নয় কিছুতেই।

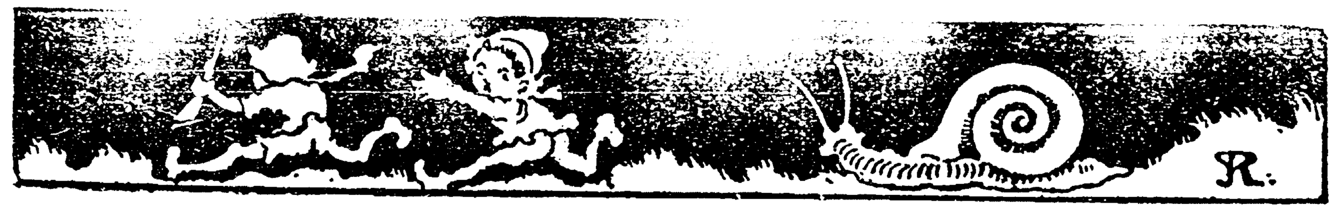

মঙ্গল কাব্যের গল্প

শ্রীজয়দেব রায়, এম্.এ

মঙ্গল কাব্যের নাম বোধ হয় জান ? প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে যেমন চর্য্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন, মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে তেমনি মঙ্গল কাব্য। সে যুগে তো উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি লেখার প্রথা ছিল না, যাহা কিছু লেখা হইত সবই কাব্যের আকারে। এই মঙ্গল কাব্যগুলিই ধরিতে গেলে সে যুগের উপন্যাস। এক একটা কাহিনী অবলম্বন করিয়া ৩০।৪০ জন কবিই হয়ত নানা ভাবে একই মঙ্গল কাব্য লিখিতেন।

এগুলি সে যুগের বাঙ্গালীর কেবল গল্পই নয়, এগুলিতে রহিয়াছে সেকালের খাঁটি ইতিহাস। সেকালের বাঙ্গালীর সমাজ-বিবরণ, আচার-ব্যবহার, রাজনৈতিক গণ্ডগোল, অর্থনৈতিক অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার,—সবই এই বইগুলি হইতে সংগ্রহ করা যায়। তখনকার দিনে এ দেশে ইতিহাস লেখার রেওয়াজ ছিল না। এখনকার মত খবরের কাগজও ছিল না। সমসাময়িক কবিরা

এই মঙ্গল কাব্যে যে সব বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন তাহা হইতেই দেশের অবস্থা কেমন ছিল জানা যায়। কাজেই এদিক্ দিয়াও এগুলির মূল্য কম নয়।

এই কাব্যগুলি সবই নানা দেবদেবীর মহিমা প্রচার করিয়াছে। এক এক জন কবি এক একজন দেবদেবীর ভক্ত। তাঁহারা নিজেদের আরাধ্য দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য অন্য দেবদেবীকে ছোট করিয়া মঙ্গল কাব্য লিখিতেন; উদ্দেশ্য, উপাস্যকে তুষ্ট করিয়া নিজের মঙ্গল কামনা করা। এই জন্যই এগুলির নাম 'মঙ্গল কাব্য'। অর্থাৎ যিনি লিখিয়াছেন তাঁহার তো মঙ্গল হইবেই, সেই সঙ্গে যাহারা ভক্তি ভরে শুনিবে তাহাদেরও মঙ্গল হইবে।

এই কাব্যগুলি সবই আসরে গান গাহিয়া শোনান হইত। বেশীর ভাগ লোকেই সেকালে লেখাপড়া জানিত না, বইও ছাপা হইত না, কাজেই গান গাহিয়া শোনান ছাড়া সেগুলির প্রচারের আর কি উপায় ছিল, বল ?

ধরিতে গেলে শ্রীচৈতন্য দেবের জন্মের পর হইতে আমাদের দেশের ও বাঙ্গালী জাতির ঠিক মত ঐতিহাসিক বিবরণ লেখা হয়। মহাপ্রভুর জীবনী অবলম্বনে লেখা কাব্য 'শ্রীচৈতন্য ভাগবতে' তখন বাংলা দেশে এই মঙ্গল গানের কি রকম তোড়জোড় চলিত তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—

"মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন্ জনে॥"

মঙ্গল কাব্যের প্রধান তিনটি শাখা—চণ্ডীমঙ্গল বা মঙ্গলচণ্ডীর গীত, বিষহরীর গীত বা মনসামঙ্গল এবং ধর্মমঙ্গল বা শিবের গীত। এ ছাড়া আরও বহু মঙ্গল কাব্য ছিল, যেমন—কালিকামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল, বাসুলিমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল। এমন কি ব্যাঘ্রদেবতা 'দক্ষিণ রায়'কে তুষ্ট করার জন্যও রচিত হয়—'রায়মঙ্গল'।

এই গান আট দিন ধরিয়া চলিত। এক মঙ্গল বারের ভোরে শুরু করিয়া পরের মঙ্গল বারের রাত্রিতে গান শেষ হইত। যে একটু মাত্র শুনিত তাহার শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়া উপায় ছিল না, না শুনিলে মহাপাপ হইত। পূর্ব বাঙলার গ্রামে বড়ই সাপের ভয়। সাপের দেবী মনসাকে তুষ্ট করিলে সাপের ভয় কমিয়া যায়, এই কারণে সারা বর্ষাকাল 'মনসামঙ্গল বা মনসার ভাসান' গাওয়া হইত।

মঙ্গল কাব্যের গল্প-কাহিনী কিন্তু নেহাৎ মন্দ ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ

তোমাদের চণ্ডীমঙ্গলের গল্প কিছুটা শুনাইতেছি। চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নাম-করা কাব্যের কবি হইতেছেন মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। তাঁহার উপাধি ছিল 'কবিকঙ্কণ'। তাঁহার দেশ ছিল বর্দ্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রাম। সেখান হইতে তিনি মেদিনীপুর জেলায় আড়রা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে গিয়া বাস করেন। ভগবতী চণ্ডী তাঁহাকে স্বপ্নে কাব্য লিখিতে আদেশ করিলেন—

"দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণ-ছায়া
আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই বাহিয়া যাই
আড়রায় হইনু উপনীত ॥"

চণ্ডীমঙ্গলে দুইটি গল্প আছে—একটি কালকেতু-ফুল্লরার গল্প, আর একটি হইল ধনপতি-শ্রীমন্তের গল্প। প্রথমে শোন কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী।

কালকেতুর গল্প

স্বর্গের প্রত্যেক দেবদেবীরই মর্ত্ত্যে পূজা প্রচারিত আছে, কেবল চণ্ডীর পূজা ছিল না। তিনি তাঁহার পূজা প্রচারের জন্য ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে অভিশাপ দিয়া তাহাকে কালকেতু রূপে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করাইলেন।

কালকেতু হইল এক ব্যাধের ছেলে। ছোট বেলা হইতেই দুর্দ্ধর্ষ বীর, তাহার প্রতাপে বনভূমি সদাই সন্ত্রস্ত—

"দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু!
বলে মত্ত গজপতি রূপে নব রতিপতি
সবার লোচনসুখ হেতু ॥
সহিয়া শতেক ঠেলা যার সঙ্গে করে খেলা
তার হয় জীবন সংশয়।
যে জন আকুড়ি করে আছাড়ে ধরণী পড়ে
ডরে কেহ নিকটে না রয় ॥
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে সজারু তাড়ায়ে ধরে
দূরে গেলে ধরায় কুক্কুরে।
বিহঙ্গ বাটুলে বিন্ধে লতায় জড়ায় বান্ধে
স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে ॥"

ফুল্লরার সঙ্গে পরে কালকেতুর বিবাহ হইল। তাহাদের অবস্থা ভাল নয়, বড় গরীব। কালকেতু শিকার করিয়া যাহা পায় অতি কষ্টে তাহাতে দিন চলে।

এদিকে কালকেতুর বিক্রমে বিব্রত হইয়া বনের পশুপাখীরা চণ্ডীর শরণ লইল। চণ্ডী তাহাদের আশ্বাস দিয়া একটা সোনার গোসাপের বেশ ধরিয়া ব্যাধের পথের উপর পড়িয়া রহিলেন। কালকেতু চণ্ডীর ছলনায় সেদিন আর কোন শিকার না পাইয়া সেই গোসাপটিকেই ধরিয়া আনিল।

বাড়ী আসিয়া দেবী একটি সুন্দরী রমণীর মূর্ত্তি ধরিয়া ফুল্লরাকে বলিলেন, "তোমার স্বামী আমাকে ধরে এনেছে, আমি এখানেই থাকব।"

কালকেতু ফুল্লরার মুখে এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে মারিতে যাইতেই দেবী নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে কয়েক ঘড়া মোহর ও গুজরাট রাজ্য দান করিলেন। তারপর কালকেতু গুজরাটের বন কাটাইয়া রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিল। ভাঁড়ুদত্ত নামে একজন অসৎ লোকের প্ররোচনায় শেষে কলিঙ্গ-রাজের সঙ্গে বিবাদ বাধিতে কালকেতু বন্দী হইল। কারাগারে চণ্ডীর স্তব করায় আবার তাহার মুক্তি হইল এবং সে সুখে রাজত্ব করিতে লাগিল।

শ্রীমন্ত সওদাগরের গল্প

চণ্ডীমঙ্গলের দ্বিতীয় গল্পটি শ্রীমন্ত সওদাগরের কাহিনী। উজানি নগরের ধনপতি সওদাগরের দুইটি স্ত্রী—লহনা ও খুল্লনা। দুইজনের মধ্যে খুব ভাব। কিন্তু এক সময়ে ধনপতি বাণিজ্য করিতে বিদেশে গেলে, দুর্বলা নামে এক দাসীর চক্রান্তে লহনা খুল্লনার উপর ভীষণ চটিয়া গেল।

লহনার আদেশে খুল্লনাকে বনে ছাগল চরাইতে হয়; এই সময়ে চণ্ডী তাহাকে তাঁহার পূজা করিবার জন্য আদেশ দিলেন। চণ্ডীপূজার ফলে খুল্লনা আবার বাড়ী ফিরিতে পারিল।

তারপর একদিন ধনপতি সওদাগর যখন সিংহলে বাণিজ্য করিতে যাইতেছে, তাহার মঙ্গলের জন্য পাতা চণ্ডীর ঘট সে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল। ইহার ফলে চণ্ডীর রোষে ধনপতির সমস্ত তরী ডুবিয়া গেল, বহু কষ্টে সে সিংহলে পৌঁছিল। পথে চণ্ডী তাহাকে 'কমলে কামিনী' মূর্ত্তি দেখাইলেন। ধনপতি সিংহল-রাজকে এই মূর্ত্তির কথা বলিয়াও তাঁহাকে না দেখাইতে পারায় কারাগারে বন্দী হইল।

এদিকে দেশে খুল্লনার শ্রীমন্ত নামে একটি ছেলে হইয়াছে। বড় হইয়া পিতৃসন্ধানে সেও সিংহল যাত্রা করিল। পথে শ্রীমন্তও 'কমলে কামিনী' দেখিল।

সিংহল-রাজকে প্রথমে তাহা না দেখাইতে পারায় শ্রীমন্তের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। কিন্তু মশানে চণ্ডীর স্তব করিয়া তাহার তো মুক্তি হইলই, উপরন্তু সে ধনপতিকেও মুক্ত করাইল এবং সিংহল-রাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়া সমারোহে দেশে ফিরিয়া আসিল।

সম্ভব হইলে পরে একদিন তোমাদের 'মনসা মঙ্গল' কাব্যের গল্প শুনাইব।

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

—চার—

"ছুটেছে ঘোড়া, উড়েছে বালি"

এর পরে দু'বছর কেটে গেছে। বর্দ্ধিষ্ণু মাস্তাং উপত্যকার অনেক উন্নতি হয়েছে ইতিমধ্যে। রেড ইণ্ডিয়ানরা দু'-একবার উপত্যকাবাসীদের ওপরে আক্রমণ চালিয়েছিলো বটে কিন্তু সে আক্রমণ প্রতিহত ক'রতে তাদের কোন বেগ পেতে হয় নি। কিশোর ডিক ভালে এতদিনে যৌবনে পদার্পণ করেছে, বাচ্চা ক্রুসোও বড় হয়ে লাভ করেছে কুকুরের পূর্ণ অবয়ব। শিকারীদের এবং রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এখন ডিকের 'রূপোলী' রাইফেলের নাম সুপরিচিত: তার অব্যর্থ সন্ধানের কথাও কারো অজানা নেই।

ক্রুসোর শিক্ষাও হয়েছে সম্পূর্ণ। বহু যত্নে, অসীম ধৈর্য্য সহকারে ডিক তাকে শিকারীর উপযুক্ত কুকুরে পরিণত ক'রেছে। 'নিয়ে আয়' অথবা 'নিয়ে চল্'—এ সব বুঝতে এখন আর তার মুহূর্ত্ত মাত্রও সময় লাগে না; এমন কি, সরোবরের জলে কোন জিনিষ ফেলে দিলেও বেশ খানিক দূর পর্য্যন্ত ডুব দিয়ে ক্রুসো তা উদ্ধার ক'রতে পারে। বিস্ময়কর তার সাঁতারের ক্ষমতা। ডিক যদি কোনো শিকারের পেছনে ধাওয়া করে, ক্রুসো সেই শিকারকে পেছনে ফেলে তাকে ডিকের

দিকে ফেরাতে পারে পর্য্যন্ত! কোনো কিছু পাহারা দেবার হ'লেও, ডিক জানে, সে ক্রুসোর ওপরে নির্ভর ক'রে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হ'তে পারে। ক্রুসোর অন্য অন্য গুণগুলোর কথা লিখতে গেলে বই অত্যন্ত বড় হ'য়ে উঠবে, তাই সে ভার আমরা তার জীবনী-লেখকের ওপরেই ছেড়ে দিলাম।

ইতিমধ্যে একদিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য বিভাগের এক প্রতিনিধি একদল অশ্বারোহী নিয়ে মাস্তাং উপত্যকায় এসে উপস্থিত হওয়ায় চারিদিকে সাড়া পড়ে গেলো। এ হেন ঘটনা এখানে সুদুর্ল্ভ। মেজর হোপ উপত্যকা ত্যাগ করায় জো ব্লাণ্ট সর্ব্বসম্মতিক্রমে উপত্যকার সমাজপতি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলো এবং মেজর হোপের মতো দুর্গেই বসবাস করতো সে।

রাষ্ট্র-প্রতিনিধির আগমনের উদ্দেশ্য, রেড ইণ্ডিয়ান এবং শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে বন্ধুত্বের ভিত্তি স্থাপন করা। মাস্তাং উপত্যকার সমাজপতি হিসেবে এবং রেড ইণ্ডিয়ানদের আচার-ব্যবহার ও তাদের বিভিন্ন ভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকার জন্য জো ব্লাণ্টকে ওরা এই অভিযানের উপযুক্ত বিবেচনা করেছে। এই অভিযানে যাবে তিনজন, এবং আর দু'জন সঙ্গী নির্ব্বাচনের ভারও থাকবে জো'র ওপরে। রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে যে কোনো সন্ধি অথবা সহযোগিতার প্রস্তাব করতে গেলে যে উপহারের লোভ না দেখালে হয় না এ তারা ভালো করেই জানতো এবং সেজন্যেও তারা প্রস্তুত হয়ে এসেছিলো।

রান্নাঘরে মায়ের পাশে বসে ডিক তার রাইফেল পরিষ্কার করতে করতে সাংসারিক সুখ-দুঃখের গল্প শুনছে। এ-কথা সে-কথার পর মা জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, সৈন্যেরা জো ব্লাণ্টের সঙ্গে এত কী কথা বলছে বল তো?"

ঠিক সেই সময়েই জো এসে উপস্থিত।

"আরে! জো নাকি? বাঃ, ঠিক সময়েই এসে পড়েছো! এই মাত্র হরিণের মাংস উনুন থেকে নামালাম।"

"তাই নাকি? বাঃ! তবে ধন্যবাদটা বোধ হয় রূপোলী বন্দুকেরই প্রাপ্য।"

"বন্দুকের নয়, বন্দুকের মালিকের।"—মা হেসে বললেন।

"তার চেয়ে বরং বলো, ক্রুসোর,—কারণ ও যদি হরিণটাকে আমার দিকে তাড়িয়ে না আনতো তা হ'লে কি আমি তাকে শিকার করতে পারতাম?" ডিক বললো।

"এ ভাবে তর্ক করলে তো বলতে হয়, সমস্ত কৃতিত্বটা ক্রুসোর মা ফ্যানেরই। কারণ সে যদি না ক্রুসোকে পেটে ধরত তা হ'লে ক্রুসোই বা আসত কোথা থেকে? সে কথা যাক, এখন কাজের কথা বলি। দু'জন সঙ্গী নিয়ে ওরা আমাকে রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সদ্ভাব পাতাবার জন্য পাঠাতে চায়।"

"আহা, আমিও যদি যেতে পেতাম!" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ডিক বললো।

"তোমাকে তো নিতেই এসেছি হে! জানো না, আমার সঙ্গী নির্ব্বাচনের ভার যে আমারই ওপরে! তুমি রাজী কিনা এখনই জানিয়ে দাও; কারণ কাল ভোরেই আমরা রওনা হবো।"

"এত তাড়াতাড়ি!" উদ্বিগ্নস্বরে মিসেস ডার্লে বলে উঠলেন।

"হ্যাঁ, কারণ 'পনি'রা এখন ইয়েলো ক্রীকের কাছটায় তাঁবু গেড়ে আছে। শুনেছি শীগ্‌গিরই ওরা তাঁবু উঠিয়ে আরো পশ্চিমে চলে যাবে। তার আগেই আমাদের গিয়ে পৌঁছানো উচিত।"

"আমায় যেতে দেবে তো মা?" উদ্বিগ্নস্বরে ডিক প্রশ্ন করলো।

কিছুক্ষণ নীরবে থেকে মা ধীর, শান্ত স্বরে বললেন, "হ্যাঁ, যেতে দেবো বৈকি! ঈশ্বর তোকে রক্ষা করুন। চিরদিন তো আর তোকে ধরে রাখতে পারবো না রে! রেড ইণ্ডিয়ানদের দেশে তোর প্রথম অভিযান যদি শান্তির প্রচেষ্টাতে হয় তো তার চেয়ে আনন্দ আর কিসে আছে?"

ডিক মায়ের হাত দু'টো নিজের গালের ওপর চেপে ধরলো। এই সব হৃদয়াবেগ বিনিময়ের দৃশ্য ক্রুসো নির্ব্বিকার হয়ে দেখে যেতে পারলো না। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ডিকের গায়ে নাক বোলাতে বোলাতে সে-ও জানালো তার সমবেদনা।

"আরে, বাচ্চু! হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুইও যাবি। ক্রুসোও যাবে, কি বলো জো?"

"কিন্তু সে কি ঠিক হবে? বিপদের সময়ে, যখন খুব সাবধানের সঙ্গে কাজ করা দরকার, তখন ওকে নিয়ে—"

"বিশ্বাস করো, আমার ওপর যদি নির্ভর করতে পারো তো ক্রুসোর ওপরেও নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করতে পারবে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে ক্রুসোও চলুক।"

"কিন্তু আর একজন কা'কে নিচ্ছো বললে না?"

"অনেক চিন্তা ক'রে শেষ পর্য্যন্ত হেনরিকেই সঙ্গে নেবো ঠিক করেছি। নিপুণ শিকারী না হ'লেও ওর মতো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এ অঞ্চলে নেই। আচ্ছা, আমি চলি ডিক, কাল ভোরে তৈরী হয়ে দুর্গে আসবে। কেমন?"

পরদিন ভোরে রূপোলী রাইফেলটা কাঁধে ফেলে ডিক তার ছোট ঘোড়ায় চড়ে যথাস্থানে এসে হাজির হ'লো। পেছনে পেছনে ক্রুসোও এলো। জো আর হেনরি ইতিপূর্ব্বেই তৈরী হয়ে ছিলো।

তাদের বিদায় দেবার জন্য তখন একটা ছোটখাটো ভীড় জমে গেছে।

"তোমরা যদি তিন মাসের মধ্যে ফিরে না আসো, জো, তা হ'লে আমরা সদলবলে তোমাদের সন্ধানে বেরোবো।"—একজন বললো।

"তিন মাসের অনেক আগেই যদি আমরা ফিরে না আসি তো বৃথা আমাদের অনুসন্ধানের জন্য তোমাদের আর কষ্ট করবার দরকার হবে না। বেঁচে থাকলে আমরা তার অনেক আগেই ফিরে আসবো।" ঘোড়ায় জিন লাগাতে লাগাতে জো বললো।

এর কিছুক্ষণ পরেই তারা বেরিয়ে পড়লো। (ক্রমশঃ)

দূরের পাড়ি

শ্রীঅরুণমোহন চক্রবর্ত্তী

আকাশ-পথে ডানা মেলে যখন কোনো বিমান এক দেশ থেকে অন্য দেশের পথে পাড়ি জমায় তখন তাকে মাঝে মাঝে নামতে হয় মাটির বুকে তেল নেবার জন্য। এ জন্য বড় বড় যাত্রীবাহী বিমানগুলোর সময়ও বড় কম নষ্ট হয় না। শুধু তাই নয়, বিমানের যত বড় বড় দুর্ঘটনা তা এই উঠতে বা নামতে গিয়েই ঘটে থাকে।

বড় বড় যাত্রীবাহী বিমানগুলো যখন তিন হাজার বা চার হাজার মাইলের পথে পাড়ি জমায় তখন তেল তাদের বেশ কিছু নিতেই হয় সঙ্গে। এই তেল বেশী নেবার দরুণ যাত্রীর সংখ্যা তাদের বাধ্য হ'য়ে কমাতে হয়, কারণ তেলের একটা নিজস্ব ওজন আছে তো? কিন্তু যাত্রীর পরিমাণ কমা মানে আয়ের পথও কমা।

তাই বর্ত্তমানে যে সব বড় বড় বিমান দূরের পাড়ি জমায় তাদের তেল নেবার জন্য এক অভিনব উপায় বার করা হয়েছে। এর ফলে সেগুলো হাজার হাজার মাইলের পথ একটানা উড়ে যেতে পারে অথচ তার জন্য যে প্রচুর পরিমাণ তেল দরকার তা তারা সঙ্গে নেয় না। অল্প কিছু তেল সম্বল করেই তারা দূরের পথে পাড়ি জমায়।

ব্যাপারটা তোমাদের কাছে ধাঁধার মত মনে হচ্ছে, না? তবে ব্যাপারটা খুলেই বলি।

এক কথায় আকাশ-পথে তেল নেওয়া মানে বোঝায় একখানা বিমান তেল জোগান দেবে, আর একখানা বিমান তা নেবে। কিন্তু কী ভাবে? আকাশ-পথে যে বিমান তেল সরবারহ করে তাকে বলা হয় তেলবাহী বা ট্যাঙ্কার। যাত্রীবাহী

বিমান যখন আকাশ-পথে পাড়ি জমায় তখন তেলবাহী বিমানখানা কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে চলে না। তাতে অযথা খানিক তেল নষ্ট হয়। কারণ, যাত্রীবাহী বিমানখানার তেল শেষ হ'লে তবে তো তেলবাহী তাকে তেল জোগাবে! আর যাত্রীবাহী বিমানও এত অল্প তেল নেয় না যে একটুতেই তা ফুরিয়ে যাবে। এতখানি তেল তার সঙ্গে থাকে যে পথে কোনো বিমান-বন্দর পড়লে সে অনায়াসেই সেখানে নামতে পারে,—আর কাছাকাছি বিমান-বন্দর না পড়লে সে আবার তার পূর্বস্থানে ফিরে আসতে পারে। কাজেই তেলবাহী বিমান যাত্রীবাহী বিমানের যাত্রাপথের একস্থানে অপেক্ষা ক'রে থাকে। যাত্রীবাহী বিমানটি, তেলবাহী বিমান যেখানে অপেক্ষা করছে সেখানে পৌঁছবার আগেই, যোগাযোগ স্থাপন ক'রে জানিয়ে দেয় তার ঐ বন্দরে উপস্থিত হবার একটা মোটামুটি সময়। তেলবাহী বিমানখানা সেই সময়ের আগেই প্রস্তুত হ'য়ে অপেক্ষা করতে থাকে। তারপর যাত্রীবাহী বিমানের আগমন-নির্দেশ পেলেই আকাশ-পথে উঠে তাকে লক্ষ্য ক'রে রওনা হয়। কিন্তু কী ভাবে খুঁজে পায় তেলবাহী বিমান ঐ যাত্রীবাহী বিমানখানাকে অনন্ত আকাশ-মণ্ডলে? আকাশ পরিষ্কার থাকলে না হয় কোন ঝামেলা নেই। কিন্তু যদি মেঘ বা কুয়াশা থাকে তবে? তারও ভাবনা নেই কোনো, তেলবাহী বিমানখানা 'রাডার' নামে এক রকম যন্ত্রের সাহায্যে ঠিক নির্দিষ্ট বিমানখানাকে খুঁজে নিতে পারে।

সাক্ষাৎ-পর্ব তো শেষ হ'লো—এবারে কি করবে? যাত্রীবাহী বিমান একটা খুব ভারী দড়ি নামিয়ে দেয় আকাশে। তেলবাহী বিমান এক বিশেষ কৌশলের সাহায্যে ঐ দড়ির সঙ্গে নিজের একটা দড়ি আটকে টেনে আনে কাছে, তারপর তার সঙ্গে এক প্রকাণ্ড তেলের নল যুড়ে দেয়। নল যুড়ে দেওয়া হ'লে এবারে যাত্রীবাহী বিমানখানা তা টেনে এনে নিজের পেট্রল ট্যাঙ্কের মুখে লাগিয়ে দেয়। এই সব কাণ্ড যখন চলে তখন ভেবো না যে বিমান দু'খানা খুব কাছাকাছি থাকে—বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখেই তারা এ সব কাজ শেষ করে।

নল লাগানো হ'য়ে গেলে তেল ঢালবার সুবিধের জন্যে তেলবাহী বিমানখানা যাত্রীবাহী বিমানের চাইতে অনেকটা উঁচুতে উঠে যায় এবং পাম্পের সাহায্যে তেল সরবরাহ করতে আরম্ভ করে। এই ভাবে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৭' গ্যালন ক'রে তেল সরবরাহ করা হয়। অর্থাৎ আধ ঘণ্টায় আড়াই থেকে তিন হাজার গ্যালন তেল সরবরাহ করা যেতে পারে। পেট্রলে যাতে কোনো রকমে আগুন

লেগে যেতে না পারে সে জন্য কতকগুলো নিরাপত্তা-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

তেল নেওয়া হ'য়ে গেলে যাত্রীবাহী বিমানখানা তেলের নলটা খুলে একটা দড়ির সঙ্গে বেঁধে নীচে নামিয়ে দেয়। দড়িটার এক জায়গা রাখা হয় খুব নরম; প্রবল বায়ুর চাপে দড়ি যায় ছিঁড়ে, ফলে তেলবাহী বিমানখানা তা আবার গুটিয়ে নিয়ে ফিরে চলে নিজের আস্তানার দিকে। এই ভাবে আকাশের ওপরে, যাত্রীদের অগোচরে, একখানা বিমান আর একখানা বিমান থেকে পথ চলার সম্বল তেল জোগান পায়। নামতেও হয় না নীচে, জানতেও পারে না যাত্রীরা, অথচ বিমান-খানা তার প্রয়োজন মিটিয়ে নেয় আনায়াসেই।

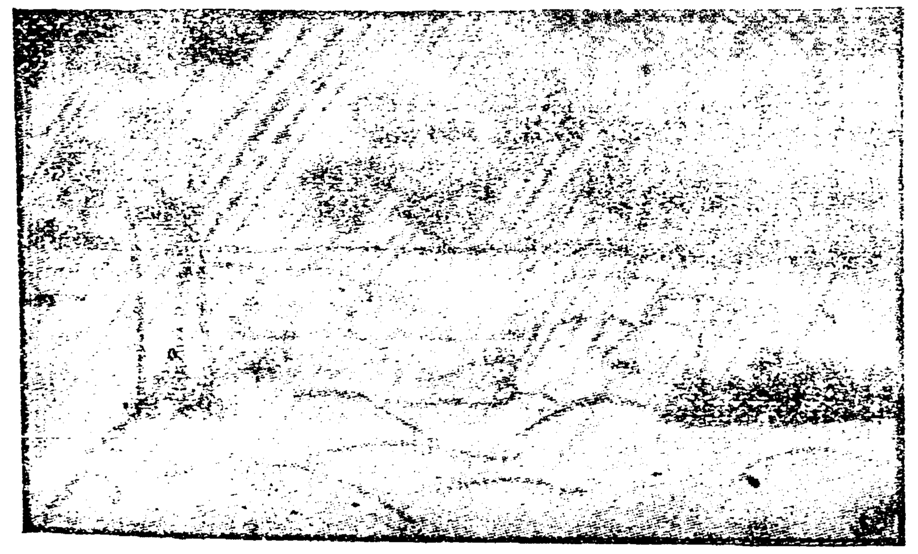

শ্রাবণে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

ওই বহে আসে ভিজে ভিজে পূবালি বাতাস,
যেন মেঘে মেঘে নুয়ে পড়ে মেদুর আকাশ।
ভরা দুপুর বেলা
এ কি বিজলী-খেলা,
কেন কড় কড় রবে কাঁপে ভুবন, ভবন!
ঢাকা পড়িল এমন কেন প্রখর তপন?

আজ মরা নদী ভরা হ'ল কূলে কূলে জল,
হের গাছে গাছে ফল, ফুলে ফুলে পরিমল।
চষা মাঠের বুকে
যত কৃষাণ সুখে
ধান রোপন করিছে গান গাহিয়া সরল;
এলো শ্যামল ধরণী বুকে শ্রাবণ সজল।

ফোটে কামিনী, কদম ফুল, যূথী, কেতকী,
শোন কানন সভাতে কুঞ্জে পাখী কত কি!
ছেলে মেয়ের দলে
ভেজে বৃষ্টি-জলে,
কেউ দেখেছ তাদের নাচ, খুশী এত কি!
ধারা শ্রাবণ না এলে হেন দেখা যেত কি?

তেলে-জলে

শ্রীবেণু ঘোষ

পাড়ার এক বাড়ীতে ছিল দু'টো কুকুর। ওদের মনিব দু'জনকেই খুব ভালবাসতেন, আদর-যত্নও করতেন। একদিন দুপুর বেলায় মনিব বেশ আদর ক'রে কুকুর দু'টোকে রকমারি খাবার খাওয়ালেন। ওরা খুব খুসী মনে সব খাবার সমান ভাগে খেয়ে নিল, যেমন করে আমরা খাই নেমন্তন্ন-বাড়ীতে। তারপর পাশাপাশি শুয়ে গল্প করতে লাগল মনের আনন্দে।

প্রথম কুকুরটি বল্‌লে—"দেখ ভাই, আজ থেকে আমরা বন্ধু হ'লাম। খাবার নিয়ে আর আমরা মারামারি, ঝগড়া-ঝাঁটি করব না—কেমন?"

দ্বিতীয় কুকুরটি উত্তর দিল,—"হ্যাঁ ভাই, তাই ভাল। তোমার মতন বন্ধু পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। আজ থেকে তুমি হ'লে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু।"

প্রথমটি আবার বল্‌লে—"আজ থেকে তুমিও আমার জীবনের একমাত্র বন্ধু। এস, আমরা দু'জনে দু'জনার থাবা ছুঁয়ে শপথ করি,—আর আমরা খাবার নিয়ে কোন দিন ঝগড়া বা কাড়াকাড়ি করব না।"

ওদের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই টুক্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে কে একটুক্‌রো মাংস ছুঁড়ে দিয়েছে ওদের মাঝখানে। বোধ হয় দুষ্টু রাঁধুনীটাই হবে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘটল এক বিপর্য্যয় কাণ্ড। বিদ্যুতের মত দু'জনেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই টুকরোটার ওপর। তার পর আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি, চীৎকারে সমস্ত পাড়া উঠল কেঁপে। মনিব লাঠি নিয়ে ছুটে এলেন এবং নির্ব্বিবাদে দু'জনকারই পিঠের মধ্যে ঘা কতক বসিয়ে দিলেন।

আধ ঘণ্টা পরে। ওরা দু'জন উঠোনের দু' কোণে বসে আছে। এর ঘাড়ের খানিকটা মাংস নেই, ওর নেই কানের খানিকটা। সারা উঠোনময় ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ। মাংসের টুকরো অবশ্য ওদের কারোরই ভোগে আসে নি, কয়েকটি কাক আগেই সেটা নিয়ে চম্পট দিয়েছে। শপথ-করা বন্ধুত্বটুকুও কোন ফাঁকে চুরমার হয়ে গেছে।

ফুটবলের ফুল ব্যাক্

শ্রীঅমলকুমার মিত্র, বি. এ, সাহিত্যভারতী

গত বারে পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গোল-রক্ষক সম্বন্ধে কিছু বলেছি। আজ শোন কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ফুল ব্যাকের গল্প।

ফুটবলে ভাল ব্যাকের অভাব খুব বেশী। যে খেলোয়াড়ের "পোজিশন" সম্বন্ধে সদাসর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি ও জ্ঞান থাকে, তিনিই কেবল এই জায়গায় ভাল খেলতে পারেন। অবশ্য ফুটবলের সব খেলোয়াড়েরই 'পোজিশন্' সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে চলে না, কিন্তু ফুল ব্যাক্‌কেই এ বিষয়ে সবচেয়ে সচেতন থাকতে হয়। মোহনবাগানের অধিনায়ক শৈলেন মান্না ও পাকিস্থানের তাজ মহম্মদের এ গুণ অনেকটা আছে।

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুল ব্যাক হচ্ছেন ম্যান্‌চেষ্টার ইউনাইটেডের রাইট ব্যাক্ ও অধিনায়ক জনি কেরি, যদিও তিনি আয়ারল্যাণ্ড থেকে এসেছেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি "অবশিষ্ট ইয়োরোপ" দলের অধিনায়ক হয়ে রাইট হাফ্ স্থানে গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধেও খেলেন।

কেরি দেখতে লম্বা-চওড়া, সুগঠিত। মাথায় চকচকে টাক। শরীরেও অসম্ভব শক্তি। কিন্তু তিনি কখনও শারীরিক বলপ্রয়োগ করে খেলা পছন্দ করেন না, নিজের ক্রীড়ানৈপুণ্যের উপর তাঁর অসম্ভব বিশ্বাস। বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়ে তিনি যেখানে সেখানে বল মেরে দেন না। একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিজ দলের যে খেলোয়াড়টি সবচেয়ে অবরোধমুক্ত অবস্থায় রয়েছেন ব'লে তিনি মনে করেন, তাঁকেই বলিষ্ঠ শটে বল পাস্ করে দেন। ছেলেরা তাঁর অটোগ্রাফ নিতে এলে তিনি হাসিমুখে সই করে দেন—"কিপ্ অন্ প্লেয়িং ফুটবল" অর্থাৎ—"বরাবর ফুটবল খেলে যাও।"

ওয়েল্‌সের অধিনায়ক হচ্ছেন আর্সেনালের ওয়ালে বার্ণস। জনি কেরির মত বার্ণসও আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবল খেলোয়াড়। তিনিও কেরির মত রাইট ব্যাকে খেলেন। সাহস এবং 'ঠাণ্ডা মাথা' ব'লে তাঁর খুব নাম আছে। ১৯৪৫ সনে তিনি আর্সেনালের পক্ষ সমর্থন করেন এবং সে বছরই স্বীয় ক্রীড়াপ্রতিভা-বলে ওয়েল্‌সের আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল একাদশে মনোনীত হ'ন। আর্সেনালের সমর্থকেরা যখন বার্ণসকে নিয়ে নাচানাচি শুরু করেছেন এমন সময় তিনি একটির পর একটি খেলায় আহত হ'তে লাগলেন। ডাক্তাররা তো বলেই দিলেন, তিনি আর কখনও ফুটবল খেলতে পারবেন না। কিন্তু ওয়ালে দমবার পাত্র ন'ন। পরের বছরেই তিনি আবার বড় খেলায় নামলেন। বার্ণস 'পোজিশন্' সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন এবং লম্বা কিক্ মারতেও ওস্তাদ। পেনাল্টি কিক্ মারতে তো তিনি অদ্বিতীয় এবং বল নিয়ে তাঁর মত দ্রুতবেগে দৌড়াতেও খুব কম খেলোয়াড়ই পারেন। তিনি সব বিষয়ে কেরির সমকক্ষ হ'লেও কেরির মত নিজ দলের খেলোয়াড়কে অদ্ভুত চাতুর্য্যের সঙ্গে বল সরবরাহ করতে তিনি পারেন না।

উদীয়মান তরুণ লেফ্‌ট ব্যাক্ হিসাবে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ডিভিসনের খেলোয়াড় ব্ল্যাকবার্ণ রোভার্সের বিল একারস্‌লে খুব নাম করেছেন। বিল্ খুব পরিশ্রম করে খেলতে পারেন। শোচনীয় পরাজয়ের মুখেও তাঁর আত্মবিশ্বাস অদ্ভুত। তিনি ওয়ার্ল্ড্ কাপে ইংল্যাণ্ডের আন্তর্জ্জাতিক একাদশের পক্ষ হয়ে স্পেনের বিরুদ্ধে খেলেছেন।

ইংল্যাণ্ডের আন্তর্জ্জাতিক একাদশের রাইট ব্যাক্ হচ্ছেন ছাব্বিশ বছর বয়স্ক টটেনহাম হটস্পারের খেলোয়াড় আলফ্ রামসে। অধিনায়ক বিলি রাইটের অনুপস্থিতিতে গত নভেম্বর মাসে তিনি ওয়েলস্ এবং জুগোস্লেভিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড দলকে পরিচালিত করেন। রামসে ডাইনে এবং বাঁয়ে দুই পোজিশনেই সমান ভাল খেলতে পারেন।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডের উইলি ষ্টিফেন্ এক সময় ইয়োরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুল ব্যাক্ হিসাবে নাম করেছিলেন। তাঁর মত লম্বা-চওড়া ফুল ব্যাক্ সচারচর চোখে পড়ে না। দূর থেকে তাঁকে দেখলে মনে হ'ত একজন ছোটখাট দৈত্য বুঝি সমস্ত মাঠটা চষে বেড়াচ্ছে! তাঁর বুলেটের মত মারাত্মক শট বিপক্ষ দলের ত্রাসের কারণ হ'ত।

ফ্রান্‌সের রেনি হাউসও উদীয়মান ব্যাক্ হিসাবে খুব নাম করেছেন।

একটা টীমে সচরাচর দু'টি ব্যাক্‌কেই সমান শক্তিশালী দেখতে পাওয়া যায় না। রোমের লেজিও ক্লাবের এনটোনেজি এবং ফুরিয়েসি কিন্তু এই নিয়মের ব্যতিক্রম। ব্রেজিলে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড কাপ প্রতিযোগিতায়ও ফুরিয়েসি ইটালীর পক্ষ সমর্থন করেন। এনটোনেজির দুর্ভাগ্য, তিনি অল্পের জন্য দল থেকে বাদ পড়ে যান।

সুইডেনের অধিনায়ক, লম্বা-চওড়া ফুল ব্যাক্ এরিক্ নীলসনও জগৎযোড়া নাম কিনতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি মালমো টীমের অধিনায়ক। সুইডেনের ফুটবল লীগে মালমো আশ্চর্য্য রকম ভাবে অপরাজিত থেকে যাচ্ছে কয়েক বছর ধরে। তাঁদের এই সাফল্যের কারণ শোনা যাচ্ছে এক রকমের ইনজেকসন্! ইনজেকসনের রাসায়নিক ফরমূলা কিন্তু কাউকে জানান হচ্ছে না। নীলসন নাকি আজ পর্য্যন্ত দেড় শ'টির উপর ইনজেকসন নিয়েছেন, এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁর চুলে পাক ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খেলাও ক্রমশঃ পাকছে। গত বছর তিনি ইনজেকসন নিয়েছিলেন কি নেন নি তা আমরা অবশ্য ঠিক জানি না, কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক খেলায় সুইট্‌জারল্যাণ্ডের সঙ্গে যে শেষ রক্ষা করতে পারেন নি, সে খবর রাখি। এই খেলায় সুইডেনের এই বিশ্ববিখ্যাত টীমকে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের হাতে (না পায়ে?) ৪-২ গোলের ব্যবধানে পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

সেকালে কলকাতার মাঠে যে সব ব্যাক্ কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে মোহন বাগানের গোষ্ঠ পাল, ক্যালকাটার বেনেট, সামারসেট্‌স্‌এর ডে, আর্গাইল্‌সএর উইংফিল্ড ('গোল স্কোরিং ব্যাক্') এবং আরো অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য।

কপালে যা লেখা আছে

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

এক ছিলেন গরীব ব্রাহ্মণ। গরীব হ'লেও লোকটী ছিলেন ভারী সৎ, কারও সাতে-পাঁচে থাকতেন না। পুঁথিপত্র আর পূজো-অর্চনা নিয়েই তাঁর দিন কেটে যেত।

কিন্তু এমনি পোড়া অদৃষ্ট, ভগবান্ ব্রাহ্মণের বরাতে পুত্রসুখ লেখেন নি। একটির পর একটি ছেলে হয়, কিন্তু বছর না ঘুরতেই ভগবান্ তাকে কেড়ে নেন। কোন ছেলেই এক বছরের বেশী বাঁচে না। ব্রাহ্মণ ভাবেন, কী আমি এমন অপরাধ করেছি যার জন্য আমার এই শাস্তি! আমার প্রত্যেকটি ছেলে কেন এত হীন-আয়ু হবে!

পর পর পাঁচটি ছেলে এইভাবে হারিয়ে ব্রাহ্মণীও আর সহ্য করতে পারলেন না; স্বামীকে ডেকে বললেন, "শাস্ত্রে বলে রাজ্যে অকালমৃত্যু ঘটে নাকি রাজার জন্য। কিন্তু আমাদের রাজা তো সে রকম ন'ন! এত জ্ঞানী-গুণী রাজা আর কোন্ দেশে আছেন? কিন্তু তবু তাঁর রাজ্যে এমনটা হচ্ছে কেন? তুমি যাও, রাজার কাছে গিয়ে এর প্রতিকার প্রার্থনা কর।"

ব্রাহ্মণও সেই কথাই ভাবছিলেন। তিনি তখনই রাজার কাছে গিয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করলেন।

রাজা ছিলেন বাস্তবিকই খুব জ্ঞানী এবং গুণী। ব্রাহ্মণের কথায় তিনি প্রথমটা খুব লজ্জিত হলেন; তার পর তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, "আচ্ছা, আমি এর একটা বিহিত করবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করব। এর পরের বারে যখন আপনার ছেলে হবে তখন ছ' দিনের দিন আমাকে একটা খবর দেবেন।"

কিছু দিন পরেই ব্রাহ্মণের আর একটি ছেলে হ'ল। ব্রাহ্মণ কথামত ছ' দিনের দিন গিয়ে রাজাকে খবর দিলেন। রাজা বললেন, "চলুন আপনার বাড়ীতে। যে ঘরে আপনার ছেলে রয়েছে সেই ঘরে ঢুকবার দরজার কাছে আমাকে রাত্রে একটু শুতে দেবেন।" ব্রাহ্মণ একটু সঙ্কোচ বোধ করলেও শেষ পর্য্যন্ত রাজাকে নিয়ে বাড়ী এলেন।

এখন, হয়েছে কি, জন্মের পর ছ'দিনের দিন অর্থাৎ ষষ্ঠীর দিন বিধাতা পুরুষ এসে কপালে ভাগ্যলিপি লিখে দিয়ে যান। রাজার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, বিধাতা পুরুষের পথ আটকানো।

ব্যবস্থামত রাজা আঁতুড়-ঘরের দরজায় শুয়ে রইলেন। রাত্রে বিধাতা পুরুষ এসে দেখেন, দরজা যুড়ে কে শুয়ে আছে। তিনি লোকটিকে উঠে পথ ক'রে দিতে বললেন, কিন্তু রাজা রাজী ন'ন কিছুতেই। বিধাতা পুরুষ যতই সরে যেতে অনুরোধ করেন রাজা ততই আরো জাঁকিয়ে বসেন। শেষে বিধাতা পুরুষ হতাশ হয়ে বললেন, "তবে কি ছেলেটির ভাগ্যলিপি লেখা হবে না?"

রাজা বললেন, "আমি একটি মাত্র সর্ত্তে দরজা ছেড়ে দিতে পারি। ভাগ্যলিপি লিখে ফিরে যাবার সময়ে আমাকে বলে যেতে হবে ছেলের কপালে কি লিখলেন।"

কি আর করেন, বিধাতা পুরুষ শেষে রাজার কথায় রাজী হয়ে আঁতুড়-ঘরে ঢুকলেন।

ফিরবার সময়ে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি লিখলেন? ছেলেটির আয়ু কত?"

"এক বছর।"—বলে বিধাতাপুরুষ পথ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু রাজা নাছোড়বান্দা।—"বলেন কি ঠাকুর! আমি যে ব্রাহ্মণকে কথা দিয়েছি—তাঁর ছেলের যাতে অকালমৃত্যু না হয় তার বিহিত আমি করব।"

"তা কি হয়? কপালের লেখা কি খণ্ডন করা যায়? আমি যা লিখে এসেছি তার আর নড়চড় হ'তে পারে না।"

কিন্তু হবে না বললেই তো হয় না। রাজা এবার বিধাতা পুরুষের পা জড়িয়ে ধরে বললেন, "ঠাকুর, যে ভাবেই হোক, ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে দীর্ঘায়ু করে দিতে হবে। নইলে আমি রাজা, এ রাজ্য আর মুখ দেখাতে পারব না।"

বিধাতা পুরুষ যেন একটু বিচলিত হয়েছেন মনে হ'ল। রাজা সুযোগ পেয়ে আরও চেপে ধরলেন—"আপনি ইচ্ছে করলে সবই রদ-বদল করা যেতে পারে। কি করলে এ ছেলে বাঁচবে তা আপনাকে বলতেই হবে। নইলে আবার আপনাকে আটকে রাখব।"

বিধাতা পুরুষ আর কি করেন, বললেন, "বেশ, বলছি। ও ছেলে অবশ্যি এক বছর পূর্ণ হ'লে মারা যাবেই; তবে তোমাকে একটি শ্লোকের একটা চরণ বলে যাচ্ছি। এই শ্লোকের বাকি চারটে চরণ যদি কখনও পূর্ণ হয় তবে এ ছেলে আবার বেঁচে উঠবে এবং তার পর দীর্ঘায়ু হ'তে তার কোন বাধা থাকবে না। চরণটি হচ্ছে—"লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ" অর্থাৎ "অর্থ যাহা পাবার তাহা পাবেই পাবে লোক।"

তখন রাজা পথ ছেড়ে দিলেন, বিধাতা পুরুষও প্রস্থান করলেন। রাজা ব্রহ্মণকে সব কথা ব'লে এবং আশ্বাস দিয়ে ফিরে এলেন।

এই ঘটনার ঠিক এক বছর পরে রাজা খবর পেলেন, ব্রাহ্মণের ছেলেটি মারা গেছে। রাজার মনে বড় দুঃখ হ'ল কিন্তু তিনি চুপ ক'রে রইলেন না, এর একটা বিহিত তিনি করবেনই। তিনি ছদ্মবেশে রাজধানী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। যাবার সময় ব্রাহ্মণকে বলে গেলেন, "আমি অন্ততঃ ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আপনার ছেলের মৃতদেহ দাহ করবেন না।"

রাজা চলেছেন তো চলেছেনই। তাঁর মনের মধ্যে শুধু ঘুরছে সেই শ্লোকের প্রথম চরণটি—'লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ'—'অর্থ যাহা পাবার তাহা পাবেই পাবে লোক।' চলতে চলতে অবশেষে তিনি আর এক রাজ্যে এসে হাজির। রাজার ছদ্মবেশ, কেউ তাঁকে চিনতে পারল না। রাজা এক ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়ে অতিথি হ'লেন।

এখন, এই ব্রাহ্মণটি ছিলেন খুব পণ্ডিত লোক, তাই রাজা স্বয়ং রাজকন্যাকে পড়াবার ভার দিয়েছিলেন তাঁর ওপর। শুধু রাজকন্যা ন'ন, ব্রাহ্মণ সে দেশের মন্ত্রীর মেয়ে, সেনাপতির মেয়ে এবং, কোষাধ্যক্ষের মেয়েকেও পড়াবার ভার নিয়েছিলেন। এই চারটি ছাত্রীই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এসে তাঁর কাছে পড়ত।

রাজা ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অতিথি হবার দিন কয়েক পরেই হঠাৎ কি একটা কাজে ব্রাহ্মণকে একবার দূরদেশে যেতে হ'ল। ব্রাহ্মণ যাবার সময় তাঁর ছেলের ওপর ভার দিয়ে গেলেন ছাত্রী

চারজনকে পড়াবার। ব্রাহ্মণের ছেলেটি কিন্তু তেমন সুবিধের ছিল না। সে ছাত্রীদের কয়েক দিন তাড়াহুড়ো ক'রে পড়িয়ে বল্ল, "তোমাদের শিক্ষা শেষ হয়ে গেছে, এবার আমায় গুরু-দক্ষিণা দাও।"

ছাত্রীরা শুনে খুসী হয়ে বল্ল, "বেশ তো, বলুন কি দিতে হবে? যা আদেশ করবেন তাই দেব দক্ষিণা।"

ব্রাহ্মণপুত্র হেসে বললে, "তোমরা চারজনই আমাকে বিয়ে কর। তা হ'লেই আমাকে ঠিক মত দক্ষিণা দেওয়া হবে।"

ছাত্রীরা তো শুনে হতভম্ব। কিন্তু কথা দিয়ে ফেলেছে, সত্য ভঙ্গের অপরাধ তারা করবে না। তারা গম্ভীর ভাবে বলল, "বেশ, তাই হবে। আজ রাত্রে, সহরের দক্ষিণে যে শিবমন্দির আছে সেখানে আসবেন। আমরা চারজনই সেখানে আপনার গলায় মাল্যদান করব।"

এদিকে, যে ঘরে বসে ব্রাহ্মণের ছেলে ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছিল ঠিক তার পাশের ঘরেই রাজা বসেছিলেন। কাজেই সমস্ত কথাই তাঁর কানে গেল। তিনি মনে মনে বললেন, "দাঁড়াও, বিয়ে তোমাকে করাচ্ছি।" তিনি সটান ছেলের মা—অর্থাৎ ব্রাহ্মণের স্ত্রীর কাছে গিয়ে ছেলের অপকর্ম্মের কথা প্রকাশ ক'রে দিলেন। ব্রাহ্মণপত্নী শুনে তো মহা খাপ্পা। ছেলেকে ডেকে তিনি প্রথমটা খুব ধমকালেন, তার পর, যাতে সে আর শিবমন্দিরে যেতে না পারে সেজন্য, কৌশলে তাকে একটা ঘরে পুরে শিকল দিয়ে রাখলেন।

আর রাজা করলেন কি, সন্ধ্যা হ'তেই চুপি চুপি গিয়ে সেই মন্দিরের ভিতর লুকিয়ে রইলেন। একটু রাত হ'তেই রাজকন্যা সত্য রক্ষা করতে মন্দিরে এসে হাজির। নাম ধরে ডাকতেই রাজা অন্ধকারের ভিতর থেকে চুপি চুপি একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে তাঁর অস্তিত্ব জানিয়ে দিলেন। রাজকন্যা অন্ধকারে তাঁকেই ব্রাহ্মণপুত্র ভেবে তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। রাজা বলে উঠলেন, "লব্ধব্যমর্থং।" কণ্ঠস্বরে রাজকন্যা তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন, কিন্তু মালা দিয়ে ফেলেছেন, এখন আর উপায় কি? তিনি শুধু বললেন, "লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ"—"অর্থ যাহা পাবার তাহা পাবেই পাবে লোক।"

একটু পরে এলেন মন্ত্রিকন্যা। তিনিও ঠিক অমনি ক'রে অজানতে রাজার গলায় মালা দিলেন। রাজা এবার রাজকন্যার বলা চরণটি উচ্চারণ করলে মন্ত্রিকন্যা নিজের ভুল বুঝতে পেরে বললেন, "দৈবোপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।—"দৈব এলেও এড়াতে তায় সাধ্য নাহি তার।"

তার পর এলেন সেনাপতির কন্যা। তিনিও ঠিক ঐ ভাবে রাজার গলায় মালা দিলে রাজা শ্লোকের প্রথম দু'টি চরণ উচ্চারণ করলেন। সেনাপতির কন্যাও ব্যাপারটা বুঝলেন কিন্তু অধীর হলেন না, বললেন, "অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে।"—"কাজেই আমি হই নি অবাক্, করছিও না শোক।"

সব শেষে এলেন কোষাধ্যক্ষ-কন্যা। আর আর সখীদের মত তিনিও রাজার গলায়

মালা দিলে রাজা শ্লোকের তিনটি চরণ বলে গেলেন। শুনে কোষাধ্যক্ষ-কন্যা হেসে বললেন, "ললাটলেখো ন পুনঃ প্রয়াতি!"—"কপালে যা লিখন আছে নয় তা ঘুচিবার।"

রাজা শুনে ভারী খুসী, কারণ শ্লোকের চারটি চরণই এখন পূর্ণ হয়ে গেছে:

"লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ। দৈবোপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ ॥
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে। ললাটলেখো ন পুনঃ প্রয়াতি ॥"
অর্থ যাহা পাবার তাহা পাবেই পাবে লোক,
দৈব এলেও এড়াতে তায় সাধ্য নাহি তার;
কাজেই আমি হই নি অবাক্,—করছিও না শোক,
কপালে যে লিখন আছে নয় তা ঘুচিবার।

এবারে তা হ'লে নিশ্চয়ই সেই ব্রাহ্মণ-পুত্র বেঁচে উঠবে। রাজা তখন সদ্যবিবাহিত পত্নী চারজনকে নিজের পরিচয় দিয়ে সব কথা খুলে বললেন। শুনে তাঁদেরও মনে আর কোন দুঃখ রইল না। রাজা তাঁদের নিয়ে নিজের দেশে চলে এলেন। এসে দেখেন, সত্যি সত্যি ব্রাহ্মণের ছেলে বেঁচে উঠেছে এবং ব্রাহ্মণ তাঁকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্য রাজসভায় এসে হাজির হয়েছেন।

এই রাজা কিন্তু আর কেউ ন'ন—স্বয়ং রাজা বিক্রমাদিত্য। *

* রাজা বিক্রমাদিত্যের একটি গল্প অবলম্বনে।

নানা কথা

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্

একটা খাবারের দোকান খোলা হয়েছে, তার মালিক কোনও জিনিষের দাম নিজে বলেন না। খদ্দেররা খেয়ে খুসী হয়ে তাদের মনের আনন্দে যা দেয়,

মালিক বলেন যে সেটাই হচ্ছে তার ন্যায্য দাম। শুনে তোমরা কি ভাবছ, বলব? আহা, ঠিকানাটা পেলে বেশ হ'ত, নয় কি? ঠিকানা দিচ্ছি,—পোঃ বেডফোর্ড, জিঃ ইণ্ডিয়ানা, আমেরিকা। 'আত্মিনাথের মেসো'-র ঠিকানার মত গোলমেলে নয়, কিন্তু দোষের মধ্যে একটু যা দূর!

* * * *

সুইডেনের ওকনা সহরে ক্যারোলিন কার্লসেন নামে একটী মহিলা সেদিন ৮৭ বছর বয়সে মারা গেছেন। তোমরা হয়তো তাতে আশ্চর্য্য হবে না, এ আর বেশী কথা কি? আমিও বলছি না যে এটাই আশ্চর্য্য। আসল মজাটা হচ্ছে এই, যে, তিনি ১৮৭৬ সনে, অর্থাৎ ১৩ বছর বয়সে, একদিন এক ঘুম লাগিয়েছিলেন, সেই ঘুম ভাঙ্গে ৩২ বছর পর, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। বেচারী বড় হবার সুখদুঃখ না জেনেই এক চোটে বুড়ী হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর শরীর কিছু খারাপ হয় নি, তার প্রমাণ তাঁর দীর্ঘায়ু।

* * * * *

উদ্যোগী জাত বলতে হয় বটে ওলন্দাজদের! তাদের ছোট্ট দেশটায় লোক অনেক, তাই তারা নতুন জমি যোগাড় করে সাগর ছেঁচে। অগভীর সমুদ্রের খানিকটা ঘিরে নিয়ে বাঁধ দিয়ে তার জলটা ছেঁচে বাইরে ফেলে দিলেই খানিকটা জমি পাওয়া যায়। বাঁধের ভিতরকার চাষবাসের জমিগুলি অবশ্য বাঁধের বাইরের সমুদ্রের জলের চেয়ে নীচু। এ রকম অনেক জমি থাকায় দেশটারই নাম হয়েছে 'নেদারল্যাণ্ডস্' বা নীচু-দেশ। আজকাল আরও সাড়ে সাতাশ লাখ বিঘে জমি এই উপায়ে সমুদ্র থেকে দখল করে নেবার চেষ্টা চলছে। এই সব জমি অসম্ভব উর্ব্বর হয়। 'চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাহি ত্রিভুবনে।'

* * * *

ওলন্দাজদের কথায় তাদের প্রতিবেশী দিনেমারদের কথা মনে হ'ল। তাদের দেশের রাজধানীর নাম কোবেনহাউন, ইংরেজী বইয়ে যাকে বলে কোপেনহ্যাগেন। সেই কোবেনহাউনের কাছে আজ প্রায় ত্রিশ বছর হ'ল একটী মজার সহর তৈরী হয়েছে, তার নাম De Gamles By (ডি গ্যাম্‌লেস্ বী?), অর্থাৎ বুড়োদের সহর। কেন না এখানে যে ১৬০০ লোক থাকতে পায় তারা সবাই সরকারী চাকরী থেকে পেন্‌সন-পাওয়া বুড়ো। ষাটের নীচে বয়স সেখানে কারু নেই, নব্বই—পঁচানব্বইও আছে। গড়ে রোজ দু'জন মারা যায় এদের মধ্যে,

সেই দু'টো জায়গা ভর্ত্তি করা হয় নতুন দু'জন বুড়ো এনে। এখানে লোকে শুধু মরেই, কিন্তু জন্ম আর বিয়ের বালাই নেই। সহরে বুড়োদের জন্য দোকান, পার্ক, আড্ডা—কিছুরই অভাব নেই। আর সবচেয়ে তাদের পক্ষে যা দরকারী সেই হাসপাতালের তো খুব ভাল রকম ব্যবস্থাই আছে। এ সব সুবিধে দেখে আরও বারোটী বুড়োদের সহর কোবেনহাউনের আশপাশে তৈরী হচ্ছে, কেন না কোবেনহাউনে পেন্‌সন-পাওয়া বুড়োর সংখ্যা প্রায় ৪২০০০।

* * *

বুড়োদের যেমন, ছোট ছেলেদেরও তেমনি সহর আছে ফ্রান্সে, ইটালীতে।

হিন্দী দোঁহা

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম.এ, বি.এস্-সি

গত চৈত্র মাসের রামধনুতে তোমাদের কয়েকটি হিন্দী দোঁহার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলাম। আজ আর কয়েকটি শোন। দোঁহাগুলির অর্থ সুন্দর এবং হিন্দী শিখিবার পক্ষেও এগুলি কিছুটা কাজে আসিবে।

"হরিকে হরিজন বহুত হৈঁ,
হরিজনকো হরি এক;
শশীকে কুমুদন বহুত হৈঁ,
কুমুদন কো শশী এক।"

অনুবাদ:—হরির হরিজন বহু আছে, হরিজনের হরি এক। শশীর কুমুদ বহু আছে, কুমুদ ফুলদের শশী এক।

"তুলসী পিঁদনে হরি মিলে তো
মৈঁ পেঁদে কুঁদা ঔর ঝাড়;
পথর পূজনে হরি মিলে তো,
মৈঁ পূজে পাহাড়।"

অনুবাদ:—তুলসী (মালা) পরিলে যদি হরি মিলে তবে আমি বড় বড়

তুলসীর ঝাড় ও গোড়া পরিব। পাথর পূজিলে যদি হরি মিলে তাহা হইলে আমি পাহাড়কে পূজা করিব।

"নিত নাহসে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই,
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বাহুড় বন্দরাই।
দুধ পিকে হরি মিলে তো বহুৎ বৎসবালা ;
মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।"

অনুবাদ :—নিত্য স্নান করিলে যদি হরি মিলে তবে আমি জলজন্তু হইব। ফলমূল খাইলে যদি হরি মিলে তবে তো অনেক বাহুড় ও বাঁদর আছে। দুধ পান করিলে যদি হরি মিলে তো অনেক গোবৎস বা বালক আছে। মীরা কহে বিনা প্রেমে নন্দলালকে পাওয়া যায় না।

অসমভূমি

কুমারী দীপালি সেনগুপ্তা

এখানে আকাশ আলোয় ধোয়া,
নীলিমায় ঝরে স্নেহের ছোঁয়া ;
এখানে ঝর্ণা হরষোজল
মুক্তা ছড়ায়ে ঝরে উছল,
এই যে আমার জনমভূমি—
—অসমভূমি।

এখানে নীল দিগন্ত ঘিরে
গিরিমালা রয় উচ্চশিরে ;
শিখরে শিখরে ছড়ায় হাসি
প্রভাতী সোনালী আলোর রাশি
নীল আকাশের আঁচল চুমি'—
—অসমভূমি।

পুলক-পরশ জাগায় প্রাণে
সবুজ ধানের ক্ষেতের গানে ;
হাসি ঝলমল্ সোনার রোদে
চল-চঞ্চল উজল নদে
মাধুরী তোমার প্রকাশ' তুমি,
—অসমভূমি।

চাঁদিনী নিশীথে মুগ্ধ প্রাণে
জোৎস্নার ধারা স্নিগ্ধ স্নানে
সুনীল আকাশ, শ্যামল ধরা
নীরব শান্ত স্বপন-ভরা,
রাত্রির স্নেহপরশে ঘুমি'
—অসমভূমি।

দু'পিঠ

এ. এস. নূর মোহাম্মদ

পৃথিবীকে ভাল করে দেখেছ কি কেউ
সুখে-দুখে গড়া এই পৃথ্বী মোদের ?
কূলের হদিসও দেয়, মরণের ঢেউ—
চোখ খুলে দেখেছ কি কেউ রূপ এর ?
হাসি আর পাখী আর ফুল আর গান
তবু, ভাই, কুশ্রী এ পৃথিবীর রূপ—
খুশীর জোয়ার সাথে অশ্রুরও বান
আসে হেথা ; আছে কাঁটা, আছে খানা, কূপ।
কালো আর আলো আর ঝড় ও মলয়
হাসি গান রোগ শোক দুঃখ অশেষ,
সঞ্চয় ও নিঃস্বতা আর অপচয়—
দুঃখেরও মাঝে রয় হাসি-সুখ রেশ।
হেথা চাঁদ, ও-পাশেতে রাহুর বিকাশ,
হেথায় আঁধার রাত, হোথা উজ্জ্বল,
সকল পাওয়ার হাসি, না পাওয়ার শ্বাস,
মরণের নীরবতা—প্রেমে উচ্ছল।
যুদ্ধ ও মহামারী, হিংসা ও দ্বেষ—
ছেয়ে গেছে পৃথিবীটা—মরো আর মারো,
চারিদিকে এরিসের উন্মাদ বেশ
বাঁচানোর পন্থা ও মন নাই কারো।
বঞ্চনা, অভিশাপ, ছল-আবরণ,
জোর-জুলুমের রথ চলে দিনরাত,
হানাহানি মারামারি চলে অনু'খণ
এ সব থামাতে কেউ তুলছে না হাত !
মিছে এর কিছু নয়, সবি সত্য,—
বন্ধন হেথা দৃঢ়, ভাঙ্গবারও ঢের,
বেশী খেয়ে মরে—কারো নাই পথ্য,
পৃথিবীটা অদ্ভুত রূপ ভাই এর।
ধ্বংস ও ভাঙ্গনের মাঝে তবু সব
বেঁচে আছে তেমনিই—সেই পাখী, ফুল,
দুঃখেরও মাঝে তাই করি অনুভব
মলয় ও মধুমাস ফিরে—নাই ভুল।
গাছে গাছে কিশলয়—যূঁই-চামেলী,
ঘরে ঘরে কচিমুখে শুনি কলরব—
ধরা 'পরে নবারুণ কিরণের কেলি
হারায় নি কোনটিই, বেঁচে আছে সব।

রায় পাহাড়ীর নিশাচর

শ্রীঅমলেন্দু সেন

১৭

রাজা অবনীনাথ মুখ তুলে কৃতজ্ঞভাবে হরিশের দিকে তাকালেন। এক মিনিট বিশ্রাম করে তিনি আবার বলতে লাগলেন ঃ

"হরিশ আমার জন্য যা করেছে তার তুলনা হয় না। সে লালুর ভার তো নিলই, তার ওপর আমাকে বললে যে রায়পাহাড়ীতে এসে লুকিয়ে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ হবে আমার পক্ষে। বাড়ীটা তো বন্ধই আছে, এখানে আমাকে খুঁজে দেখবার কথা কেউ ভাববেও না। আমারও মনে পড়ল যে এ বাড়ীতে লুকিয়ে থাকবার একটা ভাল জায়গা আছে,—একটা লুকানো সুড়ঙ্গ-পথ।

"সেই গুপ্ত সুড়ঙ্গের ভিতরে লুকিয়ে থাকাই স্থির করলাম।

"তখন লালুকে নিয়ে হরিশ গ্রামে ফিরে এল। ফিরে এসে সে আমারই কথামত রায়পাহাড়ীর রাজবাড়ীতে ভূতের উৎপাত হয়েছে ব'লে এমন করে রটাতে লাগল যে এ বাড়ীর আশেপাশে বাজে লোকের আনাগোনা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

"হরিশ আর লালু চলে আসবার মাসখানেক বাদে এক অন্ধকার রাত্রিতে আমিও কলকাতা থেকে চলে এসে এই বাড়ীতে ঢুকলাম। তার পরেই সুরু হ'ল আমার এই অমানুষিক জীবনযাত্রা। সারাদিন সুড়ঙ্গের মধ্যে থাকতাম, আর অন্ধকার রাত্রে কখনও কখনও বাইরের হাওয়ায় একটু বেরোতাম। মানুষের

মুখ দেখি নি বহুকাল, এক হরিশের ছাড়া। সে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে খাবার-টাবার দিয়ে যেত মধ্যে মধ্যে। খুব সাবধানে আসতে হ'ত বলে সে নিয়ম মত আসতে পারত না, তাই অনেক দিন না খেয়েও কাটাতে হয়েছে আমাকে।

"ভাবনায়, অনাহারে আর অন্ধকারে একা বন্ধ থেকে থেকে আমি প্রায় পাগলের মত হয়ে উঠলাম। শরীর একেবারে ভেঙে পড়ল। কিন্তু একটা সঙ্কল্প আমি ঠিক রেখেছিলাম,—যতদিন না ধরণীর খুনীকে পাওয়া যায় ততদিন আমার ছেলেকে তার বাপের পরিচয় জানতে দেব না। সে যে জানবে যে তার বাবা একজন পলাতক খুনী আসামী, আর তাই ভেবে আমাকে ঘৃণা করবে এবং নিজে লজ্জা পাবে, এ ভাবনা আমার পক্ষে অসহ্য। তার চেয়ে বরং সে জানুক যে সে হরিশেরই ভাইপো, তার বাবার নাম অনাথবন্ধু দাস। বেলেঘাটায় আমি ঐ নামেই পরিচয় দিয়েছিলাম। গগনও সে কথাটা জানত।

"গগন অবশ্য আর বেশী কিছু জানত না। আমি কোথায় গেলাম, আমার ছেলেরই বা কি হ'ল, সে-সব কথা তাকে জানাই নি। তার অনেক বছর পর যখন লালুর মুখেই সে শুনল যে লালুর বাবার নাম অনাথবন্ধু দাস, সে হরিশের কাছেই মানুষ হয়েছে, আর তার বাবা তাকে কেবলমাত্র একটী মাদুলী দিয়ে গিয়েছে, তখন সে অনেক কথাই আন্দাজ করে নিতে পারল। তার পর লোভে পড়ে সে কি সয়তানী করেছে সে কথা আমি লালুর মুখে পরে শুনেছি।

"এদিকে এই নির্জ্জন পুরীতে একটী একটী করে আমার দিন, মাস, বছর কেটে যেতে লাগল। ধরণীর খুনের রহস্যও কিছু জানা গেল না, আমারও শরীর তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে আসতে লাগল!

"তার পর একদিন লালু আর রতন ভূত দেখতে এল এ বাড়ীতে। সেদিন তাদের দেখে ভূত যে নিজেই কি ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়েছিল তা তো আর তারা জানল না! অতি কষ্টে সেদিন পালিয়ে এসে সুড়ঙ্গে ঢুকি। খানিকক্ষণ পরে হরিশ এল, খাবার-টাবারের একটা পুঁটলী নিয়ে। তার কাছে শুনলাম যে যাকে দেখেছিলাম সে আর কেউ নয়, আমারই ছেলে লালু। কতদিন ভেবেছি যে একটীবার লালুকে যদি দেখতে পেতাম! কিন্তু যেদিন তাকে দেখলাম সেদিন কেউ কাউকে চিনলাম না।

"তার পর, ছ' সাতদিন আগেকার কথা। সেদিন সন্ধ্যার খানিক পরে মনে হ'ল যে এই ঘরের মধ্যে কে যেন সাবধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ তো হরিশ

নয়। সে এ সময়ে আসে না। আর তার পায়ের আওয়াজও এর চেয়ে ভারী। ভয়ে ভয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে পড়ে রইলাম সুড়ঙ্গের মধ্যে।

“শব্দটা ক্রমে যেন সুড়ঙ্গের মধ্যেই চলে এল। আঠারো বছরের মধ্যে আমার ছাড়া আর কারও পায়ের আওয়াজ শোনা যায় নি এই গুপ্তপথে। এ তবে কে? পুলিস? না, এতদিনে সত্যিই ধরণীনাথের প্রেতাত্মা ফিরে এসেছে?

“ভয়ে আমি আর নড়তে পারলাম না, খালি চোখ মেলে রইলাম অভিভূতের মত। হঠাৎ দেখি……

“অন্ধকারে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে একটা ছায়ামূর্ত্তি

“দেখেই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।”

১৮

এক সঙ্গে অতখানি কথা বলে রাজা অবনীনাথ যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। লালু তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে হাওয়া করতে লাগল তাঁকে। আমি অবাক্ হয়ে লালুকে দেখতে লাগলাম। কামারের ঘরের ছেলে বলে যাকে জানতাম, আসলে সে কিনা রায়পাহাড়ীর রাজপুত্র! আজ তাতে আমাতে কত তফাৎ হয়ে গেল!

এমন সময় একটী লোক ঘরে ঢুকল। তাকে এখানে দেখব, এ কথা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নি।

সে হচ্ছে মামার হারানো চাকর রঘু।

আশ্চর্য্য হয়ে মামা বলে উঠলেন, “এ কি! রঘু এখানে?”

তাঁকে নমস্কার করে রঘু বললে, “আজ্ঞে হ্যাঁ! আমিই। যদি অনুমতি দেন, তা হ’লে এইবার আমার কথাটা সব বলি।”

তার পর রঘু সুরু করল তার নিজের কাহিনী:

“আমাদের দেশ ছিল এই রায়পাহাড়ীরই কাছে এক গ্রামে। ছেলেবেলায়ই আমার মা মারা যাওয়ায় রইলুম কেবল বাবা আর আমি। কোনও একটা ব্যাপার নিয়ে বাবা ধরণী বাবুর বিষ-নজরে পড়েন। বাবাকে অনেক ভাবে কষ্ট দেন ধরণী বাবু। তার পর একদিন রাত্তিরে আমাদের ঘরে আগুন লাগে। বাবা তাতে পুড়ে মারা যান।

“ধরণী বাবুর এই অত্যাচারের শোধ নেব, এই ঠিক করে আমি এসে তখন এ বাড়ীতে চাকরের কাজ নি। ধরণী বাবুকে কবে হাতের মুঠোয় পাব সেই অপেক্ষায় রইলুম। তাঁকে খুন করতে না পারা পর্য্যন্ত আমার জ্বালা মিটবে না।

“এরই মধ্যে একদিন আমি সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়ে গেলুম। ঐ যে বড় আলমারীটা দেখছেন, ওটা পরিষ্কার করতে গিয়ে একদিন হঠাৎ টের পেলুম যে ওর পিছনেই একটা গুপ্তপথের দরজা আছে। তার পর একদিন এক ফাঁকে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঘুরে দেখে এলুম যে সেটার আর এক মাথা গিয়ে শেষ হয়েছে রায়পাহাড়ীর জঙ্গলের মধ্যে একটা পোড়ো মন্দিরে।

“অনেক দিন অপেক্ষা করতে হ’ল আমার সুযোগের জন্য। তার পর একদিন ধরণী বাবু রায়পাহাড়ী এলেন, রাণীমার শ্রাদ্ধের সময়। তাঁর মালপত্র আমি এনে এই ঘরেই তুললুম, যাতে তিনি আমার মুঠোর মধ্যে থাকেন।

“ঘটনার দিন সকালবেলাই আমি রাজাবাহাদুরের শিকারের সরঞ্জামের মধ্যে থেকে তাঁর ছোরাখানা সরিয়ে রেখেছিলুম। তার পর রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেলে সেই ছোরা নিয়ে এসে ঐ আলমারীর পেছনে সুড়ঙ্গের মুখে বসে রইলুম।

“ধরণী বাবু ঘরে এলেন। তার খানিক বাদেই এলেন রাজাবাহাদুর। আড়ালে বসে আমি তাঁদের কথাবার্ত্তা সব শুনলুম। তার পর রাজাবাহাদুর বেরিয়ে যেতেই আমি ঘরে ঢুকে পড়লুম।

“ধরণী বাবু এই টেবলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার পায়ের আওয়াজ পেয়েই তিনি চমকে চেয়ে আমাকে দেখলেন। আমিও লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে ছোরা চালালুম।

“কিন্তু ছোরা ধরণী বাবুর বুকে লাগল না। তিনি সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন বলেই হোক্, কিংবা আমার তখন মাথার ঠিক ছিল না বলেই হোক, ছোরা গিয়ে বিঁধল তাঁর কাঁধে। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডান হাতখানা একটা হাতুড়ির মত এসে পড়ল আমার রগের ওপর।

“বাপরে, সে কি ঘুঁষি! এক ঘুঁষি খেয়েই আমি চোখে সরষে ফুল দেখতে লাগলুম; তার পর ঘুরে পড়ে গেলুম মেঝের ওপর। তখন কি হ’ল তা আর জানি না।

“যখন জ্ঞান হ’ল তখন দেখি ঘরে কেউ নেই। ঘরের এখানে-সেখানে রক্তের দাগ। আমার মাথাটা তখনও ভোঁ ভোঁ করছে। আস্তে আস্তে উঠে সুড়ঙ্গ দিয়ে বাইরে চলে গেলুম। কি হয়েছে তা কিছুই বুঝতে পারলুম না, বেজায় ভয় করতে লাগল।”

(ক্রমশঃ)

নতুন বই

মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান—১ম খণ্ড। ডাঃ দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ডি. এস্-সি ও অধ্যাপক জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্. এস্-সি প্রণীত। এ. মুখার্জ্জী এ্যাণ্ড্ কোং লিঃ, ২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২। দাম ৬॥০

এটি একটি পাঠ্যপুস্তক, কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এস্-সি পরীক্ষার পদার্থ-বিজ্ঞান অর্থাৎ ফিজিক্সএর পাঠ্য-অনুযায়ী লেখা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তক হ'লেও পথপ্রদর্শক হিসাবে রামধনুর পাঠকদের কাছে বইটি সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করছি।

কলেজে বিজ্ঞান শিখবার জন্য এ যাবৎ কাল আমরা বিদেশী ইংরেজী ভাষার সাহায্য নিয়ে আসছি। কিছু দিন হ'ল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আই. এ ও আই. এস-সি পরীক্ষায় ইংরেজী ভিন্ন অন্য সব বিষয়ের প্রশ্নপত্রের উত্তর বাংলায় লিখবার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্বেও দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য বিষয়ে যাই হোক, পদার্থ-বিজ্ঞান বা রসায়নে ছাত্রদের বাংলায় উত্তর দেবার তেমন আগ্রহ দেখা দেয় নি। গ্রন্থকার এর দু'টি কারণ নির্দেশ করেছেন—(১) বাংলায় বিজ্ঞানের বইএর অভাব (২) অধ্যাপকদের বাংলায় পড়ানো বা পরীক্ষা নেবার আগ্রহের অভাব। গ্রন্থকারদ্বয় এই দু'টি বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন—বিশেষ ক'রে ২য় কারণটির। অধ্যাপকদের আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ অমূলক তা তাঁরা প্রমাণ করেছেন। গত পাঁচ বছর প্রথম শ্রেণীর কলেজে বাংলায় পদার্থ-বিজ্ঞান পড়িয়ে তাঁরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছেন যে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে ছাত্রেরা অনেক সহজে এবং অনেক কম সময়ে ঐ বিজ্ঞানের দুরূহ অংশগুলি আয়ত্ত করতে পারে। পরিভাষা সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্যগুলিও যুক্তিপূর্ণ, এবং প্রথম দিকে বাংলায় বিজ্ঞান শিখলে পরে উচ্চতর গবেষণার সময়ে বিদেশী ভাষার সাহায্য নিতে অসুবিধা হবে—এ কথা যাঁরা বলেন তাঁদের যুক্তিও তাঁরা সুন্দর ভাবে খণ্ডন করেছেন।

এবারে বইখানি সম্বন্ধে বলি। গ্রন্থের ভাষা সরল এবং সাধুভাষায় যাকে বলে প্রাঞ্জল। পড়তে পড়তে কোথাও বাধা বোধ হয় না, বরঞ্চ অনেক জায়গায় পাঠ্যপুস্তকের নীরসতা ছাপিয়ে কৌতূহলেরও সৃষ্টি করে যথেষ্ট। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার দরুণ কোথায় ছাত্রদের বুঝতে কষ্ট হ'তে পারে সে বিষয়েও গ্রন্থকারদ্বয় খুব অবহিত মনে হ'ল। এমন একখানি সারবান্ গ্রন্থ রচনায় পথ দেখিয়ে অধ্যাপকদ্বয় বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

প্রথম খণ্ডে বলবিদ্যা, পদার্থের ধর্ম্ম, তাপ, কম্পন ও তরঙ্গ এবং শব্দ—পদার্থবিদ্যার এই ক টি বিভাগ দেওয়া হয়েছে। আমরা শীঘ্রই পরবর্ত্তী খণ্ড দেখবার আশায় রইলাম।

ছোটদের গোর্কির মা (২য় সংস্করণ)—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। দে ব্রাদার্স, ১৩।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২। দাম ১॥০

বিখ্যাত রুশ লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির লেখা 'মা' বিশ্বসাহিত্যের একখানি অমর গ্রন্থ।

খগেন্দ্র বাবু বাংলায় ছেলেমেয়েদের উপযোগী ক'রে তার ভাবানুবাদ প্রকাশ ক'রে বাঙ্গালী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বইটির একাধিক সংস্করণ এর জনপ্রিয়তার পরিচায়ক।

বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে খগেন্দ্র বাবু প্রথিতযশা। তাঁর অনুবাদ শুধু প্রাণপূর্ণ নয়, সাধারণ অনুবাদ থেকে এর স্বাতন্ত্র্য সহজেই চোখে পড়ে। ছেলেমেয়েরা আগ্রহের সঙ্গেই বইখানি গ্রহণ করবে। ছাপা-কাগজ ভালই, ছবিও আছে অনেক। মলাটের ছবিটি কিন্তু তেমন আকর্ষণীয় হয় নি।

আমাদের সংবাদপত্র বিভাগ

খেলার মাঠে

কলকাতার ফুটবল লীগ্ প্রায় শেষ হ'তে চলল। এখন পর্য্যন্ত, যত দূর মনে হয়, ১ম বিভাগে এবার মোহনবাগানেরই চ্যাম্পিয়ন্ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। তারা ২য় স্থান অধিকারী ইষ্ট বেঙ্গল দলের চাইতে ৩ পয়েন্ট এগিয়ে আছে।

প্রথম বিভাগের সকলের নীচে আছে ক্যালকাটা গ্যারিসন্ দল। তারা এখনও কোন পয়েন্ট দখল করতে পারে নি।

২য় বিভাগে সুপ্রসিদ্ধ ক্যালকাটা দলেরই চ্যাম্পিয়ন্ হবার সম্ভাবনা বেশী। উয়াড়ী দল তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

কিন্তু ফুটবল মাঠের গোলমাল ক্রমেই যেন বেড়ে চলেছে। খেলার দর্শক, ক্লাবের সদস্য, খেলোয়াড়, পুলিশ—এদের কারো না কারো মধ্যে গোলমাল যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন বিশৃঙ্খলা লীগের খেলায় আগে দেখা যেত না। ব্যাপার যে ভাবে চলছে তাতে লীগ্ প্রতিযোগিতা যদি শেষ পর্য্যন্ত অসমাপ্ত রয়ে যায় তা হ'লেও কিছু বলবার নেই।

আচার্য্য নলিনীমোহন

পরিণত বয়সে, শান্তিপুরের নিভৃত পল্লী-ভবনে ডক্টর নলিনীমোহন সান্যাল পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৯০ বছর পার হয়ে গিয়েছিল।

আচার্য্য নলিনীমোহনের কর্ম্মময় জীবন ছাত্রসমাজের আদর্শ বলা যেতে পারে। বিভিন্ন সরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক ও পরে পরিদর্শকের কাজে প্রতিষ্ঠিত থাকার পর তিনি সরকারী কর্ম্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু শিক্ষাজগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করার লোক তিনি ছিলেন না। তাই ৬০ বছর বয়সে আবার হিন্দী ভাষায় এম্. এ পরীক্ষা দিয়ে (এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে) তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগে অধ্যাপনা সুরু করেন। তার পর ৮৩ বছর বয়সে হিন্দী ভাষা সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে পি, এইচ্-ডি উপাধি লাভ করেন।

ডক্টর সান্যাল সাহিত্যক্ষেত্রেও সুপরিচিত ছিলেন। হিন্দী সাহিত্যে তাঁর খ্যাতি ছিল অসাধারণ। বাংলা এবং ইংরেজী ভাষাতেও তিনি

বহু বই লিখে গেছেন। তা ছাড়া নানা সাময়িকপত্রে তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁর এই সাহিত্যচর্চ্চা ক্ষান্ত হয় নি।

রামধনুকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন, এতে তিনি অনেকবার লিখেছেন। তাঁর অগণ্য ছাত্রদের মধ্যে রামধনু-সম্পাদকও একজন।

১৩৫০ সালের পৌষ মাসের রামধনুতে তাঁর জীবন কথা বেরিয়েছিল। যারা পড় নি তারা পড়ে দেখ।

চিঠিপত্র

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

অবশেষে বর্ষা এল—আমার প্রিয় ঋতু বর্ষা। বাইরে ঝমঝম্ ক'রে অবিরাম জল ঝরে চলেছে। কবির ভাষায়—"আজি অন্ধকার দিবা বৃষ্টি ঝর ঝর।" বাইরে বেরুবার তাড়া নেই, আর তা সম্ভবও নয়। রাস্তায় এক হাঁটু জল। তা ভেঙ্গে কেউ এসে বিরক্ত করবে তারও নেই আশঙ্কা। এখন রবীন্দ্রনাথের একখানি কাব্যগ্রন্থ হাতে ক'রে আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দেওয়ার মত মজা আর কি আছে বল? কাজেই চিঠি ছোট হ'লে আমায় দোষ দিও না।

শ্রীঅমলকুমার মিত্র (গৌহাটী)—তুমি ঠিকই ধরেছ, বিতর্ক-সভায় আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নি। যাই হোক্, তোমার এবং আর যে ক'টি লেখা পেয়েছি তাই দিয়েই স্থরু করে দেব ভাবছি। পুরস্কারের প্রস্তাবটি ভাল; ওটিও শীঘ্রই ঘোষণা করব। শ্রীরুণু বসু (কাঁচড়াপাড়া)—তোমার হিমাচল-ভ্রমণের কাহিনী শুনে হিংসে হচ্ছে। না, মুসৌরী, দেরাদুন আমি দেখি নি, তবে কাশ্মীরে ঘুরেছি। আর জলপাইগুড়ি আমার মামার বাড়ী, কাজেই দার্জিলীংএর সঙ্গে পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ। শ্রীরত্না দেবী (বাঁকীপুর)—ছবি পেয়েছি। কিন্তু ভাল কাগজ না হ'লে যে ছবির ওপর অবিচার করা হয়! খুব সম্ভবতঃ পূজা-সংখ্যায় ওগুলি দিতে পারব। শ্রীনমিতা দাম (গৌহাটি)—'কর্ত্তৃত্ব' কথাটা নিয়ে গোলমালে পড়েছ? কর্ত্তৃত্ব বলতে গৃহস্থালী তো বটেই, বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নীর যে সব কাজ করতে হয়—সবই বোঝাতে পারে। তোমার অনুবাদটি মনোনীত হয়েছে। শ্রীঅশোক চৌধুরী (নবদ্বীপ)—এক বছর পরে পরীক্ষা, তারই ভয়ে তুমি এখন থেকে সব কাজ বন্ধ রাখতে চাও! তোমার ২য় পত্রে তোমার দাদু এবং আমার পূজনীয় শিক্ষক ৺নলিনীমোহন সান্যালের পরলোক গমনের কথা শুনে তোমারই মত আমিও শোকাচ্ছন্ন। তাঁর কথা এবারে সংবাদপত্র বিভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীবিষ্ণুপদ রায় (বালিঘাই)—তোমার অনেকগুলি প্রশ্ন, আজ কয়েকটার জবাব দেই। ওকাপি আফ্রিকার জীব। দেখতে কতকটা জিরাফ আর কতকটা জেব্রা মেশান। এদের বংশ পৃথিবী থেকে প্রায় লোপ পেয়ে গেছে, বহু খোঁজাখুঁজি করে ক্বচিৎ কখনও একটি চোখে পড়ে। লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় একটি ওকাপি আছে। তোমার 'উদ্ধৃতি'গুলি ভাল কিন্তু কবিতাটিতে, ছড়া হলেও, ছন্দে ত্রুটী আছে। শ্রীমুকুলরাণী মণ্ডল (কলাড়িয়া)—প্রতিযোগিতার লেখা ১০ই শ্রাবণের মধ্যে 'পাঠাতে হবে' মানে ঐ তারিখের মধ্যে আমাদের হাতে পৌছান চাই। শ্রীমহামায়া মুখার্জি—তোমার 'টুনি পাখী' কবিতাটিতে ছন্দ ও মিল বেশ ভাল হয়েছে কিন্তু ওর গল্পটি যে বড় বেশী পরিচিত! শ্রীঅরুণ পোদ্দার—তোমার 'বলতে পার কে' বেশ ভাল হয়েছে। শ্রীসুরমা রায়—তোমার ভ্রমণ-কাহিনী "দাক্ষিণাত্যে" লেখাটিতে ব্যক্তিগত স্পর্শ না থাকায় একটু প্রাণহীন হয়ে পড়েছে। ভ্রমণ-কাহিনী আরও সরস হওয়া দরকার, নইলে ভূগোলের পাঠ্যপুস্তকের মত হয়ে যায়।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। জয় হিন্দ। ইতি—রাঃ সঃ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রতিযোগীদের ভোটে তালিকাটি এই রকম দাঁড়িয়েছে:—(১) বৈজ্ঞানিক (২) রাজনীতিজ্ঞ (৩) চিকিৎসক (৪) সৈনিক (৫) সাংবাদিক (৬) সাহিত্যিক (৭) শিল্পী (৮) দার্শনিক (৯) ঐতিহাসিক (১০) খেলোয়াড়।

এই তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি তালিকা পাঠানোয় পুরস্কার পেলেন: ১ম:—

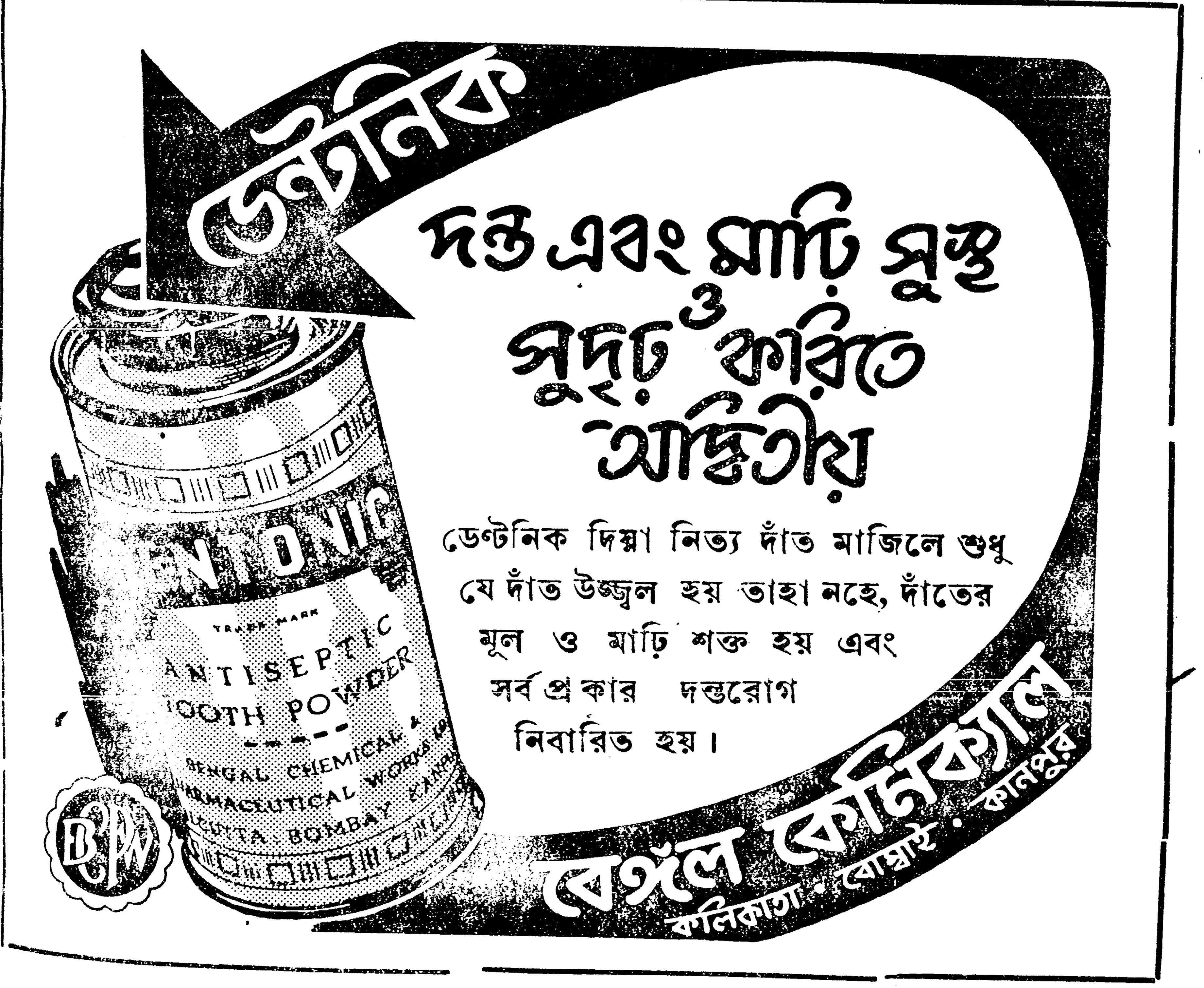

শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র (বালীগঞ্জ, কলিকাতা ১৯); ২য়—শ্রীনলিনী চৌধুরী (মেদিনীপুর)।

এ ছাড়া কুমারী রেখা চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা), শ্রীপ্রবালচরণ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), কুমারী ছবি মিত্র (মেদিনীপুর), কুমারী দীপ্তি সেনগুপ্তা (গৌহাটী), শ্রীশিপ্রা রায় (এলাহাবাদ) —এঁদের তালিকাও ঐ তালিকার কাছাকাছি হয়েছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

৪৭

উত্তরদাতাদের নাম: বাবুল মৈত্র (কাটিহার); সরিৎ দত্ত (গুড়াপ); বাবলু পাইন (ঘাটশিলা); দীপককুমার ধর (সোনালী—পূর্ণিয়া) ; জয়া, বিজয়া, ছন্দা রায় (আইজ্জটনগর); নমিতা দাম (গৌহাটী); বেণু ঘোষ (কাটিহার) ; সুশান্ত লাহিড়ী (ময়নাগুড়ি) ; বিভাস-বিহারী বসু (পাটনা); সন্তোষ সেন (কলিকাতা); মাণিক বসু (দিল্লী); সীতা ও নীতা লাহিড়ী (এলাহাবাদ); জ্যোৎস্না বটব্যাল (কানপুর ,; মৃগাঙ্ক চট্টোপাধ্যায় (কাশী); গণু, রণু ও বুড়ী (কলিকাতা ৬); নন্দা দাশগুপ্তা (বালীগঞ্জ); খোকা ও উমা (নয়াদিল্লী)।

নূতন ধাঁধা

অক্ষয় সেকরার কাছে একটা ১৩ ভরি সোনার পাত আছে। পাতটি সাড়ে ছয় ইঞ্চি লম্বা কিন্তু এমন ভাবে তৈরী যে সব জায়গায় সমান চওড়া, অর্থাৎ প্রতি ইঞ্চির ওজন সমান।

সেদিন কয়েকজন লোক এসেছে অক্ষয়ের দোকানে রূপো কিনতে। কেউ চায় এক ভরি, কেউ দুই ভরি, কেউ আরও বেশী। অক্ষয় ওজন করতে গিয়ে দেখে নিক্তির ওজনগুলি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খানিকটা ভেবে সে বল্‌ল, "আচ্ছা, আমি এই সোনা দিয়েই আপনাদের রূপো ওজন করে দিচ্ছি—এক ভরি থেকে ১৩ ভরি পর্য্যন্ত যে কোন ভরি ওজনের রূপো এ দিয়ে ওজন করা যাবে।" এই ব'লে সে সোনার পাতটিকে তিন টুকরো ক'রে কেটে ফেলল।

তোমরা বলতে পার, অক্ষয় টুকরোগুলি কোন্‌টা ক' ইঞ্চি ক'রে কাটল ?

এ মাসের নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

এ মাসের রামধনুর মুখপত্রে যে ছবিটি ছাপা হয়েছে সেটি দেখে একটি কবিতা বা প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে হবে। যার লেখা সব চেয়ে ভাল হবে সে-ই পুরস্কার পাবে। যে কেউ প্রতি-যোগিতায় যোগ দিতে পার, কিন্তু প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নীচের কুপনটি পূর্ণ ক'রে পাঠাতে হবে। লেখা ১০ই ভাদ্রের মধ্যে আমাদের কাছে পৌঁছান চাই। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত ব'লে ধরা হবে।

রামধনু

নাম

ঠিকানা

পু: প্র: শ্রা, ৫৮

এই মাত্র বাহির হইল

* বিশ্ব-পরিচয় *

বা

পৃথিবীর ইতিহাস

মূল্য আট টাকা মাত্র

মানুষকে পূর্ণতা অর্জ্জন ক'রতে হ'লে, পৃথিবীতে সুন্দরের অবিনশ্বর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে, তা'র জ্ঞানতৃষা তৃপ্ত করতে হবে এবং এই তৃপ্তির জন্য প্রথমেই পড়তে হবে পৃথিবীর বিভিন্ন কালের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির ইতিহাস বা **"বিশ্বপরিচয়"**...

পৃথিবীর সকল দেশের বিবরণ সহ পাঁচ শতাধিক একবর্ণ ও বহু বর্ণে চিত্রে সমৃদ্ধ ৬½"×১০" আকারে পাঁচশত পৃষ্ঠার এক বিরাট গ্রন্থ, আধুনিক গেটআপ সুদৃশ্য বাঁধাই।

*** মূল্য অগ্রিম পাঠাইয়া দিলে ডাক-মাশুল ***
লাগিবে না

* সদ্য প্রকাশিত ক'খানা বই *

কাউন্ট অব মন্টিকৃষ্টো (অনুবাদ)	১৷৹	ভগৎ সিং	৷৹
ডাঃ জেকিল এণ্ড মিঃ হাইড (অনুবাদ)	১৷৹	যুগলাঙ্গুরীয়	১৲
গল্পের মায়াপুরী (গল্পের সংকলন)	২৲	ব্যথার দান	১৲
আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট (জীবনী)	১৲	ডাকাতের মুখোমুখী	১৲
জনসেবক লেলিন (জীবনী)	১৷৹	মৃণালিণী	১৲

দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি ঝামাপুকুর লেন,
ফোন: বড়বাজার ৪৬৭, কলিকাতা ৯

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের		অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের	
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা	১৲	ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি	১৷৹
বিজ্ঞান-বুড়ো	১৲	পদ্মরাগ	১৷৷৹
আকাশের গল্প	১৷৹	সোনার হরিণ	১৷৷৹
আবিষ্কারের গল্প	৸৹	নূতন পুরাণ	৸৶৹
ধূমকেতু	৸৹	হাস্য ও রহস্য	৸৶৹
অয়েল পেন্টিং (নাটক)	৷৹	চায়ের ধোঁয়া	৸৹
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের			
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১৲	দমাদম্ দামোদর (নাটক)	৷৶৹

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি রসা রোড, কলিকাতা ২৫

ড,

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

সুকমারিত্বতায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

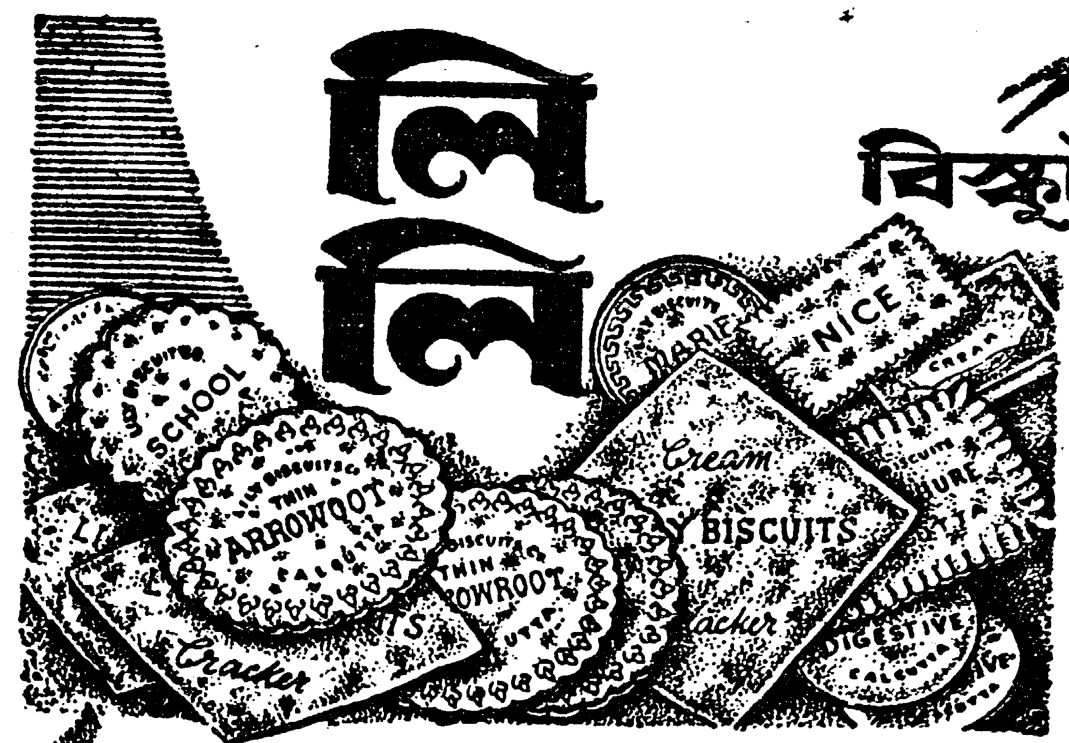

কয়েকটী মনোরম
ও
স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন ক্রীম,
ক্যাণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ

৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

রামধনু

সম্পাদক -- শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস-সি.

...বক ৪৲

...াসিক ২।০

...ত সংখ্যা ।৵০

কার্য্যালয় :

১৬, টাউনসেণ্ড রোড,

কলিকাতা ২৫

বড়দের প্রীতি-উপহারের

একখানি সেরা বই

কথাশিল্প

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়. অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রবোধ সান্যাল, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ বসু, সরোজ রায় চৌধুরী, গজেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী ও রাণী রায় প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকদের লেখা গল্প-সংগ্রহ। প্রত্যেক লেখকের রেখাচিত্র ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্বলিত। সুন্দর বাঁধাই, বিরাট বই।

মূল্য ৩৷৹

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড

১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫

৫০৲ পুরস্কার

গত ১৮।৭।৫১ তারিখে কৃষ্ণনগর রেল-ষ্টেশন হইতে একটি ১২।১৩ বছরের শ্যামবর্ণ, কালা, **বোবা ও হাবা** মেয়ে হারাইয়াছে। পুরুষ ছেলের মতন তাহার চুলছাঁটা, পরনে হাফ্‌প্যাণ্ট ও গায়ে গেঞ্জি ছিল। তাহার দুই চোখের মাঝখানে নাকের উপর একটি ব্রণের ছোট দাগ আছে। আশ্রয় অভাবে কোনও ভিক্ষুকের হাতে বা উহাদের দলে তাহার পড়িয়া যাওয়া সম্ভব। কোনও সদাশয় ব্যক্তি দয়া করিয়া নীচের ঠিকানায় তাহার সন্ধান দিয়া শোকার্তা জননীর প্রাণরক্ষা করিলে চিরবাধিত হইব। সেজন্য ৫০৲ পুরস্কার দিতেও স্বীকৃত আছি।

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

চাষাপাড়া, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মায়ের কাছে

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৪শ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৫৮ { ৫ম সংখ্যা

জোনাকী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জোনাকী ভাই, অন্ধকারে
ঘুরে ফিরে করছ কি?
মুক্তা মণি কুড়িয়ে নিয়ে
টাকার থলে ভরছ কি?
জোনাকী কয়, "সরিক মোরা
চিন্তামণির খনির তো,
তোমরা জানো আকাঙ্ক্ষী নই
মোরা মুক্তা মণির তো।
হরি যদি এই পথেতে
আসেন—চেয়ে থাক্‌ছি তাই,
চতুর্দ্দিকে আনন্দেতে
আলোর এলুন আঁকছি ভাই।"

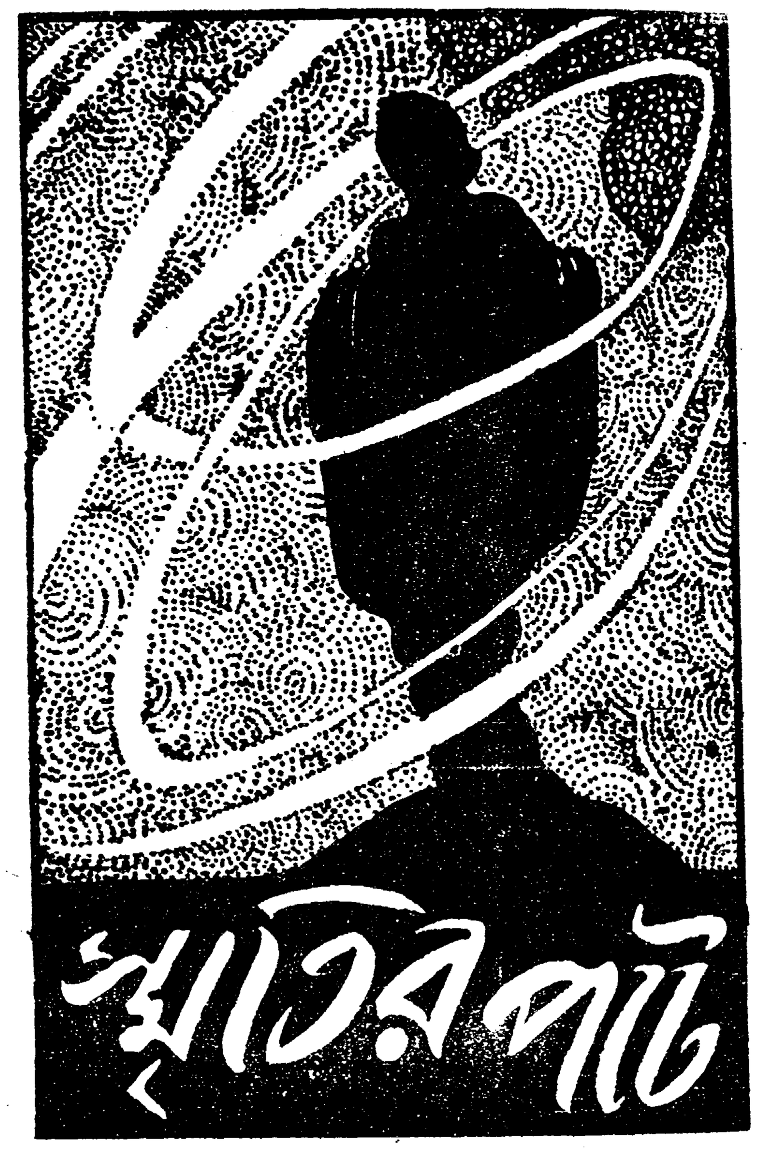

সেকালের গণক ঠাকুর

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আমাকে ছেলেবেলায় একটি বিষয়ে অত্যন্ত আনন্দ দিত, তাহা হইতেছে গণক ঠাকুর। সেকালে বিক্রমপুরে গ্রহাচার্য্যদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল। তাঁহারা দ্বিপ্রহরে যখন-তখন আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেন, 'দৈবজ্ঞদানে গ্রহদোষ শান্তি! কই গো, মা ঠাকরুণরা, বিদায় করুন!' গ্রহাচার্য্যদের গ্রীষ্মকালে মাথায় দিবার জন্য একটী ছাতা, অন্য সময়ে বগলে একটি লাঠি, উড়ানির মধ্যে ছোট একটি গামছায় জড়ান শীর্ণ-জীর্ণপত্র-শোভিত পঞ্জিকা। ইঁহাদের অনেকেই ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু কেহ কেহ বেশ লেখাপড়াও জানিতেন। এমনি আশ্চর্য্য যে দৈবজ্ঞের আহ্বানে কোন মা জননীই বিরক্ত হইতেন না, বরং তাঁহাকে সমাদরে বারান্দায় বসাইয়া বেশ মোটা রকমের সিধা দিতেন—চাল, ডাল, তরকারি; মাছ থাকিলে মাছ পর্য্যন্ত! তার পর গৃহিণী হাত দেখাইতেন। সধবা অবস্থায় মরিবেন কিনা, ছেলেরা বিদ্বান্ হইবে কিনা, অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে কি না, কর্ত্তার চাকরীতে উন্নতি হইবে কিনা, মেয়ের বিবাহ কবে হইবে, কেমন বর হইবে, ছেলেমেয়ের কোন ফাঁড়া আছে কিনা, শনি, রাহু ও মঙ্গলের প্রভাব কতটা, একাদশ বৃহস্পতি কবে উদিত হইবেন ইত্যাদি। চতুর গণক ঠাকুর অনেক বাক্যজালে সকলকে মুগ্ধ করিয়া উত্তম রূপে ফলার বা ভোজনপান সারিয়া বিশ্রামান্তর সন্ধ্যার একটু আগে গৃহাভিমুখী হইতেন।

আমাদের গ্রামের কয়েক মাইল দূরে ছিল ধামারণ গ্রাম। ধামারণ বোধ হয় 'ধর্ম্মারণ' নামের রূপান্তর। সেই গ্রামের একটি প্রকাণ্ড দীঘি দেখিয়াছি, তাহার চারি পাড়ে ছিল দৈবজ্ঞদের বাড়ী। আমাদের শৈশবে পণ্ডিত রাজমোহন বিদ্যানিধি,

গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি নামকরা জ্যোতিষীরা ছিলেন ঐ গ্রামের অধিবাসী। তাঁহাদের গণনার খ্যাতি ও পাণ্ডিত্যের কথা দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদের বাড়ীতে জ্যোতিষের কত যে পুঁথি ছিল, কত পত্রপাতি দেখিয়াছি তাহা এখনও মনে পড়ে।

এই সব গ্রহাচার্য্যেরা মূর্ত্তি গড়িতে ও চিত্র করিতে ছিলেন প্রসিদ্ধ। তাঁহারা অনেকে মূর্ত্তি গড়িতেন, নানা উৎসবের প্রয়োজনে কুলা, পিঁড়ি ইত্যাদি চিত্র করিতেন। দৈনন্দিন গৃহস্থের সুখ-দুঃখের, আনন্দ ও উৎসবের পরিবেশের মধ্যে তাঁহাদের একটা সহজ সুন্দর যোগ ছিল।

রাজমোহন জ্যোতিষের অদ্ভুত গণনার প্রত্যক্ষ আমি পরবর্ত্তী জীবনেও উপলব্ধি করিয়াছি। বাল্য ও কৈশোর-জীবনের এই সব নানা কথা মনে পড়িয়া আনন্দ অপেক্ষা কি জানি কেন দুঃখই হয় বেশী।

পরীক্ষার প্রয়োজনে

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি

চল্লিশ বছরের অধিক কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট-বড় পরীক্ষার পরীক্ষকের নানা কার্য্য করিয়া আসিয়াছি। অতএব পরীক্ষার সাফল্যের জন্য কি কি গুণ বা কৃতিত্ব প্রয়োজন সে সম্বন্ধে দু'-চার কথা রামধনুর পাঠকদের হয়ত কাজেই লাগিবে, ভাল না লাগিলেও।

হস্তাক্ষর: ভাল হাতের লেখা পরীক্ষার সাফল্যের জন্য প্রথম প্রয়োজন। এই হস্তাক্ষরের প্রথম গুণ হইবে "সহজপাঠ্যত্ব"। তদুপরি যদি সুন্দর ও সুশ্রী হয় তো সোনায় সোহাগা। পরীক্ষকদের অনেকেই বয়স্ক লোক। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক পরীক্ষকদেরও, অতিরিক্ত অধ্যয়নের দরুণ, অনেকেরই চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। উত্তরের খাতা হাতে পড়িলেই পরীক্ষক যদি কদর্য্য লেখা পান তো সেইখানেই তাঁহার মন পরীক্ষার্থীর প্রতি বিমুখ হইয়া পড়ে। আবার ভাল লেখা দেখিলেই ঠিক তাহার বিপরীত ভাব মনের মধ্যে উদিত হয়। রুষ্ট পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর দোষ দেখিবার জন্য উন্মুখ থাকেন এবং ভাল হাতের লেখাওয়ালার দোষসমূহকে যথা সম্ভব কম করিয়া দেখিবার তাঁহার প্রবৃত্তি হয়।

পরীক্ষায় ভাল হাতের লেখা কিরূপ হওয়া উচিত? লেখার অক্ষরগুলি বেশ স্পষ্ট, মোটা মোটা ও গোটা গোটা হওয়া প্রয়োজন। সরু নিবওয়ালা কলমে লেখা বর্জ্জন করিতে

হইবে। ফাউন্‌টেন পেন ব্যবহার করিতে হইলে মোটা নিবের পেন অভ্যাস করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা খুব বড় বড় হরফে লেখে, সরকারী কাগজ যত পারা যায় অপচয় করা যাউক ভাবিয়া প্রতি পৃষ্ঠায় তিন-চার ছত্র মাত্র লেখে, তাহারাও ঠকিয়া যায়। বেশী বড় লেখা মানেই বেশী বার কালি লইতে হয়। সময় নষ্ট হয়; হাতেরও অনেক বেশী সঞ্চালনক্রিয়া করিতে হয়, তাহাতেও সময় লাগে। আর পরীক্ষক যদি পরীক্ষার্থীর বক্তব্য বিষয় দু'-তিন পৃষ্ঠার মধ্যে পান তাহা হইলে তিনি তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। দশ-বারো পৃষ্ঠার পরে তিনি ভুলিয়া যান ছাত্রটি সব কথাই লিখিয়াছে কিনা। জ্যামিতি, অঙ্ক গণিত ও বিজ্ঞানের উত্তরপত্রে অল্প স্থানের মধ্যে উত্তর লিখিবার সুবিধা খুব বেশী। জ্যামিতির যদি একটি প্রতিজ্ঞা এক পৃষ্ঠায় শেষ করা যায় তাহা হইলে চিত্র দিবার দ্বিগুণ পরিশ্রম—দ্বিগুণ সময় নষ্ট করিতে হয় না। জ্যামিতির ও অঙ্কের সমস্ত পদ্ধতিটি পরীক্ষকের নখদর্পণে থাকিয়া যায়, তাঁহার পরিশ্রম লাঘব হয়। ছাত্রের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি উদ্রিক্ত হয়।

সে যুগের মেধাবী ছাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়

তাহা হইলে ব্যাপারটা দাঁড়াইল এই: হস্তাক্ষর বেশ স্পষ্ট করিতে হইবে। অক্ষরগুলি খুব ছোটও হইবে না, খুব মোটাও হইবে না। লাইনগুলি খুব ঠাসও হইবে না, খুব ছড়ানও হইবে না। সরু কলম ও সরু নিব ব্যবহার করিবে না, মোটা নিব ব্যবহার করিবে। ফাউন্‌টেন পেন হইলে মোটা নিবওয়ালা পেন লইবে। জ্যামিতি, বিজ্ঞান ও ভূগোলে যথা সম্ভব চিত্র ও ম্যাপ ব্যবহার করিবে।

উত্তরপ্রদান প্রণালী: কি রকম উত্তর লিখিলে সব চেয়ে বেশী নম্বর পাওয়া যায় তাহা বলা শক্ত। এক রকম ভাল ছেলেরা বেশ সাজাইয়া লেখে। ক, খ বা ১, ২ করিয়া উত্তরের অংশগুলি সুশৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া লেখে। প্রধান বাক্য বা শব্দগুলিকে নিম্নরেখাঙ্কিত (ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'আণ্ডার লাইন্‌ড্') করে। ইহারা পরীক্ষকদের কার্য্য বেশ সুগম করে, ভাল নম্বরও পায়। আর এক প্রকারের ভাল ছেলে আছে যাহারা এ সব কিছুই করে না, সাপ্টা লিখিয়া যায়। তাহারাও কিন্তু ভাল নম্বর পায়। তাহাদের ভাষার পদ্ধতি বা 'ষ্টাইল' মনোহর। যাহা লেখে তাহার অর্থ সহজেই বোঝা যায় এবং সুন্দর ভাষার জন্য সাপ্টা লেখাও পড়িতে কষ্ট হয় না। ছেলেদের নিজেদের ভাষার চেয়ে পাঠ্যপুস্তকের ভাষাই যে ভাল হয় সে বিষয়ে

সন্দেহ নাই। ভাল ছেলেরা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া পাঠ্যপুস্তকের ভাষাকে নিজায়ত্ত করে। এ জন্য তাহাদের লেখা ভাল হয়।

এ বিষয়ে একটা মজার গল্প চলিত আছে। গল্পটি আশুতোষ সম্বন্ধে। ঠিক সত্য কি না বলিতে পারি না, কারণ মহাপুরুষদের সম্পর্কে অনেক লোকে বানানো গল্পও প্রচারিত করে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধীয় সমিতিতে এক সাহেব অধ্যাপক পরীক্ষক একটি ছেলের সম্বন্ধে মন্দ মন্তব্য করিলেন—ছেলেটি বই দেখিয়া লিখিয়াছে, অতএব তাহাকে ফেল করানো হউক। আশুতোষ প্রমাণ চাহিলেন। সাহেব অধ্যাপক বলিলেন, এর লেখা হুবহু পুস্তকের সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে। বই দেখিয়া না লিখিলে এরূপ মিল হইত না। আলোচনাটা ইতিহাসের উত্তর সম্বন্ধে। আশু বাবু বলিলেন, শুধু এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ছেলেটিকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না। সে মুখস্থও লিখিয়া থাকিতে পারে। সাহেব বলিলেন, এত পাতা হুবহু মুখস্থ রাখা অসম্ভব। আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে, তাঁহারা যে ইতিহাস-পুস্তক অনেক বছর আগে পড়িয়াছিলেন তাহা, আনাইলেন। ঐ পুস্তকের অধিকাংশ স্থানই যে তাঁহার কিরূপ মুখস্থ তাহার পরিচয় দিলেন। ছেলেটি রক্ষা পাইল।

ছাত্রদের বন্ধু আশুতোষ

পাঠপ্রণালী: প্রাচীন কালে অধিকাংশ জ্ঞান শুনিয়া শুনিয়াই আহরিত হইত। বর্ত্তমান কালে চক্ষুই জ্ঞানার্জ্জনের প্রধান উপায়। পাঠ করিয়াই আমরা বেশী শিখি। অনেক ছেলে ক্লাসের পড়ায় মন দেয় না, ভাবে, 'বাড়ীতে বই পড়িয়া সব ঠিক করিয়া লইব'। তাহাদের প্রথম লোকসান—ক্লাসের ঘণ্টাটায় তাহারা কিছুই শিখে না। শুধু পড়িয়া শিখিতে গেলে চক্ষুর উপর পীড়ন করা হয়। আর ২য়—পুস্তকের সকল স্থানই সমান প্রয়োজনীয় নয়। অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা জানেন কোন্ স্থান বেশী এবং কোন্ স্থান কম প্রয়োজনীয়। এ জন্য যে সব ছেলে ক্লাসের পড়ায় মন দেয় তাহারা সহজেই পাঠ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় অংশ বুঝিতে পারে।

লাল-নীল পেনসিলের ব্যবহার: প্রয়োজনীয় ও অল্প প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য বর্ত্তমান যুগের মুদ্রিত পুস্তকাদিতে—বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মপটু (প্র্যাক্‌টিক্যাল্) দেশ আমেরিকায় ছোটবড়, বাঁকা নানাবিধ অক্ষরের

ব্যবহার চলিতেছে। পাঠকালে লাল, নীল পেনসিলের ব্যবহারও একই কার্য্য সাধন করে। পাঠশ্রম সংক্ষেপ করিবার ইহার মত সুন্দর উপায় নাই। অতএব ছাত্রদিগকে অল্প বয়স হইতেই প্রয়োজনীয় পাঠ্য বিষয়সমূহকে লাল, নীল দাগের নানাবিধ চিহ্নে চিহ্নিত করিতে শিখিতে হইবে। অনেকে ভাবে, দাগ কাটিলে পুস্তকের নূতন ভাব নষ্ট হয়। কিন্তু পুস্তকের প্রয়োজন বিদ্যার্জ্জনের জন্য। এতদর্থে উহার প্রতি প্রয়োজন হইলে নির্ম্মম হস্তক্ষেপেও আপত্তি করা উচিত নহে। নিজ প্রয়োজন মত দাগ দিবার পদ্ধতি ঠিক করিতে হইবে। প্রয়োজনীয় অংশের পাশে বা তলায় একটা নীল দাগ। তার চেয়ে প্রয়োজনীয়ের পাশে লাল দাগ। আরও বেশী প্রয়োজনীয়ের উপর দু'টী দাগ ইত্যাদি।

পুস্তকের পাতায় পতাকা সংস্থান : কয়েকটি ছেলেকে ডাকিয়া তাহারা কত সহজে অভিধান হইতে শব্দ বাহির করিতে পারে তাহা পরীক্ষা করা কৌতূহলজনক ও প্রয়োজনীয় ব্যাপার। যাহাতে অল্প সময়ে শব্দ বাহির করা যায় তজ্জন্য আমেরিকান অভিধানগুলিতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশকের (থাম্ব ইন্‌ডেক্স) ব্যাবস্থা আছে। অভিধান খুলিবা মাত্র উহার কোথায় A, N প্রভৃতি আছে তাহা সামনে দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব শব্দ খুঁজিবার সময় বেশ সংক্ষেপ হয়। আমি বাংলা ও সংস্কৃত অভিধানের পাতায় আঠা দিয়া ক, চ, প প্রভৃতি বর্গের প্রথমেই পতাকা দিয়া দেখিয়াছি উহাতে বেশ সত্বর কথা বাহির করা যায়। একটি ভাল ছেলের এক মোটা বইয়ের পাতায় ঐ রকম পতাকা আঁটা দেখিয়াছিলাম। ছেলেটি বলিল, ইহাতে সে অনেক কম সময়ে প্রয়োজনীয় বিষয় খুঁজিয়া পায়। পড়িবার বেশী সময় পায়।

মনস্তত্ত্ব : যখন মন ক্লান্ত থাকে তখন পড়িবার চেষ্টা বৃথা। যখন এক বিষয়ে মন নিবিষ্ট হইতেছে না তখন বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করা যায়। মন যখন ভাল থাকে তখন শক্ত ব্যাপারের কাজ করা উচিত। যেমন ক্লান্তি আসিতে থাকে তেমনিই ক্রমে ক্রমে লঘুতর বিষয়ে মন দিতে হইবে। একটা বিষয় বুঝিতে পারিতেছি না। সে বিষয়ে আর চেষ্টা না করিয়া কার্য্যে বিরত হও। মনের অন্তরালে একটি অন্তর্মন,—বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে বলেন 'সাব্‌কন্‌শাস সেলফ্‌'—থাকে। সে তোমার অজ্ঞাতে কাজ করিতে থাকিবে। পরদিন দেখিবে বিষয়টি স্পষ্ট হইয়াছে। স্মৃতির একটা নিয়ম—একটা কবিতা যদি একদিন কুড়িবার আবৃত্তির পর মুখস্থ হয়, তাহা প্রায় পাঁচ দিনে দশ আবৃত্তিতেই মুখস্থ হয়। অর্থাৎ অর্দ্ধেক প্রচেষ্টায়। কতকগুলি ঔষধের দ্বারা মনকে উত্তেজিত করিয়া কাজ করান যায়। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী ফল খারাপ হয়। তবে ঠিক পরীক্ষার দিন অল্পমাত্রায় চায়ের মত উত্তেজক ঔষধি ব্যবহার করা যাইতে পারে।

আহার-বিহার : পরীক্ষার্থীর কিরূপ আহার-বিহার হইবে তৎসম্বন্ধে গীতায় যোগীদের সম্বন্ধে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য।

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগ ভবতি দুঃখহা॥"

আহার ও ব্যায়াম বা পরিশ্রম পরিমিত হইবে। নিদ্রা ও জাগরণ পরিমিত হইবে।

পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার কালে ফুটবল ম্যাচ খেলা চলিবে না। রাত জাগিয়া পড়াও চলিবে না। গুরুতর ভোজ খাওয়াও চলিবে না। লোকের সহিত কলহ করা চলিবে না। অন্তরে ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ পোষণ করা চলিবে না। আর একটা মানসিক চেষ্টা করিতে হইবে—নিজেকে শুভ মন্ত্রণাদান—"অটো সাজেস্‌শন্‌"। 'আমি ভালই হইব' এইরূপ একটা দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। আমাদের দেশে ভগবানের প্রতি ভক্তি জাগ্রত করিয়া এই অবস্থা অর্পিত হইত। বৈষ্ণবদের একটি শ্লোকাংশ :—"রক্ষিষ্যতি বিশ্বাস গোপ্তৃত্বে বরণং তথা"—ভগবান্ রক্ষা করিবেনই, তাঁহাকে রক্ষাকর্ত্তা রূপে বরণ করিলাম—মনোমধ্যে এই ভাব স্থায়িত্ব করা।

মামা-ভাগ্নে সংবাদ

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

ম্যাট্রিকে ফেল্ করলো যেদিন নন্দ, সেদিন উঠলো মেতে—
বল্লে মামায়,—"এবার আমায় কল্‌কাতাতে হবেই যেতে।
সরস্বতীর চরণতলে শেষ প্রণতি জানিয়ে তবে
লক্ষ্মীমায়ের কৃপায় পথে চল্‌বো এবার সগৌরবে।
মামা, তুমি সঙ্গে চলো। দু'জন মিলে দোকান করি,—
হয়তো হঠাৎ উঠবো ফেঁপে, কিনবো দু'-চার মোটর-লরি।
বিমান পোত্‌ও কিনতে পারি সুযোগ মত, তখন গাঁয়ে
ফিরবো আবার কাশ্মীরি শাল চড়িয়ে গায়ে শীতের বায়ে।"

ভাগ্নে এবং মামা তখন রওনা হলেন রাতারাতি।
হাবড়া নামক ইষ্টিশনের হাজার কয়েক বিজলি বাতি
চতুর চোখে লাগায় ধাঁধা। কুছ্ পরোয়া নেইকো তা'তে,
ভাগ্নে-মামা চল্‌লো জামার পকেটগুলি সাম্‌লে হাতে,
চৌদ্দ-আনার পুঁজি নিয়ে। উঠলো সটান ধর্ম্মতলায়
একটী ছোট নিমকি-গজার দোকান-ঘরে। তীক্ষ্ণ গলায়

বল্লে মামা,—"এই দোকানী, দুইটি আনার দাও তো খাবার *
একটি ঠোঙায়।" মামার পরেই এগিয়ে এসে ভাগ্নে আবার
খাবার নিয়ে আরেক ঠোঙায় বস্‌লো খেতে দিব্যি সুখে,—
গরম গরম নিমকি-গজা টপাস্‌ ক'রে পড়লো মুখে।
অনেক দিনের ক্রেতা যেন খাচ্ছে হেথায় নিত্যি এসে,
খাবার খেয়ে মুখটি মুছে মামা আগেই চল্লো হেসে।
দোকানী কয়,—"দামটা, বাবু!" মামা অবাক্‌। বলেন, "সে কি!
দাম যে দিলুম নগদ তোমায়, তিনশত বার দাম নেবে কি?
ভাঙিয়ে নিলেম টাকাটি মোর, এই দ্যাখো তার চৌদ্দ আনা
পকেট মাঝে মজুত আছে; দাম দিতে হয় আছে জানা,
আমায় তুমি শেখাবে কি? নইকো আমি গেঁয়ো বাঙাল,
মাগ্‌না খাবার চ্যারিটি-বয়, হ্যাংলা নুলো, পথের কাঙাল।
রীতিমতো দাম দিয়ে খাই।" এই না ব'লে দোকানীটার
নাকের ওপর ধরলো মামা, তিনটে সিকি দুয়ানীটার
রিনিক-ঠিনিক আওয়াজ মৃদু বাজিয়ে দিলো। চমক লাগে
সতেরো জন খরিদ্দারের। অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব জাগে
সবার মনে। দোকানীটার দুই চোখে দুই ছানাবড়া!
মাথা নেড়ে তথাপি কয় বচন দু'-চার মিঠে-কড়া।

এমন সময় ভাগ্নে হঠাৎ ঠোঙা হাতেই উঠ্‌লো কেঁদে
একেবারে পঞ্চমেতে করুণ সুরে কণ্ঠ সেধে
আর্তস্বরে। বল্লে তবে,—"হেথায় যে মান যায় না রাখা,
চোখের সাম্‌নে ভদ্রলোকটি খাবার কিনে দিলেন টাকা
চৌদ্দ আনা ফেরৎ নিয়ে। দোকানী ফের জুলুম করে!
আমারি বা ভরসা কিসের? আমিও তো ওনার পরে
নগদ দামে খাবার কিনে খাচ্ছি ব'সে, আবার দেখি
দাম দিতে হয়! দোকান এটা, গাঁটকাটাদের আড্ডা এ কি!

* ১৯৩৯ সালের আগে দু'-আনায় ৮ খানা নিমকি বা গজা বিক্রি হ'তো।

খাবার খেয়ে জেলে যাবো? কপালে মোর এই কি ছিলো?"
সতেরো জন খরিদ্দারের ধন্ধ লাগে। হঠাৎ নিলো
নন্দলালের পক্ষ সবাই, উঠলো রুখে সমস্বরে—
"তাই তো বটে, তাই তো বটে, ছেলে-মানুষ কাঁপছে ডরে;
এতক্ষণে বুঝেছি এই দোকানদারের কারসাজিটা,—
এমনি করেই ঠকায় যতো খরিদ্দারে। কেবল মিঠা
বিজ্ঞাপনের কথায় ভুলে আমরা আসি। পাই নিকো টের—
নিত্যি সবাই দু'বার ক'রে দাম দিয়ে যাই। হয় তো নোটের
তাড়ায় ঠেসে কোটের পকেট ব্যাটা কেবল ওৎ পেতে রয়,
কখন কাহার ঘাড় ভাঙিবে! খোকন, তোমার নেই কোনো ভয়,—
সটান চ'লে যাও তো বাড়ী। দেখি তোমায় রুখবে কে'টা!
চালাকি নয়! দাম চাহিলেই ডজন সাতেক খড়ম-পেটা
করবো ওকে।" পথের পরে ভিড় জমে যায় হাজার লোকের;
"ব্যাপার কি হে, ব্যাপার কি হে?"—সবাই বলে। মুখের চোখের
ভাবটা কা'রোই নয় সুবিধা। হাতাহাতি লাগলো বুঝি!
সেই সুযোগে ভাগ্নে এবং মামা দু'জন সোজাসুজি
নাম্‌লো এসে সদর পথে, গলিয়ে মাথা ভিড়ের ফাঁকে
চল্‌লো রাতের শহর বেয়ে,—যেথায় চলে ঝাঁকে ঝাঁকে
ভাল্‌মানুষের নাতিপুতি। ফ্যালফেলিয়ে রইলো চেয়ে
দোকানীটা। ঘাম ঝরে তার কষ্টি-পাথর কপাল বেয়ে।

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

—পাঁচ—

একটা ঘোড়ায় শুধু মালপত্র বোঝাই করা ছিলো; রেড-ইণ্ডিয়ানদের উপহারের সামগ্রী আর ওদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামান্য যা কিছু। সেই ঘোড়াটা লাগাম ধরে নিয়ে যাবার ভার পড়লো হেনরির ওপরে।

তিনজন পাশাপাশি চলতে লাগলো। যে যার নিজের চিন্তায় বিভোর। ক্রুসো ডিকের পেছনে পেছনে ছুটে চলেছে। জো আর হেনরি পুরোনো শিকারী; তাদের কাছে এ ধরণের অভিযান নতুন নয়। রেড-ইণ্ডিয়ানদের কাছে তারা কেমন ব্যবহার পাবে, কী ভাবে তাদের সদ্ভাব লাভ করা যাবে, এই চিন্তাই বড় হয়ে তাদের মনে দেখা দিচ্ছিলো। রেড-ইণ্ডিয়ানদের চিন্তা ডিকের মনেরও অনেকখানি যুড়ে ছিলো সত্যি, কিন্তু এই প্রথম অভিযানের 'উন্মাদনায়—প্রকৃতির অপূর্ব্ব বন্য সৌন্দর্য্যে সে বিভোর হয়ে গিয়েছিলো।

কিছুটা পথ চলবার পর জো ঘোড়ার গতি কমিয়ে আনলো।

"থামছো কেন জো? চলো, আগের মতোই আরো খানিকটা পথ সবেগে ধেয়ে যাই।" —ডিক বললো।"

ওর কথায় হেসে জো ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিলো। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে আবার সে রাশ টানলো। ডিকও সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে বেগ কমাতে বাধ্য হ'লো। ডিকের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে জো বললো, "এ ভাবে ঊর্দ্ধশ্বাসে চললে ঘোড়াগুলো সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন আমরা মুস্কিলে পড়বো। তাই বলছি, একটু রাশ টানো।"

লজ্জা পেয়ে ডিক ঘোড়ার চলার বেগ কমিয়ে দিলো। কিছুক্ষণ চলার পর ডিক জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা জো, আমাদের সঙ্গে যা খাবার আছে তা কত দিন চলবে ব'লে মনে করো?"

"দিন দুয়েক। ততদিনে আমরা বেশ খানিকটা এগিয়ে যাবো। গ্রেট প্রেয়ারির বিস্তীর্ণ প্রান্তর এখান থেকে তিন সপ্তাহের পথ হ'লেও আমাদের বন্দুক যে ইতিমধ্যে কিছু শিকার সংগ্রহ করবে, এটুকু ভরসা নিশ্চয়ই ক'রতে পারি।"

"কিন্তু, যদি ধরো কোনো শিকার না জোটে?" ডিক বললে।

"কেন, তখন তো আমাদের ঘোড়াগুলো রয়েছে!" কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে হেনরি বললো।

"না, সত্যি জো, সে সম্ভাবনা কি আছে?"

"না, আমার তো মনে হয় কিছু না কিছু শিকার জুটে যাবেই। কিন্তু তা হ'লেও খুব জোর করে কিছুই বলা যায় না। তবে, এ পথে অজস্র হরিণ আর বাইসন পাওয়া যাবার কথা।"

"দেখ তো জো, ঐ দূরে উঁচু জায়গাটার কাছে! ঐ কালো মতো, ওটা একটা হরিণ না?" তাকে বাধা দিয়ে উত্তেজিত স্বরে ডিক বললো।

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ক'রে ভ্রূর ওপরে বাঁ হাত চাপা দিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করে জো বললো, হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে! যাও ডিক, এ সুযোগ নষ্ট ক'রো না।"

সঙ্গে সঙ্গে ডিক আর ক্রুসো সেদিকে ধেয়ে গেলো। কিছু দূর গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ডিক বললো, "তুই এখানে থাক্ ক্রুসো; আমার ঘোড়াটা ধর।" বলে লাগামটা ক্রুসোর মুখে দিয়ে ডিক ঝোপঝাপ ভেঙ্গে সন্তর্পণে এগিয়ে চললো। এ ভাবে খুব সাবধানে খানিকটা যাবার পর ডিক ঝোপ থেকে মাথা তুলে দেখলো, সেখান থেকে হরিণটার দূরত্ব প্রায় পাঁচ শ' গজ হবে। কিছু দূরে বাঁ-দিকে একটা পাহাড়ী ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে। যে ঝোপের অন্তরালে আত্মগোপন করে ডিক নিঃশব্দে অগ্রসর হচ্ছিলো তার প্রায় শেষ সীমানায় পৌঁছে গেছে সে। সামনে এখন কেবল সুদূরপ্রসারী ফাঁকা মাঠ; একটা গাছ পর্য্যন্ত নেই যার পেছনে লুকিয়ে থাকা সম্ভব। সামনে উঁচু ঢিবিটার ওপরে নির্ভয়ে চরছে হরিণটা। এত দূর থেকে গুলি করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বন্য পশুদের একটা স্বভাব ডিকের ভালো করেই জানা ছিলো। সে হ'লো ওদের কৌতূহল। এই কৌতূহল-বৃত্তি হরিণদের মধ্যে আবার সবার থেকে বেশী। এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিতে ডিক বিন্দুমাত্র দেরী করলো না। একটা শুকনো গাছের ডালের একদিকে তার রুমালটা পতাকার মতো করে জড়িয়ে নিজে ঝোপের অন্তরালে থেকে আস্তে আস্তে নাড়তে লাগলো সেটা। হরিণটার দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হ'তেই সঙ্গে সঙ্গে তার দু' কান খাড়া হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে সভয় পদক্ষেপে এই অদ্ভুত ব্যাপারটা কী তাই দেখবার জন্যে হরিণটা এগিয়ে আসতে লাগলো। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই পতাকাটা নেমে এলো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডিকের রাইফেলের অব্যর্থ সন্ধানে ধরাশায়ী হ'লো হরিণটা।

"সাবাস ডিক, সাবাস! রাতের খাওয়াটা আজ রীতিমতো জমবে দেখছি!" বলে হেনরি ঘোড়া ছুটিয়ে ডিকের কাছে এলো।

"যা বলেছো। আজ আর শুকনো মাংস খেতে হবে না। কিন্তু তোমার ঘোড়াটা কোথায় গেলো হে?" ঘোড়া থেকে নামতে নামতে জো জিজ্ঞাসা করলে।

"এখুনি এসে হাজির হবে।" বলে ডিক দু'টো আঙ্গুল মুখে পুরে দিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে শীষ দিয়ে উঠলো।

এই শব্দ ক্রুসোর কানে পৌঁছবা মাত্র সে হঠাৎ ঘোড়াটার পেছনের পায়ে সজোরে এক গোঁত্তা লাগালো। শান্তশিষ্ট ক্রুসোর এই অদ্ভুত ব্যাপারে ঘোড়াটা ভীষণ ভয় পেয়ে সবেগে ছুটতে লাগলো। ক্রুসো জানতো, ঘোড়াটাকে ভয় না দেখালে তাকে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে না। তাই সে এই অভিনব পন্থা অবলম্বন করলো। পাছে লাগামটা কোনো গাছে জড়িয়ে যায় সেই ভয়ে সে লাগামটাও মুখ থেকে ফেলে দিয়ে ছুটতে লাগলো ওর পেছু পেছু। ওদের কাছাকাছি আসতেই ক্রুসো আবার লাগামটা তুলে নিয়ে একটু একটু ক'রে ঘোড়াটাকে থামিয়ে নিলো।

"চমৎকার তোমার কুকুরটা, ডিক!" উচ্ছসিত স্বরে জো বললো।

"তবু তো তোমরা ক্রুসোর সম্পূর্ণ পরিচয় পাও নি। এ সব ওর কাছে অতি সাধারণ কাজ। পুরো দু' বছর ধরে আমি ওকে শিক্ষা দিয়েছি। একমাত্র বন্দুক ছোঁড়া ভিন্ন যে কোনো কাজ ও করতে পারে।"

"চেষ্টা করলে বোধ হয় বন্দুক ছোঁড়াও ওর পক্ষে অসম্ভব নয়।" বলে হাসতে হাসতে হেনরি ঘোড়া থেকে নামলো।

ইতিমধ্যে সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। জো ঠিক করলো সে রাত্রি এখানেই তাঁবু ফেলে আশ্রয় নেওয়া হবে। কাঠকুটো কুড়িয়ে উনুনের মত করা হ'লো। তারপর ঝর্ণা থেকে জল এনে মাংস চড়িয়ে দিয়ে আগুনের সামনে বসে শুরু হলো নানা রকম গল্প। ঘন অন্ধকার ততক্ষণে সেই আগুনের অপরিসর বৃত্তের বাইরের সব কিছুকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে।

ভোজনপর্ব্ব বেশ সুচারুভাবেই সমাধা হ'লো; এবার এলো চা আর ধূমপানের পালা। তারপর ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন তিনটে খুলে এনে পাশাপাশি রাখা হ'লো। খানিকটা ঘাসে-ঢাকা জায়গা বেছে নিয়ে সেই জিনে মাথা রেখে আগুনের কাছে শুয়ে পড়লো তিনজনে। আর ডিকের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়লো ক্রুসো। ক্রমে সবাই গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। কিন্তু ক্রুসোর ঘুম অত্যন্ত সজাগ; আগুনে কাঠ ফাটার সামান্য শব্দেও সে থেকে থেকে চকিত হয়ে উঠছিলো।

(ক্রমশঃ)

দিল্লীশ্বর ও পরমেশ্বর

শ্রীবিমলচন্দ্র সেন

প্রাচীন ভারতের গায়কশ্রেষ্ঠ তানসেন সম্রাট্ আকবরের সভাগায়ক ছিলেন। বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর সঙ্গীতে তাঁর নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ এবং সে সম্বন্ধে আশ্চর্য অনেক জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে। আকবর ছিলেন অত্যন্ত গুণগ্রাহী। এ বিষয়ে তাঁর কাছে উচ্চ-নীচ বলে কিছু ছিল না, হিন্দু-মুসলমানে কোন ভেদ-জ্ঞানও তিনি করতেন না। শোনা যায়, তানসেন তাঁর সন্ধ্যার বা রাত্রিকালের করুণ রাগিণী দিয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখে অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিতে পারতেন। সম্রাটের আনন্দের মুহূর্ত এবং বিষাদের ক্ষণগুলি তানসেনের সময়োপযোগী সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠতো। এই গীত-মন্ত্রের মূর্ছনায় কখনও কখনও তিনি ভাবাবেশে বাহ্য-জ্ঞানহারাও হয়ে যেতেন। তানসেনের ভক্তিমূলক ভজন-সঙ্গীতগুলি আকবরকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করতো।

একবার সম্রাট্ তানসেনকে নিভৃতে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—'আচ্ছা, তান, তুমি এমন সুমধুর ভজন-সঙ্গীতগুলি কার কাছে শিখলে?'

বিনয়-নম্র কণ্ঠে তানসেন উত্তর দিলেন—'সম্রাট্, আমি বড় বড় ওস্তাদের কাছে দীর্ঘকাল সাধনা করে অফুরন্ত সঙ্গীতবিদ্যার কতকাংশ আয়ত্ত করেছি; কিন্তু সর্বশেষে এমন একজন গুরুর সঙ্গলাভ করলাম, যাঁর কাছে থেকে আমি প্রথম বুঝতে পারলাম, প্রকৃত ভাব-সঙ্গীত কি! চোখের দৃষ্টি বাইরের দিকে নিবদ্ধ থাকলেও, ঐ ভক্তিমূলক ভজন-গীতি গাইবার সময় অন্তর্দৃষ্টি অন্তর্লোকে আবদ্ধ রাখতে পারলে তবেই তা গাইবার সার্থকতা বজায় থাকে।'

আকবর তানসেনের কথার সারবত্তা অন্তরে অন্তরে অনুভব করলেন এবং তাকে ধরে বসলেন যে তাঁর গুরুর গান তাঁকে শোনাতেই হবে। গুরু হরিদাস স্বামী আশ্রম ছেড়ে কখনও বাইরে যান না শুনে সম্রাট্ নিজেই রাজধানী ছেড়ে তানসেনের সঙ্গে সেই নির্জন আশ্রমপ্রান্তে যেতে আগ্রহান্বিত হলেন। তিনি বাজে কথা বলতেন না, তানসেনকে সঙ্গে নিয়ে একদিন সত্যিই সেই আশ্রমাভিমুখে রওনা হ'লেন। পরদিন অপরাহ্ণ বেলায় সেখানে পৌঁছে হরিদাস স্বামীর সঙ্গে দেখা করে ওঁরা সব-কিছু বললেন। ওঁদের ইচ্ছার কথা শুনে গুরু মধুর একটু হাসলেন। তারপর তাঁর ইঙ্গিতক্রমে তানসেন সম্রাট্ সহ ঠিক সন্ধ্যার সময় নদী-

তীরবর্তী আশ্রমের এক নিভৃত অংশে গিয়ে বসলেন। ধীরে ধীরে সূর্য অস্তমিত হ'লো।

অল্পক্ষণ পরে গুরুদেব সেখানে এসে মৃগচর্মে আসন গ্রহণ করলেন এবং একটু পরে তানসেন একটি উৎকৃষ্ট ভজন-সঙ্গীতযোগে গুরুর বন্দনা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ গান হবার পর গুরুদেবও তানের সঙ্গে গুণ্ গুণ্ করে ঐ গানটিই গাইতে সুরু করলেন। গানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণের মধ্যে গুরুর চোখে-মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করে তান নিজে গান বন্ধ করলেন, আর গুরুজি একাই গানটি গেয়ে চললেন। ক্রমে তাঁর মুখাবয়বে দিব্য জ্যোতিঃ ফুটে উঠতে লাগলো। বোঝা গেল, স্বামীজি ভক্তির উচ্ছ্বাসে এখন যেন দুর্লভ কিছুর সন্ধানে সঙ্গীতের আলোক-সাহায্যে পথ খুঁজছেন। সম্রাট্ মুগ্ধ—স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

রাজধানীতে ফিরে এসে পরের দিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে আকবর ঠিক সেই ভজন-সঙ্গীতটিই তানসেনকে গাইতে অনুরোধ করলেন। তানসেন আবার অপূর্ব তান-লয় সহকারে অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে সেটি গাইলেন।

সম্রাট্ তন্ময় হয়ে সে স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনলেন; তারপর খুব বিস্মিত হয়ে বললেন—'তান, তোমার গান অতীব চমৎকার হয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু তোমার গুরুজির গানে যে অনির্বচনীয় একটা অনুভূতি আমাদের হৃদয়ের কানায় কানায় ভরে উঠেছিল, এখন তো ঠিক তেমনটি হ'লো না! এর হেতু কি?'

অবনত মস্তকে বিনীতভাবে তানসেন বললেন, 'হ্যাঁ সম্রাট্, আপনার অনুমান সত্য। আমি আপনার সামনে সর্বদা এই ভেবে গাইছিলাম যে আমি মহাপ্রতাপশালী দিল্লীশ্বরের তৃপ্তির জন্য তাঁকে গান শোনাচ্ছি; কিন্তু গুরুদেব স্বীয় অন্তরে পরমেশ্বরকে ধ্যান করতে করতে তাঁর বন্দনা-গান করে সেই পরমেশ্বরকেই ভজন-সঙ্গীতটি পরম শ্রদ্ধাভরে উপহার দিচ্ছিলেন—তফাৎ মাত্র এইখানেই।'

সম্রাট্ চমৎকৃত হয়ে অতীব হৃষ্টচিত্তে সংক্ষেপে বললেন—'হাঁ তান, তোমার কথাই ঠিক, আমারও তাই মনে হচ্ছিল।'

"সকলেই আজ্ঞা দিতে চায়, আজ্ঞা পালন করিতে কেহই প্রস্তুত নয়। প্রথমে আজ্ঞা পালন করিতে শিক্ষা কর, আজ্ঞা দিবার শক্তি আপনা হইতেই পাইবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

আমাদের বন্ধু হাবুল

শ্রীঅজয়কুমার দত্ত

বিষ্টুদের বাইরের ঘরে আমরা ক'জন বসে আছি। একচোট আলোচনা আমাদের মধ্যে হয়ে গেছে যে পড়াশুনো করে 'কিস্সু' হবার নয়—এবার ভালয় ভালয় একটা চাকরী বাগাতে পারলে হয়। এ বিষয়ে আলোচনাটা কত মুখরোচক হয় তা সবাই জানে। এমন কি চার-পাঁচ বছর ধরে যারা এক ক্লাশেই রয়ে যায় তাদের কাছেও খোঁজ নিয়ে দেখতে পার—তারা নিশ্চয় ওর স্বপক্ষে ভোট দেবে এ কথা জোর করে বলতে পারি, ঐ চার-পাঁচ বছরের যে কোন দিনই হোক না কেন সে ভোট গ্রহণ।

সবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলে কি হবে, এই একটা সময় যখন মনে হয়, আহা, বেশ কিছুতে যদি ট্যাকটা ভারী থাকত!

তারপরে ঠিক সময় বুঝে যেন নিতাইটা আরো দাগা দিয়ে গেল। ক্লাস সেভেন পর্য্যন্ত পড়েই লেখাপড়া ছেড়ে একটা মোটরের কারখানায় ঢোকে ছেলেটা। আজকাল কি ষ্টাইলিশই না হয়েছে ছোকরা! রাস্তা দিয়ে যাবার সময় আবার আমাদের ডাক দিয়ে বলা হ'ল—'কি রে, বায়স্কোপে যাচ্ছিস না তোরা? যাবি ত' চল্, আমি দু'জনকে দেখাতে পারি। কিছু বাড়তি পয়সা আছে সঙ্গে।'

আমরা দলে তখন চারজন আছি। মনে মনে সবারই অন্য ইচ্ছা থাকলেও মুখে আমাদের বলতেই হ'ল বেশ জোর দিয়েই—'যা যা, আমরা বুঝি আর যেতে পারি না ভেবেছিস্?' বিষ্টু আবার বলে উঠল—'হাবুলের জন্য ওয়েট করছি আমরা, ও এলেই একসঙ্গে সবাই যাব।' বেশ বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারে বলে বিষ্টুকে আমরা প্রায়ই তারিফ করি।

তার পরেই আমরা বিষ্টুদের ঘরে এসে বসেছি। বলাই আর সুবোধ আর একবার সিনেমা যাবার কথাটা উঠিয়েছিলো—সত্যিই একখানা ভাল ইংরেজী ছবি এসেছিলো, আমরা সবাই জানতাম। কিন্তু আমি আর বিষ্টু কথাটা বেশী এগোতে দিই নি। আগের ছবিটা ওরাই দেখিয়েছিলো আমাদের, এবার আমাদের দু' জনের খরচ করার পালা।

বিষ্টু আবার লম্বা-চওড়া লেকচার ঝেড়ে বসল—'আজকাল যা সময় পড়েছে, বুঝলি, আমাদের আর বৃথা সময় কিংবা পয়সা কোনটাই অপব্যয়ে যেতে দেওয়া ঠিক নয়। যতদূর সম্ভব কৃপণতা দেখাতে পার এই দু'টির ব্যয়বহুলতা কমিয়ে ততই মঙ্গল। সে কথা তোমরাও মান নিশ্চয়ই, কি বল, মান না?' আমাকে বাদ দিয়ে ওদের দু'জনেরই ওপর বিশেষ নজর দিয়ে কথাগুলো বলা হয় তা আমি বুঝতে পারি।

ওরা দু'জনে চুপ করে থাকে, আর আমরাও ভাবতে থাকি আবার কি কথা ফাঁদা যায়।

এমন সময় হাবুলকে দেখা গেল বেশ হন্তদন্ত হয়েই রাস্তা দিয়ে আসতে। হড়বড় করে

ঘরটায় ঢুকে এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে ও এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলল যে আমাদের মনে হ'ল ও যেন একটু বাড়াবাড়িই করছে, নয়ত নিশ্চয় ও কিছু আর যুদ্ধজয় করে কিংবা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হয়েছে খবর নিয়ে ফিরছে না। তার পর কিন্তু সত্যিই সে সেই অনুপাতের কথা শুনিয়ে বস্‌ল যা আমরা কখনই আশা করি নি।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই : ঘণ্টাখানেক আগে হাবুল কি একটা দরকারে বাজারের দিকে যায়। ফিরবার সময় রাস্তার ওপর একটা ছেঁড়া মনিব্যাগ কুড়িয়ে পায় আর তার ভেতর থেকে বার হয় জলজ্যান্ত একখানা একশ' টাকার নোট। হাবুল পকেট থেকে ছিন্নভিন্ন এক মনিব্যাগ বার করে। এত ছেঁড়া আর পুরোনো সেটা যে হাবুল বলেই তার চোখে পড়েছে। রাস্তার অনেক লোক যে সেটা দেখেও দেখে নি তা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু তার ভেতর থেকেই হাবুল বার করে চোখ-জুড়ানো একখানা করকরে এক শ' টাকার নোট !

'এখন, কথা হচ্ছে, টাকাটা নিয়ে কি করা যায় ? তোমরা যদি সবাই বল তবে অবশ্য এর মালিককে খুঁজে বার করে টাকাটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়।' কথাটা বলে হাবুল একটু জমাবার চেষ্টা করে আর কি, নয়ত ওর মত ছেলের মুখে এ কথা বার হয় কি করে! কাজেই আমরা কেউ কান দিই না ও-কথায়।

আর কান দেবার মত অবস্থাও নয় তখন আমাদের। সবাই তখন পাল্লা দিয়ে ভীষণ ভাবে ভাবতে সুরু করে দিয়েছি। খেলার কথা কিংবা খেলো কথা নয়—অতগুলো টাকার ভাল রকম সদ্গতি দরকার। তাকে তো আর হাউই বাজির মত জ্বালিয়ে আকাশে উড়তে দিলেই হ'ল না, সাথে সাথে আমরাও যেন একটু উড়তে পারি তার ব্যবস্থা করতে হবে। ক'দিন আগে আমরা যে রাজগীরে একটা ট্রিপ দেবার কথা ভাবছিলাম, টাকার অভাবে যা বাতিল হয়ে যায়, সেটা করতে পারলে ত' মন্দ হয় না! কিন্তু পাটনা থেকে রাজগীরে যাওয়া-আসার টিকিটের দাম ত' মোটে দেড় টাকা। অত সস্তার মধ্যে যাবার ত' আর দরকার নেই। আরও দূরে, কাবুল কি কান্দাহারে গেলে কেমন হয় ? কিন্তু সেখানে বেড়িয়ে ফিরে এলে ত' আবার যে-কে সেই অবস্থা। পকেট শূন্য হয়ে গেলে কি আর কাবুল-কান্দাহারের স্মৃতি-কথা মনে থাকবে ? তার চেয়ে বিষ্টুর প্ল্যান অনুযায়ী সাইকেল মেরামতের একটা দোকান দিলে কেমন হয় ? বিষ্টুর মতে পাটনায় এত ভাল ব্যবসা আর হয় না ; অথচ নিজেদের আমাদের কিছুই করতে হবে না বলতে গেলে, কেবল লাভের টাকাটা ভাগাভাগি করে নেওয়ারই যা পরিশ্রম। বিষ্টুদের চাকরের ছোকরা ভাইটা দোকানে কাজ করতেও রাজী আছে, মাত্র কুড়ি টাকা মাইনেতে।

'কিন্তু এখন সিনেমায় গেলে হয় না ?'—বলাই হঠাৎ বলে ওঠে। আমার সন্দেহ হয় ও বোধ হয় ভাবছিল যে ক'দিন ধরে বায়স্কোপই দেখা যাক্। ৩টা, ৬টা, ৯টা—প্রত্যেকটা শো'এ বেদম ছবি দেখার মতলবই নিশ্চয় ভাঁজছিল ও। নাঃ, তাই যদি হয় তবে আমি আপত্তি করব। তবে এখন এই ম্যাটিনী শো'তে যাবার অবশ্য আপত্তি নেই একজনেরও। সঙ্গে সঙ্গে একটা কিছু করা দরকার এ কথাটা জরুরী বলে সবারই মনে হয়।

রাস্তায় নেমেই আমি প্রস্তাব করি 'ফিটনে গেলে কেমন হয় ?'

বলাই সায় দেয়—'ঠিক বলেছ। রাস্তাও কম নয়, এদিকে ম্যাটিনী শো'এর সময়ও প্রায় হয়ে এসেছে, হেঁটে গেলে অনেক দেরী হয়ে যাবে। একটা ফিটন ডাকা যাক্, কি বল হাবুল ?'

হাবুল ঘাড় নেড়ে সায় দেয় ; কি রকম যেন আনমনা ভাব ওর! বড়ই ভাবনায় পড়ে গেছে বেচারা অতগুলো টাকার মালিক হয়ে। নাঃ, ওকে যদি এই বিপদে সাহায্য না করি ত' আমরা আর বন্ধু কিসের ! মনে মনে সবাই দৃঢ়সঙ্কল্প হই।

ফিটনে যেতে যেতে ঠিক করা হয় সিনেমা দেখার পর বাজারে গিয়ে নোটখানা ভাঙিয়ে নিলেই চলবে। বিষ্টুর চেনাশোনা এক ভদ্রলোকের ওষুধের বড় দোকান আছে। সেখানে গেলেই কাজ হয়ে যাবে।

সিনেমা হলের সামনে পৌঁছে দেখি ছবি আরম্ভ হবার আর দেরী নেই। তাড়াতাড়ি

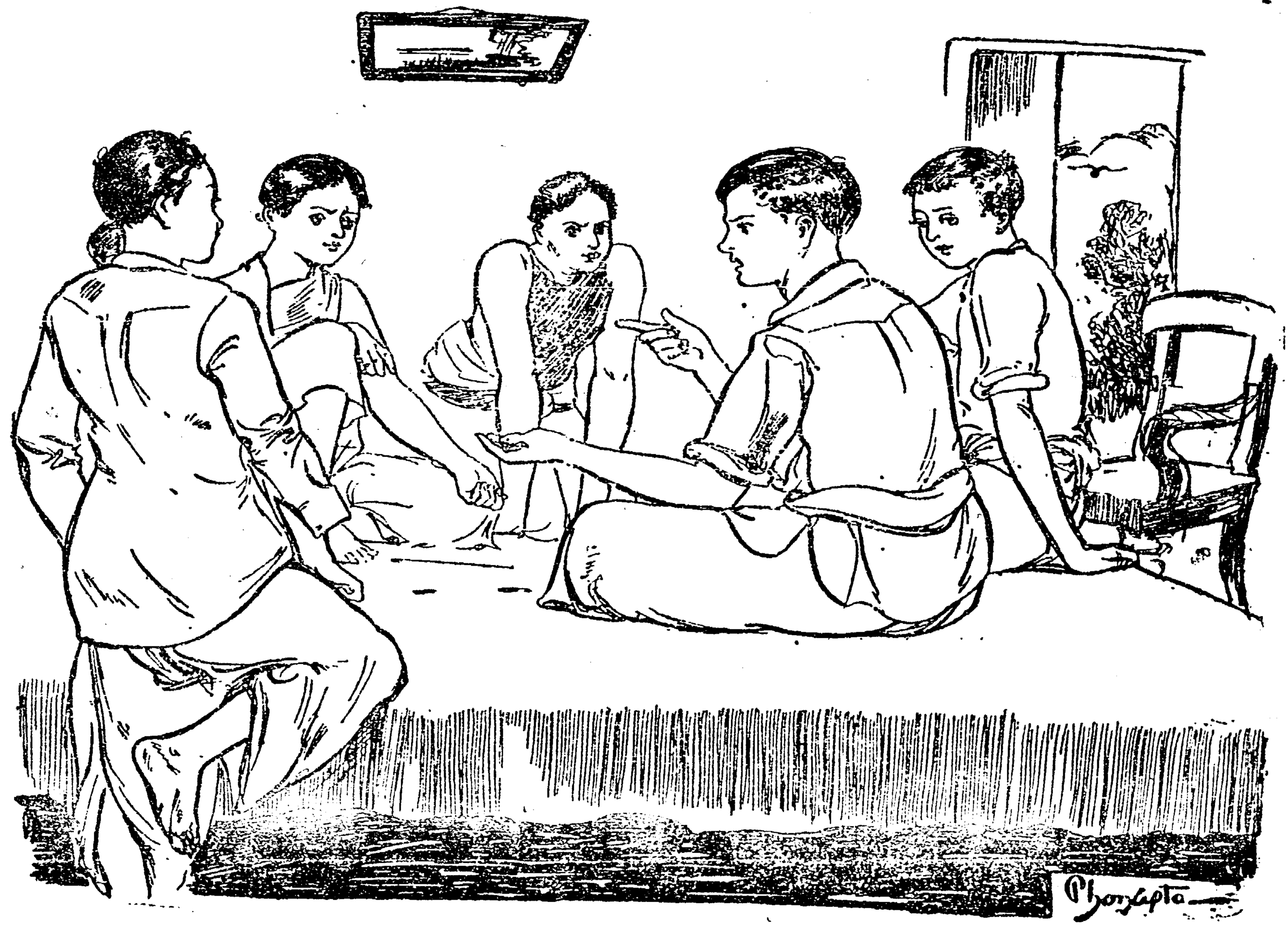

আজকাল যা সময় পড়েছে,…বুঝলি ?

ফিটনের ভাড়াটা চুকিয়ে দিলাম আমিই। বিষ্টু পাঁচখানা টিকিট কেটে নিয়ে এল, ওরই পয়সায়। সত্যি কথা বলতে কি, মনের মধ্যে কে যেন বার বার বলছিল—'আজ খরচ করতে একটুও আপত্তি ক'রো না। ভয় কি, যা ফেলছ তার অনেকগুণ ফিরে পেতে আর দেরী নেই।' সবারই মনের মধ্যে যে এই কথাগুলো শোনা যাচ্ছিল, তাতে আমি নিঃসন্দেহ। কেবল হাবুলটাকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল না যে ও কি ভাবছে। হঠাৎ যেন ও সমস্ত স্ফূর্তি হারিয়ে ফেলেছে বলে মনে হচ্ছে। ও কি,—ভাবতেই আমি শিউরে উঠলাম,—ও কি এখনও টাকাটা ফিরিয়ে দেবার কথা ভাবছে ?

বইটা নাম-করা ছিল, আমাদের সবারই বেশ ভাল লাগল। বেশ খুসী মনেই আমরা, ছবিটা শেষ হ'তেই, হল্ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এলাম, কিন্তু তখনও হাবুলের মুখে সেই আগের অসন্তোষ। লক্ষ্য করলাম সবাই হাবুলের হাব-ভাবে বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। নাঃ, ওকে চাঙ্গা করা দরকার।

একটা বড় হোটেলের সামনে এসে আমি বলাইএর গাটা একটু টিপে দি; বলাইও ইসারা বুঝে সঙ্গে সঙ্গে ব'লে ওঠে, 'একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক্।' চা আর তার সঙ্গে একরাশ ভাল ভাল খাবার খাওয়া গেল। এক সঙ্গে এতগুলো জিনিষ নিজের পয়সায় হোটেলে বসে খেয়েছি কিনা কখনও মনে পড়ে না। বলাই আর সুবোধ দু'জনে ভাগাভাগি ক'রে বিলটা চুকিয়ে দিল। হোটেল থেকে বেরিয়ে দেখি এতক্ষণে হাবুলের মেজাজটা ভাল হয়েছে মনে হ'ল, বেশ একটু খুসী খুসী ভাব দেখা গেল ওর। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেও ওর চক্‌চকে মুখটা দেখা গেল স্পষ্ট ভাবে।

রাস্তায় নেমেই বিষ্টু বললে, 'আজ সমস্ত দিনটা বেশ এন্‌জয় করা গেল।'

হাবুল হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল—'হ্যাঁ, তা আর বলতে! হ্যাঁ, দেখ'—হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ল এ রকম ভাবে বলল—'তোমরা দু'জনে বরং এগোও। আমি চলি—এদিকে একটু কাজ আছে আমার।'

সুবোধ বল্লে—'সে কি? চল, তার আগে নোটটা ভাঙিয়ে নেওয়া যাক্।'

হাবুল তাচ্ছিল্য করে বল্‌ল—'থাক্ গে। মেজমামাকে বললেই চলবে যে তোমার নোট ভাঙাতে পারলাম না। মেজমামাই ওটা ভাঙাতে দিয়েছিল কিনা। আচ্ছা, চলি?' বলে হঠাৎ পাশের রাস্তাটায় ঢুকে পড়ল।

আর আমরা? সমস্ত রাস্তাটা আমরা এক সঙ্গে হেঁটেই ফিরলাম, কিন্তু কেউ একটা কথাও কারো সঙ্গে বলতে পারলাম না, যেন কে আর কাকে চেনে!

খেয়াল-হারা দার্শনিক

শ্রীশেফালী চক্রবর্ত্তী

আচার্য্য ব্রজেন শীল ছিলেন এ দেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। শুধু এ দেশে কেন, তাঁকে যারা চিনত তারা বলত পৃথিবীতেও তাঁর সমকক্ষ পণ্ডিত তাঁর সময়ে খুব বেশী ছিলেন না।

বড় পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে নিতান্ত সাধারণ ব্যাপারে অত্যন্ত খেয়াল-হারা স্বভাবের পরিচয় দেন। ব্রজেন শীল সম্বন্ধেও এই রকম কয়েকটি মজার মজার ঘটনা শোনা যায়।

ব্রজেন শীল ছিলেন দার্শনিক। যে কোনও বিষয়কে অত্যন্ত গভীর ভাবে আলোচনা করাই দার্শনিকদের স্বভাব। কলেজের ছাত্রদের পড়াতে পড়াতে কখন যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত তা তিনি বুঝতেই পারতেন না। একবার তিনি ভারী মজার এক কাণ্ড করে বসেছিলেন। তখন তিনি কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ। কলেজের ছাত্রদের ফুটবল্ ম্যাচ হবে, তাই তাঁকে দর্শক হিসাবে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। খেলা সুরু হ'ল। সবাই মহা উৎসাহ-উত্তেজনায় খেলা দেখছে, তিনিও দেখছেন। হঠাৎ খেলা দেখতে দেখতে তিনি উত্তেজিত ভাবে উঠে পড়লেন। অত্যন্ত রেগে গিয়ে কলেজের খেলাধুলার ভার প্রাপ্ত অধ্যাপককে ডেকে বললেন,—"এ কি! আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি ছেলেরা একটা মাত্র বল্ নিয়ে মহা অসুবিধায় পড়েছে। তারা সবাই মিলে একটা মাত্র বল নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। আমার এত বড় কলেজ, এত ছাত্র, আর তাদের কি না একটা মাত্র বল্! এতে খেলবার সময় তারা তো কাড়াকাড়ি করবেই। ওদের আর কি দোষ? ওদের আরোও বল এনে দিন, ওরা খেলুক।"

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

বোঝো এখন! তিনি তখন যা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, তাঁকে বোঝানো সত্যিই কষ্টকর হয়েছিল। অতি কষ্টে সব বোঝানো হ'লে তখন তিনি ঠাণ্ডা হয়ে বসলেন।

আর একদিন, তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ একটা ঘোড়ার আস্তাবলের সামনে এসে থমকে থেমে দাঁড়ালেন। তার পর আস্তাবলের একটি ঘোড়াকে এক মনে দেখতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক লোক এসে সেখানে ভীড় ক'রে দাঁড়াল। ব্রজেন শীলের মত একজন ব্যক্তি রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে

আস্তাবলের ঘোড়া লক্ষ্য করছেন, ব্যাপার কি? তারা কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারল না। শুধু দেখতে পেল যে ঘোড়ার লেজটা একটা বাঁশের ফাটলের মধ্যে পড়ে এমন ভাবে আটকে গেছে যে কিছুতেই সে সেটা খুলতে পারছে না। এ আর কি এমন ব্যাপার! দু' মিনিট টানাটানি ক'রে ঘোড়াটা নিজের লেজ ঠিকই খুলে নেবে। তখন তারা তাঁকে ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, "আচ্ছা, ঘোড়াটা নিজে তার অত বড় দেহটা ঐ ফাটলের মধ্যে দিয়ে গলিয়ে ও-পাশ থেকে এ-পাশে আনল, আর তার লেজটা কিনা কিছুতেই বেরুচ্ছে না! এটা কি সত্যিই ভেবে দেখবার ব্যাপার নয়?"

লোকগুলি তখন প্রাণ খুলে হাসতে পারলে বাঁচে। অথচ অত বড় একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সামনে তাঁরই কথা নিয়ে হাসাহাসি করাও যায় না। তারা আস্তে আস্তে সবাই সরে পড়ল। একজন এসে তাঁর চিন্তার ব্যাপারটা মীমাংসা ক'রে দিয়ে বলল যে, "আপনি যা ভাবছেন তা ঠিক নয়। ঘোড়াটা যখন ওর লেজ নাড়ছিল তখন হঠাৎ লেজটা ঐ ফাটলের মধ্যে বেকাদায় পড়ে গিয়ে আটকে গেছে। ও খুলতে পারছে না। সত্যিই ঘোড়াটা ঐ ফাটলের মধ্যে দিয়ে গলে ও-পাশ থেকে এ-পাশে আসতে চেষ্টা করে নি বা আসে নি। তা একদম অসম্ভব।"

আর একবার। কলেজের ছেলেরা, যারা বোর্ডিংয়ে থাকত, তাদের ভাল খেতে দেওয়া হ'ত না। একদিন তারা ঠিক করল যে রোজ ওরা শুধু ভাত, ডাল আর চচ্চড়ি খেয়ে কাটাবে কেন? অধ্যক্ষের কাছে নালিশ ক'রে এর প্রতিকার করে নেবে। ব্যবস্থা মত সবাই দল বেঁধে ব্রজেন শীলের কাছে গিয়ে হাজির। ব্রজেন বাবু কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললে—"রোজ আমাদের এত খারাপ খাবার দেওয়া হয় কেন?"

তিনি খুব ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্যি নাকি? তোমাদের খারাপ খাবার দেওয়া হয়? ভা—রী অন্যায় তো! আচ্ছা, শুনি কি দেওয়া হয়? তারপর সাধ্যমত ব্যবস্থা করব বই কি!"

ছেলেরা এতটা সহানুভূতি পেয়ে আশান্বিত হয়ে উঠে বলল, "দিনের পর দিন আমরা খালি ভাত, ডাল......"

"বল কি? বল কি? মাঝপথে তিনি তাদের থামিয়ে দিয়ে অত্যন্ত অবাক

পেঁড়োর গড়

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্, এস্-সি

আমাদের একটি ছোট্ট পাঠক এবং একটি ছোট্ট পাঠিকা কলকাতার কাছাকাছি, ধর এই ৩০।৪০ মাইলের মধ্যে, একটি ঐতিহাসিক জায়গার খোঁজ চেয়ে পাঠিয়েছেন রামধনু মারফৎ,—যেখানে ছোটখাট ছুটীতে বেড়াতে যাওয়া যায়। ভেবে-চিন্তে একটা জায়গার নাম মনে পড়ছে। চল, তোমরাও ঘুরে আসবে।

হাওড়া তেলকল ঘাট থেকে সুরু হয়ে যে ছোট রেল লাইনটি আমতার দিকে চলে গেছে সেই লাইন ধরে ১৯।২০ মাইল চলে গেলে মুন্সীর হাট নামে একটা ষ্টেশন পাওয়া যাবে। এইখানেই আমাদের নামতে হবে। অবশ্যি ঠিক মুন্সীর হাটই আমাদের গন্তব্য স্থান নয়, আমরা যাব ওখান থেকে আরও মাইল পাঁচেক দূরে, পেঁড়োর গড়ে। মুন্সীর হাট থেকে পেঁড়োর গড়ে বাস্ চলাচল করে।

পেঁড়োর গড়ের অপর নাম হচ্ছে পেঁড়ো-বসন্তপুর, শুদ্ধ ক'রে বললে বলতে হয় পাণ্ডুয়া। কিন্তু সাধারণ লোকে জায়গাটাকে পেঁড়ো ব'লেই বলে, শুনতে ভাল না লাগলেও।

তা পেঁড়োই বল আর পাণ্ডুয়াই বল, জায়গাটি কিন্তু তুচ্ছ করবার নয়। এইখানেই এক সময় ছিল প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের রাজধানী। ঐ বংশের রাজা পাণ্ডুদাস এই নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাই তাঁর নাম থেকেই ঐ নগরের নাম পাণ্ডুয়া হয়েছে। সে আমলে এই ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল।

এখন যেখানে হাওড়া, হুগলী এবং মেদিনীপুর জেলা রয়েছে, ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য ছিল তারই অনেকটা অংশ যুড়ে। লোকে বলে, এখানে অনেক বড় বড় বণিক বা শ্রেষ্ঠী থাকতেন ব'লে রাজ্যের নাম ভূরিশ্রেষ্ঠ হয়। অবশ্যি পরবর্ত্তী যুগের লোকদের বোধ হয় অমন গাল-ভরা সংস্কৃত নাম নিয়ে অসুবিধা হ'ত, তাই পাণ্ডুয়া থেকে যেমন হ'ল পেঁড়ো, তেমনি ভূরিশ্রেষ্ঠও ক্রমে হয়ে দাঁড়াল ভূরশুট বা ভুরশো।

প্রাচীন কবি কৃষ্ণ মিশ্রের লেখা বিখ্যাত নাটক প্রবোধচন্দ্রোদয়ের নাম তোমরা অনেকে শুনে থাকবে। এটি সম্ভবতঃ খৃঃ ১০ম শতাব্দীতে লেখা। এই নাটকে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের প্রচুর সুখ্যাতি আছে। পাঠান রাজাদের সময়ে ভূরিশ্রেষ্ঠ ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্য। তার পর মোগল আমলে অবশ্যি এদেরকে সম্রাট্ আকবরের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে হয়, কিন্তু সে নামে মাত্র। রাজ্যের শাসন এবং ভিতরকার সমস্ত ব্যাপারেই এখানকার রাজা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন, তাঁকে শুধু মোগল দরবারে সামান্য কর দিতে হ'ত। তাও কি রকম কর শুনবে? — বছরে মাত্র একটি মোহর, একটি কম্বল এবং একটি ছাগল।

একবার শনি ভাঙ্গড় নামে এক বাগ্দী সর্দ্দার এই রাজ্যের রাজাকে হারিয়ে দিয়ে এখানকার রাজা হয়ে বসেন। তিনি ছিলেন কালী-উপাসক। জঙ্গলের মধ্যে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁর পূজো করতেন এবং দেবীর সামনে নরবলি দিতেন। সেই কালীমূর্ত্তি এখনও শনি ভাঙ্গড়ের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী 'দিল-আকাশে' দেখতে পাওয়া যায়।

শনি ভাঙ্গড় কিন্তু বেশী দিন রাজত্ব করতে পারেন নি, কিছুদিন পরেই আবার চতুরানন নামে এক বীর ব্রাহ্মণ তাঁকে হারিয়ে দিয়ে এখানে ব্রাহ্মণ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। চতুরাননের ছেলে না থাকায় তাঁর জামাই সদানন্দ মুখোপাধ্যায় ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। এঁর বংশই হচ্ছে ভূরিশ্রেষ্ঠের শেষ রাজবংশ। এই বংশের শেষ রাজা হচ্ছেন রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায়।

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের ছেলে রাজা হ'তে না পারলেও তাঁর অদ্ভুত প্রতিভাবলে তিনি যে খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেছেন তা রাজার চাইতে অনেক বেশী। ভবিষ্যতেও তাঁর খ্যাতি এ দেশ থেকে লুপ্ত হবে না। ইনি আর কেউ ন'ন, বাংলার অমর কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

ভারতচন্দ্রের বাবা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন আলিবর্দ্দী খাঁর আমলের

লোক। তাঁর জমিদারীর আয় ছিল বছরে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা,—সে আমলে বড় কম টাকা নয়। এই বিপুল সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য তাঁর প্রাসাদের চারদিকে গড়বন্দী করা ছিল। সেই থেকেই জায়গাটির নাম হয় পেঁড়োর গড়। বর্দ্ধমানের রাজার তখন ভীষণ প্রতাপ। কি একটা ব্যাপারে নরেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে বর্দ্ধমান-রাজের বিবাদ বাধলে বর্দ্ধমান-রাজের সৈন্যবাহিনী এসে নরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্য বা জমিদারী দখল ক'রে নেয়। ভারতচন্দ্রও দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হ'ন। এর পর বড় হয়ে তিনি আর একবার পেঁড়োর গড়ে ফিরলেও স্থায়ীভাবে আর কোন দিন এখানে থাকতে পারেন নি। পরবর্ত্তী কালে তিনি নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি হয়ে তাঁর আশ্রয়েই বসবাস করতে থাকেন।

কিন্তু ভারতচন্দ্রের শৈশব এই পেঁড়োর গড়েই কেটেছিল। এখানকার কাণা নদীর ধারে তিনি ছেলেবেলায় সমবয়সীদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন, ছুটোছুটি করতেন। বর্ষায় যখন নদী কানায় কানায় ভরে উঠত তখন তার অগাধ জলে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের কবিচিত্তের প্রথম প্রেরণা যুগিয়েছে এই পেঁড়োর গড়।

ভারতচন্দ্র তাঁর একটি কবিতায় আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছিলেন :—

"ভরদ্বাজ অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হতকংস—ভূরশুটে বসতি ;
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতীযুত
ফুলের মুখুটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি।"

পেঁড়োর গড়ে প্রাচীন কালের বহু ধ্বংসাবশেষ এখনও এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে। ভারতচন্দ্রের পিতৃপুরুষের ভিটার চার দিকে যে পরিখা ছিল তারও চিহ্ন রয়েছে। কাণা নদীর ধারেও প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ কিছু কিছু আছে। একটি প্রাচীন স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের রাজধানী হিসেবেই নয়, বাংলার এক অমর কবির জন্মস্থান এবং বাল্যলীলাভূমি হিসাবেও জায়গাটি দর্শনীয় সন্দেহ নেই।

একটি যুদ্ধের গল্প

শ্রীকৌটিল্য

ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ বেধেছে। একজন ইংরেজ অশ্বারোহী শত্রুশিবিরের গোপন খবর আনবার জন্য গিয়েছিল, হঠাৎ ধরা পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ৩.৪ জন ফরাসী সৈন্য তাকে তাড়া করল, ঘোড়ায় চেপে।

ইংরেজ সৈন্যটিও প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাতে লাগল, এবং খানিকটা এগিয়েই বুঝতে পারল তার ঘোড়াটি ফরাসী ঘোড়াগুলির চাইতে অনেক উৎকৃষ্ট।

খানিক দূর গিয়ে সামনে একটা ছোট নালা। ইংরেজ সৈন্যটির মনের ভয় তখন অনেকটা কেটে গেছে, বরঞ্চ তার জায়গায় দেখা দিয়েছে একটু রসিকতা করবার লোভ। সে চট্ ক'রে নালাটা পার না হয়ে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে একটু অপেক্ষা করতে লাগল। একটু পরেই একজন ফরাসী সৈন্য তার খুব কাছে এসে পড়ল। ইংরেজ সৈন্যটি একটু মাথা নুইয়ে হাত বাড়িয়ে তার সঙ্গে করমর্দ্দন করার ভঙ্গী করল, তার পর অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে ইঙ্গিত করতেই তার সুশিক্ষিত ঘোড়া এক লাফে নালাটা পার হয়ে তীরবেগে ছুটে চল্‌ল।

এই অপমানে লাল হয়ে ফরাসী সৈন্যটিও আবার তাকে আক্রমণ করবার জন্য ঘোড়া হাঁকাল, কিন্তু তার ঘোড়াটি অত সহজে নালা পার হ'তে পারল না। ইংরেজ সৈন্য হাসতে হাসতে বল্‌ল, "ও মশাই, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আপনার ঘোড়াটার জন্ম ফরাসী দেশে।"

ফরাসী সৈন্যটির অবস্থা বুঝতেই পারছ। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে তখনই কোমরবন্ধ থেকে পিস্তল বার ক'রে ইংরেজটিকে লক্ষ্য করে গুলি করল, কিন্তু পর পর ২।৩ বার চেষ্টা করেও গুলি বেরোল না তার ভেতর থেকে।

আবার সেই অট্টহাসি। "ও মশাই, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আপনার পিস্তলটিও যে তৈরী হয়েছে ফরাসী দেশে।"—বলতে বলতে ইংরেজ সৈন্যটি তীব্রবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে নিমেষে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

নতুন বই

শ্রীরাধারাণী দেবী

দি ব্ল্যাক্ টিউলিপ্ (এ্যালেকজাণ্ডার ডুমা)—অনুবাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, ২৪বি, লেক্ রোড, কলিকাতা ২৯। দাম ১।৹

এ্যালেকজাণ্ডার ডুমার ব্ল্যাক্ টিউলিপ্ বিশ্বসাহিত্যের একখানি অতুলনীয় গ্রন্থ। এর আখ্যানভাগ যেমন মনোরম, ঘটনাপ্রবাহ, তেমনি রোমাঞ্চকর এবং কৌতূহলপ্রদ। এই সুন্দর বইখানি ছেলেমেয়েদের উপযোগী ক'রে পরিবেশন ক'রে ক্ষিতীন্দ্র বাবু বাংলা সাহিত্যের সম্পদ্ বাড়িয়েছেন। বছর কয়েক আগে এই বইখানিই 'ফুলের মূল্য' নাম দিয়ে তিনি রামধনুতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেছিলেন। তার পর বইখানিকে পুস্তকাকারে দেখবার জন্য ছোটদের মহলে আগ্রহের সীমা ছিল না। এর নতুন ক'রে প্রকাশ তাই ছোটদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করবে সন্দেহ নেই।

গ্রন্থকার এই অনুবাদে আশ্চর্য্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ভাষা যেমন সুন্দর, লিখবার ভঙ্গীটিও তেমনি চিত্তাকর্ষক। ছোটদের উপযোগী ক'রে লিখতে হয়েছে ব'লে তাঁকে মূল গল্পটি জায়গায় জায়গায় সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে কিন্তু তাতে রসসৃষ্টির কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় নি বা আখ্যানভাগের মনোহারিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নি। পড়তে বসলে প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কৌতূহল অব্যাহত থাকে। রামধনুতে যে আকারে গল্পটি বেরিয়েছিল পুস্তকাকারে বার করার সময়ে তাকে অনেক জায়গায় আরও সংক্ষিপ্ত ও সংশোধিত করা হয়েছে মনে হ'ল। ভাষাও 'সাধু' থেকে 'চলতি'তে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

বইখানি এণ্টিক কাগজে ছাপা, মলাটটিও সুদৃশ্য। তবে ছোটখাট মুদ্রাকর-প্রমাদ জায়গায় জায়গায় চোখে পড়ল। আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে এ সব ছোটখাট ত্রুটীগুলি থাকবে না।

বিতর্ক-সভা

বিষয় ঃ—"স্কুল-কলেজে বর্ত্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত থাকা উচিত কিনা।"

স্বপক্ষে ঃ

বর্ত্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত থাকা উচিত এই এই কারণে ঃ—(১) প্রতিযোগিতা মানুষকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক'রে তোলে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে কোন জাতি বড় হ'তে পারে না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রয়োজন এদিক্ দিয়ে সব চেয়ে বেশী। (২) বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েই পড়াশোনা করতে চায় না, অথচ

জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হ'লে লেখাপড়া অবশ্যই করতে হবে। পরীক্ষায় পাশ না করতে পারলে নতুন ক্লাসে উঠতে পারবে না,—লোকচক্ষে হেয় হ'তে হবে এই বোধই তাকে পড়াশোনা করতে বাধ্য করায়। পরীক্ষার ব্যবস্থা উঠে গেলে শতকরা ১০টি ছেলেমেয়েও নিয়মিত বই ছোঁবে কিনা সন্দেহ।

—শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক

যোগ্যতা এবং ভাল-মন্দ বাছাইএর পক্ষে পরীক্ষাই হচ্ছে সব চেয়ে সহজ এবং শ্রেষ্ঠ উপায়। আজকাল কিছু কিছু মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি হয়তো বেরিয়েছে কিন্তু পরীক্ষার মত সহজ পদ্ধতি এখন পর্য্যন্ত বেরোয় নি। ছাত্রছাত্রীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুঝবার জন্য পরীক্ষার প্রচলন অপরিহার্য্য।

—শ্রীরেবা গোস্বামী

বিপক্ষে ঃ

বর্ত্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত রাখা উচিত কি না সে সম্বন্ধে ১৯০৪ সালেই ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-দপ্তরে একটি বিতর্ক হয়। ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে তখন বলা হয় যে বর্ত্তমানের পরীক্ষা-পদ্ধতি এমনই যে ছাত্রেরা কেবল 'পরীক্ষা' 'পরীক্ষা' করে পাগল হয়, প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের আন্তরিক স্পৃহা তাদের মধ্যে জাগ্রত হয় না। কোর্সের বাইরের বই ছাত্রেরা স্পর্শ করে না, ইম্পর্টেণ্ট প্রশ্ন ও তার উত্তরের জন্যই লালায়িত হয়, ইত্যাদি।

পরীক্ষায় নম্বর দেওয়ার মধ্যেও যথেষ্ট গলদ আছে। পরীক্ষকেরা অনেক সময়ে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। বিভিন্ন পরীক্ষকের পক্ষে সমান ষ্ট্যান্ডার্ডে উত্তরপত্র পরীক্ষা করা অসম্ভব।

অনেক সময়ে পরীক্ষার্থীর হাতের লেখার উপর পাস-ফেলের প্রশ্ন নির্ভর করতে দেখা গিয়েছে।

পরীক্ষায় পাশের হারও আজকাল অবিশ্বাস্য রকমের কমে গিয়েছে। অনেকে বলেন ছাত্রসমাজের সুস্পষ্ট অবনতি ঘটেছে। তাঁদের এই অভিযোগের সঙ্গে আমরা একমত হ'তে পারলাম না। ছাত্রসমাজের একাংশ কিছুটা আরাম ও হুজুগপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু তা বলে সমগ্র ছাত্রসমাজের প্রতি এই দোষারোপ করা চলে না। পক্ষান্তরে বরং পরীক্ষার ত্রুটি সম্বন্ধেই সন্দেহের উদ্রেক হয়। কোন কোন পরীক্ষার ব্যাপারে অনাবশ্যক কঠোরতা অবলম্বন করে ছাত্রসমাজকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে স্যর ফিলিপ হার্টগ্ বলেছেন—"পরীক্ষা সব চেয়ে ক্ষতি করে তাদের যারা অকৃতকার্য্য হয়। ...এই অকৃতকার্য্যতা তাদের জীবনে যে মর্ম্মান্তিক প্রভাব বিস্তার করে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।"

—শ্রীঅমলকুমার মিত্র

পরীক্ষায় কখনও প্রকৃত শিক্ষা হয় না। প্রায়ই দেখা যায় সারা বছর ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষার সময় মাস খানেক খুব পড়ে পাশ ক'রে গেল, কিন্তু তার পরেই আবার সব ভুলে গেল। একে প্রকৃত শিক্ষা বলা চলে না। আবার হয়তো সারা বছর নিয়মিত ভাবে পড়াশুনো ক'রেও পরীক্ষার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় বা অন্য কোন অপ্রত্যাশিত কারণে ভাল ক'রে দেখে নিতে না পারায় ফল খারাপ করল। তা ছাড়া পরীক্ষার উত্তর লিখবার একটা বিশেষ কায়দা আছে। অনেকে, কোন বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, উত্তর দেবার এই বিশেষ ধরণটি আয়ত্ত করতে না পারলে ফল খারাপ করে। আবার ঠিক এর উল্টোও দেখা যায়; ভিতরে অন্তঃসারশূন্য হয়েও শুধু এই গুণটি থাকায় উৎরে যায়। আজকাল অজস্র হেল্‌প বুক্, শর্ট কাট্ প্রভৃতি বইএর প্রাদুর্ভাব হওয়ায় অনেক ছাত্র সহজেই পাশ করে কিন্তু কিছুই শেখে না।

—শ্রীগৌরী মিত্র

প্রবাদের ইতিহাস

এর আগে একবার তোমাদের বলেছিলাম, বাংলা ভাষায় প্রচলিত কতকগুলি প্রবাদবাক্যের সৃষ্টি হয়েছে নানা ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে—যার খবর আমরা অনেকেই রাখি না। এই রকম আর দু'-একটি প্রবাদের গল্প বলি শোন।

কোন অতিরিক্ত আয়েসী বা বিলাসী লোকের কথা বলতে গেলে আমরা ঠাট্টা ক'রে বলি, "লোকটা যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ!" এই খাঞ্জা খাঁ কিন্তু ঐতিহাসিক লোক এবং খুব বেশী দিনের লোকও ন'ন। এঁর আসল নাম হচ্ছে খাঁজাহান খাঁ, সংক্ষেপে হ'ল খাঞ্জা খাঁ। এঁর বাড়ী ছিল পারস্য দেশে, কিন্তু ভারতে এসে ইনি মোগল বাদশাহের অধীনে চাকরী নেন। পলাশীর যুদ্ধের কিছু পরে ইনি হুগলীতে ফৌজদার হয়ে আসেন এবং, যতদিন ফৌজদারের পদ প্রচলিত ছিল, ঐ পদে বহাল থাকেন। ফৌজদার থাকবার সময়ে ইনি অত্যন্ত বিলাসে এবং আড়ম্বরে থাকতেন ব'লে তাঁর নামে ঐ রকম প্রবাদ বাক্য তৈরী হয়েছে। চাকরী থেকে অবসর নেবার পরও ইনি কোম্পানীর কাছ থেকে পেন্সন পেয়ে গেছেন।

আর একটা প্রবাদ আছে—"শঙ্কর চক্কোত্তীকে খেলে বাঘে, অন্য লোকে কোথা লাগে!"

কোন বলশালী লোক, যার ওপর লোকের ভরসা ছিল, সে-ই যদি কোন কাজ করতে গিয়ে পরাজিত হয় তা হ'লে এই কথাটি বলা হয়। এই শঙ্কর চক্রবর্ত্তীও একজন ঐতিহাসিক লোক। শোনা যায় তিনি ছিলেন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের একজন সেনাধ্যক্ষ। গায়ে অসীম শক্তি থাকায় তাঁর দলের লোকেরা তাঁকে খুব খাতির করত। কিন্তু ঘটনাচক্রে একদিন বাঘের হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। সেই থেকে এই প্রবাদের সৃষ্টি।

ভাষার ঋণ

জীবন্ত ভাষার স্বভাবই হচ্ছে সে নানা বিদেশী ভাষা থেকে শব্দসম্ভার সংগ্রহ ক'রে নিজেকে পুষ্ট করে। আমাদের বাংলা ভাষাও এই রকম, সংস্কৃত থেকে সৃষ্ট হ'লেও, নানা বিদেশী শব্দ গ্রহণ ক'রে সমৃদ্ধ হয়েছে। সেই সব শব্দ আমাদের কাছে এত পরিচিত যে আমরা কখনও ভাবতে পারি না যে সেগুলি অন্য ভাষা থেকে ধার করা। এই রকম কয়েকটি বাংলা শব্দ নীচে দিচ্ছি, তোমরা বলতে পার এর কোন্‌টা কোন্ ভাষা থেকে এসেছে? (পাঁচ মিশেলীর শেষে উত্তর দেওয়া হ'ল।)

(১) ফর্দ্দ (২) আইন (৩) দোয়াত (৪) তামাশা (৫) খবর (৬) নকল (৭) আওয়াজ (৮) দোকান (৯) কিনারা (১০) জানোয়ার (১১) পাজী (১২) ঠাণ্ডা (১৩) বিকাল (১৪) আচ্ছা (১৫) পকেট (১৬) হোটেল (১৭) পিওন (১৮) জেল (১৯) থিয়েটার (২০) ডিপো (২১) বিস্‌কুট (২২) বেহালা (২৩) সাবান (২৪) চাবি (২৫) ফিতা (২৬) গীর্জ্জা (২৭) ম্যালেরিয়া (২৮) গেজেট (২৯) কোম্পানী (৩০) প্লেট (৩১) নিগ্রো (৩২) চিনি (৩৩) চা (৩৪) গ্যাস (৩৫) শয়তান।

ইংরেজী ভাষার মধ্যেও অনেক বাংলা এবং হিন্দী শব্দ প্রবেশ করেছে। (সংস্কৃত তো আছেই।) যেমন ধর বাজার, জঙ্গল, শাল, পায়জামা ইত্যাদি।

বিজ্ঞানের টুকিটাকি

ব্লটিং পেপার কি ক'রে কালি শুষে নেয়?

ব্লটিং পেপার সাধারণ লিখবার কাগজের তুলনায় খুব খসখসে। এর গায়ের অসংখ্য আঁশ খালি চোখেই স্পষ্ট দেখা যায়। যদি একটুকরো ব্লটিং পেপার নিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখা যায় তবে দেখবে ঐ সব আঁশের ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য গর্ত্ত বা ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রগুলোই হচ্ছে ব্লটিং পেপারের কালি টেনে নেবার আসল অস্ত্র। আর যে প্রক্রিয়ার ফলে ঐ গর্ত্ত দিয়ে কালি টেনে নেঁওয়া হয় বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে বলা হয় কৈশিক আকর্ষণ।

তোমরা নিশ্চয়ই জান পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ খুব ছোট ছোট কতকগুলি কণিকা দিয়ে তৈরী—যাকে বলা হয় অণু। ব্লটিং পেপার এই রকম সূক্ষ্ম কাগজের অণু দিয়ে তৈরী। আরও

ভাল ক'রে বলতে গেলে বলতে হয় সেলুলোজের (যা নাকি কাগজের প্রধান উপাদান) অণু দিয়ে তৈরী। তেমনি কালিও ঐ রকম কালির অণু দিয়ে তৈরী, বা জল এবং রংএর অণু দিয়ে তৈরী। এখন, অণুর নিয়ম হচ্ছে এই, তারা সর্ব্বদা পরস্পর পরস্পরকে টানাটানি করে; নিজেদের মধ্যে তো বটেই, পাশে আর কোন জিনিষ থাকলে তাদের অণুকেও টানে। ব্লটিং কাগজের অণুগুলি সর্ব্বদা নিজেদের মধ্যে টানাটানি করছে। কালির ওপর ব্লটিং চাপা দিলে সেই অণুগুলো আবার সংলগ্ন কালির অণুগুলোকেও টানতে থাকবে। কালির অণুগুলিও আবার উল্টে তাদেরকে টানবে। (অবশ্যি সঙ্গে সঙ্গে তারাও নিজেদের মধ্যে টানাটানি করবে।) এই টানাটানির ফলই হচ্ছে কৈশিক আকর্ষণ, আর এরই জন্য ব্লটিং পেপারের সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি দিয়ে কালি উঠে এসে লেখাগুলোকে শুকনো ক'রে দেবে।

বজ্রপাত জিনিষটা কি?

মেঘ কি তোমরা নিশ্চয়ই জান—ছোট ছোট জলকণার সমষ্টি। এই সব জলকণা প্রায়ই বিদ্যুৎশক্তি-সম্পন্ন হয়। বাতাসে ভাসতে ভাসতে এই মেঘ প্রায়ই নীচের অন্যান্য বস্তুতে ঐ বিদ্যুৎ সংক্রমিত করে—ফলে সেগুলিও বিদ্যুৎশক্তি-সম্পন্ন হয়ে পড়ে এবং মেঘের সঙ্গে তাদের আকর্ষণ হ'তে থাকে। এর পর ঐ মেঘ যদি তাদের কোনটার খুব কাছে এসে পড়ে এবং তাদের আকর্ষণের মাত্রাও খুব বেশী হয়ে যায় তা হ'লে মাঝের বায়ুস্তর ভেদ ক'রে বিরাট এক স্ফুলিঙ্গ একটা থেকে আর একটায় চলে আসতে পারে। এরই নাম বজ্রপাত।

স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টির কারণ হচ্ছে—তীব্র গতিবেগসম্পন্ন কতকগুলি ইলেক্‌ট্রন্ বা বিদ্যুৎ-কণা। এই ইলেক্‌ট্রন্ ছুটে চলবার সময় বায়ুস্তরকেও ভীষণ ভাবে আঘাত করে, যার ফলে বায়ুর অণুগুলিও ভেঙ্গে গিয়ে আরও অনেক ইলেক্‌ট্রন্ বেরিয়ে আসে। একটু পরেই অবশ্যি আবার সেগুলি ঐ অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়।

যে জিনিষের সঙ্গে মেঘের এই স্ফুলিঙ্গ আদান-প্রদান হয় তারই ওপর, চলতি কথায় বলা হয়, 'বাজ পড়েছে'।

কারও কারও ধারণা, বাজ পড়া মানে বুঝি বোমার মত কোন উত্তপ্ত ভারী জিনিষ আকাশ থেকে খসে পড়া। সে ধারণা একদম ভুল।

উত্তর (ভাষার ঋণ)

১—৬ আরবী, ৭—১১ ফারসী, ১২—১৪ হিন্দী, ১৫—১৮ ইংরাজী, ১৯—গ্রীক, ২০—২১ ফরাসী, ২২—২৬ পর্ত্তুগীজ, ২৭—২৯ ইটালীয়, ৩০—৩১ স্প্যানীশ, ৩২—৩৩ চীনা, ৩৪—ওলন্দাজ, ৩৫—হিব্রু।

রায় পাহাড়ীর নিশাচর

শ্রীঅমলেন্দু সেন

১৯

"পরদিন ভোরে জানা গেল যে ধরণী বাবু খুন হয়েছেন। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। আমি তো তাঁকে খুন করি নি, তবে আবার তাঁকে মারল কে? যেটুকু আমি জানি, সে কথাও কাউকে বলতে পারলুম না, পাছে দোষটা শেষে আমারই ঘাড়ে পড়ে। কাজে কাজেই চুপ করে রইলুম।

"রাজাবাহাদুর পালিয়ে যাবার পর আমি আর কি করব, কলকাতায় চলে এলুম। আপনি আমাকে আপনার বাড়ীতে কাজে নিলেন। কত বছর কেটে গেল কলকাতায় আপনার কাছে।

"তার পর রেঙ্গুন গেলুম। সেখানে লালু বাবুকে নিয়ে রতন বাবু এলেন। একদিন তাঁদের কাছে শুনলুম যে তাঁরা এ বাড়ীতে স্বচক্ষে একটা ভূত দেখেছেন। প্রথমে কথাটায় তেমন কান দিই নি, কিন্তু যখন শুনলুম যে ভূত এই ঘরে ঢুকেই অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন হঠাৎ একটা কথা আমার মনে হ'ল। লালু বাবু যাকে দেখেছেন সে ভূতটুত না হয়ে একজন লোকও তো হ'তে পারে যে সুড়ঙ্গের পথটা জানে। ধরণী বাবু তো মারাই গেছেন,—আর যদি কেউ জানেন তো তিনি হচ্ছেন রাজাবাহাদুর। তা হ'লে কি রাজাবাহাদুর এখানেই লুকিয়ে আছেন? কথাটা ভাবতে লাগলুম।

"এর পরেই আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল। রেঙ্গুনে আমি ধরণী বাবুর দেখা পেয়ে গেলুম। যাকে সবাই আজ আঠারো বছর ধরে মৃত বলে জেনে এসেছে, যাকে খুন করবার দায়ে আমার মনিব সব ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেই ধরণী বাবুকে জলজ্যান্ত দেখলুম আমি।

"তখন জানলুম যে রাজাবাহাদুর যদি আজও বেঁচে থাকেন, তা হ'লে তাঁকে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করতে পারি এক আমিই। তার আগে অবশ্য দেখতে হবে যে আমার সন্দেহ ঠিক কি না, রায়পাহাড়ীর ভূত রাজা অবনীনাথই, না আর কেউ।

"ব্যস্ত হয়ে চলে এলুম রেঙ্গুন থেকে। সেখান থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে সটান এখানে। এ বাড়ীতে এসে সুড়ঙ্গ-পথে ঢুকে রাজাবাহাদুরের দেখা পেলুম। আমাকে দেখে ভয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি একটু সুস্থ হ'তেই তাঁকে সব কথা বললুম। সব শুনে তিনি লালুকে দেখতে চাইলেন সবার আগে। আর রেঙ্গুনে ধরণী বাবুকেও একটা তার করে দেওয়া হ'ল এখানে আসবার জন্য।

"খানিকক্ষণ হ'ল তিনি এসে পৌঁছেচেন। তাঁকে ডেকে নিয়ে আসব কি?"

২০

রঘু গিয়ে যাকে ডেকে নিয়ে এল তাকে দেখে আমার মুখে আর কথা ফুটল না। একদিনের মধ্যে এতগুলো অভাবনীয় ব্যাপার দেখলাম আর আশ্চর্য্য কথা শুনলাম যে আমার মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছিল।

রঘুর সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন রেঙ্গুনের ডাক্তার নিশীথ দত্ত।

রাজা অবনীনাথ তাঁকে দেখে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন, উত্তেজনা দমন করে বসে পড়লেন। ডাক্তার দত্ত,—না, তাঁকে ধরণীবাবুই বলি,—ধরণী বাবু ছুটে এসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বললেন, "দাদা, আমাকে ক্ষমা করতে পারবে কি? তোমার যত কষ্টের কারণ আমি, এর জন্য আমি সত্যিই অনুতপ্ত।"

রাজা অবনীনাথ তাঁকে ধরে তুললেন। তারপর একটু স্থির হয়ে বললেন, "ভাই, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আজ আর কারও ওপর আমার কোনও রাগ নেই। তোমার কথা আমি সব রঘুর কাছে শুনেছি। তোমার মুখে আবার সব শুনতে চাই। বল।"

ধরণী বাবু বললেন ঃ

"দাদা ! আমার প্রথম জীবনের কথা ভাবতে এখন আমি লজ্জা পাই। তুমি তখন আমার সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করেছিলে আমারই ভালর জন্য, সে কথা সেদিন বুঝি নি।

"তুমি যখন বাজী-জেতা টাকাগুলো ফেরৎ নিয়ে আমাকে ধমক দিয়ে চলে গেলে, তখন তোমার ওপর বেজায় একটা আক্রোশ হ'ল আমার। আমাকে মারবার জন্য রঘু যখন ঘরে ঢুকল, তখন আমি ভাবছিলাম কি করে তোমাকে জব্দ করব।

"আমার ঘুঁষি খেয়ে রঘু তো অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। ছোরাখানা কাঁধে গেঁথে গিয়েছিল। সেখানা খুলে নিতেই দেখি যে তার বাঁটে তোমার নাম লেখা। অমনি মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। ঠিক, এইবার তোমাকে জব্দ করবার পথ খুঁজে পেয়েছি।

"কাঁধ থেকে দরদর করে রক্ত পড়ে জামা ভিজে যাচ্ছিল, গড়িয়ে মেঝেতেও পড়তে লাগল। প্রথমে তোমার ছেঁড়া আস্তিনের টুকরোটাকে রক্তে ভিজিয়ে নিলাম। তারপর রক্ত পড়া বন্ধ করে আর এক প্রস্থ জামাকাপড় পরে নিয়ে রক্তমাখা জামা আর ছোরাখানা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

"তুমি তোমার শোবার ঘরের বাইরে জুতো ছেড়ে ঘরে ঢুকেছিলে, তা পায়ে পরে নিয়ে বাগানে গেলাম। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আমাকে কেউ দেখতে পাবে এমন সম্ভাবনা ছিল না। বাগানে গিয়ে জামাকাপড়, ছোরা ইত্যাদি পুঁতে রেখে ফিরে এলাম। তার পর জুতোর কাদা অল্প অল্প মুছে ফেললাম, যাতে একটু-আধটু দাগ লেগে থাকে। যেখানকার জুতো সেখানে রেখে ঘরে ফিরে এলাম।

"ডাক্তারী পড়বার সময় কেনা একটা কঙ্কাল ছিল আমার। সেটাকে তার বাক্স থেকে বের করলাম। আমার আংটীটা তার একটা আঙুলে পরিয়ে সেটাকে কাঁধে ফেলে সুড়ঙ্গপথে ঢুকলাম। রঘু যেমন ছিল, পড়ে রইল।

"সুড়ঙ্গটা গিয়ে শেষ হয়েছে রায়পাহাড়ীর জঙ্গলে একটা পোড়ো মন্দিরের মধ্যে। তার কাছেই একটা পুরোনো খাদ ছিল। কঙ্কালটা তার মধ্যে ফেলে দিলাম।

"সেখান থেকে চলে এলাম রাতারাতি কলকাতায়।" (ক্রমশঃ)

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

১৫ই আগষ্টের পুণ্য প্রভাতে এই চিঠি লিখছি। এই তারিখটি শুধু আমাদের দীর্ঘদিনের পরাধীনতা মোচনের তারিখ নয়, আরও নানা দিক্ দিয়ে এই তারিখটি স্মরণীয়। এই তারিখেই এ দেশে আবির্ভাব হয়েছিল মহামানব শ্রীঅরবিন্দের, আবার এই তারিখেই তিরোভাব হয়েছিল পুণ্যশ্লোক ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের।

স্বাধীনতা পেলেও দেশের দুর্দ্দিনের অবসান ঘটে নি। কিন্তু সে স্বাধীনতার ত্রুটী নয়—দোষ কিছুটা আমাদের, এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এজন্য অনেকখানি দায়ী। যে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হয়েছে আমরা তার উপযুক্ত হব—আজকের দিনে এই হোক আমাদের সংকল্প-বাক্য।

শ্রীরুদ্রকুমার বড়ুয়া (কলিকাতা)—তোমার প্রস্তাবটি খুব সুন্দর। শীগগিরই আমরা শিশুসাহিত্যিকদের কোন সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করব। কুমারী নিবেদিতা সেন (কলিকাতা ২৯)—তুমি যে অনুমতি পেয়েছ এবারে কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারলে না। ধাঁধার উত্তর আরও ভেবে-চিন্তে পাঠাবে। শ্রীঅসীমা পাল (করিমগঞ্জ)—তোমার অভিযোগ উপলব্ধি করছি কিন্তু এখানে কাগজের কি দুর্ভোগ চলেছে তা তো জান না! যাই হোক আগামী সংখ্যা অনেক বর্দ্ধিত-কলেবরে বার করবার ইচ্ছা আছে। ধাঁধার উত্তরটি কিন্তু শুদ্ধ হয় নি। শ্রীঅজয় ঘোষ (এলাহাবাদ)—হ্যাঁ, প্রবীণ ও নবীন শিশুসাহিত্যিকরা এক জোটে অভিনয়ে নেমেছিলেন। এখানে থাকলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতে কিন্তু তাঁদের ঐ সব পোষাকে চিনতে পারতে কি? এ বিষয়ে একটি সরস রচনা একজন নাম-করা শিশুসাহিত্যিক বারান্তরে তোমাদের শোনাবেন বলে ভরসা দিয়েছেন। হয়তো না দেখতে পাওয়ার ক্ষোভ তাতে সামান্য মিটতে পারে। শ্রীসীতা বসু (নাগপুর)—যতদূর জানি, বাংলায় ছোটদের প্রথম সাপ্তাহিক হচ্ছে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত 'রবিবার'।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। জয় হিন্দ। ইতি—রাঃ সঃ

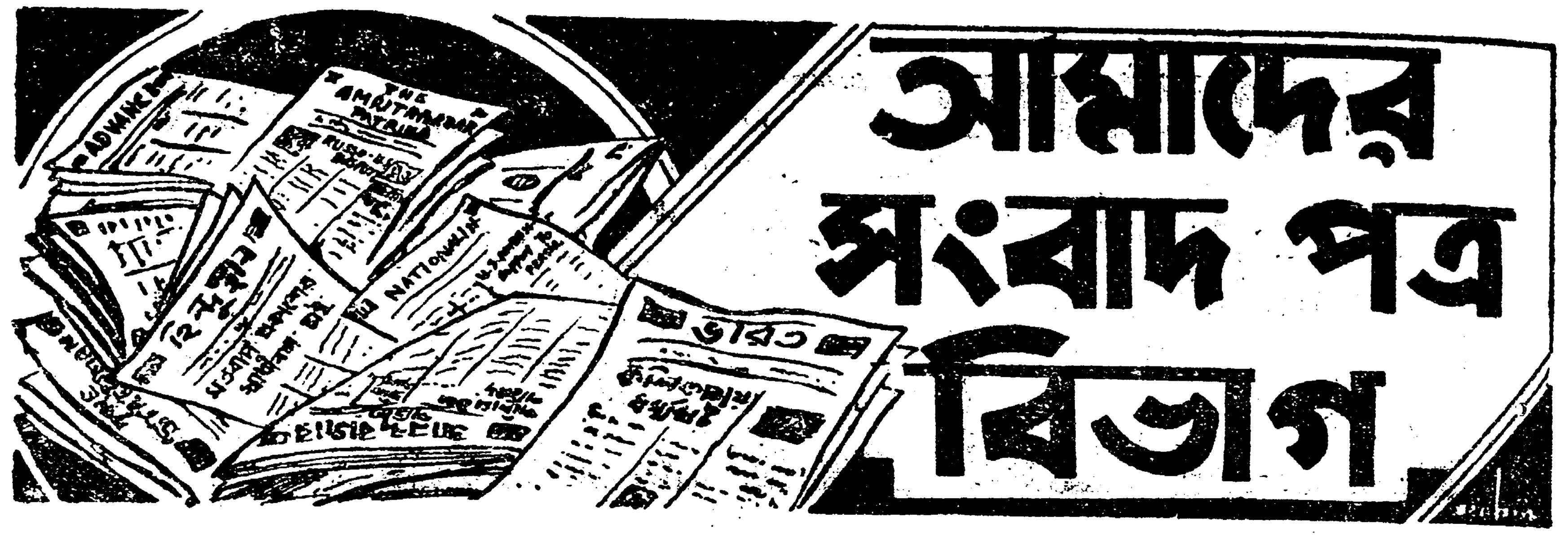

১৫ই আগষ্ট

ভারতীয়দের হাতে দেশের শাসন-ভার আসবার পর দেখতে দেখতে চার বছর কেটে গেল। আবার এল সেই স্মরণীয় তারিখ ১৫ই আগষ্ট। বর্ত্তমানে পৃথিবী যুড়ে যে বিশৃঙ্খলা চলছে তাতে কোন দেশের পক্ষেই নিরুপদ্রবে থাকা সম্ভব নয়— বিশেষতঃ ভারতের মত যে সব দেশ নতুন ক'রে স্বাধীনতা লাভ করেছে তাদের পক্ষে। অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা তো রয়েছেই। তবু স্বাধীন ভারত একদিন জগৎসভায় তার বিশিষ্ট আসন দখল ক'রে নেবেই এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

আজ এই স্মরণীয় দিনে যে সব দেশপ্রেমিকের জীবনব্যাপী সাধনার ফলে এই স্বাধীনতা অর্জ্জিত হয়েছে তাঁদের নমস্কার জানাই।

কলকাতার ফুটবল

কলকাতায় ফুটবল লীগ্ প্রতিযোগিতা এ বছরের মত শেষ হয়ে এল। সাত বছর পরে জনপ্রিয় মোহনবাগান দল এবারে আবার লীগ্ বিজয়ের সম্মান অর্জ্জন করল। এই নিয়ে তারা লীগ চ্যাম্পিয়ন্ হ'ল ৪ বার—১৯৩৯, ১৯৪৩, ১৯৪৪, ১৯৫১।

লীগে ২য় স্থান অধিকার করল গত বারের চ্যাম্পিয়ন্ ইষ্ট বেঙ্গল দল। তারা ইতিপূর্ব্বে পাঁচ বার লীগ চ্যাম্পিয়ন্ হয়েছিল। এবারেও তাদের চ্যাম্পিয়ন্ হবার আশা ছিল যথেষ্ট, কিন্তু মন্দ ভাগ্যের জন্য তা সম্ভব হয় নি। প্রথম খেলায় চ্যাম্পিয়ন্ মোহনবাগানের কাছে ৩-০ গোলে পরাজিত হ'লেও ২য় খেলায় তারা ২-০ গোলে মোহনবাগান দলকে হারিয়ে সে পরাজয়ের কতকটা শোধ নিতে পেরেছে।

আই. এফ. এ শীল্ডের খেলা সুরু হয়েছে; দেখা যাক কি হয়।

সুকুমার-স্মরণোৎসব

সন্দেশ-সম্পাদক ৺সুকুমার রায়ের নাম বাংলা শিশুসাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়, কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যেই তিনি বাংলার ছেলেমেয়েদের জন্য যে রস-ভাণ্ডার সৃষ্টি করে গেছেন তা আজও অফুরন্ত হয়ে আছে। সম্প্রতি শিশু-

সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকে একটি মনোরম স্মরণোৎসবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে একটি স্বর্ণখচিত মৃত্যু-উত্তর পদক দিয়ে। পদকটি তাঁর ছেলে শিল্পী শ্রীসত্যজিৎ রায়ের হাতে দেওয়া হয়। প্রবীণ শিশুসাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য

৺সুকুমার রায়

করেন, এবং বিভিন্ন সাহিত্যিকরা সুকুমারের বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সব শেষে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সুকুমারের রচিত কবিতা-নাটক ইত্যাদি আবৃত্তি ও অভিনয় ক'রে উপস্থিত সুধী-বৃন্দের মনোরঞ্জন করে। এতে শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅচিন্-নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅমিতাভ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅনি-রুদ্ধ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুপ্রিয় রায়, শ্রীদীপ্তিপ্রসাদ বসু, শ্রীরমা রায়, শ্রীমানসী রায়, শ্রীতানিয়া চক্রবর্ত্তী এবং আরো অনেকে অংশ গ্রহণ করেছিল।

শিশুসাহিত্যিকদের অভিনয়

সম্প্রতি শিশুসাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে আর একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জন' নাটক অভিনয়। বাংলার বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ও শিল্পীরা এতে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে ৬০।৭০ বছর বয়স্ক সাহিত্যিকরাও ছিলেন। দর্শকেরা সকলেই সাহিত্যিকদের এই অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন—শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীসুনির্ম্মল বসু, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, শ্রীশ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরাণী চক্রবর্ত্তী, শ্রীমীরা রায় চৌধুরী, শ্রীআশীষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীবারীন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীকল্যাণ রায়চৌধুরী, শ্রীদ্বিজেন্দ্র গুপ্ত এবং আরো অনেকে।

একজন দীর্ঘায়ু লোক

সম্প্রতি করিমগঞ্জে অলোকচন্দ্র দে নামে এক ব্যক্তি ১২৫ বছর বয়সে মারা গেছেন। বর্ত্তমান ভারতে তিনিই বোধ হয় ছিলেন সব চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও তিনি ছিলেন যুবক, তখন তাঁর বয়স ছিল ৩১ বছর। ইনি আগে শ্রীহট্টে থাকতেন, দেশ বিভাগের পর করিমগঞ্জে চলে আসেন।

আষাঢ় মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য পুরস্কার পেলেন—শ্রীভাবরী চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা)। আর যাঁদের লেখা ভাল হয়েছে :—শ্রীশ্যামল বসু (কাশী), শ্রীঅজয় মিত্র (মিত্রদীঘি), শ্রীকল্যাণী রায় চৌধুরী (কটক) ও শ্রীদীপঙ্কর ঘোষ (বিষ্ণুপুর)।

সুসংবাদ

কৃষ্ণনগর থেকে শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী জানিয়েছেন যে মেয়েটিকে আশ্চর্য্য ভাবে ফরিদপুরে পাওয়া গেছে। ওখানকার মোক্তার শ্রীসত্যরঞ্জন দত্ত এই ব্যাপারে যে মানবিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা নেই। এ বিষয়ে এ মাসের রামধনুর মলাটের ২য় পৃষ্ঠায় যে বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয়েছে এর পর তার আর কোন প্রয়োজন রইল না।

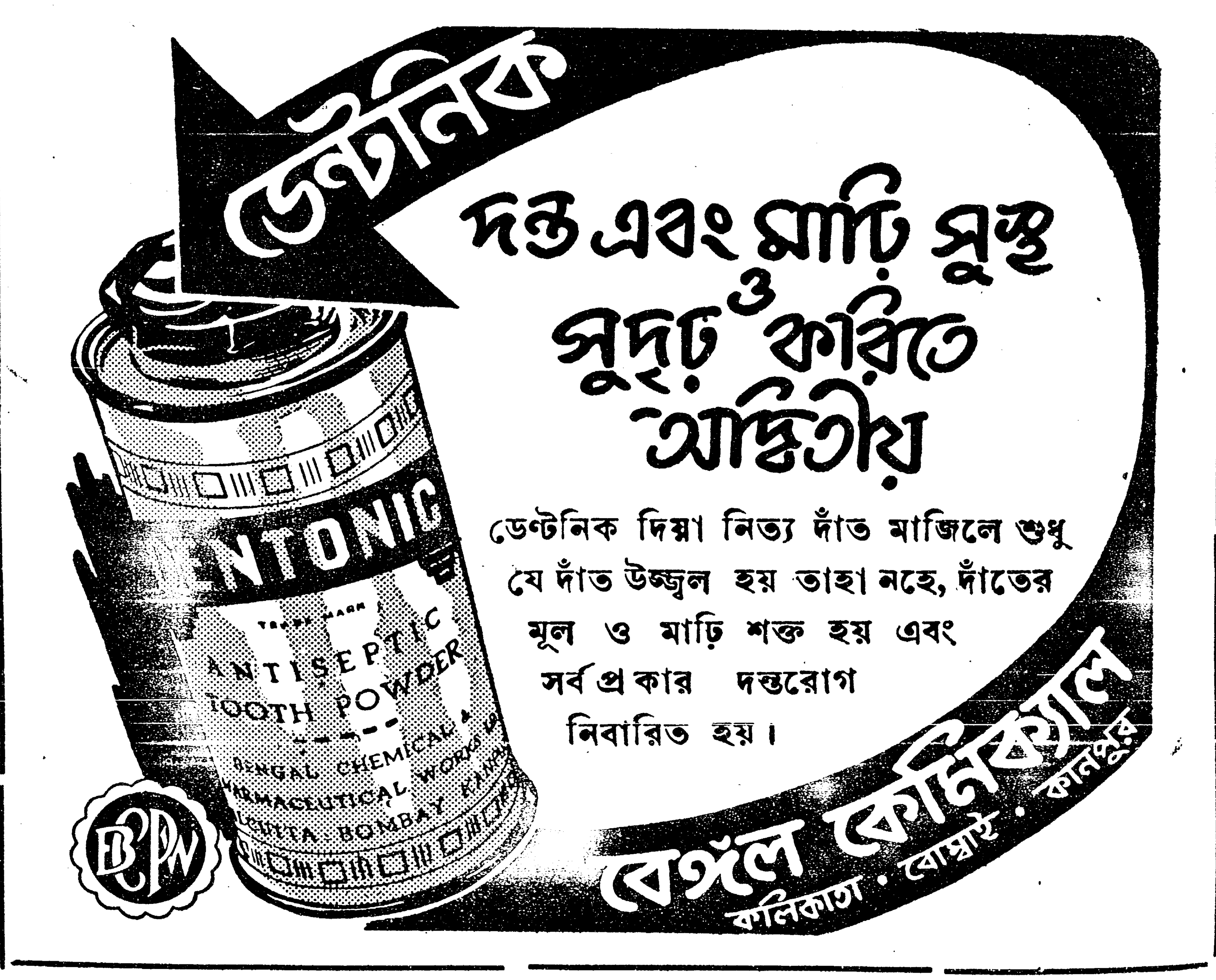

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

অক্ষয় সেকরা সোনার পাতটিকে $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, ১$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি এবং ৪$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি এই তিন ভাগে কাটল। তা হ'লে ১ ভরি, ৩ ভরি এবং ৯ ভরি ওজনের ৩টে টুকরো পাওয়া যাবে।

উত্তরদাতাদের নাম :—রত্না, জয়ন্ত, স্বপ্না ও ছন্দা রায় (বাঁকীপুর), দেবী বিশ্বাস (বেলগাছিয়া); অমল, কবিরাজ, নখু, শান্তি, লক্ষ্মী, মন্টু, তপু, তুতুল, বেবী ও মেসো মশাই (বালীগঞ্জ); দীপককুমার ধর (সোনালী—পূর্ণিয়া); সরিৎ দত্ত (গুড়াপ); মঞ্জুলা ও বাণী মজুমদার (বহরমপুর); দিলীপ সমাজদার (কলিকাতা-৪); ঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান); বীথি দাশগুপ্তা (বালিগঞ্জ); মুকুলরাণী মণ্ডল (কশাড়িয়া); জয়া, বিজয়া ও ছন্দা রায় (আইজটনগর); সুনীল, অনিল, হাবু, নন্দ ও বাবলু (মালদহ); শান্তা গুহ (করিমগঞ্জ); রমা, রুবি, ছবি, পিণাকী, সোমেশ্বর, গায়ত্রী, মীনাক্ষী, জ্যাকেন্দু (মেদিনীপুর); সুনীলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বিমল ও রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় (লখনউ), শিপ্রা দত্তগুপ্তা (নিউদিল্লী)।

নূতন ধাঁধা

রাম বাবু দশ বছর যাবৎ চাকরী করছেন। চাকরীতে ঢুকবার সময়ে তিনি যা মাইনে পেতেন এখন মাইনে বেড়ে তার পাঁচগুণ হয়েছে। কিন্তু প্রথম চার বছর তাঁর মাইনে এক পয়সাও বাড়ে নি। ৫ম বছরে হঠাৎ মাইনে বেড়ে যায় এবং যা পাচ্ছিলেন তার সঙ্গে সেই মাইনের আরও দ্বিগুণ যোগ হয়। কিন্তু এর দু' বছর পরেই দেশে ঘটল বিপর্য্যয়, রাম বাবুর চাকরীও যেতে বসে। অনেক বলে কয়ে শতকরা ২০ টাকা মাইনে কমিয়ে তিনি কাজে বহাল থাকেন। ৮ম বর্ষে দেশের অবস্থা একটু ভাল হওয়ায় তাঁর মাইনে আবার সিকি ভাগ বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তার পরের বছর তার সঙ্গে আরও ১০০ টাকা যোগ হয়। এ বছর আবার তাঁর মাইনে শতকরা ২৫ টাকা বেড়েছে। তা হ'লে এখন তাঁর মাইনে কত হ'তে পারে?

এ মাসের নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

এ সংখ্যার মুখপত্রে যে ছবিটি ছাপা হয়েছে (মায়ের কাছে) তার আর একটি মানানসই নাম দিতে হবে। যার নামকরণ সব চেয়ে ভাল লাগবে আমাদের কাছে, তাকেই পুরস্কার দেওয়া হবে। যে কেউ যোগ দিতে পারবে কিন্তু প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নীচের কুপনটি কেটে ভর্ত্তি ক'রে পাঠাতে হবে—যাতে ১০ই আশ্বিনের মধ্যে আমাদের হাতে পৌছায়।

নাম

ঠিকানা

রামধনু

ভাঃ পুঃ প্রঃ ৫৮

এই মাত্র বাহির হইল

* বিশ্ব-পরিচয় *

বা

পৃথিবীর ইতিহাস

মূল্য আট টাকা মাত্র

মানুষকে পূর্ণতা অর্জ্জন ক'রতে হ'লে, পৃথিবীতে সুন্দরের অবিনশ্বর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে, তা'র জ্ঞানতৃষা তৃপ্ত করতে হবে এবং এই তৃপ্তির জন্য প্রথমেই পড়তে হবে পৃথিবীর বিভিন্ন কালের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির ইতিহাস বা **"বিশ্বপরিচয়"**...

পৃথিবীর সকল দেশের বিবরণ সহ পাঁচ শতাধিক একবর্ণ ও বহু বর্ণ চিত্রে সমৃদ্ধ ৬½"×১০" আকারে পাঁচশত পৃষ্ঠার এক বিরাট গ্রন্থ, আধুনিক গেটআপ সুদৃশ্য বাঁধাই।

*** মূল্য অগ্রিম পাঠাইয়া দিলে ডাক-মাশুল ***
লাগিবে না

* সদ্য প্রকাশিত ক'খানা বই *

কাউন্ট অব মন্টিক্রিষ্টো (অনুবাদ)	১॥০	ভগৎ সিং	॥০
ডাঃ জেকিল এণ্ড মিঃ হাইড (অনুবাদ)	১॥০	যুগলাঙ্গুরীয়	১৲
গল্পের মায়াপুরী (গল্পের সংকলন)	২৲	ব্যথার দান	১৲
আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট (জীবনী)	১৲	ডাকাতের মুখোমুখী	১৲
জনসেবক লেলিন (জীবনী)	১॥০	মৃণালিণী	১৲

দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি ঝামাপুকুর লেন,
ফোন: বড়বাজার ৪৬৭, কলিকাতা ৯

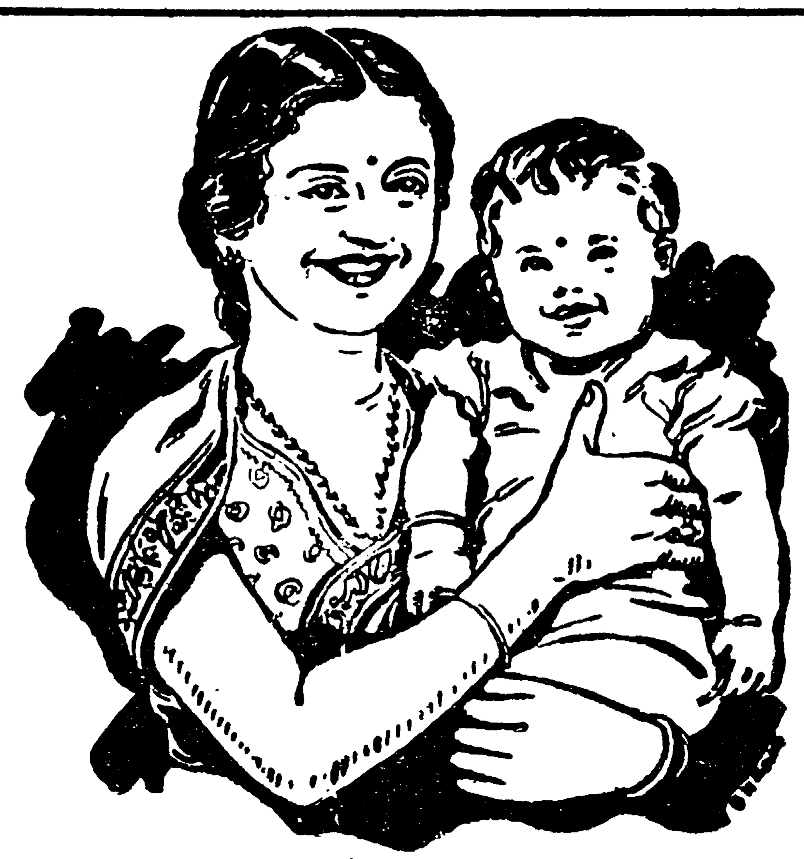

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের		অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের	
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা	১৲	ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি	১।০
বিজ্ঞান-বুড়ো	১৲	পদ্মরাগ	১॥০
আকাশের গল্প	১।০	সোনার হরিণ	১॥০
আবিষ্কারের গল্প	৸০	নূতন পুরাণ	৸৵০
ধূমকেতু	৸০	হাস্য ও রহস্য	৸৵০
অয়েল পেন্টিং (নাটক)	।০	চায়ের ধোঁয়া	৸০
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের			
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১৲	দমাদম্ দামোদর (নাটক)	।৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি রসা রোড, কলিকাতা ২৫

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

রকমারিতায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

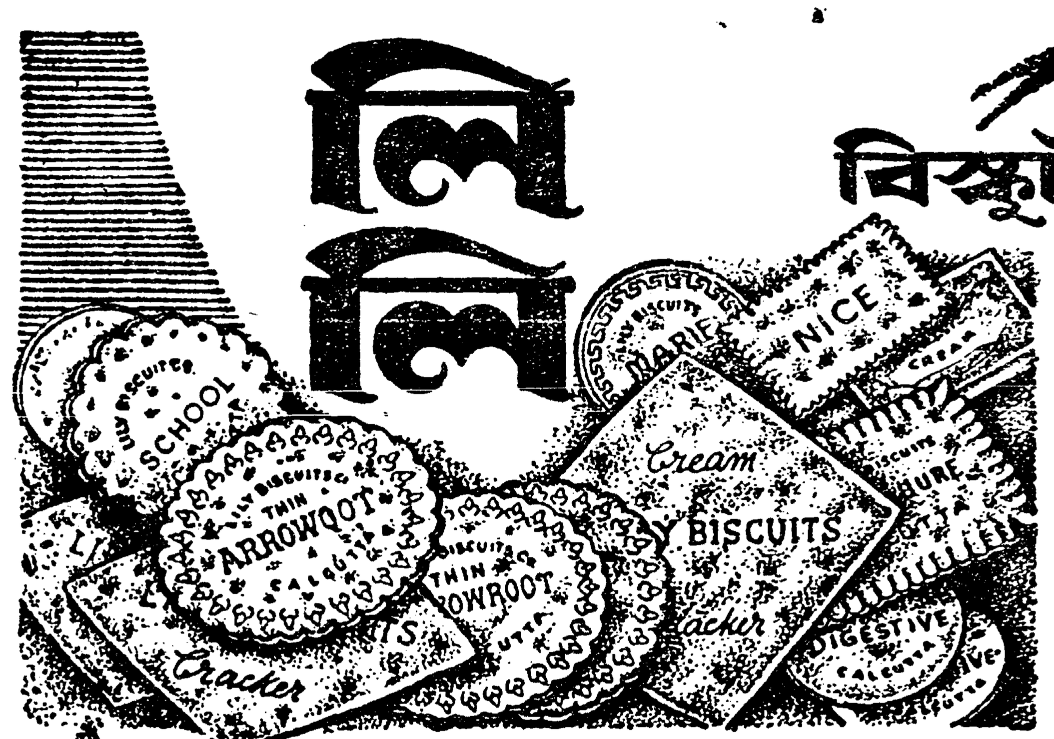

কয়েকটী মনোরম ও স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন-ক্রীম,
ক্যার্ণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ

৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

রামধনু

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস-সি.

কার্য্যালয় :
১৬, টাউনসেণ্ড রোড
কলিকাতা ২৫

একমাত্র

সুলেখা স্পেশাল

ফাউণ্টেন পেন
কালিতেই
এক্স-সল
" X-Sol "
সলভেণ্ট
আছে।

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রার্থনা

শারদীয়ার পুণ্য তিথিতে—
জাতির জয়যাত্রা কামনা করে

সলোমন এণ্ড কোং

২৯ ষ্ট্রাণ্ড রোড (মোহতা হাউস) কলিকাতা-১

নানা প্রকার ডিজেল—কেরোসিন—
পেট্রোল-ইঞ্জিন, হ্যাণ্ড ও পাওয়ার-
পাম্প—গ্যালভানাইজ্‌ড টিউব—
প্রভৃতি আমদানী ও প্রস্তুতকারক—

সোল প্রোপ্রাইটার : নৃপেন ভট্টাচার্য্য

'GRAM : 'AGRASTONS' * * * PHONE : BANK 4497

অমৃতসালসা

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বহুপ্রকার মূল্যবান্, রক্ত পরিষ্কারক ও বলকারক উপাদান ও স্বর্ণ সংযোগে প্রস্তুত—জগদ্বিখ্যাত "অমৃত সালসা" আজ ৫৫ বৎসর যাবৎ পূর্ণ সুখ্যাতির সহিত মানবসমাজে সুপরিচিত। রক্ত শোধন, বাত ও যাবতীয় দুর্ব্বলতা বিনাশে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। খোস, পাঁচড়া, চুলকানি, জটিল ও পুরাতন চর্ম্মরোগে, দুষিত ক্ষত এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় ইহা অদ্বিতীয় টনিক। সকল ঋতুতে সকলের পক্ষে বিশেষ ফলদায়ক।

১ শিশি ১।০, ৩ শিশি ৩।৵০, ১ ডজন ১২॥০, মাশুল স্বতন্ত্র।

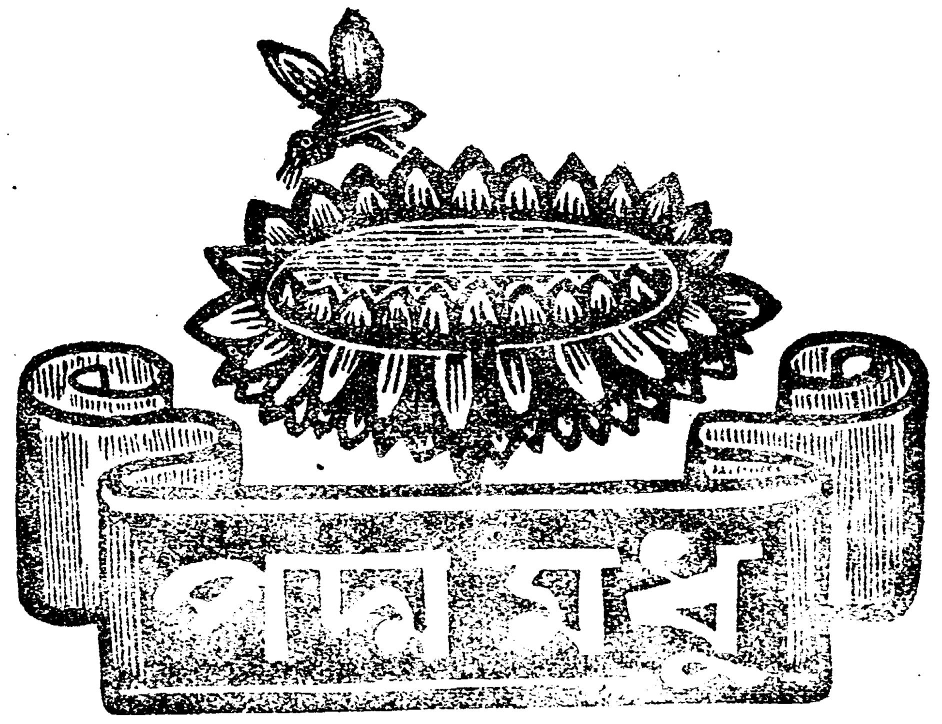

যাবতীয় চক্ষুরোগ ও ছানির মহৌষধ। মূল্য ১ শিশি ১।০, ৩ শিশি ৩।৵০

গৃহচিকিৎসার বাক্স

নিজে নিজেই সর্ব্বরোগের চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

২৬ প্রকার ঔষধযুক্ত। ১ বাক্স মূল্য ১২॥০

মকরধ্বজ—১ তোলা ৬।০ চ্যবনপ্রাশ—/১ সের ২৲

কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের

মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

১৪৪এ, আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা ৫

ফোন্ঃ বড়বাজার ৬০৫২

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৪শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৫৮ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শরতের ব্যথা

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এ কোথায় আজ এলেম মা মোরা—
কোন্ নাম-হারা গাঁয়!
রাখাল-বাঁশরী বাজে না মা হেথা
বিজন গোঠের ছায়।

কোথা মা মোদের ময়না নদী সে
নি-জন বালুর চরে—
ভায়ে-বোনে মিলে মাকে ঘিরে খেলা
সবুজ আঙিনা 'পরে।

পাল-তোলা ডিঙা দূরে ভেসে যায়
কোন গাঁয়ে নাহি জানি,
ওপার হ'তে মা হেসে কারা নিতি
ডাকে দিয়ে হাতছানি।
এপারে ওপারে নিতি ডাকাডাকি
আঁধার আলোর সাথে,
মায়ের কোলের নিঝুম ঘুমটী
নেমে আসে আঁখিপাতে।
উতলা বাতাসে সাদা কাশে কাশে
কত চরে কত খেলা,
মেঘ রোদ্দুরে কত লুকোচুরি—
ভরা শরতের বেলা।
কানায় কানায় ভরে ওঠে নদী
আঙিনায় ওঠে জল,
সবুজ মাঠের অগাধ সুষমা—
দীঘি ভরা শতদল।
কত গাঁয়ে গাঁয়ে মিলে বোনে ভায়ে
কত কাঁদা—কত হাসা,
সুখে দুখে মেলা স্বর্গের খেলা—
বুক ভরা ভালবাসা।
এ কোথায় আজ এসেছি মা মোরা
ছেড়ে সে সোনার চর,
ওপারে পদ্মা—ওপারে পদ্মা
কলাঝাড়ে ঘেরা ঘর।
মাগো মা আবার চলো ফিরে যাই
মোদের সে হারা ঘরে,
শরতের ভোরে ডিঙাখানা বেয়ে
ভেঙে-পড়া বালুচরে।

রায় পাহাড়ীর নিশাচর

শ্রীঅমলেন্দু সেন

২১

"আমার উদ্দেশ্য ছিল, এক ঢিলে দুই পাখী মারব। খুনের দায়ে তুমিও নাকাল হবে, আর আমি মারা গেছি জেনে পাওনাদাররাও আমার আশা ছেড়ে দেবে। তার জন্য অবশ্য আমার লুকিয়ে থাকা দরকার। তাই পরের জাহাজেই রেঙ্গুন পালিয়ে গেলাম।

"এদিকে ব্যাপারটা যে এত দূর গড়াবে, তা ভাবি নি। আমি মনে করেছিলাম যে পুলিস একটু ভাল করে দেখলেই বুঝতে পারবে যে কঙ্কালটা জাল আর খুনটা মিথ্যে। কয়েকটা দিন কষ্ট পেয়ে তুমি ছাড়ান পাবে, আর ততদিনে আমিও একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারব। কিন্তু তুমি হঠাৎ পালিয়ে যাওয়ায় পুলিস ধরে নিল যে খুনটা সত্যি, আর খুনী তুমিই।

"রেঙ্গুনে এসে ডাক্তারী সুরু করে দিলাম। মধ্যে মধ্যে মনে হ'ত যে তোমাকে সব কথা জানাতে পারলে ভাল হয়, কিন্তু কোথায় পাব তোমাকে?

"এ ভাবে অনেক বছর কেটে গেল। তার পর হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল রঘুর সঙ্গে। আমি তাকে চিনতে পারি নি। সে আমাকে চিনেছিল আমার আঙুলের ওপরকার আঁচিলটা দেখে। তারপর আমার বাড়ীতে এসে সব কথা বলে। তুমি যে বেঁচে আছ, তার এ সন্দেহের কথাও শুনলাম। তাকে বললাম

যে সে আগে এসে দেখুক সে কথা ঠিক কিনা। যদি ঠিক হয় তা হ'লে আমাকে টেলিগ্রাম করে দিতে বললাম। আর বলেছিলাম যে টেলিগ্রাম পেলেই আমি নিজে এখানে আসব তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে।

"বল, দাদা, আমাকে তুমি ক্ষমা করেছ?"

দুই ভাইয়েরই চোখে এক এক ফোঁটা জল দেখা দিল।

ধরণী বাবুর কথা শেষ হ'ল। ঘরের ভিতর সবাই খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। কিন্তু আমি আর থাকতে পারছিলাম না,—হঠাৎ বলে বসলাম, "লালু কি করে এখানে এল?"

উত্তর দিলেন হরিশ কাকা। তিনি বললেন ঃ

"সে কথা আমি বলছি। রঘুর কাছে সব কথা শুনেই রাজাবাহাদুরের আগে মনে হ'ল লালুর কথা, তার পর সেই রসিদখানা উদ্ধার করবার কথা। আমাকে তখন রসিদের কথাটা বলেছিলেন, আমি কলকাতায় চলে এলাম।

"কলকাতা পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তাই আগে গেলাম বেলেঘাটায়। রাজাবাহাদুর বলে দিয়েছিলেন যে খিড়কীর দিকে একটা গলি আছে, সেদিক দিয়ে বাড়ীতে চুপিচুপি ঢুকবার সুবিধে। পাঁচীল টপকে ঘরখানার কাছে এসে দেখি যে ভেতরে আলো দেখা যাচ্ছে।

"ভাবনায় পড়ে গেলাম। ঘরে লোক রয়েছে দেখছি। একবার ভাবলাম যে বেশী রাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে দেখব, বাড়ীর লোক সব ঘুমোলে তার পর যা হয় একবার চেষ্টা করে দেখা যাবে। তবু কৌতূহল হ'ল, সাবধানে এগিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি মেরে দেখি,—লালু!

"সে তখন রসিদখানা লুকানো জায়গা থেকে বের করেছে। মোমবাতির আলোয় ঝুঁকে পড়ে সেটাকে দেখছিল। আমি ভাঙা জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লাম। আমাকে দেখে লালু চমকে উঠল, কিন্তু সে এক মুহূর্ত্তের জন্য।

"তাড়াতাড়ি সব কথা তাকে সংক্ষেপে বললাম। তার বাবা যে কে, এবং তিনি বেঁচে আছেন আর দেখবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাও বললুম তাকে। এ শুনে লালু ভয়ানক অস্থির হয়ে পড়ল তক্ষুনি রায়পাহাড়ীতে আসবার জন্য। আমি জানতুম না যে তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছ। লালুরও সে কথা খেয়াল হ'ল না। কাজেই তোমার কোনও খোঁজ না করেই আমরা খিড়কীর দিক্‌কার

গলি দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সেই রাত্তিরের শেষ গাড়ীতে রওনা হয়ে আমরা এখানে চলে এলুম।

"আঠারো বছর কত দুঃখ-কষ্ট সইবার পর রাজাবাহাদুর তাঁর সন্তানকে দেখলেন। লালুও তো জ্ঞান হবার পর এই প্রথম দেখল তার বাবাকে। যে দৃশ্যটা তখন দেখলাম সে কথা আর মুখে কি বলব?

"তারপর একটু ঠাণ্ডা হ'তেই লালুর আগে মনে পড়ল তোমার কথা। এ সুখের ভাগ তোমাকে না দেওয়া পর্য্যন্ত তার মন শান্ত হচ্ছিল না। আমাকে তাই আবার ছুটতে হ'ল তোমাকে নিয়ে আসবার জন্য। বড় ভালবাসে তোমাকে লালু।"

হরিশ কাকার কথা শেষ হ'তেই আমি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম লালুকে। অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বলতে পারলাম না। মুখে ফুটল শুধু একটী কথা: "লালু!"

লালু তাতেই সব বুঝতে পারল। সেও আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, "ভাই!" তারও গলা জড়িয়ে এল।

... ...

এ কথাটী এখানেই ফুরোলো।

এ ঘটনার পর কত বছর পার হয়ে গেছে। কত পুরোনো মানুষ চলে গেল, কত নতুন মানুষ পৃথিবীতে এল। আমরাও বুড়ো হ'তে চললাম।

লালু এখন রায়পাহাড়ীর রাজা, আর আমি আমাদের গ্রামের স্কুলের গরীব মাষ্টার মাত্র। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব অটুট আছে আজও।

—শেষ—

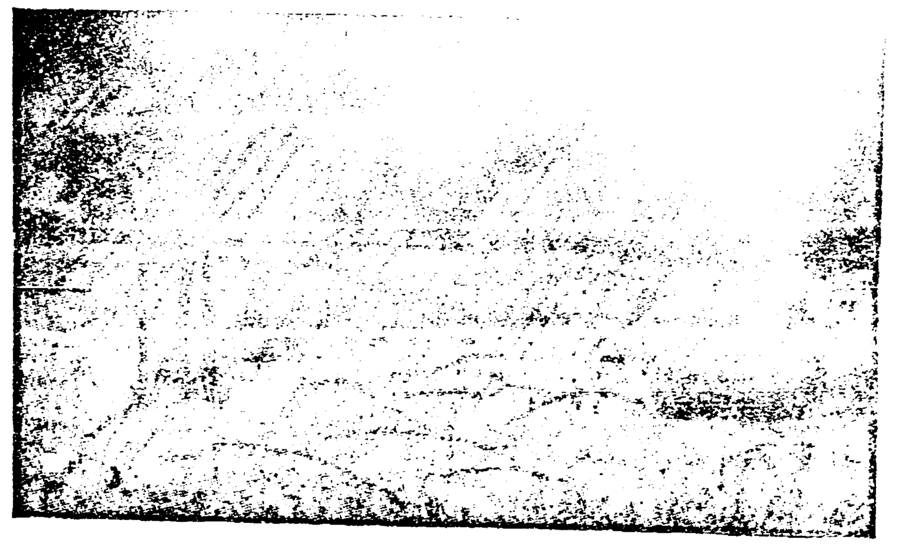

আমার দেশের মানুষ

(গল্প)

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

বাগেরহাট ও ঢাকায় গোলমাল সুরু হবার ফলে হিন্দু বাস্তুহারার দল পূর্ববঙ্গ ছেড়ে দলে দলে কলকাতায় এসে পৌছালো, এবং কলকাতায় স্থান সঙ্কুলান না হওয়ার জন্য সহরের বাইরে কুড়ি-পঁচিশ মাইল ব্যেপে তারা ছড়িয়ে পড়লো। খালি বাড়ী আর একখানিও খালি রইল না। কলকাতার বাহিরে গঙ্গার ধারে জিতেন বাবুর একখানি পৈতৃক বাড়ী ছিল। বাড়ীখানি এতদিন খালিই পড়ে ছিল, জিতেন বাবু এবার উঠে পড়ে লাগলেন সেটিকে বাসযোগ্য করে তুলতে। বললেন—দোতলা বাড়ী, চারখানা ঘর, পুকুর আছে, বাগান আছে। এবার রীতিমত ভাড়া তুলবো!

হাজারখানেক টাকা খরচ করে পুরানো বাড়ী রীতিমত মেরামত করা হ'ল। তারপর খানকয়েক 'টু লেট্' লিখে তিনি বাহির হলেন ষ্টেশনের আশেপাশে সেঁটে দেবার জন্য।

টিকিট-ঘরের পাশে প্রথম 'টুলেট্'খানি সবে মাত্র সেঁটেছেন এমন সময় পাশ থেকে একটি লোক বলে উঠলো—আপনিই জিতেন বাবু বুঝি? আজ ক'দিন ধরে আপনার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছি। আপনার বাড়ীখানা আমিই ভাড়া নিতে চাই।

জিতেন বাবু এইটাই আশা করেছিলেন, হেসে বললেন—বাড়ী আপনি দেখেছেন?

—বাইরে থেকে দেখেছি। উপর নীচে চারখানা ঘর আছে, ওতেই আমার কুলিয়ে যাবে। তা ছাড়া বাগান ও পুকুরটাও তো ভোগ করতে পাবো।

জিতেন বাবু বললেন—সে তো বটেই। ও বাড়ীতে যে থাকবে, বাগান ও পুকুর সেই ভোগ করবে।

—আমরা, মশাই, পাড়াগেঁয়ে লোক, পুকুর বাগানটাই আমরা ভালো বুঝি! হেঁ হেঁ হেঁ! খুলনা টাউনের দু' মাইল দূরে আমাদের বাড়ী মশাই! এক বিঘের উপর একটা পুকুর আছে সেখানে! সেখান থেকে এসে কলকাতার সহরের ইটের পাঁচীলের মধ্যে মন টিঁকবে কেন? তাই আমি এই রকমই একটা বাড়ী খুঁজছিলাম। তা ভগবানের আশীর্বাদে যখন মিলে গেছে, তখন আমি আপনাকে ছাড়ছি না! হেঁ হেঁ হেঁ!

প্রথম আলাপেই লোকটিকে বেশ ভালো মানুষ বলে মনে হ'ল। বললেন—চলুন, আমিও এই ট্রেনে কলকাতায় ফিরবো, আপনার সঙ্গে একসঙ্গেই ফেরা যাক্।

ট্রেনে উঠে উপেন বাবু ভাড়ার কথা পাড়লেন, বললেন—আপনি কত ভাড়ায় বাড়ীটা দিতে চান?

—কত ভাড়া হওয়া উচিত আপনিই বলুন?

—যদি ন্যায্য ভাড়া জিজ্ঞাসা করেন তা হ'লে আমি বলবো ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা। তবে এখন তো কেউ ন্যায্য ভাড়া চাইছে না।

—দেখুন, কলকাতায় আমিও ভাড়া দিয়ে থাকি। ভাড়াটেকে শোষণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। সেই জন্য ন্যায্য ভাড়াটা আপনিই ঠিক করবেন। আমি দরাদরি করবো না।

—আপনি তা হ'লে আমাকে ত্রিশ টাকায় ওটা দিন।

—বেশ, তাই হবে। মাসিক ত্রিশ টাকাই আপনি দেবেন।

—আর সেলামী?

—সেলামী আমি এক পয়সাও চাই না, ভাড়াটা মাস কাবারে ঠিকমত পেলেই আমি খুসী।

উপেন বাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, বললেন—আপনি সত্যিই সজ্জন। আপনার মত মানুষ এ যুগে বড় একটা মেলে না। আজ আমাদের বিপদের সুযোগ নিয়ে যে যে ভাবে পারছে আমাদের শোষণ করছে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, প্রতি মাসে সাত তারিখের মধ্যে আমি আপনার বাড়ীতে ভাড়া পৌছে দিয়ে আসবো। কলকাতায় তো আমাকে রোজই আসতে হবে। মাসে একটা দিন কি আর আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে পারবো না? আপনার মত নির্লোভী লোককে দর্শন করাও পুণ্য মশাই!

উপেন বাবু হাওড়ায় নেমে বরাবর জিতেন বাবুর সঙ্গে এলেন। ত্রিশটি টাকা জিতেন বাবুর হাতে দিয়ে সেই দিনই বাড়ীর চাবি নিয়ে গেলেন।

জিতেন বাবু হিসাবী লোক, ছেলেকে বললেন,—যে টাকাটা খরচ করেছি তিন বছরে তা সুদ সমেত উঠে আসবে। তারপর যা হবে সব উদ্বৃত্ত! জমি ও বাড়ীতে টাকা লাগালে কখনও লোকসান হয় না।

দেখতে দেখতে একটি মাস কেটে গেল। রবিবার দিন জিতেন বাবু বাড়ী থেকে আর বেরুলেন না। আজ উপেন বাবুর ভাড়া দিতে আসার দিন। ত্রিশ টাকার বিল লিখে এক আনার টিকিটের উপর সই করে বসে রইলেন, উপেন বাবু ভাড়া দিলে রসিদ দিতে হবে। কিন্তু সকাল আটটা থেকে বসে বসে রাত আটটা হয়ে গেল, উপেন বাবু এলেন না।

সোমবার আপিস যাবার আগে জিতেন বাবু ছেলেকে বলে গেলেন—বিল লেখা রইল, উপেন বাবু এলে ভাড়া নিয়ে বিল দিবি।

কিন্তু কোথায় উপেন বাবু! সোমবার ছেড়ে শনিবার এসে গেল, উপেন বাবুর দেখা নেই। রবিবার দিন দুপুরে জিতেন বাবু ছুটলেন দেশে। উপেন বাবুর নাম ধরে কয়েক বার ডাকাডাকি হাঁকাহাকি করার পর দোতলার বারান্দায় এক বৃদ্ধাকে দেখা গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কে বাবা তুমি? কি চাও?

—উপেন বাবু আছেন ?

—না, সে কলকাতায় গেছে।

—আমি কলকাতা থেকে আসছি, তাঁর সঙ্গে আমার দরকার ছিল।

—আচ্ছা, উপীন এলে তাকে বলবো।

—বলবেন, জিতেন বাবু এসেছিলেন কলকাতা থেকে, ভাড়াটা তিনি যেন দিয়ে আসেন।

—আচ্ছা বাবা!

জিতেন বাবু ফিরলেন। সমস্ত পথটা তিনি ভাবতে ভাবতে এলেন, বাড়ী ফিরেই হয়তো শুনবো উপেন বাবু ভাড়া দিয়ে গেছেন।

কিন্তু বাড়ী ফিরে তিনি তেমন কিছুই শুনতে পেলেন না। সোমবার থেকে শনিবার পর্য্যন্ত ভাড়াটের চিন্তাতেই জিতেন বাবুর কাটলো। রবিবার তিনি আবার ছুটলেন দেশে। ডাকাডাকি করতেই এক যুবক বাহির হয়ে এলো, বললো,—ভাড়ার কথা তো আমরা কিছুই জানি না, দাদা ফিরলেই আমি বলবো। কাল বা পরশুর মধ্যে আপনি নিশ্চয়ই ভাড়া পেয়ে যাবেন।

জিতেন বাবু অনেক শক্ত কথা মনে মনে ভেঁজে গিয়েছিলেন, কিন্তু বলবেন কাকে? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,—তোমার মা আছেন ?

—না। মা আজ কলকাতায় গেছেন।

কাজেই জিতেন বাবুকে ফিরতে হ'ল।

তারপর কালও গেল, পরশুও গেল, উপেন বাবু এলেন না। শেষে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন জিতেন বাবু। স্থির করে ফেললেন যে এই রবিবারে ভাড়া না নিয়ে তিনি ফিরবেন না। যত দেরীই হোক তিনি বসে থাকবেন। হাজার টাকা খরচ করে তিনি বাড়ী সারালেন, সে কি বিনা ভাড়ায় লোককে থাকতে দেবার জন্য!

কিন্তু রবিবার পর্য্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হ'ল না। শনিবার সকালেই তিনি চিঠি পেলেন: আপনাদের বাড়ী আজ দু' দিন খালি পড়ে আছে। আপনি সত্বর এসে চাবি দেবার ব্যবস্থা করে যাবেন।

শনিবার আপিস থেকেই জিতেন বাবু ছুটলেন দেশে।

বাড়ী খাঁ খাঁ করছে। দরজা জানালা সব খোলা। বাড়ীর তালা-চাবি উপেন বাবু ফেরৎ দেন নি, সেগুলি তিনি খুলে নিয়ে গেছেন। ভিতরে ঢুকে তো জিতেন বাবুর চক্ষুস্থির! দু'টি জানালা ও একটি দরজার একখানিও পাল্লা নেই। ভাড়াটে শুধু ভাড়াই ফাঁকি দেয় নি, জানালা-দরজা পর্য্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। দু'টো ভালো হব্‌সের তালা পর্য্যন্ত নিয়ে গেছে। জিতেন বাবুর মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল, কিন্তু কাকে কি বলবেন? তখনই প্রতিবেশীর কাছ থেকে একটা তালা নিয়ে বাড়ীর দরজায় লাগালেন। তারপর বাজারে গেলেন একটি তালা কিনতে।

মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল। ত্রিশ টাকা দিয়ে দু' মাস থেকে দু'শ' টাকার মাল হস্তগত করে ভাড়াটে বিদায় নিয়েছে। অচেনা লোককে ভাড়া দিয়ে তিনি কি বোকামিই

করেছেন! সোজা ষ্টেশনে ফিরে না গিয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে তিনি হাঁটতে সুরু করলেন। গঙ্গার হাওয়ায় মাথাটা তবু একটু ঠাণ্ডা হবে।

ঘণ্টাখানেক গঙ্গার হাওয়া খেয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা হ'ল। ইতিমধ্যে প্রায় মাইল তিনেক পথ তিনি পার হয়ে এসেছেন। পরের ষ্টেশন থেকে ট্রেন ধরার জন্য এবার তিনি ষ্টেশনের দিকে চললেন।

পথ সংক্ষেপ করার জন্য একটি গলি পার হচ্ছেন, এমন সময়ে সহসা চোখে পড়লো একখানি [illegible]ন বাড়ী তৈরী হচ্ছে। বাড়ীর সামনে উপেন বাবুর মত কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। জিতেন বাবু ভালো করে ঠাহর করে দেখলেন—হ্যাঁ, উপেন বাবুই তো বটে! কাছে গিয়ে বললেন—কি মশাই ?

উপেন বাবু বললেন—কি চাই আপনার ?

—কি চাই মানে ? আমার ভাড়া তো মারলেন, শেষে আমার জানালা-দরজাগুলোও খুলে এনেছেন ?

—আপনি কি বলছেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

—তা পারবেন কেন ? কিন্তু এই জানালা-দরজার পাল্লা আপনি কোথায় পেলেন ?

ছুতোর জানালা-দরজা ফিট করছিল, জিতেন বাবু সেইগুলি দেখিয়ে দিলেন।

উপেন বাবু বললেন—ত্রিশ টাকা দিয়ে কিনেছি। কেন ?

—কিনেছেন ? বটে! আপনি তো আচ্ছা জোচ্চোর মশাই!

—আপনি তো বেশ লোক মশাই! আপনার সঙ্গে আলাপ নেই, পরিচয় নেই, আপনি খামখা আমাকে গালাগালি সুরু করলেন!

—আমার বাড়ীর জানালা-দরজা খুলে আনলেন, আর আমি আপনাকে পূজো করবো ?

—আপনার ভুল হয়েছে, আপনি লোক চিনতে ভুল করেছেন।

—আমার জানালা-দরজাগুলোও কি আমি ভুল করেছি? এইজন্যই এ দেশের লোক পাকিস্থানী বাঙালদের ভাড়া দেয় না।

—ওঃ! আপনি আমাকে পাকিস্থানী বাঙাল ভেবেছেন বুঝি? আমি তো বলেছি আপনার লোক চিনতে ভুল হয়েছে। আমি, মশাই, খাস কলকাতার লোক। নিত্য গঙ্গাস্নান করবো বলে এখানে বাড়ী করছি। এ অঞ্চলে আমাকে সবাই চেনে। দ্বিজেন বাবু নাম বললেই চিনবে। তালতলায় আমার বাড়ী, তিন পুরুষের বাস ওখানে। আপনার ব্যাপারটা কি সব খুলে বলুন তো শুনি ?

জিতেন বাবু আর কি বলবেন! সেই মানুষ, সেই গলা, অথচ উপেন বাবু দ্বিজেন বাবু হয়ে গেল! তাঁর বাড়ীর জানালা-দরজা তিনি চেনেন না! হতবাক্ হয়ে জিতেন বাবু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁরই চোখের সামনে তাঁরই বাড়ীর জানালা-দরজা দ্বিজেন বাবুর বাড়ীতে ফিট হ'তে লাগল। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি পা চালালেন। দ্বিজেন বাবু পিছু ডাকলেন, বললেন,—আপনার ব্যাপারটা কি বলে গেলেন না ?

জিতেন বাবু একবার পিছন পানে তাকালেন। দ্বিজেন বাবু দাঁড়িয়ে হাসছেন—সেই মুখ সেই হাসি! ওই যে উপেন বাবু সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মনের কথা মনেই চেপে রাখা ছাড়া তো উপায় নেই! উনি দ্বিজেন বাবু, খাস কলকাতার লোক, কলকাতায় তিন পুরুষের বাস।

ট্রেনে আসতে আসতে জিতেন বাবু প্রতিজ্ঞা করলেন—বাড়ী আর তিনি ভাড়া দেবেন না। যা খরচ হয়েছে হোক, চাবি দিয়ে ফেলে রাখবেন সে-ও ভালো। তাতে নতুন করে লোকসান কিছু হবে না।

রামলক্ষ্মণ-কথা

শ্রীকার্ত্তিক মজুমদার

রাম বাবু, লক্ষ্মণ বাবুকে তোমরা চেন? তোমরা চিনবেই বা কোত্থেকে, এত কাল পাশের বাড়ীতে থেকে আমিই ভাল ক'রে ওদের চিনতে পারলাম না! দু' ভায়ের অদ্ভুত মিল। চোখ, মুখ, কান, এমন কি পাট ক'রে চুল আঁচড়ালে চাঁদির উপরে চারটে চুল দু'জনেরই খাড়া হয়ে থাকে সব সময়ে। তোমার আমার সাধ্য নেই কোন্ জন যে কে তা চিনে বের করবার। ওদের মায়ের নাম কৌশল্যা নয় বটে কিন্তু কি কৌশলে যে তিনি তাঁর পুত্র দু'টিকে চিনে বের করতেন সেটাই আশ্চর্য্য লাগে। তবে এ কথা ঠিকই, রামের অপরাধে লক্ষ্মণকে বা লক্ষ্মণের দোষে রামকে বহুবার প্রহার খেতে হয়েছে।

এখন অবিশ্যি তাঁরা অনেক বড় হয়ে গিয়েছেন। দস্তুর মত রাম বাবু, লক্ষ্মণ বাবু। গলায় গলায় দু'জনের ভাব। একসঙ্গে অফিস যান, ট্রামে একখানা টিকিট করেন, এক রঙের জামা পরেন। অফিস থেকে ফিরে এসে একসঙ্গে খান, তারপর সাজগোজ ক'রে একসঙ্গে বেরিয়ে যে যার পথে যান্। সাজগোজ করার সময় শুনেছিলাম তাঁদের আয়না লাগে না। সত্যি কথা বলতে কি, রাম বাবু, লক্ষ্মণ বাবুদের ঘরে কোনো আয়নাই নেই। মিছেমিছি বাজে খরচ। দু'জনে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ও ওকে দেখে'নেন, ব্যস, আয়নার কাজ চুকে যায়।

মুস্কিল হয় আমাদের। নির্ব্বুদ্ধিতার কথা তোমাদের বলতে বাধা নেই,

বোকার মত রাম বাবুকে আমি পাঁচটা টাকা ধার দিয়েছিলাম, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তা আর খারিজ করতে পারলাম না। রাম বাবুর দেখা পাই না যে না তা নয়, দেখা পাই। বিকেলের দিকে বড় রাস্তার মোড়ে দেখা হ'তেই চায়ের দোকান থেকে চা খাওয়া অসমাপ্ত রেখেই হয়ত ছুটে এসে বললাম, 'রাম বাবু, আমার সেই ইয়ে টাকাটা—'

রাম বাবু চোখ বড় বড় ক'রে বলেন, 'আপনি ভুল করছেন মশাই, আমি রাম বাবু নই, আমি তার ভাই লক্ষ্মণ।' বলেই সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যেমন যাচ্ছিলেন তেমন বেরিয়ে যান।

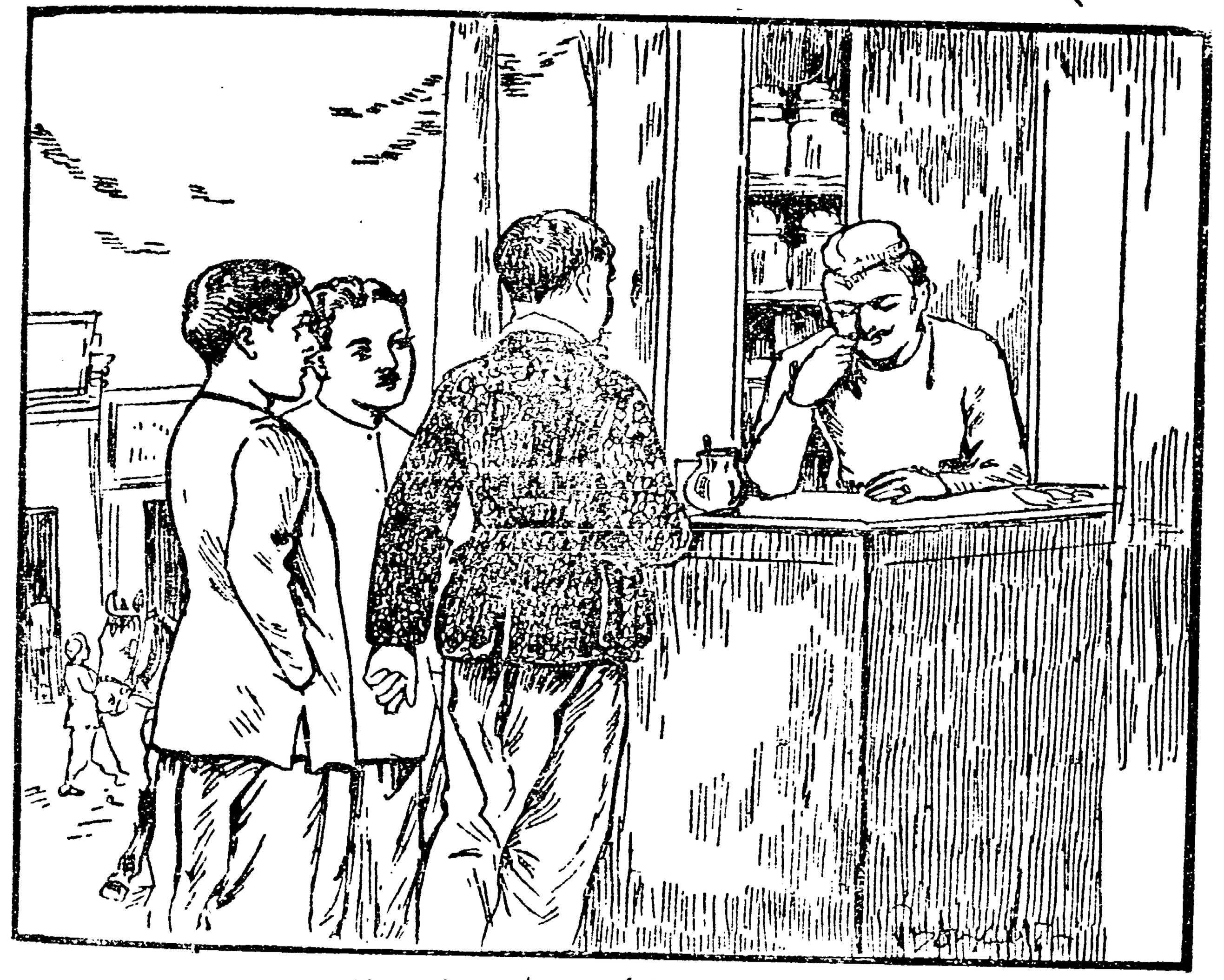

পানওয়ালা···উপায় ঠাউরেছে।

যখনই ধরি তখনই এই কথাই শুনি। তখনই মনে হয় আমারই ভুল হয়েছে। ক্ষমাও চাই মাঝে মাঝে। রাম বাবু কি লক্ষণ বাবু (ঈশ্বর জানেন কে) ক্ষমাও করেন অবশ্য। কিন্তু এ জীবনে আমার সেই পাঁচ টাকা আর উদ্ধার হ'ল না। তোমরা কোনও পন্থা বাতলাতে পারো এই মুস্কিলের?

মোড়ে সিগারেট-পানওয়ালারও অবস্থা আমার মত। কিন্তু সে একটা উপায় ঠাউরেছে। অবিশ্যি সে মুস্কিল আসানের ঝুক্কি আছে। তার পন্থা হচ্ছে রাম-লক্ষ্মণের একজনকে পৃথিবী থেকে সরাতে পারলেই সব কিছু জল হয়ে যাবে। জিজ্ঞেস করছিল আমার সঙ্গে কোনো ভাল গুণ্ডার আলাপ আছে কিনা। তা হ'লে সন্ধ্যার দিকে লক্ষ্মণকে এক ফাঁকে শক্তিশেল দিয়ে পৃথিবীতে শুধু রামকে রাখলেই ল্যাঠা চুকে যায়। তা হ'লেই সব কিছু গণ্ডগোলের অবসান হয়ে যায়।

পানওয়ালার প্ল্যানটা আমার মনে ধরেছে, কিন্তু এখনো সবটা না তলিয়ে ভেবে 'হ্যাঁ' 'না' কিছু বলি নি।

শুধু কি পানওয়ালা? আমাদের প্যারিস হেয়ার কাটিং সেলুনের প্রাণকেষ্ট পরামাণিক কি কম বেকুফ্ হয়েছে?

প্যারিস হেয়ার কাটিং সেলুনে পূরো দস্তুর কাজ চলছে। কঁ্যাচো কঁ্যাচো কাঁচির আওয়াজ আর নানা লোকের কথাবার্ত্তায় চারধারটা একেবারে সরগরম। রাম বাবু এসে ঢুকলেন, দাড়ি কামাবেন। পরামাণিক এসে গালে সাবান ঘষতে যাবে, রাম বাবু তাকে ধমকে উঠলেন, 'এই, ভাল ক'রে কামিও, ক্ষুরে ধার দিয়ে নিও। পূরো পয়সা নিয়ে সব ফাঁকির কারবার চালাচ্ছো। এই দাড়ি কামিয়ে যাব আবার আধ ঘণ্টার মধ্যে গজিয়ে উঠবে! —তখন আবার এখানে আসো, আবার তিন গণ্ডা পয়সা গচ্চা।'

এত কথা! পরামাণিকের পোর আঁতে ঘা লেগে গেল। খানিকটা গুম হয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা বাবু, আধ ঘণ্টা বাদে আপনার যদি দাড়ি গজায় ত' আমি বিনি পয়সায় আবার কামিয়ে দেব।' গাঁইগুঁই করতে করতে সে রাম বাবুর দাড়ি কামিয়ে দিল নিখুঁৎ ভাবে। একটা দাড়ির গোড়া পর্য্যন্ত দেখা যায় না।

আধ ঘণ্টা বাদে সেই পরামাণিকের পো অবাক্ হয়ে দেখল সেই বাবু এসে হাজির। একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি সমেত। দিনের বেলায় চোখকে অবিশ্বাস করা যায় না। বিনি পয়সায় কামিয়ে দেবার কথা ছিল, তাই পরামাণিকের পো বিনিবাক্যে সাবানের ফেনা ঘষতে সুরু ক'রে দিল। দাড়ি কামাবার সময় একবার পরখ ক'রে দেখল সত্যিই আসল দাড়ি। তার সুদীর্ঘ দাড়ি কামাবার জীবনে এমন পরমাশ্চর্য্য ঘটনা সে দেখে নি। মনে মনে নিজেকে ধন্য মনে করল।

দাড়ি কামানো হ'লে লক্ষ্মণ বাবু একটু বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'কি, বাজে কথা বলছিলাম?'

এবার আর পরামাণিকের পো সাহস ক'রে কিছু বলল না।

চিত্রশালা

প্রাচীন রোমের খেলাধুলা

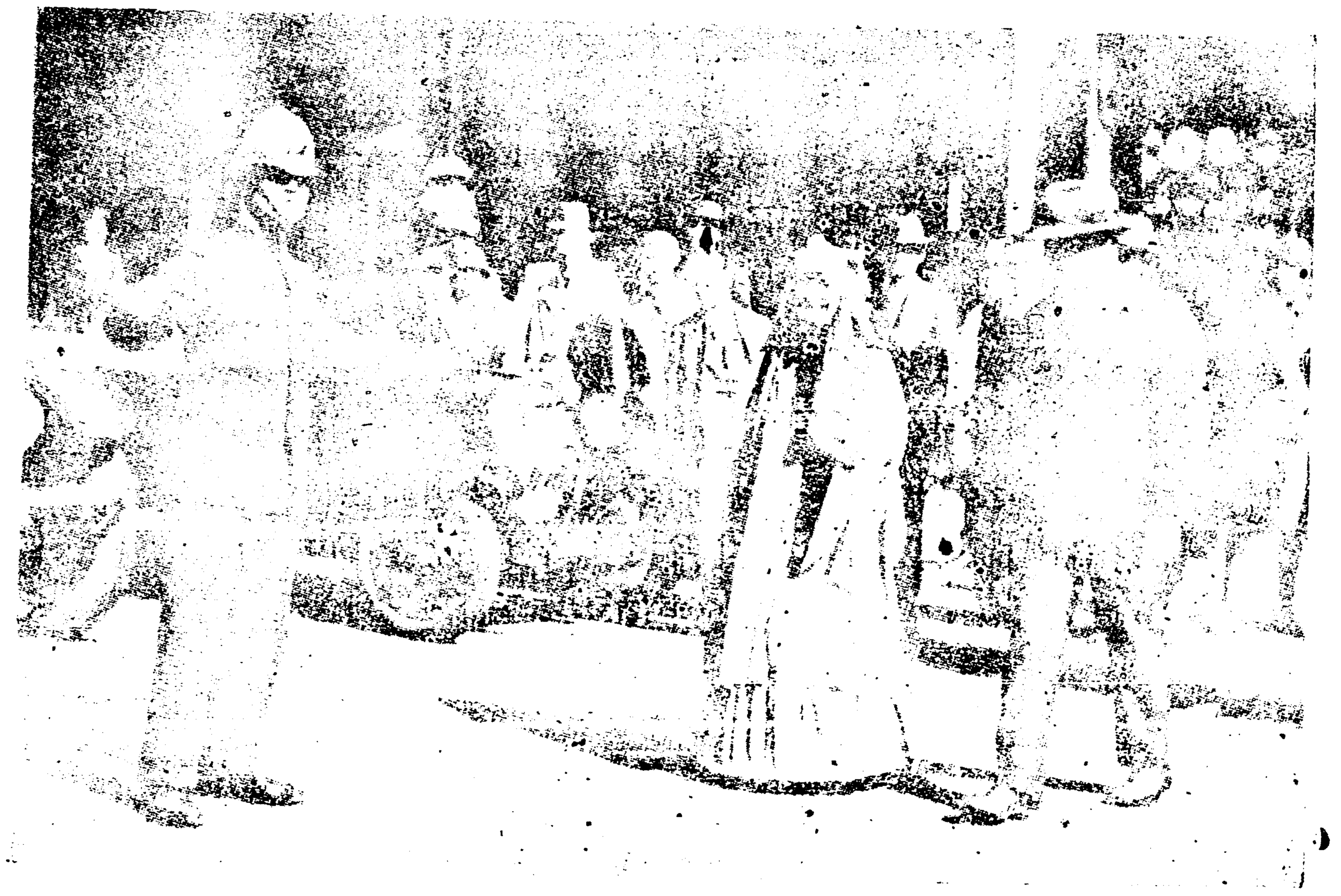

মিসেস্ রবর্ট

চিত্রপরিচয় দেখ

অবাক্ কাণ্ড

বন্দে আলী মিয়া

দেববদাস বৈরাগী

কি করে কখন ঠিক নাই কিছু—অতিশয় বদ্‌রাগী।
সংসারে তার বড় অশান্তি—সদাই ঝগড়াঝাঁটি,
একদা সে তাই ঝোলাঝুলি লয়ে ছেড়ে গেল ভিটামাটি।
আজিকার মতো দেশেতে তখন ছিলো নাকো রেলপথ,
ছিলো নদী-নালা, দস্যু ও ঠগ, জঙ্গল, পর্ব্বত।
দেশ ত্যাগি' দেব চলে দিন রাত পথ হ'তে প্রান্তরে,
যাবে কাশীধাম বাসনা তাহার জাগিয়াছে অন্তরে।
সংসারে কেহ নাহি আপনার—ফিরে আর আসিবে না,
বিদেশে সেথায় থাকিবে সুখেতে—কেহ রবে নাকো চেনা।
চলিতে চলিতে একদিন দেব বিপাকে পড়িল অতি,
সম্মুখে নদী—নাহি লোকালয়, ভাবে কিবা হবে গতি।
নদীর পাড়েতে বিশাল বৃক্ষ—তাহার শাখার 'পরে
আশ্রয় তার করিয়া লইল নিশি যাপনের তরে।
গভীর রাত্রে সহসা দেবের নিদ্রা ছুটিয়া যায়—
চেয়ে দেখে নীচে বিশাল বরাহে অজগর গিলে খায়।
চীৎকারে তার বন-জঙ্গল শিহরায় বার বার,
ভয়ে দেব কাঠ—পড়ে যাবে বুঝি—কাঁপিতেছে দেহ তার।
বরাহ গিলিয়া এলো অজগর সেই সে গাছের তলে,
ছোবল মারিয়া বাকল খাইয়া ঝাঁপ দিলো নদীজলে।
দেবদাস ভাবে হজমের গুণ এই এ গাছের ছালে,
ইহা সে লইবে—প্রয়োজনে তার লাগিবে বা কোনো কালে।

পরদিন নদী পার হয়ে দেখে সমুখে রাজার বাড়ী,
তিন দিন সেবা হয় নি তাহার—চলে তাই তাড়াতাড়ি।

রাজপ্রাসাদের অতিথিশালায় পৌছিলো দেবদাস,
সেথায় আজিকে করিবে আহার একান্ত অভিলাষ।
প্রাসাদের কোণে মন্দির মাঝে নারায়ণ বিগ্রহ,
ভাবে, হেথা রবে রাজ-পূজারীর হইয়া আজ্ঞাবহ।
হেথায় থাকিলে ঠাকুরভোগের প্রসাদ পাইবে রোজ,
দেহটা রহিবে পরম আরামে—বিনা আয়াসেতে ভোজ।
আলাপ জমালো পূজারীর সনে—তুষ্ট করিলো তারে,
তুপুরে আহার করিল সেথায় নানাবিধ উপচারে।
এমন ভোজন করে নি জীবনে—ভুঁড়ি লয়ে ওঠা দায়,
খাটিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল সুকোমল বিছানায়।
হাঁসফাঁস তার মিটিল না তবু—আলসেতে দেহ ভরে,
আহার বটেই হয়েছে বেজায়, এপাশ ওপাশ করে।
হঠাৎ তাহার হইল স্মরণ—রয়েছে হজমী ছাল,
এতটুকু তার খাইলে এখনি চুকে যাবে জঞ্জাল।
ঝোলা হ'তে ছাল বাহির করিয়া গিলিল তা জল দিয়া,
শয্যায় শুয়ে পরম আরামে পড়িল সে ঘুমাইয়া।

দিন বয়ে গেল, সন্ধ্যা ঘনালো—জাগিল না দেবদাস,
ডাকিতে আসিয়া পূজারী দেখিল পড়ে আছে তার বাস,
পড়ে আছে ঝোলা—পড়ে আছে টিকি—জলে ভাসিতেছে মেঝে,
বনজ তরুর ছাল খেয়ে সে যে হজম হইয়া গেছে।

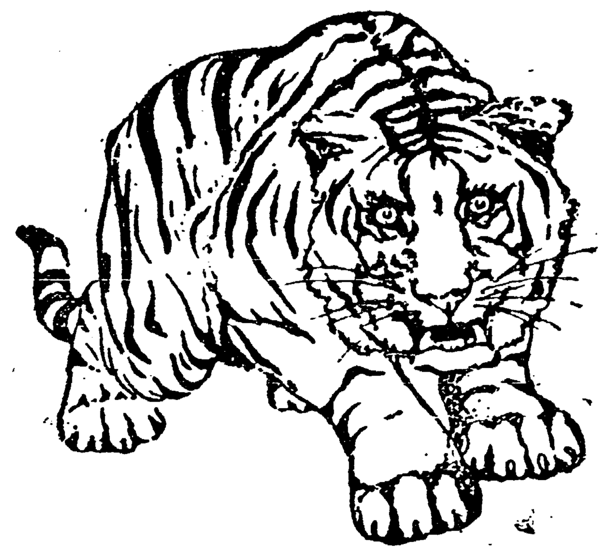

আজব কৌটো

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্‌. এ, বি. এল্‌

ব্রজেশ বাবু ভবানীপুরে থাকতেন। বেশ অবস্থাপন্ন লোক, বাড়ী, গাড়ী সবই ছিল তাঁর, আর ছিল একমাত্র ছেলে সুনীল। স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন অনেক দিন আগে।

তাঁর ছিল দামী জিনিষ বাঁধা রেখে টাকা ধার দেবার ব্যবসা। সেই উপলক্ষ্যে একবার একটা খুব বেশী রকমের দামী একছড়া মুক্তোর মালা তাঁর হাতে আসে। তিনি যাচাই করে দেখেছিলেন যে তার দাম হাজার পঞ্চাশেক টাকা। তা বাঁধা রেখে ব্রজেশ বাবু হারের মালিককে দশ হাজার টাকা ধার দেন। কেউ জানে না কেন তিনি ওরকম দামী জিনিষ ব্যাঙ্কে না রেখে নিজের শোবার ঘরে সিন্দুকে রেখেছিলেন। কি করে যেন একদল চোর সে খবরটা টের পেয়ে গেল।

এর দিন পাঁচ-সাত পরের কথা। সেই রাত্রে পাহারাওয়ালা লছমন চৌবে ব্রজেশ বাবুদের পাড়ায় টহল দিয়ে যাচ্ছিল। রাত তখন হবে দু'টো-আড়াইটে। একটু দূর থেকে সে দেখতে পেল যে ব্রজেশ বাবুর খিড়কীর দিকের দরজাটা খুলে দু'জন লোক চুপিচুপি বেরিয়ে আসছে। একজনের হাতে একটা থলি। সাবধানে এগিয়ে এসে রাস্তার আলোয় তার মুখ দেখেই পাহারাওয়ালা তাকে চিনতে পারল—সে হচ্ছে দাগী চোর আর গুণ্ডা খেতু।

তাকে দেখে চৌবেজী ভাবলেন যে আজ বরাৎ ভাল, এত বড় একটা আসামী হাতের নাগালে পেয়েছেন, তাকে ধরে ফেলতে পারলে একটা মোটা রকম পুরস্কার তো নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু ডাল-রুটির দিকে তিনি যতটা মনোযোগ দিতেন ততটা মন তিনি কখনও দেন নি দৌড়-ঝাঁপ ইত্যাদি কাজে। কাজেই তিনি যখন তেড়ে গেলেন, খেতু তার আগেই সেই যে ছুট লাগালো, প্রাণপণ দৌড়েও চৌবেজী তার কাছাকাছি যেতে পারলেন না। তবু সে যতক্ষণ সোজা রাস্তা ধরে দৌড়াচ্ছিল ততক্ষণ তাকে চোখে চোখে রেখেছিলেন চৌবেজী। হাঁক-ডাক করলে অথবা হুইস্‌ল্‌ বাজালে হয়তো অন্য কারু সাহায্য পাওয়া যেতে পারতো, কিন্তু তা হ'লে যে বকশিশটা ভাগাভাগি হয়ে যায়! কাজেই একাই চোরের পেছনে দৌড়তে লাগলেন চৌবেজী।

বেলতলা থেকে আর্ল স্ট্রীট, সেখান থেকে রিচি রোড পর্য্যন্ত চৌবেজী চোরকে দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু হাজরা রোডে পৌঁছে সে যখন মোড় ঘুরলো, তার পর আর তাকে দেখা গেল না।

চোর পালালো দেখে পাহারাওয়ালার ঘটে বুদ্ধি এলো। এইবার তার হুইস্‌ল্‌ বেজে উঠলো। তা শুনে দূর দূর থেকে লোকজন ছুটে আসতে লাগলো। শেষটায় শ' দুই হাত দূরে একটা গলির মধ্যে চোর ধরা পড়লো। কিন্তু তখন তার কাছে থলিটা নেই, চোরাই অন্য কোনও জিনিষও পাওয়া গেল না।

মুক্তোর হারের কথা অবশ্য পাহারাওয়ালা জানতো না। যাই হোক, সে চোরকে প্রথমে নিয়ে গেল ব্রজেশ বাবুর বাড়ী। তার হাঁক-ডাকে উঠে তিনি তাড়াতাড়ি সিন্দুক খুলে দেখেন; সর্ব্বনাশ! থলিশুদ্ধ মুক্তোর হারটাই নেই! তা দেখে ব্রজেশ বাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

কিন্তু মাথায় হাত দিলেই তো আর হারের মালিক ছেড়ে দেবে না। মাস খানেক বাদেই সে ভদ্রলোক এসে যখন ধার শোধ করে তাঁর হার ফেরৎ চাইলেন, তখন নিরুপায় হয়ে ব্রজেশ বাবুকে তার দাম বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা মিটিয়ে দিতে হ'লো। তাঁর যা কিছু ছিল তার প্রায় সমস্ত বিক্রী করে তিনি টাকাটা যোগাড় করলেন। এ আঘাত তিনি সইতে পারলেন না, ছ'মাস যেতে না যেতে তিনি মারা গেলেন।

মুক্তোর হার ছড়ার যে কি হ'লো তা আর কিছুতেই জানা গেল না। ওদিকে, খেতু ধরা পড়েছে শুনে, ত্রিপুরা থেকে খবর এলো যে তাকে যেন ছাড়া না হয়, একটা খুনের দায়ে তাকে সেখানকার পুলিস অনেক দিন যাবৎ খুঁজছে। এর কিছু দিন পর তাই তাকে আগরতলায় নিয়ে যাওয়া হ'লো। সেখানকার বিচারে যথাসময়ে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হ'লো।

খেতুকে কিন্তু বেশী দিন জেলে থাকতে হয় নি। বছর তিনেকের মধ্যেই জেলের ভিতরেই তার মৃত্যু হ'লো।

কিন্তু খেতুও এক সময় সৎপথে থেকে পরিবার প্রতিপালন করতো। প্রথম জীবনে সে তামা-কাঁসার জিনিষ তৈরী করতো, বেশ ভাল কারিগর বলে তার নাম ছিল। তাই সে জেলে এসে কর্ত্তাদের ব'লে কয়ে জেলের ভিতরেই বাসনপত্র তৈরী করবার ব্যবস্থা করে নেয়। তারই মধ্যে সে একটা কৌটোও বানিয়েছিল। ঢাকনায় কব্জা-দেওয়া বেশ বড় গোছের একটা ব্রোঞ্জের কৌটো, তাতে গালা-রং করা।

মরবার সময় সে জেলের কর্ত্তার কাছে কৌটোটা দিয়ে বলে যে তার ভাই বিপিনকে যেন তার দাদার শেষ চিহ্ন হিসেবে সেটা দিয়ে দেওয়া হয়। জেলের কর্ত্তা তাতে রাজী হয়ে কৌটোটা রেখে দেন। কিন্তু যতদিনে তিনি বিপিনের খোঁজখবর নিতে সুরু করলেন ততদিনে জানা গেল যে সেও মরে স্বর্গে কিম্বা নরকে গিয়ে তার দাদার সঙ্গে জুটেছে। তারও কেউ ছিল না। কাজেই কৌটোটা কাউকে দেওয়া হ'লো না, জেলখানার আপিসেই পড়ে রইলো।

ঘটনাচক্রে এই সময়ে ব্রজেশ বাবুর ছেলে সুনীল কি একটা কাজে আগরতলায় আসে। খেতু যে আগরতলার জেলে ছিল সে খবর সে জানতো। এখানে এসে তার মৃত্যুসংবাদ জেনে তার মনে হ'লো যে জেলে একবার খবর নিয়ে দেখলে হয়, যদিই খেতু কাউকে কিছু বলে গিয়ে থাকে হার ছড়ার সম্বন্ধে।

জেলের কর্ত্তা সে বিষয়ে কিছু বলতে পারলেন না। কিন্তু তার কাহিনী শুনে তিনি সুনীলকে সেই কৌটোটা দিয়ে দিলেন। তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল যে সুনীলদের জিনিষ যে চুরি করেছিল তার জিনিষে সুনীলের একটা দাবী আছে নিশ্চয়। এ যেন সেই নাকের বদলে নরুণ পাওয়ার মত।

খবরের কাগজওয়ালারা এটা টের পেয়ে এ বিষয়ে একটু মজা করে লিখলো খবরটা। তাতে আর কিছু হোক না হোক, অনেকে জেনে গেল কৌটোটার কথা। বিশেষতঃ, খেতুর যে সব সঙ্গী-সাথী ছিল তারা এটা পাবার চেষ্টা করতে লাগলো নানা ভাবে।

সুনীল এর পর কলকাতায় ফিরে আসে। কৌটোটাকে সে বিশেষ কোনও মূল্য দেয় নি, কলকাতায় আসবার দু'-চারদিন পরেই সে একজন পরিচিত লোককে ওটা দিয়ে দেয়।

এর পাঁচ-সাতদিন বাদেই তার ঘরে চোরের উপদ্রব হ'লো। একদিন একটু বেশী রাত্রে বাড়ী ফিরে এসে সে দেখে তার ঘরের তালা ভাঙা, ঘরে বাক্স, বিছানা সব লণ্ডভণ্ড। কিন্তু কোনও জিনিষ চুরি যায় নি। তা থেকে তার সন্দেহ হ'লো যে চোরদের লক্ষ্য ছিল বোধ হয় ঐ কৌটোটা।

সুনীলের এক ছেলেবেলাকার বন্ধুর নাম ছিল অজয়। তার বিদ্যেবুদ্ধির জন্য তার ওপর সুনীলের খুব একটা ভাল ধারণা ছিল। তাই সে তার পরদিনই কৌটোটা ফিরিয়ে নিয়ে এসে অজয়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে গেল।

তার কাছে সব কথা মন দিয়ে শুনলো অজয়। তারপর কৌটোটাকে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো। প্রথমে ঢাকনাটা, তারপর চারধার বেশ করে দেখে নিয়ে কৌটোটাকে উলটিয়ে তার তলাটা দেখলো। তারপর আপন মনেই বললে, তলাটা দেখছি বেশ ঝকঝকে, আয়নার মত এতে মুখ দেখা যাচ্ছে।

সুনীল জিজ্ঞাসা করলো, অত মন দিয়ে তলাটা দেখছো কেন? দেখবার মত কোনও দাগ বা লেখা তো ওখানে নেই!

অজয় কৌটোটাকে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললে, সে কথা সত্যি। আচ্ছা, এবার ভেতরটা দেখা যাক।

ঢাকনাটা তুলে ভিতরে তাকিয়েই সে বললে, হুঁ:, এ যে দেখছি কপাল ফেলে কুঁজে চন্দন!

সুনীল বললে, হ্যাঁ, আর কোথাও কোনও কারুকার্য্য নেই, আছে খালি তলাটার ভেতর পিঠে কতগুলো লতাপাতার নক্সা। এর কোনও মানে হয় না।

—উঁহু, মানে একটা আছে নিশ্চয়। তিন তিনটে বিশেষত্ব কখনও অর্থহীন হ'তে পারে না। প্রথমতঃ, তলাটা বিশেষ করে পালিশ করা হয়েছে, যার কোনও দরকার ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, কৌটোতে কিছু রাখলেই যে জায়গাটা ঢাকা পড়ে যাবে শুধু সেই জায়গাটাতেই নক্সা কাটা হ'লো কেন? তৃতীয়তঃ, নক্সাটা খোদাই না করে এচ্ (etch) করা হয়েছিল কেন?

—সে আবার কি?

—এচ্ করা মানে হচ্ছে এসিড দিয়ে পুড়িয়ে দাগ দেওয়া। তামার জিনিষে এচ্ করার চেয়ে ছেনি দিয়ে খোদাই করে নক্সা কাটারই প্রচলন বেশী। এটা একটু তলিয়ে দেখতে হবে। তুমি বরং এটা এখন আমার কাছে রেখে যাও।

সুনীল উঠে পড়লো।

এর দিন কয়েক বাদে একদিন রাত্তিরে সুনীল আবার এলো অজয়ের বাড়ীতে। অজয়ই তাকে আসতে বলেছিল। তাকে দেখেই অজয় বললে, এসেছ? তোমার কথাই ভাবছিলুম। চল, একটা মজা দেখবে।

বিজ্ঞানের ব্যাপারে ঝোঁক থাকায় অজয় তার বাড়ীতে একটা ছোটখাট ল্যাবরেটরীর মত করেছিল। সুনীলকে নিয়ে সেখানে গিয়ে সে সেই কৌটোটাকে বের করলো আলমারী থেকে। একটা খুব উজ্জ্বল আলোর সামনে কৌটোর তলার দিকটা একটু কাৎ করে ধরে সে বললে, দেওয়ালের দিকে চেয়ে দেখ, সুনীল।

সুনীল চেয়ে দেখলো যে কৌটোর পালিশ-করা তলাটা থেকে আলোটা ঠিকরে গিয়ে পড়েছে দেওয়ালের গায়ে, আর তারই মধ্যে অস্পষ্ট কালো অক্ষরে ফুটে উঠেছে কয়েকটা কথা—

মোতি হাজরা বাগের পেটে

অক্ষরগুলির ধারে ধারে আলো যেন বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সুনীল অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, এটা কি করে হ'লো? কৌটোর তলায় তো কিছু লেখা দেখা যাচ্ছে না!

অজয় বললে; এটা হচ্ছে ধাতুবিদ্যা সংক্রান্ত একটা রহস্য। এ ক'দিনে আমি ধাতুবিদ্যার নানারকম বই পড়ে দেখেছি। পড়তে পড়তে কয়েকটা মজার খবর জানতে পেরেছি। শোনো।

সুনীল বললে, একটু সোজা করে বুঝিও, বাপু! আমি তো তোমার মত বৈজ্ঞানিক নই।

—সহজ করেই বলছি, শোনো। লোহা পুড়িয়ে লাল করে হঠাৎ সেটাকে ঠাণ্ডা জলে ডোবালে সেটা হয় শক্ত, কিন্তু তামা আর তামা-মেশানো অন্য ধাতুকে সে রকম করলে সেটা হয়ে যায় আগেকার চেয়ে নরম। সেই অবস্থায় সেটাকে কোনও জায়গায় জোরে আঘাত করলে শুধু সেই জায়গাটুকু শক্ত হয়ে যাবে। হাতুড়ি দিয়ে ছেনি ঠুকে ঠুকে যদি তার ওপরে কোনও নক্সা খোদাই করা হয়, তা হ'লে সেই দাগ-বরাবর শক্ত হয়ে যাবে, অথচ বাকী অংশটুকু থাকবে নরম। বুঝলে তো?

—বুঝলুম। তার পর?

—তা হ'লেই দেখ, তামা আর রাং মিলিয়ে যে ব্রোঞ্জ ধাতু হয়, তার পাতে কোনও নক্সা ঐ ভাবে খোদাই করা হ'লে তার উলটো পিঠে সেই নক্সাটা শক্ত দাগে দাগে ফুটে উঠবে। অবশ্য, সে দাগ এত কম উঁচু হয়ে ফুটবে যে খালি চোখে তা ধরা যাবে না, জানা যাবে তার ওপর আলো ফেললে।

—কেন?

—আলোর একটা নিয়ম হচ্ছে এই যে কোনও জিনিষে বাঁকা হয়ে আলো পড়ে ঠিকরে গেলে সেই ঠিকরে-যাওয়া আলোয় সেই জিনিষের অদৃশ্য খুঁতগুলিকেও বড় করে দেখিয়ে দেয়। এখানেও তাই হ'লো।

—বল কি? খেতুর মত একটা বাজে লোক এত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানতো?

—বাজে নয়, খেতু এক সময় একজন উঁচুদরের কারিগর ছিল, সে কথাটা মনে রেখো। এ কথাটা জানা তার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। বিশেষতঃ এই উপায়ে জাপানীরা যে ম্যাজিক আয়না তৈরী করে তার একটা সে দেখেও থাকতে পারে।

—সে কি রকম জিনিষ?

—জাপানীদের ম্যাজিক আয়না তৈরী হয় ব্রোঞ্জএর কিংবা শাকুদোর। তামার সঙ্গে সোনা মেশালে তাকে বলে শাকুদো। তার এক পিঠে নক্সা খোদাই করা হ'লে অপর পিঠে আলো ফেললেই তার নক্সার ছায়া দেওয়ালে পড়ে, সেইটেই এর মজা।

—কিন্তু এই কৌটোটার বেলায় কি সে কথা খাটবে? এর তলাটাকে যদি ম্যাজিক আয়না বল, তা হ'লে তার উলটো পিঠে লেখাটা কোথায়? সেখানে তো নক্সা রয়েছে শুধু ফুলপাতার! তাও খোদাই করা নয়, এচ্ করা।

—সেইটে দেখেই তো আমার প্রথম সন্দেহ হয়। এখন বুঝেছি যে আগে খোদাই করে কথাগুলো লিখে তারপর সেই খোদাইএর দাগ গোপন করবার জন্য তার ওপর এসিড ঢেলে লতাপাতা আঁকা হয়েছিল। তাতে শুধু ওপরের দাগগুলি ঢাকা পড়লো, কিন্তু আয়নাটা যে যে দাগে শক্ত আর যেখানে যেখানে নরম ছিল, ঠিক সেই রকমই থেকে গেল।

—বেশ, তা যেন হ'লো। কিন্তু যে কথাটা লেখা হয়েছে, তাতে গোপন করবার কি আছে? মতি হাজরা লোকটাই বা কে, আর তাকে বাঘে খেয়েছে এ কথা অত করে লিখে আবার সেটাকে লুকোবার চেষ্টারই বা মানে কি?

সে কথার জবাব না দিয়ে অজয় উঠে পড়লো, তারপর জামা গায়ে দিতে দিতে বললে, চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে ট্রাম-রাস্তা পার হয়ে যখন বেলতলা রোডে পড়লো তখন সুনীল জিজ্ঞাসা করলো, এ কোথায় চলেছ, অজয়?

—আর একটু এগিয়ে দেখাই যাক না! হাওয়া খাওয়াও হবে, আর যে পথে খেতু পালিয়েছিল সে পথটাও দেখা হবে।

ঠিক সেই পথ ধরে ঘুরতে ঘুরতে তারা ক্রমে হাজরা রোডে এসে পড়লো। এইখান থেকেই চোর পাহারাওয়ালার চোখের আড়াল হয়ে গিয়েছিল। সেই মোড় ঘুরে হাজরা রোড ধরে চললো দুই বন্ধু।

রাত তখন দশটা বাজে। এ দিকটায় লোকের ভিড় সাধারণতঃই কম, এখন তো লোকজন প্রায় নেই বললেই হয়। দু'ধারে মাঝে মাঝে বেশ বড় বড় বাড়ী। হঠাৎ তাদেরই একটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো অজয়। মস্ত গেটওয়ালা বাগান-ঘেরা বাড়ীটা।

সুনীল বললে, দাঁড়ালে যে?

অজয় গেটটা দেখতে দেখতে উত্তর দিল, নাঃ, এই গেটটা দেখছি। বাহারে গেটখানা

করেছে। বাপ রে, দু' পাশে আবার দুই বিকট ড্রাগনের মূর্ত্তি! কি রকম দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে, দেখেছ?

—দেখেছি। এখন চল।

—আহা, ব্যস্ত হচ্ছো কেন? এই ড্র্যাগনটাকে দেখ না! বেচারীর দাঁতগুলো সব নেই, পাড়ার ছোঁড়ারা বোধ হয় ভেঙে ফেলেছে কোন সময়। আচ্ছা, সুনীল, তোমার কি মনে হয়? মূর্ত্তিটা কি ফাঁপা?

—তোমার ড্রাগন গোল্লায় যাক! এই বিটকেল জানোয়ারটার রূপ দেখেই আজ সারা রাত কাটাবে ভেবেছো নাকি?

—আচ্ছা, আচ্ছা, একটা জিনিষ দেখে নিয়েই তোমার সঙ্গে আসছি। তুমি তো ঢেঙা মানুষ, একবার হাত ঢুকিয়ে দেখ তো তোমার হাত কত দূর যায় এর গলার ভেতর?

সুনীল একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। অথচ উপায় নেই দেখে সে একটু উঁচু হয়ে তার ডান হাতখানা ড্র্যাগনটার মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। এক মুহূর্ত্ত পরেই সে চমকে উঠে তার হাত বের করে নিল,—তখন তার হাতে ঝুলছে কাল রংএর একটা চামড়ার থলি।

সেই থলি থেকে যে সেই পাঁচ বছর আগেকার হারানো মুক্তোর মালা পাওয়া গেল সে কথা কি আর বলতে হবে?

বাড়ীতে ফিরে এসে অজয় বলছিল, সুনীল শুনছিল: প্রথম থেকেই আমার একটা বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হয়। খেতু যেখানে ধরা পড়েছিল সেখান থেকে হাজরা রোডের মোড়, এই জায়গাটুকুর মধ্যে কোথাও হারটাকে সে লুকিয়ে রেখেছিল। কেননা, তার আগে আগাগোড়াই সে পাহারাওয়ালার নজরে ছিল। আর, সেখান থেকে সেটাকে সে সরাতে পারে নি, কারণ ধরা পড়বার পর থেকে মরণ পর্য্যন্ত সে সরকারের অতিথি ছিল। একই কারণে সে তার সঙ্গী-সাথীদের কাউকে খবরটা দিতেও পারে নি।

মরবার সময় সে তাই ম্যাজিক-আয়নার কায়দায় কথাটা লিখে গেল—"মোতি হাজরা বাগের পেটে"। মোতি মানেই মুক্তো, আর সেটাই লেখা সহজ। হাজরা রোডেই কোনও বাঘের পেটে সেটা রয়েছে, এ কথাও লেখা রইলো। তার ভাই বিপিনও তামা-কাঁসার কারিগর ছিল, সে এ লেখাটা বের করতে পারবে এ বিশ্বাস তার ছিল।

'বাগের পেটে' কথাটার মানে আমি ঠিক বুঝতে পারি নি যতক্ষণ না ড্রাগন দু'টোকে দেখলুম। খেতু যে ড্র্যাগনকে বাঘ বলে মনে করবে, এ আর আশ্চর্য্য কি? তারপর যখন দেখলুম যে একটা ড্র্যাগনের দাঁত ভাঙা, অথচ অন্যটার দাঁত রয়েছে, তখন আর সন্দেহ রইলো না যে কোন্‌টার পেটে থলিটা লুকোনো আছে। তোমাকে বেশী রকম চমকে দেবো বলে তোমাকেই 'বাগের পেটে' হাতড়ে দেখতে বলেছিলুম।

সুনীল অজয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো। আনন্দে, বিস্ময়ে আর কৃতজ্ঞতায় তার মুখ দিয়ে কোনও কথা ফুটলো না।" *

* বিদেশী গল্প অবলম্বনে।

বিসর্জন

(শিশুসাহিত্য-পরিষদের "বিসর্জন" নাটকাভিনয়)

জনৈক পুরবাসী

প্রস্তাবনা

অবশেষে সম্পন্ন হ'ল। একদিন নয়, দুদিন, এক জায়গায় নয়, দু' জায়গায়।

প্রথম দিন হ'ল ১৯৫১ সালের ২২শে জুলাই ; স্থান—ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের সম্মেলন কক্ষ, কাল—সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটা।

দ্বিতীয় দিন হ'ল, ১৯৫১ সালের ৫ই আগষ্ট : স্থান আশুতোষ কলেজ মেমোরিয়াল হল্।

নাটকের পাত্র-পাত্রী ও বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণকারিগণ:—

রঘুপতি—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, গোবিন্দমণিক্য—শ্রীনরেন্দ্র দেব, নক্ষত্র-

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব

রায়—শ্রীসুনির্মল বসু, মন্ত্রী—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, জয়সিংহ—শ্রীরবীন্দ্রলাল রায়, নয়নরায়—শ্রীআশিস্ ভট্টাচার্য, চাঁদপাল—শ্রীবারীন দাশগুপ্ত, অতিসাধারণ পুরবাসী : হারু—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, অক্রূর—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, নেপাল—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, কানু—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, গণেশ—শ্রীশ্রীহরি গাঙ্গুলি, ধ্রুব—শ্রীমানসী রায়, প্রহরীদ্বয়—শ্রীদ্বিজেন গুপ্ত ও শ্রীকল্যাণ রায়চৌধুরী, রাণী—

শ্রীরাণী চক্রবর্তী, অপর্ণা—শ্রীমীরা রায়চৌধুরী, প্রম্টার—শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেন্দ্র দত্ত, রঙ্গমঞ্চে যথসময়ে অভিনেতাগণকে প্রেরণকারী—শ্রীঅমলশঙ্কর রায়।

দু'-চারজন বাড়তি—শ্রীশচীন বাগচী, শ্রীসবিতা রায়চৌধুরী, শ্রীনবনীতা দেবী, শ্রীজয়সিংহের পত্নী ইত্যাদি ইত্যাদি। চশমা খুললে চোখে সবই প্রায় অন্ধকার দেখি। তাই সাজ-ঘরের সকলকে ভাল করে চিনতে পারি নি। তাঁদের নাম দিতে

শ্রীযুক্ত সুনির্মল বসু

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাল রায়

পারলাম না বলে তাঁরা যেন আমার অপরাধ না নেন। অবশ্য চশমা চোখে দিয়েও যে সব ঠিক ঠিক দেখি তাও নয়।

দুঃখ যে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের বয়স উল্লখ করতে পারলাম না। কারণ, বীমা কোম্পানিতে যেমন বয়সের লিখিত প্রমাণ থাকে আমার কাছে তেমন নেই এবং তা সংগ্রহের চেষ্টাও করি নি। এমনিতেই এই কাহিনীটি রচনা ও প্রকাশ করে বিপদের মুখে গিয়ে পড়চি।

পিছনের দৃশ্য

এবার নাটকের কাহিনীটি শুরু করি :

প্রথমে পাঠক-পাঠিকাদের কিছু কষ্ট স্বীকার করে তিনটি বছরের অন্ধকার পথ দিয়ে ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পৌঁছতে হবে। তখন কলিকাতার ইডেন

উদ্যানে "নিখিল ভারত প্রদর্শনীর" উদ্যোগ-আয়োজন চলছে। ইংরেজের গড়া, তখনকার দিনের মাড়োয়ারি-চরা এই "নন্দন-কাননটি"কে ঠিকেদারের লোকজন ভেঙ্গে-চূরে নূতন রূপ দেবার চেষ্টা করছিল। পরিশেষে তারা প্রদর্শনী-ক্ষেত্র গড়েও তুলেছিল এবং কলকাতার এই "নন্দনের" রূপ কেমন হয়েছিল তা এখনকার বিরূপ সমালোচনা থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে।

এই প্রদর্শনীরই এক অংশে ছিল "ছোটদের মহল"। তার পিছনে

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র

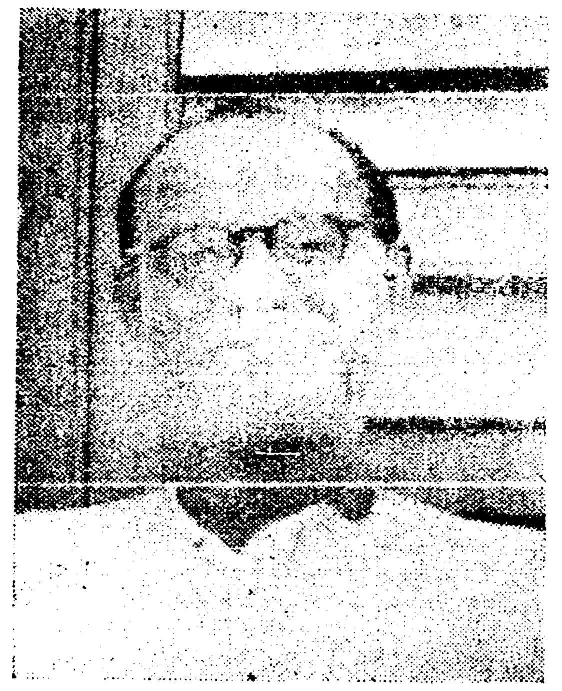

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

শেওলা-ভরা পচা খাল—"নন্দনের অলকনন্দা।" সম্মুখে একটি অপরিসর বাঁধানো রাস্তা। মহলের উত্তরে গুটিকয়েক ছোট গাছ, দক্ষিণে খানিকটা ফাঁকা জায়গা।

"মহলটি "যাঁরা সংগঠন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে "শিশুসাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণই ছিলেন সংখ্যাগুরু। আর, এই "অতি সাধারণ পুরবাসীর" স্কন্ধে পড়েছিল সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব। "মহলের" অন্দরের ও পশ্চাতের দৃশ্য বর্ণনা এখানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

"শিশুসাহিত্য-পরিষদের" তেমন সচ্ছলতা থাকবার কথা নয়। কারণ এটিকে গড়ে তুলেচেন জন কয়েক সাহিত্যিক ও দু'-একজন শিল্পী। তাই প্রদর্শনীর প্রারম্ভেই একদিন কার্য-নির্বাহক-সভায় প্রস্তাব করে বসলাম, "শিশু-সাহিত্য'পরিষদের' সদস্যগণ মিলে প্রদর্শনীর রঙ্গমঞ্চে একখানি নাটক অভিনয় করা যাক।

প্রস্তাবটি সৎ ও উৎসাহব্যঞ্জক। তাই "অতি সাধারণ পুরবাসী" দ্বারা উত্থাপিত হ'লেও সকলেই তাতে সম্মতি দিলেন। বলা বাহুল্য, আমার এ গৌরবটির আজ পর্যন্ত কোন ভাগীদার দেখা দেন নি। কারণ, কেউ আর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন না।

শ্রীযুক্ত শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

অভিনয়ের প্রস্তাব গৃহীত হ'ল, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল নাটক নিয়ে। দেশে নাটক-নভেলের অভাব নেই। তা ছাড়া, সাহিত্যিকগণ প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর নাট্যকার, এই বিশ্বাসে ঘোর বিশ্বাসী। বিশ্বাস থেকে অহংকার, অহংকার থেকে কলহ। কলহের শক্তি সকলেরই আছে, কিন্তু সকলে 'সেয়ানা' নয়।

আবার প্রস্তাব করে বসলাম, নিতান্ত গোঁয়ার "পুরবাসীর" মতো, "রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন' নাটক অভিনয় করা যাক।" বাংলার দৃশ্য-কাব্যের ভাণ্ডারে এই মহামণিকে কেউই প্রকাশ্যে উপেক্ষা করতে পারলেন না, এর পাশেও আর কোনটিকে এনে ধরলেন না, এর স্নিগ্ধ আলোককে সকলেই নমস্কার করে হাতে তুলে নিলেন। কেউ কেউ কেবল বললেন, "এ বই জমানো শক্ত।" (ক্রমশঃ)

ক্ষণজন্মা

শ্রীসুবোধ বসু

বাণ্টুর বয়স কত হবে, ন' দশ বছরের বেশী নয়; কিন্তু এরই মধ্যে তার বুদ্ধি-বিবেচনা যেমন দানা বেঁধেছে, তেমনি কথাবার্তার কায়দাটাও রপ্ত হয়ে উঠেছে আশ্চর্য্য রকম। এর থেকেই তার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আঁচ করে নিতে বুদ্ধিমানদের অসুবিধে হয় না।

সেদিন সাড়ে তিনটের কিছু আগেই বাণ্টু ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরল। নিচু ক্লাস বলে তিনটেয় তাদের ছুটি হয়। তারপর বাড়ির গাড়িতে চ'ড়ে বাড়ি ফিরতে আর কতটুকুই বা দেরি!

তার মা ডেকে বল্লেন, 'হাত-পা ধুয়ে দুধটা খেয়ে নাও, বাণ্টু! টেবিলের ওপর ঢাকা আচে...'

বাণ্টু তা খুবই জানে। রোজই ঢাকা থাকে। দুধটা তার কাছে বিষতুল্য। কিন্তু মা বলেন, দুধ খেলে নাকি গায়ের জোর হয়; তাড়াতাড়ি বড় হওয়া যায়। তাড়াতাড়ি বড় হওয়ার তাগিদেই তাকে দুধ খেতে হয়। শুনেছে, ঝাল খেতে পারলেও নাকি তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠা যায়, যেমন দুধ বা চিনির পিঁপড়ে খেলে সাঁতার শেখা যায়! কিন্তু সাঁতার শেখার প্রয়োজনেও এখনও সে পিঁপড়ে খেতে পারে নি।

দুধের গেলাস শেষ ক'রে, গোঁফের জায়গাটায় দুধের সাদা ছাপ এঁকে সে মায়ের কাছে এলো। তিনি খাটে শুয়ে বই পড়ছিলেন।

'পড়া পেরেচ?'

'সব।' বাণ্টু সগর্ব্বে জানালে। 'আমি তো ক্লাসের ফার্স্ট বয়!...জানো মা, রেশনে আমাদের কম চাল দেয় কেন? দেশে চাল কম হচ্চে ব'লে। তাই সবাইকে কম কম ক'রে খেতে হবে। একজন খুব বেশি খাবে, আর একজন কম খাবে, তা হওয়া চলবে না!...'

'তাই নাকি?' তার মা সকৌতুক মুখে বই সরিয়ে তাকালেন।

'আমি ঠিক করেচি', বাণ্টু বলল, 'রাতে আর ভাত খাব না। দেশের চাল বাঁচাব...'

মা হাসলেন। অদ্ভুত ভাত-ভক্ত বাণ্টু, হঠাৎ নাগরিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছে! ক্লাসে মাষ্টার মশায়ের কাছ থেকে সন্ত উপদেশ শুনে এসেছে নিশ্চয়ই।

'এক বেলা রুটি খেলে ভালোই তো!' তিনি বললেন।

'রুটি খেতে পারব না আমি।' বাণ্টু আপত্তি জানালে। এক কাজ করলে হয় না? রাতে শুধু লজেঞ্জুষ আর টফি খাই নে কেন? চাল আর রুটি দু'টোই বেঁচে যায়! আর কি মজাটাই হয়! বলে বাণ্টু খাদ্যশস্যহীন আহারের আন্দোলনের প্রতি প্রাগাঢ় সমর্থন জানালে।

বাণ্টুর আরেকটা দুর্ব্বলতা আছে। এর জন্য তার কাকাই দায়ী! খারাপ দৃষ্টান্ত যে মানুষকে কতটা নষ্ট করে এ তারই উদাহরণ।

বাণ্টু একদিন চুপে চুপে এসে বল্লে, 'মা, আমি আর হাফ্ প্যাণ্ট পরব না...'

'সে কি রে! তবে কি পরবি?' মা কিছুটা অবাক্ হয়ে বল্লেন।

'ছোট কাকার মতো আমিও আদ্দির পাঞ্জাবি আর ফর্শা ধুতি পরে ইস্কুলে যাব।'

'ছোট কাকা বি. এ ক্লাসে পড়ে; সে যা করবে, তোমারও তা মানাবে কি? এ বয়সে হাফ-প্যাণ্টই পরতে হয়। তোমার গালে যদি একগাল দাড়ি গজায়, কেমন হয়?...'

'দোৎ!' সম্ভাবনাটায় বাণ্টু খানিকটা ঘাবড়ে গেল। 'কিন্তু না, আমি পরবই। হাফ-প্যাণ্ট আমি কিছুতেই পরব না—এমন ছোট ছোট লাগে!'

'ও:, এই বুঝি তোমার দেশের জন্য ভাবা!' সহসা তার মা অন্য যুক্তি ধরলেন। 'দেশে কম চাল হচ্চে বলে ভাত খেতে চাচ্চ না। আর দেশে কম কাপড় হচ্চে, অথচ বেশি ক'রে কাপড় লাগাতে চাও।...'

একেবারে মোক্ষম অস্ত্র। সমাজ-সচেতন বাণ্টু উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে মার দিকে তাকাল। কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে রইল। তারপর বললে, 'আচ্ছা, তবে থাক।...'

পরদিনটা রবিবার। বাণ্টুর ইস্কুল ছিল না। বাড়ির বাগানের এক অংশে সে টেলিফোন খাটিয়ে ফেলেছে। তারের এক প্রান্তে স্বয়ং বাণ্টু রিসিভার ধরে আছে; আর অন্য প্রান্তে তার বন্ধু হারু। বাণ্টু চোঙার মুখে মুখ দিয়ে বেশ চেঁচিয়েই বলছে: 'হ্যালো, হ্যালো! এটা কি বম্বে? কে, বেবী?...'

টেলিফোনের তার অবশ্য এমন কিছু নয়। মার সেলাইয়ের কল থেকে সরানো সাদা সুতো মাঝের প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়া গাছের গুঁড়িটা বেষ্টন করে এদিক থেকে ওদিকে চলে গিয়েছে। তার রিসিভার হচ্চে ওষুধের শিশির লম্বাটে খাপ। কিন্তু তাতে কোনই অসুবিধে হচ্ছে না। স্পষ্ট কথাবার্ত্তা শোনা যাচ্ছে।

বেবী বাণ্টুর পিসতুত ভাই। ওর বাবার সঙ্গে ওরা বম্বেতে থাকে। সে স্বচ্ছন্দে জবাব দিল, 'কে, বাণ্টু? হ্যাঁ, আমি। বল।...'

বেচারী হারু! বাণ্টুর আদেশে তাকে বোম্বাইবাসী বেবী সাজতে হয়েছে।

'আচ্ছা, তোদের ওখানের মিল্‌গুলো কি যথেষ্ট কাপড় তৈরি করছে না?' বাণ্টু প্রশ্ন করলে। 'এত কম কাপড় পাচ্ছি কেন?...'

'করছে। তবে বোধ হয় ব্ল্যাক মার্কেট হচ্চে।'

'তবে অ্যারেষ্ট কর্ না। তোর বাবা তো গবর্ণমেণ্ট।'

বেবীর বাবা, বাণ্টুর পিসেমশায়, গবর্ণমেণ্টের বড় চাকরি করেন হিসেব-নিকেশ বিভাগে। কিন্তু তাঁর ছেলে বেবী তক্ষুনি গবর্ণমেণ্টের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে বল্লে, 'বেশ। এক্ষুনি অর্ডার দিচ্ছি। তুইও কলকাতার সব চোর দোকানদারকে ধরে ফেল্। নইলে কিছুতেই আদ্দির পাঞ্জাবি পরা যাবে না...'

সহসা টেলিফোনের কথাবার্ত্তায় বিঘ্ন উপস্থিত হ'লো।

'কি করচিস্ রে, জওহরলাল নেহেরু?'

'টেলিফোন করছি, দেখছ না?'

ঘাড় বেঁকিয়ে পেছনে চেয়ে বাণ্টু বেশ উষ্ণস্বরেই জবাব দিলে। ছোটকাকার ঐ এক ঠাট্টা। সে নাকি জওহরলাল নেহেরু!

'কোথায়?'

'বম্বেতে।'

'এখান থেকে সুতো তো ঐ পর্য্যন্ত মাত্র গিয়েছে, দেখতে পাচ্ছি।'

'তাতে কি হ'লো?' বাণ্টু অসন্তুষ্ট স্বরে বললে, 'দেখচ না, সুতোটা গাছের গুঁড়িতে প্যাঁচ খেয়ে গেচে? ট্রাঙ্ক টেলিফোন! গাছের গুঁড়িকে ট্রাঙ্ক বলে না ইংরেজিতে!'

কিছুদিন হয় বাণ্টু বিশেষ ব্যস্ত এবং উত্তেজিত। পাড়ার সমস্ত বাচ্চা ছেলেমেয়েকে

জুটিয়ে সে তাদের বাগানের একদিকে জোর কুচকাওয়াজ করাচ্ছে। মুখ-নির্গত মেশিন-গানের শব্দে চারদিক্ মুখর। আর বাগানের ফুলগাছের বেড়ার কাঠিগুলি তুলে এনে যেমন ভয়ঙ্কর বেওনেট প্র্যাকৃটিশ হচ্ছে, তাতে বাণটুর মা তাদের শারীরিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন।

'এই খেলাটা বন্ধ কর তো বাণটু! কবে কার চোখে-মুখে খোঁচা লেগে যাবে, তখন কাণ্ড হবে!'

'ব্যঃ রে, যুদ্ধ লাগচে, আর দেশরক্ষার জন্য আমাদের তৈরি হ'তে হবে না?' বাণটু সপ্রতিবাদে বললে। 'দেশ স্বাধীন রাখবার জন্য দরকার হ'লে আমাদের মরতেই হবে!...এই গুপী, ধর, গানটা ধর। কদম কদম বাঢ়ায়ে যা...' দেশরক্ষার গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য বাণটু তার নিজস্ব বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেল।

কিন্তু যুদ্ধের পরেই শান্তি। খবরের কাগজে কাগজে সাধারণ নির্ব্বাচনের তোড়জোড়ের খবর বেরুচ্চে রাশি রাশি। কংগ্রেস, আর সোস্যালিষ্ট, আর কৃষক-প্রজা, আরও কত সব দল! সুতরাং বাণটুও ঠিক করলে. সে ইলেকৃশনে দাঁড়াবে।

'ইলেকৃশন কাকে বলে, মা?' একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে সে সরাসরি তার মাকে প্রশ্ন করে বসল।

'লোকেরা তোমাকে পছন্দ করে, তোমাকে বিশ্বাস করে, এইটে তাদের দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেওয়া।' ব'লে মা মোটামুটি ভাবে তাকে ভোট সংগ্রহ, ভোট-দান ও নির্ব্বাচনের প্রক্রিয়াটা বলে দিলেন। ভোটের সময় কি রকম জুলুম-জবরদস্তি হয়, তাও বললেন।

'ধ্যেৎ, আমিই সব চেয়ে ভালো, এ কথাটা নিজে বলতে লজ্জা করে না?' বাণটু সলজ্জ-ভাবে বললে।

'তা হ'লে কি আর নেতা হওয়া যায়!' মা স্মিত হেসে বললেন। 'নিজেকে নিজেই সব চেয়ে জোর গলায় ভালো বলতে হবে। তা ছাড়া, সাঙ্গোপাঙ্গদের দিয়েও বলাতে হবে- হাঁ, অমুক বাবুর মতো আর হয় না...'

তার কোনও ভাবনা নেই।' বাণটু উৎসাহিত হয়ে বললে। 'হারু, গুপী, কেষ্ট, গদাই- ওরা তো আছেই। কালই ওদের লজেঞ্চুষ খাইয়েচি। আজ আবার টফি দেব বলেচি...আর রোজ যে মোটরে চড়াই!...'

পরের রবিবার বাণটুদের বাগানেই ভোট-সভা আহূত হ'লো।

'কে কে ভোটে দাঁড়াতে চাও?' গম্ভীর গলায় বাণটু ঘোষণা করলে। যেন ঘোষণা নয়, সাবধান-বাণী। অর্থাৎ খবরদার, কেউ দাঁড়াতে চেয়ো না, দাঁড়ালে মুস্কিলে পড়বে।

কিন্তু তা হ'লে কি হয়, বিশু, শম্ভু, খুকী, পারুল, হাবলা প্রভৃতি আধ ডজন ছেলেমেয়ে হাত তুললে। তারা সবাই দাঁড়াতে চায়। সবারই নেতা হ'তে শখ।

'বটে!' বাণ্টু মেঘের মতো আওয়াজ ক'রে বললে। 'হারু-গুপী-কেষ্ট-গদাই, তোরা তৈরী আছিস?...'

'হাঁ।' একবাক্যে সাড়া এল।

'তবে লাগা।' বাণ্টু বললে।

পলকে মারামারি শুরু হয়ে গেল। চেঁচামেচিতে ছুটোছুটিতে চারদিক ভরে উঠল। বাড়ী থেকে বাণটুর মা ও অন্যান্যেরা ছুটে এলেন। কিন্তু তখন মাঠ প্রায় পরিষ্কার।

'কি হয়েছে রে?' মা স-উদ্বেগে প্রশ্ন করলেন।

'আমি ইলেকশনে জিতেছি, মা!' সগর্ব্বে বাণ্টু জানালো। 'কি ক'রে নেতা হ'তে হয়, তার কায়দা শিখে নিয়েছি...'

বাতাসেরও রেহাই নেই

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

পাল-তোলা নৌকো তোমরা সকলেই দেখেছ, অনেকে চড়েছও হয়তো। পালে বাতাস লাগলে তারই ঠেলায় নৌকো এগিয়ে চলে। সেকালে, যখন বাষ্পে-চলা জাহাজের আবিষ্কার হয় নি, তখন সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজও এই রকম পালে ভর দিয়ে চলত। অর্থাৎ বাতাসের শক্তিকে কাজে খাটিয়েই মানুষ যতটা সম্ভব জলপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছিল।

শুধু যাতায়াতের ব্যবস্থা করাই নয়, ছোটখাট কল-কারখানা চালানো, কূয়ো থেকে জল তুলে ক্ষেতে ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি আরও হরেক রকম কাজে বাতাসের সাহায্য নেওয়া হ'ত। এজন্য নানা জায়গায় হাওয়া-কল, যাকে ইংরেজীতে বলে 'উইণ্ড মিল্', বসানো থাকত। এই রকম উইণ্ড মিলের ছবিও তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। আর, যারা ডন্‌কুইক্‌সটের বিখ্যাত গল্প পড়েছ, তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে কি ক'রে ডন্‌কুইক্‌সট দৈত্য মনে ক'রে এই রকম এক উইণ্ড মিলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন।

বাষ্পের শক্তির সঙ্গে মানুষের পরিচয় হবার পর এই নতুন শক্তিকে মানুষ কাজে লাগাতে লাগল নানা ব্যাপারে। পৃথিবীর চেহারা ক্রমে বদলাতে সুরু করল। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা আরও নতুন নতুন কয়েকটা শক্তির খোঁজ পেয়েছেন। যেমন ধর, বিদ্যুৎ, খনিজ তেল (পেট্রল, কেরোসিন ইত্যাদি)। এর ফলে সেকেলে উইণ্ড মিলের প্রচলন আস্তে আস্তে কমতে লাগল।

কিন্তু যাই বল, বাষ্পের জন্য প্রধানতঃ দরকার কয়লার—যা নাকি অনেক দেশেই নেই। যেখানে আছে সেখানেও তার ভাণ্ডার নিশ্চয়ই অফুরন্ত নয়। কেরোসিন বা পেট্রল সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। অথচ বাতাস হচ্ছে সব চেয়ে সহজ-লভ্য! হাত বাড়ালেই হ'ল। মাটী থেকে দু'শ' মাইল পর্য্যন্ত এই বাতাসের রাজ্য ছড়িয়ে আছে। আর এ যে কত বেশী তা কল্পনা করা যায় যখন মনে পড়ে পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু পাহাড়-চূড়া এভারেষ্ট উঁচুতে মাত্র পাঁচ মাইল।

বিজ্ঞানীরা তাই ভাবতে লাগলেন, এই বাতাসের শক্তিটাকে কোনও নতুন উপায়ে মানুষের কাজে লাগান যায় না কি? উইণ্ড মিল্ বা হাওয়া-কলের সাহায্যে নয়, কেননা সে ক্ষেত্রে বাতাস যখন বেশ জোরে বইতে থাকে তখনই শুধু তার সাহায্য পাওয়া যায়। স্থির, রুদ্ধ বাতাস সেখানে কোন কাজে লাগে না। আর সব সময়ে এবং সর্ব্বত্র যে ঐ রকম মনের মত বাতাস পাওয়া যাবে তার তো কোন মানে নেই!

ভেবে ভেবে বৈজ্ঞানিকেরা একটা উপায় বার করলেন। তাঁরা দেখলেন, বাতাসকে ইচ্ছে করলে খুব চাপ দিয়ে ঘন ক'রে উপযুক্ত পাত্রের মধ্যে ঠেসে রাখা যায়। সেই ঘনীভূত বাতাস প্রয়োজন মত সরু নলের ভিতর দিয়ে বার ক'রে দিলে প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব হ'তে পারে। সাধারণ অবস্থায় বাতাসের চাপ হচ্ছে প্রতি ইঞ্চিতে প্রায় ১৪॥ পাউণ্ড। বাতাসেকে ঠিকমত ঘন করতে পারলে এই চাপকে বাড়িয়ে কয়েক শ' থেকে কয়েক হাজার পাউণ্ডে নিয়ে যাওয়া যায়। এবং তা যদি সম্ভব হয় তা হ'লে সে বাতাসের অসাধ্য আর কি থাকতে পারে বল?

আসলেও হয়েছে তাই। বাতাসকে প্রচণ্ড চাপে ঘন ক'রে বিশেষ ভাবে তৈরী পাত্রের মধ্যে পূরে রেখে, তারপর তাকে প্রয়োজন মত তীব্র বেগে বার ক'রে দিয়ে বিজ্ঞানীরা আজ ছোট-বড় নানা কাজে ব্যবহার করছেন। একটা নয়, দুটো নয়—শত শত রকম কাজে। কয়লার খনিতে কয়লা কাটার কাজে এই রকম বাতাস-চালিত যন্ত্র ব্যবহার ক'রে খুবই সুফল পাওয়া গেছে, কারণ এতে আগুন জ্বলে উঠবার ভয় নেই মোটেই। শুধু কয়লা কাটাই নয়, রাস্তা তৈরী করা, কন্‌ক্রিটের চাঁই ভাঙ্গা, পাহাড়ের গায়ে ছিদ্র করা, কল-কারখানা চালানো, এমন কি রেলগাড়ী চালাবার কাজে শুদ্ধ, এই রকম ঘনীভূত বাতাস ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইয়োরোপ-আমেরিকার অনেক বড় বড় সহরে ডাকঘরের কাজে তো অনেক দিন থেকেই এর প্রচলন হয়েছে! সমুদ্রের নীচে যেমন কেব্‌ল্ বসানো থাকে

তেমনি সহরের বিভিন্ন অংশে মাটীর তলা দিয়ে লম্বা লম্বা নল বসানো আছে—এক ডাকঘরের সঙ্গে অন্য ডাকঘরের সংযোগ ক'রে। জরুরী চিঠিপত্র হাল্কা রবার আর ফেল্ট দিয়ে বিশেষ ভাবে তৈরী এক রকম চোঙ্গার মধ্যে পুরে এই নলে বসিয়ে দেওয়া হয়, তার পর তার ওপর প্রবল চাপের ঘনীভূত বাতাস ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎ-বেগে সেটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তার গন্তব্য স্থলে। এই ভাবে চিঠিপত্র এত তাড়াতাড়ি পাঠানো যায় যে সময় সময় টেলি-গ্রাফের চেয়েও আগে গিয়ে তা পৌঁছায়। অথচ সুবিধে এই, প্রেরকের নিজের হাতে লেখা সে চিঠি; টেলিগ্রাফ পাঠাবার মত অত কসরৎও করতে হয় না তা নিয়ে, আর একসঙ্গে অনেক বেশী কথা লেখা চলে। আজকাল এই 'হাওয়ার ডাকে'র এত উন্নতি হয়েছে যে এর সাহায্যে বড় বড় ভারী ভারী পার্সেলও পাঠান হচ্ছে অতি অল্প সময়ে।

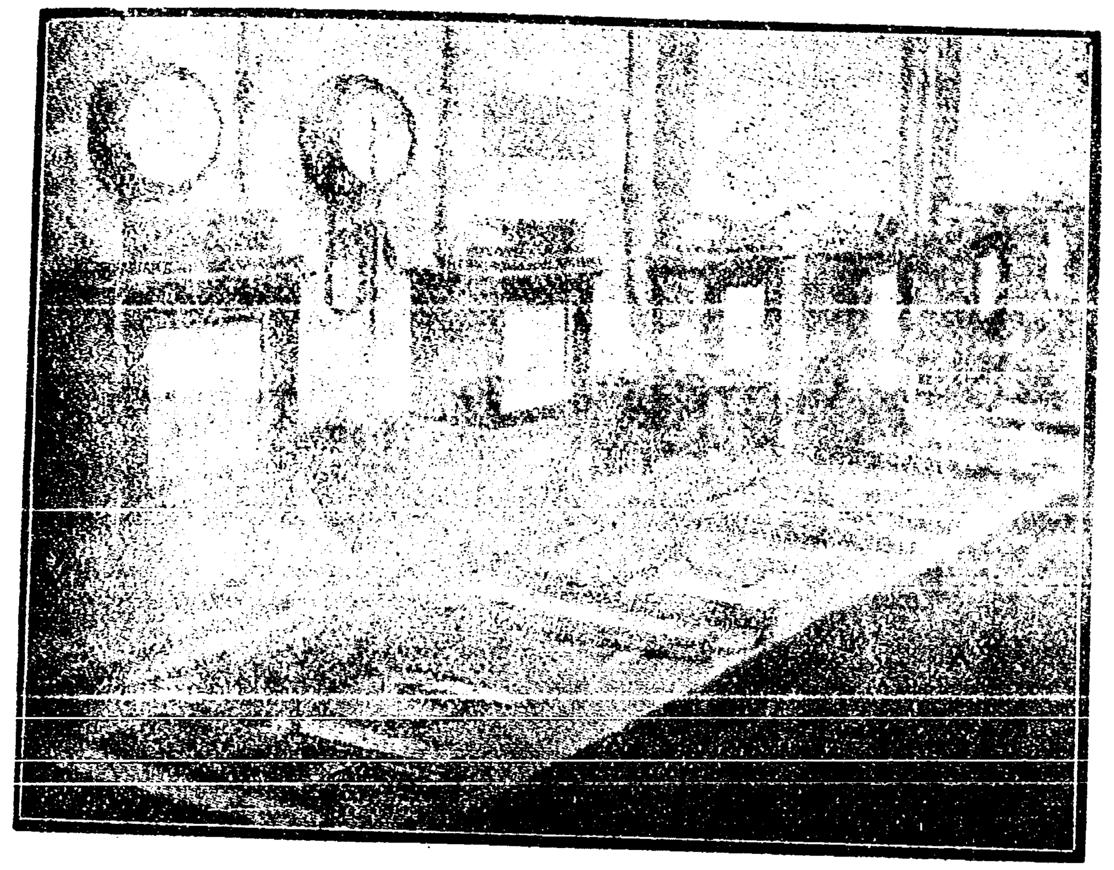

ঘনীভূত বাতাসের সাহায্যে চিঠি পাঠাবার ডাকঘর

তোমরা হয়তো ভাবছ, এ নয় হ'ল, কিন্তু কোন কারণে নলের মধ্যে যদি কোন চোঙ্গা হঠাৎ অসাবধানতায় আটকে যায় তা হ'লেই তো চিত্তির! মাইলের পর মাইল লম্বা নল চলে গিয়েছে, তার কোথায় গিয়ে কোন্‌টা ঠেকল, নল না খুলে তা তো আর বোঝা যাবে না! কিন্তু মোটেই তা নয়। কাজটা খুবই সোজা। সে রকম ক্ষেত্রে নলের মুখে একটা পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ করলেই হ'ল। পিস্তলের শব্দ নলের ভিতর দিয়ে গিয়ে সেই চোঙ্গায় ঠেকে আবার প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসবে। পিস্তলের আওয়াজ সেকেণ্ডে কত ফুট যায় তা কর্ত্তাদের জানা আছে, কাজেই কতক্ষণ বাদে শব্দটা প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল সেটা ধরতে পারলেই নলের কোন্ জায়গায় চোঙ্গা আটকে আছে বার করতে আর কোনই কষ্ট হয় না।

এই রকম ঘনীভূত বাতাসের সাহায্যে নলের ভিতর দিয়ে জিনিষ আদান-প্রদানের চলন আমেরিকার বড় বড় সহরে খুবই বেড়ে গেছে। শুধু ডাকঘরেই নয়, আপিসে, হোটেলে, এমন কি অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে পর্য্যন্ত এর রেওয়াজ হয়েছে। পঞ্চাশ তলা-ষাট তলা এক-একটা বাড়ী, তার কত দিকে কত এলাহি কাণ্ড! একই বাড়ীর এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের যোগাযোগ রাখাও সহজ কথা নয়। এই রকম বাতাস-যাওয়া নলের প্রচলন হওয়ায় সেখানকার বাসিন্দাদের তাই মহা সুবিধা হয়েছে। ঘরে ঘরে এই রকম নল বসানো আছে। তার ভিতর দিয়ে চিঠিপত্র, দরকারী কাগজপত্র এবং অন্যান্য খুঁটিনাটি জিনিষ—সবই এদিক্ ওদিক্ চালান করা যাচ্ছে বিদ্যুৎ-বেগে, আবার আসছেও তেমনি ভাবে। হোটেলের ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে নিমেষের মধ্যে। এমন কি ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া, দোকান থেকে জিনিষপত্র কেনাকাটি—এ সবও সময় সময় হাসিল হচ্ছে এই নলেরই ভিতর দিয়ে ঘনীভূত বাতাসের সাহায্যে।

ছোটখাট শিল্পকলায়ও বাতাস-চালিত যন্ত্রের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। ঘরের দেয়াল চূণকাম করতে হবে বা ডিস্‌টেম্পার করতে হবে? বেশ, নিয়ে এস বাতাস-চালিত যন্ত্র। পাটের পোঁচরার চাইতে অনেক সহজে অনেক নিখুঁত ভাবেও কাজ হাসিল হয়ে যাবে। জাহাজের গায়ে রং করতে হবে? তুলি দিয়ে আর কতক্ষণ বুলোবে? দিনের পর দিন কেটে যাবে ওতে আর লোকেরও দরকার হবে অনেক। তার চাইতে নিয়ে এস বাতাস-চালিত রং স্প্রে করার যন্ত্র, কয়েক দিনের কাজ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, তাও দশ ভাগের এক ভাগ লোক লাগিয়ে। আজ এই বাতাস-চালিত যন্ত্রের সাহায্যে শিল্পী অতি সহজে পাথর খোদাই ক'রে তার মূর্ত্তি গড়ছে, দন্ত চিকিৎসক রোগীর দাঁত পরিষ্কার ক'রে দরকার মত তা ভরাট ক'রে দিচ্ছে, ছুতোর তার কাঠ চেরাই ক'রে নিচ্ছে। মিস্ত্রীকে আর কষ্ট ক'রে হাতুড়ী চালাতে হচ্ছে না—বায়ু-চালিত কলের হাতুড়ীই তার কাজ ক'রে দিচ্ছে। ডুবুরীকে জলে নেমে নিঃশ্বাস নেবার জন্য আর চিন্তা করতে হচ্ছে না, ঘনীভূত বাতাস-পোরা নল তার সঙ্গেই রয়েছে। এ যাবৎ কাচের আসবাবপত্র তৈরী করতে হ'লে শেষ অবস্থায় অনেক মেহনৎ করতে হ'ত। শিক্ষিত ওস্তাদরা এসে তরল কাচের নলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে অনেক ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের পর মনোমত জিনিষ গড়তে পারত। ঘনীভূত বাতাস এখন অতি সহজেই তাদের কাজ উদ্ধার ক'রে দিচ্ছে। এই রকম আরো কত কি!

বিজ্ঞানীদের পাল্লায় পড়ে আজ আর কারোই ছুটী নেই—পবনদেবেরও না।

কৃতী গ্রাহক-গ্রাহিকার পাতা

কুমারী স্বপ্না রায় ও কুমারী ছন্দা রায় রামধনুর দু'টি ছোট্ট গ্রাহিকা। সম্প্রতি এরা দু' বোনে পাটনা লেডী ষ্টিভেন্সন্ হলে "ধ্রুব" অভিনয়ে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছে। ধ্রুবের ভূমিকায় স্বপ্না এবং উত্তমের ভূমিকায় ছন্দার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে নেপালের মহারাণী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী দেবী এবং আরো অনেকে তাদের পদক দিয়ে অভিনন্দিত করেছেন। কুমারী স্বপ্না সঙ্গীতেও বিশেষ নিপুণা। পাটনার একাধিক সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় সে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্রথম হয়ে বহু পদক ও পুরস্কার লাভ

কুমারী ছন্দা ও কুমারী স্বপ্না রায়

কুমারী সুতপা চট্টোপাধ্যায়

করেছে। পাটনার বেতার-আসরেও সে নিয়মিত অংশ গ্রহণ ক'রে থাকে। তার বয়স মাত্র ১০ বছর। কুমারী ছন্দার বয়স ৭ বছর। সেও সম্প্রতি ওখানকার বেতারে 'বালমণ্ডলীতে' অংশ গ্রহণ করছে। এদের বড় বোন শ্রীমতী রত্না রায়ও (রামধনুর গ্রাহিকা) পাটনার একজন বেতার-শিল্পী।

কুমারী স্তপা চট্টোপাধ্যায় কাশীপ্রবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা। এরও কৃতিত্ব বহুমুখী। নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি, লাঠি ও ছোরা খেলা এবং লেখাপড়া—সব দিক্ দিয়েই সে বাহাদুরী দেখিয়েছে। কাশীর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রভুনারায়ণ ক্লাব, মিলন সংসদ্, লিট্‌ল্ মোহনবাগান ক্লাব, মিনার্ভা ক্লাব, মানসী লাইব্রেরী, হিন্দু গার্ল্‌স স্কুল, হরিসভা এবং আরও নানা প্রতিষ্ঠান থেকে সে বহু কাপ্, মেডেল, মূর্ত্তি এবং পুরস্কার পেয়েছে। কুমারী স্তপা বর্ত্তমানে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু গার্ল্‌স্ স্কুলের প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্রী।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ

শ্রীগৌরী দেবী

চল, এবারে একটু দেশভ্রমণ ক'রে আসি। কোথায় যাবে? যাচ্ছ যখন, তখন একটু দূরেই যাওয়া যাক্। অজানা, অচেনা দেশ দেখতেই তো ভাল লাগবে বেশী!

কয়েক বছর আগে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে একদল বাছাই-করা খেলোয়াড় এসেছিলেন আমাদের দেশে ক্রিকেট খেলতে। এঁদের কয়েক জন পরে কমন্‌ওয়েল্‌থ দলের সঙ্গেও আবার এসেছিলেন।

এঁদের মধ্যে রামাধীনের খেলা দেখে সবাই অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। ঐ সময়ে, যারা ভূগোলের বিশেষ ধার ধারে না, তারা অনেকেই জিজ্ঞাসা করত, 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিজটা আবার কোথায়?' যারা জানত তারাও নামের চাইতে খুব যে বেশী কিছু জানত তা মনে হয় না। কাজেই এই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজেই বেরিয়ে এলে কেমন হয়?

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ কোথায় জান তো? উত্তর আমেরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকার মাঝখানে

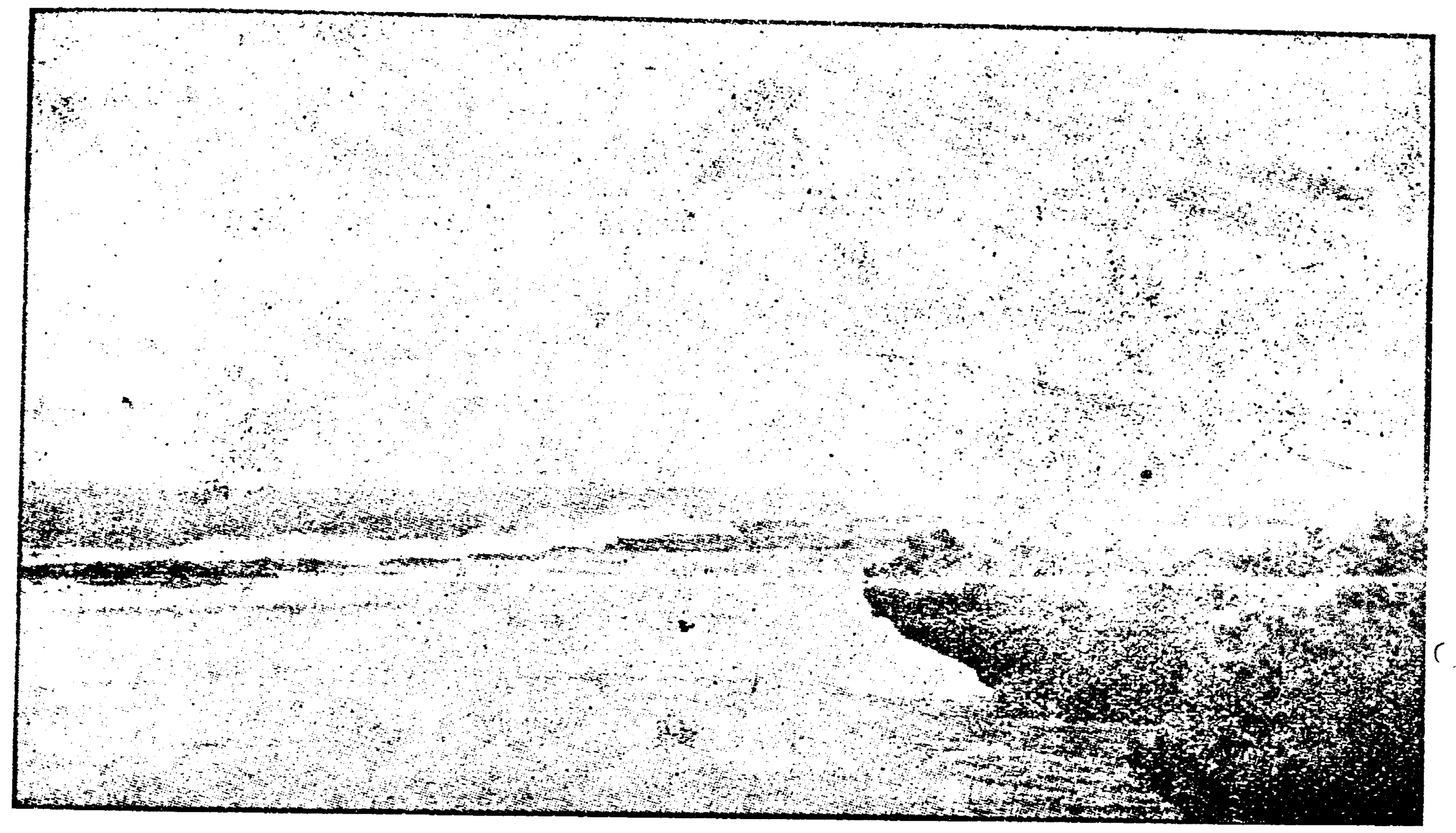

প্রবাল-দ্বীপ

পানামা, তারই পূবে ক্যারিবিয়ান্ সাগর। এই ক্যারিবিয়ান্ সাগরের মধ্যে ছড়িয়ে আছে অনেক-গুলি ছোট-বড় দ্বীপ। এদেরকেই বলা হয় ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ। স্পেনীয়রা যখন আমেরিকা আবিষ্কার করল তখন তারা প্রথমে তাকে ভারতবর্ষ ব'লে ভুল করেছিল। তাই এরও নাম দিয়েছিল ইণ্ডিয়া। কিন্তু আসল ইণ্ডিয়া হচ্ছে পূর্ব্ব গোলার্দ্ধে, তাই পরে এদের নাম দেওয়া হয় ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া বা ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে আদিম অধিবাসী এখন বিশেষ নেই বললেই হয়। এখন যারা বাস করে তাদের মধ্যে নিগ্রোর সংখ্যাই বেশী। কিছু শ্বেতাঙ্গ এবং বিদেশীও আছে। এক সময়ে স্পেনীয়রা এ দেশ দখল ক'রে নেয়, তখন দলে দলে স্পেনীয়রা এসে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাদের সঙ্গে আসে বহু আফ্রিকান ক্রীতদাস। এখনকার অধিবাসীরা অনেকেই তাদেরই বংশধর। অবশ্য তাদের এবং স্পেনীয়দের সঙ্গে স্থানীয় লোকেদের বিবাহাদির ফলে অনেক মিশ্র জাতেরও সৃষ্টি হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকেও অনেকে গিয়ে ওখানে উপনিবেশ গেড়েছিল, তাদের বংশধররাও ওখানে রয়ে গেছে। তোমাদের প্রিয় খেলোয়াড় রামাধীনের পূর্ব্বপুরুষও এই ভাবে ভারতবর্ষ থেকে ওখানে যান।

প্রথমে এস আমরা ত্রিনিদাদে নেমে পড়ি। ত্রিনিদাদ যেন বাঙ্গালীর কাশী। উত্তর প্রদেশে হ'লেও কাশীতে যেমন বাঙ্গালী খুব বেশী, এখানেও তেমনি ভারতীয় হিন্দুর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এত দূর বিদেশে এসেও নিজেদের দেশের লোক পেয়ে তোমাদের নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগবে। এখানকার হিন্দু-মন্দির একটি দেখবার জিনিষ; সম্প্রতি ভারত সেবাশ্রম থেকে একদল সন্ন্যাসী এসে এখানকার আশেপাশে হিন্দু ধর্ম্মের বাণী প্রচার ক'রে খুব জনপ্রিয় হয়েছেন। এঁদের কাছে বহু বিদেশী হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষাও নিয়েছে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার। এখানে সেখানে ছড়ানো রয়েছে বড় বড় জলপ্রপাত, স্বচ্ছ নীলসলিলা নদী, আপনার থেকে তৈরী সুন্দর সুন্দর ফল-ফুলের বাগান। এখানকার পীচের হ্রদও একটা দেখবার জিনিষ। এই বিরাট হ্রদে জল নেই এক ফোঁটা, আগাগোড়া আলকাৎরার পীচে ভর্ত্তি। রাস্তা বাঁধাবার জন্য পৃথিবীর নানা জায়গায় এখান থেকে পীচ সরবরাহ করা হয়।

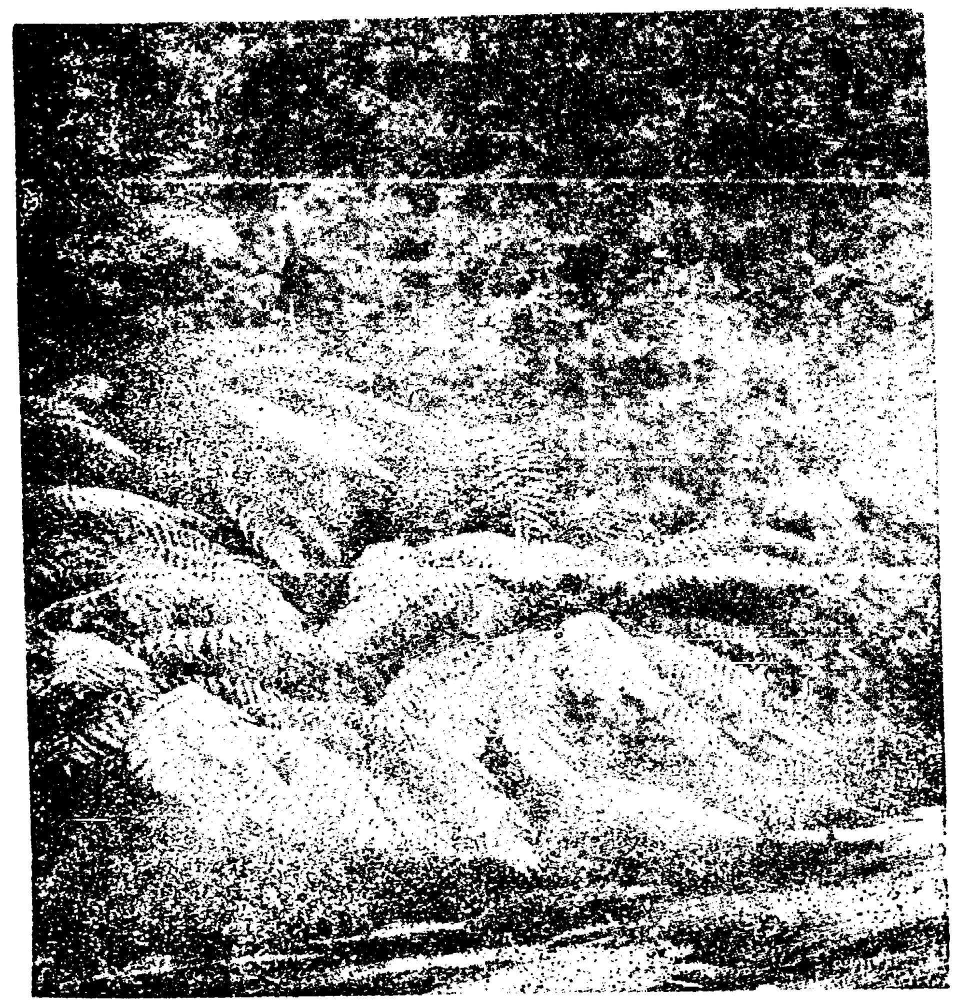

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের কোন কোন দ্বীপ এই রকম ঘন গাছপালায় ভর্ত্তি। অসম্ভব উর্ব্বরা ওখানকার মাটী।

ত্রিনিদাদ থেকে আমরা যাব বারবেডোস। এখানকার দৃশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। এই দ্বীপটি প্রায় সবটাই তৈরী হয়েছে প্রবাল থেকে। সমুদ্রের ধারে যত দূর তাকানো যায় দুধের মত সাদা বালি। আসলে এগুলো প্রবালের গুঁড়ো, তাই এত সাদা। এ রকম প্রবাল দ্বীপ এ অঞ্চলে আরও কিছু কিছু আছে। তবে সেগুলি খুবই ছোট। বারবেডোস দ্বীপের ভিতরে কিন্তু চমৎকার মাটী—আর অসংখ্য আখের ক্ষেত। আখ এবং চিনির ব্যবসা এখানকার একটা মস্ত ব্যবসা। দ্বীপের প্রায় প্রত্যেকটি অধিবাসীই কোন-না-কোন ভাবে এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আছে।

এইবার আস্তে আস্তে আমরা আরও কতকগুলো ছোট-বড় দ্বীপ দেখতে দেখতে যাব। মার্টিনিক, গ্রেনেডা, সেণ্ট ভিনসেণ্ট, সেণ্ট লুসিয়া, ডোমিনিকা, ভার্জ্জিন দ্বীপপুঞ্জ। এর কোনটা এখনও ফরাসীদের অধীনে, কোনটা ইংরেজের, আবার কোনটা বা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে। নানা রকম ফল-ফলারির জন্য এই সব দ্বীপ বিখ্যাত। নারকেল, কমলা লেবু, কফি, কোকো, লেবু, লাইম্ (যা থেকে লাইম্‌জুস হয়) ইত্যাদির প্রচুর চাষ হয় এখানে। আর এক রকম ফল পাওয়া যায়, তার নাম 'ব্রেড-ফ্রুট্' বা রুটী-ফল। এই ফল সিদ্ধ ক'রেও খাওয়া যায়—খেতে অনেকটা আলুর

মত। এই রুটী-ফলের গাছের ছাল দিয়ে চমৎকার কাপড় তৈরী হয়। এর কাঠও নৌকো তৈরীর কাজে চমৎকার। এই সব দ্বীপে উৎকৃষ্ট মেহগনী গাছও প্রচুর হয়। দামী আসবাব তৈরীর কাজে মেহগনী কাঠের কি রকম কদর তা তোমরা নিশ্চয়ই জান।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিখ্যাত দ্বীপ জামাইকার নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এই পাহাড়-ঘেরা দ্বীপটিকে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আধার বলতে পার। এখানকার গরম জলের ঝরণা ও অঞ্চলের লোকের কাছে খুবই আদরের। ওর জল নাকি বাতের মহৌষধ—যেমন আমাদের রাজগীরের উষ্ণ প্রস্রবণের জলের সুনাম আছে। রাজধানী কিংষ্টন্ একেবারে আধুনিক সহর।

কিউবা আর হাইতি হচ্ছে এখানকার সবচেয়ে বড় দু'টি দ্বীপ। কিউবা তামাকের জন্য বিখ্যাত। এরই রাজধানী হচ্ছে হাভানা—যা থেকে 'হাভানা সিগার' কথাটা এসেছে।

যাবার আগে আমরা বাহামা দ্বীপপুঞ্জটাও ঘুরে যাব—বিশেষ ক'রে সমুদ্রের তলাকার দৃশ্য দেখবার জন্য। এখানকার সমুদ্রের খানিকটা অংশ এমন ভাবে 'প্রবাল দিয়ে ঘেরা' যে হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি চারদিকে প্রবালের প্রাচীর গাঁথা রয়েছে। ফলে সেই প্রবাল-ঘেরা নীল সমুদ্রটুকু অসম্ভব রকম স্থির এবং স্বচ্ছ। এখানে একরকম নৌকো পাওয়া যায় যার তলাটা কাঁচ দিয়ে তৈরী। নৌকোয় বসেই সেই কাঁচের ভিতর দিয়ে সমুদ্রের তলাটা,—একেবারে মাটী পর্য্যন্ত, চমৎকার দেখা যায়। স্থির জলে সূর্য্যের আলো পড়ে আর তারই মধ্যে দেখা যায় অদ্ভুত অদ্ভুত সামুদ্রিক আগাছার ঝাড়, নানা আকৃতির প্রবাল, স্পঞ্জ, রং-বেরং সামুদ্রিক জীব—মাছ—ঝিনুক—কত কি! সে যেন এক রূপকথার দেশ! স্পঞ্জের ব্যবসা এ অঞ্চলের একটা খুব নাম-করা ব্যবসা।

কে বড়?

(জাতকের গল্প)

শ্রীশান্তা দেবী

বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্তকুমার নামে এক পরম গুণবান্ রাজা ছিলেন। আসলে ইনি হচ্ছেন বোধিসত্ত্ব, অর্থাৎ বুদ্ধদেবই পূর্ব্বজন্মে একবার ঐ নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রহ্মদত্তের সুশাসনে বারাণসীর লোকেরা পরম শান্তিতে বাস করছিল—কোন রকম অভাব-অভিযোগ ছিল না তাদের। রাজাকেও তারা বাপের মত ভক্তি করত।

একবার ব্রহ্মদত্ত ঠিক করলেন, ছদ্মবেশে দেশ পর্য্যটন করবেন। তিনি আর কাউকে কিছু না ব'লে একদিন শেষ রাত্রে সারথিকে নিয়ে রথে চেপে বসলেন।

রথ চলেছে। চলতে চলতে পথ এক জায়গায় খুব সরু হয়ে গেছে। হঠাৎ ব্রহ্মদত্তের সারথি দেখলেন উল্টো দিক্ থেকে আর একখানা রথ সেই পথে এগিয়ে আসছে। সঙ্কীর্ণ পথে দু'খানি রথ চলবার জায়গা নেই; একজনকে নেমে পথ ছেড়ে দিতে হবে, নইলে কেউই যেতে পারবে না।

অগত্যা ব্রহ্মদত্তের সারথি ভাবলে প্রভুর পরিচয় দিলে হয়তো তাড়াতাড়ি এগোতে পারবে। সে অন্য রথের সারথিকে ডেকে বললে, "ওহে, পথটা ছেড়ে দাও। এ রথে বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্ত রয়েছেন।"

অন্য রথের সারথি জবাব দিলে, "আমার এ রথে রয়েছেন স্বয়ং কোশল-রাজ মল্লিক। কাজেই আমি পথ ছাড়তে পারি না, তুমিই পথ ছেড়ে দাও।"

খানিকক্ষণ কথা কাটাকাটির পর ঠিক হ'ল, যে রাজা বয়সে বড় তিনিই আগে যাবেন। কিন্তু হিসাব নিয়ে দেখা গেল ব্রহ্মদত্ত আর মল্লিক উভয়েই সমবয়সী। তখন ঠিক হ'ল যার রাজ্য বড়, সেনা-বল বেশী, ধনরত্ন বেশী কিংবা বংশমর্য্যাদা বেশী তিনিই আগে যাবেন। দুই সারথি আবার নিজ নিজ প্রভুর পরিচয় দিতে সুরু করল, কিন্তু এবারেও দেখা গেল দুই রাজাই সমান সমান, কেউ কোন দিক্ দিয়েই অপরের চাইতে বড় ন'ন।

তখন কোশল-রাজের সারথি বল্‌ল, "আচ্ছা, এবারে আমাদের রাজার গুণগুলি বলে যাই। তোমাদের রাজার গুণ তারপর শুনব। যদি দেখি তাঁর গুণ বেশী তবে নিশ্চয়ই পথ ছেড়ে দেব। না হ'লে তুমি ছাড়বে।"

"আমাদের কোশল-রাজ" সারথি বলতে লাগ্‌ল, "রাজকুলের আদর্শ। কোমল ব্যবহার পেলে তিনিও কোমল ব্যবহার করেন, কিন্তু কেউ কঠোর হ'লে তিনিও জানেন কি ভাবে কঠোর হয়ে তাকে দমন করতে হয়। আমাদের রাজার নীতি হচ্ছে সাধুর সঙ্গে সাধু ব্যবহার, শঠের সঙ্গে শাঠ্য।"

ব্রহ্মদত্তের সারথি বললেন, "আমাদের রাজার নীতি কিন্তু তা নয়। তিনি বলেন, অপর পক্ষ রাগ দেখালে তুমি রাগ দেখিও না, ভালবাসা দিয়ে তাকে জয় ক'র। অসাধুকে জয় করতে হবে সাধুতা দিয়ে, কৃপণকে শিক্ষা দিতে হবে দানের উদাহরণ দেখিয়ে, মিথ্যাবাদীকে দমন করতে হবে সত্য দিয়ে। কাজেই তুমিই বল কার গুণ বেশী।"

কিন্তু বিচারের জন্য তাকে আর অপেক্ষা করতে হ'ল না। তার কথা শুনে কোশল-রাজ মল্লিক নিজেই রথ থেকে নেমে সারথিকে আজ্ঞা দিলেন, পথ ছেড়ে দিতে।

পাতিয়ালার বীরাঙ্গনা

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে এমন কয়েকজন বীর রমণীর নাম পাওয়া যায় যাঁদের কথা শুনলে বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে! কর্ম্মদেবী, চাঁদ সুলতানা, লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি বীরাঙ্গনাদের নাম তোমরা সবাই জান। আজ আর একজনের কথা শোনাব—যাঁর নাম হয়তো তোমাদের কাছে তেমন পরিচিত নয়। ইনি হচ্ছেন পাতিয়ালার রাণী সাহেবা কোয়র।

পাতিয়ালা হচ্ছে শিখ রাজ্য। রাণী সাহেবা কোয়রও ছিলেন জাতিতে শিখ। যখনকার কথা বলছি তখন পাতিয়ালার সিংহাসনে ছিলেন এক অপদার্থ রাজা, সাহেব সিং তাঁর নাম। রাজকার্য্যের কোন ধার ধারতেন না তিনি, রাতদিন আমোদপ্রমোদেই দিন কেটে যেত তাঁর। ফলে রাজ্যে সুশাসন ব'লে কিছু ছিল না।

রাণী সাহেবা কোয়র ছিলেন সাহেব সিংহের বোন। কিন্তু ভাইবোনের স্বভাবে ছিল আকাশ-পাতাল তফাৎ। রাণী সাহেবা ছিলেন যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি সাহসী।

জয়মল সিংহ নামে এক শিখ জায়গীরদারের সঙ্গে রাণী সাহেবার বিয়ে হয়েছিল, এবং স্বামীর সঙ্গে সুখে-স্বচ্ছন্দেই দিন কাটছিল তাঁর। হঠাৎ একদিন পাতিয়ালা থেকে খবর এল ভাই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। রাজ্যের সর্দ্দারদের ইচ্ছা তাদের রাজকন্যাই রাজ্যশাসনের গুরুভার বহন করুক। ভাইএরও তাতে আপত্তি নেই। তিনি নামে রাজা হয়ে মাথার উপর বসে থাকতে পারলেই খুসী। রাজ্য চালানোর ঝঞ্ঝাট অপরে নিলে সে তো তাঁর পক্ষে পরম সৌভাগ্য।

স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে রাণী সাহেবা পিতৃরাজ্যে ফিরে এলেন, তার পর রাজ্য পরিচালনার সমস্ত ভার তুলে নিলেন নিজের হাতে। সাহেব সিং নামেই শুধু তাঁর উপরে রাজা হয়ে রইলেন।

দেখতে দেখতে রাণী সাহেবার সুশাসনে রাজ্যের চেহারা বদলে গেল। প্রজারা সবাই খুব খুসী।

কিন্তু ওদিকে ঘটল আর এক কাণ্ড। রাণী সাহেবা তো বাপের রাজ্য নিয়ে ব্যস্ত, হঠাৎ খবর পেলেন, ফতেসিং নামে আর এক শিখ সর্দ্দার তাঁর স্বামীর রাজ্য আক্রমণ করেছেন. এবং শুধু তাই-ই নয়, জয়মল সিং যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁর হাতে বন্দী হয়েছেন।

স্বামীর এ বিপদে বীর নারী স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তখনই পাতিয়ালা থেকে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফতে সিংহের রাজ্য আক্রমণ করলেন, আর এই আক্রমণে সৈন্য পরিচালনার ভার নিজের হাতে নিয়ে শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

ফতে সিং এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার ভাবতেও পারেন নি। তিনি বাধা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু রাণী সাহেবার বীরত্বের কাছে তাঁর সৈন্যেরা দাঁড়াতে পারল না—লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

রাণী সাহেবা নিজের হাতে বন্দী স্বামীকে মুক্ত ক'রে দিলেন। শুধু তাই নয়, স্বামীর রাজ্য যাতে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকে তারও সব রকম ব্যবস্থা করলেন। বীর পত্নীর সাহায্যে জয়মল সিংহ আবার নিজ রাজ্য ফিরে পেলেন।

তোমার সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা কর

আগে নিজেরা জবাব দাও, তারপর পাঁচ মিশেলীর শেষে দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ।

(১) কে বলেছিলেন?—

(ক) "আমি সমুদ্রের ধারে কেবল নুড়ি কুড়োচ্ছি, আসল জ্ঞানসমুদ্র দূরেই রয়ে গেছে।"

(খ) "অসম্ভব কথাটি একমাত্র পাওয়া যায় মূর্খদের অভিধানে।"

(গ) "চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না।"

(২) কোন্‌টা ঠিক?—

(ক) 'ডোডো' হচ্ছে আফ্রিকার এক জংলী জাতি, অধুনালুপ্ত একরকম পাখী, নিউ-জিল্যাণ্ডের একটা নদী।

(খ) 'পোপোকাটিপেট্‌ল্' হচ্ছে প্রাচীন মিশরের একজন রাজা, এক রকম বিষাক্ত পোকা, মেক্সিকো দেশের একটি পাহাড়।

(গ) চার্চ্চিল সাহেব হচ্ছেন ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল দলের, উদারনৈতিক দলের, রিপাব্‌লিক্ দলের নেতা।

(৩) এই বইগুলি কোন্‌টা কার লেখা?—

(ক) রবিন্‌সন্ ক্রুসো, (খ) কাউণ্ট অব্ মণ্টেক্রিষ্টো (গ) বুড়ো আংলা (ঘ) সে

(৪) এগুলি বলতে কি বোঝায়?—

(ক) বর্জ্জাইস্ (খ) স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন্ (গ) ক্রসড্ চেক্ (ঘ) দস্তা।

খোস-খবর

ম্যালেরিয়া রোগের কারণ হচ্ছে মশা। ম্যালেরিয়া তাড়াতে হ'লে মশা তাড়াতে হবে। কিন্তু কি উপায়ে? এক প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলেছেন বাদুড় পুষতে পারলে হয়তো তাদের দিয়ে এ কাজ হাসিল হ'তে পারে। বাদুড়ের একটি প্রিয় খাদ্য নাকি মশা। একবার একটা বাদুড়ের পাকস্থলী পরীক্ষা ক'রে প্রায় এক হাজার মশা পাওয়া গিয়েছিল। এক রাত্রের মধ্যে বাদুড়টা ঐ মশাগুলি খেয়েছিল।

* * *

সাহারা মরুভূমি হচ্ছে ধূধূ-করা বালির সাগর। এক ফোঁটা জল ওখানে পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন কোন ভূতাত্ত্বিকের বিশ্বাস,—সাহারার তলায়, অনেক নীচে, বহু লুপ্ত নদীর চিহ্ন বর্ত্তমান। এ বিষয়ে একটা বৈজ্ঞানিক অভিযান চালাবার জন্যও তাঁরা তোড়জোড় করছেন। সাহারার তলায় কোথায় কোথায় এমনি ধারা জলস্রোতের চিহ্ন থাকতে পারে তার একটা ম্যাপ তৈরী ক'রে গভীর কূয়ো খুঁড়তে পারলে, তাঁরা আশা করেন, ওখানে প্রায় ২৫ হাজার বর্গ মাইল উর্ব্বরা জমি তৈরী করাও অসম্ভব হবে না।

* * *

স্পেনের এক ডাক্তার ম্যাড্রিডে বসে তাঁর এক রোগীর চিকিৎসা করেছেন। রোগীটি কিন্তু ছিল ২০০০ মাইল দূরে বুয়েনস্ আয়ারস্‌এ। ডাক্তার অবশ্যি রোগীর নাড়ী, হৃদ্‌পিণ্ড, ফুস্‌ফুস্ সবই ভাল ক'রে পরীক্ষা করতে ছাড়েন নি। এ সবই করা হয়েছে রেডিও-টেলিফোন আর রেডিও-এক্স রে ফটোর সাহায্যে।

* * *

পৃথিবীতে এক সময় নানা রকম ঘড়ির প্রচলন ছিল তা বোধ হয় জান। কেউ মোমবাতির ক্ষয় দেখে সময় ঠিক করত, কেউ করত দড়ি পুড়িয়ে—কতটা দড়ি পুড়ল দেখে। লাঠি পুঁতে তার ছায়ার আকার দেখে সময় ঠিক করার রেওয়াজ অনেক দেশেই ছিল। এ ছাড়া জল-ঘড়ি, বালি-ঘড়ি ইত্যাদি হরেক রকম ঘড়ির কথাও শোনা যায়। কিন্তু চীন দেশে সময় ঠিক করা হ'ত এক অদ্ভুত উপায়ে—বিড়ালের চোখ দেখে। বিড়ালের চোখ আলোর তারতম্য অনুসারে ছোট-বড় হয়, জান তো?

সধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর

(১) (ক) নিউটন (খ) নেপোলিয়ন (গ) বিবেকানন্দ। (২) (ক) অধুনালুপ্ত এক রকম পাখী (খ) মেক্সিকো দেশের একটি পাহাড় (গ) রক্ষণশীল দলের নেতা। (৩) (ক) ড্যানিয়াল ডিফো (খ) আলেক্‌জাণ্ডার ডুমা (গ) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (ঘ) রবীন্দ্রনাথ (৪) (ক) খুব ছোট একরকম ছাপার অক্ষর (খ) একরকম ওষুধ (গ) যে চেক্ ব্যাঙ্কের মারফৎ ছাড়া স্বয়ং গিয়ে ভাঙ্গানো যায় না। (ঘ) একরকম ধাতু।

মা

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

দশ হাতে অস্ত্র তব,
দশ দিকে ঘোরে ত্রিনয়ন,
তবে কেন ত্রস্ত, ভীত,
অবসন্ন তোমার নন্দন ?
অন্নবস্ত্রে এ দুর্দ্দশা
কেন, যথা জননী অন্নদা ?
কেন বা সন্ত্রস্ত করে
ক্রুদ্ধচিতে প্রান্তবাসী সদা ?
সতত কার্ম্মুকধারী
পুত্রে তব কেন মোরা পূজি ?
রক্ষিতে অশক্ত যদি
ভক্তে তিনি, বৈরি সহ যুঝি ?
নব নব অস্ত্রে তিনি
দিলে দেখা, তোমারি কৃপায়,
তুচ্ছি মোরা বদ্ধমুষ্টি,
তুচ্ছি, যথা অম্বিকা সহায়।
গাল পাতি দিব মোরা,
যতই লাঞ্ছনা ভালে যোটে,
এ নীতি যাহারি হোক্,
তোমার এ নীতি নহে মোটে।
ভায়ে ভায়ে প্রীতি যদি
নাহি হয় প্রতাপে তোমার,
যে করে অবজ্ঞা তোমা
লভুক সে চণ্ডীর হুঙ্কার।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

পূজার রামধনু হাতে তোমাদের সামনে হাজির হ'লাম। তোড়জোড় করতে একটু দেরী হ'ল; আশা করি পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা ভেবে কিছু মনে করবে না।

বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ ঋতু হচ্ছে এই শরৎ,—শ্রেষ্ঠ উৎসব হচ্ছে এই দুর্গোৎসব। এক সময়ে দেখেছি, পূজোর অনেক—অনেক আগে থেকেই দেশময় আনন্দের সাড়া পড়ে যেত। প্রবাসী বাঙ্গালী দীর্ঘ দিন পরে নিজের নিজের গ্রামে ফিরে আসতেন। দেশে অভাব-অভিযোগ কম থাকায় সকলেই খুসী মনে উৎসবে যোগ দিতে পারত। এখন আর সেদিন নেই। বাংলা দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ায় এখানকার একটা বড় অংশ পূজোয় বাড়ী যাবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অন্নবস্ত্র-সমস্যা এত জটিল হয়ে পড়েছে যে সাধারণের পক্ষে দিন চালানোই কঠিন। কোথা থেকে আসবে সেই প্রাণের উচ্ছলতা ?

তবু, তোমাদের কচি মুখে এ ক'টা দিনের জন্য হাসি ফুটে উঠুক এই কামনা করি। তোমাদের কেউ কেউ হয়তো ছুটিতে দেশভ্রমণে যাচ্ছ। তোমাদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে জানালে খুসী হব।

শারদীয় সংখ্যা ব'লে এ সংখ্যায় ধারাবাহিক রচনা যতটা সম্ভব কমানো হয়েছে, সেগুলি আসছে বার বেরুবে। "রায়পাহাড়ীর নিশাচর" এবারে শেষ হ'ল, শীঘ্রই আর একজন নাম-করা লেখকের লেখা নতুন একখানা ধারাবাহিক উপন্যাস সুরু করা হবে।

আর একটা কথা, পূজো উপলক্ষে আমাদের কার্য্যালয় কিছুদিন বন্ধ থাকবে; কার্ত্তিক সংখ্যা রামধনু তাই কার্ত্তিকের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হবে। অগ্রহায়ণ মাস থেকে আবার নিয়মিত ভাবে মাসের প্রথমে বেরুবে।

এবার তোমাদের চিঠির জবাব দেই।

শ্রীরুণু বসু (কাঁচড়াপাড়া)—তোমার ১ম বিভাগে প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হবার খবরে খুসী হয়েছি। তোমার চিঠি পড়ে '৪২ দেখে এলাম। তুমি বোধ হয় সিনেমা দেখতে খুব ভালবাস ? প্রদীপের গাছা ও শ্রীকলসী পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত; মাঙ্গলিক কাজে ওগুলি ব্যবহৃত হয়। শ্রীশরদিন্দুবিকাশ দাস (গৌহাটী)—তোমার চিঠির পৃথক্ জবাব আশা করি পেয়েছ। তোমাদের হাতে লেখা

পত্রিকা "পরশমণি"তে রামধনুর পাঠক-পাঠিকাদের কাছে লেখা চেয়েছ। C/o রামধনু কার্য্যালয় এই ঠিকানায় লেখা এলে পাঠিয়ে দেব। শ্রীঅশোক চৌধুরী (নবদ্বীপ)—তুমি রামধনুর জন্য এত ভাব জেনে খুব খুসী হ'লাম। 'কোরকের' দীর্ঘায়ু কামনা করি। ধাঁধার জবাব অমন অদ্ভুত হ'ল কি ক'রে? ও রকম কি কারো মাইনে হয়? শ্রীনিবেদিতা সেন (কলিকাতা ২৯)—ধাঁধার উত্তরে এবারে পাশ। ভুল বুঝলে সব সময়েই তা সংশোধন করা যেতে পারে। অভিনয়ের কথা রামধনুতেই দেখবে। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সেন (বালীগঞ্জ)—তোমার সুচিন্তিত পরামর্শ ভাল লাগল। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল হ'লে আশা করি ত্রুটীগুলি সংশোধন করা যাবে। শ্রীমালবিকা দত্ত (করিমগঞ্জ)—তুমি ম্যাট্রিক ভাল ভাবে পাশ করেছ, শুনে খুব খুসী হ'লাম। কলেজে উঠেও রামধনু তেমনি ভাল লাগে তো? শ্রীবিষ্ণুপদ রায় (চন্দনপুর)—তোমার 'সংগ্রহ' সুবিধামত বার করার ইচ্ছা আছে, পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গেই কি আর বার করা যায়? পারা আর সীসে সম্বন্ধে ও কথা কোথায় শুনলে? কথাটা ঠিক নয়। বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণু ভেঙ্গে এক মৌলিক পদার্থকে অন্য মৌলিক পদার্থে নেওয়া যে সম্ভব তা দেখিয়েছেন—কিন্তু অত সহজে নয়। শ্রীশর্মিলা সরকার (কলিকাতা)—তোমার আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠিখানি পেয়ে খুব ভাল লাগল। খেলাধূলা ও ব্যায়াম সম্পর্কে বাংলায় একাধিক সাময়িক পত্র আছে। যেমন ধর 'ব্যায়াম', 'খেলাধূলা', 'ময়দান', 'গড়ের মাঠ' ইত্যাদি। যে কোন ভাল পত্রিকার ষ্টলেই হয়তো এগুলি পাবে। শ্রীসম্বিৎ দত্ত (গুড়াপ)—তোমার পিতৃবিয়োগের সংবাদে মর্ম্মাহত হ'লাম। তোমাকে কি ব'লে সান্ত্বনা দেব? ভগবান তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন, তোমাদের মনে বল দিন।

তোমাদের প্রেরিত লেখার আলোচনা আসছে বারে করব। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। জয় হিন্দ।—ইতি রাঃ সঃ

নতুন বই

পদ্মানদীর ডাক—শ্রীসুবোধ বসু। গ্রন্থাগার, পি. ৫৮, ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেনসন্, কলিকাতা ২৯। দাম ১৸০

গ্রন্থকার বড়দের জন্য উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব স্থান প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়েছেন। ছোটদের জন্য অবশ্য তিনি কম লেখেন, কিন্তু যেটুকু লেখেন তা হয় অনবদ্য। "পদ্মা—প্রমত্তা নদী" তাঁর একখানি বিখ্যাত উপন্যাস। এ বইখানি তারই কিশোর-সংস্করণ। গল্পের নায়ক 'রাজ্জা' পদ্মানদীর প্রত্যক্ষ প্রভাবে বেড়ে উঠেছে, প্রমত্তা পদ্মার মতই তার চরিত্র। লেখক এই চরিত্র-চিত্রণে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বইখানা তোমরা অবশ্যই পড়ে দেখবে।

পুরু এন্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা, মলাটটিও মনোরম।

চিৎপটাং—শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী, এম্. এ। সি. সি. বসাক এণ্ড সন্স, ১২৭, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। দাম ১৸০

ছোটদের উপযোগী কবিতার বই। বেশীর ভাগ কবিতাই হাসির। গ্রন্থকার ছড়া-কবিতা লেখায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর চিৎপটাংও শিশুদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারবে।

বইখানির রূপসজ্জাও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ছাপা, বাঁধাই, মলাট—সবই প্রথম শ্রেণীর।

আমি যখন বড় হব—শ্রীআশীষকুমার ভট্টাচার্য্য। বিশ্ববাণী লাইব্রেরী, ১৭বি, মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা ২৯। দাম ৸০

এটিও একটি কবিতার বই। কবিতার বিষয়বস্তুর নূতনত্ব সহজেই চোখে পড়ে। শিশুর কল্পনাকে লেখক অতি চমৎকার ভাষায় ও ছন্দে রূপ দিয়েছেন। ছেলেরা কবিতাগুলি পড়ে এবং মুখস্থ করে আনন্দ পাবে। রঙ্গিন কালিতে ছাপা, পাতায় পাতায় ছবিও আছে।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

দিনের শেষে

শ্রীঅমিতাভ ভট্টাচার্য্য

রবি গেল অস্তপাটে,
পাটনীর খেয়াঘাটে
চুকে গেছে দেওয়া-নেওয়া ঐ ;
গোধূলি রাঙ্গাল ধূলি,
ধেয়ে আসে ধেনুগুলি,
রাখাল তাহার পিছে কই !

ছেলেরা নাহিকো মাঠে,
সকলি বিকিয়ে হাটে
দোকানীরা ঘরে চলে যায় ;
পাখীরা ফিরিছে নীড়ে,
সাদা বক যায় ফিরে—
অন্ধকারে মাছ ধরা দায়।

নামে ছায়া সরোবরে,
শতদল-দল পরে,—
ঢুলু ঢুলু হের তার আঁখি ;
সাদা মেঘ ভেসে আসে,
তারি পাশে চাঁদ হাসে,
আঁধারের রূপ দেবে ঢাকি।

দূরে দেবালয়-মাঝে
আরতির শঙ্খ বাজে,
দিবসের যবনিকা নামে,—
সব কিছু হ'ল শেষ,
জাগে সমাপিকা-রেশ,
আঁধার ছড়াল ধরাধামে।

ম্যাজিক ধোঁয়া

টেবিলের ওপর দেখা গেল একটি কাচের গ্লাস রয়েছে। যাত্নকর গ্লাস হাতে নিয়ে দর্শকদের বললেন, ''এইবার আপনাদের ধোঁয়ার খেলা দেখাচ্ছি। এখন, আপনারা বলুন, শুধু চোখে ধোঁয়া দেখবেন, না খেলায় ধোঁয়া দেখবেন?" একজন দর্শক বলে উঠলেন, "শুধু চোখে ধোঁয়া দেখবো"। তখন যাত্নকর একটি বাল্‌তি পর্দ্দার ভিতর থেকে এনে, তার ভিতর কতকগুলি ন্যাকড়ার টুকরো, কাগজের

টুকরো ইত্যাদি রেখে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে বললেন, "এখন আপনারা শুধু চোখে ধোঁয়া দেখ্‌ছেন।" তখন ত্ন'-একজন দর্শক চেঁচিয়ে বললেন, "এ কি ধোঁয়া দেখাচ্ছেন মশাই ? এ তো আমরাও জানি। আপনি অন্য ধোঁয়া দেখাতে পারেন কি ?"

সেই সময় দেখা গেল, যাত্নকরের সহকারী একটি চায়ের প্লেট হাতে করে দাঁড়িয়ে আছেন। যাত্নকর তখন দর্শকদের উদ্দেশ্যে বললেন, "যাঁদের সিগারেট খাওয়া অভ্যাস আছে তাঁরা দয়া করে সিগারেট খান। আমি ঐ ধোঁয়া মন্ত্রবলে গ্লাসের মধ্যে আনবো।" দর্শকদের মধ্যে অনেককেই সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদি খেতে দেখা গেল।

যাত্নকর এবার প্লেটটিকে গ্লাসের উপর ঢাকা দিলেন। হঠাৎ দেখা গেল, আস্তে আস্তে গ্লাসটি ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে। যাত্নকর প্লেটটা গ্লাস থেকে তুলে ধরতেই গ্লাসের ভিতর থেকে ধোঁয়া বার হওয়া আরম্ভ হ'ল।

আশ্চর্য্য হচ্ছ, কেমন ? কৌশলটা জানা থাক্‌লে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। খুব সামান্য ব্যাপার।

এইবার কৌশলটা বলছি শোন।

প্রথমে দরকার একটি বড় কাচের গেলাস ও একটি চায়ের প্লেট। দ্বিতীয়তঃ দরকার এক ড্রাম্ হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও এক ড্রাম লাইকার এমোনিয়া।

শেষের ত্ন'টী জিনিষ সব ডাক্তারখানাতেই পাবে। কিন্তু কোন ডাক্তার বাবুর সার্টিফিকেট ছাড়া পাওয়া হয়তো সম্ভব হবে না। যা হ'ক, ঐ ত্ন'টো রাসায়নিক দ্রব্য না হ'লে এ খেলা দেখানো সম্ভব হবে না। তোমরা কোন রকমে যোগাড় করে নিও।

এর পরের কাজ হচ্ছে সহকারীর। যখন যাত্নকর মঞ্চ থেকে দর্শকদের সঙ্গে কথা বলবেন তখন সহকারী পর্দ্দার অন্তরালে প্লেটের পিছন দিক্‌টায় "লাইকার এমোনিয়া'র এক ফোঁটা তূলি দিয়ে মাখিয়ে রাখবেন। আর গেলাসে এর আগেই ত্ন'-এক ফোঁটা "হাইড্রোক্লোরিক এসিড" দেওয়া থাক্‌বে। গেলাসটি কাৎ করে আস্তে আস্তে ঘুরালে সমস্ত এসিড গেলাসের গায়ে মাখা হয়ে যাবে।

এবার সহকারী এই ত্ন'টী নিয়ে যাত্নকরের কাছে উপস্থিত হ'লেই যাত্নকর গেলাসটি নিয়ে প্লেট চাপা দিয়ে দেবেন। বাস্, অমনি প্লেটের এমোনিয়া আর গেলাসের হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সংমিশ্রণে তৈরী এমোনিয়াম্ ক্লোরাইড-এর ধোঁয়ায় গেলাস ভরে যাবে।

সাবধান—এই ম্যাজিকে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যগুলি ব্যবহারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, নতুবা যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদের সম্ভাবনা আছে। এ বিষয়ে প্রথমটা অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য নিতে হবে।

খেলাধুলার কথা

অবশেষে আই. এফ্. এ শীল্ডের খেলাও শেষ হ'ল। ফাইনাল হ'ল মোহনবাগানের সঙ্গে ইষ্ট বেঙ্গল দলের। দু' দিন। (বাইরে থেকে যে সব দল যোগ দিয়েছিল তারা শেষ পর্য্যন্ত কেউই টিকে থাকতে পারে নি।) প্রথম দিন কেউইই কাউকে গোল দিতে পারে নি, ২য় দিন ইষ্ট বেঙ্গল দলের সালে পর পর দু'খানি গোল দিলে ইষ্ট বেঙ্গল বিজয়ী হয়। ইষ্ট বেঙ্গলের এই বিরাট কৃতিত্ব ভারতীয় খেলোয়াড়দের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করল,—ভারতীয় মাত্রেই এতে গর্ব্ব বোধ করবে। কারণ এর আগে আর কোন ভারতীয় দলই পর পর তিন বার আই. এফ. শীল্ড দখল করতে পারে নি। এ কৃতিত্ব প্রথম দেখায় সেকালের গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স্ দল। তার পর ক্যালকাটা এবং শেরউড ফরেষ্টার্স্। আর এবার দেখাল ইষ্ট বেঙ্গল।

বোম্বাইএ জাতীয় ফুটবল্ প্রতিযোগিতাও (সন্তোষ ট্রফী) শেষ হয়েছে। ফাইনালে বাংলা দল বোম্বাই দলকে পরাজিত ক'রে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বাংলা দল এই নিয়ে পর পর চার বার এই গৌরব অর্জ্জন করল।

কংগ্রেসের নতুন সভাপতি

সম্প্রতি ভারতীয় কংগ্রেসে একটা বড় রকম পরিবর্ত্তনের চেষ্টা হচ্ছে—কংগ্রেস যাতে তার জনপ্রিয়তা ফিরে পায় তারই জন্তে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন এবং কংগ্রেসকে ঢেলে সাজাবার

চেষ্টা করছেন। কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন পদত্যাগ করেছেন, তাঁর জায়গায় জওহরলালজীই সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। কংগ্রেসের সম্পাদক এবং

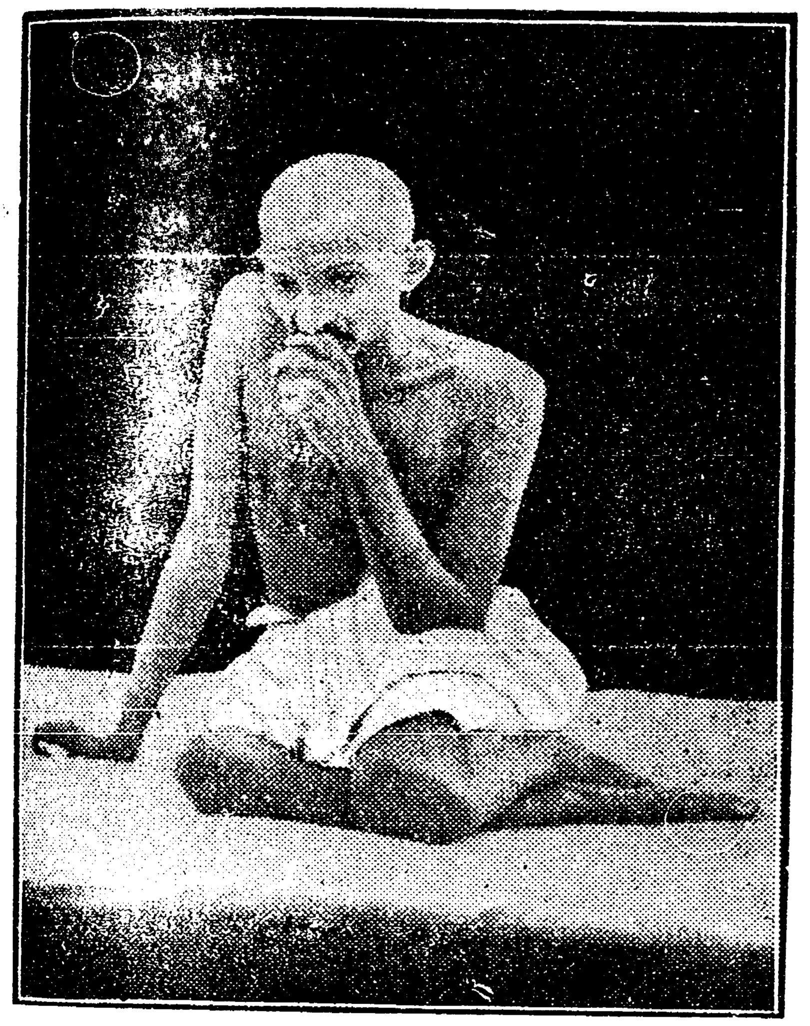

মহাত্মা গান্ধী

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যেও অনেক অদলবদল করা হয়েছে। শীঘ্রই দিল্লীতে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন বসবে; তার তোড়জোড় সুরু হয়ে গেছে।

শিশুকল্যাণ-সংসদ্

সম্প্রতি শিশুকল্যাণকামী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা মিলে 'শিশুকল্যাণ-সংসদ্' নামে একটি সমিতি গঠন করেছেন। এতে বিভিন্ন শিশুচিকিৎসক, শিশুসাহিত্যিক, শিশুশিক্ষাব্রতী এবং বিশেষ ক'রে শিশুদের মায়েরা রয়েছেন। সম্প্রতি এই সংসদ্ কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে সমারোহের সঙ্গে পাঁচদিন-ব্যাপী এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এতে শিশুদের হাতের তৈরী নানা রকম কাজ এবং শিশুদের

কংগ্রেসের নতুন সভাপতি শ্রীজওহরলাল

হিতকরী নানা বিষয় দেখান হয়। সেই সঙ্গে শিশুদের কল্যাণকর বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বক্তৃতারও ব্যবস্থা করা হয়। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

মহাত্মাজীর স্মরণে

২রা অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন।

সারা ভারত এই দিনে মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবে। গান্ধীজীর মহান্ আদর্শই আজকের দিনে আমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, এ কথা ভুললে চলবে না।

একজন ভারী লোক

পূর্ণিয়া জেলায় সারিয়া গ্রামে তীর্থানন্দ সিংহ নামে একটি লোকের খবর পাওয়া গেছে। ইনিই বোধ হয় বর্ত্তমানে এ দেশের সবচেয়ে ভারী লোক। এঁর ওজন সাড়ে ছ' মণ। ভারী হ'লেও এর চেহারা মোটেই বেমানান নয়, বরঞ্চ বেশ সুগঠিত। ইনি উঁচুতে সাত ফুট এবং বেশ শক্তিশালী। এর অনেক জমিজমা আছে, তবু ইনি রোজ খানিকটা ক'রে জমিতে নিজের হাতে লাঙল দেন। এর বয়স ৫০ বছর।

শ্রাবণ মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

'শ্রাবণের ভরা নদী' ছবিটির ওপর সব চেয়ে ভাল কবিতার জন্য পুরস্কার পেলেন শ্রীঅরুণিমা সেনগুপ্তা। (গ্রাঃ নং ৩২১৫—বোলপুর)।

আর যাঁদের লেখা ভাল হয়েছে :—শ্রীমহামায়া মুখার্জি' (কলিকাতা-৪), শ্রীদীপালী সেনগুপ্তা (গৌহাটী), শ্রীজয়ন্তকুমার দাশ (কলিকাতা ১২)।

এ মাসের নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

—এবারে তিনটি পুরস্কার—

নীচে কয়েকটি বিখ্যাত বই থেকে কয়েকটি চরিত্রের উল্লেখ করা হ'ল। এদের মধ্যে কোন্ চরিত্রটি তোমার সব চেয়ে ভাল লাগে এবং কেন লাগে তা লিখে পাঠাতে হবে। কোন্ বইএ চরিত্রগুলি আছে তা কিন্তু তোমাদেরই বার করতে হবে। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে কিন্তু প্রত্যেক লেখার সঙ্গে ২৮১ পৃষ্ঠায় দেওয়া কুপনটি কেটে ভর্ত্তি করে পাঠাতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না। লেখা ১৫ই কার্ত্তিকের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌছান চাই। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়—এই তিনটি পুরস্কার দেওয়া হবে।

চরিত্রগুলি হচ্ছে :—

গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ, জয়সিংহ, অলিভার টুইষ্ট, সিন্দবাদ, ফ্রায়ার টাক্, পাগলা দাশু, অপু, নারায়ণী।

চিত্র-পরিচয়

(২৪৩ পৃঃ)

প্রাচীন রোমের খেলাধুলা :—প্রাচীন রোমের কলোসিয়ামে এই ধরণের খেলা দেখাবার রেওয়াজ ছিল। সদ্য-ধরা বুনো হিংস্র জানোয়ারদের মধ্যে ক্রীতদাসদের নামিয়ে দেওয়া হ'ত লড়াই করবার জন্য, আর হাজার হাজার লোক পরমানন্দে সেই বীভৎস 'মজার দৃশ্য' দেখত।

মিসেস্ রবট্ :—ছবিতে একটি ভদ্রমহিলাকে রাস্তা পার হ'তে দেখা যাচ্ছে। পুলিশ হাত দেখিয়ে গাড়ী-ঘোড়া থামিয়ে এঁকে পার করে দিচ্ছে। মহিলাটি কিন্তু আসল মানুষ ন'ন, কলের মানুষ; যদিও চলাফেরার ব্যাপারে ইনি আসল মানুষের মতই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এঁর নির্ম্মাতা এঁর পাশে পাশে চলেছেন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

রামবাবুর মাইনে এখন ৫০০ টাকা।

উত্তরদাতাদের নাম : দীপক কুমার ধর (সোনালী—পূর্ণিয়া); অনীশকুমার, তপু, শপু, জ্যাতু, ঘুণ্টু (বহরমপুর); অনিলকুমার দাশ ও সুনীলকুমার চৌধুরী (মালদহ); রত্না, জয়ন্ত, স্বপ্না ও ছন্দা রায় (বাঁকীপুর); দিলীপকুমার সমাজদার (কলিকাতা ৪); নিবেদিতা সেন (কলিকাতা ২৯); বেণু ঘোষ (কাটিহার); মালবিকা দত্ত. বৌদি, মাণিক, মেজদা (করিমগঞ্জ); শান্তা গুহ (করিমগঞ্জ); মুকুলরাণী মণ্ডল (কশাড়িয়া); জয়ন্তী, রিতা, ঝুমুর, নূপুর, গায়ত্রী, ভারতী, লাবণ্য, নীহার ও সুশান্ত লাহিড়ী (ময়নাগুড়ি); বিষ্ণুপদ রায় ও পরেশচন্দ্র পাহাড়ী (চন্দনপুর); রুণু বসু (কাঁচড়াপাড়া); সীমা বসু (নিউ দিল্লী); জ্যোৎস্না দেবী (কাশী); জগদানন্দ মিত্র (এলাহাবাদ)।

রামধনু

নাম

ঠিকানা

*

পুঃ প্রঃ শাঃ ৫৮

নূতন ধাঁধা

আমাদের পাড়ায় এক পাগলাটে দোকানদার এসেছে, তার ব্যবসা হচ্ছে নানারকম বাদ্যযন্ত্র বিক্রী করা। সেদিন একটি ছেলে তার দোকানে কিছু বাজনা কিনতে এসেছিল। দোকানদার বললে, "কোন্ বাজনা দেব বল? আমার কাছে ৮ রকম বাজনা আছে, আগে তার পরিচয় দেই। প্রথম যেটিকে দেখছ সেটি কিন্তু এখানকার নয়, এ থাকে কলকাতার এক সহরতলীতে। ২য়টির মজা, গানের যে প্রথম গৎ সেটিই এর নেই। ৩য়টিকে আবার বন্ধ ক'রে রাখার উপায় নেই, সর্ব্বদাই তোমাকে বন্ধ রাখতে মানা করবে। ৪র্থটি কিন্তু ভারী আজ্ঞাবহ; ওকে যে জিজ্ঞাসা করবে ও কার, বলবে ও নাকি তারই! ৫মটির আবার একটি হাত আছে, তার ওপর মস্ত বড় একটা ফল বসানো। ৬ষ্ঠটি দেখতে যাই হোক, ওর ভিতরে আছে খালি ইট-পাথরের টুকরো। ৭মটি অবশ্যি নিতে পার, নিলে তার খানিকটাই হবে তোমার, সবটা নয়। আর অষ্টমটি বিলাতি বাজনা, তাই ওর মাথাটিই শুধু বড়। এখন কোন্‌টা চাও বল?"

দোকানীর কথা শুনে তো ছেলেটি থ! তোমরা বলে দাও দোকানদার কোন্ কোন্ বাজনার কথা বলছে।

(ধাঁধার উত্তর ৫ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত পাঠালে চলবে।)

দ্রষ্টব্য: পূজা উপলক্ষ্যে আমাদের কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে। সেজন্য কার্ত্তিকের রামধনু কার্ত্তিক মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে।

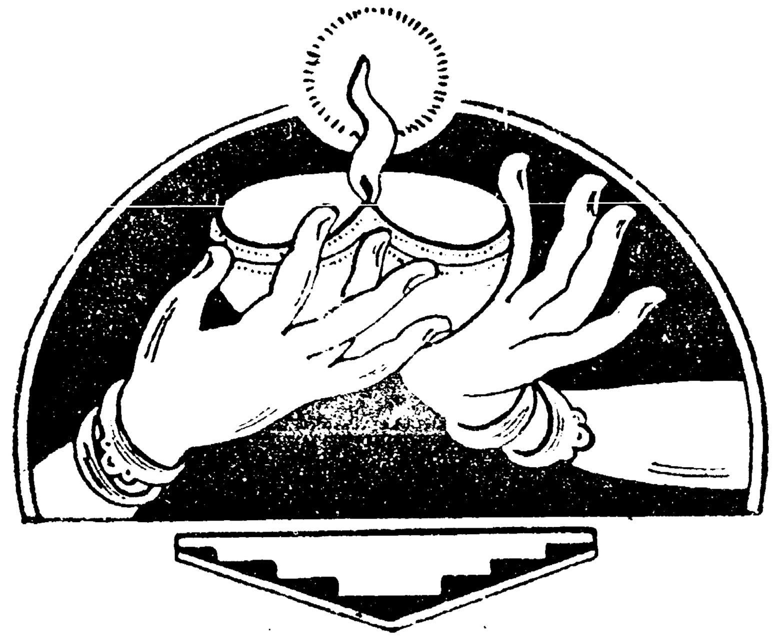

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

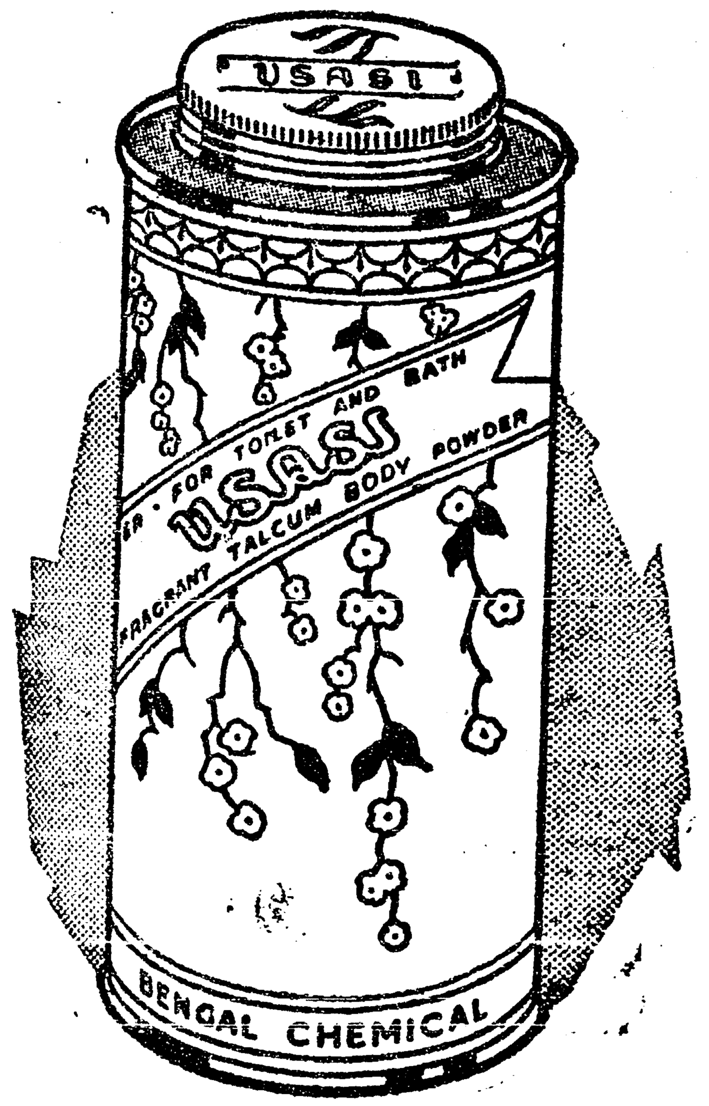

ঊষসী

অভিজাত প্রসাধন-রেণু

লুপ্ত ও সুপ্ত
দেহ সৌন্দর্য্যকে
জাগ্রত করে
শিশুর কোমল অঙ্গেও নির্ভয়ে
ব্যবহার চলে

বেঙ্গল কেমিক্যাল · কলিকাতা · বোম্বাই

ফুটফুটে টুকটুক

পুঁচকে টুকটুকটা কি নোংরা ছেলে! সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাসি মুখ না ধুয়েই গপ্ গপ্ করে খাবে পাউরুটী। ঘেন্না পিত্তি নেই। খাবার খেয়েই খেলতে ছুটবে। আগের দিনের পরা পোষাক ছাড়ে না। রান্নাঘরের পাশে ঘুলঘুলিটায় একটা এত্ত বড় মাকড়সা জাল বুনছিল। বাবু দেখতে পেয়েই জালসমেত মাকড়সাটা চেপে ধরে পুটপুট করে তার সব ঠ্যাংগুলো ভেঙে ফেললে; তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটলো নর্দমার ফাঁকে একটা আরশুলা ঘুরছে দেখে। টুকটুক করলে কি— চুপি চুপি গিয়ে চট্ করে আরশুলাটাকে মুঠার মধ্যে ধরে ফেলে। তারপর তার পায়ে সুতো বেঁধে সুরু করলো আকাশে ওড়াতে। আরশুলাটা খানিকটা ফুরফুর করে ওড়ে, খানিকটা বসে। টুকটুক খিলখিল করে হাসে আর মজা করে হাততালি দেয়। এমনি করেই কাটতো তার দিন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই টুকটুকের দাঁতের গোড়া ফুলে কট্‌কট্ করতে সুরু করেছে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে পূঁয রক্ত পড়ছে; পোকা লেগে দাঁত কালো হয়ে গেছে। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে গরলের মতো ঘা, গাময় বেরিয়েছে চুলকনা! কেবলি চুলকে ওঠে। গরলের ঘা-ভরা-হাতে চুলকাতে পারে না। বাছাধন যায় আর কি! কেঁদে ককিয়ে সারা। শেষকালে টুকটুক ডাক্তারখানায় গেল। ডাক্তার বাবু দেখেই বুঝলেন, নোংরামির জন্য তার এই হাল হয়েছে। তখন প্রেসক্রপশান লিখলেন—

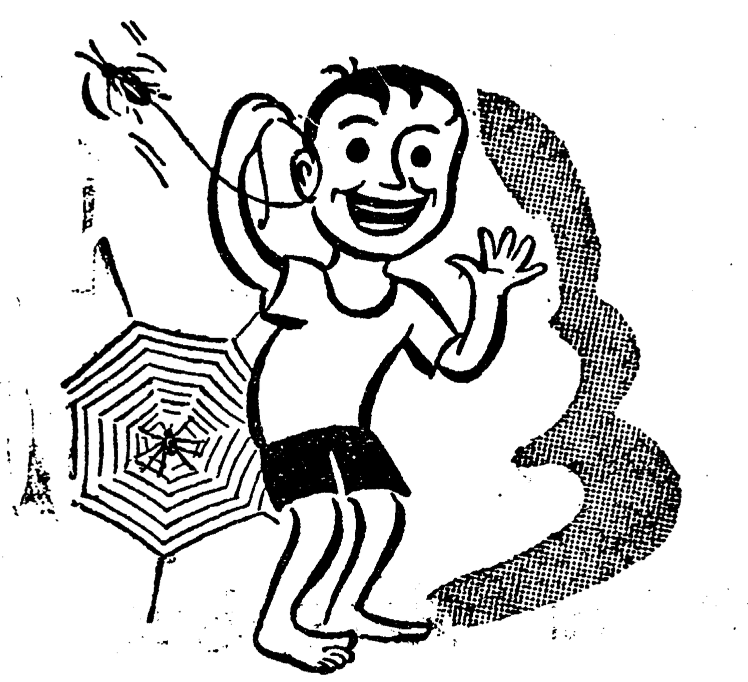

টুকটুকের জন্য—রোজ সকালে-বিকালে **ক্যালকাটা কেমিক্যালের নিম টুথ পেষ্ট** দিয়ে দাঁত মাজতে হবে আর **মার্গো সোপ** গায়ে মেখে চান করতে হবে। আর হাতের ঘায়ে ক্যালকেমিকোর নিমের মলম '**মার্গুয়েন্টাম**' লাগাতে হবে।

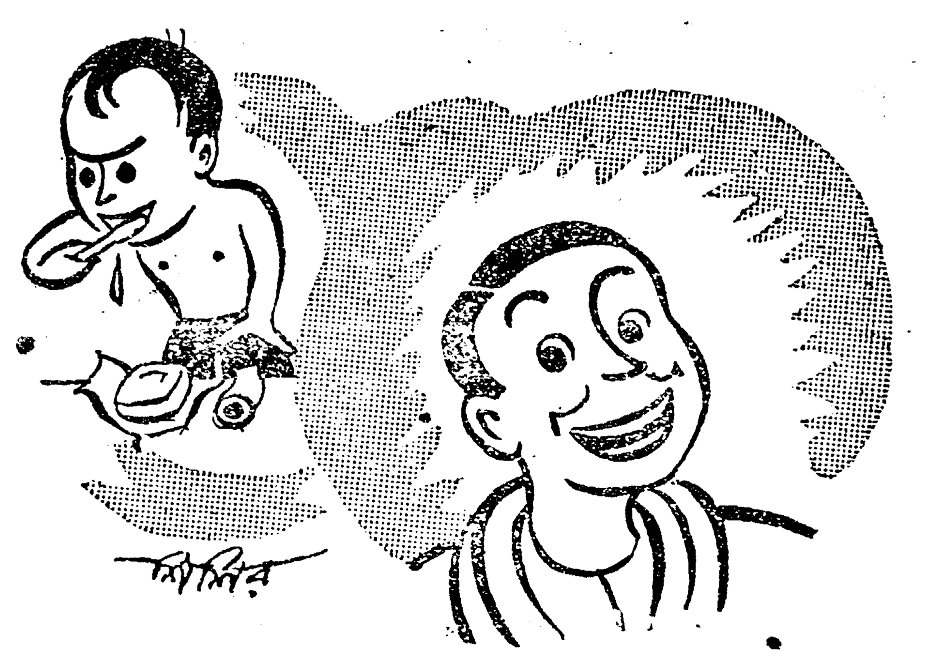

সেই দিন থেকে নিত্যি সকালে উঠে টুকটুক **নিম টুথ পেষ্ট** দিয়ে দাঁত মাজতে সুরু করলে, **মার্গো সোপ** মেখে চান করে এবং আঙুলের ঘায়ে '**মার্গুয়েন্টাম**' লাগায়।

টুকটুক এখন থুত্থড়ো বুড়ো; কিন্তু তার দাঁত একটিও পড়েনি, আয়নার মত ঝকঝক করছে, আর গায়ের রঙ যেন দুধে-আলতা মেশানো। টুকটুক বুড়ো বয়সেও ফুটফুট করছে। নিমের মলম **মার্গুয়েন্টাম** ব্যবহার করার ফলে তার গায়ে আর খোসপাঁচড়াও হয়নি।

শিশুদের জন্য **দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিং** কর্তৃক প্রচারিত।

দেব সাহিত্য-কুটীরের এ বছরের পূজা-বার্ষিকী

বিরাট গ্রন্থ **অভিষেক** দাম চার টাকা

রং-বেরঙের অসংখ্য ছবি, গল্প, কবিতা, হাসি-কৌতুক, নাটক, যাদুবিদ্যা ও খেলাধুলার ঝরণা।

এতে লিখেছেন—

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বনফুল, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, পি, সি, সরকার, কালিদাস রায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনির্ম্মল বসু, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, অন্নদাশঙ্কর রায়, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। এ ছাড়া আরও অনেকে—

শিশু-নাটক

স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত

বীর শিবাজী	৸০	বীর মোহনলাল	৸০	বিদ্রোহী	॥০
স্বাধীনতা জাগল	॥০	কর্ণার্জ্জুন	॥০	বিজয় সিংহ	॥০
প্রতাপসিংহ	৸০	সিরাজের স্বপ্ন	৸০	বন্দীবীর	॥০

দেব সাহিত্য-কুটীর

২২।৫বি ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

গল্পসল্প গ্রন্থমালা

নব প্রকাশিত

শ্রীরাজশেখর বসু
হিতোপদেশের গল্প
বহু চিত্রে শোভিত
শোভন সংস্করণ ১৸০

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত
বেড়াল ঠাকুরঝি
কাগজের মলাট ১৷০
শোভন সংস্করণ ২৸০

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আলোর ফুলকি
শোভন সংস্করণ ২৲

"প্রত্যেক ছেলেমেয়ের এ বই পড়া উচিত। —মৌচাক

"সংস্কৃত সাহিত্যের 'বিবিধ রতন'কে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্গত করবার অসামান্য শক্তি দেখতে পেলাম।" —পূর্বাশা

"গল্পগুলি একটি নূতন স্বাদ লাভ করিয়াছে।" —যুগান্তর

"বলিবার ভঙ্গি এত সরল এবং গল্পগুলি এমনই জটিলতাবর্জিত যে, এগুলি খাঁটি শিশুসাহিত্য হইয়াছে। ছবিগুলিও চমৎকার।"—যুগান্তর

"রূপকথার মত এর প্রত্যেকটি গল্প কথার সুন্দর ভঙ্গিমায় ও ভাষায় সহজ সারল্যে ছেলে-মেয়েদের মনকে অবশ্যই অধিকার করবে।"—মৌচাক

"অবাক হয়ে গেছি 'আলোর ফুলকি' প'ড়ে। ভাবতে পারি নি, এ রকম বই বাংলা ভাষায় সম্ভব।...
'আলোর ফুলকি' সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে এই কথাটাই বলবার যে এটি বাংলা গদ্যসাহিত্যের একটি অনন্য উদাহরণ। এত ভালো গদ্য, আর এত ভালো গল্প অবনীন্দ্রনাথ নিজেও আর কখনো লেখেন নি।"—কবিতা

পূর্ব প্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গল্পসল্প
কাগজের মলাট ১৷৷০
শোভন সংস্করণ ২৷৷০

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
সাত ভাই চম্পা
শিশুদের অভিনয়যোগ্য নাটক
শোভন সংস্করণ ১৷০

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
টাকডুমা ডুম ডুম
শিশুদের অভিনয়যোগ্য নাটক
শোভন সংস্করণ ১৷৷০

শিশুপাঠ্য অন্যান্য বই

শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী
ছেলে ভুলানো ছড়া
উনষাটটি ছড়ার সংকলন
মূল্য এক টাকা

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য
প্রভাত রবি
কিশোর রবীন্দ্রনাথের জীবনী
মূল্য আড়াই টাকা

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন
কুড়ানো ছেলে
ফরাসী গল্পের অনুবাদ
মূল্য বারো আনা

বিশ্বভারতী ০ ০ ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

যাবতীয় বিজ্ঞাপনের কাজের জন্য
কিরীট
অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী
৭২-২, হিন্দুস্থান পার্ক,
কলিকাতা-২৯।

সন্দীপন প্রেস

৪৮, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা ৯

রঙীন ছাপা ও যাবতীয় জবের কাজ সুন্দর রূপে করা হয়। বিলাতী মেসিন, নতুন টাইপ, সময় মত ডেলিভারী আমাদের অপর বিশেষত্ব।

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা	১৲
বিজ্ঞান-বুড়ো	১৲
আকাশের গল্প	১৷০
আবিষ্কারের গল্প	৸০
ধূমকেতু	৸০
অয়েল পেন্টিং (নাটক)	৷০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১৲

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

দি লাষ্ট্ অব্ দি মোহিকান্স্	৷৷৵০

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি	১৷০
পদ্মরাগ	১৷৷০
সোনার হরিণ	১৷৷০
নূতন পুরাণ	৸৵০
হাস্য ও রহস্য	৸৵০
চায়ের ধোঁয়া	৸০
দমাদম্ দামোদর (নাটক)	৷৵০

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত

অলিভার টুইষ্ট	৷৷৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি রসা রোড, কলিকাতা ২৫

জীবন বীমা

জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কগণ বহু শতাব্দীর গবেষণা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে জীবন বীমা পরিচালনার জন্য 'যৌথ' প্রণালীই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই প্রণালীতে বীমাকারীরাই কর্ত্তৃপক্ষ নির্ব্বাচন করেন ও পুঁজিবাদীদের হস্তক্ষেপ করার কোনও সুযোগ থাকে না। যাহা কোম্পানীর লাভ হয় তাহা সম্পূর্ণ বীমাকারীদের ভিতর বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ফলে এই যৌথ প্রথায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অধিক হয় ও চাঁদার হার অনেক কম হয়।

ইণ্ডিয়ান্ মিউচুয়্যাল লাইফ এসোসিয়েশান লিঃ এইরূপ যৌথ প্রথায় পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। গত ২৫ বৎসর ধরিয়া যৌথ নীতিতে পরিচালিত হইয়া এই প্রতিষ্ঠান আজ ভারতবর্ষে সর্ব্বোচ্চ হারে অর্থাৎ প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১২৲ হিসাবে বোনাস দিতে সমর্থ হইয়াছে এবং চাঁদার হারও অনেক কম। বীমার সর্ত্তগুলি বীমাকারীদের স্বার্থসুলভ করিয়া প্রণীত হইয়াছে।

জীবন বীমা করিবার জন্য অথবা এজেন্সি লওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়্যাল লাইফ এসোসিয়েশান লিঃ

১০নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

সেক্রেটারী — মিঃ এস. সি. মিত্র, এম. এ

এবার পূজোয় তোমাদের জন্যে একটা সুন্দর
ঝলমলে বার্ষিকী ইন্দিরা দেবী'র সম্পাদনায়
প্রকাশ করা হচ্ছে। বইটির নাম :

সাত সমুদ্দুর

শুধু ঝলমলে নয়—গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, ধাঁধা, মজার খেলা,
কবিতা, কার্টুন, ভ্রমণ-কাহিনী, হাসির গল্পে বোঝাই।

দাম : আড়াই টাকা　　　　প্রকাশক : শ্রীঅরুণ চক্রবর্ত্তী

পরিবেশক :

এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ

১৪, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা : ১২

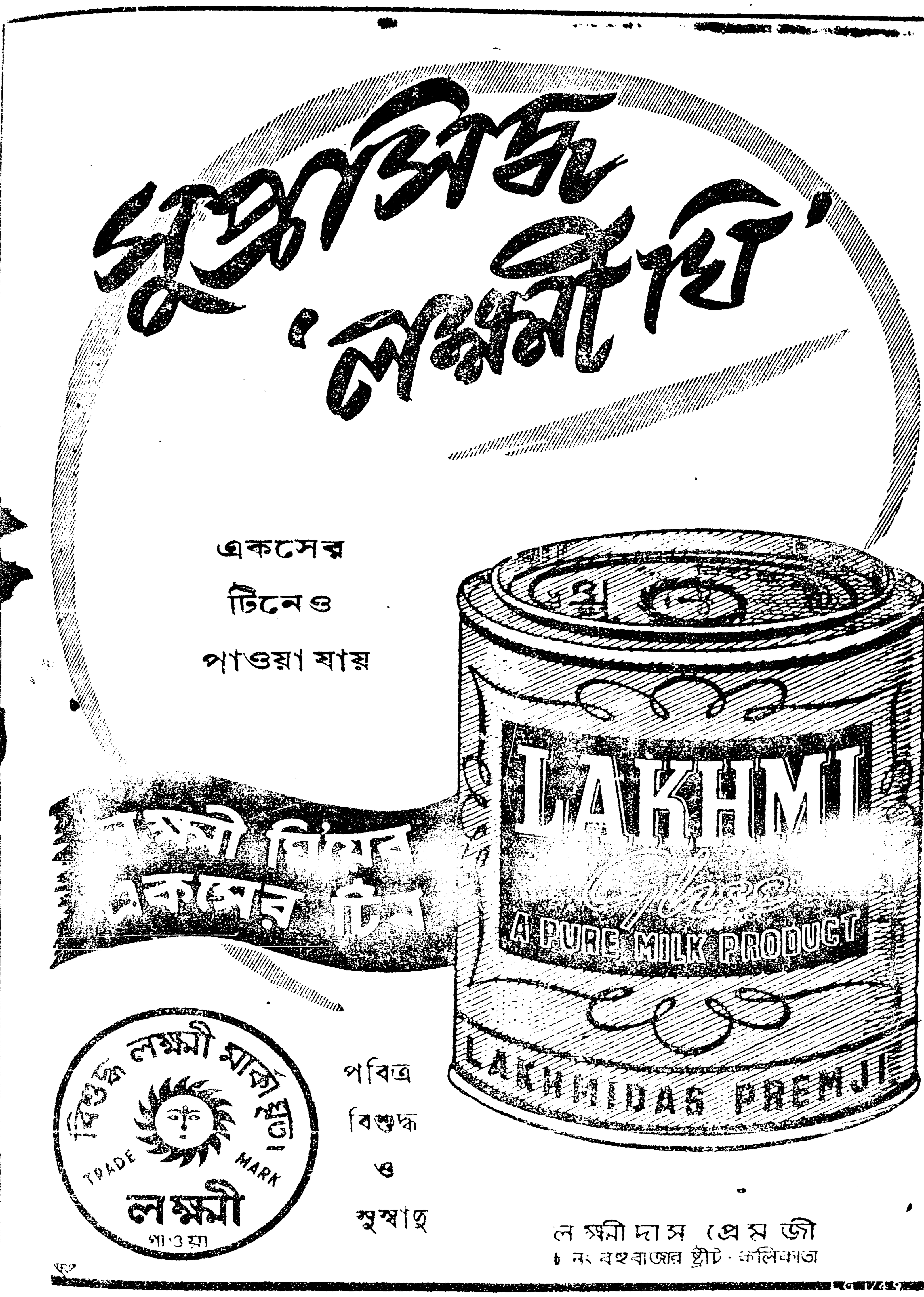

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

স্বকুমারিতায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

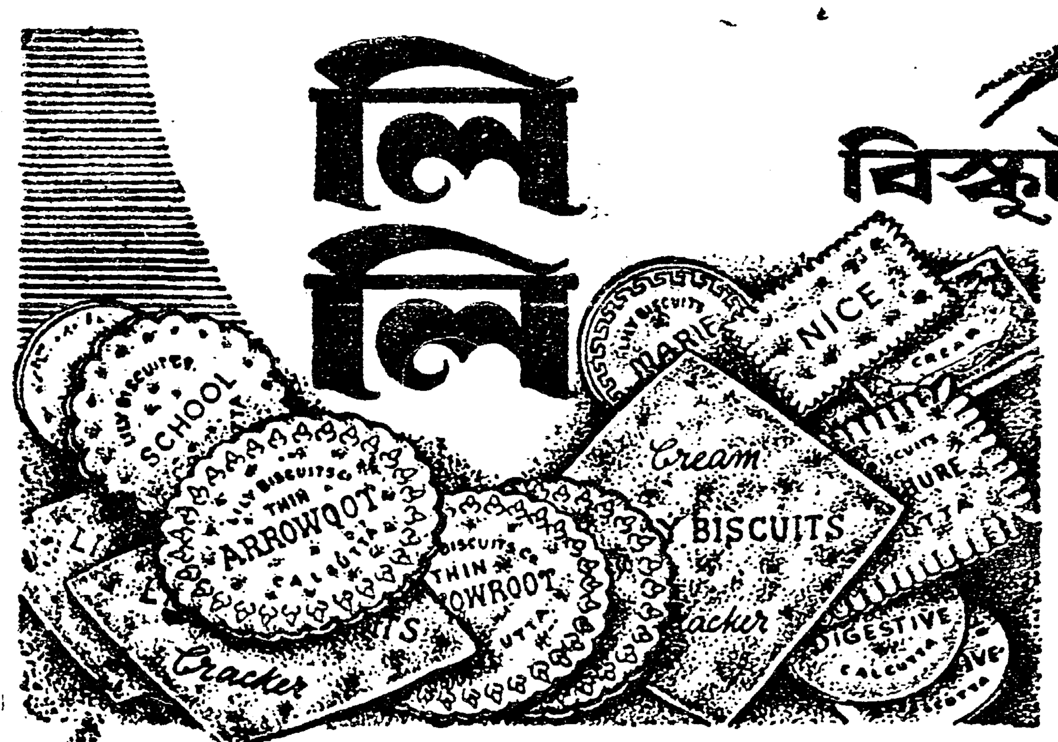

বিস্কুট

কয়েকটী মনোরম
ও
স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন-ক্রীম,
ক্যার্ণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ
৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

২৪শ বর্ষ কার্ত্তিক, ১৩৫৮ ম সংখ্যা

রামধনু

সম্পাদক — শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম, এস-সি

...ষিক ৪॥
...মাসিক ২।০
...সংখ্যা ।৵০

কার্য্যালয় :
১৬, টাউনসেণ্ড রোড
কলিকাতা ২৫

এজেণ্ট চাই

রামধনু খুচরা বিক্রয়ের জন্য বাংলা ও ভারতের সমস্ত বড় বড় সহরে এজেণ্ট চাই।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য
নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার, রামধনু
১৬, টাউনসেণ্ড রোড
কলিকাতা—২৫

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে

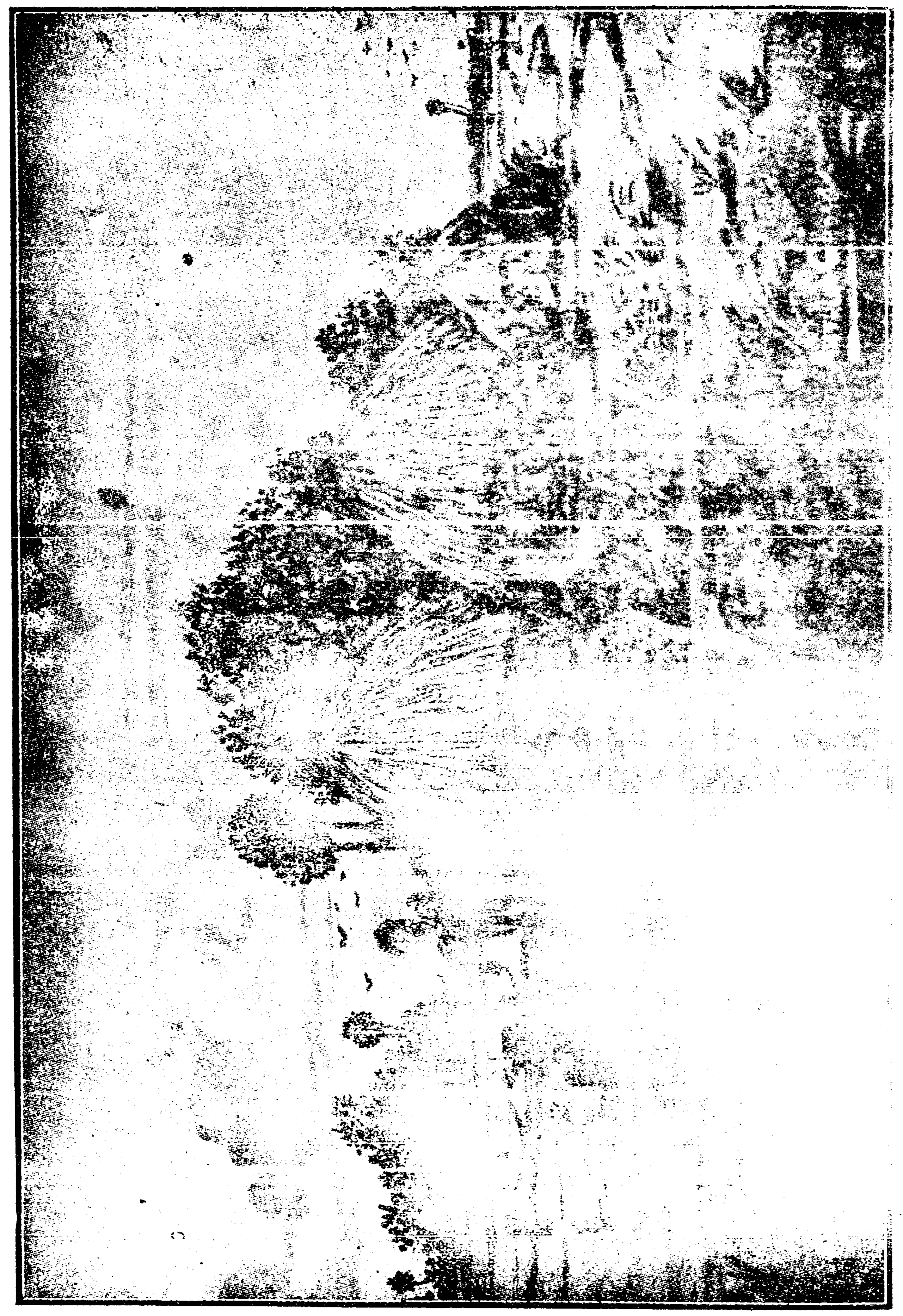

বাংলার মাঠ

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৪শ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৫৮ { ৭ম সংখ্যা

ধ্রুব হওয়া

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাল্যে ধ্রুবের কাহিনী শুনিয়া
ধ্রুব হ'তে হ'ল সাধ,
অজ্ঞাতে আমি হয় তো তাহাতে
করিয়াছি অপরাধ।
বলেছিল মোরে সঙ্গী জনেক
ধ্রুব হয়ে এক-মন,
এক রাত্রিতে ভগবানে ডেকে
পেয়েছিল দরশন।

একটা রাত্রি, নাই ঘুমালাম
ডাকি যদি বসে একা,
ভাবিলাম ঘরে পেয়ে যাব আমি
দীনবন্ধুর দেখা।
চেয়ে লব তাঁর দধির ভাণ্ড—
অক্ষয় সেই ধন,
থাকিবে না কোনো অভাব—হইবে
সার্থক এ জীবন।
সবে নিদ্রিত, উঠিয়া বসিনু
ছবিতে যা আছে আঁকা—
ধ্রুবের মতন করি জোড় হাত
সুরু করিলাম ডাকা।
ডাকিনু,—কোথায় কমললোচন
কৃষ্ণ, এসো হে কাছে,
কাতরে ডাকিছে গরিবের ছেলে,
বড় দরকার আছে।
ডেকে ডেকে শেষে ঘুমানু—দেখা তো
হ'ল না ভাগ্যে মোর,
কি আশা ভঙ্গ। উঠিয়া দেখিনু
রাত্রি হয়েছে ভোর।
এখনো কিন্তু ভাবি সেই ডাক
পথেতে হয় নি হারা;
স্বল্পশক্তি শিশুর সে ডাক
দেরীতে পেয়েছে সাড়া।
হয় তো সে ডাক শুনিয়া দয়াল
আসি গিয়াছেন ফিরে,
সেই চিন্তাই আকুল করে যে
ভাসায় নয়ন নীরে।

তাই ডাকি তাঁরে আজও প্রতি রাতে,
আশাপথ চেয়ে থাকি,
যদি প্রভু ফের আসেন দেখিতে
সে ছেলেটা কাঁদে নাকি।

———

ময়নামতীর গান

শ্রীসুনীল ঘোষ, এম্. এ

এর আগে একবার তোমাদের "ডাক ও খনার বচন" সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলেছি; এবার বলছি "ময়নামতীর গান" সম্বন্ধে। এই গ্রন্থটি যে ঠিক কবে রচিত হ'য়েছে তা সঠিক ভাবে বলা চলে না। খ্রীষ্টিয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি কোন সময়ে রচিত হ'য়েছে বলেই অনুমান করা যেতে পারে। এখন ময়নামতী কে ছিলেন সেই কথাই তোমাদের একটু বলি।

বিক্রমপুর রাজ্যে মাণিকচাঁদ নামে এক রাজা ছিলেন। বিবাহসূত্রে ইনি ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত মেহেরকুল লাভ করেন। এ ছাড়াও উত্তর বঙ্গের বহু স্থান তাঁর শাসনাধীনে ছিল। অনেকের ধারণা এঁর পিতামহের নাম ছিল সুবর্ণচন্দ্র। অনেকের মতে মাণিকচাঁদ ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীর লোক, আবার কেউ কেউ প্রমাণ করেছেন ইনি একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করতেন।

মাণিকচাঁদের স্ত্রীর নাম ছিল ময়নামতী। এঁর আসল নাম কিন্তু শিশুমতী। নাথ সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা গোরক্ষনাথ এঁকে দীক্ষা দিয়ে "মহাজ্ঞান" নামে একটি আশ্চর্য্য বিদ্যা শিখিয়ে দেন। বিদ্যাটি জানা থাকলে জগতে নাকি অনেক অসম্ভব কাজ করা যায়—এমন কি মরা মানুষ বাঁচানো পর্য্যন্ত! অনেক চেষ্টা করেও ইনি স্বামী মাণিকচাঁদকে "মহাজ্ঞান" বিদ্যাটি শেখাতে পারেন নি; কারণ মাণিকচাঁদ নিজের স্ত্রীকে গুরু বলে স্বীকার করতে রাজী হন না। তারপর মাণিকচাঁদ রাজবংশের প্রথা অনুযায়ী আরও অনেকগুলি বিয়ে করলে ময়নামতী সপত্নীদের সঙ্গে সদ্ভাবে বাস করতে পারলেন না। ফলে মাণিকচাঁদ এঁকে রাজধানী থেকে দূর করে দেন। ইনিও রাজধানী থেকে বেরিয়ে এসে "ফেরুসা" নগরে বসবাস করতে আরম্ভ করেন।

এদিকে দিন যায়। মাণিকচাঁদ কুমন্ত্রীদের পাল্লায় পড়ে অবিরাম প্রজা উৎপীড়ন করে চলেছেন। প্রজারাও রাজার মৃত্যু কামনায় ধর্ম্ম ঠাকুরের কাছে পূজো-অর্চ্চনা আরম্ভ করে দিলে। ফলে রাজা অকালমৃত্যুতে পতিত হলেন। ময়নামতীর কাছে সংবাদ গেল। তিনি এসে দেখলেন মাণিকচাঁদ মৃত্যুশয্যায়। স্বামীর উপর এই রকম আচরণ দেখাবার জন্যে ময়নামতী যমকে প্রহার করলেন। রাণী তারপর যমদূতকে তাড়িয়ে নদীতে নিয়ে গেলে যমদূত নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। রাণী তখন মহিষ-রূপ ধারণ করে সেই জলের মধ্যেই তেড়ে গেলেন। যমদূত শফরী হ'য়ে জলের সঙ্গে মিশে গেল; রাণী হলেন পানকৌড়ী। যমদূত চিংড়ি মাছ হ'য়ে লাফাতে লাফাতে চললো— রাণী হলেন রাজহাঁস। যমদূত পায়রা হ'য়ে আকাশে উড়লো; রাণী বাজ হয়ে তাকে তাড়া করলেন। যমদূত বেগতিক দেখে গোদাযম বৈষ্ণবের বেশ ধরে বৈষ্ণবদের মধ্যে ঘুপটি মেরে বসে রইলো; কিন্তু তাতেই কি ছাই রেহাই আছে? রাণী মৌমাছির রূপ ধরে তার মাথায় হুল ফুটিয়ে দিলেন। কিন্তু এত সব মারধর আর অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের পরেও রাজাকে বাঁচান গেল না।

রাজা মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর গোবিন্দচন্দ্রের জন্ম হ'ল। রাজ্যের শাসনভার রয়ে গেল ময়নামতীর হাতে। বড় হয়ে গোবিন্দচন্দ্র বিয়ে করলেন হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যা পরমাসুন্দরী আদুনাকে, আর বিয়ের যৌতুক স্বরূপ পেলেন রাজার দ্বিতীয়া কন্যা পাদুনাকে। অনেকের মতে দাক্ষিণাত্যের রাজা রাজেন্দ্র চোল গোবিন্দচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর একটি মেয়ের বিয়ে দিয়ে রাজার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন।

আঠারো বছর বয়সের সময়ে ময়নামতী পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ১২ বছর সন্ন্যাস গ্রহণে বাধ্য করলেন। গোবিন্দ্রচন্দ্রের পত্নীদেরও এ বিষয়ে মত ছিল না। তারা কিছুতেই নিরস্ত করতে না পেরে গোপনে ময়নামতীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলে। কিন্তু "মহাজ্ঞানের" প্রভাবে তিনি সব ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিলেন। গোবিন্দচন্দ্রকে সন্ন্যাস নিতেই হ'ল, কারণ তা না হ'লে উনিশ বছরেই তাঁর মৃত্যু হ'ত।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর নানা বিপদ্-আপদ্ আর প্রলোভনের মধ্যে দিয়ে গোবিন্দচন্দ্রকে দিন কাটাতে হ'ল। রাজার ছেলে তিনি, বনবাসের এই কষ্ট দেখে তাঁর নিজের মায়ের ওপরেই রাগ হ'তে লাগল সব চেয়ে বেশী। অবশেষে একদিন, দীর্ঘ বারো বছর পরে, তিনি সন্ন্যাসীর বেশে নিজের প্রাসাদে ফিরে এলেন। তাঁকে চিনতে পারলো না কেউ, এমন কি আদুনা পাদুনা পর্য্যন্ত। তাই তিনি যে বিদেশী হ'য়ে রাজপ্রাসাদে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছেন এই অপরাধে তাঁকে হাতীর পায়ে ফেলে দেবার আদেশ হ'ল। কিন্তু হাজার হোক সে রাজারই হাতী; সে-ই গিয়ে রাজার পায়ের তলায় বসে শুঁড় নাড়তে লাগলো। তখন ডাকা হ'ল রাজপুরীর সেই বিরাট কুকুরটাকে। কুকুরও প্রভুকে এতদিন পরে কাছে পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে লেজ নাড়তে লাগলো। তখন চারপাশে হৈ হৈ পড়ে গেল, সবাই চিনতে পারলো তাদের রাজাকে। গোবিন্দচন্দ্র আবার সিংহাসনে বসলেন।

এইখানেই ময়নামতীর গান ফুরোলো। এই গান কোন একটি ব্যক্তি বিশেষের রচিত নয়। নানা জায়গায়, আর নানা লোকের হাতে পড়ে এর মধ্যে নানা রকম ছোটখাট ঘটনা আর মতের সমাবেশ হ'য়েছে। তখনকার দিনের গাথা-সাহিত্যের মত এ গানও লোকের মুখে মুখে গাওয়া হ'ত। সে যুগের প্রায় সব গল্প আর কাহিনীই একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করে গড়ে উঠতো। সেই

সঙ্গে তার সাথে জড়িয়ে থাকতো লোকাচার, দেশাচার আর সমাজনৈতিক পরিবেশ। এই সব অসম্পূর্ণ কথিকার আঁচড় থেকে চুটকি-চাটকি এমন অনেক কথা আমরা জানতে পারি যেগুলিকে জড় করলে দেখতে পাবে যে একটা অন্ধকার যুগের খানিকটা ইতিহাস সকলের অজ্ঞাতেই গড়ে উঠেছে। তা ছাড়াও মাঝে মাঝে দেখতে পাই হাসি-কান্নায় ভরা সহজ মানুষকে।

বনবাসে স্বামীর কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক ; আহুনা সঙ্গে থাকলে স্বামীর অনেক কাজে লাগতে পারেন। তাই তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করছেন :

"আমারে সঙ্গে করি লইয়া যাও ॥
জীয়র জীবন ধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে
রান্ধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে ॥
পিপাসার কালে দিমু পানি।"

কিন্তু যখন কিছুতেই গোবিন্দচন্দ্রকে রাজী করানো গেল না, তখন তিনি কান্নাকাটি আরম্ভ করলেন :

"তুমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা।
রাঙা চরণ বেড়িয়া লমু পালাইয়া যাবু কোথা ॥"

এ ছাড়া দেখতে পাই সে যুগে মেয়েদের সাজগোজ করার প্রবল চেষ্টা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বেঁধে খোঁপা করার রেওয়াজও তখন ছিল যথেষ্ট। "ময়নামতীর গানে" দেখতে পাই রাণী আহুনা চুল বাঁধছেন ; কত রকমেই চুল বাঁধা হ'ল—অথচ মনোমত হ'ল না একটাও। তারপর শাড়ী পরার পালা। "নীলাম্বরী", "মেঘ-ডুম্বুর", "গঙ্গাজলী"—শাড়ীর নামও সে যুগে কম ছিল না।

তখনকার দিনে সম্ভ্রান্ত বংশের নারীরাও জিনিষ কিনতে হ'লে হাটবাজারে যেতে অসম্মান বোধ করতেন না। বাজনার মধ্যে তখন প্রচলিত ছিল খোল, মৃদঙ্গ প্রভৃতি। তখনকার দিনে রাজা সদাশয় হ'লে প্রজাদের ট্যাঁকে দু' পয়সা জমতো। তোমাদের রামধনুর প্রথম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় "ময়নামতীর গান" সম্পর্কিত যে গাথাটি সংগ্রহ করেন তাতে দেখা যায় তখনকার প্রজারা কি রকম স্বাবলম্বী ছিল :—

"কারু পুষ্করিণীর জল কেহ নাহি খায়।
আথাইলের ধনকড়ি পাথাইলে শুখায় ॥"

এ ছাড়া তখনকার দিনের রাজসভার বর্ণনাও কিছু কিছু পাওয়া যায় এই বইএ।

সত্যি ডিটেকটিভ গল্প

শ্রীঅরবিন্দ গুহ

মিউ, মিউ, মিউ—উ-উ।

স্পষ্ট বেড়ালের ডাক। আমরা পাঁচজনে একসঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। গড়ের মাঠের এদিক্‌টায় আমরা আরও অনেক দিন এসেছি, কিন্তু কই, এখানে তো কখনো বেড়ালের ডাক শুনি নি! কোন্ বেড়ালের আবার এমন বেয়াড়া হাওয়া খাওয়ার সখ হ'লো?

তা ছাড়া আমরা এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম যা একান্ত গোপনীয়। পাতা পড়লেও আমরা চমকে উঠতে পারি, বিষয়টা এমন। দেওয়ালের কান আছে বলেই আমাদের এতদূর আসা। কে বলতে পারে এ বেড়ালটাই কৃতান্ত মুখুয্যের চর নয়?

কে কৃতান্ত মুখুয্যে? কৃতান্ত মুখুয্যেকে যদি তোমরা চিনতে তা হ'লে এ সব কথা কিছুতেই তোমাদের বলতাম না।

আসল কথা কি জানো, ও নামে কোনো লোকই নেই। ভদ্রলোকের আসল নাম ভাঁড়িয়ে আমি বানানো নামেই কাজ চালাচ্ছি। আসল নাম শুনতে চাও? মাপ করো, আমি মরে গেলে তবে বরং ভূত হয়ে সে নাম বলবো 'খন। তার আগে পারবো না।

যাক সে, গোপন কথাটা বলি। আমাদের ইচ্ছে হয়েছে এবার পূজোয় আমরা পাড়ায় একখানা প্লে করবো। নাটক ঠিক করে ফেলেছি—"রাবণ বধ"। পার্ট-টার্ট ভাগ-বাঁটোয়ারা—মায় মুখস্থ অবধি সারা, কিন্তু মুস্কিল বেধেছে চাঁদা নিয়ে। পূজোর চাঁদা থেকে থিয়েটার বাবদ একটি পাই পয়সা দিতেও বটকেষ্টদা'র ঘোরতর আপত্তি। আমরা কত বোঝালাম, ধর্মের ব্যাপার নিয়েই থিয়েটার করা হবে, কত হ্যানো কত ত্যানো, কিন্তু বটকেষ্টদা'র সেই এক কথা—"মা দুর্গার নামে তোলা টাকা থেকে আমি এক আধলা বাজে খরচ হ'তে দেবো না। পারো তো থিয়েটারের জন্যে পাড়ার থেকে আলাদা করে চাঁদা তোলো। তারপর তা দিয়ে ইচ্ছে হয় রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখাও, ইচ্ছে হয় কোরিয়ার যুদ্ধ দেখাও।"

অতএব থিয়েটারের নামে চাঁদার খাতা বগলে নিয়ে ঘুরতেও কসুর করি নি। কিন্তু মুরারি উকিল, গুরুদাস মোক্তার, অপরেশ ডাক্তার এমন কি নরহরি কবরেজের মুখেও একই প্রশ্ন—"কৃতান্ত বাবু কি থিয়েটারের চাঁদা দিয়েছেন ?"

আরে, আসল মামলাই তো সেখানে। কৃতান্ত মুখুয্যের মুখখানা এমন যে তার কাছে যাবার কথা উঠলেই আমাদের পেট কামড়াতে সুরু করে। ভদ্রলোক যে কখন কোন্ মেজাজে থাকেন! চাঁদার বদলে হয়তো চাঁদা করে থাপ্পড়ই দিলেন। আবার মেজাজ ভাল থাকলে...

কী উপায় করা যায়, তাই নিয়েই গড়ের মাঠের এখানে আমাদের শলা-পরামর্শ। কিন্তু অন্য উপায় নেই। যেতে হবে, যেতে হবে, যেতেই হবে রে! এমন সময় মিউ, মিউ, মিউ-উ-উ।

বেড়ালটাকে দেখেই তো গোপীকান্ত প্রথমে ভাবাগঙ্গারাম মেরে গেল। আস্তে ঠোঁটের উপর আঙুল তুলে ইশারা করলো, চুপ।

কেউ নেই, কিছু নেই। শুধু একখণ্ড পাথরের সঙ্গে লাল ফিতে দিয়ে বেড়ালটা বাঁধা।

গোপীকান্তই প্রথম মুখ খুললো—"আরে, এ যে কৃতান্ত মুখুয্যের বেড়াল! এ বেড়াল এখানে এ অবস্থায় কেন ?"

সত্যি, এ একেবারে অভাবিত কাণ্ড। কৃতান্ত মুখুয্যের অমন পেয়ারের বেড়াল! শুনেছি, সাহেব-পাড়া থেকে নগদ ছাপ্পান্ন টাকা খসিয়ে কৃতান্ত মুখুয্যে এই কাবুলী বেড়ালটা যোগাড় করেছিলেন। আমরাই তো একদিন ভদ্রলোককে এই বেড়ালটা নিয়ে মোটরে হাওয়া খেতে দেখেছি।

যাকে বলে রীতিমত ঘনীভূত সমস্যা। এ-সমস্যার সমাধান বাংলা দেশে কে করতে পারে ?

দু'জন পারেন। এক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়, দুই শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত। নাম দু'টো আমিই বাতলে দিলাম।

জগমোহন বললো—"ওসব বাজে কথা রেখে এখন কাজের কথা ভাব। বেড়ালটা এখানে কেমন করে এলো! তুই কি বলিস গোবিন্দ ?"

গোবিন্দ গম্ভীর। জটিল সমস্যার পনেরো আনা কিনারা করলে পাকা ডিটেকটিভদের অবস্থা বইয়ে যেমন হয় বলে পড়েছি, গোবিন্দের মুখখানা অবিকল তেমনি।

—"বেড়ালটা কি নিজেকে ফিতে দিয়ে নিজে পাথরের সঙ্গে এমন ভাবে বাঁধতে পারে ?"—গোবিন্দ আস্তে আস্তে রহস্য ভাঙ্গবে।

—"উঁহুঃ। নিশ্চয়ই কেউ একজন বেড়ালটাকে এখানে বেঁধে রেখে গেছে।"

গোবিন্দ বললো—"কে বেড়ালটাকে এখানে বেঁধে রেখে গেছে, আমি জানি।"

গোবিন্দ বলে কী ? শুনে আমার পর্য্যন্ত চোখ যোড়া কপালে উঠে এলো। —"কে? কে?? কে???"

একবার বেড়ালটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গোবিন্দ ঝাড়া সাত মিনিট চুপ করে রইলো। তারপর শান্ত গলায় বললো—"একজন দুর্বৃত্ত।"

আর একটিও কথা না ব'লে আমি মুখ চুণ করে ব'সে রইলাম। গোবিন্দ ব'লতে লাগলো,—"ছেলেধরা কাকে বলে জানো ? এরা বড়লোকের ছেলেদের ধরে নিয়ে যায়, তারপর চিঠি পাঠায়, যদি আপনার ছেলেকে ফেরৎ পেতে চান তো অমুক দিন, অমুক সময়, অমুক জায়গায় পাঁচ শ' টাকা নিয়ে যাবেন। বুঝতেই পারছো, বড়লোকের অনেক পাঁচ শ' টাকা থাকে, আর ছেলেধরার ব্যাপারটাও নেহাৎ ছেলেখেলা নয়। অতএব, পাঁচ শ' টাকা দিয়ে ছেলেকে ফেরৎ নিয়ে আসতে হয়। বুঝতে পারছো ?"

গোবিন্দ বললো—"এখন প্রশ্ন, বাবারা কেন গায়ের রক্ত-জল-করা টাকা দিয়ে ছেলেদের উদ্ধার করে ? বলতে পারো ?"

আমার কথাটা জগমোহনই দুঃখের সঙ্গে বললো—"হাতের সুখের জন্যে। ছেলেদের পিঠের মতো অমন প্রশস্ত পিটোবার জায়গা পৃথিবীতে বাবারা আর কোথায় পাবে ?"

গোবিন্দ এবার জগমোহনের উপর পড়লো—"বোকার মত কথা বলিস নে জগমোহন! সব বাবাই কিছু তোর বাবার মত নয়। সেই জন্যেই সব ছেলেকে ছেলেধরায় ধরে না। তারা এমন ছেলেই ধরে যার বাবা, সাধু ভাষায় যাকে বলে পুত্রবৎসল, স্নেহান্ধ। সোজা কথায় বলতে গেলে যে বাবা ছেলেকে দু' দণ্ড চোখের আড়াল করতে পারে না, এ্যায়সা ভালবাসে। মানে, কারো ভালবাসার জিনিষটি, তা ছেলেই হোক আর যাই হোক, ধরে নিয়ে তারপর ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করে সেটি ফেরৎ দিয়ে দেবে।"

এতক্ষণে বেড়ালের রহস্য কিছু কিছু বোঝা গেলো। কে না জানে কৃতান্ত মুখুয্যে বড়লোক এবং এই বেড়ালটাকেও বড় কম ভালবাসেন না! সেই অজানা বেড়াল-ধরা দুর্বৃত্তটা ঠিকই আরম্ভ করেছিল কিন্তু শেষ-রক্ষা বুঝি আর হ'ল না। হয়তো কৃতান্ত মুখুয্যে সাধের বেড়ালের শোকে এতক্ষণে কাহিল হয়ে পড়েছেন। এই হারানো বেড়াল আমরা যখন তাঁকে গিয়ে ফিরিয়ে দেবো, তখন ? মেজাজী মানুষ তো, তখন চাই কি খুশি হয়ে আমাদের থিয়েটারের জন্যে একটা মোটা চাঁদাই দিয়ে দেবেন। সন্দেহ কী, ভগবান্ আছেন! হিপ্ হিপ্ হুররে।

তারপর গোবিন্দের ইচ্ছেমতোই সব করলাম।

অবশ্যি আরম্ভ গোবিন্দই করলো। প্রথমে গোবিন্দে পাথরের খণ্ড থেকে ফিতের দিকটা খুলে ফেললো। কিন্তু না, বেড়ালের বাঁধন খুললো না। ঐ ফিতেশুদ্ধুই বেড়ালটাকে কোলে তুলে নিলে। কিন্তু আচ্ছা বেড়াল বটে একখানা! কোথায় উদ্ধারকর্তার দিকে ভাল ভাবে একটু তাকাবি, মিষ্টি করে হাতটা চেটে দিবি, তা না উল্টে গোবিন্দের বাঁ হাতে খ্যাঁচ করে এক পেল্লায় থাবা বসিয়ে দিলি ?

কিন্তু ছেলে বটে গোবিন্দ! মুখে তবু হাসি লেগেই আছে।—"ও ভেবেছে আমিও বুঝি সেই দুর্বৃত্তদের একজন। আহা বেচারী!"

বেচারী চোখের পলকে আর এক কাজ করে ফেললো। আর এক থাবায় গোবিন্দের জামাটা একেবারে ফর্দ্দা-ফাই; সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দ বেড়ালটা কোল থেকে নামিয়ে দিলো, বললো—"এক কাজ কর গোপীকান্ত। ট্রাম-ভাড়া বাদ দিয়ে সকলের পকেট মিলিয়ে মোট কত হবে রে?"

পাঁচজনের ট্রামভাড়া পনেরো পয়সা বাদে সকলের পকেট ঝেড়ে-মুছে মোট হ'লো এক টাকা সাড়ে এগার আনা। তা দিয়ে গোবিন্দের হুকুমে কাবুলী বেড়ালের মেজাজ ঠাণ্ডা করবার জন্য যে সব জিনিষ আনা হ'লো তা দেখে আমাদেরই জিভে গরম জল এলো। বেড়ালটা চোখের সামনে সেগুলো আগাপাশতলা সাবাড় করলো।

শুধু কি তাই? ট্রামে আসতে আসতে গোবিন্দের গালে আর একবার থাবা মেরে ইঞ্চিখানেক আঁচড়ে দিলে। অগত্যা জগমোহনের কোল। জগমোহনকে একটা থাবাই মোটে দিয়েছিলো; কিন্তু সেই একটাই মোক্ষম। পেটের ওপরের খানিকটা চামড়া আর জামার দফাটি সেই এক আঁচড়েই গয়া। তারপর গোপীকান্ত। না, গোপীকান্তের জামা অটুট আছে, কিন্তু কাপড়ের কোঁচার অর্দ্ধেকটাই নেই।

কৃতান্ত মুখুয্যের বাড়ীতে ঢুকবার আগে গোবিন্দই আবার বেড়ালটাকে কোলে নিলো। গোবিন্দেরই অবিশ্যি নেওয়া ঠিক। আসল বুদ্ধি কার শুনি? কৃতান্ত মুখুয্যের প্রশংসার ফাঁকে তাল বুঝে থিয়েটারের চাঁদার কথাটা পাড়তে হবে কিন্তু। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আসল কথা ভুলে যাবে তেমন কাঁচা ছেলে নয় গোবিন্দ।

বাইরের ঘরে ব'সে কৃতান্ত মুখুয্যে খুব মন দিয়ে, কি যেন একখানা বই পড়ছিলেন। হয়তো কোন ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থের মধ্যে হয়তো ভদ্রলোক বেড়ালের শোক ভুলবার চেষ্টা করছেন। আহা রে!

গট্‌গট্ করে গোবিন্দ কৃতান্ত মুখুয্যের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। গদগদ গলায় বেড়ালটা ডাকল, মিউ, মিউ, মিউ-উ-উ। গোবিন্দের মুখে এক আশ্চর্য্য তৃপ্তির হাসি। চমকে উঠে ভদ্রলোক গোবিন্দের দিকে তাকালেন।

—"বড়লোকটাকে কোত্থেকে আনলে?"

—"আজ্ঞে, দুর্বৃত্তের হাত থেকে আমরা, মানে বলতে কি আমিই, ওটাকে উদ্ধার করে এনেছি। জানি না কোন্ পাষণ্ড এ হেন কাবুলী বেড়ালকে গড়ের মাঠে একখণ্ড পাথরের সঙ্গে ফিতেয় বেঁধে বন্দী ক'রে রেখেছিলো। কী করুণ কান্না বেড়ালটার! উঃ, সে যে কী মর্ম্মান্তিক দৃশ্য!"—বলতে বলতে গোবিন্দ প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি!

—"কবিতা! কবিতা!"

কবিতা হচ্ছে কৃতান্ত মুখুয্যের মেয়ের নাম। বাবার ডাক শুনে সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো। মেয়েটি টিঙটিঙে হাড্ডিসার, কুচকুচে কালো, ঢ্যাঙঢেঙে লম্বা। কবিতাই বটে!

চেয়ার ছেড়ে কৃতান্ত মুখুয্যে একেবারে গোবিন্দের সামনা সামনি দাঁড়ালেন। সেই অপরূপ কবিতার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন,—"এই বেড়াল আমার মেয়ের তিনখানা বোটানি বই শেষ পাতা পর্যন্ত খেয়েছে, ওর গালে এমন ভাবে আঁচড়েছে যে সাংঘাতিক ঘা হয়ে গেছে, ওর একজোড়া চশমা কাচটাচ সমেত খেয়ে হজম করে দিয়েছে, একজোড়া ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করেছে। এই বেড়ালের দৌলতে আমার সারা বাড়িতে একখানা কাপড় আস্ত নেই, একটা কোটেরও কলার নেই। আমার একখানা কাশীদাসী মহাভারতের একপর্ব ছাড়া বাকী সপ্তদশ পর্ব এক ঘণ্টায় সাবাড় করেছে। গেলো বারো দিনের ভেতর আমরা এক ফোঁটা দুধ খেতে পাই নি, একটুকরো মাছ মুখে দিই নি। সব ঐ বেড়ালের পেটে। অথচ যার জন্যে সাহেব-পাড়া থেকে ব্যাটাকে কিনে আনলাম, তার বেলায় ঢুঁ ঢু। একটা ইঁদুর ছুঁয়ে দেখে নি পর্যন্ত! চোবে কি, রাত্তিরে ইঁদুর দেখলে ভয়ে মশারি-টশারি ছিঁড়ে আমার বিছানার মধ্যে ঢুকে আঁচড়ে-কামড়ে একাকার। শরীরে আমার এমন এক চিলতে চামড়া নেই যেখানে ও আঁচড়ায় নি।"

আস্তে আস্তে কৃতান্ত মুখুয্যের গলা চড়তে লাগলো। শেষের কথাগুলো বলবার সময় ছাদ-ফাটানো হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"সেই আপদ্ আমি নিজের হাতে বিদেয় ক'রে এলাম, ফিতে দিয়ে পাথরের সঙ্গে বাঁধলাম পর্যন্ত, ভাবলাম বারো দিন বাদে আজ রাত্তিরে খেয়েদেয়ে একটু শান্তিতে ঘুমুবো, তা বলে কিনা—দুর্বৃত্তের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে এনেছি! আমাকে বলে কিনা দুর্বৃত্ত!"

কৃতান্ত মুখুয্যে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাঁ হাতে গোবিন্দের ডান কানটি ধরলেন, ডান হাতে গোবিন্দের বাঁ-গালে ধাঁই ক'রে এক চড় কসিয়ে দিলেন। সবুর করো, এ ত' কেবল কলির সুরু।

গোবিন্দের কোল থেকে আলগোছে বেড়ালটা পড়লো মেঝেয়। সেটাকে ফুটবল বানিয়ে ভদ্রলোক গোষ্ঠ পালের কায়দায় এ্যায়সা একখানা কীক্ করলেন যে আমাদের মাথার উপর দিয়ে বোঁ ক'রে উড়ে গিয়ে বেড়ালটা দড়াম্ ক'রে পড়লো একটা আলমারির কাচে। ব্যস, যা হবার তা-ই হ'লো। ঝন্‌ঝন, ঝনঝন্, ঝন্‌ঝন্।

ওদিকে সমানে চলছে ঠাস্‌ঠাস্, ঠাস্‌ঠাস্, ঠাস্‌ঠাস্। গোবিন্দের দু' গাল আর কৃতান্ত মুখুয্যের দু' হাত।

প্রাণের মায়া বড় মায়া। এক পা, দু' পা, তিন পা, চার পা। আমরা চারজন গুটি গুটি দরজার কাছে এসে গেছি প্রায়। আর একটু, আর একটু। এই, এই তো, এই যে! তারপর সোজা পিছন ফিরে চোঁচা দৌড়।

দৌড়তে দৌড়তে দূর থেকে শুনলাম সেই কবিতা না কবিতার পেত্নীর মতো গলা—"বাঁবাঁ, তাঁর চাঁরটে ছিঁচকে যে সঁটকান দিঁলো!"

পরদিন সকালে আমরা চারজন গেলাম গোবিন্দের বাড়ি। একটা আগুনের কুণ্ড জ্বেলে গোবিন্দ চুপচাপ বসে আছে। ভীমরুলে কামড়ালে যেমন হয়, গোবিন্দের সারা মুখ ফুলে ঢোল।

—"আগুন জ্বেলে কি করছিস্ রে?"

—"পোড়াচ্ছি?"

—"কি পোড়াচ্ছিস্?"

—"ডিটেকটিভ বই।"

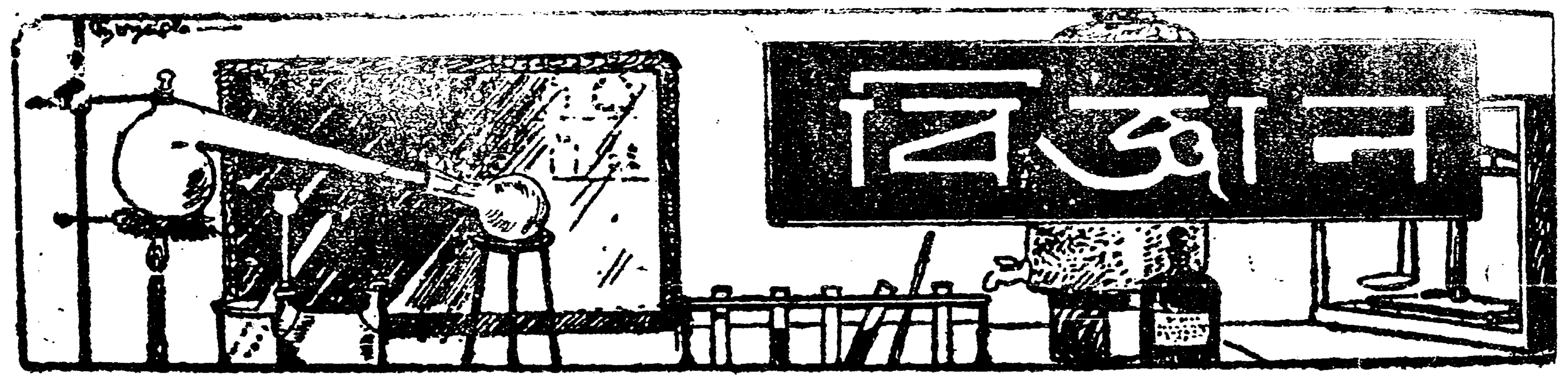

কস্‌মিক্ রশ্মি

শ্রীতুলাল অধিকারী, বি. এস্-সি

১৯১২ সালে জার্মান বিজ্ঞানী হেস্ ঘোষণা করলেন যে সুদূর আকাশমার্গের চতুর্দ্দিক্ থেকে এক অদৃশ্য রশ্মি অবিরাম বৃষ্টিধারার মত পৃথিবীর বুকে এসে পড়ছে। প্রচণ্ড তেজবান্ ও গতিশীল এই রশ্মি, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে লক্ষ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে। সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে কোটী কোটী মাইল পথ বেয়ে এসে প্রায় ২০০ মাইল বায়ুস্তর ভেদ করার পরেও এরা সমুদ্রের জলরাশির অনেকটা স্তর ভেদ করে চলে যাবার ক্ষমতা রাখে। কয়েক ফুট পুরু ধাতুর স্তরকে অনায়াসে ভেদ করে যেতে পারে। এই আশ্চর্য্য আলোর নাম দেওয়া হ'ল 'কস্‌মিক রে' (রশ্মি)।

কস্‌মিক রশ্মির প্রকৃতি বুঝতে হ'লে পদার্থ গঠনের কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। সেজন্য একটু গোড়ার কথা বলে নি। তোমরা হয়তো জান, বিশ্বের যেখানে যা কিছু পদার্থ আছে তারা মাত্র ৯২ রকমের মূল পদার্থের সংযোগে গঠিত। এর মধ্যে

হাইড্রোজেন সব চেয়ে হাল্কা অর্থাৎ তার ভর সব চেয়ে কম, আর ইউরেনিয়ামের ভর সব চেয়ে বেশী। মূল পদার্থগুলি অসংখ্য অদৃশ্য পরমাণুর সমষ্টি। আবার যে কোন পরমাণু কতকগুলি বিদ্যুৎযুক্ত এবং বিদ্যুৎশূন্য কণিকার সমষ্টি। বিদ্যুৎযুক্ত কণিকাগুলি দু'রকমের—নেগেটিভ ও পজিটিভ। এদেরকে বলা হয় ইলেকট্রন ও প্রোটন। বিদ্যুৎশূন্য কণিকাগুলির নাম দেওয়া হয়েছে নিউট্রন। প্রোটন ও নিউট্রন-গুলি পরমাণুর ঠিক মাঝখানে জোট বেঁধে থাকে। ইলেকট্রনগুলি তাদের কেন্দ্র করে বিভিন্ন কক্ষে প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে। বিভিন্ন মূল পদার্থের কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা হয় বিভিন্ন। ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন কোনটাই কিন্তু স্থির হয়ে বসে নেই, তারা সব সময়েই কর্ম্মচঞ্চল। এ জন্য শক্তি বা তেজের প্রয়োজন। পদার্থ ও শক্তির সংযোগেই বিশ্বে এত বৈচিত্র্যের লীলা। গতিই শক্তি। কোন পদার্থের গতি বা স্পন্দন যত বেশী তার তেজও তত বেশী। এই তেজের কতকটা অংশ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পদার্থের দেহ থেকে আলাদা হয়ে রশ্মি বা তরঙ্গের আকারে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, যেমন তাপ, আলো, রণ্টজেন-রশ্মি বা গামা রশ্মি। পদার্থ শুধু তেজ পরিত্যাগ করে না, তেজ শোষণও করতে পারে। ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন প্রমাণ করেছেন যে পদার্থ ও তেজ কোন এক জিনিষেরই দু'টি ভিন্ন রূপ। পদার্থ তেজে পরিণত হ'তে পারে, তেজও পদার্থে পরিণত হ'তে পারে। কিন্তু একটুখানি পদার্থ থেকে পাওয়া যায় বিপুল পরিমাণ তেজ।

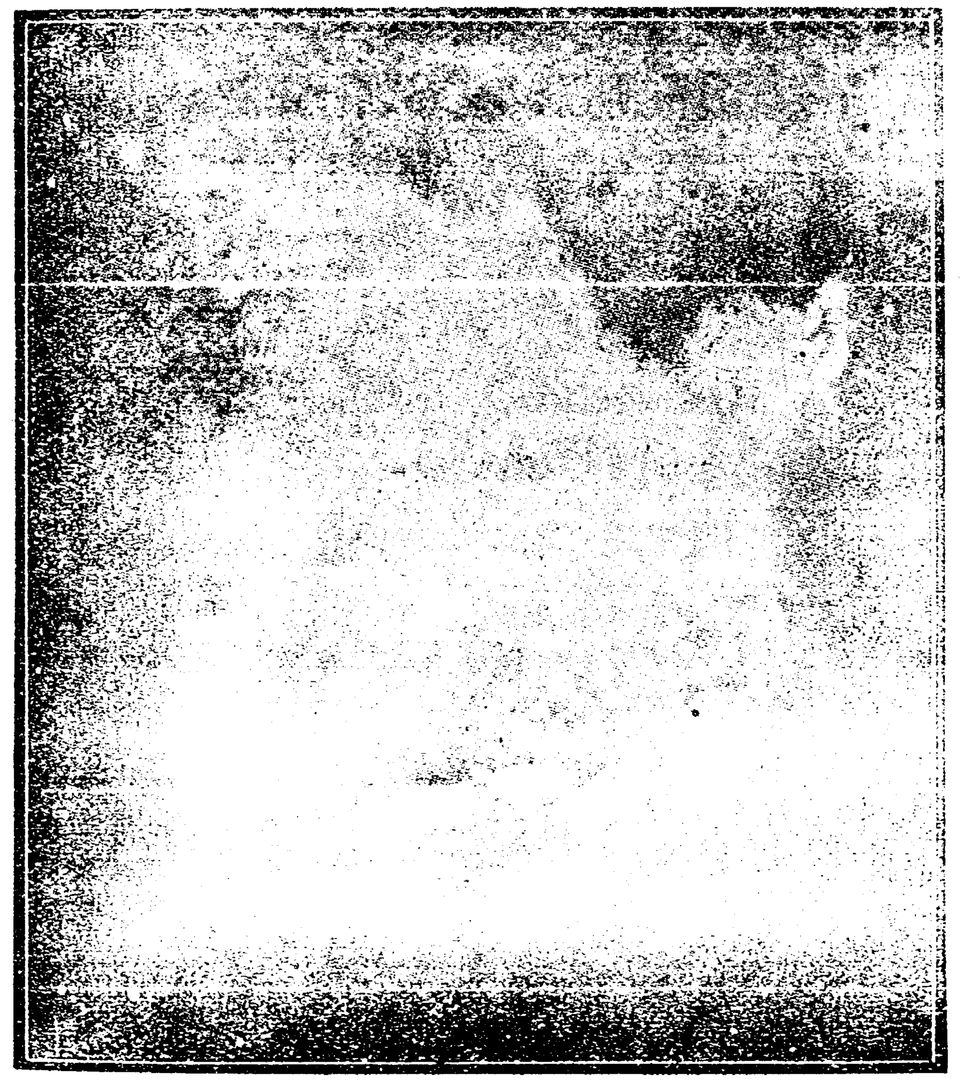
মহাশূন্য—কস্‌মিক্ রশ্মির সাম্রাজ্য

প্রোটন বা নিউট্রন ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় ২০০০ গুণ ভারী। অতএব

পদার্থের প্রায় সমস্ত ভর কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ। বেগবান্ নিউট্রন, প্রোটন ইত্যাদির দ্বারা পরমাণুর কেন্দ্রে আঘাত করলে কোন কোন অবস্থায় কেন্দ্রটী চূর্ণ হয়ে ছোট ছোট অংশে ভেঙ্গে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রের কতকটা ভর লুপ্ত হয়ে গিয়ে বিপুল পরিমাণ তেজের সৃষ্টি করে। মুক্ত তেজের কতকটা অংশ কণিকার আকারে চতর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই তেজ-কণিকাগুলিকে ফোটন বলা হয়। ফোটনের গতি আলোর গতির সমান—প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। ফোটনের আঘাতেও পরমাণুর কেন্দ্র চূর্ণ হয়। পরমাণুর জগতে পদার্থ-কণিকা ও ফোটনের সংঘর্ষের ফলে কখনও পদার্থ-কনিকা ফোটনে এবং কখনও ফোটন পদার্থ-কণিকায় রূপান্তরিত হয়।

দেখা গেল পদার্থ-জগতের আসল উপাদান ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। ফোটনকে তেজ-কণিকা মনে করা যায়। পদার্থ-কণিকা ও ফোটনের শক্তি মাপা হয় ইলেকট্রন-ভোল্ট নামক এককের দ্বারা, যাদের সংক্ষেপে বলা যাক্ ই-ভো।

সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রচণ্ড শক্তিশালী ফোটন আলোর গতিতে এবং পদার্থ-কণিকাও প্রায় একই বেগে ছুটে এসে পৃথিবীর বায়ুস্তরে প্রবেশ করছে। বায়ুর অণুর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের ফলে অণুগুলির ভেতর থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসছে তীব্র গতিশীল ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রনগুলি আরোও কতকগুলি অণুকে আঘাত ক'রে আরও বেশী ইলেকট্রন ও ফোটনের সৃষ্টি করছে। এই ভাবে বহু সংঘর্ষের মধ্যে যেমন তারা পৃথিবীর দিকে এগুচ্ছে, তাদের তেজও তেমনি কমে আসছে। এমনও হ'তে পারে যে একটী মূল কণিকা আশপাশের সংঘর্ষ এড়িয়ে সোজাসুজি একটী পরমাণুর কেন্দ্রে এসে পড়ল। তার প্রচণ্ড আঘাতে পরমাণুটী একেবারে চূর্ণ হয়ে গেল এবং তার নিউট্রন, প্রোটন ইত্যাদি আলগা হয়ে চতুর্দ্দিকে ছিটকে পড়ল। এই সব মূল এবং তাদের দ্বারা সৃষ্ট কণিকাগুলিকেই কস্‌মিক রশ্মি বলা হয়। 'উইলসন্ মেঘকক্ষ' নামে একরকম যন্ত্রে এই অতি সুক্ষ্ম ব্যাপারগুলি দেখা যায় এবং তাদের ছবিও তুলে নেওয়া যায়।

ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন পদার্থের স্থায়ী কণিকা। কস্‌মিক রশ্মির অনুসন্ধানে কয়েকটী অস্থায়ী কণিকারও সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৯৩২ সালে এণ্ডারর্সন নামে একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী দেখালেন যে একটী দশ লক্ষ ই-ভো ফোটনের আঘাতে পরমাণুর কেন্দ্রে একসঙ্গে এক জোড়া ইলেকট্রনের সৃষ্টি হয়।

এদের মধ্যে একটী সাধারণ ইলেকট্রন আর একটী পজিটিভ ইলেকট্রন বা পজিট্রন। পজিট্রন কোন ইলেকট্রনের সংস্পর্শে এলেই ১ সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের ১ ভাগ সময়ে উভয়েরই ভর লুপ্ত হয়ে যায় এবং তার বদলে একজোড়া বিপরীতগামী ফোটনের সৃষ্টি হয়।

একটী দশ কোটি ই-ভো কসমিক-কণিকার আঘাতে পরমাণুর কেন্দ্রে মেসন নামক আর একরকম কণিকার সৃষ্টি হয়। একটী পাঁচ শ' কোটি ই-ভো কস্‌মিক-কণিকার আঘাতে পরমাণুর কেন্দ্রে এক সঙ্গে ৯টী মেসনের সৃষ্টি হ'তে পারে। এই ব্যাপারটী ঘটে বায়ুস্তরের ওপরে—প্রচণ্ড-শক্তিশালী মূল কস্‌মিক-কণিকার আঘাতে। মেসনগুলি ইলেকট্রনের চেয়ে ভারী এবং প্রোটনের চেয়ে হাল্কা এবং নেগেটিভ, পজিটিভ ও বিদ্যুৎশূন্য—এই তিন রকমেরই হ'তে পারে। মেসনগুলি মাত্র ১ সেকেণ্ডের ২০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগ সময়ের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায় ও সে স্থানে পাওয়া যায় একটি তীব্র গতিশীল ইলেকট্রন।

এতদিন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে মেসন উৎপন্ন করবার মত তেজী কণিকা বা ফোটন সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকায় একটী অতিকায় সাইক্লোট্রন যন্ত্র তৈরী করা হয়েছে, তাতে ত্রিশ কোটী ই-ভো-ফোটন তৈরী করা যায়। এই ফোটনের আঘাতে পরমাণুর কেন্দ্র থেকে মেসন উৎপাদন করাও সম্ভব হয়েছে। তবুও মূল কস্‌মিক্ রশ্মি সম্বন্ধে ভাল ভাবে জানতে হ'লে পৃথিবীর বহু উর্দ্ধে রকেটে ক'রে যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালাতে হবে।

১৯৩৫ সালে একজন জাপানী বিজ্ঞানী হেডিকি ইয়ুকায়া প্রথমে মেসনের অস্তিত্ব অনুমান করেন। তাঁর মতে পরমাণুর কেন্দ্রে মেসনগুলির সাহায্যে শক্তির আদানপ্রদান হয়। কেন্দ্রে নিউট্রনঅবিরাম প্রোটনে এবং প্রোটন নিউট্রনে পরিণত হচ্ছে। মেসনগুলিই একটা থেকে আর একটাতে বিদ্যুৎ বিনিময় করছে। এখনকার মত এই. যে. একটি মূল কস্‌মিক-কণিকার আঘাতে কেন্দ্রের একটী নিউট্রন বা প্রোটন ৯।১০টী মেসনে পরিণত হয়। মেসনগুলি তাদের ভর লুপ্ত ক'রে ফোটন এবং কয়েক জোড়া ইলেকট্রন-পজিট্রনে রূপান্তরিত হয়। ইলেকট্রন পজিট্রনও তাদের ভর লুপ্ত ক'রে ফোটনে পরিণত হয়। এর থেকে মনে হয় তেজ বা ফোটনই যেন বিশ্বের আদি উপাদান।

কস্‌মিক্ রশ্মিতে লুকান আছে প্রকৃতির গভীরতম রহস্য এবং প্রচণ্ডতম শক্তির কথা। বায়ুমণ্ডলের অনেক ওপরে ১০০০০০০০০০০০০০০০০০ ইলেকট্রন-ভোল্ট

তেজী কস্‌মিক্-কণিকার অস্তিত্ব অনুমান করা হয়েছে। সেই তুলনায় আণবিক বিস্ফোরণজনিত কণিকাগুলির তেজ ১০০০০০০০০—ইলেকট্রন-ভোল্টের চেয়ে কম। যে দিন পৃথিবীর পরীক্ষাগারে মূল কস্‌মিক্-কণিকার তেজ উৎপাদন করা সম্ভব হবে সে দিন মানুষ কী বিপুল শক্তির অধিকারী হবে! শোনা যায় রাশিয়া কস্‌মিক-শক্তিকে কাজে লাগাবার কৌশল উদ্ভাবন করেছে।

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

—ছয়—

‘ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে’

পরদিন সূর্য্য উঠবার আগেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে বেরিয়ে পড়লো তিনজনে। এই ভাবে সারাদিন ঘোড়া ছুটিয়ে এবং সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই গাছপালার অন্তরালে তাঁবু খাটিয়ে তারা মাইলের পর মাইল অতিক্রম ক'রে শেষ পর্য্যন্ত এসে পৌছুলো উত্তর আমেরিকার সুবিখ্যাত গ্রেট প্রেয়ারির সামনে।

ডিকের জীবনে এ এক স্মরণীয় দিন। যে গ্রেট প্রেয়ারির চিন্তা ধ্যানে জ্ঞানে সব সময় তাকে আশ্রয় ক'রে থাকতো—প্রথম কৈশোরের দিনগুলো থেকেই, বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই বিশাল প্রান্তর আজ তার সামনে! এ সম্বন্ধে কত লোকের কাছে কত কথাই সে শুনেছে, কত স্বপ্ন দেখেছে,—কিন্তু তবু কোনো সঠিক ধারণা তার কল্পনায় দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। সে যা

শুনেছে তা থেকে কত বিভিন্ন এই প্রান্তর! না-দেখা জিনিষের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা প্রায়ই এইরকম ভুল হয়। ডিকের দু' চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি হ'লো দ্রুততর, উত্তেজনার আতিশয্যে তার মুখ দিয়ে একটাও কথা বেরোলো না।

এই প্রান্তরের সঙ্গে তুলনা চলে একমাত্র সমুদ্রের। সমুদ্রের মত এই প্রান্তরেরও চারিদিক দিগন্তরাল রেখা দিয়ে ঘেরা, সমুদ্রের মত এরও বুক ঢেউ-খেলানো, কোথাও উচু, কোথাও বা নীচু। উভয়েরই ওপরে অন্তহীন নীল আকাশ; উন্মুক্ত উদ্দাম হাওয়া সমুদ্রের মত এ প্রান্তরেরও বুক কাঁপিয়ে বয়ে যায়। নানা আকৃতির দ্বীপ ছড়িয়ে রয়েছে এই প্রান্তর-সমুদ্রের বুকে। রঙ-বেরঙের অসংখ্য পাখী, অপূর্ব্ব সুন্দর ফুল বৃদ্ধি করেছে প্রান্তরের শোভা।

ঘোড়ায় লাগাম টেনে জো ব্লাণ্ট বললো, "এখন থেকে হ'লো আমাদের বিপদের শুরু।"

"বিপদের শুরু বলছো কি জো? বলো, আনন্দের শুরু!" ডিকের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়।

"না ডিক, আমরা এখন প্রান্তরের বুকে এসে পড়েছি। এখানে শিকার দুষ্প্রাপ্য, জলেরও অত্যন্ত অভাব। অবিলম্বে জলের ব্যবস্থা না করতে পারলে হয়তো আমাদের ঘোড়াগুলো আর বাঁচবে না। তা ছাড়াও এখানে ওখানে যে সব জায়গায় বালির আস্তরণ পড়েছে, র‍্যাটল সাপে সে সব জায়গা ভর্ত্তি। আরো এক বিপদ্ হ'লো ব্যাজারদের* গর্ত্ত। ঘোড়ার পা যাতে সেই গর্ত্তে না পড়ে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। আর, সবার উপরে রেড ইণ্ডিয়ানরা তো আছেই! একবার আমাদের সন্ধান পেলে দল বেঁধে ধেয়ে আসবে।"

"হাঁ জো, ঠিক বলেছো। তার উপরে আছে আবার প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়—ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত।" ব'লে হেনরি মাথার উপরের কালো মেঘটা দেখিয়ে দিলো।

"হ্যাঁ, বৃষ্টি আসছে। তবে বজ্রপাতের আভাস এখনো পাচ্ছি না। বৃষ্টি আসবার আগেই আমাদের ঐ সামনের ঝোপগুলোর অন্তরালে আশ্রয় নিতে হবে।" জো বললো।

সঙ্গে সঙ্গে সকলে সেই ঝোপ লক্ষ্য করে ধেয়ে চললো। পথে এক অনুর্ব্বর ভূমি অতিক্রম করবার পর হঠাৎ এক অদ্ভুত জিনিষ দেখে থমকে দাঁড়ালো ডিক। অসংখ্য ইঁদুরের মত ছোট ছোট প্রাণী প্রান্তরের এক অঞ্চল ছেয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে জো বললো, "এ হ'লো প্রেয়ারি-ডগ্; কতকটা মারমটের মত দেখতে। এরা মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়ে বাস করে, আর ঘেউ ঘেউ করে কতকটা কুকুরের মত; সেজন্য ওদের প্রেয়ারি-ডগ্ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।"

ওদের দেখা মাত্র ক্রুসো ক্রুদ্ধ গর্জ্জন ক'রে উঠলো, কিন্তু ডিকের মুখে সমর্থনের কোন আভাস না পাওয়ায় সে ওদের আক্রমণ করতে পারলো না।

প্রেয়ারি-ডগ্‌দের স্বভাবের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যে ওরা খুব কৌতুক বোধ করলো। দূরের থেকে ওরা জো এবং তার সঙ্গীদের ওপরে তম্বি করছিল, যেন এক্ষুণি দল বেঁধে এসে আক্রমণ করবে। কিন্তু শিকারীদের তরফ থেকে আক্রমণের সামান্যতম লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্র সবাই যে

*ব্যাজার হচ্ছে একরকম নিশাচর জন্তু। সূচলো মুখ, ছোট ছোট পা, মোটা চামড়া। মাটীর নীচে গর্ত্ত খুঁড়ে বাস করে।

যায় গর্ত্তে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে পতপত ক'রে ল্যাজ দোলাতে লাগলো। মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই ল্যাজগুলোও কখন অদৃশ্য হয়ে গেলো! ওদের কাণ্ড দেখে ডিকের হাসি আর থামে না।

সারারাত চরম দুর্দ্দশায় কাটিয়ে ভোরের দিকে সেই অবস্থাতেও সকলে তন্দ্রায় ঢুলে পড়লো। যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেলা হয়ে গেছে; সারারাতের বৃষ্টির পর প্রকৃতি সতেজ হয়ে উঠছে; ঘন সবুজে ছেয়ে গেছে চতুর্দ্দিক্। জামাকাপড়, মালপত্র শুকিয়ে নিয়ে ওরা আবার বেরিয়ে পড়লো।

এই ভাবে কয়েক দিন অতিক্রম করার পর জো বললো, "আমরা খুব সম্ভব বাইসনদের এলাকায় কাছে এসে পড়েছি। ঐ যে মাটিতে দাগ দেখছো, এ বেশী দিনের নয়; কোনো বাইসন কিছুদিন আগেই এখানে কাদায় গড়াগড়ি খেয়েছে।"

ক'দিনের সম্পূর্ণ অভিনব অভিজ্ঞতায় ডিকের কৌতূহল আর উত্তেজনার অন্ত নেই। শিকারীদের কাছে এ সব বৃত্তান্ত শুনে যে অদম্য বাসনা তার মনে ছেলেবেলা থেকে অঙ্কুরিত হয়েছিলো এতদিনে তা' পল্লবিত হয়ে উঠেছে। এ প্রান্তরের সমস্ত কিছুই এক অপরূপ রূপ নিয়ে তার চোখে দেখা দিতে লাগলো।

মাত্র কয়েক গজ যেতে না যেতেই উত্তেজিত স্বরে জো বললো, "বাইসনের চিহ্নের জন্য আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না, ঐ—ঐ দেখ একটা বিরাট বাইসন।"

উত্তেজনায় অধীর হয়ে তক্ষুণি ডিক ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে জো আর হেন্‌রিও নামলো ঘোড়া থেকে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ তো দেখতে পাচ্ছি; ওঃ, কী প্রকাণ্ড বাইসনটা! ব্যাটা কেমন মজাসে কাদা মাখছে দেখো!"—চাপা গলায় হেনরি বলে উঠলো।

"শুধু একটাই দেখছো তুমি? ঐ দেখো, দূরে, অসংখ্য বাইসন চ'রে বেড়াচ্ছে!" জো বললো।—"তোমার কুকুরটাকে সামলে রাখতে পারবে তো হে ডিক?"

"ওর জন্য আমি একটুও ঘাবড়াচ্ছি না। আমি শুধু ভাবছি, নিজেকে সামলে রাখতে পারবো কি না!" ডিক বললো।

"এগিয়ে যাও, ডিক! কিন্তু খুব সাবধান; হাঁটুতে ভর ক'রে নিঃশব্দে অগ্রসর হবে।"

কিছুদূর পর্য্যন্ত হামাগুড়ি দেবার পর সন্তর্পণে মাথা তুলে ডিক যে দৃশ্য দেখলো, যে কোনো দুঃসাহসিক শিকারীর বুকে তা রক্তের স্রোত বইয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। সমস্ত উপত্যকা সহস্রাধিক বাইসনে কালো হয়ে র'য়েছে। (ক্রমশঃ)

তোমাদের ভাই

শ্রীপূর্ণেন্দু মল্লিক

গেঁয়ো সুরে মাঠে ব'সে গান গায় কে-ও ভাই?—
চেনো আর না-ই চেনো, তার পানে চেয়ো ভাই;
চেয়ো ভাই মাঝে মাঝে
সকাল-দুপুর-সাঁঝে—
পথ দিয়ে যেতে তার পরিচয় পেয়ো ভাই।
গেঁয়ো সুরে গান গায়—তোমাদের-ই সে-ও ভাই।

অরুণ-আলোর পথে মাঠে সে যে আসে ভাই,
তোমাদিকে মনে-প্রাণে ভালো সে যে বাসে ভাই।
বছর বছর ধ'রে
সেনার ফসল ভ'রে
তোমাদেরই ঘরে ঘরে পাঠাতে সে আসে তাই;
অরুণ-আলোর পথে আসে সে যে—হাসে ভাই।

দুপুরের খর তাপে পড় পড় ঘরে তার
মরমর মাতা কাঁদে নিদারুণ জ্বরে তার—
প্রাণে তার লাগে ভয়,
তবু হায় অসময়—
মাঠে ব'সে দিনমান গায় ঘাম ঝরে তার,
দুপুরের খর তাপে মাতা কাঁপে জ্বরে তার।

কখন গাঁয়ের বুকে আঁধার ঘনায় ওই—
আকাশেতে জমে মেঘ কোণায় কোণায় ওই,
হাওয়ায় হাওয়ায় তার
বাড়ে বেগ ঝঞ্ঝার,
সন্ধ্যা-মাঠের পথে গেঁয়ো সুরে গায় ওই—'
ভেঙ্গে যাওয়া-ঘরে গান ভেসে ভেসে যায় ওই।

ভেসে ভেসে যায় গান—গায় গান কে-ও ভাই ?—
ঝড়ে ভাঙ্গা-ঘরে তার পরিচয় পেয়ো ভাই,—
যেখানে মায়ের প্রাণ
জ্বরে হয় অবসান,
সেখানে সময় ক'রে মাঝে মাঝে যেয়ো ভাই—
গেঁয়ো স্বরে গায় গান—তোমাদেরই সে-ও ভাই।

পালোয়ান-চরিত

পালোয়ানদের গল্প শুনবার জন্য তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব আগ্রহ দেখিয়েছিলে এবং সে আগ্রহ মাঝে মাঝে মেটান হবে এমন একটা আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল। আজ একটি বাঙ্গালী পালোয়ানের কাহিনী দিয়ে সে প্রসঙ্গ সুরু করা যাক।

ভীম ভবানীর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। অবশ্য আজ তিনি বেঁচে নেই, অনেক দিন আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। নেহাৎ অল্প বয়সে,—তখন তাঁর বয়স চল্লিশেরও নীচে, তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু দীর্ঘায়ু না হ'লেও যে ক'টা দিন তিনি ছিলেন বাঁচার মতনই বেঁচে গেছেন, শুধু ছেলেবেলার কয়েকটা বছর ছাড়া।

ভীম ভবানীর আসল নাম ছিল ভবেন্দ্রমোহন সাহা। কলকাতার বীডন ষ্ট্রীট অঞ্চলে ছিল তাঁদের বাড়ী। ভবেন্দ্র থেকেই ভবানী নামের উৎপত্তি, ভীম কথাটা তার অনেক পরে যোগ হয়েছিল।

ছেলেবেলায়, এমন কি ১৪।১৫ বছর বয়স পর্য্যন্ত, ভবানী ছিলেন ভয়ানক রোগা। তার ওপর ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে তাঁর শরীরের হাড় ক'খানি ছাড়া আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাঁর জীবনে এল এক পরিবর্ত্তন। ক্লাসের একটি সমবয়সী ছেলে একদিন

কথায় কথায় তর্কাতর্কির পর তাঁকে ধরে বেদম মার লাগাল। শরীর দুর্ব্বল ব'লে ভবানীকে মুখ বুজে তা সহ্য করতে হ'ল, উল্টে সে মার শোধ দেবার মত সামর্থ্য তাঁর ছিল না। কিন্তু এই থেকেই তাঁর মনে এল এক প্রচণ্ড ধিক্কার। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, যে ভাবেই হোক নিজের এই অক্ষমতা দূর করবেন, শক্তিমান্ পুরুষ তাঁকে হ'তেই হবে।

অদ্ভুত ছিল তাঁর মনের জোর! তিনি সেই দিনই হাজির হলেন দর্জিপাড়ায় ক্ষেতু বাবুর

ভীম ভবানী

আখড়ায়। ক্ষেতু বাবুর আখড়া ছিল সে সময়ে পালোয়ানদের একটি নাম-করা আড্ডা। প্রসিদ্ধ ধনী ক্ষেতু গুহ ছিলেন এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। দেশবিদেশ থেকে বড় বড় পালোয়ানরা এসে এখানে শরীরচর্চ্চা করতেন, ছেলেদের কুস্তী শেখাতেন। ভবানীও এই আখড়ায় এসে যোগ দিলেন।

গভীর সংকল্প এবং গভীর একাগ্রতা মানুষকে কি ভাবে বড় ক'রে তুলতে পারে ভবানীর জীবনে তার পরিচয় পাওয়া গেল। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর চেহারায় দেখা দিল অদ্ভুত পরিবর্ত্তন।

"বোলকে মোল নহি যো কহনে জানে বোল,
হৃদয় তরাজু তৌলকে, তঁহু বোলকে ঘোল।"

অনুবাদ :—কথা অমূল্য বস্তু, যে কহিতে জানে। হৃদয়রূপ দাঁড়িপাল্লায় ওজন করিয়া তবে কথা বল।

"যো যাকে শরণ লিয়ে সো রাখে তাকো লাজ,
উলট জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ।"

অনুবাদ :—যে যাহার শরণ লয় সে তাহাকে লজ্জা হইতে রক্ষা করে। উজান জলে মাছ চলে, গজরাজ বিধ্বস্ত হইয়া ভাসিয়া যায়।

"বহুত ভালা না বোলনা চলনা, বহুত ভালা না চুপ,
বহুত ভালা না বর্ষাবাদর, বহুত ভালা না ধূপ।"

অনুবাদ :—বেশী বলা বা চলা ভাল নহে ; বেশী চুপ করিয়া থাকাও ভাল নহে। বেশী বর্ষা ও বাদল ভাল নহে বেশী, গ্রীষ্মও ভাল নহে।

বিসর্জ্জন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জনৈক পুরবাসী

[শুনলাম এবং শুনে দুঃখিত হলাম যে, "রামধনুর" সম্পাদক মহাশয় এই সামান্য বিষয়ের নগণ্য রচনাটির রচয়িতা কিনা সে কথা জানতে কয়েকজন সহৃদয় পাঠকপাঠিকা কৌতূহলী হয়ে তাঁকে প্রশ্নস্বরে জর্জ্জরিত করেচেন। তিনি এটির রচয়িতা ন'ন তা আমি এই চূণের ঘরে বসে বিদ্যে ছুঁয়ে বলচি। এমনিতেই নানা কাজের "গণ্ডকে" তিনি ভারাক্রান্ত। তার ওপর এই "বিস্ফাটকের" জ্বালা যে তিনি স্বেচ্ছায় সইতে যাবেন না এ কথা না বললেও চলে। তাঁকে যাঁরা চেনেন তাঁরা সবাই জানেন তিনি মানুষটি নিরীহ ; মুখে সর্ব্বদাই হাসি। ভাল কথায়ও হাসেন, মন্দ কথাতেও হাসেন। সম্প্রতি শ্বশুরালয়ে গিয়ে পদস্খলনের ফলে ভগ্নহস্ত হয়েচেন, তাতেও হাসি। এ হেন মানুষকে এমন এক অপবাদ দিয়ে পাঠকপাঠিকারা আরও যেন না হাসান এই আমার সবিনয় অনুরোধ।

গোড়াতেই তো বলেচি এবং এখনও বলচি আমি সামান্য পুরবাসী। যদি বিশ্বাস না হয়, "রামধনুর" পৃষ্ঠায় আমার সুন্দর ছবিখানি দেখবেন। তাতে আমিও হাসচি। এখন আমাদের হাসবার সময়। কারণ আসমুদ্র হিমাচল আজ আমাদের জন্য ডুকরে কাঁদচে। আমাদের পরম উপকার করবার উদ্দেশ্যে হাটে-মাঠে-ঘাটে-পথে লাউড স্পীকার চীৎকার করচে—"মেরে ভাইয়োঁ", "ভাই সব", "ফ্রেণ্ড্স্ য়্যাণ্ড্ কমরেড্স্" ইত্যাদি। আমাদেরই জন্য টন টন কাগজ, মণ মণ কালি, গ্যালন গ্যালন পেট্রোল, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্চে। আমাদেরই জন্য পাকা পাকা মাথা,

শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু

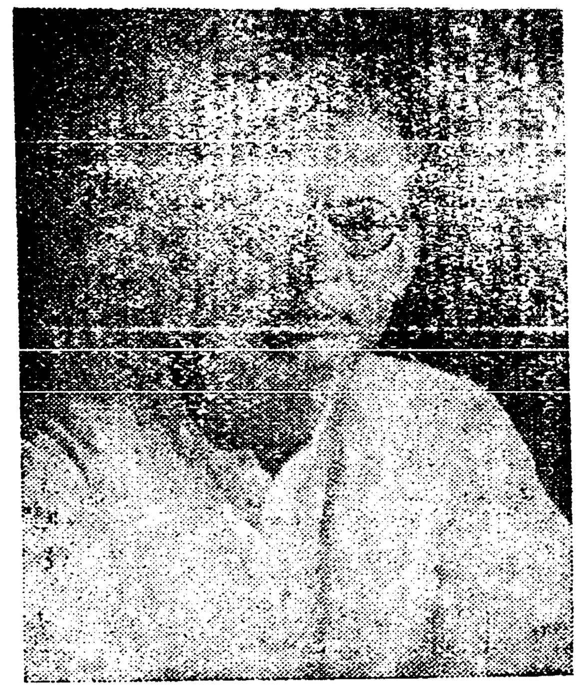

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বড় বড় ভুঁড়ি আমাদের বাগে আনবার ফন্দি আঁটতে আঁটতে হিমসিম খেয়ে যাচ্চে। আমাদেরই জন্য মোটর ছুটচে, রেল চলচে, এরোপ্লেন উড়চে। আমরা, মানে নগণ্য পুরবাসীরা, বিদ্যাসাগর, কার্ণেগী ও কর্ণের আসনে সগৌরবে সমাসীন। এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (!) মানুষ, টাকার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কুমীর, এমন কি বাজারের পরম পাকা চোরেরাও সকলে আজ আমাদের সামনে দু'হাত পেতে ভিক্ষা করচে—শুধু একটি ভোট! এতে না হেসে থাকা যায়? এবার নাটকীয় দৃশ্য সুরু করা যাক্ :]

রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' 'জমানো' যাবে কিনা এ নিয়ে যাঁরা মন্তব্য করলেন, তাঁরা "বড় বড় ষ্টেজে বড় বড় অভিনয়" "ছেলেবেলা থেকে" করচেন। এ জন্য লোকে হাততালি দিয়েচে, খবরের কাগজে নাম ছাপা হয়েচে, নানা জায়গা থেকে লোকে "পার্ট" নিয়ে এসে সাধাসাধি করে। কেউ শিশির বাবুর "বন্ধু"

ও রবীন্দ্রনাথের "অন্তরঙ্গ", কেউ পরলোকগত নির্মলেন্দুবাবুর "আত্মীয়", কেউ বিশ্বভারতীর "ছাত্রী", কেউ "আফিসে সরস্বতী পুজোয় থিয়েটার" করেন, কেউ "ঢাকায় কয়েক বার ষ্টেজে নেমেছিলেন।" ইত্যাদি। আমি নিতান্ত বেয়াকুফের মতো সকলের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। জীবনের পথে চলতে চলতে প্রতি নিয়ত অভিনয় করা ছাড়া "ষ্টেজে" তো কোনদিন অভিনয় করি নি! একবার ছাত্রাবস্থায় জনকতক বন্ধুবান্ধব মিলে "জয়দেব" নামক যাত্রা-নাটকখানি অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। তাতে

শ্রীযুক্তা রাণী চক্রবর্ত্তী

শ্রীমতী মীরা রায় চৌধুরী

আমাকে দেওয়া হয়েছিল "উড়ের" পার্ট। কিন্তু কয়েক দিন মহড়া দিতে দিতে নিজেরা এমন ঝগড়া করলাম যে, শেষ অবধি "ষ্টেজে" গিয়ে উঠ্‌তে পারলাম না। কাজেই ষ্টেজের অভিজ্ঞতা আমার কিছুই নেই। কোন নট বা নাট্যকারের অথবা কোন সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও সম্পর্ক নেই কোনদিন। কাজেই চুপচাপ থেকে ভূমিকা বণ্টনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলাম এবং বণ্টন বিষয়ে সক্রিয়ও হলাম। বড় বড় অংশগুলি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়ে নিজে নিলাম এক "অতি সাধারণ পুরবাসীর" ভূমিকা। কিন্তু চাঁদপাল এবং পুরবাসিনী "ক্ষ্যান্তমণি ও "নিস্তারিণীকে" পাওয়া গেল না। অবশ্য "অতি সাধারণ পুরবাসীদের" ভূমিকা নেবার মতো "অতি সাধারণ কেউ" ছিলও না, আমরা ছাড়া। (প্রথম অবস্থায় তাই আমাদের মধ্যে ছিলেন, শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী, শ্রীশচীন বাগচী, শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও শ্রীঅমলশঙ্কর রায়।) প্রথম দিকে

"মন্ত্রীর" ভূমিকা দেওয়া হ'ল শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকারকে এবং "নয়ন রায়" হলেন শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী। দু'জনেই দেহগৌরবে গরীয়ান্। মন্ত্রিত্ব ও সেনাপতিত্ব সার্থক হয়ে উঠ্‌বে সকলেরই ধারণা হ'ল। ওঁদের গায়ে উঠে পোশাকও যে মৃদুস্বরে তারিফ করবে এতেও সন্দেহ রইল না।

"বিসর্জন" নাটক কেনা হ'ল, যার যার কাছে বই ছিল তাঁরাও বার করলেন। অভিনয়-কাল যাতে সওয়া দু'ঘণ্টার বেশি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে বই কেটেকুটে ছোট ক'রে শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের বাড়িতে বৈঠকখানায় রীতিমতো মহড়া শুরু হ'ল। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের জন্য "ষাট" নকল করা হ'ল না। কারণ, কার এত মাথা ব্যথা? অথচ সকলেই বুঝতে পারলেন, গোড়াতেই মস্ত গলদ্ তৈরী হ'ল। তবুও "কার এত দায়, হ্যাঃ!"

শহরের চারধার থেকে সকলে "যথাসময়ে" ১৬, টাউনসেণ্ড রোডে মহড়া দেবার জন্য জমায়েৎ হ'তে লাগলেন। "ঠিক সাড়ে সাতটায়" সকলের জমায়েৎ হবার কথা তাই কেউ "ঠিক সাড়ে আটটায়", "ঠিক ন'টায়", "ঠিক সাড়ে ন'টায়" গিয়ে পৌঁছতে লাগলেন। আবার কারো কারো "বিশেষ কাজ" পড়তে লাগলো ঠিক ঐ সময়টায়। তাই ডুব দিতে লাগলেন। রাজা আসেন তো মন্ত্রী ও পুরোহিত আসেন না। পুরবাসীদের পাঁচজনের মধ্যে তিনজনই হাওয়া! প্রায়ই সব "হাঁ হাঁ" করতে লাগলো।

তবুও "রীতিমতো" মহড়া চল্‌তে লাগ্‌লো।

প্রম্‌ট্ করতে লাগলেন কখন শচীন বাগচী, কখনও ক্ষিতীন বাবু, কখনও শ্রীমান কল্যাণ, কখনও বা 'দ্বিজুদা' (সকলের আদরে), কোন দিন বা আমি। আমরা সকলেই "অতি সাধারণ পুরবাসী"। পূর্ণ বাবু ও উপেন বাবু সাধারণ হলেও এই "সামান্য" কাজের তুলনায় তাঁরা অসাধারণ। তাই ওর ধার দিয়েও গেলেন না। "রাজা বাবুদের" মুখে কথা যোগাতে লাগলাম, আমরাই।

অনেক দিনের কথা, ঘটনাও দু'-একটা নয়, কাজেই লিখতে লিখতে কিছু ভুলচুক হচ্ছে। যেটা পরে বলা উচিত ছিল সেটা আগেই বলচি, যেটা আগেই বলা দরকার সেটা এখনও বলা হয় নি; এবং যেটা আদৌ বলা উচিত নয় সেটাও না বলে থাকতে পারি নি। তাই এই অবসরে আমাদের অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহের কাহিনীটিও বলে রাখি।

একদিন "ছোটদের মহলের" কার্যকরী সংসদের অধিবেশন হচ্ছে সংসদের

অন্যতম সদস্য ডাঃ মানে ডাক্তার, জে. মানে যোগেশ, সি. মানে চন্দ্র, মুখার্জি মানে মুখোপাধ্যায়ের 'ক্লিনিকে'। খাসা মানুষটি! যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, আর সেইরূপই গৌর। দেখলেই মনে হয়, গব্য মাখনের জীবন্ত টিলা। মাথায় মস্ত টাক, মুখে 'চওড়া' (ব্রড্) হাসি, মস্তিষ্কে 'স্কিমের' চরকা অবিরাম ঘুরচে। শিশু-রোগ চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী তাই "শিশু"সাহিত্য-পরিষদ্‌কে অর্থ, সামর্থ্য, আশ্রয় ও খাদ্য দিয়ে সাহায্য করেন আর শিশুসাহিত্যিকগণের রোগ হ'লে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসেন এবং একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁর "চেম্বারে" গিয়ে দেখা করতে বলেন যখন প্রায় কোন সময়েই তাঁর দেখা পাওয়া যায় না। নাটকের বিভিন্ন ভূমিকাগুলিও বণ্টন করা হ'ল। তখন মহিলাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রেডিওর ইন্দিরাদি। তাঁকে অনেকেই দেখেচেন। ভূমিকা বণ্টনের সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি অভিনয় করবেন কি?" তিনি উত্তরে বললেন, "ন্যাঃ!" জানি না মনে মনে বলেছিলেন কিনা, "আ মর!" আর উপস্থিত ছিলেন, রাণী চক্রবর্ত্তী। সকলে সমস্বরে তাঁকে বললেন, "তুমিই রাণী!" তিনিও আপত্তি করলেন না। কৃপাভরে মৃদু হাসলেন। কারণ রাজা, প্রজা, রাজত্ব, মেজাজ ও চেহারা সবই তাঁর আছে। তাঁর দরবারে যাঁরা একবার গেচেন, তাঁর রাজত্বে যাঁরা বাস করেন, তাঁরাই তাঁর প্রবল প্রতাপের ও বাক্য-জাল এবং জ্বালার বিষয় অবগত। হয়তো তাঁরই সামনে মাত্র কয়েক পল দাঁড়িয়েই পূর্বজন্মে কোন নিরীহ পণ্ডিত রচনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন—"মূকং করোতি বাচালং।" এত সহজেই রাণী পাওয়া যেতে সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। বাকী কেবল, ভিখারিণী অপর্ণা, পুরবাসিনী নিস্তারিণী ও ক্ষ্যান্তমণি।

অপর্ণাকে কিছুক্ষণ আগেই এনেছিলেন, যোগেন গুপ্ত মহাশয়। মাথায় খাটো, নধর একটি মেয়ে! মাথার চুলগুলো স্থূল বেণীবদ্ধ হয়ে পিঠের নীচে অনেক দূর নেমে গেচে। গুপ্ত মহাশয় বললেন, "এই অপর্ণা হবে। নাম মীরা রায় চৌধুরী। এম্. এ-পাস। বিশ্বভারতীতে পড়তো—"

কে একজন বলে উঠলেন, "বিশ্বভারতীর ছাত্রী, রবীন্দ্রনাথের নাটক—ও আর দেখতে হবে না—"

আমাদের মধ্যে দু'-চারজন ডেঁপোও যে নেই তা নয়! কিন্তু কি করা যাবে? ডেঁপো নেই কোথায়?

মনে মনে গুপ্ত মশায়ের কথাগুলি আওড়ালাম, "এই অপর্ণা হবে।" তা

হতে পারে! ওর চোখে ভীরুতা-মাখানো প্রশান্তি, মুখখানি করুণতায় কমনীয়, চলাফেরা ধীর, কথাবার্তাও সংযত। ভিখারিণীর ভূমিকায় ভালই হবে। অবশ্য এ সবই যে ভিখারিণীর গুণ তা বলতে পারি না এবং রাস্তাঘাটে ও বাড়ির দরজায় ভিখারিণীদের দেখে এমন কথা কেউ বলতেও পারেন না।

প্রসঙ্গত একটি গল্প না বলে পারচি না। আমাদের জনৈক প্রতিবেশীর বাড়িতে প্রায়ই এক ভিখারিণী ভিক্ষায় আসতো। সে এসেই দরজা থেকে হাত কয়েক দূরে বসে পড়ে বলতো, "ভিক্ষে দাও বাবা—বাবা গো—"

তার 'বাবা' বলার তাৎপর্য ছিল এই যে সে যে ঘরখানির সামনে বসতো তাতে তখন "বাবারাই" বসে কাজকর্ম করতেন, "মায়েরা" থাকতেন অন্দরে অনেক দূরে! অতদূরে তার ক্ষীণ কণ্ঠ পৌছবার কথা নয়।

বাবাদের মধ্যে একজন ছিলেন পাকা লেঠেল ও চিত্রশিল্পী। তাঁর হাতে তূলি, পাশে লাঠি থাকতো। তিনি বাঙালী হলেও খুব তেজী ছিলেন। তাই এক এক হুঙ্কারে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করতেন। তখন যে ভাষা বার হ'ত তা তাঁর বা আমাদের কারোই মাতৃভাষা নয়, তবে আমাদের সকলেরই রাষ্ট্রভাষা।

তিনি ভিখারিণীকে অবশ্য মতৃভাষাতেই উত্তর দিতেন, "হবে না—বাড়িতে অসুখ—"

ভিখারিণী আর সময় নষ্ট না করে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে চলে যেত। এমনি ব্যাপার বেশ কয়েকদিন ধরে চললো।

শেষে একদিন ভিখারিণীটি এসে যেমনি বলেচে, "বাবাগো, এক মুঠো ভিক্ষে দাও—" অমনি উত্তর হ'ল, "হবে না—অসুখ—"

ভিখারিণীও আস্তে আস্তে বললে, "বাবা, রোজই শুনি অসুখ। একদিন তো কাউকে মরতে দেখলাম না!"

কথাগুলি "বাবার বাবার" কানে যেমন যাওয়া অমনি তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "কেয়া শালে—!"

ভিখারিণীটি তারপর থেকে সে বাড়িতে আর ভিক্ষা চাইতে গিয়েচে বলে তো শুনি নি। সংসারে নানা রকমের ভিখারিণী আছে। তারই একটির অংশ নেবার জন্য একজনকে সংগ্রহ করে আনলেন যোগেন বাবু।

বাকি রইলো পুরবাসিনীরা। তাদেরও সন্ধান চলতে লাগলো। স্থির হ'ল, একান্তই যদি না পাওয়া যায় তো ভূমিকাগুলির "নী" কেটে "সী" করে দেওয়া যাবে।

(ক্রমশঃ)

শাশুড়ী-জামাই

(কথা সরিৎসাগরের গল্প)

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

অনেক দিন আগে মথুরাতে এক অত্যন্ত বদরাগী বুড়ী বাস করত। যেমন ছিল তার মেজাজখানা, নামও ছিল তেমনি—মকরদ্রংষ্ট্রা। মকরদ্রংষ্ট্রাকে সহরের কেউ দেখতে পারত না, কিন্তু ভয় করত সবাই। এমন কি স্বয়ং মথুরার রাজাও তাকে দস্তুর মত সমীহ করে চলতেন, কাউকে তোয়াক্কা করত না বুড়ী। এর কারণ আর কিছু না, বুড়ীর ছিল অগাধ টাকাপয়সা, আর সংসারে টাকাপয়সা থাকলে তো লোকে তাকে সমীহ করবেই।

বুড়ীর শুধু টাকাপয়সাই ছিল না, ছিল একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে রূপিণিকা। রূপিণিকাকে বিয়ে করবার জন্য সহরের অনেক ছেলেরই আগ্রহ ছিল, কিন্তু বুড়ী কাউকেই আমল দিত না। টাকাপয়সা না থাকলে বুড়ীর কাছে কারোই কোন কদর নেই।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বুড়ী শেষ রক্ষা করতে পারল না। রূপিণিকা একটি গরীব ব্রাহ্মণের ছেলেকে পছন্দ করে বসল। ছেলেটি অবশ্যি খুব চালাক-চতুর এবং নানা গুণের অধিকারী। কিন্তু বড্ড গরীব। নাম তার লোহজঙ্ঘ। রূপিণিকা জেদ করে বসল, তাকেই সে বিয়ে করবে এবং সে জেদ বজায় রাখতেও ছাড়ল না। গরীব লোহজঙ্ঘ বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ীতে চলে এল।

মকরদ্রংষ্ট্রা গরীবদের কোন কালেই দেখতে পারে না। জামাইও গরীব, কাজেই সেও বাদ গেল না। ফলে শাশুড়ীর মুখের তোড়ে কয়েক দিনের মধ্যেই জামাই-এর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। শাশুড়ী তাকে উঠতে বসতে খোঁটা দিত, গালাগালি দিত। শ্বশুরবাড়ীতে ঘর-জামাই হয়ে অন্নধ্বংস করার মত পাপ যে আর নেই এ কথা শুনতে শুনতে লোহজঙ্ঘের কান ঝালাপালা হয়ে গেল। অবশেষে সে ঠিক করল, আর নয়, এবার শ্বশুরবাড়ী থেকে পালাতে হবে। গোপনে, কেননা তা না হলে রূপিণিকা বাধা দেবে।

গভীর রাত্রে কাউকে না জানিয়ে লোহজঙ্ঘ শ্বশুরগৃহ ত্যাগ করল।

পথে বেরিয়ে তার ভারী ধিক্কার জন্মাল। তা ছাড়া তার মনে হ'ল রূপিণিকাকে ছেড়ে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। কোন তীর্থে গিয়ে আত্মহত্যা করাই সমীচীন।

লোহজঙ্ঘ চলেছে। পথে ভীষণ গরম, তৃষ্ণায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু তবু তার চলার বিরাম নেই। অবশেষে সে একটা বড় নদীর ধারে এসে পড়ল। একটু বিশ্রাম ক'রে নেবার জন্য তার মন ছটফট করছিল, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও একটি গাছ পর্য্যন্ত নেই যার নীচে বসা যায়। হঠাৎ চোখে পড়ল—নদীর ধারে একটা মরা হাতী পড়ে রয়েছে। শেয়াল-কুকুরে হাতীটার পেট ফুটো করে ভিতরের সমস্ত মাংস কুরে কুরে খেয়ে গেছে, পড়ে আছে শুধু ওপরের চামড়াখানি। লোহজঙ্ঘ ভাবল, এই হাতীটার ভিতর ঢুকে খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে

নিলে কেমন হয়! এই না ভেবে সে পেটের ফুটোটা দিয়ে হাতীর ভিতরে ঢুকে সেখানে শুয়ে পড়ল, এবং পরিশ্রান্ত হওয়ায় একটু পরেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে কখন আকাশ কালো ক'রে মেঘ জমেছে, লোহজঙ্ঘ তা জানতেও পারে নি। দেখতে দেখতে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। অমন বৃষ্টি আর কেউ দেখে নি। বৃষ্টির তোড়ে হাতীর পেটের কোঁচকান চামড়া নরম হয়ে ফুলে উঠে সেই ছিদ্রটিও গেল বন্ধ হয়ে। তার পর নদীতে ডাকল বান। নদীর জল দুই কূল ছাপিয়ে লোহজঙ্ঘ সমেত হাতীটাকে নিয়ে ফেলল নদীর জলে, তার পর সেই মরা হাতী স্রোতের টানে ভেসে চলল সমুদ্রের দিকে।

এদিকে হয়েছে কি, কয়েকটা গরুড় বংশীয় অতিকায় পাখী খাবারের খোঁজে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাদেরই একজন সমুদ্রের জলে হাতী ভাসছে দেখে, সেটাকে খাবার মনে ক'রে ছোঁ মেরে তুলে নিল, আর সটান সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে চলে গেল অপর পারে লঙ্কাদ্বীপে। হাতীটাকে ডাঙ্গায় নামিয়ে পাখীটা তার পেট ঠুকরে আবার ফুটো ক'রে ফেলল ভিতরের মাংস খাবে বলে। এদিকে এত যে কাণ্ড হয়ে গেছে লোহজঙ্ঘ তার কিছুই জানে না। এতক্ষণ সে সমানে ঘুমিয়েছে। পাখীর আঁচড়ে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই সে হাতীর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল। পাখীটাও হাতীর পেটে একটা জ্যান্ত মানুষ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সরে দাঁড়াল।

লোহজঙ্ঘ আবার চলতে সুরু করল। যেতে যেতে পথে দু'টি রাক্ষসের সঙ্গে দেখা। রাক্ষসেরা ভাবল এ বুঝি শ্রীরামেরই কোন অনুচর। তারা ভয় পেয়ে তখনই তাদের রাজা বিভীষণকে গিয়ে খবর দিল।

বিভীষণও খবর পেয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, বললেন, "লোকটিকে এখনই সমাদর ক'রে নিয়ে এস।"

লোহজঙ্ঘ এলে বিভীষণ তাকে খুব খাতির দেখিয়ে নমস্কার ক'রে বললেন, "ঠাকুর, আপনি কে? কি জন্যই বা এই রাক্ষসপুরীতে এসেছেন?"

চতুর লোহজঙ্ঘ তৎক্ষণে সমস্ত ব্যাপার আন্দাজ ক'রে ফেলেছে এবং মনে মনে কর্ত্তব্যও স্থির করে ফেলেছে। সে বলল, "আমি হচ্ছি মথুরার এক গরীব ব্রাহ্মণ। নানা দুঃখ-কষ্টে আমার দিন কাটছিল, তাই একদিন মনের দুঃখে নারায়ণের মন্দিরে গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়লাম। নারায়ণ স্বপ্নে বললেন, 'বৎস, তুমি লঙ্কাপুরীতে চলে যাও। সেখানে আমার পরম ভক্ত বিভীষণ রাজত্ব করছে। সে তোমার সমস্ত দুঃখ দূর করবে।' তাই আমি অনেক বাধা-বিপদ উৎরে এ দেশে হাজির হয়েছি।"

বিভীষণ হাত যোড় ক'রে বললেন, "ঠাকুর, যখন এসেছেন তখন কিছু দিন এখানে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করলে আমরা কৃতার্থ হব।"

লোহজঙ্ঘ পরমসুখে লঙ্কাপুরীতে বাস করতে লাগল। রাজধানীর কাছেই একটা বড় পাহাড় ছিল, সেখানে গরুড়বংশীয় বড় বড় পাখীরা বাস করত। বিভীষণ একদিন সেই পাখীদের একটিকে এনে লোহজঙ্ঘকে দিয়ে বললেন, "এই পাখীই হবে আপনার বাহন। এরই পিঠে চেপে

আপনি স্বচ্ছন্দে মথুরায় ফিরে যেতে পারবেন। তবে যাবার আগে কিছু দিন এর পিঠে চড়া অভ্যাস করে নিন।"

পর দিন থেকেই লোহজজ্ঘ বাহনটীকে নিয়ে আকাশ ভ্রমণের অভ্যাস সুরু করল। পাখীটিও সহজেই পোষ মেনে গেল। লোহজজ্ঘ প্রত্যহ তার পিঠে চড়ে এদিক্ ওদিক্ বেড়িয়ে আসতে লাগল।

অবশেষে যাবার সময় হ'ল। বিভীষণ তাকে প্রচুর ধনরত্ন উপহার দিলেন। আর দিলেন একটি ক'রে সোনার শঙ্খ, চক্র, গদা আর পদ্ম। বললেন, "আমার অনুরোধ, মথুরায় যে নারায়ণ-মন্দির আছে সেখানে গিয়ে এই জিনিষগুলো আমার হয়ে নারায়ণকে নিবেদন করবেন।"

বিরাট পাখীর পিঠে চড়ে লোহজজ্ঘ মথুরায় এসে হাজির হ'ল। প্রথমে সে নগরের প্রান্তে এক নির্জ্জন জায়গায় একখানি ঘর নিল, তার পর বাজারে গিয়ে বিভীষণের দেওয়া মূল্যবান্ রত্নের একটি বিক্রী ক'রে বেশভূষা, খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতি আবশ্যকীয় জিনিষ কিনে নিয়ে এল। তার পর রাত্রে স্বয়ং বিষ্ণুর মত পোষাক পরে, হাতে বিভীষণের দেওয়া সেই শঙ্খ-চক্রগুলি নিয়ে তার বাহন পাখীটির পিঠে চড়ে একেবারে শ্বশুরবাড়ীর ওপর গিয়ে হাজির হ'ল।

ঘরে রূপিণিকা একা ছিল। শব্দ শুনে বাইরে এসে দেখে স্বয়ং বিষ্ণু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হাতে গরুড়ে চড়ে তার মাথার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ সৌভাগ্য তার কল্পনারও অতীত। সে হাতযোড় করে অভিভূত ভাবে প্রণাম করল। বিষ্ণুরূপী লোহজজ্ঘ হেসে বলল, "আমি তোমার ভক্তি দেখে তোমাকে দর্শন দিতে এসেছি। তোমার ভক্তি যদি অচলা থাকে তবে কাল আবার এসে দর্শন দেব।" তার পর আবার সাঁ ক'রে উড়ে চলে গেল।

মকরদংষ্ট্রা মেয়ের কাছে সমস্ত কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। তার পর বলল, "আমি তো বুড়ো হলাম, স্বর্গে যাবার বয়স হ'ল। যদি সশরীরে স্বর্গে যেতে পেতাম তবে কি সুবিধাই না হ'ত! এবারে যেদিন বিষ্ণু আসবেন সেদিন আমার কথা তাঁকে বলবি? যে ক'রেই হোক, আমাকে যেন তিনি সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যান। তিনি তোকে এত ভালবাসেন, নিশ্চয়ই তোর কথা রাখবেন।"

পরদিন লোহজজ্ঘ আবার বিষ্ণু সেজে এলে রূপিণিকা তাকে মায়ের অনুরোধ জানাল। লোহজজ্ঘ বলল, "তাই তো, মানুষের পক্ষে সশরীরে স্বর্গে যাওয়া তো সহজ নয়। তবে হ্যাঁ, এক উপায় করা যেতে পারে। প্রতি একাদশী তিথিতে স্বর্গের দরজা একবার ক'রে খোলা হয় মহাদেবের গণেদের ভিতরে নিয়ে যাবার জন্য। তোমার মা যদি মহাদেবের গণ সাজতে রাজী হ'ন তবে সেই ছদ্মবেশে তাঁকে আমি স্বর্গে ঢুকিয়ে দিতে পারি।" তার পর কি ভাবে গণ সাজতে হবে তাও বলল। মাথা নেড়া ক'রে পাঁচটা ঝুঁটি রাখতে হবে; আর শরীরের অর্দ্ধেকটায় লাল আর বাকি অর্দ্ধেকটায় কালো রং মাখাতে হবে।

মকরদংষ্ট্রা শুনে খানিকটা ইতস্ততঃ করে, শেষে স্বর্গে যাবার লোভে তাইতেই রাজী হ'ল। এমনিতেই তার চেহারা কুৎসিৎ, ঐ রকম সাজে আরও বীভৎস দেখাতে লাগল তাকে। তার পর একদিন রাত্রে লোহজজ্ঘ এসে তাকে পাখীর পিঠে বসিয়ে আকাশে উড়তে আরম্ভ করল।

খানিকক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখা গেল একটু দূরে একটা মন্দির, তার সামনে একটা উঁচু স্তম্ভ, স্তম্ভের মাথায় আবার একটা চাকা বসানো। লোহজজ্ঘ করল কি, বুড়ীকে সেই স্তম্ভের ওপর নামিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসছি।"

বুড়ী বসে আছে তো বসেই আছে, বিষ্ণুর আর আসবার নাম নেই। সেদিন কি একটা পূজো উপলক্ষ্যে অন্ধকার থাকতেই দলে দলে যাত্রী আসছিল মন্দিরে পূজো দিতে। হঠাৎ তারা শুনতে পেল অন্তরীক্ষ থেকে কে বলছে—"তোমরা সাবধান, আজ এখানে মূর্ত্তিমতী মড়কের আবির্ভাব হবে।" আসলে যে লোহজজ্ঘই পাখীর পিঠে বসে এ কথা বলছে তারা তো তা জানে না! যাই হোক, তারা ওটাকে দৈববাণী বলে ধরে নিল। এদিকে ঐটুকু ছোট স্তম্ভের ওপর আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়? ক্রমে মকরদংষ্ট্রার হাত-পা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল, মাথা টলতে লাগল, সে পাগলের মত চীৎকার যুড়ে দিল।

যাত্রীরা চীৎকার শুনে স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে দেখে, তার চূড়ায় এক বীভৎস নারী-মূর্ত্তি! এই তবে সেই মড়ক দেবী মনে ক'রে তারা দারুণ হৈচৈ সুরু ক'রে দিল। ফলে দেখতে দেখতে সহর শুদ্ধ লোক সেখানে এসে জড় হ'ল।

একটু পরে দিনের আলো ফুটতেই কিন্তু বুড়ীকে সবাই চিনতে পারল। কেউ তাকে দেখতে পারত না, তাই তার এ সাজা দেখে সবাই খুসী। যাই হোক, অনেক কষ্টে বুড়ীকে নামানো হ'ল।

এইবার লোহজজ্ঘ এসে নিজের পরিচয় দিয়ে সমস্ত কথা খুলে বলল। শুনে সবাই হেসে গড়াগড়ি। মায়ের অপমানে রূপিণিকা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, কিন্তু বহুদিন পরে নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে ফিরে পেয়ে সে দুঃখ তার দূর হ'ল। মকরদংষ্ট্রার অবশ্যি জামাইএর ব্যবহারে খুব খুসী হবার কথা নয়, তবে জামাই এখন মস্ত ধনী শুনে সে নিজেকে সামলে নিল। এর পর থেকে সে আর কখনো জামাইকে কটু কথা বলে নি।

বিতর্ক-সভা

(ভাদ্র সংখ্যার পর)

বিষয়ঃ—"স্কুল-কলেজে বর্ত্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত থাকা উচিত কিনা।"

স্বপক্ষেঃ—

পরীক্ষার ফলাফল অনেকটা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে—এ কথায় বিশেষ যুক্তি নাই। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে ছাত্র ক্লাসে পড়াশুনায় ভাল বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করে পরীক্ষায়ও সে ভাল ফল করিবেই। পরীক্ষার ফলে ছাত্রদের স্বাস্থ্য-

হানি হয়—ইহাও পরীক্ষার দোষ নহে, ছাত্রের এবং অভিভাবকের ব্যক্তিগত দোষ। সারা বৎসর কিছুই না করিয়া পরীক্ষার সময়ে অসম্ভব পরিশ্রম করিতে হইবে এরূপ কেহ বলে নাই। নিয়মিত ভাবে পড়াশোনা করিয়া গেলে পরীক্ষার সময় অতি পরিশ্রম করিবার কোন প্রয়োজন করে না—স্বাস্থ্যহানিরও কোন আশঙ্কা থাকে না।

—শ্রীজয়ন্তকুমার রায়

বিপক্ষে :—

বর্ত্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের উপর বিষের মত কাজ করিতেছে। একে তো দেশের যে অবস্থা—পুষ্টিকর খাদ্য দুর্লভ বলিলেও চলে, তাহার উপর পরীক্ষার পীড়ন ছাত্রছাত্রীদের জীবন অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়। একটা বড় পরীক্ষার পর পরীক্ষার্থীকে দেখিলে মনে হয় সে যেন একটা কঠিন রোগে ভুগিয়া উঠিল। রাত্রি জাগরণ, দুশ্চিন্তা, সময় মত আহার-নিদ্রার অভাব ইত্যাদি নানারূপ অত্যাচার হইতে পরীক্ষার্থীরা কখনও নিষ্কৃতি পায় না। এই ভাবে জীবনযুদ্ধে অকেজো হইয়া পরীক্ষায় কৃতাকার্য্য হওয়ার কোন অর্থ হয় না।

—শ্রীকমলা মুখোপাধ্যায়

পরীক্ষার বর্ত্তমান পদ্ধতি নিঃসন্দেহ যুগোপযোগী নয়। এতে সবচেয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে প্রতিযোগিতাকে। এই প্রতিযোগিতা ছাত্রদের মধ্যে একটা অস্বাস্থ্যকর বিদ্বেষ সৃষ্টির সাহায্য করে। এই বিদ্বেষ উত্তর কালে তাদের স্বভাবেও সংক্রমিত হয়ে যেতে পারে।

—শ্রীহরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

আমাদের ও বিজয়ার শুভেচ্ছা ও প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ ক'র। বরাবরকার মত

এবারেও তোমাদের কাছ থেকে বিজয়ার শুভেচ্ছাসূচক অজস্র চিঠি পেয়েছি। এই সুযোগে তার জন্যও তোমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি!

শ্রীনমিতা দাম (গৌহাটী)—তোমার দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ দীর্ঘ চিঠি পড়ে বেশ ভাল লাগল। অনুযোগ সম্বন্ধে অবশ্যই অনুসন্ধান করব। চিত্তরঞ্জন ও উমা (মালকী—শিলং)—১৩৫৭ সালের কার্ত্তিকের ধাঁধার উত্তর পাঠিয়েছ এক বছর পরে! ও তো কোন্ কালে রামধনুতে বেরিয়ে গেছে! শ্রীমালবিকা দত্ত (করিমগঞ্জ)—যাক্, কলেজে উঠেও তা হ'লে রামধনু ভাল লাগছে! শ্রীশর্মিলা সরকার (কলিকাতা)—তোমার প্রেরিত সুন্দর বিজয়া-কার্ডখানি দেখে মুগ্ধ হলাম। ছবিটা কি তোমার নিজের আঁকা? শ্রীঅরুণ পোদ্দার (নিউদিল্লী)—দিল্লীতেও তা হ'লে এখানকার মতই হৈচৈ করেছ পূজোয়? তোমায় প্রশ্নটির জবাব তর্কসাপেক্ষ। তবে এ দেশে অবনীন্দ্রনাথকেই ঐ আসন দেওয়া হয়। তোমার চিঠিতে গ্রাহক নং দেও না কেন? শ্রীঅহীন্দ্রশেখর নায়েক (বোলপুর)—বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিকদের নিয়মিত পরিচয় দেবার একটা পরিকল্পনা আমরা করেছি—আর একটু অগ্রসর হলেই সুরু করবার ইচ্ছা আছে। শ্রীশেখরচাঁদ মল্লিক (হাওড়া)—তোমার সচিত্র শুভেচ্ছা পেয়ে খুব ভাল লাগল। শ্রীরুণু বসু (কলিকাতা)—তোমার দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের কথা শুনে আমারও খুব লোভ লাগছে। ফিরে এসে বিবরণ শুনিও। শ্রীবেণু ঘোষ (দিনাজপুর)—তোমাদের 'নটীর পূজা' অভিনয় দেখতে পেলাম না ব'লে আফশোষ হচ্ছে। কল্পিত চেহারার সঙ্গে মিল খুঁজে পাও নি? পাবে না বলেই তো ওর নাম কল্পনা! অসীমা পাল (করিমগঞ্জ)—রামধনু সবই একসঙ্গে ডাকে দেওয়া হয়। কাজেই তোমাদের ওখানকার ডাকঘরে খবর নিয়ে দরকার হ'লে "খুব কড়া করে" অভিযোগ করবে। শ্রীঅশোক চৌধুরী (নবদ্বীপ)—তোমার রাগ পড়েছে জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। কবিতা তোমার খুব ভাল লাগে? আমারও লাগে। কিন্তু অনেকেই, কেন জানি না, ওটা তত পছন্দ করে না। একেই বলে রুচি! শ্রীদিলীপকুমার দত্ত—(কলিকাতা) ভাবীসাহিত্যিকের বৈঠকে কেবল মাত্র গ্রাহক-গ্রাহিকার লেখাই ছাপা হয়—বয়স ব'লে কিছু বিবেচনা করা হয় না। শ্রীশক্তিপ্রসাদ সোম (হাওড়া)—তোমার চিঠিখানা বেশ কৌতুকপ্রদ, তাই এখানে খানিকটা তুলে দিলাম :—"গত সংখ্যায় 'একজন ভারী লোক' নামে যে সংবাদ প্রকাশ করেছেন তাতে একটু ভুল আছে। গ্রামটি গারিয়া নয়, সারসি। তীর্থানন্দ বাবুকে আমি ও আমাদের বাড়ীর সবাই

খুব ভাল ক'রে চিনি। আমাদের বাড়ীতে একবার তাঁকে টেবিলে খেতে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু টেবিলে বসে খেতে পারেন নি তিনি। শরীরটাকে (বিশেষ ক'রে পেটটিকে) জায়গা দিতে এত দূরে তাঁকে বসতে হয় যে হাত টেবিলে অতিকষ্টে পৌছায়। ট্রাম-বাসেও সিট্ খালি থাকলে তাঁর বসবার উপায় নেই, সিট্ তাঁর পক্ষে চওড়ায় কম হয়ে যায়।"

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ শেষ করি। জয় হিন্দ।—ইতি রাঃ সঃ

নতুন রাজ্যপাল

ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ায় তাঁর জায়গায় পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় প্রবীণ শিক্ষাব্রতী—জীবনের চল্লিশ বছরই তিনি শিক্ষা বিভাগে কাটিয়েছেন। শেষের দিকে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য যে গণপরিষদ্ গঠিত হয় ডাঃ মুখোপাধ্যায় তারও সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। দাতা হিসাবেও তাঁর নাম স্মরণীয়। শিক্ষার জন্য তিনি লক্ষাধিক টাকা দান করেছেন। অত্যন্ত অনাড়ম্বর তাঁর জীবন, আর তেমনি মিষ্টি—অমায়িক তাঁর স্বভাব। এ হেন একজন গুণবান্ লোককে রাজ্যপাল রূপে পেয়ে বাঙ্গালী মাত্রেই খুসী হবে।

পরলোকে লিয়াকৎ আলি

পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলি খাঁ রাওলপিণ্ডীতে বক্তৃতা দেবার সময় আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। হত্যাকারীও অবশ্যি সঙ্গে সঙ্গে জনতার হাতে নিহত হয়েছে।

কায়েদে আজম জিন্নার মৃত্যুর পর লিয়াকৎ

আলি খাঁই ছিলেন পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্তিমান্ পুরুষ, কাজেই এ আঘাত সারা পাকিস্তানকে গভীর ভাবে শোকাচ্ছন্ন ক'রে তুলেছে।

জনাব লিয়াকৎ বিদ্বান্ এবং নানা সদ্গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর এই নৃশংস হত্যায় ভারতীয়েরাও কম আঘাত পায় নি।

পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল ঢাকার খাজা নাজিমউদ্দীন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছেন, আর অর্থমন্ত্রী জনাব গোলাম মহম্মদ হয়েছেন তাঁর জায়গায় পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল।

ইংল্যাণ্ডে পট পরিবর্ত্তন

সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডে সাধারণ নির্ব্বাচন হয়ে গেল। গত ছ'বছর ধরে যে দল সেখানে শাসন পরিচালনা করছিল সেই শ্রমিক দল এবার রক্ষণশীল দলের কাছে পরাজিত হয়েছে। ফলে এটলি সাহেবকে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে বিদায় নিতে হয়েছে, তাঁর জায়গায় আবার ফিরে এসেছেন চার্চিল সাহেব। কড়া সাম্রাজ্যবাদী ব'লে চার্চিলের নাম আছে। কাজেই এই পরিবর্ত্তনের ফল পৃথিবী শুদ্ধ লোক আগ্রহের সঙ্গেই লক্ষ্য করবে।

ভারতে এম. সি. সি. দল

ইংল্যাণ্ড থেকে বাছাই করা ক্রিকেট খেলোয়াড়ের দল, এম্. সি. সি., এবারে ভারত ভ্রমণে এসেছে সে খবর তোমরা জান।

এই দলটি আগাগোড়া তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত। সম্প্রতি এ দেশে এসে পর পর কয়েকটা ম্যাচ খেলার পর দিল্লীতে ভারতীয় দলের সঙ্গে তাদের প্রথম টেষ্ট ম্যাচ হয়ে গেল। খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে—বিশেষ ক'রে ভারতীয় দলেরই ত্রুটীতে, নইলে তাদেরই জয়লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। ১ম ইনিংস্এ ইংল্যাণ্ড দল করে মাত্র ২০৩ রান। প্রত্যুত্তরে ভারতীয় দল ৬ উইকেটে ৪১৮ রান্ তুলে ডিক্লেয়ার করে। ভারতীয় দলের অধিনায়ক হাজারে ১৬৪ রান্ ক'রে নট্ আউট থাকেন। মার্চেণ্ট করেন ১৫৪ রান্। কিন্তু ২য় ইনিংস্এ ইংল্যাণ্ড দল তাদের যোগ্যতার পরিচয় দেয়। বহু চেষ্টা ক'রেও ভারতীয় দল তাদের ৬ জনের বেশী আউট্ করতে পারে না। রান্ ওঠে ৩৬৮। এই দলের ওয়াটকিন্সের আউট্ না হয়ে ১৩৮ রান্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক ছিলেন হাওয়ার্ড।

জাপানী হকি দল

জাপান থেকে একদল হকি খেলোয়াড়ও এই সময়ে ভারতে এসেছেন। এঁরা অলিম্পিক্ খেলায় যোগ দেবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। সম্প্রতি কলকাতায় বাংলা দল এবং ভারতীয় দলের সঙ্গে এদের পর পর ২টি খেলা হয়। ২টিতেই এরা পরাজিত হয়েছে ৫-১ এবং ৬-০ গোলে। ভারতীয় দল হকিতে এখনও অজেয়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। বেহালা। ২। সানাই ৩। খোল। ৪। সেতার। ৫। করতাল। ৬। পাখোয়াজ। ৭। তবলা। ৮। বিগ্‌ল্।

উত্তরদাতাদের নাম :— নির্ভুল : সরিৎ দত্ত (গুড়াপ) কাজল মিত্র (দিল্লী), সীমা দাস (কলিকাতা); মোহন ও শীলা (কটক)। আংশিক : দীপককুমার ধর ও অলক ধর (সেনালী); অসীমা পাল, সুস্মিতা, শান্তনু, নন্দন, দিদিমণি (করিমগঞ্জ); মালবিকা দত্ত, বাপ্পা, গৌতম, অমল, বৌদি (করিমগঞ্জ); রত্না, জয়ন্ত, স্বপ্না ও ছন্দা রায় (বাঁকীপুর) সৌম্যেন রায় (বনারস); তৃপ্তি ও দীপ্তি (বালিগঞ্জ), উমা ও শিশির চক্রবর্ত্তী (লক্ষ্ণৌ)।

নূতন ধাঁধা

নীচের কথাগুলির ভাবার্থ নিয়ে এমন তিনটি ক'রে শব্দ নির্ব্বাচন করতে হবে যা পাশাপাশি পড়লেও যা হয় ওপর-নীচে পড়লেও তাই হবে। যেমন ধর

চ শ মা
শ ঠ তা
মা তা ল

এই ভাবে চেষ্টা কর :—

(ক) (১) একজন মহাপুরুষ। (২) অনেকে মন্দিরে গিয়ে যা করে। (৩) ভদ্র নয়।
(খ) (১) জ্যামিতির বইএ খোঁজ। (২) একরকম সরীসৃপ। (৩) পৃথিবী।
(গ) (১) একরকম পাখী। (২) কাশ্মীরের কাছে খোঁজ। (৩) পাখীরা যা শোনায়।

(১৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে উত্তর পাঠাতে হবে।)

এ মাসের নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

"পূজার ছুটী কেমন কাটল'—এ সম্বন্ধে একটি রচনা (১০০০ শব্দের মধ্যে) লিখে পাঠাতে হবে। লেখা ২৯শে অগ্রহায়ণের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে কিন্তু প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নীচের কুপনটি পূরণ ক'রে পাঠাতে হবে, না হ'লে তা গ্রাহ্য হবে না।

আমাদের বিচারে যার লেখা সব চেয়ে ভাল হবে সে-ই পুরস্কার পাবে।

রামধনু

নাম

ঠিকানা

পুঃ প্রঃ কাঃ ৫৮

ভাদ্র মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

সবচেয়ে ভাল নামকরণের জন্য পুরস্কার পেলেন: শ্রীঅরবিন্দ সরকার (দিল্লী)। নামটা হচ্ছে—'সাত ছেলের মা'।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— অগ্রহায়ণ সংখ্যা রামধনু পূর্ব্ব বিজ্ঞপ্তি মত মাসের প্রথমে বাহির না হইয়া ঐ মাসের শেষ সপ্তাহে বাহির হইবে।

উষসী

অভিজাত প্রসাধন-রেণু

লুপ্ত ও সুপ্ত
দেহ সৌন্দর্যকে
জাগ্রত করে
শিশুর কোমল অঙ্গেও নির্ভয়ে
ব্যবহার চলে

বেঙ্গল কেমিক্যাল • কলিকাতা • বোম্বাই

ফুটফুটে টুকটুক

পুঁচকে টুকটুকটা কি নোংরা ছেলে! সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাসি মুখ না ধুয়েই গপ্ গপ্ করে খাবে পাঁউরুটী। ঘেন্না পিত্তি নেই। খাবার খেয়েই খেলতে ছুটবে। আগের দিনের পরা পোষাক ছাড়ে না। রান্নাঘরের পাশে ঘুলঘুলিটায় একটা এত্ত বড় মাকড়সা জাল বুনেছিল। বাবু দেখতে পেয়েই জালসমেত মাকড়সাটা চেপে ধরে পুটপুট করে তার সব ঠ্যাংগুলো ভেঙে ফেললে; তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটলো নর্দমার ফাঁকে একটা আরশুলা ঘুরছে দেখে। টুকটুক করলে কি—চুপি চুপি গিয়ে চট্ করে আরশুলাটাকে মুঠার মধ্যে ধরে ফেলে। তারপর তার পায়ে সুতো বেঁধে সুরু করলো আকাশে ওড়াতে। আরশুলাটা খানিকটা ফুরফুর করে ওড়ে, খানিকটা বসে। টুকটুক খিলখিল করে হাসে আর মজা করে হাততালি দেয়। এমনি করেই কাটতো তার দিন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই টুকটুকের দাঁতের গোড়া ফুলে কট্কট্ করতে সুরু করেছে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে পুঁয রক্ত পড়ছে; পোকা লেগে দাঁত কালো হয়ে গেছে। আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে গরলের মতো ঘা, গা ময় বেরিয়েছে চুলকনা। কেবলি চুলকে ওঠে। গরলের ঘা-ভরা-হাতে চুলকাতে পারে না। বাছাধন যায় আর কি! কেঁদে ককিয়ে সারা। শেষকালে টুকটুক ডাক্তারখানায় গেল। ডাক্তার বাবু দেখেই বুঝলেন, নোংরামির জন্য তার এই হাল হয়েছে। তখন প্রেসক্রিপশান লিখলেন—

টুকটুকের জন্য—রোজ সকালে-বিকালে **ক্যালকাটা কেমিক্যালের নিম টুথ পেষ্ট** দিয়ে দাঁত মাজতে হবে আর **মার্গো সোপ** গায়ে মেখে চান করতে হবে। আর হাতের ঘায়ে ক্যালকেমিকোর নিমের মলম **'মার্গুয়েণ্টাম'** লাগাতে হবে।

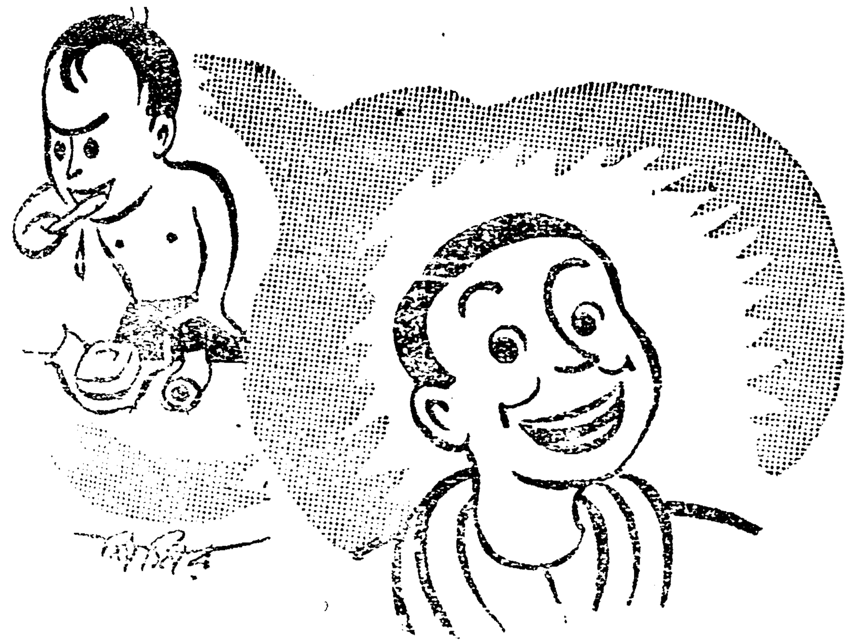

সেই দিন থেকে নিত্যি সকালে উঠে টুকটুক **নিম টুথ পেষ্ট** দিয়ে দাঁত মাজতে সুরু করলে, **মার্গো সোপ** মেখে চান করে এবং আঙুলের ঘায়ে **'মার্গুয়েণ্টাম'** লাগায়।

টুকটুক এখন থুথ্‌ড়ো বুড়ো; কিন্তু তার দাঁত একটিও পড়েনি, আয়নার মত ঝকঝক্ করছে, আর গায়ের রঙ যেন দুধে-আলতা মেশানো। টুকটুক বুড়ো বয়সেও ফুটফুট করছে। নিমের মলম **'মার্গুয়েণ্টাম'** ব্যবহার করার ফলে তার গায়ে আর খোসপাঁচড়াও হয়নি।

শিশুদের জন্য **দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিং** কর্তৃক প্রচারিত।

দেব সাহিত্য-কুটীরের এ বছরের পূজা-বার্ষিকী

বিরাট গ্রন্থ **অভিষেক** দাম চার টাকা

রং-বেরঙের অসংখ্য ছবি, গল্প, কবিতা, হাসি-কৌতুক, নাটক, যাদুবিদ্যা ও খেলাধূলার ঝরণা।

এতে লিখেছেন—

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বনফুল, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, পি, সি, সরকার, কালিদাস রায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনির্ম্মল বসু, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, অন্নদাশঙ্কর রায়, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। এ ছাড়া আরও অনেকে—

শিশু-নাটক

স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত

বীর শিবাজী	৸৹	বীর মোহনলাল	৸৹	বিদ্রোহী	॥৹
স্বাধীনতা জাগল	॥৹	কর্ণার্জ্জুন	॥৹	বিজয় সিংহ	॥৹
প্রতাপসিংহ	৸৹	সিরাজের স্বপ্ন	৸৹	বন্দীবীর	॥৹

দেব সাহিত্য-কুটীর

২২।৫বি ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

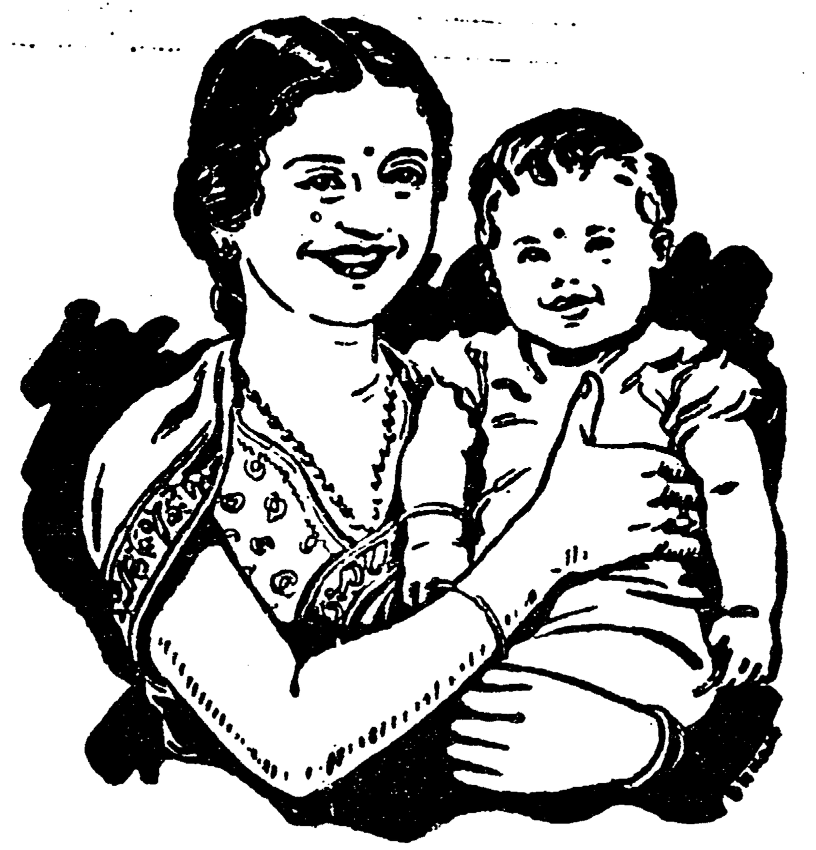

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা	১৲
বিজ্ঞান-বুড়ো	১৲
আকাশের গল্প	১।৹
আবিষ্কারের গল্প	৸৹
ধূমকেতু	৸৹
অয়েল পেন্টিং (নাটক)	।৹

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১৲

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

দি লাষ্ট্ অব্ দি মোহিকানস্	॥৴৹

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি	১।৹
পদ্মরাগ	১॥৹
সোনার হরিণ	১॥৹
নূতন পুরাণ	৸৴৹
হাস্য ও রহস্য	৸৴৹
চায়ের ধোঁয়া	৸৹
দমাদম্ দামোদর (নাটক)	।৴৹

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত

অলিভার টুইষ্ট	॥৴৹

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি রসা রোড, কলিকাতা ২৫

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

রকমারিত্বায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

লি
লি বিস্কুট

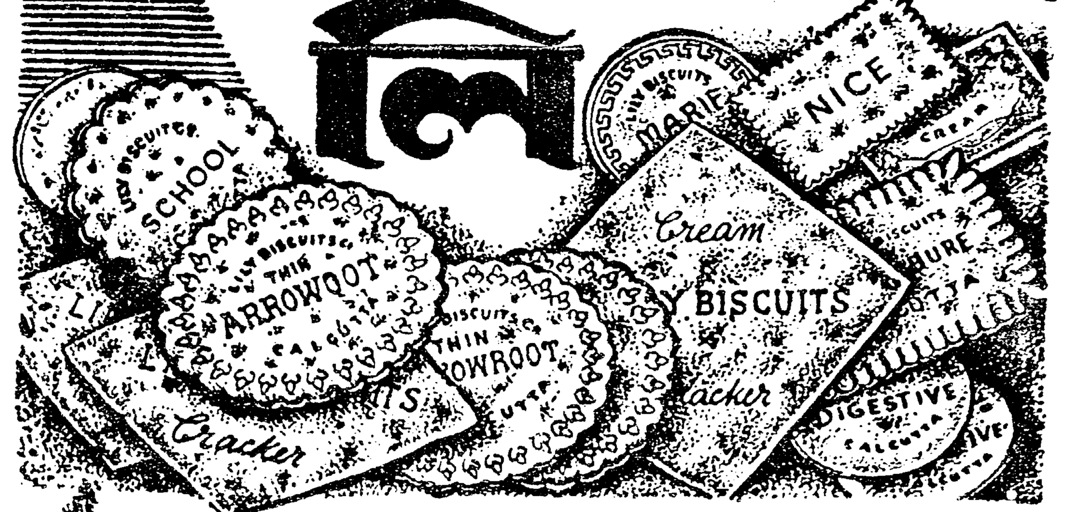

কয়েকটী মনোরম
ও
স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন-ক্রীম,
ক্যাণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ
৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

রামধনু

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্, এস-সি.

...িক ৪৲
...াদিক ২।০
...তি সংখ্যা ।৵০

কার্য্যালয় :
১৬, টাউনসেণ্ড রোড
কলিকাতা ২৫

ছোটদের উপহার ও লাইব্রেরির জন্য

সুবোধ বসু-র

পদ্মা নদীর ডাক

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "পদ্মা প্রমত্তা নদী"র কিশোর-সংস্করণ। মূল্য ১৸৹

ইহা যখন ছায়াচিত্রে প্রথম প্রদর্শিত হয় তখন কলিকাতার ছয়টি কলেজের অধ্যক্ষ কাহিনীটি শিক্ষাপ্রদ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

Amrita Bazar Patrika : It is a pleasure to welcome this exhilarating story as a distinguished addition to our juvenile literature."

গ্রন্থাগার : পুস্তক-প্রকাশক

পি ৫৮ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা-২৯

এজেণ্ট চাই

রামধনু খুচরা বিক্রয়ের জন্য বাংলা ও ভারতের সমস্ত বড় বড় সহরে এজেণ্ট চাই।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার, রামধনু
১৬, টাউনসেণ্ড রোড
কলিকাতা—২৫

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

রামধনু—

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৪শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮ | ৮ম সংখ্যা

আমাদের গ্রাম

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

শান্তি লভিবে যদি এসো না হেথায়,
বারেক এসো না ভাই, অযোধ্যা-গাঁয়।
রামের এ গ্রাম নয়, আমাদের গ্রাম,
মাঠে মাঠে চরে ধেনু নয়নাভিরাম।
দক্ষিণে বহে নদী দ্বারকেশর—
কাশ ফুলে ফুলময় এর দু'টি চর।
উত্তরে শালবন গেছে এঁকেবেঁকে,
মন-ভোলা ঘুঘু সেথা ডাকে থেকে থেকে।

ধানক্ষেতে লুটে পড়ে দখিনা বাতাস,
দোল দোল দোল খায় দূর্ব্বার ঘাস ।
বামুন, কামার, চাষী—সব যেন ভাই,
'তপশীলী' বলে হেথা কেহ কভু নাই ।
সারা দিন যে যাহার করে ফিরে কাজ,
সন্ধ্যায় সবে মিলে বসায় সমাজ ।
তাস খেলে, পুঁথি পড়ে, করে হরিনাম;
এই হ'ল আমাদের অযোধ্যা গ্রাম ।

বিসর্জন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জনৈক পুরবাসী

বুঝতে পারচি আমাদের এই ঘরোয়া কাণ্ডকারখানা কারো কারো ভাল লাগচে না। লাগতো যদি যাঁদের কথা বলা হচ্ছে তাঁরা খুব বিখ্যাত লোক হতেন আর লেখকও হতেন আচার্য্য পদবাচ্য কেউ। কিন্তু যা নেই, যা হবার নয়, তার জন্যে ক্ষুব্ধ হয়ে মনঃপীড়া ভোগে লাভ কি? এখন আমাদের সাধারণ মানুষের দিন পড়েচে। আমাদের কথা শুনতে, বলতে, লিখতে, এবং আমাদের সঙ্গে মিশতেও হবে। নতুবা পুরানোর পর্যায়ে পড়ে ধূলিসমাচ্ছন্ন হয়ে বিস্মৃতির অন্ধকারে অদৃশ্য হবারই ষোলো আনা সম্ভাবনা।

যে অংশ শূন্য রইলো তা যে শূন্যই থেকে যাবে এবং যাঁরা ভূমিকা গ্রহণ করে 'রিহার্সাল' দিচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যেও যে ভাঙন ধরবে এ কথা আমরা গোড়াতে বুঝতেই পারলাম না। কিন্তু দেখা গেল, যে মন্ত্রিত্বের লোভে লোক পাগল হয়, মাথা ভাঙাভাঙি করে, প্রথমেই ভাঙন ধরলো সেই মন্ত্রিত্বেই। সুধীর বাবু দেহগৌরবে গরীয়ান্, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর সে গৌরব রাখতে যেন নেতিয়ে পড়তে লাগলো। সেই সঙ্গে তাতে দেখা দিল লজ্জার জড়িমা ও আলস্যের অসাড়তা। বোঝা যেতে লাগলো 'ষ্টেজে' মন্ত্রী সেজে দাঁড়াতে তিনি খুব ইচ্ছুক ন'ন। তবুও মুখে সে কথা

প্রকাশ করলেন না; শেষে একদিন "মন্ত্রিত্বের পদে—এ পদাঘাত করি" বেমালুম ডুব দিলেন এবং ডাকতে গেলে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে বললেন, "আমি পারবো না। আপনারা বিশু বাবুকে নিয়ে যান।" বিশু বাবু মানে শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। অনেক সময় সন্দেহ হয়, বিশু বাবুই বোধ হয় এ যুগের বিনয়ের অবতার। বর্ণ গৌর, নাতিদীর্ঘ ছিপছিপে গড়ন, মুখখানি খাশা। এমন সুপুরুষ ব্যক্তি হাজারে একটাও মেলে কি না সন্দেহ। সর্ব্বদাই কাঁধে চাদর ও ফিটফাট; নিম্নকণ্ঠে কথা বলেন, ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে—যেন মাখন-মাখানো মিছরির ছুরি। বাক্যগুলিও মধুর। কিন্তু শুনেচি, বেশি মধু পানে গা জ্বালা করে। সেই জন্যই বোধ

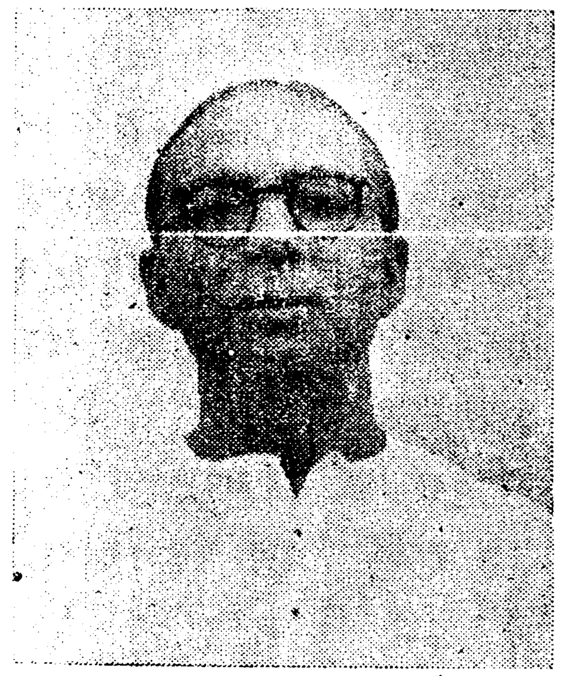

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপালদাস ঘোষ

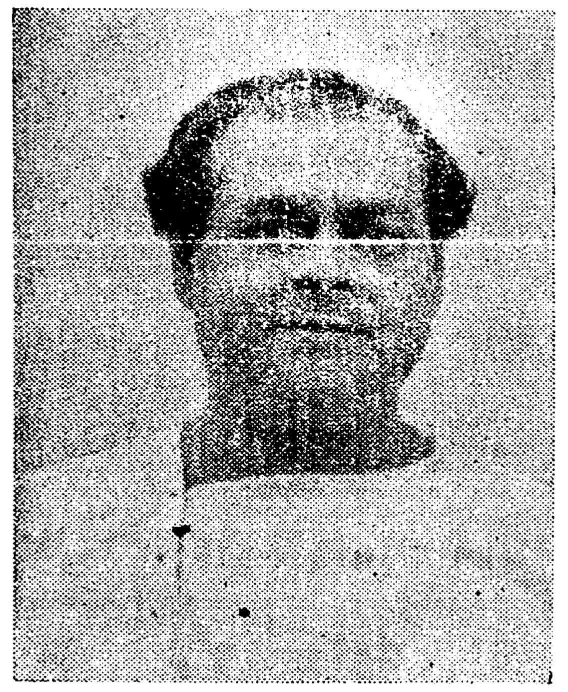

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক

হয় তাঁর বাক্যমধু সেবন করতে করতে মাঝে মাঝে কেমন একটু গায়ের জ্বালা ধরে। এক সময় তিনি সিনেমায় অভিনয় করেচেন, অভিনয়ে তাঁর বেশ দখল। তাই বললাম, "আপনি মন্ত্রী হ'ন"। শুনেচি হাতীতে পথ থেকে রাজাহীন রাজ্যের রাজা ধরে, ক্ষিপ্ত জনতা পথ থেকে সেনাপতি নির্ব্বাচন করে লড়াই করতে যায়, কিন্তু মন্ত্রী ধরার কাহিনী কেউ শুনেচেন বা দেখেচেন বলে তো আমাদের ধারণা নেই। আমরা চেষ্টা করতে লাগ্‌লাম তারই।

বিশু বাবু সবিনয়ে, সহাস্যে, মৃদু অথচ সবল কণ্ঠে বললেন, "আমাকে কেন? সুধীর বাবু, আপনিই হোন। বেশ মানাবে।"

সুধীর বাবু সহাস্তে বললেন, "না, না, আমি পারবো না আপনারা ওঁকে নিয়ে যান।" এবং তু'জনে বিনয়ের এমন পাল্লা দিতে লাগলেন যে হতভম্বের মতো বসে রইলাম। পরিশেষে মন্ত্রী বিনাই এলাম ফিরে। মনে মনে রবীন্দ্রনাথের ওপর রাগ হোলো। মন্ত্রী ছাড়া কি 'বিসর্জন' হ'ত না? এই যে হাজার হাজার "ক্লাবের" প্রতিমা 'বিসর্জন' হয়, ওদের কি মন্ত্রী থাকে, না ওরা মন্ত্রীর জন্য হয়রান হয়? মন্ত্রীর মুখ দিয়ে ক'টি কথাই বা তিনি বলিয়েচেন? ঐ একটি দৃশ্যেই তো মন্ত্রীর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান। তবুও মন্ত্রী চাই, কারণ দৃশ্যটি রাজসভার। তাই মন্ত্রী খোঁজা চলতে লাগলো। কিন্তু এমন কাউকে পাওয়া গেল না যিনি এ পদের যোগ্য। শেষে বললাম, "আমিই মন্ত্রী হব।"

শ্রীযুক্ত আশীষকুমার ভট্টাচার্য

আমার মন্ত্রিত্ব গ্রহণে আপত্তি করলেন "রাজা" শ্রীনরেন্দ্র দেব। বললেন, "গলার স্বরে ধরা পড়ে যাবে।" বললাম, "আমাকে পুরবাসীর ভূমিকায় আসতে হবে তৃতীয় দৃশ্যে। তা ছাড়া আমি গলার স্বরও বদলাতে পারি।" এবং তার প্রমাণও দিলাম। তবুও তিনি আপত্তি করলেন। বুঝলাম, মন্ত্রিত্বের গদিতে বসা আমার ভাগ্যে নেই। মন্ত্রী হবার জন্য আমার জন্ম হয় নি, সাধারণ 'ভোটার' হয়েই আমাকে জীবন কাটাতে হবে। স্বয়ং "রাজামশাই" আমাকে পছন্দ করেন না! একবার কথা উঠলো শ্রীক্ষেত্রপালদাস ঘোষকে মন্ত্রিত্বের গদিতে বসাবার। কিন্তু তাঁর চেহারা ও কণ্ঠস্বর নারী, বিশেষ করে রাণীর—প্রৌঢ়া রাণীর—ভূমিকা অভিনয়ের বেশি উপযোগী। কাজেই তাঁকে বাদ দিয়ে সকলের নজর পড়লো শ্রীগৌরীশঙ্করের দিকে। গৌরীরও কচি কচি চেহারা, আধ-পাকা কথা। হাসি হাসি মুখও তার মন্ত্রিত্বের পদে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। সকলেই বলতে লাগলেন, "সুধীর বাবু কিংবা বিশু বাবু হ'লে চমৎকার মানাতো!" কিন্তু তাও যে হবার নয়। সুধীর বাবু লাজুক, বিশু বাবু "য়্যামবিশাস্",—তিনি চান "বড় পার্ট"। মুখে অবশ্য তিনি সে কথা প্রকাশ করেন নি, কারণ তিনি যে বিনয়ের অবতার। তাঁর চোখ তু'টি সে কথা বলে দিচ্ছিল। বড় পার্টের মধ্যে ছিল চারটী—রাজা, রঘুপতি, জয়সিংহ ও রাণী। কিন্তু চারটীর একটীও তখন খালি ছিল না।

এই বিপদে আবার গোল বাধলো "চাঁদপালকে" নিয়ে। আশা ছিল পাল-রাজত্বের যুগে পালের চাঁদকে পেতে বেগ পেতে হবে না। কিন্তু নিশ্চয়তার মধ্যেই যে ফাঁকির বীজ লুকিয়ে থাকে এ সত্যটি ব্যক্তিগত জীবনে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেও সমষ্টিগত ক্রিয়াকলাপে যে সত্য হবে তা বুঝতে পারলাম না। শেষে বুঝতে হ'ল। রবীন্দ্রনাথ চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেচেন, বিশ্বাসঘাতক করে। কাজেই ভূমিকাটি গ্রহণ করতে কারোই মন চাইলো না। তবুও ক্ষেত্রপাল বাবুকে চরিত্রটী অভিনয় করার জন্যে অনুরোধ করা হ'ল। তিনিও একদিন "রিহার্সাল" দিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিন তিনিও মন্ত্রীর পথ ধরলেন। তবুও রীতিমত "রিহার্সাল" চলতে লাগলো। কারণ "প্রক্সি" দেওয়া বিদ্যাটি কলেজ-জীবনে শিক্ষা হয়েছিল অনেকেরই। তবুও কার্য্যটি করতে হ'ল আমাকেই বেশী করে। কোনদিন হই মন্ত্রী, কোনদিন চাঁদপাল, কোনদিন বা আর কিছু। কিন্তু রাজা-রাণী হলাম না কোন দিনই এবং ইচ্ছা থাকলেও জয়সিংহ-অপর্ণাও হতে পারলাম না। কারণ শেষোক্ত ব্যক্তি তু'টি প্রত্যহ উপস্থিত থাকতে লাগলেন। আমাদের মধ্যে "রেগুলার য়্যাটেন্‌ড্যান্স"-এর জন্য কোন পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে এঁরা তু'জনেই যে ব্রাকেটে তা লাভ করতেন এতে সন্দেহ করার কিছু নেই।

যাঁরা অনুপস্থিত থাকতে লাগলেন তাঁরা সকলেই বড় বড় 'নট'—"ষ্টেজে মেরে দেবেন"। এবং সাধারণতঃ ষ্টেজেই মেরে দিয়ে থাকেন। সবচেয়ে গরহাজির হ'তে লাগলেন, রঘুপতি। তিনি রাজপুরোহিত। কাজেই বাইরে সভা-সমিতি ও নাট্য-দর্শনের নিমন্ত্রণে সন্ধ্যা থেকে একটু বেশি রাত অবধি এপাড়ায়-ওপাড়ায় লাঠি হাতে ঘুরে বেড়ান। তাঁর জন্যে আমাদের "মড়া" আগলে বসে হা-হুতাশ করতে হয়। রাজাও রাজকার্য সেরে আসতে আসতে সবাইয়েরই পেট "বাপান্ত" শুরু করে। আবার আমাদের পুরবাসীদের মধ্যে কানু ও নেপাল নিজেদের কাজ-কর্ম সেরে যখন আসেন তখন বাড়ী যাবার সময় হয়ে আসে। ইতিমধ্যে ধীরেন বাবু, কুঞ্জ বাবু ভেগেচেন, দ্বিজুদা'ও 'ভাগবো ভাগবো' করচে, কল্যাণও কেমন আড়া-মোড়া ভাঙচে। বাকী আমরা ক'টি।

নেপাল এসেই হা-হা করে হাসতে হাসতে পকেট থেকে সিগারেট বের করে বলে "দাদা খান্। সত্যি বলচি—হা-হা"—কানু এসেই ফিক্ করে হেসে লাট্টুর মতো ঘুরতে ঘুরতে বলে, "চা খেয়েছেন সকলে?" রাজা এসেই তাঁর বিখ্যাত গোঁফে চাড়া দিয়ে বলেন, "এখনও আরম্ভ করো নি? ধর—ধর, বই ধর—" আর পুরোহিত

এসেই সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে জনতার মনের ভাবটা আন্দাজ করে নিয়ে যার মুখখানি সবচেয়ে গম্ভীর দেখেন তাকে বলেন, "বুঝলা অমুক, এই তোমার কথা ইসে—"। অতঃপর ক্রোধ প্রকাশের সুযোগ তখন আর পাওয়া যায় না, নিজেদেরই মনে হয় অপরাধী। তবুও মনোভাব প্রকাশের সুযোগ খুঁজি। মনে হয়, কি ঝকমারি! তারপরই রিহার্সাল চলে।

পুরোহিত হুংকার দিয়ে ওঠেন, "জয়সিংহ—ও—ও—"

অমনি একজন পিছন থেকে মৃদুকণ্ঠে বলে, "এই রকম করে ষ্টেজে মেরে দিতে গেলে যে সবাইকে পাল চাপা দেবে"—

কিন্তু এ কথা পুরোহিতকে বলবে কে? তাকে তো তখনই "ভস্মসাৎ" হ'তে হবে। তাই রাজামশাই একদিন রাজকীয় চালে বললেন, "ওটা সিংহ হচ্ছে"—

পুরোহিত তাঁর দিকে একবার কট্‌মট করে তাকিয়ে অতঃপর "সিংহ" বলেই নাদ ছাড়তে লাগলেন। কিন্তু আবার এক উৎপাত দেখা দিল। একদিন তিনি বলে বসলেন, "সে তোমার সিংহাসনে নির্চ্চয় লাগিবে।" বুঝলাম, দর্শকদের হাতে ইট খাওয়া ভাগ্যে নিশ্চিত। তবুও শুধরে দিতে গিয়ে ধমক খেতে সাহস কারোই হ'ল না। তা ছাড়া আরও ভয় হতে লাগলো, পুরুত ঠাকুর হয়তো "দুত্তোর নিকুচি করেচে" বলে লাঠি হাতে একেবারে প্রস্থান করবেন। তখন মূলেই "হাভাত" হয়ে যাবে। তার চেয়ে ষ্টেজেই না হয় ইট খাবো। শেষে রাজামশাইয়েরও একদিন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো; বললেন, "নির্চ্চয় হচ্চে যে!"

পুরুত ঠাকুর অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "হ্যাঁ —হ্যাঁ —'নিশ্চয়' লাগিবে।" এবং যেন মনে মনে বললেন, "উচ্চারণে ভুল ধরতে এসেছে! ঢাকায় এমন—।" তারপর প্রকাশ্যে হাঁক দিলেন—"চা কৈ হে?" (ক্রমশঃ)

এভারেষ্ট অভিযান

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম. এ

গিরিরাজ হিমালয়। চেনা হ'লেও অচেনা। মানুষ তাঁর সবটাই চিনে নিতে চায়, কিন্তু গিরিরাজ তাতে নারাজ। বহু লোক আজ পর্যন্ত এ প্রচেষ্টায় প্রাণ দিয়েছে। আরও কত লোক দেবে কে জানে! গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয় আজও অপরাজিত রয়ে গেছেন।

একদল স্কচম্যানের এ বছর হিমালয় অভিযানের কথা হয়তো তোমরা শুনেছ। তাঁদের লক্ষ্যস্থল নন্দাদেবী। উচ্চতায় ২৫,৬৪৫ ফিট এই গিরিশৃঙ্গ। কিন্তু আমি বলতে যাচ্ছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গিরিচূড়া এভারেষ্টের কথা।

এভারেষ্টের উচ্চতা হচ্ছে ২৯,০০২ ফিট। একজন বাঙ্গালী সর্বপ্রথম এটা আবিষ্কার

এভারেষ্ট

করেছিলেন এ কথা স্মরণ করে গর্ব অনুভব করছি; তোমরাও করবে। হিন্দু কলেজের সেকালের একজন নাম-করা ছাত্র রাধানাথ সিকদারই হচ্ছেন এই প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। দুঃখের বিষয় তাঁর নাম অনুসারে পর্ব্বতচূড়ার নামকরণ না হয়ে হ'ল ভারতের সর্বপ্রথম সার্ভেয়র জেনারেল স্যর জর্জ এভারেষ্টের নাম অনুসারে। পরাধীন জাতির ভাগ্যে এমন বিড়ম্বনা কত ঘটেছে!

এভারেষ্ট আবিষ্কারের পর প্রায় অর্ধ শতাব্দী মানুষ তার খোঁজ-খবর বড় একটা রাখে নি। তিব্বত গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে অনুমতি ও সাহায্য পাওয়াও তখন খুব কঠিন ছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে তার নজর পড়ল এদিকে। আরম্ভ হ'ল অভিযানের পর অভিযান। এই সব অভিযানের বিবরণ যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি মর্মস্পর্শী। আমি বেছে বেছে মাত্র কয়েকটি কাহিনী তোমাদের সংক্ষেপে শোনাচ্ছি।

১৯২০ সালের কথা। এভারেষ্ট অভিযানের উদ্দেশ্যে বিলাতে এক কমিটি গঠিত হ'ল। পর্ব্বত আরোহণের জন্যে অনুমতি এবং যথেষ্ট অর্থও সংগৃহীত হ'ল। ঠিক হ'ল পর পর দু'বছর দু'টি দলকে হিমালয়ে পাঠান হবে। প্রথমটির কায হবে প্রধানতঃ অনুসন্ধান, দ্বিতীয়টির অভিযান। শেষ পর্যন্ত দু'টির জায়গায় তিনটী দল কাযে লাগেন।

১৯২১ সালে যে দল ভারতে আসেন তার মধ্যে ছিলেন জর্জ লিগ-মেলরী। হিমালয়-অভিযানের ইতিহাসে এঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। পাহাড়ের ওপর মাল বইতে তিব্বতের শেরপা কুলীরা সব চেয়ে দক্ষ। তাই এই সব কুলী সংগ্রহ করা হ'ল। তা ছাড়া তিব্বতী পথ-প্রদর্শক, টাট্টু, ঘোড়া, ইয়াক্ প্রভৃতি তো নেওয়া হ'লই। অবশেষে এই বিরাট দল হিমালয়ের ভেতর দিয়ে চলতে আরম্ভ করল। হিমালয়ের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'তে তুষার-ঝঞ্ঝা আর হিমাবাহের মধ্যে দিয়ে দলটি এসে পৌছুল প্রস্তর-সমাকীর্ণ এক বিরাট উচ্চ সমতল প্রদেশে। এই স্থানের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০,০০০ ফিট। জুন মাসের শেষাশেষি অভিযাত্রীরা আরও এগিয়ে এসে পৌছুলেন হিমালয়ের প্রসিদ্ধ তিব্বতী মঠ রংবাখে। মঠটি এভারেষ্টের কুড়ি মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখান থেকেই তাঁরা সব প্রথম দেখলেন মরকতপ্রভায় মহিমান্বিত এভারেষ্টের সুস্পষ্ট অপূর্ব দৃশ্য। মেলরী তাঁর ডাইরীতে এ সময় যে কথা ক'টি লিখেছেন তা উদ্ধৃত করছি—"বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমরা চেয়ে রইলুম। আমাদের মন থেকে ভাবনা-চিন্তা সব কোথায় উড়ে গেল। মনে কোন প্রশ্ন এল না। কেউ কোন মন্তব্য করল না। কেবল প্রাণ ভরে সকলে দেখতে লাগল।"

এইবার এভারেষ্টে ওঠার প্রশ্ন। গিরিশৃঙ্গটি ঠিক যেন একটি বিশাল পিরামিড। খাড়াই এত মসৃণ যে মানুষ কোন দিক্ দিয়ে ওঠার কল্পনাও করতে পারে না। অনেক অনুসন্ধানের পর মেলরী উত্তর পূবে একটি পথের খোঁজ পেলেন যেখান দিয়ে উঠ্‌লে হয়তো খানিকটা অগ্রসর হওয়া যাবে। উত্তর কল নামক স্থান থেকে এই পথের সুরু।

উত্তর কলে এসে পৌছুতে দলটিকে ফের একশ' মাইল পিছু হাঁটতে হ'ল। দু'মাস পথ খোঁজবার পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্টের পর তাঁরা কৃতকার্য হলেন। স্পষ্ট বোঝা গেল এই পথ দিয়ে এভারেষ্টের দিকে বেশ খানিকটা অগ্রসর হওয়া যাবে।

এদিকে আগষ্ট মাস এসে গেল। হিমালয়ের ক্ষণস্থায়ী গ্রীষ্মের প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। খুব তাড়াতাড়ি কায চলল। ২৪শে আগষ্ট দলের তিনজন আরোহী ২৩,০০০ ফিট পর্যন্ত উঠলেন। কিন্তু এভারেষ্ট আরও ৬,০০০ ফিট দূরে। অভিজ্ঞ আরোহীরা বুঝলেন যে এ সময় এর বেশী এগুনো যাবে না। কেন না এরই মধ্যে ভীষণ রকম তুষারঝঞ্ঝা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। মনের আশা মনে চেপে রেখে তাঁরা নীচে নেমে দলের কাছে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বললেন। এ ভাবে তাঁদের প্রথম অভিযানের শেষ হ'ল।

দ্বিতীয় অভিযান সুরু হ'ল ১৯২২ সালের ১লা মে। আবার রংবাখের মঠের কাছে ছাউনি পড়ল। এবারে দলে রইলেন তের জন ইংরেজ, ষাট জন পাহাড়ি, একশ' জন তিব্বতী পথপ্রদর্শক আর তিনশ'র চেয়েও বেশী মালবাহী পশু। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন তিব্বত এর আগে এত বড় দল আর দেখেই নি। দু' সপ্তাহ ধরে বিরাট হিমবাহের ভেতর দিয়ে অতি কষ্টে মাল টানার কায চলল। তার পর উত্তর কলের কাছে তাঁবু খাটান হ'ল। এবার আরম্ভ হ'ল সত্যিকারের অভিযান। ২০শে মে মেলরী আর তার তিন বন্ধু কয়েকজন সুদক্ষ কুলীকে সঙ্গে নিয়ে অজানা পথে পাড়ি জমালেন। কি অসহ্য ঠাণ্ডা! বরফ-জমা হাওয়া যেন তাঁদের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছিল। এদিকে এভারেষ্ট আরও এক মাইল দূরে। অসীম ধৈর্য, অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে তাঁরা এগুতে লাগলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিছু হঠতে হ'ল। ১৯২২ সালে এ রকম তিনটি চেষ্টা হয়েছিল। কোনটিই সফল হয় নি। শেষ চেষ্টা হয় জুন মাসে এবং তাতে এক বিষম বিপত্তি ঘটে। ভীষণ এক তুষার-ঝঞ্ঝা আরোহীদের বিপর্যস্ত করে ফেলে। সাতজন কুলী নিখোঁজ হয়ে যায়। তাদের দেহ হয়তো আজও বরফের তলায় চাপা পড়ে হিমালয়ের প্রচণ্ড ক্রোধের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বার বার হেরে গিয়ে অভিযাত্রীর দল নীচে নেমে এলেন, আর দূরে দাঁড়িয়ে এভারেষ্ট শ্বেত উষ্ণীষ নেড়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সে পরাজয়ের দৃশ্য দেখতে লাগল।

১৯২৪ সালে হ'ল এ দলের শেষ অভিযান। কিন্তু সে গল্প আর একদিন বল্‌ব।

দাদার মত দাদা

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ, বি. এল্

প্রশান্ত মহাসাগরে গিলবার্ট দ্বীপপুঞ্জ বলে কতকগুলি প্রবালদ্বীপ আছে। তার মধ্যে একটির নাম তারাওয়া। এই দ্বীপে এক পরিবারে আটটী ভাই ছিল। তাবানাওরা ছিল তাদের মধ্যে সকলের বড়, বছর ত্রিশেক বয়স হবে তার। সব-চেয়ে ছোট ভাইয়ের নাম ছিল তেবিনা। এই ছোট ভাইটীকে বড় ভাল বাসত তাবানাওরা।

একদিন ভোরবেলা তেবিনা ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে গেল সমুদ্রে। কিন্তু সে আর ফিরে এল না। পাগলের মত হয়ে তাকে খুঁজতে বেরোলো তার সাত ভাই।

সবচেয়ে বেশী অস্থির হয়ে উঠলো তাবানাওরা। অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে শেষে জানা গেল যে তেবিনা এক জায়গায় এক কোমর জলে নেমে দাঁড়িয়ে জলে ছিপ ফেলেছিল, হঠাৎ কোথা থেকে একটা মস্ত বাঘা-হাঙ্গর এসে তাকে নিয়ে যায়। একটু দূরেই ডাঙ্গায় বসে এক বুড়ী রোদ পোয়াচ্ছিল। সে হাঙরটাকে দেখতে পেয়েই চীৎকার করে ওঠে, কিন্তু তেবিনা বুঝতে না পেরে বুড়ীর দিকে যেই মুখ ফিরিয়েছে অমনি হাঙরটা এসে তার পা ধরে টেনে নিয়ে গেল।

ভাইয়ের শোকে তাবানাওরা প্রথমটায় যেন কি রকম হয়ে গেল। কিন্তু তারপর সেই শোক ছাপিয়েও তার কেবল মনে উঠতে লাগলো একটা কথা। তেবিনার তো একটা শ্রাদ্ধ করতে হবে। কিন্তু শ্রাদ্ধে যে তেবিনার মৃতদেহটা চাই, অন্ততঃ পক্ষে মৃতদেহের একটা টুকরো না হ'লে তো শ্রাদ্ধই হবে না। আর, শ্রাদ্ধ না হ'লেই সর্ব্বনাশ! তা হ'লে তেবিনা মরেও শান্তি পাবে না। তার আত্মা স্বর্গে ঢুকতে পারবে না, বাইরে ঘুর-ঘুর করে তাকে কাটাতে হবে চিরকাল। কেননা, এদের স্বর্গে ঢোকবার নিয়মকানুনের বেজায় কড়াকড়ি। স্বর্গের সিংহদরজায় সব আত্মারা এসে জড় হয়, তারপর তাদের বেশ করে দেখেশুনে বাছাই করে ঢুকতে দেওয়া হয় স্বর্গে। এই বাছাই করবার ভার আছে একটী সাংঘাতিক দেবতার উপর, তাঁর নাম হচ্ছে নাকাআ। যদি তিনি দেখেন যে এমন কোনও লোকের আত্মা দরজার কাছে ঘোরাফেরা করছে যার মৃতদেহের সৎকার হয় নি; অথবা ঠিক ঠিক নিয়মমত শ্রাদ্ধ করা হয় নি, তিনি তক্ষুনি সেই অভাগা আত্মার গলায় একটা ফাঁস লাগিয়ে তার টুঁটি চেপে ধরেন।

তেবিনারও তো তা হ'লে সেই অবস্থা হবে। এখন উপায়? আদরের ভাইটী কত কষ্ট পেয়ে মারা গিয়েছে, এখন স্বর্গে গিয়েও নাকাআর হাতে নাকাল হবে! তাকে কি কোনও উপায়ে রক্ষা করতে পারবে না তাবানাওরা? একটা টুকরো পেলেও হ'ত, কিন্তু তেবিনার সবটুকুই তো রয়েছে হাঙরের পেটে। আর, সেই হাঙরও আছে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরের কোন্ গহন তলে, তা কে বলতে পারে?

আর কেউ হ'লে হাল ছেড়ে দিত, কিন্তু তাবানাওরা তা করলো না। তার হঠাৎ মনে হ'লো একটা কথা। হাঙরদের স্বভাব এই যে একবার কোথাও একটা শিকার জুটে গেলে তারা দিনের পর দিন ঠিক সেই সময়ে আবার সেখানে শিকারের লোভে আসে। তাবানাওরা ঠিক করলো যে সে শিকার সেজে যাবে সেখানে, যেখানে তেবিনাকে হাঙরে ধরে নিয়ে গিয়েছিল! তার পর সে একবার দেখবে

যে হাঙরের পেট থেকে তেবিনার শরীরের একটা টুকরোও আদায় করে নিতে পারে কিনা। ইচ্ছে করে জলে নেমে বাঘা-হাঙরের মুখে গিয়ে পড়াটা কত বড় দুঃসাহসের কাজ, কিন্তু ভাইয়ের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করবে না তাবানাওরা? নিজের প্রাণের উপর অতটা টান নেই তার।

তারপর সে তার অস্ত্র তৈরী করতে মন দিল। সাত হাত লম্বা মস্ত একটা লাঠি, তার মাথায় পরানো হ'লো একহাত লম্বা একটা ফলা। তার মাথাটা সূচালো, আর দুই ধারে শাণ-দেওয়া ক্ষুরের মত ধার। ফলাটা যেখানে পরানো হ'লো তারই এদিকে লাঠিটার গায়ে বাঁধা হ'লো সারি সারি হাঙরের দাঁত। হাঙর মেরে তার দাঁত সংগ্রহ ক'রে ঘরে রেখে দেয় ওদেশের লোকেরা। নানারকম তুকতাকে তা লাগে। তা ছাড়া, খুব ধারালো বলে সেগুলি অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতেও ব্যবহার করা হয়। সেই দাঁত খাড়া-খাড়া ক'রে চার লাইন বাঁধা হ'লো তাবানাওরার এই ভয়ঙ্কর বর্শার আগার দিকে হাত দুয়েক পর্য্যন্ত। অনেক রাত্রে পর্য্যন্ত জেগে তাবানাওরা এই অস্ত্র তৈরী করলো। কি ভীষণ সেই বর্শাটা! একবার ভাল ক'রে গেঁথে গেলে দু'ধারী করাতের মত কাটতে কাটতে ঢুকে যাবে হাঙরের শরীরে।

তখন ভোরের প্রথম আলো আকাশে ফুটে উঠেছে! নারকেল গাছের বন থেকে বেরিয়ে বেলাভূমি পার হয়ে তাবানাওরা সমুদ্রের জলে এসে নামলো তার সেই বর্শা হাতে নিয়ে। সমুদ্রের ঢেউ এসে বালির উপর আছড়ে পড়ছে, তার পর খানিক দূর পর্য্যন্ত অগভীর জল। চল্লিশ-পঞ্চাশ হাতের মধ্যে ডুব-জল নেই। নির্ভয়ে ঢেউ ঠেলে এগিয়ে গিয়ে তাবানাওরা দাঁড়ালো এক কোমর জলে। এইখান থেকেই কাল হাঙরটা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তার ছোট ভাইটীকে। বাকী ছ'ভাই আর গ্রামশুদ্ধ লোক ডাঙায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো তাবানাওরা কি করে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'লো না। হাঙরটা আগে থেকেই এসে ঘোরা-ঘুরি করছিল বোধ হয়। তাবানাওরা জলে নেমে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই দেখতে পেলো যে একটা মস্ত কালো তিন-কোণা পাখনা যেন জলের উপর দিয়ে ছুটে আসছে তার দিকে। হাঙররা যখন অল্প জলে শরীর ডুবিয়ে চলে তখন তাদের পিঠের উপরের পাখনাটা জলের উপর জেগে থাকতে দেখা যায়।

বিদ্যুদ্বেগে হাঙরটা এসে পড়লো তাবানাওরার কাছে। সে অমনি চট করে তার পথ ছেড়ে দাঁড়ালো, আর তার সেই বর্শা চালালো সেটার পেট লক্ষ্য করে। কিন্তু তার পুরু চামড়ায় লেগে বর্শাটা পিছলে গেল, গেঁথে গেল না।

হাঙরটা এত জোরে ছুটে এসেছিল যে সেটা তখনই ফিরতে পারলো না, সোজা হাত পঞ্চাশ-ষাট বেরিয়ে গেল। তারপর সে ফিরলো। বর্শাটা উঁচু করে ধরে স্থির হয়ে তাবানাওরা অপেক্ষা করতে লাগলো।

এবার হাঙরটা তেড়ে এল না। সাবধানে একটু একটু করে এগিয়ে এসে তাবানাওরার চার পাশে চক্কর দিতে লাগলো। প্রথমে দূর থেকে, তারপর আর একটু কাছে, তারপর আরও একটু—এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে তার চক্করটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসতে লাগলো। তারপর সে হঠাৎ তীরের মত ছুটলো তাবানাওরাকে লক্ষ্য করে।

এবার তাবানাওরা আর নড়লো না। হাঙরটা তার কাছে এসে যেই প্রকাণ্ড একটা হাঁ করেছে, অমনি সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই সাংঘাতিক বর্শাটাকে একেবারে গোড়া পর্য্যন্ত চালিয়ে দিল সেই হাঁ-করা মুখের একেবারে ভিতরে। সেই ধাক্কায় সে ছিটকে উপরে উঠে গেল, তবু সে বর্শার মুঠোটা ছাড়লো না। হাঙরটা তখন মারলো এক ঝটকা। তখন বর্শার মুঠো ভেঙে গিয়ে তাবানাওরা ছিটকে পড়লো বিশ হাত দূরে। তারপর সে উঠে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে দেখতে লাগলো কি হয়।

সেই অল্প জলে হাঙরটা তখন মরণ-যন্ত্রণায় লুটোপুটি খাচ্ছে। তার শরীরের ঝাপটায় ঘোলানো জলে তার মুখ থেকে বেরিয়ে-আসা রক্ত মিশে যাচ্ছে হুহু করে। বর্শাটা তার গলা চিরে নাড়ীভুঁড়ি ভেদ করে পেটে ঢুকে গিয়েছে প্রায় পাঁচ-ছ'হাত। আস্তে আস্তে তার ছটফটানি থেমে এল। বাঘা-হাঙরের বিপুল মৃতদেহটা সেই অল্প জলে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো।

আর পায় কে তাবানাওরাকে? মহানন্দে সাতটী ভাইয়ে মিলে ধরাধরি করে হাঙরটাকে ডাঙ্গায় তুলে নিয়ে এল। তার পর মন্ত্রটন্ত্র পড়ে তার পেটটা চিরে ফেলতেই দেখা গেল যে তেবিনার দেহের সবটুকু তখনও হজম হয়ে যায় নি—খানিকটা হাড়গোড় রয়েছে তার পেটে। তাবানাওরার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

কেন না, যেটুকু পাওয়া গেল, তাতেই কাজ চলে যাবে। ঐটুকু নিয়ে শ্রাদ্ধ করতে পারলেই আর নাকাআর সাধ্য থাকবে না যে তেবিনার আত্মাকে আটকায়। স্বর্গের প্রথম দরজা পেরিয়ে সে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারবে, পশ্চিম দিগন্তের ওধারে

যে সব স্বর্গ—প্রথমে বোউরু, তারপর মাতাং, তারও ওদিকে মেইনিআবা—সেই সব অপরূপ সৌন্দর্য্য আর সুখের দেশে।

সেই রাত্রিতে তাবানাওরা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারলো। তার ছোট্ট ভাইটী, পরম স্নেহের তেবিনা, সুখে থাকতে পারবে স্বর্গে গিয়ে। দাদার যা কাজ, তা করতে পেরেছে তাবানাওরা।

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

—সাত—

'হিংস্র নগ্ন বর্ব্বরতা'

তখনো বাইসনগুলো এত দূরে রয়েছে যে তাদের হাঁকডাক অথবা খুরের শব্দ অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে কানে আসছে। মাঝামাঝি একটা জায়গায় গোটা ছয়েক বাইসন পরম নিশ্চিন্ত মনে চরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ করে চোখে পড়ে একটা প্রকাণ্ড বাইসন। বাইসনটা মহা স্ফূর্ত্তিতে কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

সুদূর পশ্চিমের এই প্রান্তদেশে যত বন্য জন্তুর সাক্ষাৎ মেলে তাদের মধ্যে সব থেকে ভয়ঙ্কর হ'লো বাইসন আর ভালুক। ওদেশী বাসিন্দারা বাইসনকে 'মোষ' ব'লে অভিহিত করলেও মোষের সঙ্গে এদের পার্থক্য প্রচুর। উত্তর আমেরিকার এই সব প্রান্তরে, সুবিস্তৃত স্থান জুড়ে ওদের একচ্ছত্র আধিপত্য। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ওদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে এবং ওদের চারণভূমিও একটু একটু করে পেছিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমে। কিন্তু সুদূর পশ্চিমে ওদের আধিপত্য এখনো রয়েছে অব্যাহত।* ওদের গায়ের লোম ঘন খয়েরী রঙের কিন্তু ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রঙেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। শীতে ও বসন্তে ওদের লোম অনেকটা বড় হয় এবং তার রঙও রোদে পুড়ে হালকা হয়ে আসে অনেকটা। কিন্তু শীতের পরে ওদের গায়ে যে নতুন লোম দেখা দেয় তার রঙ ঘন খয়েরী,—প্রায় কালো বললেও চলে। আকৃতিতে কতকটা ষাঁড়ের মতো হ'লেও বাইসনের মাথা আর কাঁধ ষাঁড়ের থেকে অনেক বড়। সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় লোমের জন্য ওদের আকৃতি আরো ভয়াবহ দেখায়। বাইসনের ঘাড়ে এক প্রকাণ্ড কুঁজ থাকে

* এ বই প্রকাশিত হয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। তখনো অসংখ্য বাইসন ওদেশে বাস করতো। আজকাল বাইসনের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাচ্ছে বললেই হয়।

এবং পেছনের পায়ের তুলনায় সামনের পা দু'টো অনেক লম্বা। ওদের মাথার শিং খুব লম্বা না হলেও বেশ মোটা এবং পায়ের খুর দু'ভাগে ভাগ করা। ওদের ল্যাজ ছোট এবং তার প্রান্তে একগুচ্ছ চুল।

পুরুষ বাইসনের থেকে ভয়াবহ জন্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করাও কঠিন। ওদের এক একটার ওজন কখনো কখনো পঁচিশ মণের কাছাকাছি পর্য্যন্ত হয়। বাইসন আহত হলে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। লাফিয়ে, গর্জ্জন ক'রে, মুখ দিয়ে ফেনা বের ক'রে নিঃশ্বাসের ঝড় তুলে, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে আঘাতকারীকে আক্রমণ করে বসে। শিকারীর নিতান্ত ভাগ্য যে বাইসন সহসা ক্ষেপে যায় না, এবং সহজেই ভয় পেয়ে যায়। আর ওদের কাঁধের গড়ন যে রকম তাতে ওরা সহজে সোজা পথ ছাড়া ছুটতে পারে না। ওদের চোখের দৃষ্টি নীচের দিকে ফেরানো থাকে ব'লে সামনের দিক ভিন্ন ওরা তাকাতেও পারে না অন্য দিকে। ক্ষিপ্ত বাইসনের আক্রমণ এড়াবার সব থেকে সহজ উপায় হলো ওর পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ান। সাধারণতঃ ওদের গতি বিশেষ দ্রুত না হ'লেও ক্ষেপে গেলে ওরা অত্যন্ত দ্রুত ছোটে। খুব ভালো ঘোড়া ভিন্ন অন্য কোন জন্তুর পক্ষে তখন ওদের সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব।

বাইসনের কাদা মাথার কথা আগেই বলেছি। গ্রীষ্মকালেই বিশেষ করে ওরা এতে প্রচুর আনন্দ পায়।

আবার আমাদের গল্পে ফিরে আসা যাক। প্রকাণ্ড বাইসনটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একটা ছোট জলার ভেতরে নেমে কাদা মাখতে লাগল। বেশ খানিকক্ষণ জল-কাদা মেখে শিকারীদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো বাইসনটা। আর একটা বাইসন তখন এগিয়ে গেলো সেই জলার দিকে। এমন সময় অতর্কিতে শিকারীদের গুলি ওদের উপরে বর্ষিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে ছুটে পালাতে লাগলো যে যার মত। সকলে অবশ্য পালাতে পারে নি। যে বাইসনটা জো'র গুলিতে আহত হয়েছিল, ডিকের গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলো সেটা। হেনরিও গুলি করেছিলো, কিন্তু ক্ষীণদৃষ্টির জন্য তার গুলি লক্ষ্য ভেদ করতে না পারলেও অপর বাইসনটাকে আঘাত করেছিলো।

"চলো, এবার ফেরা যাক।" বাইসনের মাংস কাটা হ'য়ে গেলে জো বললো।

"কিন্তু অপর বাইসনটার কথা ভুলে যাচ্ছ যে! সেটাও তো আহত হয়েছে!" ডিক বললে।

"ওঃ, তার কথা ভাবতে হবে না; সেও মারা যাবে। আমাদের সঙ্গে যা মাংস আছে তা-ই আমরা খেয়ে উঠতে পারবো না, আর বেশী নিয়ে কি হবে?"

কথাটা ডিকের ঠিক পছন্দ হলো না। "এখনি আসছি" বলে ক্রুসোকে নিয়ে আহত বাইসনটার দিকে সে এগিয়ে গেলো।

কিছুদূর গিয়েই ডিক বইসনটার দেখা পেলো। একটা নীচু জায়গায় পড়ে ছিলো বাইসনটা।

"শুয়ে পড় ক্রুসো", ফিসফিস করে ডিক বললো,—"আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি শুয়ে থাক্"।

সঙ্গে সঙ্গে ক্রুসো শুয়ে পড়লো। ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো ডিক। কিছুদূর যেতে-না-

যেতেই বাইসনটা দেখতে পেলো তাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফিরে দাঁড়িয়ে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হ'লো। ক্রোধে, যন্ত্রণায় ক্ষ্যাপার মত হয়ে গিয়েছে সে। বাইসনটার ভীষণ চেহারা দেখে ডিকের বুক কেঁপে উঠলো। তার গায়ের লোমগুলো সব খাড়া হ'য়ে উঠেছে, মুখ দিয়ে রক্তমাখা ফেনা গড়িয়ে পড়ছে, চোখ দু'টো জ্বলছে যেন আগুনের গোলা। ডিককে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিকট গর্জ্জন ক'রে বাইসনটা সবেগে তাকে আক্রমণ করলো। আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও ডিক তার উপস্থিত-বুদ্ধি হারালো না। রাইফেল উদ্যত করে সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাইসনটা এতক্ষণে খুব কাছে এসে পড়েছে। যখন আর মাত্র তিন গজ বাকী, ডিক এক লাফে ওর পথ ছেড়ে স'রে এসেই সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলো। কিন্তু এতে তার বিশেষ কিছুই হ'লো না। গুলি লাগামাত্র বাইসনটা থেমে পড়ে ডিকের দিকে মুখ ফিরিয়ে আবার তাকে আক্রমণ করলো।

উত্তেজনার আতিশয্যে এবং এ ভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার দরুণ ডিক নিজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেললো। কী করবে ভেবে না পেয়ে সে তাড়াতাড়ি বাইসনটার মাথা লক্ষ্য ক'রে গুলি করলো। ডিকের গুলি যেন ইটের দেওয়ালে প্রতিহত হলো! দ্বিগুণ বিক্রমে গর্জ্জন ক'রে বাইসনটা এসে পড়লো ডিকের খুব কাছে। আগের মত এবারেও ডিক একপাশে লাফিয়ে প'ড়তে গেলো কিন্তু কি একটায় পা আটকে যেতে সবেগে ভূপতিত হলো সে।

এতক্ষণ ক্রুসো খুব শান্ত ছেলের মতো ডিকের আদেশ পালন ক'রে আসছিলো। কিন্তু ডিকের আসন্ন বিপদ্ দেখে সে আর স্থির থাকতে পারলো না। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চীৎকার করে সে বাইসনটার মাথার উপরে লাফিয়ে প'ড়ে তার নাক কামড়ে ধরলো। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য বাইসনটা প্রস্তুত ছিলো না; কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে মাথাটা একবার ঝাড়া দিতেই ক্রুসো শূন্যে ছিট্‌কে গেলো।

কিন্তু মাটিতে পড়েই ক্রুসো আবার তার উপরে লাফিয়ে পড়লো। এবার ক্রুসো একটু ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলো। ভীষণ চীৎকার করতে লাগলো এবং সুযোগ বুঝে থেকে থেকে ধারালো দাঁত দিয়ে সজোরে কামড়াতে লাগলো বাইসনটাকে, যাতে সে আবার ডিককে আক্রমণ করবার সময় না পায়। ইতিমধ্যে ডিক নিজেকে সামলে নিয়ে রাইফেলে গুলি ভরে নিয়েছে। এবার আর সে ভুল করলো না। লক্ষ্য স্থির করে এক গুলিতে তার ফুসফুস ফুটো করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-ফাটানো চীৎকার করে লুটিয়ে পড়লো বাইসনটা।

প্রভুকে এ ভাবে রক্ষা পেতে দেখে ক্রুসোর আর আনন্দ ধরে না। নেচে, কুঁদে, লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে সে বার বার ডিকের চারিদিকে ঘুরতে লাগলো। (ক্রমশঃ)

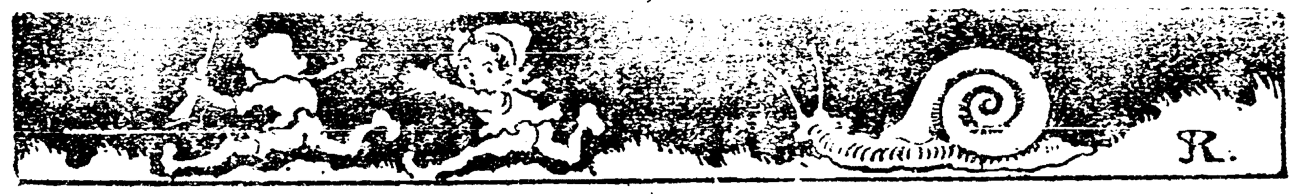

চিঠি

শ্রীআদিত্যনাথ মিশ্র, বি. এ, বি. টি, সাহিত্যশাস্ত্রী

প্রভাকর দা',

এখন তুমি কল্পলোকের সাত মহলায় থাকো,
ছোট্ট তোমার ভায়ের কথা আর কি মনে রাখো ?
ভুলে যাওয়া খুবই সহজ, ভুলে যাবেই জানি,
তবু তোমার স্নেহের কাছে শুধুই যে হার মানি।
মনে তোমার রঙের নেশা—স্বপ্ন দেখ কত,
আমার চোখে ভাসছে শুধু পাঁজরা শত শত।
দূরকে নিকট করতে পারো, নিকট কর দূর,
'সৃষ্টিছাড়া স্বভাব কবির'—পথটা যে বন্ধুর।
জানি তুমি খ্যাতির নেশায় কাটাও নিশিখানি,
ভাবতে মনে ছোট্ট কথা নেইকো সময় মানি।
কিন্তু তুমি নিজেই জানো, আর কেহ না জানে,
তোমার স্মৃতি, তোমার প্রীতি বুকে আঘাত হানে।
অচিন ফুলে নিলে তুলে সোহাগ ভরে, মিতা,
করলে আমায় ধন্য কত—বল্‌ব আমি কি তা।
ইচ্ছে হ'লে পড়বে চিঠি, না হয় ফেলে দিও,
রিক্ত নমস্কারের ডালি আদর করে নিও।
কোন্ ঠিকানায় এখন থাকো নেইকো আমার জানা,
রামধনুর এই পাতার উপর তাই তো আঁচড় টানা।
সত্যিকারের কবি তুমি, পদ্য আমি লিখি,
তোমার আশীষ মাথায় নিয়ে মিলটা দেওয়া শিখি।

"নেপোয় মারে দই"

শ্রীধ্রুবেন্দুকুমার সেন

সকাল হ'তেই বৌবাজারের 'দি গ্রাণ্ড রেষ্টুরেন্টের' লম্বা বড় ঘরখানা চা-পিয়াসী অগণিত লোকের আগমনে কোলাহলমুখর হ'য়ে ওঠে। এ পাড়ায় ঐ একমাত্র ভাল চা খাবার জায়গা—দূর দূর থেকেও লোকেরা এখানে আসে এখানকার সেই বিখ্যাত মোগলাই পরোটা আর ফাউল কারীর লোভে। বুড়োরা আসে সকালে ময়দানে একপ্রস্থ হাঁটবার পর গরম চা'এর প্রত্যাশায়, কলেজের ছেলেরা আসে চা-সহযোগে ফুটবলের গরম আলোচনা করার লোভে; আর বেকাররা আসে খবরের কাগজের কর্ম্মখালি-মার্কা বিজ্ঞাপন হৃদয়ঙ্গম করবার আশায়।

এমন 'দি গ্রাণ্ড রেষ্টুরেন্ট'এ সেদিন সকালে এক কাণ্ড হ'য়ে গেল। বয়দের ভেতর পঞ্চা আর গজা অনেকদিন কাজে ঢুকেছে, বছর তিনেক একসঙ্গে কাজ করছে, সুতরাং বন্ধুত্বও দু'জনার মধ্যে প্রগাঢ়। তাই দু'জনার মনেই ব্যাপারটা খুব রেখাপাত করেছে। রান্নাঘরে গিয়ে গজা চুপিচুপি একটা চপ্ খাচ্ছিল, দোকানের ম্যানেজার, কি কারণে জানি না, হঠাৎ অসময়ে সেদিন রান্নাঘরে ঢুকে গজাকে লুকিয়ে চপ্ খেতে দেখেই তার গালে বিরাশী সিক্কার যা একখানা চড় মেরেছে যে তাতে তার মাথা গেছে বিগড়ে।

—"ম্যানেজারকে যদি এর দ্বিগুণ জব্দ না করতে পারি তো এ জীবন আর রাখব না। চলন্ত ট্রামের নীচে পড়ে প্রাণ দেব।" গজা বলল।

"—এ হে হে, অতটা একবারে করিস নি। কি হতে কি হয় বলা তো যায় না!" পঞ্চা বাধা দিল।

—"না ভাই পঞ্চা, ম্যানেজারকে জব্দ করতে না পারলে এখানে আর চাকরী করা পোষাবে না। যে করেই হোক ওকে এবার জব্দ করতেই হবে। সেদিন আবার বকশিষের আধাআধি বখরা চাইছিল। আমি বললাম, মাইনে পাই তো ঐ ক'টি টাকা, তা থেকে তোমাকে দিলে আর থাকবে কি? বকশিষের লোভেই এখানে টিকে আছি—বকশিষের ভাগ কিছুতেই দেব না। ঐ রাগেই আমাকে বাগে পেয়ে ও আজ চড় মেরেছে। আমিও দেখে নেব—আমার নাম শ্রীমান্ গজানন।"

—"ঠিক বলেছিস ভাই, ঠিক জবাব দিয়েছিস। দেখ, আমি ভাবছি, কারখানা, করপোরেশন, ইস্কুল-কলেজের মত আমরাও এখানে একটা সঙ্ঘ করব। "দি গ্রাণ্ড রেষ্টুরেন্ট কর্ম্মচারী-স্বার্থ-সংরক্ষণ সঙ্ঘ"—কি বল?"

—"ভালই হয় ভাই। কলেজের বাবুরা যাকে ইউনিয়ন না কি ছাই ঘোড়ার ডিম বলে সেই রকমই হবে তো?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঐ রকম। তা দেখ, সব জিনিষ তাড়াতাড়ি করাই ভাল। ইচ্ছে হবে

বলে ফেলে রাখা ঠিক নয়। সঙ্ঘ গড়ে মালিকের সঙ্গে আমাদের লড়তে হবে, ম্যানেজারের চোখ রাঙানি আর মানবো না। আমরা গরীব বলে আমাদের ওপর অত্যাচার করবে, তা আর হ'তে দেব না।"

তার পরের দিন 'দি গ্রাণ্ড রেষ্টুরেন্টের লেডীস ওন্‌লি লেখা পার্টিশন দেওয়া ঘরের ভেতর রেষ্টুরেন্ট-কর্ম্মচারীদের সভা হ'ল।

'দি গ্রাণ্ড রেষ্টুরেন্ট কর্ম্মচারী-স্বার্থ-সংরক্ষণ সভায় অনেক আলোচনার পর ঠিক হ'ল—সবাই সব ব্যাপারেই সকলকার সঙ্গে সহযোগিতা করবে—বিশেষতঃ চুরি করে খাবার ব্যাপারে। ম্যানেজার একাই চুরি করে খাবে তা হয় না। বড়ুয়া প্রতিশ্রুতি দিল। কৈলাসও তাই। বড়ুয়ার আরও রাজী হবার কারণ তার বেতো-পায়ে হপ্তায় দু'দিন কবিরাজী তেল মালিশ করে দেবার প্রতিশ্রুতিতে পঞ্চা আর গজার সঙ্গে তার একটা অলিখিত চুক্তিও হ'যে গেছে সবার অজ্ঞাতে। তিনটের সময় সভা ভাঙ্গল কারণ রেষ্টুরেণ্টে তখন খরিদ্দাররা আসতে আরম্ভ করেছে।

বিকেল পাঁচটায় গজা মুখ চূণ করে পার্টিশন দেওয়া রান্নাঘরের ভেতর ঢুকল।

—"কিরে, কি ব্যাপার? তোর মুখটা শুকিয়ে ও রকম আমশি হ'য়ে গেছে কেন রে?" বড়ুয়া প্রশ্ন করে।

—"কর্ম্ম সেরেছে! সব দুধ ফুরিয়ে গেছে, এখন চা করার আর দুধ নেই।"

—"দুধ নেই? সর্ব্বনাশ! তিন সের দুধ ফুরিয়ে গেল! মোটে তো বিশ কাপ চা হ'ল দু' ঘণ্টায়। এখনও তো সারা বিকেল আর সন্ধ্যে পড়ে আছে। তখন তো খরিদ্দারদের ভিড়ে নিঃশ্বাস ফেলবার আর উপায় থাকবে না। রাত দশটা পর্য্যন্ত কি করে চলবে আজ! দুধ শেষ হ'ল কি করে?"

—"পঞ্চা সব দুধ খেয়ে নিয়েছে।"

—"বলিস্ কি রে! তিন সের দুধ পঞ্চা ছোঁড়া একাই মেরে দিল!"

শেষ পর্য্যন্ত বুদ্ধি জোগায় বড়ুয়াই। আলমারী থেকে একটা নতুন দুধের টিন বার করে গরম জলে গুলে তিন সের দুধ তৈরী করে ফেলল সে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। হাসতে হাসতে বলে, "ঘরে বেড়ালের যা উৎপাত! ম্যানেজারকে বলতে হবে।"

"দু'টো চিংড়ীর কাটলেট—চারটে মোগলাই পরোটা—দু'টো হাফ ডিস ফাউল কারী—"

"এক প্লেট পুডিং—চারটে ফাউল কাটলেট—দু'টো ওমলেট—আট কাপ চা—"

পঞ্চা, গজা, ভূতো আর ন্যাপলার চীৎকারে বড়ুয়া আর কৈলাস একেবারে হিমসিম খেয়ে গেল। গা দিয়ে তাদের টস্‌টস্ করে ঘাম ঝরছে।

—"বড়ুয়াদা', আমি একটা কাটলেট খাই?" খানিক বাদে কৈলাস বড়ুয়াকে জিজ্ঞেস করলে। "ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে।"

বড়ুয়া একবার কটমট করে কৈলাসের দিকে তাকাল। তারপরে হঠাৎ মনে পড়ে গেল সঙ্ঘের কথা। সেখানে ভাই ভাই—বেরাদার বেরাদার সব—একেবারে সাম্যবাদ। সুতরাং বাধ্য হয়েই বড়ুয়াকে একটা কাটলেট এগিয়ে দিতে হ'ল কৈলাসের দিকে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

এমন সময় পঞ্চা আসে হাঁফাতে হাঁফাতে—"সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

—"কি রে, কি হ'ল আবার?"

—"গজা রাস্কেল দেড় ডজন কেক্ সাবাড় করে দিয়েছে!"

—"তিনটে ডবল ওমলেট, তিন কাপ চা—আ—আ—আ।" গজা চীৎকার করে হাঁকল।

—"কৈলেস? কৈলেস কোথায়?" বড়ুয়া এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে হাক পাড়ল।

—"কেলাসদা'? কৈলাসদা'কে দেখলাম বাথরুমের পাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে লেমোনেড খাচ্ছে। প্রায় তিন বোতল খেয়েছে, আরও—"

—"ওদিকে আর এক কাণ্ড হয়েছে। নিমকী আর সুজীর বিস্কুট ভরা কাঁচের জারগুলো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পুডিংএর ডিসটাও তাই।"

এমন সময় ম্যানেজার এল রসুই-ঘরে।

—"বিস্কুটের জার কোথায় গেল? পুডিংএর প্লেট কোথায় গেল? লেমোনেডগুলো কোথায় গেল? বড়ুয়া, কৈলাস, পঞ্চা, গজা, ভুলো, ন্যাপলা সবাইকে বাবু ডেকেছেন। শীগগির এস তোমরা।" ম্যানেজার রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে।

সবাই এসে জড় হ'ল। জোড়হাতে দোকানের মালিককে জানাল যে তাদের কোনই দোষ নেই—সব দোষ একা ম্যানেজারের। ম্যানেজারই সব সরিয়েছে, এখন নিজেকে নির্দ্দোষী বলে তাদের মত গরীবের ওপর অত্যাচার করছে।

—"আমি সব খেয়েছি?"

—"খেয়েছ কি সরিয়েছ তা ভগবান্ জানেন। মোদ্দা আমি তোমাকে দেখলাম তিন সের দুধ বিক্রী করে দিতে গোয়ালাকে।" গজা খুব জোর গলায় বললে।

—"আমি তো তোমায় কেক খেতে দেখলাম চুপিচুপি টেবিলের নীচে বসে—এই কিছুক্ষণ আগে।" পঞ্চা চীৎকার করে বললে।

দোকানের মালিক বুড়ো বড়ুয়াকে বিশ্বাস করেন, জিজ্ঞেস করলো—"বড়ুয়া, এ সব সত্যি কথা?—ম্যানেজারের নামে যা যা বলছে এরা সব?"

বড়ুয়া বিনীতভাবে ঘাড় নাড়ল। সংঘের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা সে করে কি ক'রে? তা ছাড়া এতগুলো লোক বলছে—

ম্যানেজার চীৎকার করে উঠল—"না, না, এ সব মিথ্যে, শুধু আমাকে তাড়াবার জন্যে সব ষড়যন্ত্র!

—"ব্যাটা, তোমাকে তাড়ানোই উচিত।" কলেজের কতকগুলো ষণ্ডা ষণ্ডা ছেলে এতক্ষণ

গলা ফাটিয়ে কেক্ কেক্ করে চীৎকার করে না পেয়ে অবশেষে ম্যানেজারকে ধরে উত্তম মধ্যম দিয়ে দিল। —"ব্যাটা চোর, চুরি করে আবার কথা ?"

—"বড়ুয়া ?"

—"আজ্ঞে !"

—"আজ থেকে তুমি এ দোকান চালাবে। ম্যানেজার আর রাখব না।" দোকানের মালিক বললেন।

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর ম্যানেজার রাখবেন না—বড়ুয়াকেই দোকান দেখতে দিন।" কলেজের ছেলেরা একসঙ্গে দোকানের মালিককে অনুরোধ জানাল, কারণ বড়ুয়ার হাতে দোকানের ভার থাকলে ধারে খেতে তাদের সুবিধে হবে।

'দি গ্রাণ্ড রেষ্টুরেন্ট' এখনও খুব ভাল চলছে। গজা আর পঞ্চা এখন খুব আনন্দেই আছে। তাদের গায়ে মাস লেগেছে—ওজনও ক' পাউণ্ড বেড়েছে শুনলাম।

সোনার বালুচরে

শ্রীঅশোক সেন, এম্ এ

—এক—

অনেকদিন আগেকার কথা বলছি। মিঃ উইলিয়ম্ লেগর‍্যাণ্ড নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। উইলিয়মের অবস্থা এক সময়ে খুব ভাল ছিল, কিন্তু অদৃষ্টদোষে তাঁর সংসারে অভাব-অনটন দেখা দেয়। সেই

দুঃখে তিনি দেশের ভিটেমাটি ছেড়ে স্যুলিভান দ্বীপে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেন।

দক্ষিণ ক্যারোলিনায় এই দ্বীপটার কিন্তু বেশ একটু বিশেষত্ব আছে,। লম্বায় এটি প্রায় তিন মাইল, চওড়ায় আধ মাইলেরও অনেক কম। চারিদিকে বালি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। মূল ভূভাগ ও দ্বীপের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে সরু একটা খাল, সেটা মিশেছে গিয়ে বন-জংগলের ভিতরে। এখানে গাছপালার বড় অভাব, যা আছে তাও খুব ছোট। একেবারে দক্ষিণে তালগাছের ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে একটা কেল্লা আর কতকগুলি পুরানো ঘরবাড়ী। গরমকালে এখানে শহুরে লোকদের আনাগোনা হয়ে থাকে। দক্ষিণ দিক্‌টা আর বালু-ভরা সাগরতীর বাদ দিলে সমস্ত দ্বীপটি সবুজ-ঘন মার্ট্‌লের ঝোপঝাড়ে ভর্ত্তি। মার্ট্‌লের ঝোপ আবার এত উঁচু ও ঘন হয় যে তাকে দুর্ভেদ্য জংগলও বলা চলে;—সেখান থেকে ভেসে যায় আকাশ-বাতাসে তার সুগন্ধ।

পূব দিক্ থেকে খুব বেশী দূরে নয় এমন এক ঝোপজংগলের মধ্যে ছোট্ট একখানি ঘর তৈরী করে বাস করছিলেন উইলিয়ম বা উইল। সেখানে দৈবাৎ তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ; আলাপ আস্তে আস্তে পরিণত হ'ল বন্ধুত্বে। ভদ্রলোক বেশ সুশিক্ষিত; বুদ্ধিও ধারাল, কিন্তু বড় ভাবপ্রবণ, অল্পেতেই কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়েন। সব কাজে তাঁর উৎসাহও যেমন, আবার দমেও পড়েন তেমনি চট্ করে। শিকার করা আর মাছ ধরার ভারী শখ ছিল তাঁর। আর একটা বাতিকও তাঁকে পেয়ে বসেছিল,—সেটা হচ্ছে, নানাজাতীয় কীট, পতঙ্গ, সামুদ্রিক খোল ইত্যাদি সংগ্রহ করা। বনে বনে, সাগরপারে তিনি খুঁজে বেড়াতেন সেই সব দুর্লভ জিনিষ। তাঁর অভিযানের সঙ্গী ছিল তাঁর বিশ্বস্ত নিগ্রো চাকর জুপিটার। জুপিটারের বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম হলে কি হবে, মনিবকে দেখাশোনা করবার ভার ছিল তার উপর; তাই সে স্বচ্ছন্দে তার মনিবের অভিভাবক হয়ে উঠেছিল।

সেবার কিন্তু অসম্ভব শীত পড়েছিল। স্যুলিভান দ্বীপে শীতটা বেশী পড়ে না—বছরের শেষে তো কচিৎ চিম্‌নি জ্বালবার দরকার হয়। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে একদিন বনের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চল্লুম উইলের কুটীরের দিকে। আমি তখন থাকতুম চার্লস্‌টনে—ঐ দ্বীপ থেকে ন' মাইল দূরে। কয়েক সপ্তাহ তাঁর সাথে দেখা হয় নি, তাই একবার দেখা করবার ইচ্ছে হ'ল।

পৌঁছে দরজার কড়া নাড়লুম, কিন্তু কেউ কোন সাড়া দিলে না। দরজার চাবি কোথায় থাকত আমি জানতুম। সেই লুকানো জায়গা থেকে চাবিটা নিয়ে

দরজা খুলে ভিতরে গেলুম। ঘরে সুন্দর আগুন জ্বলছিল। ওভারকোট খুলে চেয়ার টেনে নিয়ে আগুনের পাশে গিয়ে বসলুম। ভাবলুম, এ সময়ে চিম্‌নির আগুন, বেশ নূতনত্ব আছে এতে। ওঁদের অপেক্ষায় বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে রইলুম।

অন্ধকার হবার একটু পরে উইল জুপিটারের সাথে ফিরে এলেন। আমাকে দেখে তো দু'জনে খুব খুসি। জুপিটার বিড়বিড় করে কি বলতে বলতে রাত্রের খাবারের ব্যবস্থা করতে গেল।

উইলকে কিন্তু খুব হাসিখুসি বলে বোধ হচ্ছিল। কেন তা তখন বুঝতে পারি নি। পরে বুঝলুম, এত খুসি হবার পেছনে কারণ আছে। সেদিনকার শিকারটা তাঁর খুব মনের মতন হয়েছে,—অদ্ভুত ধরণের একটা পোকা তিনি পেয়েছেন। তাঁর মতে, সে রকম পোকা আগে কখনো দেখা যায় নি। এ সম্পর্কে কাল তিনি আমার মতামত শুনতে চান।

আগুনে হাত সেঁকতে সেঁকতে বললুম, "আজই দেখান না কেন?" মনে মনে পোকা-গুষ্টির শ্রাদ্ধ করতে লাগলুম।

তুমি আসবে জানলে তাঁকে আর ওটা দিতুম না। ফেরবার পথে সেই লেফ্‌টেনান্টের সাথে দেখা, তিনি দেখেই ওটাকে বাড়ী নিয়ে যেতে চাইলেন। সকালের আগে তো তোমাকে ওটা দেখাতে পারছি না। আজ রাত্রিটা থেকে যাও, কাল সকালেই জুপিটারকে পাঠিয়ে ওটা আনাব। এমন সুন্দর পোকা আমি কখনো দেখি নি!"

"কাল সকালে?"

"কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? একেবারে ঝকঝকে সোনালী রংএর—ঠিক একটা বড় বাদামের মত—পিঠের উপর নীচে একদিকে ঘোর কালো দু'টি দাগ—আর একদিকে তার চাইতে একটু বড় দাগ—এর শুঁয়োগুলা......"

বাধা দিয়ে জুপিটার বল্লে—"সোনার পোকা, সাহেব, ওর সবটুকু সোনা। এমন ভারী পোকা আমি জীবনে কখনও দেখি নি।"

জুপিটারের কথা কেড়ে নিয়ে উইল উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্লেন, "সত্যি, ওটার গা দিয়ে যেন জ্যোতিঃ ঠিক্‌রে বেরোচ্ছিল—না দেখলে ঠিক বিশ্বাস করতে পারবে না। যাক, কাল সকালে নিজের চোখে দেখলে সব বুঝতে পারবে। আমি বরং এঁকে তোমাকে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়ে দিই।"

সামান্য একটা পোকাকে নিয়ে এত গদগদ হবার কি আছে বুঝলুম না।

উইল তাঁর টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন। সেখানে কালি-কলম ছিল, কাগজ ছিল না। দেরাজ খুলে কাগজ খুঁজলেন, কিন্তু পেলেন না।

"যাক গে, এতেই হবে" বলে তিনি তাঁর ওয়েষ্ট কোট থেকে এক টুকরো কাগজ টেনে বের করলেন, তার উপর কলম দিয়ে নকৃশা আঁকতে লাগলেন। তিনি যখন এ সব নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন আমি চিম্‌নির পাশে বসে শরীর গরম করছিলুম। আঁকা শেষ করে তিনি কাগজখানা আমার হাতে দিলেন, নিজে সেখানে বসে রইলেন। কাগজখানা হাতে নিতেই বাইরে কুকুরের ডাক শুনতে পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে দরজার উপর আঁচড় কাটবার শব্দ হ'ল। জুপিটার দরজা খুলে দিলে উইলের বিশাল পোষা কুকুরটি ঘরের মধ্যে ঢুকলো, আমার কাঁধের উপর পা তুলে দিয়ে আমায় আদর করতে লাগল। কিছুদিন হ'ল ওর সাথে আমার বেশ ভাব হয়ে গেছে কিনা তাই। তার রঙ্গরস শেষ হ'লে কাগজখানা তুলে লক্ষ্য করে দেখলুম। সত্যি কথা বলতে কি, ছবিটা দেখে অবাক্‌ই হলুম।

খানিকক্ষণ চিন্তা করে বল্লুম—"অদ্ভুত জাতের পোকা বটে! আমার কাছে একেবারে নতুন। মড়ার খুলি ছাড়া আর কিছুর সাথে এর মিল আছে বলে তো মনে হয় না।

উইল অস্ফুট কণ্ঠে বল্লেন—"মড়ার খুলি! তা হ'তে পারে—আঁকাটা দেখে সে রকম একটা কিছু মনে হতে পারে। উপরের দিকের কালো দাগ দু'টো চোখ বলে মনে হয়, তার নীচের লম্বা দাগটা অনেকটা মুখের মত, গঠনটা ঠিক ডিমের মতন।"

আমি বল্লুম—"তা হবে; আপনার কিন্তু আঁকবার হাত নেই। যাই হোক, পোকাটাকে না দেখে এর আকার সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে পারছি নে।"

তিনি একটু দুঃখিত হয়ে বল্লেন—"কি জানি, আমি তো ভাবতুম আমি বুঝি ভালই আঁকতে পারি।"

আমি হেসে বল্লুম—"আপনি বোধ হয় আমার সাথে ঠাট্টা করছেন, নইলে একটা খুলির নকৃশা আঁকলেন কেন? পোকাটা যদি সত্যি খুলির মত হয়, তা হ'লে বলতে হবে পৃথিবীর মধ্যে এটা একটা অতি অদ্ভুত ধরণের পোকা। শুঁয়োগুলো তো দেখতে পাচ্ছি নে!"

উত্তেজিত হয়ে উইল বল্লেন—"শুঁয়ো! নিশ্চয় আছে। বেশ পরিষ্কার করেই—হুবহু আসল পোকাটার মত করে সে অংশটা এঁকেছি।"

অবাক্ হয়ে বল্লুম—"আপনি হয়তো এঁকেছেন; কিন্তু আমার চোখে তো পড়ছে না!"

আর কোন কথা না বলে কাগজখানা তাঁকে ফিরিয়ে দিলুম; তিনি বিরক্ত হয়েছেন, লক্ষ্য করলুম। অবাক্ হয়ে ভাবলুম ব্যাপারটা কেমন করে অন্য দিকে ঘুরে গেল। কিন্তু ওঁর বিরক্তির কোন কারণ খুঁজে পেলুম না। তবে এ কথা ঠিক যে তাঁর আঁকা নক্শাতে শুঁয়োর চিহ্ন মাত্র ছিল না, আর সেটাকে একটা খুলির নক্শা বললেও ভুল হয় না।

তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে আমার হাত থেকে কাগজখানা ফিরিয়ে নিলেন; মুচড়িয়ে সেটাকে অগুনের মধ্যে ফেলতে যাবেন এমন সময় ছবিটির উপর নজর পড়তেই তিনি একদৃষ্টে সেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মুখখানা লাল হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছাইএর মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। (ক্রমশঃ)

চৌকস খেলোয়াড়

শ্রীঅমলকুমার মিত্র

আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, জীবনের একটি মাত্র ক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভ করবার জন্যই সকলে আগ্রহশীল। খেলাধূলার বেলাতেও এর ব্যতিক্রম নেই। আজকালকার খেলোয়াড়দের লক্ষ্য হচ্ছে, একই বিভাগে খ্যাতি ও নৈপুণ্য অর্জ্জন করা। যেমন ধর, ক্রিকেট খেলোয়াড়দের লক্ষ্য হচ্ছে—হয় ভাল ব্যাটিং করব, নয় ভাল বোলিং করব। আগে কিন্তু খেলোয়াড়দের মনে ব্যাটিং, বোলিং আর ফিল্ডিং—তিনটি বিভাগেই ভাল ফল প্রদর্শন করবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল। যেদিন থেকে আমেরিকা খেলাধূলার ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ সম্মান অর্জ্জনের অধিকারী হয়েছে

সেদিন থেকে খেলোয়াড়দের মনে কোনও এক বিশেষ বিভাগে পারদর্শিতা লাভ করবার ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে।

বিশেষ বিভাগে পারদর্শিতা অর্জ্জন করা হ'ল ব্যক্তিগত ব্যাপার। যাঁরা খেলাধূলার মাধ্যমে জীবিকা অর্জ্জন করেন, কিংবা যাঁরা জগৎ-জোড়া নাম রেখে যেতে চান, কেবল তাঁদের পক্ষেই এইরূপ পারদর্শিতা শোভা পায়। দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করলে মনে হয় এতে দেশের বৃহত্তর কল্যাণের মর্য্যাদা নষ্ট হ'তে পারে। চৌকস খেলোয়াড় হতে পারেন অনেকের মধ্যে একজন। এখন, যদি সকলেই মনে করেন, "আমি ভাল ব্যাট্সম্যান হব, বোলিং করতে কিন্তু পারব না," তা হলেই ব্যাপারটি হয় হাস্য-উদ্দীপক। কেবল রান্ তুললেই তো আর পলাশী জিতে যাওয়া যাবে না, বিপক্ষের দলকে বোলিংএর মারপ্যাচে কাবু করে ফেলাও তো দরকার।

সি. কে. নাইডু

জীবিকার জন্য কোন এক বিশেষ খেলায় ব্যুৎপত্তি দেখানকে অবশ্যি দোষের বলা যায় না। টেনিস খেলায় যাঁরা নাম করেছেন সেই সব আমেরিকান্ খেলোয়াড়দের বেশীর ভাগই পেশাদারী খেলোয়াড়। যেমন ধর, ডোনাল্ড বাজ, ববি রিগস্, ক্র্যামার আর রিচার্ড গঞ্জেলিস।

সব বিষয়ে পারদর্শী খেলোয়াড়ের যে অভাব হয়েছে, এ কথা আজ আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আগের দিনে চৌকস খেলোয়াড়ের অভাব ছিল না, এবং একজন খেলোয়াড়ই হকি, টেনিস, ফুটবল, ক্রিকেটে সাফল্য অর্জ্জন করছেন, এ কথা শোনা যেত। কিন্তু আজ সব দেশই আমেরিকার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাফল্য অর্জ্জন করতে চায়, আর তা করতে হলে চাই কোনও একটি বিশেষ খেলায় বিশেষ পারদর্শী একজন খেলোয়াড়। নানা বিষয়ে চৌকস খেলোয়াড় আর আসবে কোথা থেকে তা হ'লে?

গত মহাযুদ্ধের আগেই আমরা অধিকাংশ চৌকস খেলোয়াড়ের দেখা পাই। অক্সফোর্ড আর কেম্ব্রিজের এই দিক্ দিয়ে খুব নাম-ডাক ছিল। ভারতবর্ষের অনেক স্কুল-কলেজেও খেলাধূলার চর্চ্চা করা হ'ত। বিদেশী খেলারও সমাদর ছিল খুব; আর সেই জন্যই আমরা দেখতে পাই একসঙ্গে হকি, টেনিস, ফুটবল আর ক্রিকেটে অনেক ভারতীয় খেলোয়াড় সুনাম অর্জ্জন করেছেন। সর্ব্ব বিষয়ে পারদর্শী কোনও খেলোয়াড়ের নাম উল্লেখ করতে হলে আমি করব কর্ণেল সি, কে, নাইডুর নাম সর্ব্বাগ্রে। তাঁকে যদি বলা হয় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ "অল-রাউণ্ডার" তা হ'লেও বোধ হয় অতিরঞ্জিত করা হবে না। অবশ্যি ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত হন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে উইসডেন বলেছিলেন—"আমার মতে মিঃ নাইডু পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চার জন

ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মধ্যে আসন পেতে পারেন।" ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি যে ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রকাশ করেন বোম্বাইএর অধিবাসীরা সে কথা কোনদিন বিস্মৃত হতে পারবেন না। সে দিনের খেলায় তিনি ১৩টি ওভার বাউণ্ডারী করেছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় তিনি ছয় ফুট হাইজাম্প দিতে পারতেন এবং হার্ডল্‌স্‌, ১০০ গজ স্প্রিন্টিং ইত্যাদিতেও চ্যাম্পিয়ন্‌ ছিলেন। বন্দুকের গুলিতে লক্ষ্য ভেদ করতে তিনি ওস্তাদ। হকি, টেনিস, টেবিল-টেনিস, ঘোড়া ছোটান আর বিলিয়ার্ড সএ তাঁর সমকক্ষ খুব কম খেলোয়াড়ই আছেন।

আজকাল সকলের পক্ষে সব বিষয়ে পারদর্শী হওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ; দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে স্বাস্থ্যের প্রতি অমনোযোগ। ভাল খেলোয়াড় হতে হলে স্বাভাবিক খেলবার শক্তি ছাড়াও, শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা প্রয়োজন। শৈশবাবস্থায় যার এ দু'টি গুণ আছে, তাকে আলাদা করে বেছে নিয়ে "স্পেশাল ট্রেনিং" দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই সঙ্গে ভাল ভাল খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবারও সুযোগ তাকে দেওয়া দরকার ; এতে সে নিজের দোষ-ত্রুটী লক্ষ্য করতে পারবে, আর তার মধ্যে আরও উন্নতি করবার মনোভাব জেগে উঠবে। অনেক সময়েই অনেক খ্যাতনামা বৈদেশিক খেলোয়াড়কে মন্তব্য করতে শোনা যায়—"ভারতীয় খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-নৈপুণ্য আমাদের সমান সমান, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে বেশী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ খেলায় তারা পরাজিত হয় কারণ তাদের দম খুব কম। আর শেষের দিকে জয়ী হবার ঐকান্তিক মনোভাবের একান্ত অভাব।"

এ ছাড়া আর একটি জিনিষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। সেটি হ'ল চরিত্র। অনেক নাম-করা খেলোয়াড় কেবল মাত্র এই গুণটির অভাবে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করেন। খেলোয়াড়ী মনোভাব যার নেই তার খেলোয়াড় হতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আর শিক্ষার কথা বোধ হয় না বললেও চলে। শিক্ষা বলতে বড় বড় উপাধি লাভের কথা বলছি না, যে শিক্ষার দ্বারা খেলোয়াড়েরা ভাল-মন্দ বুঝতে শিখবেন, ন্যায় ও অন্যায় চিনতে শিখবেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করতে শিখবেন তারই কথা বলছি।

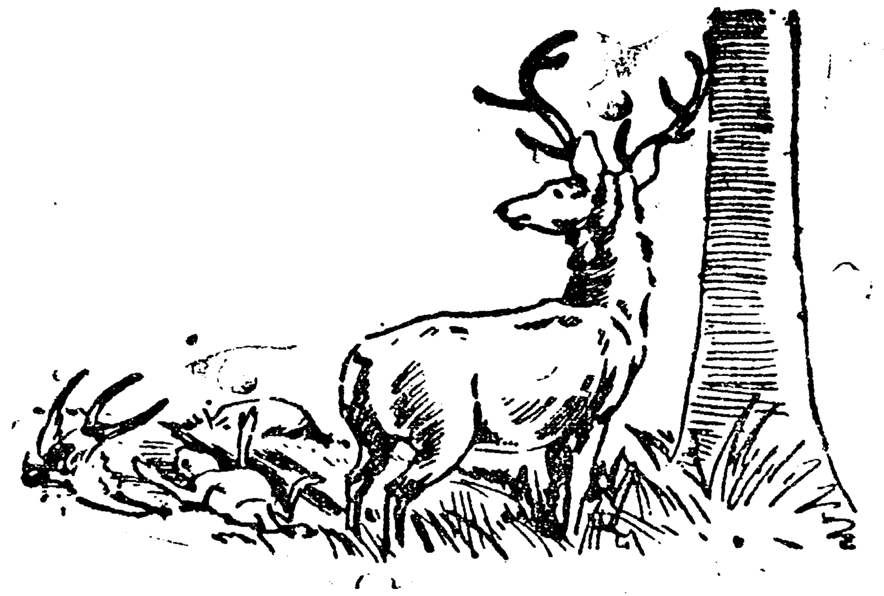

পরলোকে শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্রনাথ আর নেই। সম্প্রতি কলকাতার উপকণ্ঠে বরাহনগরের 'গুপ্তনিবাসে' ৮১ বছর বয়সে তাঁর জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে একটা যুগের অবসান হ'ল বলা যেতে পারে।

যোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারে অবনীন্দ্রনাথের জন্ম হয় হয়। তাঁর বাবা গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইএর ছেলে। অর্থাৎ সেই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ হলেন তাঁর কাকা। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর হচ্ছেন অবনীন্দ্রনাথের বড় ভাই।

যোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারের কথা তোমরা সবাই জান। শিক্ষা,, সাহিত্য, চারুকলা—নানা দিক্‌ দিয়ে আধুনিক বাংলাকে গড়ে তুলতে এই পরিবারের দান অসামান্য বলা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে এমন কয়েকজনের নাম করা যেতে পারে যাঁদের নাম শুধু বাংলায় নয়, ভারতে নয়—পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশে সুপরিচিত। বাংলাকে এই আন্তর্জাতিক আসনে যাঁরা বসিয়ে গেছেন অবনীন্দ্রনাথও তাঁদের একজন। এমন কি মহাকবি রবীন্দ্রনাথের নাম যখন পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ভাল ক'রে প্রচারিত হয় নি তখনও অবনীন্দ্রনাথের নাম ওদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের চাইতে বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও।

বিশিষ্ট ধনী এবং প্রতিভাশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করবার ফলে অবনীন্দ্রনাথ অল্প বয়স থেকেই নানা কলাবিদ্যা শিখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু চিত্র-শিল্পের দিকেই তাঁর বিশেষ রকম ঝোঁক দেখা যায়। সে সময়ে এ দেশের শিল্পীদের আদর্শ ছিল বিলেতী শিল্পীদের আঁকা ছবি—অবনীন্দ্রনাথও গোড়াতে তাই নিয়েই হাত পাকান। কিন্তু শীগ্‌গিরই তিনি অনুভব করলেন এ ভাবে বিদেশের অনুকরণ

না করে আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পকলার পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন। তাঁর তূলির মোড় ফিরল—খাঁটী ভারতীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকা সুরু করলেন তিনি। ফলে ভারতের এক হারিয়ে-যাওয়া আশ্চর্য্য সুন্দর শিল্পের পুনরাবির্ভাব হ'ল। দেশবিদেশের গুণীরা মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগল তাই। অবনীন্দ্রনাথ শুধু নিজেই এই রকম ছবি এঁকে ক্ষান্ত হ'লেন না, এর প্রচারে মন দিলেন। ফলে তাঁর হাতে তৈরী হ'ল দক্ষ একদল শিল্পী—যাঁরা বিশ্বের দরবারে ভারতীয় চিত্রকলার মাধুর্য্য প্রকাশে সক্ষম হলেন। এঁদের মধ্যে নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার, মুকুল দে, সারদাচরণ উকীল এবং আরও অনেক শিল্পীর নাম করা যেতে পারে।

কিন্তু চিত্রশিল্পে বিশ্বযোড়া খ্যাতি অর্জ্জন করলেও শুধু তাইতেই অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলা সাহিত্যেও তাঁর দান বড় কম নয়। বিশেষ ক'রে বাংলা শিশুসাহিত্যে তাঁর দান অতুলনীয় বলা চলে। তাঁর লেখা রাজকাহিনী, শকুন্তলা, নালক, ভূতপত্রীর দেশ, ক্ষীরের পুতুল, বুড়ো আংলা প্রভৃতি বই তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ। খাতাঞ্জীর খাতা, মারুতির পুঁথি প্রভৃতি আরও কতকগুলি সুন্দর সুন্দর বই তিনি লিখে গেছেন—যেগুলি এখন পুস্তকাকারে পাওয়া যায় না। শিশুসাহিত্য-পরিষদ্ থেকে বাংলার শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিকদের ভুবনেশ্বরী পদক নামে প্রতি বছর একটি ক'রে স্বর্ণপদক দেবার ব্যবস্থা হয়েছে সে খবর তোমরা জান। এই পদক সর্ব্বপ্রথম দেওয়া হয় অবনীন্দ্রনাথকে।

ব্যক্তিগত ভাবে অবনীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে যারা এসেছে তারাই জানে কি রকম সাদাসিধে, দিল-খোলা মানুষ ছিলেন তিনি! গল্প করতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল। তাঁর লেখা 'ঘরোয়া' আর 'যোড়াসাঁকোর ধারে' নামে দু'খানা আত্মচরিত পড়লেই এর পরিচয় পাওয়া যায়। অচেনাকে মুহূর্ত্তে আপনার করে নেবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ মিশলেই তাঁকে ভাল না বেসে থাকা যেত না।

পরিণত বয়সে তাঁর একটা নতুন ধরণের খেয়াল হ'ল। যত রাজ্যের ফেলে-দেওয়া কাঠকুটো, ডালপালা যোগাড় করে তা দিয়ে তিনি চমৎকার সব খেলনা তৈরী করতেন। এর নাম দিয়েছিলেন তিনি 'কাটুম কুটুম'। সৃষ্টিছাড়া সব পুতুল, কিন্তু তার মধ্যে তাঁর শিল্পী-মনের যে ছাপ থেকে যেত তা হ'ত অনবদ্য। এ পুতুল একটি যারা তাঁর কাছ থেকে উপহার পেয়েছে তারা নিজেকে পরম ভাগ্যবান্ ব'লে মনে করে।

কিছু দিন থেকেই অবনীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের পর তিনি বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ হয়েছিলেন কিন্তু তাও বেশী দিন থাকা সম্ভব হয় নি স্বাস্থ্যের জন্য। ইদানীং তিনি বাইরে বড় একটা বেরোতে পারতেন না। তূলি বা কলম চালাবার শক্তিও চলে গিয়েছিল, কিন্তু গল্প করতেন খুব, এবং মাঝে মাঝে মুখে মুখে বলে যেতেন, অপরে তা লিখে নিত। এই সেদিনও তাঁর জন্মদিনে সবাই তাঁর বাড়ী গিয়ে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করে এসেছে, তখন কে জানত এত শীঘ্র তিনি চলে যাবেন?

মানুষ চিরকাল থাকে না। অবনীন্দ্রনাথ যা রেখে গেছেন সংস্কৃতির ইতিহাসে তাতেই তাঁর নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। তবু তাঁর এই তিরোধানে একটা বিশেষ যুগের অবসান হয়ে গেল এ কথা মনে হ'লে মনটা সহজেই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

"প্রবীণ প্রাচীন চীন"

সম্প্রতি চীন থেকে একটি সাংস্কৃতিক মিশনের ভারতবর্ষে আগমনের কথা তোমরা নিশ্চয়ই কাগজে পড়েছ। যাবার পথে এবং ফিরবার পথে এই দল কলকাতায় ঘুরে গেছেন সে খবরও হয়তো জান। তা ছাড়া এঁরা রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনেও গিয়েছিলেন। এই দলে চীনের নাম-করা সাহিত্যিক, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, রাজনীতিক, সাংবাদিক প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এঁদের নেতাকে সম্মানসূচক ডক্টর উপাধি দেন।

এর কিছু আগে আমাদের দেশ থেকেও একটি সাংস্কৃতিক মিশন চীন সরকারের আমন্ত্রণে চীনে গিয়েছিলেন। এই দলে অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালীও ছিলেন।

কিন্তু আসলে চীনের সঙ্গে এ দেশের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান আজকের ব্যাপার নয়। সম্রাট্ কনিষ্কের সময়েও চীনা পরিব্রাজকেরা এদেশে আসতেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তার পর আরও অনেকে এসেছিলেন। এ রকম কম ক'রে পঞ্চাশ জন প্রাচীন চীনা পরিব্রাজকের কথা জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ফাহিয়ান আর ইয়াং চাঙের নাম তোমরা সকলেই বোধ হয় জান। এরা তাঁদের ভ্রমণ-কাহিনীতে তাঁদের সময়কার ভারতবর্ষের যে বর্ণনা দিয়ে গেছেন এদেশের ইতিহাস রচনায় আজও তা পরম মূল্যবান্ তথ্য বলে মনে করা হয়।

ফাহিয়ান প্রায় ১৪ বছর ভারতে ছিলেন (৩৯৯-৪১৩ খৃঃ)। তখন ২য় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল। মথুরা নগর সম্বন্ধে তাঁর দেওয়া বিবরণ থেকে এখানে একটু তুলে দিচ্ছি :

'এখানে যমুনার ধারে ২০টি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম আছে। সেখানে প্রায় তিন হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ বাস করেন। এই শ্রমণদের এখানে খুবই সম্মান। রাজারাও এঁদের খুব শ্রদ্ধা করেন।

'মথুরা খুব সমৃদ্ধিশালী জায়গা—এখানকার প্রজারাও ভারী সুখে আছে। বেশীর ভাগ লোকই কৃষিকাজ ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করে—শস্য দিয়েই রাজাকে খাজনা দেয়। খাজনা খুব কম—বাড়ীঘরের জন্য কোনও খাজনা দিতে হয় না। এখানে অপরাধের সংখ্যা এত কম যে পারতপক্ষে লোককে রাজদ্বারে যেতে হয় না। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা আছে অন্য শাস্তি বড় নেই। শুধু রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ডান হাত কেটে দেওয়া হয়। এখানে জীবহত্যা নেই বললেই হয়। শূয়োর, মুরগী প্রভৃতি কেউ খায় না, পোষেও না—এক চণ্ডালেরা ছাড়া। কিন্তু তারা সহরের বাইরে পৃথক্ পল্লীতে বাস করে। তারা যখন সহরে আসে তখন একটুকরো কাঠ নিয়ে শব্দ করতে করতে সকলকে সতর্ক করতে করতে ঢোকে। সাধারণ লোক কোন মাদক দ্রব্য—এমন কি পেঁয়াজ-রশুনও খায় না।'

ইয়াং চাঙ ভারতে ছিলেন ৬২৯ থেকে ৬৪৫ খৃঃ পর্য্যন্ত। তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীও খুব তথ্যবহুল।

শুধু চীনা পরিব্রাজকেরাই যে ভারতে অসতেন তা নয়, ভারতীয় পণ্ডিতেরাও অনেকে চীন দেশে যেতেন। গুপ্ত যুগে পরমার্থ নামে একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত ওদেশে গিয়ে নানা বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ক্যান্টনে তাঁর মৃত্যু হয়। বোধিধর্ম্ম নামে আর একজন বৌদ্ধ রাজকুমারও চীনের ক্যান্টন, লোয়াং প্রভৃতি জায়গায় গিয়ে প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করেন। এই রকম আরও অনেক পণ্ডিতের নাম্ করা যেতে পারে।

কাচের কথা

এমন অনেক জিনিষ আছে পৃথিবীর সভ্যতার মূলে যার দানকে বলা যেতে পারে অসামান্য অথচ তাদের কথা আমাদের মনেও আসে না। এই রকম একটি জিনিষ হচ্ছে 'কাচ'। অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি যন্ত্র থেকে শুরু ক'রে কত রকম রাসায়নিক যন্ত্রপাতিতে যে এই কাচ নিত্য ব্যবহার করা হচ্ছে তার হিসেব দেবে কে? এই সব কাচের যন্ত্রপাতি না থাকলে বিজ্ঞানের

বড় বড় আবিষ্কারের কতগুলি সম্ভব হ'ত তা বলা কঠিন। এদিক দিয়ে ধরতে গেলে কাচকে মানুষের এক মহা উপকারী বন্ধু বলতে হবে।

সাধারণতঃ যে রকম কাচের সঙ্গে আমরা পরিচিত আধুনিক যুগের সব কাচই সে জাতের নয়। কাচ নিয়েও বিজ্ঞানীরা কম গবেষণা করছেন না,—যার ফলে আমরা নানা আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাচের সন্ধান পাচ্ছি। অভঙ্গুর কাচ,—যা হাতুড়ী দিয়ে পেটালেও ভাঙ্গে না তার কথা তোমরা রামধনুতেই পড়েছ। এমন কাচও আবিষ্কৃত হয়েছে যার পাত নিয়ে শূন্য থেকে ঝুলিয়ে, তার ওপর তিন তিনটে হাতী চাপিয়ে দেখা গেছে সে কাচের কিছুই হচ্ছে না।

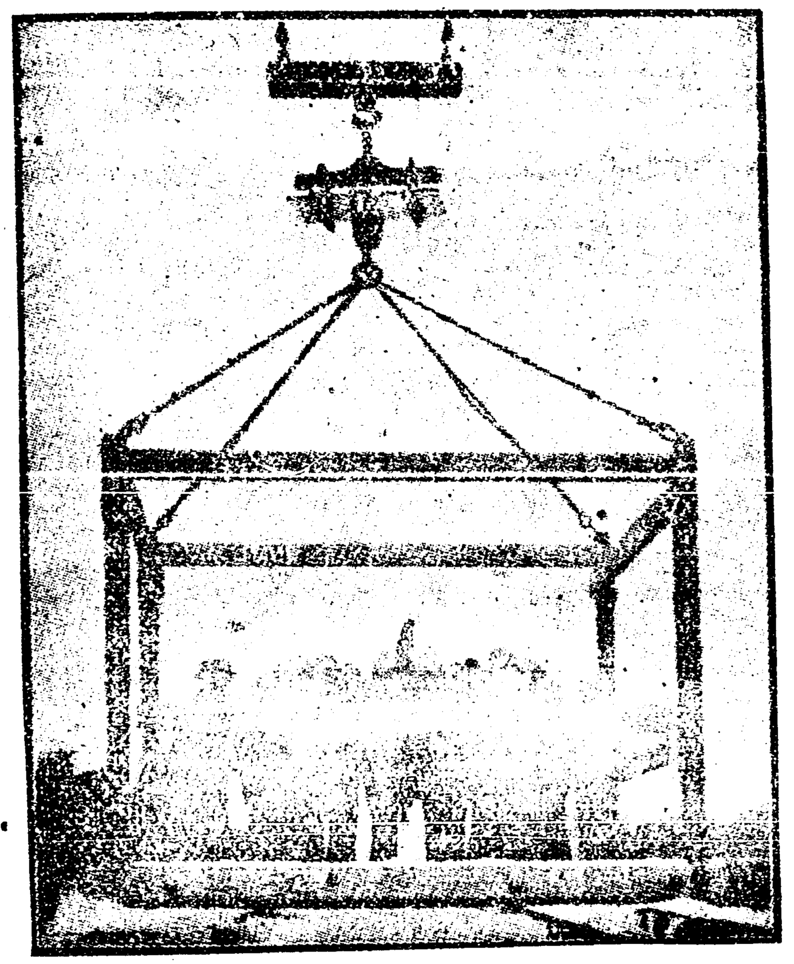

কাচের শক্তি পরীক্ষা

কিছু দিন আগে বিজ্ঞানীরা এমন এক রকম কাচের সুতো আবিষ্কার করেছেন যা রেশমের মত নরম কিন্তু ধাতুর তারের মত শক্ত। এই সুতো অস্ত্রচিকিৎসায় ক্ষতস্থান সেলাই করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। তা ছাড়া ঐ ধরণের কাচের সুতো দিয়ে চেয়ারের গদী, ঘরের পর্দা ইত্যাদিও তৈরী হচ্ছে। এক রকম কাচের ইট বেরিয়েছে যা দিয়ে ঠাণ্ডার দেশে ঘর-বাড়ী তৈরী করলে তা নাকি হবে অত্যন্ত মজবুত আর বাইরের শীত আটকাবার পক্ষে আদর্শ। আইসল্যাণ্ডে এই রকম্ কাচের তৈরী বাড়ী ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে গেছে।

ঈগলের ক্ষিদে

তোমরা ছেলেবেলায় পড়েছ, "ঈগল পাখী পাখীর রাজা" রাজা হোক্ আর নাই হোক, ঈগল পাখী যে খুব জাঁদরেল পাখী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হিংস্রও সে বড় কম নয়। হরিণ, ছাগল, ভেড়া যা পায় তাই সে শিকার ক'রে খায়। যেমন ধারাল তার ঠোঁট, তেমনি শক্তি তার গায়ে। কোন কোন ঈগল আকারেও দিব্যি বড় হয়। একবার একদল শিকারী ফাঁদ পেতে একটা ঈগল ধরেছিল। সেটি লম্বায় ছিল প্রায় সাড়ে তিন ফুট, আর তার এক একটা পাখা (টান ক'রে ধরলে) ৮ ফুট। ঠোঁটটা ছিল ইস্পাতের মত শক্ত।

একে মাংসাশী প্রাণী, গায়েও বেশ জোর আছে, আর শরীরখানাও নেহাৎ ছোট নয়;

কাজেই ঈগলের খিদেও যে বেশ ভাল রকমই হবে এতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু শরীরের তুলনায় খিদেটা যেন একটু বেশী।

বাক্‌ল্যাণ্ড নামে এক সাহেব অক্সফোর্ডে থাকতেন। তিনি একবার একটি ঈগল পুষেছিলেন। ঈগলটি ছিল সামুদ্রিক ঈগল। সামুদ্রিক ঈগল বললে অবশ্যি মনে ক'র না তারা সমুদ্রের মধ্যেই থাকে। এরা সমুদ্রের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, আর প্রধানতঃ সামুদ্রিক মাছ আর অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী খেয়েই জীবন ধারণ করে। যাই হোক, বাক্‌ল্যাণ্ডের ঈগলটি সামুদ্রিক হ'লেও ডাঙ্গার প্রাণীদের ওপরও তার কিছুমাত্র বিরাগ ছিল না এবং এর খাবার যোগাড় করতে বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেবকে অনেক সময় বেশ বিব্রত হ'তে হ'ত।

একদিন, ঈগলটা সময়মত খাবার পায় নি, সাহেবও গেছেন ভুলে। দুপুর রাত্রে হঠাৎ প্রবল চীৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। ছুটে এসে দেখেন, ঈগল তাঁর পোষা বানরটিকে ধরে কড়মড় ক'রে চিবিয়ে খাচ্ছে।

বানর খেয়ে ঈগলটার লোভ গেল বেড়ে। সুবিধে পেলেই সে এটা ওটা ধরে গিলে ফেলত। তার ভয়ে বেড়াল, খরগোস, কাঠবেড়ালী—কোন প্রাণীই আর সে বাড়ীর ধারে-কাছে আসতে চাইত না। একদিন ঈগলটা কাছাকাছি কিছু খুঁজে না পেয়ে বাক্‌ল্যাণ্ডের পোষা কুকুরটার ঘাড়েই লাফিয়ে পড়ল। কুকুরটা দিব্যি লেজ গুটিয়ে শুয়েছিল, হঠাৎ ঘাড়ের ওপর মূর্ত্তিমান্ যমের আবির্ভাবে সে পরিত্রাহী চীৎকার যুড়ে দিল। সৌভাগ্য ক্রমে সাহেব সেদিন কাছেই ছিলেন; তিনি দৌড়ে এসে ঈগলের হাত থেকে কুকুরটিকে রক্ষা করলেন। কিন্তু ততক্ষণে ঈগল তার ঘাড়ের অনেকখানি মাংস খুবলে খেয়ে নিয়েছে।

অবশেষে সেই ঈগল একদিন শিকল ছিঁড়ে গেল পালিয়ে। সবাই পড়ল দুর্ভাবনায়। শুধু ঈগলটির জন্য নয়, সহরের মধ্যে কখন কার বাড়ী গিয়ে উপদ্রব করবে সেই ভাবনায়। বাক্‌ল্যাণ্ড বললেন, "কিছু ভেব না, ও পেটুককে আমি ঠিক ফিরিয়ে আনব।" তিনি, ঈগলটা যেখানে থাকত সেখানে, একটা লাঠি পুঁতে তার আগায় একটা মুরগী বেঁধে রাখলেন।

সন্ধ্যের দিকে হঠাৎ শোনা গেল বাতাসে শোঁ শোঁ আওয়াজ। বাক্‌ল্যাণ্ড উঁকি মেরে দেখেন, ঈগল ঠিক ফিরে এসেছে এবং লাঠির ডগায় বসে মুরগীটিকে দিয়ে জলযোগের ব্যবস্থা করছে। বহু দূরে চলে গেলেও মুরগীর লোভনীয় গন্ধ তাকে আবার সেখানে টেনে এনেছে। বাক্‌ল্যাণ্ড তৈরীই ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট ত্রিপল নিয়ে দিলেন ঈগলের ঘাড়ে চাপিয়ে। আচমকা ফাঁদে পড়ে ঈগল আর পালাতে পারল না।

তার পর? তার পর ও চীজ্ আর কেউ বাড়ীতে রাখে? সেই দিনই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল লণ্ডনের চিড়িয়াখানায়।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

(গ্রাহক-গ্রাহিকার লেখা)

মা

কুমারী প্রকৃতি পণ্ডিত

এক ঝলক মিষ্টি রোদ লুটিয়ে পড়েছে পাহাড়ী পথে। হাটের দিন, পাহাড়ী মেয়েরা ঝুড়িতে করে জিনিষপত্র নিয়ে বিক্রি করতে চলেছে হাটে।

রোদ-ঝলমল ঝর্ণাটার পাশে বসেছিল একদল কুলী মেয়ে ও পুরুষ। তাদের মাঝে বাসে ছিল ধনমায়া। স্থানীয় এঞ্জিনীয়ার দীপক বাবু চলেছেন হাটে, স্ত্রী ও ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে। এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ধনমায়া ছেলেটির দিকে। রণবাহাদুর না? হ্যাঁ, তাই তো।—না না, এ যে বাঙ্গালীর ছেলে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য!

দৌড়ে যায় ধনমায়া দীপক বাবুদের সামনে। "কুলী চাই?" রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করে সে।

"না, আমাদের সঙ্গে চাকর আছে।" বলেন চন্দ্রা দেবী।

"পয়সা চাই না মা।" কাতর ভাবে বলে ধনমায়া।

"পাগল নাকি?" পাশ কাটিয়ে চলে যান চন্দ্রা দেবী বিরক্ত মুখে।

ধনমায়া কিন্তু ছায়ার মত তাঁদের অনুসরণ করে। দীপক বাবুরা হঠাৎ পথে এক বন্ধুকে দেখে দাঁড়িয়ে যান, তারপর কথাবার্ত্তায় মশগুল হয়ে পড়েন। এই সুযোগে মার হাত ছাড়িয়ে ছেলেটি ছুটে আসে অদূরবর্ত্তী বিহ্বল ধনমায়ার কাছে। কচি গলায় হাজার প্রশ্ন করে। —"তোমার ঝুড়িতে কি? তোমার বাড়ী কোথায়? এমন নোংরা কাপড় পরেছ কেন? বল না—?"

ধনমায়া আর সামলাতে পারে না নিজেকে—নিমেষে তাকে কোলে নিয়ে হাজার চুমোয় মুখটা ভরে দিয়ে কেঁদে ওঠে।

ততক্ষণে ছেলেটির খোঁজ পড়েছে। ওই যে! কিন্তু কি সাহস মেয়েটার! ওই নোংরা কাপড়ে বাবুলকে কোলে নিয়েছে!” ধনমায়া ভগ্নস্বরে বলে—“মাপ করুন মা, এই খোকার মত সুন্দর ছেলে আমার, আজ ক'মাস হ'ল— ওঃ!” ভেঙ্গে পড়ে সে।

“ন্যাকামি!” ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যান চন্দ্রা দেবী।

ধনমায়ার অশ্রুধারায় সবুজ ঘাসগুলো আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বল্‌তে পার কে ?

শ্রীঅরুণ পোদ্দার

অঙ্কের ক্লাস।

সবার বুকের মধ্যেই টিপ্ টিপ্ করতে লাগলো। শিক্ষক মশাই ক্লাসে ঢুকে সকলকে ‘বাড়ীর কাজ’ দেখাতে বল্‌লেন।

একে একে অনেকেরই খাতা দেখা হ'য়ে গেল। কিন্তু কারো অঙ্ক দেখেই তিনি সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। কারণ অঙ্ক খুব কঠিন ছিল, তাই কারুরই অঙ্ক শুদ্ধ হয় নি।

এবার আর একটি ছেলের ডাক পড়লো, তার অঙ্ক দেখে তিনি একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তারপর সন্তুষ্ট হ'য়ে ছেলেটিকে বল্‌লেন, “তোমার অঙ্ক শুদ্ধ হয়েছে। তুমি সবার উপরে গিয়ে বস।”

কিন্তু আশ্চর্য্য, ছেলেটি গর্ব্বভরে তার যোগ্যাসন অধিকার করা দূরে থাক্, সেখান থেকে নড়লও না। তার মুখ কালো হ'য়ে গেল, গলা শুকিয়ে এল।

শিক্ষক মশাই সপ্রশ্ন নেত্রে তাকালেন। ছেলেটি কাঁদ কাঁদ স্বরে বল্‌লে, “স্যর, আমি নিজে এ অঙ্ক ক'রতে পারি নি। কাল একজন ক'ষে দিয়েছিলেন। অতএব সবার উপরে বসবার অধিকার আমার নেই।”

ছেলেটির এই সত্যবাদিতার পরিচয় পেয়ে শিক্ষক মশাই তো অবাক্! তিনি সস্নেহে তাকে কোলে টেনে নিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রলেন।

বল্‌তে পার এই ছেলেটি কে ?

এই ছেলেটিই পরবর্ত্তী জীবনে গোপালকৃষ্ণ গোখেল এই নামে ভারতমাতার মুখ উজ্জ্বল ক'রেছিলেন।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

বাৎসরিক পরীক্ষার পর এখন তোমাদের অনেকেরই অফুরন্ত ছুটী,— কেবল যারা স্কুল ফাইনাল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোন পরীক্ষা দেবে তাদের ছাড়া। এ সময় রামধনু দেরীতে পেলে মনের ভাব কি রকম হয় তা কিছুটা আন্দাজ করতে পারি যখন আমাদের ছেলেবেলাকার দিনগুলির কথা মনে পড়ে। কিন্তু উপায় ছিল না। ছাপাখানার বিভ্রাটের জন্য এই অহেতুক বিলম্ব তা হয়তো বুঝতে পারছ। ঠিক এক সংখ্যায় না পারলেও এই দেরী আস্তে আস্তে (২।১ মাসের মধ্যেই) শুধরে নেওয়া যাবে এ ভরসা আমাদের আছে।

তোমাদের অনেক চিঠি ইতিমধ্যে আমার টেবিলে এসে জড় হয়েছে। এবারে সাধ্যমত তার জবাব দেই।

শ্রীবিজলী সরকার.(শ্যামপুর)— তোমাদের পারিবারিক দুর্ঘটনার কথা পড়ে মর্ম্মাহত হলাম। তোমাদেরই বাড়ীর পোষা য়্যাল্‌সেশিয়ান্ কুকুর তোমার স্বামী, ভাসুর এবং একটী চাকরকে কামড়েছে এবং সময় মত ইন্‌জেক্‌শান্ করা সত্বেও শেষের দু'জন একমাসের মধ্যে প্রাণ হারিয়েছেন এ কথা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ভগবান্ তোমার স্বামীকে সুস্থ করে তুলেছেন জেনে কতকটা শান্তি পেলাম। যারা কুকুর পোষে তারা এ থেকে সাবধান হবে আশা করি। পোষা কুকুর পাগল হ'লে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হ'তে না পারলে অনেক অঘটনই ঘটতে পারে। পোষ্টকার্ডে ধাঁধার উত্তর পাঠাতে কোনই আপত্তি নেই, বরঞ্চ অনর্থক অপব্যয় না ক'রে সেই ভাবেই পাঠানো উচিত। শ্রীশম্ভুনাথ সিংহ (বর্দ্ধমান)—সময় মত ঠিকানা পরিবর্ত্তনের কথা জানিয়ে দিলে কোন গোলমালই হ'ত না। যাই হোক অতিরিক্ত সংখ্যা বুকপোষ্টে পাঠান হয়েছে, আশা করি পেয়েছ। তুমি যে ঠিকানা চেয়েছ তার জন্য C/0. রামধনু কার্য্যালয়—এই নামে পোষ্টকার্ডেচিঠি দিও, আমরা তা যথাস্থানে রি-ডাইরেক্ট করে দেব। শ্রীরুণু বসু (কাঁচড়াপাড়া)—তোমার দেশ-ভ্রমণের কাহিনী শুনে যা হিংসে হচ্ছে! একেবারে রামেশ্বর আর কন্যাকুমারী!

আরও বিশদভাবে গুছিয়ে লিখলে তোমার রামধনুর অন্যান্য ভাইবোনেদেরও উপহার দেওয়া যেত। শ্রীরত্না রায় (বাঁকীপুর)—তোমার বোন স্বপ্না শুধু অভিনয় আর গানেই পটু নয়, ক্লাসেও প্রথম হয়ে পুরস্কার পেয়েছে এ খবরে বাস্তবিকই খুব খুসী হ'লাম। সমস্ত য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ আর পাঞ্জাবী-বিহারীর মধ্যে মাত্র ৫টি বাঙ্গালী মেয়ে, আর তারাই ১ম ও ২য় হয়েছে এ খবরও বাঙ্গালীদের কাছে ভাল লাগবে। ছন্দার কৃতিত্বেও খুসী হয়েছি। শ্রীশেখর মল্লিক (হাওড়া)—তুমি এ বছর হাওড়া জেলা স্কুলের ছাত্র-সংসদের সভাপতি হয়েছ জানিয়েছ। খুব আনন্দের কথা! তোমার ফটোগুলি না গিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই পাবে। অসংখ্য ছবি আসে কিনা, তাই অনেক সময় পছন্দ হ'লেও দীর্ঘদিন ছাপা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া এখন তো আবার 'ইলেকশনের' দরুণ কাগজ নিয়ে টানাটানি। দেখছ না, রামধনু কি রকম কাগজে ছাপতে হচ্ছে! শ্রীমহামায়া মুখার্জি (কলিকাতা ৪) তোমার কবিতাটি ছোট্টর মধ্যে বেশ সুন্দর হয়েছে। গল্প থেকে নিয়ে লিখলেই দোষ হয় না—তবে ও গল্পটা যে সকলের বড্ড পরিচিত! নূতনত্ব না থাকলে ভাল লাগবে কেন? শ্রীসত্যবান্ মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই)—২য় টেষ্ট ম্যাচ্ দেখবে ঠিক করেছ? বেশ তো, চাক্ষুষ দেখা বর্ণনা লিখে পাঠিও। আমাদের তো শুধু রেডিওয় শোনা। শ্রীনন্দদুলাল বসু (চিত্তরঞ্জন)—হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী এবং বাংলা স্বয়ংশিক্ষক বা 'সেল্ফ্ টট্' পাওয়া যায়; বয়স্কদের ওড়িয়া ভাষা শিখবার মত ঐ রকম কোন সহজ বই আছে কিনা তা আশা করি আমাদের কোন উড়িষ্যাদেশীয় গ্রাহক বা পাঠক জানাবেন।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। জয় হিন্দ। — ইতি রাঃ সঃ

আশ্বিন মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

১ম পুরস্কার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা-৪)

২য় পুরস্কার—শ্রীসুচিত্রা দেবী (নিউদিল্লী)।

৩য় পুরস্কার—শ্রীমনোমোহন দত্ত (কটক)।

এ ছাড়া আর যাঁদের লেখা ভাল হয়েছে :—শ্রীবিশ্বনাথ চৌধুরী (মধুতটী), শ্রীরত্নাবলী রায় (ভাগলপুর), শ্রীঅমলকুমার মিত্র (গৌহাটী), শ্রীইন্দ্রাণী দাশগুপ্তা (ডিগবয়)।

৺অবনীন্দ্রনাথ

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী, বাংলা সাহিত্যের—বিশেষ ক'রে শিশুসাহিত্যের অপরাজেয় লেখক, ভারতগৌরব শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ আর ইহলোকে নেই। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর এই কিছুদিন আগে আমরা শ্রীঅরবিন্দকে হারিয়েছি। অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে আর একটি ইন্দ্রপাত হয়ে গেল।

খেলাধূলার খবর

জাপানী হকি দল আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সুইডেন থেকে একটি ফুটবল দল (গটেবার্গ) এ দেশে খেলতে আসে। ফুটবলে সুইডেনের খুব নাম। কলকাতায় তারা মোহনবাগান, ইষ্ট বেঙ্গল এবং আই. এফ্. এ'র সঙ্গে তিনটি ম্যাচ খেলে। মোহনবাগান তাদের কাছে ২ গোলে পরাজিত হয়েছে, আই. এফ্. এ'র সঙ্গে তাদের খেলা হয়েছে অমীমাংসিত (২-২), কিন্তু ইষ্ট বেঙ্গল দলের সঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারে নি—এক গোলে পরাজয় বরণ করেছে।

ওদিকে এম্. সি. সি. ক্রিকেট দল করাচীতে পাকিস্তান দলের সঙ্গে ২য় আন্-অফিসিয়াল টেষ্টে ৪ উইকেটে পরাজয় স্বীকার করেছে। সম্প্রতি বোম্বাইএ ভারতীয় দলের সঙ্গে তাদের ২য় টেষ্ট খেলার তোড়জোড় চলছে। ডিসেম্বরের শেষের দিকে ৩য় টেষ্ট ম্যাচ্ হবে কলকাতায়।

স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্ব্বাচন

ভারত স্বাধীন হবার পর এই প্রথম কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টে এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধান সভায় সদস্য নির্ব্বাচনের আয়োজন হচ্ছে। সকলের মুখেই ভোটের কথা। যাঁরা বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তাঁদের নাম ইতিমধ্যেই দাখিল করা হয়ে গেছে। এবারে প্রত্যেকটি কেন্দ্র থেকে এত বেশী সংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াচ্ছেন যে নির্ব্বাচনের ইতিহাসে এ রকম বড় একটা দেখা যায় না। এঁদের মধ্যে কংগ্রেস, সমাজতন্ত্রী, কৃষক-প্রজা-মজদুর, জনসঙ্ঘ, কমিউনিষ্ট, রামরাজ্য পরিষদ্, ফরোয়ার্ড ব্লক ইত্যাদি হরেক রকম রাজনৈতিক দল তো আছেই, কোন দলের প্রতিনিধি না হয়ে স্বতন্ত্র দাঁড়িয়েছেন এমন লোকের সংখ্যাও বড় কম নয়—বোধ হয় সবচেয়ে বেশী।

দু'টি নতুন পদ

আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত পদত্যাগ ক'রে দেশে ফিরে এসেছেন এবং পার্লামেণ্টের সদস্যা হবার জন্য নির্ব্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর জায়গায়

আমেরিকায় ভারতের নতুন রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন। ওদিকে ইউ. এন্. ও'র ভারতীয় প্রতিনিধি বেনগল শ্রীনরসিংহ রাও আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতি নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

অন্যান্য দেশের খবর

কোরিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জ দলের সঙ্গে কমিউনিষ্ট দলের যুদ্ধবিরতি নিয়ে সুদীর্ঘ কাল ধরে আলোচনা চলছে। মাঝে মাঝে মনে হয় এইবার বুঝি একটা মীমাংসা হবে, আবার দুই দলের মধ্যে মতভেদ হয়ে সমস্ত ব্যাপারটা পিছিয়ে যায়। এই ভাবে চলছে দিনের পর দিন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্যের ওপর ভিত্তি ক'রে যে নতুন আইন পাশ হ'ল ওখানকার প্রবাসী ভারতীয়েরা তা সহজে মানতে রাজী নয়। মহাত্মা গান্ধীর পুত্র শ্রীমণিলাল গান্ধী ওখানকার সরকারকে রীতিমত নোটিশ দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করেছেন। পুলিশ এ পর্য্যন্ত শুধু তাঁর নামই টুকে নিয়েছে, আর কিছু করে নি। তোমরা নিশ্চয়ই জান, এই দক্ষিণ আফ্রিকায়ই মহাত্মা গান্ধী প্রথম অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করেন। আজ আবার সেই-খানেই, তাঁরই পুত্র, নতুন ক'রে পিতার অস্ত্র প্রয়োগ করতে বাধ্য হলেন।

কোল্ড ক্রীম অভ রোজেজ

গোলাপ গন্ধ
প্রসাধন প্রলেপ

শীতের দৌরাত্ম্য হইতে হাত, পা, মুখ ও গাত্রচর্মের লাবণ্য রক্ষা করে। সৌন্দর্য সাধনার শ্রেষ্ঠ সহায় এবং শৌখিন সম্প্রদায়ের পরম বন্ধু।

সুদৃশ্য আধারে ও টিউবে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই :: কানপুর

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) নি মা ই	(২) ত্রি ভু জ	(৩) ব লা কা
মা ন ত	ভু জ গ	লা ভ ক
ই ত র	জ গ ৎ	কা ক লী

উত্তরদাতাদের নাম—দীপক, অলক, কনক, ধর (সোনালী—পূর্ণিয়া); অমিয়-স্মৃতি সেনগুপ্ত (কলিকাতা-৩১); বত্না, জয়ন্ত, স্বপ্না ও ছন্দা রায় (বাঁকীপুর); সুশান্ত ও বিজলী সরকার (শ্যামপুর—বজবজ); নন্দিতা দেবী (দিল্লী); করুণাময় মজুমদার (পাটনা); ত্রিবিক্রম ঘোষ (কাশী); শিখা, রেখা ও মিনতি (কলিকাতা ২৯); যোগেন্দ্র ও রিণা (লক্ষ্ণৌ); নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ); শিপ্রা ঘোষ (কলিকাতা); নীলিমা ভট্টাচার্য্য (কালীঘাট)।

নূতন ধাঁধা

ধবধবে সাদা পোষাক পরা ও কে দাঁড়িয়ে আছে! মাথার ওপর আলো জ্বলছে, ও কি কোন দেবতা? আবার দেখ, একটু আগে ওকে কত বড় লাগছিল, এখন কত ছোট দেখাচ্ছে! এ কি, দেখতে দেখতে ক্রমে যে প্রায় মিলিয়ে গেল! অদ্ভুত তো! বল তো কে ও?

এ মাসের নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

নীচে যে চরিত্রগুলি দেওয়া হ'ল সেগুলি কোন্‌টা কোন্ বইএ আছে লিখে পাঠাও। সব চেয়ে নির্ভুল উত্তর যার হবে সেই পুরস্কার পাবে। একাধিক প্রতিযোগী সম্পূর্ণ নির্ভুল উত্তর দিতে পারলে প্রত্যেককেই পুরস্কার ভাগ করে দেওয়া হবে। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পার কিন্তু প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নীচের কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না। পুরোনো কোন সংখ্যার কুপন গ্রাহ্য হবে না। লেখা ১লা মাঘের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌছান চাই।

চরিত্রগুলি হচ্ছে :— হুব্বা, রামচরণ,, পেঁচো, উকুনে বুড়ী, বাসু, নীলাহীরা, পুতু, করালী, কাসিম, মাচ,, গুটিয়া দেও, ঘুরঘুরি, ফ্যাগিন, পিপ্পল, বক্সটেল, নীলকমল, চ্যালেঞ্জার, জাভার্ট, নেল্, নিডিয়া, মাগোয়া, সোলোমন্, য়্যাঙ্গাক্স, পরাণ, ঐন্দ্রিলা, অনাথ বাবু।

রামধনু
নাম—
ঠিকানা—

পুঃ প্রঃ অগ্র ৫৮

ছোটদের ভূচিত্রাবলী

(পি, সি, মজুমদার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স)

সমগ্র পৃথিবীর, প্রধানতঃ ভারত, পাকিস্তান, আসাম
ও বিহার প্রদেশের বিশদ বিবরণ সহ ৪৮ খানি রঙ্গিন
মানচিত্র সংবলিত আধুনিক ভূচিত্রাবলী
তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ও ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী, মূল্য ২৲

বুনিয়াদী ছাত্রসুহৃদ—১ম ভাগ

শ্রীমধুসূদন দেব প্রণীত, ৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্য

ইহাতে পশ্চিম বঙ্গের প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালের প্রশ্নোত্তর এবং পাঁচশতাধিক আদর্শ প্রশ্ন ও উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

* ১৯৫১ সালের প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় শতকরা ৮০ ভাগেরও অধিক প্রশ্ন এই পুস্তক হইতেই আসিয়াছে।

প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ—মূল্য ২৲ মাত্র

* অতি দুরন্ত শিশুও হাসিয়া খেলিয়া লেখা-পড়া শিখিবে *

কথা শেখা—শ্রীমধুসূদন দেব
প্রথম ভাগ—১ম শ্রেণী—৵০, দ্বিতীয় ভাগ—২য় শ্রেণী—৵০

ছবির পড়া—অরুণকুমার
প্রথম ভাগ—১ম শ্রেণী—।৵০, দ্বিতীয় ভাগ—২য় শ্রেণী—॥০

টুকটুকে বই—শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম ভাগ—১ম শ্রেণী—॥৵০, দ্বিতীয় ভাগ—২য় শ্রেণী—৵০

হৈ চৈ—শ্রীসুনির্ম্মল বসু
প্রথম ভাগ—১ম শ্রেণী—॥০, দ্বিতীয় ভাগ—২য় শ্রেণী—॥০

পি, সি, মজুমদার অ্যাণ্ড ব্রাদার্স
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের		অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের	
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা	১৲	ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি	১।০
বিজ্ঞান-বুড়ো	১৲	পদ্মরাগ	১॥০
আকাশের গল্প	১।০	সোনার হরিণ	১॥০
আবিষ্কারের গল্প	৵০	নূতন পুরাণ	৵৵০
ধূমকেতু	৵০	হাস্য ও রহস্য	৵৵০
অয়েল পেন্টিং (নাটক)	।০	চায়ের ধোঁয়া	৵০
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের		দমাদম্ দামোদর (নাটক)	।৵০
ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১৲	শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত	
শ্রীঅমলেন্দু সেনের			
দি লাষ্ট্ অব্ দি মোহিকান্স্	॥৵০	অলিভার টুইষ্ট	॥৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি রসা রোড, কলিকাতা ২৫

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

সুকুমারিতায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

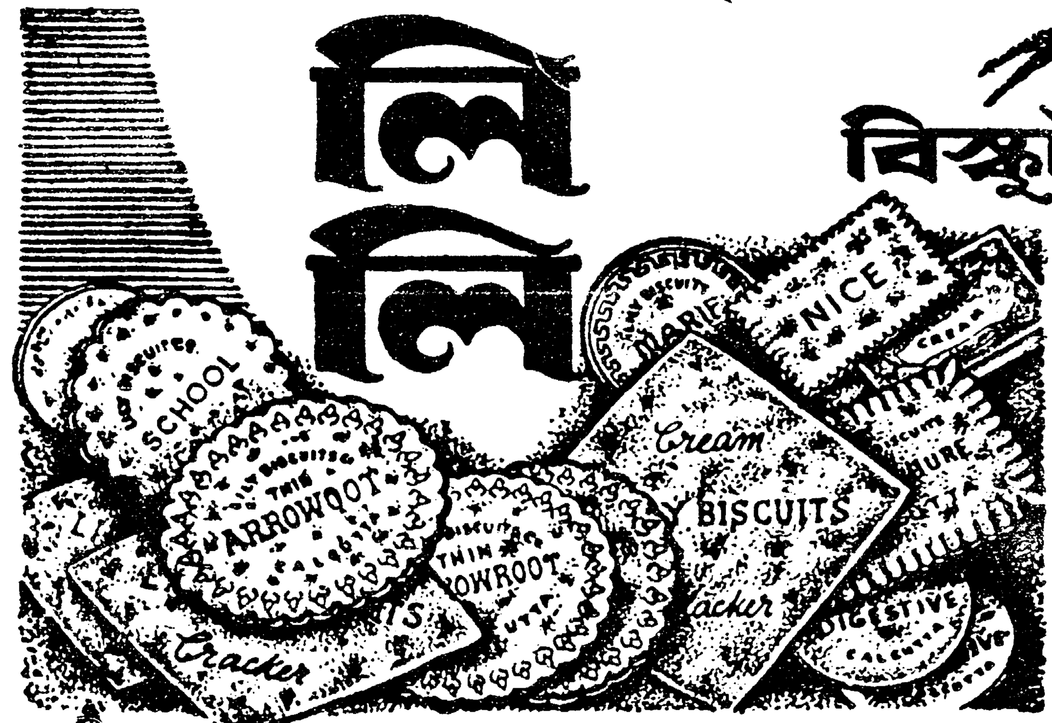

লি
লি বিস্কুট

কয়েকটী মনোরম
ও
স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন-ক্রীম,
ক্যার্ণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ
৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

রামধনু

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম, এস-সি,

কার্য্যালয় :
১৬, টাউনসেণ্ড রোড
কলিকাতা ২৫

ছোটদের উপহার ও লাইব্রেরির জন্য

সুবোধ বসু-র

পদ্মা নদীর ডাক

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "পদ্মা প্রমত্তা নদী"র কিশোর-সংস্করণ। মূল্য ১৸৹

ইহা যখন ছায়াচিত্রে প্রথম প্রদর্শিত হয় তখন কলিকাতার ছয়টি কলেজের অধ্যক্ষ কাহিনীটি শিক্ষাপ্রদ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

Amrita Bazar Patrika : It is a pleasure to welcome this exhilarating story as a distinguished addition to our juvenile literature."

গ্রন্থাগার : পুস্তক প্রকাশক

পি ৫৮ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা-২৯

এজেণ্ট চাই

রামধনু খুচরা বিক্রয়ের জন্য বাংলা ও ভারতের সমস্ত বড় বড় সহরে এজেণ্ট চাই।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার, রামধনু
১৬, টাউনসেণ্ড রোড
কলিকাতা—২৫

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাগরের শীত

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৪শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৫৮ } ৯ম সংখ্যা

সমুদ্র শাসন

শ্রীবিমল দত্ত, এম. এ

"সেতু বাঁধায় কে বাধা দেয়
এত সাহস কার ?"
অযুত ঢেউয়ের তুফান তুলে
গর্জ্জে পারাবার—
"আমার সাথে আঁটবে কে হে—
রাজত্ব আমার।"
সীতা আছেন লঙ্কাপুরে
অশোক-কাননেতে,
কপি সেনায় বাঁধ বাঁধিছে
লতায় কোমর বেঁধে ;
বানের জলে ভাসিয়ে দে যায়
জলোচ্ছ্বাসে মেতে।

"করব শাসন সমুদ্রকে,
দেখব কেমন বীর,
শুষব সাগর অগ্নিবাণে—
ছাড়নু আমার তীর।"—
বজ্রস্বরে শ্রীরাম হাঁকেন
দৃঢ় সুগম্ভীর।

যুক্ত করে হাজির তখন
সাগর রামের কাছে,
নুইয়ে মাথা প্রণাম জানায়,
মুখ তোলে না লাজে।
উৎসাহেতে লাগে সবাই
সাগর বাঁধার কাজে।

এম্‌নি যখন চলার পথে
আসবে বিরাট্ বাধা
তাল ঠুকে সব এগিয়ে যাবে,
রাখ্‌বে না কাজ আধা।
বাধা যতই হোক্ না প্রবল
হবেই কার্য্য সাধা।

'রামধনু' তার প্রচ্ছদে
দেয় রেখায় আলিম্পন,
রাখল এঁকে তরুণ মনের
বজ্রকঠিন পণ।
সাগর বাঁধার অর্থ হ'ল
বাধার উত্তরণ।

নৈশ বিজ্ঞাপন

শ্রীঅরুণমোহন চক্রবর্ত্তী

কলকাতায় যারা থাকো এবং পথেঘাটে ঘোরো ফেরো, তাদের রাতে পথ চলতে চলতে বড় রাস্তার মোড়ের 'ভিডল মোটর অয়েল', 'প্লেয়ার্স্ প্লীজ', 'রসুই বনস্পতি', 'সিজার্স সিগারেট', 'জবাকুসুম', 'মরটন্ সুইটস্' প্রভৃতি উজ্জ্বল বিচিত্র বর্ণের নৈশ বিজ্ঞাপনগুলো চোখে পড়ে থাকে নিশ্চয়ই। শুধু তাই নয়, কলকাতার প্রত্যেক চিত্রগৃহের, বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের, হোটেল এবং দোকানের নাম প্রভৃতি লিখতেও আজ্‌কাল ঐ উজ্জ্বল নৈশ বিজ্ঞাপনেরই সাহায্য নেওয়া হ'য়ে থাকে। সেদিক্ দিয়েও এই বিজ্ঞাপন তোমাদের চোখ এড়ায় নি হয়তো! আজ তোমাদের শোনাবো কি ভাবে ঐ সব নৈশ বিজ্ঞাপনগুলো অন্ধকারের বুকে নানা রকমারি আলো ছড়িয়ে জ্বলতে থাকে, সেই কথা।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, যে বিজ্ঞাপন যত চটকদারে হবে—যত লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারবে সেই বিজ্ঞাপনই বিজ্ঞাপন হিসেবে তত উন্নত বলতে হবে।

আজকাল এই বিজ্ঞানের যুগে আলো সাজিয়ে বা কাচের বাক্সের ওপর লিখে তার মধ্যে আলো দিয়ে নৈশ বিজ্ঞাপন দেবার আর তেমন দাম নেই। তবে আজও

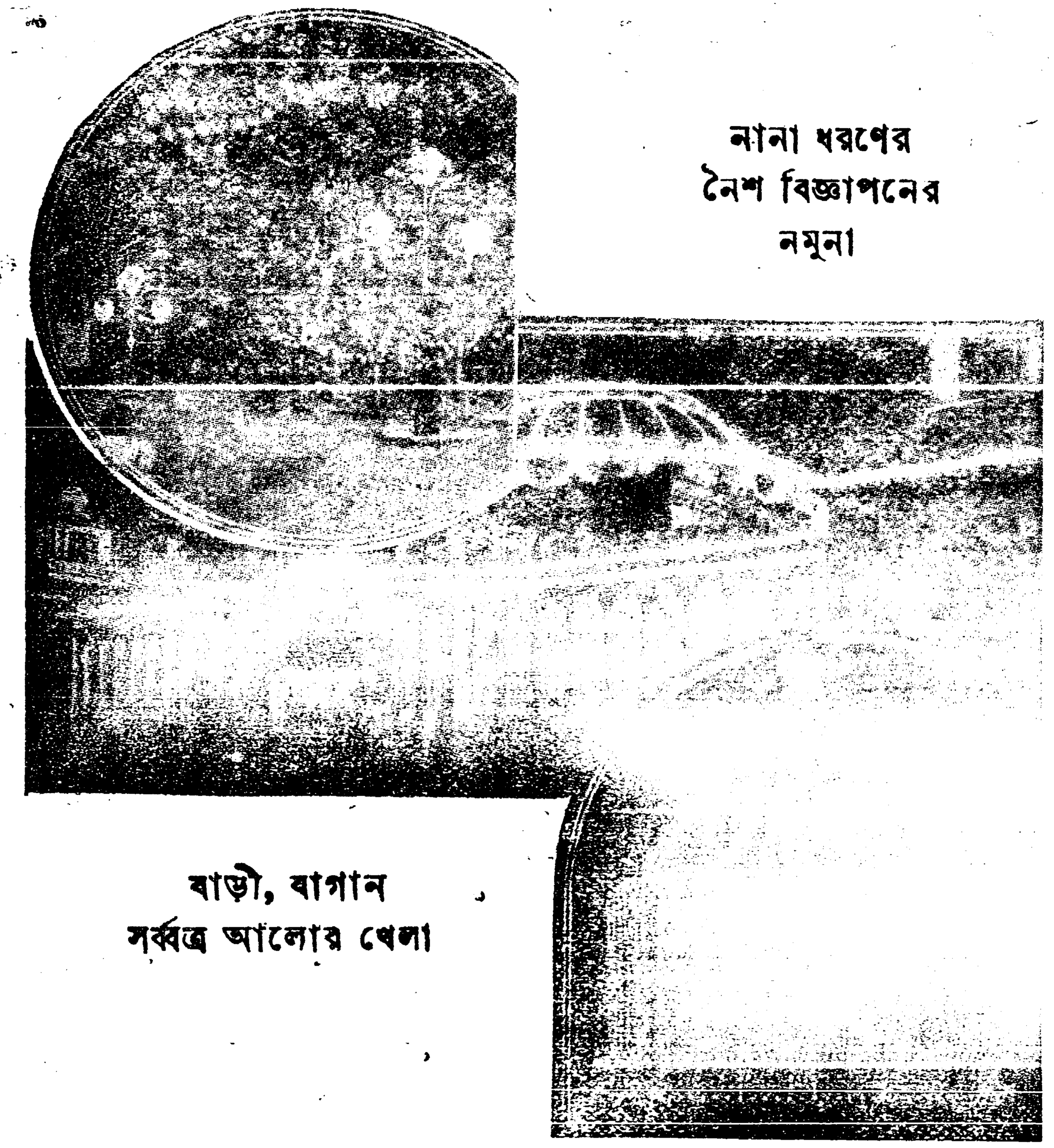

নানা ধরণের নৈশ বিজ্ঞাপনের নমুনা

বাড়ী, বাগান সর্ব্বত্র আলোর খেলা

যে ও ধরণের বিজ্ঞাপনের দেখা পাওয়া যায় তার কারণ উন্নত ধরণের এই নৈশ বিজ্ঞাপনে বিদ্যুতের খরচ পড়ে খুব বেশী। সকলেই তো আর অত খরচ ক'রে ও ধরণের বিজ্ঞাপন দিতে পারে না।

আধুনিক উন্নত ধরণের এই নৈশ বিজ্ঞাপনের কথা জানতে হ'লে আগে তোমাদের বলতে হবে বৈজ্ঞানিক গাইসলারের কথা। বৈজ্ঞানিক গাইসলার

কাচের তৈরী নলের মধ্যেকার সমস্ত বাতাস নিষ্কাসিত করে তার মাঝে বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিচালনা করলে কি হয় তাই নিয়ে গবেষণা করছিলেন। একদিন একটা কাচের তৈরী নল নিয়ে তাকে বায়ুশূন্য করে তার দু'মুখে দু'টো ধাতুর তৈরী ইলেকট্রোড বা ছিপি এঁটে খুব শক্তিশালী বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিত করতেই সমস্ত নলটা এক উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কাচের নলের মধ্যে দিয়ে উজ্জ্বল আলোক বিকীরণ করবার যে গবেষণা তিনি করছিলেন তা সফল হ'লো। বৈজ্ঞানিক গাইসলার এই প্রথায় কাচের নলের ভেতর থেকে আলোক-বিকীরণ প্রথা আবিষ্কার করেন ব'লে এই নলের নাম দেওয়া হয়েছে 'গাইসলারের নল'। আজকের যে উন্নত নৈশ বিজ্ঞাপন তা এই 'গাইসলারের নলে'রই উন্নত ব্যবস্থা।

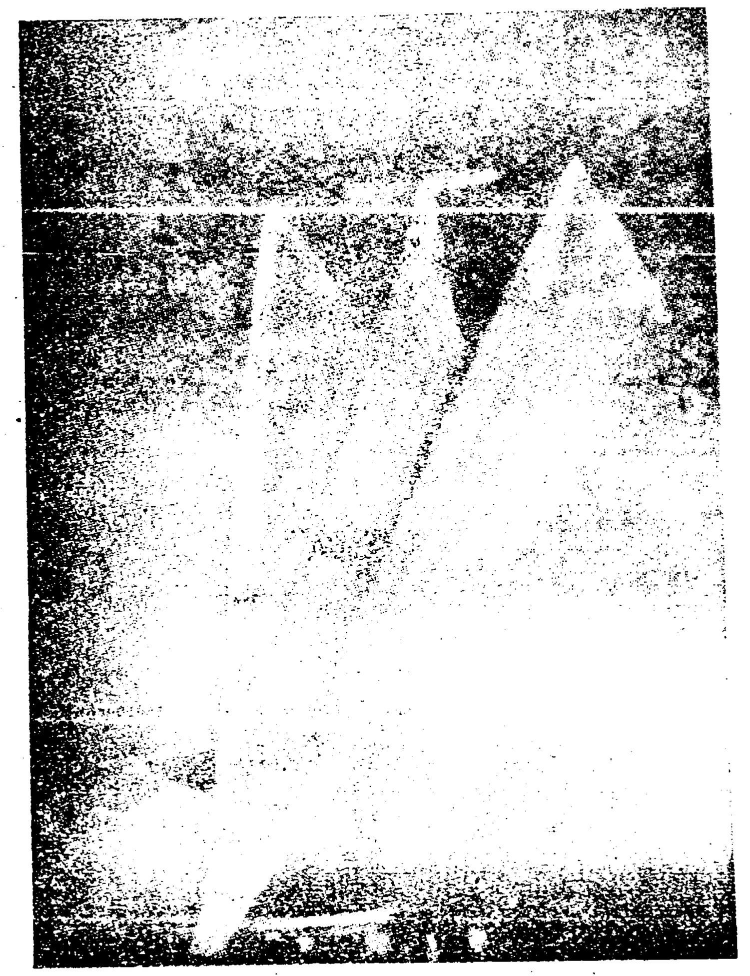

আকাশের গায়ে আলো ফেলে বিজ্ঞাপন

আধুনিক উন্নত নৈশ বিজ্ঞাপন 'নিয়ন সাইন' নামে বিশেষ পরিচিত। কাচের নলের মধ্যে নিয়ন গ্যাস নিশ্চয়ই আছে, তা না হ'লে একে 'নিয়ন সাইন' কেন বলা হবে তা তোমরা বুঝতেই পারছো। তবে এটুকু জেনে রাখো যে কাচের নলের মধ্যে সব সময় যে নিয়ন গ্যাসই থাকবে তার কোনো মানে নেই। নিয়ন ছাড়া অন্য গ্যাসও থাকতে পারে।

এবারে কৌশলটা বলি। যে শব্দটা তুমি লিখতে চাও প্রথমে চাই কাচের নল দিয়ে তৈরী সেই শব্দের অক্ষর বা অক্ষরগুলো। কাচের নলের সাহায্যে অক্ষর তৈরী করা হয় তাপ প্রয়োগ ক'রে। তাপ প্রয়োগ করলেই কাচের নল বেঁকে যায়, কাজেই যে সব অক্ষর প্রয়োজন তাপ প্রয়োগ ক'রে কাচের নল বাঁকিয়ে হুবহু সেই অক্ষর তৈরী করা হয়। তারপর নলটাকে বায়ুশূন্য ক'রে ভর্ত্তি করা হয় গ্যাস। ধাতুর তৈরী ইলেকট্রোডের সাহায্যে খোলা মুখগুলো আটকে দেওয়া হয় তারপর, যাতে ভেতরের গ্যাস বাইরে যেতে না পারে এবং বাইরের বাতাস

আসতে না পারে ভেতরে। এইবারে ইলেকট্রোডের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত করা হয় খুব শক্তিশালী বৈদ্যুতিক প্রবাহ। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নলটা থেকে বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো। নিয়ন গ্যাস থাকলে আলোর রং হবে গাঢ় লাল, আবার আর্গন গ্যাস থাকলে আলোর রং হবে উজ্জ্বল নীল। এমনি ধারা এক এক রকম গ্যাসের রং হয় এক এক রকম; গ্যাসের রং বললে অবশ্যি ঠিক বলা হয় না—আলোর রং বলাই ঠিক।

শুধু নলের সাহায্যে অক্ষর তৈরী করলে সেগুলো সরু সরু দেখতে লাগে। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে যে 'নিয়ন সাইনে'র বিজ্ঞাপনের অক্ষরগুলো দেখতে কিন্তু মোটেই সরু দেখায় না; বরং বেশ চওড়াই মনে হয়। কেন বল তো? দিনের আলোয় যদি 'নিয়ন-সাইনে'র কোনও বিজ্ঞাপনের অক্ষরগুলো লক্ষ্য করো তবে দেখবে কাচের নলের তৈরী অক্ষরগুলো বসান রয়েছে কাঠ, টিন বা ঐ জাতীয় কোনো জিনিষের তৈরী মোটা অক্ষরের মাঝে। ফলে কাচের নলের গা থেকে আলো ঠিকরে পড়ে ঐ মোটা অক্ষরের গর্ত্তে, এবং তার জন্য অক্ষরগুলো দেখতে লাগে চওড়া।

রসগোল্লার গল্প

শ্রীকল্যাণী দেবী

কেষ্টদা' বল্লেন, তা হ'লে শোন্ তোদের একটা গল্প বলি। গল্প মানে গল্প নয় কিন্তু, সত্যি ঘটনাই,—সেই যেবারে কলকাতায় গিয়ে একেবারে আদ্দেক হয়ে এলুম? সেবারই ঘটেছিল।

কেষ্টদা' একটা বিড়ি ধরালেন, আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে বসলুম গল্প শুনতে।

কেষ্টদা' বলতে লাগলেন—তখনও হাঁদুর, মানে আমার ছোট শালাটার, বিয়ে হয় নি। সবে মেয়ে দেখবার পাট শুরু হয়েছে। হাঁদুর বাপ-মা নেই, কাজেই মেয়ে পছন্দ করবার ভার পড়েছে হাঁদুর দিদির ওপর—মানে তোদের বৌদির ওপর। পড়েছে কি আর? সে নিজেই তুলে নিয়েছে, যদিও পরের ঘাড়ে ভার না চাপিয়ে নিজের ঘাড়েই সেটা নেবার ইচ্ছে হাঁদুর প্রবল ছিল; কিন্তু তার দিদি তাকে মোটে আমলই দিলে না। যাক, একদিন সে আমাকে ডেকে বল্লে, দ্যাখ, একটি ভাল পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেছে, একবার গিয়ে দেখে এসো। আমি বল্লুম, তুমি নিজেই যাও না কেন? বল্লে, তার কি আর যো রেখেছ তোমরা? 'আষ্টেপিষ্টে' এমন করে বেঁধেছ যে সংসার

ছেড়ে একপা কোথাও নড়তে পারি নে। ... শুনলুম, মেয়ে দেখতে হ'লে একপা নয়, অনেক পা-ই নড়বার প্রয়োজন—যেতে হবে সেই কলকাতায়। শুনে মনটা নেচে উঠল। মফঃস্বলেই তো থাকা, বড় সহরে যাবার তেমন একটা সুযোগ মেলে কই?

তল্পিতল্পা নিয়ে যথা দিনে যথাস্থানে তো গিয়ে উঠলুম। কিন্তু কি বলব তোদের, মেয়ে যে কেমন দেখলুম তা যদি তোরা আমায় জিজ্ঞেস করিস্, আমি বলতে পারব না। ইাছুর দিদিকেও বলতে পারি নি। সেজন্য আজ পর্য্যন্ত গঞ্জনা খাচ্ছি। আমার সব গুলিয়ে দিলে গোটাকতক রসগোল্লা।

আমরা সমস্বরে বলে উঠলুম, রসগোল্লা!

হ্যাঁরে হ্যাঁ, রসগোল্লা। অমন হাঁ করে চেয়ে রয়েছিস্ কি? তোদের কালে পূর্ব্ব পাকিস্তানের কত ভাল ভাল ময়রা এ দেশে আমদানি হয়েছে, তোরা ফার্ষ্ট ক্লাস রসগোল্লা দিয়ে জলযোগ কচ্চিস্, রসগোল্লার প্রকৃত মাহাত্ম্য তোরা কি বুঝবি? আমরা যা আগে এখানে রসগোল্লা খেয়েছি, তা ধোঁয়ার গন্ধে ভরা নিরেট এক একটি ছাই রংএর নাড়ু। আজকাল তোদের পাতে রসগোল্লা পড়ে টুপ করে, কিন্তু আমাদের পাতে পড়ত ঠাই ঠাই আওয়াজ করে। যাক গে, যা বলছিলুম। মেয়ে দেখতে তো গেলুম; তারা মেয়ে দেখাবার আগেই দেখালে এক প্লেট রসগোল্লা—সঙ্গে আরো কি কি সব ছিল, এ্যাদ্দিন পর তা আর মনে নেই। অমন ধবধবে পরিপাটি রসগোল্লাগুলো দেখে আমার মনের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল। সন্তর্পণে একটু ভেঙ্গে মুখে দিতেই চোখ দু'টো আবেশে জুড়ে এলো। আহা, কি জিনিষ! তারপর অল্প অল্প করে ভেঙ্গে ভেঙ্গে খেতে লাগলুম। তোরা বুঝি ভাবছিস পাছে ওরা হ্যাংলা ভাবে সেই ভয়ে? আরে তা নয়, ফুরিয়ে যাবার ভয়ে। মোটে তো চারটে দিয়েছিল, ও তো চার সেকেণ্ডের মামলা। একবার ভাবলুম, জিজ্ঞেস করি, এই রসগোল্লা কোন্ দোকানে পাওয়া যায়? কিন্তু চক্ষুলজ্জায় বাধল। তারপর ওরা মেয়ে আনলে। কিন্তু আমি তখন ভাবছি, পকেটে যা আছে, ফেরবার পথে তাই দিয়ে কিছু রসগোল্লা কিনলে কেমন হয়? দাম কত করে তাও তো জানা নেই, ক'টাই বা দেবে?

পরদিন মানিব্যাগে পাঁচটা টাকা নিয়ে বেরুলুম। পাঁচটা টাকাই রসগোল্লায় ব্যয় করবার ইচ্ছে। নিজে তো প্রাণ ভরে খাবই, বাড়ী ফেরবার সময় তোদের বৌদির জন্যও নিয়ে নেব এক হাঁড়ি। পথ দিয়ে চলেছি, কোন দিকে লক্ষ্য নেই, মনশ্চক্ষে কেবল ভাসছে প্লেট-ভরা বড় বড় রসগোল্লা। কতক্ষণ চলেছি খেয়াল নেই, হঠাৎ একটা লোক গা ঘেঁষে চলে গেল। যেতেই চমক ভাঙল। দেখি একটা গলি দিয়ে আমি চলেছি, রাস্তা প্রায় নির্জ্জন বল্লেই চলে। আমার কেমন সন্দেহ হ'ল। রাস্তা এত ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও লোকটা আমার গা ঘেঁষে চলে গেল কেন? গাঁটকাটা নয় তো? কলকাতার গাঁটকাটাদের অনেক গল্প শোনা ছিল, ভাবলুম এ ব্যাটা আমার গাঁটের ওপর দিয়ে হাত সাফাই করে গেল না তো? তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিলুম। যা ভেবেছি তাই,—পকেট একেবারে গড়ের মাঠ! তক্ষুণি ছুটে গিয়ে লোকটার কাছা চেপে ধরলুম। লোকটা ফিরে দাঁড়াল। দেখলুম তেইশ-চব্বিশ বছরের একটি ছোকরা। দিব্যি ঢেউ খেলানো বাবরি চুল, চোখে রিম্-লেস চশমা, চুড়িদার পাঞ্জাবী গায়ে, পকেট থেকে গন্ধ-মাখা

রুমাল উঁকি মারছে। মুখের দিকে একনজর চেয়েই বুঝলুম, ভদ্রলোক "বাই বার্থ" (জন্মসূত্রে) না হ'লেও "বাই য়্যাপিয়ারেন্স" (চেহারায়) ভদ্র হবার খুব চেষ্টা করেছে। আমায় জিজ্ঞেস করলে, কি চাই আপনার? বল্লুম,—বিশেষ কিছুই নয়; আমার যে জিনিষগুলো তুমি আমার কাছ থেকে না চেয়েই নিয়েছ, সেগুলোই আমি তোমার কাছে চেয়ে নিতে চাইছি।

সে বললে, মানে?

আমি বল্লুম,—মানে বোঝা তো বিশেষ শক্ত নয় বাবা!

ছোকরা চটে উঠে বললে,—রসিকতা করছেন নাকি আমার সঙ্গে?

বল্লুম,—না বাবা, বিশ্বেস কর, আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র রস নেই। ঐ রসের সন্ধানেই যাচ্ছিলুম, তুমিই বাবা বাদ সাধলে।

সে বল্লে—কি রকম?

বল্লুম—বাবা, দেহাতে থাকি, কালেভদ্রে কখনও কখনও সহরে আসা ঘটে। তা তোমাদের কলকাতায় যে তোমরা এমন অমৃতের ভাণ্ডার রেখে দিয়েছ, তা কি জানতুম? সেদিন মেয়ে দেখতে গিয়ে জানলুম। কিন্তু কি বলব বাবা, দিলে মোটে চারটি!

ছোকরা অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়েছিল, বল্লে,—চারটি, কি?

বল্লুম,—চারটি রসগোল্লা। খেয়ে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লুম—কিন্তু মন তো ভরল না। তাই আজ পকেটে পাঁচটি টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলুম রসগোল্লা খাবার ইচ্ছেয়। তা সে তো আর হ'ল না, তুমিই টাকা ক'টার সদ্গতি করলে। তা যাক্ গে, এখন আমার একটি অনুরোধ যদি রাখ বাবা!

সে বল্লে, কি?

বল্লাম,—বাবা, এতক্ষণ তো রসগোল্লা খাবার উৎসাহে হন্‌হন্ করে হাঁটছিলুম—সেই সুকুমার রায়ের 'খুড়োর কলে'র খুড়োর মত—জানি নে পদ্যটা তোমার পড়া আছে কি না—কিন্তু বুড়ো মানুষ এখন ভগ্নহৃদয়ে ফিরব, হাঁটা আর সম্ভব হবে না। তুমি যদি, বাবা, আমার মানিব্যাগ থেকে কেবল বাস্ ভাড়ার পয়সা ক'টা আমায় দিয়ে দাও, তবে কৃতার্থ হই।

আমার কথা শুনে ছোকরা তার পকেট থেকে আমার মানিব্যাগটা বার করল। ভেতরে কি আছে একবার দেখে নিয়ে—বল্লে তোরা বিশ্বেস করবি না,—দু'টো টাকা আর খুচরো ছ'টা পয়সা আমার হাতে দিয়ে বল্লে, নিন, দু' টাকার রসগোল্লা খাবেন, বুড়ো বয়সে এর বেশী হজম করতে পারবেন না।

দেখেছিস গাঁটকাটার উদারতা! গাঁটকাটা হ'লেও মনটা একেবারে কাঁটাবন হয়ে যায় নি। কলকেতায়, শুনেছিলুম, সবই আজব; আজ তা প্রত্যক্ষ করে আমি একেবারে থ' মেরে গেলুম। এ্যাদ্দিন জানতুম, গাঁটকাটা-হস্তগত ধন আর নিক্ষিপ্ত শর একই জিনিষ, একবার হাতছাড়া হ'লে আর ফেরে না। কিন্তু আজ গাঁটকাটার কাণ্ড দেখে কৃতজ্ঞতায় আমার মুখের ভাবটা যখন গদগদ হয়ে আসছে, ঠিক তক্ষুনি রাস্তায় একটা গাড়ী আসতে দেখে ছোকরা সাঁৎ

করে পাশের একটা ঘুপচি গলিতে ঢুকে পড়ল। আমি পদ্য লিখতে পারি নে, নইলে সত্যি বলছি, 'মা নিষাদ'র মত 'মা গাঁটকর্ত্তক' বলে একটা পদ্য সেদিন লিখে ফেলতুম।

আমরা বল্লুম, কেষ্টদা', এ সব আপনার বানানো গল্প। এমন মহৎ গাঁটকাটার কথা তো কখনও শুনি নি! কেষ্টদা' বল্লেন, তোরা শুনিস্ নি বলেই কি কথাটা মিথ্যে হয়ে যাবে? তোদের এতটুকু জীবনে কী-ই বা তোরা শুনেছিস্! তাই বলে নতুন যা কিছু শুনবি তা কি বাজে বলে উড়িয়ে দিবি? নে, মিথ্যে বকাস নে, যা বলছিলুম শোন্।

তারপর গাঁটকাটার দেওয়া টাকা দু'টো নিয়ে রসগোল্লার দোকানে তো গেলুম, খেলুম রসগোল্লা। কিন্তু কেমন একটা দুঃখ মনে যেন চেপে রইল। দু' টাকায় যা মিলে, তার থেকেই চারটি বাঁচিয়ে রাখলুম বাড়ীতে এনে আবার খাব বলে। কিন্তু ওগুলো নিই কি করে, বাসন তো নেই! পকেটে একখানা খামের চিঠি ছিল, চিঠিটা ফেলে দিয়ে সেই খামেই গোল্লা ক'টা ভরে নিয়ে বাসে চড়লুম। বাসে অসম্ভব ভীড়, ভেতর দিকে তো মোটে এগোনোই গেল না। একেবারে সামনেই অনেকগুলো লোক গাদাগাদি হয়ে একটা বেঞ্চে বসে ছিল, তাদের গাদাগাদিটা আরো একটু ঘনিষ্ঠ করে দিয়ে আমি একপাশে বসে পড়লুম। কিছুক্ষণ বাদে এক জোড়া বাঙ্গালী সায়েব-মেম বাসে উঠলেন। সায়েবটার চেহারা কতকটা সেই 'মেদিনী হইল মাটি' গোছের। মেমটি বেশ ছিপছিপে, সুন্দরপানা। আমার বেঞ্চের দু'টি ছোকরা উঠে পড়ে মেমের বসবার জায়গা করে দিলে। মেমটি 'থ্যাঙ্কস্' বলে বসে পড়েই তাঁর হাতের লেডিজ ছাতাটি অবলীলাক্রমে একটি ছোকরার হাতে ধরিয়ে দিলেন। ছোকরা ছাতাটি নিতেই তিনি আর একবার থ্যাঙ্কস দিলেন। মেমকে বসতে দেখে সায়েব বল্লেন তিনিও বসবেন। কিন্তু বসবেন বল্লেই তো হ'ল না, বসবার জায়গা কোথায়? সায়েব কি সে কথা শোনেন? পাইপ হাতে তিনি আমার সুমুখে এসে দাঁড়ালেন, বল্লেন, উঠুন তো মশাই, আমি বসি। আমি কিছু বলবার আগেই তিনি অধৈর্য্য হয়ে দু'বার পা ঠুকে হাতের পাইপটা নাচালেন, বল্লেন, গেট আপ, প্লীজ! আরে মশাই, উঠুন না, আপনি তো অনেকক্ষণ বসেছেন, এবার আমায় বসতে দিন। আমি কথা শুনে হাঁ হয়ে রইলুম। ভদ্রলোক বলে কি! আমাকে তার মাতুলগুষ্ঠীর কেউ ঠাউরেছে নাকি? মামাবাড়ীর আব্দার? একটি ছোকরা ওপাশ থেকে বলে উঠল, কি করে জানলেন উনি অনেকক্ষণ বসেছেন? সায়েব বল্লেন, বেশ, না উঠবেন, না-ই উঠলেন, আমি এই বসলুম। আমি পকেট সামলাতে সামলাতে হে-হে করে উঠলুম—বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে—!

কা'কে বাঁচিয়ে মশাই? নিজের ঠ্যাং দু'টোকে তো আগে বাঁচাই! বলেই ভদ্রলোক ধপ্ করে আমার পকেট চেপে বসে পড়লেন। আমার পকেট থেকে একটি মৃদু আর্ত্তনাদ শোনা গেল, প্যা—চ্!! সায়েব স্প্রিংএর মত ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন—পেছুনে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লেন, একি মশাই, কি লাগিয়ে দিলেন পাতলুনে? এ হে হে—চ্যাট চ্যাট কচ্চে যে! কি এগুলো? তখন রসগোল্লার অবস্থা কল্পনা করে আমার কান্না পাচ্চে, আমি কথাটি কইলুম না। সায়েব ভয়ানক রেগে গিয়ে আমায় বকাবকি করতে লাগলেন, কি রেখেছেন পকেটে, শীগ্গির বার করুন, দেখান কি আছে ওতে? আমার পকেটের সম্পত্তি দেখতে চাইবার সায়েবের যদিও কোন

অধিকার ছিল না, তবু আমি দেখালুম। ধীরে ধীরে খামখানা বার করলুম। দেখি, বাসশুদ্ধ সমস্ত চোখ ঐ খামটির দিকে উৎফুল্ল হয়ে চেয়ে আছে। খামটি ফাঁক করে আমি চারটি রসগোল্লাই বার করলুম। সায়েব চেঁচিয়ে উঠলেন,—ফুঃ, পকেটে করে আপনি রসগোল্লা নিয়ে যাচ্ছেন! কোথাকার উজবুগ! আমার রসগোল্লা দেখে বাসময় একটা হাসির হর্রা পড়ে গেল—এমন কি মেম পর্য্যন্ত মুখে রুমাল দিয়ে খুক্‌খুক্ করে হাসতে লাগলেন। সায়েব তো রেগে কাঁই! কোন্ হিসেবে আপনি পকেটে রসগোল্লা নিয়ে বাসে চড়েছেন? আমি বল্লুম, কই, কোথাও তো এমনতর নিষেধ লেখা নেই! উনি বল্লেন, না থাকলোই বা, এমন ইডিয়টও তো কোথাও দেখি নি! আমি বল্লুম, ইডিয়ট বলতে পারেন বটে। দেহাতি লোক, এমন রসগোল্লা তো কখনো চোখে দেখতে পাই নে, তাই নিয়েছিলুম ক'টা—

সায়েব বল্লেন, চোখে দেখতে পান্ না তা চোখের সামনে বাইরে রাখলেই তো পারতেন! অমন চোখের আড়ালে পকেটে রাখবার কি প্রয়োজন ছিল? দেখুন তো আমার প্যাণ্টটা একেবারে মাটি করে দিলেন! আমি বল্লুম, মাটি আর কি করেছি, ও ধোপাবাড়ী দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু দেখুন তো আমার রসগোল্লার অবস্থা! একেবারে চিঁড়েচ্যাপ্টা করে ছেড়েছেন! রসগোল্লার স্বাদ কি আর এতে পাওয়া যাবে? বলেই মুখটা বিরস করে বসে রইলুম। সায়েব বল্লেন, তা দোকানে বসে খেলেই তো পারতেন!

তা কি আর খাই নি? বাড়ীতে বসে আর এক দফা খাব বলে এ ক'টা নিয়েছিলুম। সায়েব বল্লেন, আপনি কি জাত? নিশ্চয়ই বামুন,—তা নইলে এমন ছাঁদা বেঁধেছেন? এই হ্যাংলা বামুন জাতটার নোলা না কমলে কোনোদিন আমাদের দেশের কিছু হবে না।

আমি তখন রসগোল্লার শোকে একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়েছি, কাজেই এমন কটূক্তিরও কোনও জবাব দিলুম না।

কিছুক্ষণ বাদে সায়েবের গন্তব্যস্থল পৌঁছে গেল। নামবার আগে সায়েব আমার সুমুখে এসে দাঁড়ালেন। মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে বল্লেন, দেখুন, আপনি যে বিষম পেটুক লোক তা বেশ বুঝতে পারছি। এই নিন আমার কার্ড, কাল দুপুরে আমার বাড়ীতে আপনার নেমন্তন্ন রইলো। সায়েবের নেমন্তন্ন গ্রহণ করতুম কিনা বলা যায় না, কিন্তু নামবার মুখে মেম সায়েবও আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। রাঙ্গা হাত দু'টি যোড় করে বল্লেন, যাবেন নিশ্চয়ই, নইলে ভারী দুঃখিত হব।

তাঁরা নেমে যেতেই সেই ছত্রধর ছোকরাটি চেঁচিয়ে উঠল—ঐ যাঃ! ছাতাটা যে উনি ফেলে গেলেন! এখন উপায়! এক ব্যক্তি সহজেই সমস্যার সমাধান করে দিলে: বল্লে, এই ভদ্রলোক তো কাল নেমন্তন্ন খেতে যাবেন, দিয়ে দিন্ না ওঁর হাতে! হাত বাড়িয়ে নিলুম ছাতাটা।

এত গালাগালি খেয়েও পরদিন নেমন্তন্ন খেতে গেলুম। তোরা বলবি পেটুক! তা নয়, একে তো ছাতা ঘাড়ে পড়েছে, তায় মেম সায়েবের যুক্ত কর দু'টি কেবলই মনে পড়তে লাগল।

যাই বলিস্, সায়েব-মেম আমাকে যত্ন করলেন খুব। দু'জনে আগাগোড়া আমার সামনে বসে থেকে খাওয়ালেন। মেমসায়েব 'এটা খান, ওটা খান্' করে বারম্বার অনুরোধ জানাতে লাগলেন।

সব শেষে একটা বড় থালাভরা রসগোল্লা ও বড় বড় রাজভোগ এনে হাজির করলে। আমার লজ্জায় মাথাটা নুয়ে পড়ল, কিন্তু খেলুম সব ক'টাই।

আসবার সময় সায়েবকে বল্লুম, আমাদের মাসের ঝগড়াটায় যে আপনি এ রকম মধুরেণ সমাপয়েৎ করলেন এজন্য আমার অশেষ ধন্যবাদ জানবেন।

মেম জিজ্ঞেস করলেন কবে আমি স্বস্থানে ফিরব এবং ফেরবার আগে যেন একবার দেখা করি সেজন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানালেন।

করেছিলুম দেখা। বল্লে বিশ্বাস করবি না, মেমসায়েব আমার সঙ্গে প্রকাণ্ড এক হাঁড়ি রসগোল্লা দিয়ে দিলেন; বল্লেন, ছেলেমেয়েদের জন্য দিলুম—'না' বলবেন না, ভারী দুঃখিত হব তা হ'লে। কি আর করি, হাঁড়িটা নিতেই হ'ল।

আমরা সবাই লাফিয়ে উঠলুম, য়ঁ্যা কেষ্টদা'! আপনি এক হাঁড়ি রসগোল্লা এনেছিলেন, আর কথাটা বেমালুম চেপে গেছলেন? আমরা কেউ তো তার ভাগ পেলুম না! যদিও তখন আমরা খুব ছোট তা হ'লেও রসগোল্লা খাবার বয়স নিশ্চয়ই হয়েছিল।

কেষ্টদা' বল্লেন, ভাগ পাবি কি করে শুনি? মেমসায়েব ছেলেমেয়ের নাম করে অত আগ্রহ করে দিলে, ছেলেমেয়ে নেই বলে তাঁর মনে দুঃখু দিতে কেমন বাধল। সকালে ট্রেনে চাপলুম, নামলুম সন্ধ্যেয়। এক হাঁড়ি রসগোল্লা শেষ করতে কি এর চাইতেও বেশী সময় লাগে? অনেক কষ্টে কয়েকটা বাঁচিয়েছিলুম, সেগুলো তোদের বৌদির হাতেই সব দিলুম। যাই বলিস, কলকাতার লোকগুলোকে আমরা যত খারাপ ভাবি আসলে তারা তত নয়। বিশ্বেস না করিস্ একবার গিয়ে পরখ্ করে আসিস্। অবশ্যি তোদের ভাগ্যেও যে এমনিধারা রসগোল্লা জুটবে এ বিষয়ে আমি গ্যারান্টি দিতে পারি নে।

সোনার বালুচরে

শ্রীঅশোক সেন, এম. এ

—দুই—

কয়েক মিনিট ধরে উইল একমনে কাগজখানা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলের উপর থেকে বাতিটা নিয়ে ঘরের এক কোণে বাক্সটার উপরে গিয়ে বসলেন। সেখানে বসেও ওটা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন। মুখে কিছুই বলেন না বটে, কিন্তু তাঁর অস্বাভাবিক ভাব দেখে অবাক্ হলুম। তাঁকে চিন্তিত দেখে আর কিছু জিজ্ঞেস করলুম না।

এর পর তিনি কাগজখানাকে খুব সাবধানে দেরাজের মধ্যে রেখে দিয়ে তালাচাবি বন্ধ করলেন।

এবারে যেন তাঁর মনটা একটু হালকা হ'ল। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর প্রথম উৎসাহটা একেবারে নিভে গেছে। গম্ভীর হ'লেও সে বিরক্তির ভাবটা আর নেই। তবু বুঝতে পারলুম না, হঠাৎ কিসের চিন্তায় তিনি এতটা আনমনা হয়ে পড়লেন! রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিন্তা কিছুমাত্র কমল না, বরং বেড়েই চল্ল। এ-কথা ও-কথায় তাঁকে ভোলাতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুম না। এই সময়ে সাধারণতঃ আমি রাত কাটিয়ে যাই। কিন্তু এ অবস্থায় বাড়ী ফিরে যাওয়াই ভাল মনে করলুম। তিনিও আমাকে থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন না, শুধু বিদায় দেবার সময় আমার হাতখানা সজোরে চেপে ধরলেন।

তারপর প্রায় এক মাস কেটে গেছে, এর মধ্যে উইলের সঙ্গে আর দেখা হয় নি। সেদিন হঠাৎ জুপিটার আমার চার্লসটনের বাড়ীতে এসে হাজির। এর আগে ওকে কখনও এতটা মনমরা দেখি নি। ভয় হ'ল, বন্ধুর কোনো বিপদ্ হয় নি তো?

তাকে জিজ্ঞেস করলুম—"কি হে জুপিটার, খবর কি? তোমার সাহেব ভাল আছেন তো?"

"আজ্ঞে, ভাল আর কই?"

"ভাল নেই! কেন, কি হয়েছে তাঁর?"

"কি জানি, কোন কথা তো আমায় বলেন না। মনে হয়, কোন অসুখ হয়েছে।"

"অসুখ! সে কথা আগে বল নি কেন? অসুখে বিছানায় পড়েছেন নাকি?"

"না না, তা নয়। কিন্তু ওঁর জন্য আমার বড় ভাবনা হয়।"

"জুপিটার, তুমি কি বলছ ঠিক বুঝতে পারছি নে। অসুখই যদি হয়ে থাকে তা হ'লে কি অসুখ তুমি শোন নি?"

"না, আমাকে তো কিছু বলেন না। সারাদিন মাথা নীচু করে বনে বনে ঘুরে বেড়ান। যখন বাড়ীতে ফেরেন তখন তাঁর সে চেহারা দেখলে ভয় হয়। শ্লেটের উপর ঝুঁকে কি সব হিজিবিজি লেখেন, ভগবান্ জানেন।"

"হিজিবিজি লেখেন! তার মানে?"

"সব অদ্ভুত অংক, চিহ্ন পেতে কি যে করেন আমি তার মাথামুণ্ডু খুঁজে

পাই নে। এখন পাগল হ'তেই বাকি আছে। সেদিন বাড়ী ফিরলে পর তাঁকে খা কতক বসিয়ে দেব ঠিক করেছিলুম। কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে এত কষ্ট হ'ল যে পারলুম না।"

"সর্বনাশ, অমন কাজও ক'রো না। কিন্তু কেন তাঁর এ রকম হ'ল? কি এমন ব্যাপার ঘটেছে যাতে তিনি মনে এত অশান্তি পাচ্ছেন?"

"না, কিছুই তো হয় নি! তবে এর আগে—ঠিক আপনি যেদিন গেলেন সেদিন থেকেই—তিনি কি রকম হয়ে গেছেন।"

"খুলেই বল না সব কথা, জুপিটার!"

"কেন সেই পোকাটা—"

"সেটা কি?"

"আমি জোর করে বলতে পারি, ঐ সোনালী পোকাটা ওঁর মাথায় কোথাও কামড়ে দিয়েছে।"

"এ কথা কেন বলছ?"

"কারণ আছে। এমন শয়তান পোকা কখনো দেখি নি। ওটার সামনে যাই পড়ুক না কেন কামড়ে শেষ করে দেবে। খেলা করতে করতে সাহেব তাকে ধরলেন, আবার পরের মুহূর্তে হয়তো ছেড়ে দিলেন—এ রকম কোন সময়ে নিশ্চয় ওঁকে ঐ বিষ-পোকাটা কামড়ে দিয়েছে। ওটাকে আমি দু' চোখে দেখতে পারি নে, ওকে ছুঁইও না। ধরতে হ'লে কাগজ দিয়ে মুড়ে চেপে ধরি।"

"তা হ'লে পোকার কামড়েই তিনি অসুস্থ হয়েছেন বলে তুমি মনে কর?"

"শুধু মনে করি না, আমি জানি। সোনালী পোকাটা যদি না-ই কামড়ে থাকবে তবে রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি সোনার স্বপ্ন দেখেন কেন?"

"কেমন করে বুঝলে উনি সোনার স্বপ্ন দেখেন?"

"কেমন করে? বাঃ, রাত্রে ঘুমের ঘোরে 'সোনা, সোনা' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন —আমি নিজের কানে শুনেছি।"

"হয়তো তোমার কথা ঠিক, জুপিটার! কিন্তু আজ এখানে কেন এসেছ তা তো বললে না! তোমার সাহেব কোন খবর পাঠিয়েছেন কি?"

"হ্যাঁ, তিনি একখানা চিঠি দিয়েছেন"—বলে জুপিটার চিঠিখানা আমার হাতে দিলে। তাতে লেখা ছিল ঃ

"প্রিয়—

এতদিন তোমার সাথে দেখা করতে পারি নি বলে আশা করি কিছু মনে কর নি। তোমার সাথে সেদিন দেখা হবার পর থেকে আমি বড়ই অশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। তোমায় অনেক কথা বলবার আছে, কিন্তু কেমন করে বলব বা একেবারেই বলব কিনা, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে।

কিছুদিন যাবৎ আমার শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না। জুপের সস্নেহ প্রখর দৃষ্টি আমায় পাগল করে তুলছে। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, আমাকে দেখাশোনা করবার জন্যে ও একটা বড় লাঠি তৈরী করেছে। সেদিন ওকে না জানিয়ে বেরিয়েছিলুম বলে ও আমাকে লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল। আমার অসুস্থ চেহারার জন্য বোধ করি সে যাত্রা বেঁচে গেছি। যদি সম্ভব হয়, জুপিটারের সাথে চলে আসবে। অবশ্য অবশ্য আসবে। আজ রাত্রেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই—বিশেষ জরুরী ব্যাপার। সত্যি খুব জরুরী। ইতি—

তোমার বন্ধু উইল।

চিঠিখানা পড়ে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। এ তো উইলের লেখা বলে মনে হয় না। কিসের ভাবনায় তিনি এত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন জানি নে। কোন নতুন পোকা আবার তাঁকে পেয়ে বসে নি তো? জুপিটার যা বললে, তাতে তো ভাল বুঝলাম না। এক একবার ভয় হ'তে লাগল, নানা দুঃখ-কষ্টে পড়ে তাঁর মাথার গোলমাল হয় নি তো?

তখুনি জুপিটারের সঙ্গে যাবার জন্যে তৈরী হলুম। জেটিতে পৌছে দেখি, আমরা যে নৌকোতে যাব তার ভেতরে একখানা কাস্তে ও তিনখানা কোদাল রয়েছে—সবগুলোই একেবারে নতুন বলে মনে হ'ল।

জুপ জানালে, সাহেবের হুকুম মত সে এগুলো শহর থেকে কিনে নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তবে এগুলো যে কোন্ কাজে লাগবে সে তা জানে না এবং তার বিশ্বাস সাহেব নিজেও জানেন না। তবে এ বিষয়ে ঠিক যে এর মূলে আছে সেই পোকাটা। বুঝলুম, ঐ পোকাটাই নিগ্রোর বুদ্ধিকে ঘোলাটে করে দিয়েছে, এখন ওর কাছ থেকে আর বেশী কিছু জানা সম্ভব হবে না। নৌকোয় গিয়ে চাপতেই নৌকো ছেড়ে দিল, বাতাসের সাথে পাল তুলে ভেসে চলল,—ওপারে পৌছুতে বেশী সময় লাগল না। দু' মাইল পথ হাঁটবার পর কুটীরে এসে পৌছুলুম। তখন বেলা প্রায় তিনটে হবে। (ক্রমশঃ)

একটি কাহিনী

শ্রীনবগোপাল সিংহ

কৈশোরের এক স্বপ্নঘন দিনে
একটী কথা শুনি' মায়ের মুখে
মনে রাখার মতন কথার মত
স্মৃতির পাতায় রেখেছিলাম টুকে।
কথাটুকু নেহাৎ সাধারণ
সেবাব্রতের চরম নিদর্শন—
"ভিখারীরে ভাবিস নারায়ণ"
মা কইলেন উপদেশের ছলে;
কথাটুকু নেহাৎ সাধারণ
মনে ছিল মায়ের কথা ব'লে।

বৈদেশিকী প্রভাব এলো মনে
রাজার ভাষায় দখল হ'লো যবে,
প্রাচীনতা ডুবলো নবীনতায়
কল্পকথা হারালো বাস্তবে।
ভিখারীরে দেখলে আসি তেড়ে,
ঝুলিটারে নিয়েই রাখি কেড়ে,
রাশি রাশি বক্তৃতা দিই ঝেড়ে—
"খেটে খেতে পারিস নাকো বুঝি?"
তবু যেন চিমটী কাটে মনে
মায়ের দেওয়া উপদেশের পুঁজি।

বক্তৃতা আর দুর্ব্যবহার দেখে
ভিখারীরা কমই আসে ঘরে;
পুরানোরা আসেই নাকো মোটে,
নতুন কেহ হয়তো এসে পড়ে।
কিন্তু এত শাসন করার পরেও
বকে-ঝকে, রেগে, মেরে-ধ'রেও,
হাজার রকম চেষ্টা এত ক'রেও

ঠেকিয়ে রাখা গেলো না এক ছোঁড়ায়,
আমাদেরই পাড়া-প্রতিবেশী—
নিত্য এসে দাঁড়াতো দোর-গোড়ায়।

জেদাজেদি চলতো পরস্পরের,
তাড়িয়ে দিলেই একটু আড়াল হ'তো.
খানিক পরেই আসতো আবার ফিরে
পচা ডোবায় সবুজ পানার মত।
বকাঝকায় করতো না সে ভয়—
ছোঁড়া নাছোড়বান্দা অতিশয়,
অবশেষে তারই হ'তো জয়—
মায়ের হাতে ভিক্ষে পেতো ঠিক,
অগত্যা সে নিয়ম হ'লো বাঁধা—
সপ্তাহেতে দু'দিন পাবে ভিখ।

মঙ্গল আর শনিবারের ভোরে
নিয়ম ক'রে আসতো সে ভিখ নিতে,
পরাজয়টা মোরই হ'লো শেষে
অকাতরে ভিক্ষে হ'তো দিতে।
একদিন সে ভত্তি দুপুর বেলায়
মত্ত ছিলাম সবাই ক্যারাম খেলায়,—
ভিক্ষে দিলাম অতি অবহেলায়
একান্ত সে মায়ের অনুরোধে;—
"তোরা যে সব মত্ত আছিস খেলায়,
ভিখারীটা দাঁড়িয়ে রবে রোদে?"

সেই দিন ঠিক বিকেল বেলায় দেখি
মা এসে তার দাঁড়িয়ে আছে দোরে,
ছেলেটী তার পরশু গেছে মারা
একদিনকার ম্যালেরিয়ার জ্বরে।

শুনে দুঃখ করছে তখন সবে,
আমি কই, "তা কেমন করে হবে?
এই তো কয়েক ঘণ্টা হ'লো সবে
ভিখ নিয়ে সে বেরিয়ে গেলো নিজে।"
মা কয় তার—"সে কি কথা বাবু,
মিথ্যে ব'লে লাভ হবে তোর কি যে?"
কথায় কথায় তর্ক বাড়ে ক্রমে,
প্রমাণ দেখায় নানা কথার ছলে.
পাড়ার লোকে পুড়িয়ে এলো কারা,
কোন্ ঘাটেতে শ্মশান হ'লো ব'লে।
আমার মনে হয় নাকো প্রত্যয়,
কেন হবে, হবার কথাই নয়.
সকল শুনে মা আমারে কয়—

"তর্ক কেন করিস মিছে বল?
মা হয়ে কি কাঁদতে পারে কভু
করে আপন ছেলের মরার ছল?"

হঠাৎ আমার মনে উদয় হ'লো
মায়ের বলা সেই পুরানো কথা—
"ভিখারীরে ভাবিস নারায়ণ"
এরও মাঝে আছে কি সত্যতা?
ভাবতে যেন লাগলো শিহরণ,
অশ্রু এলো ছাপিয়ে দু' নয়ন,
হায় রে মূঢ়, হায় রে অবোধ মন,
কাছে পেয়েও হারালি তায় আজ!
চিনতে তারে পারলি নে হায়, ওরে!
দেখে তাহার দীন ভিখারীর সাজ।

এভারেষ্ট অভিযানের গল্প

অধ্যাপক শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র, এম্. এ

গত বারে তোমাদের পর পর দু'টি এভারেষ্ট অভিযানের কাহিনী বলেছিলাম, এবারে শোন সেই দলেরই তৃতীয় বা শেষ অভিযানের কথা। এই শেষ অভিযান আরম্ভ হ'ল ১৯২৪ সালে।

বার বার হেরে গিয়ে আরোহীরা হয়ে উঠলেন মরীয়া। তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং অধ্যবসায়ও বেড়ে উঠ্‌ল। এবারে যাঁরা দলে ছিলেন তাঁদের মধ্যে মেলরী আর আইরভিনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এপ্রিলের শেষে রংবাখের কাছে আবার তাঁবু পড়ল। চমৎকার আবহাওয়ার মধ্যে অভিযান আরম্ভ হ'ল। কিন্তু দু' সপ্তাহ পরে আরোহীরা আবার পরাজিত হয়ে ফিরে এলেন, তুষার-ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে তাঁরা এগুতে পারলেন না। কয়েক দিন পর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হ'ল। দড়ি আর মইএর সাহায্যে প্রচণ্ড বায়ু ও তুষারের মধ্যে আরোহণের কায চলল। এক সপ্তাহ প্রকৃতির সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করবার পর তাঁরা অনেকটা এগিয়ে গেলেন। এবার ঠিক হ'ল এক সঙ্গে দু'জন করে এগুবেন।

প্রথম দলে চললেন মেলরী এবং ক্রশ। উত্তর কল পর্য্যন্ত দু'জন নিরাপদে চলে এলেন। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন আরম্ভ হ'ল খাড়াইএর সঙ্গে যুদ্ধ। প্রথম দিনেই এঁরা দু'জন বেশ খানিকটা উঠে গিয়ে ২৫,৩০০ ফিট উঁচুতে তাঁবু ফেললেন। সারারাত সে কি কন্‌কনে ঠাণ্ডা! তাপযন্ত্র শূন্যের অনেক নীচে নেমে গিয়েছে। তাঁবুর বাইরে হাওয়ার সে কি বন্‌ বন্‌ শব্দ! ঠাণ্ডায় অস্থির হয়ে কুলীর দল পরদিন সকালে আর কিছুতেই এগুতে চাইল না। মেলরী আর ক্রশ কত বোঝালেন, কত লোভ দেখালেন, কিছুতেই কিছু হ'ল না। হতাশ হয়ে দু'জন আবার নেমে এলেন।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দল উত্তর কল থেকে এগুতে আরম্ভ করেছিল। এ দলে ছিলেন নরটন আর সমারভিল। প্রথম দলের সঙ্গে পথে এঁদের দেখা হ'ল। প্রথম দলেরই স্থাপিত পাঁচ নম্বরের তাঁবুতে তাঁরা রাত কাটালেন। সকালবেলা ঠিক আগেকার মত কুলীদের সঙ্গে আবার গোলমাল বাধল। এই ঠাণ্ডায় তারা আর ওপরে উঠবে না। অনেক বুঝিয়ে তিনজন কুলীকে রাজী করা গেল। এই কুলীরা শেষ পর্যন্ত যে রকম সাহস ও প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়েছিল তা সত্যিই বিরল।

হাঁফাতে হাঁফাতে প্রায় প্রতি পদক্ষেপে জিরিয়ে ওপরে ওঠা চলল। ছ'নম্বর তাঁবু পড়ল ২৬,৮০০ ফিট উঁচুতে। কুলীরা কায সেরে নীচে নেমে গিয়ে বাহবা পেল। নরটন আর সমারভিল তাঁবুতে রাত কাটালেন। এত উঁচুতে মানুষ বোধ হয় এর আগে আর কখনও রাত্রিবাস করে নি। সারারাত তাঁদের ঘুম হ'ল না। উত্তেজনায় দু'জন অস্থির। মাত্র ২,৩০০ ফিট দূরে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে এভারেষ্ট তাঁদের যুদ্ধে আহ্বান করছে, এমন সময় ঘুমানো যায় কি?

প্রভাত হ'ল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা হামা দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। বরফের আঘাতে সারা দেহ তাঁদের ক্ষতবিক্ষত। অনবরত মুখ শুকিয়ে উঠছে। বিষম পরিশ্রমে দু'জনেই কাঁপছেন। প্রতি পদক্ষেপে চার থেকে বারো বার নিশ্বাস নিতে হচ্ছে। কি কষ্ট! তবু এঁরা এগিয়ে চললেন। একেই বোধ হয় বলে 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন'। পাঁচ ঘণ্টা এমনি করে চলে ২৭,০০০ ফিট—তার পর ২৭,৪০০ ফিট্—ক্রমে ২৮,০০০ ফিটও তাঁরা পার হয়ে গেলেন। এবারে বুঝি এভারেষ্ট পরাজিত হ'ল।

কিন্তু না। দুপুর বেলা সমারভিল আর পারলেন না। গলা শুকিয়ে তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাবার মত হ'ল। আর দু'-এক মিনিট এ রকম ভাবে এগুলে তাঁর মৃত্যু

হ'ত। তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছিল। ইশারায় বন্ধুকে এগিয়ে যেতে ব'লে তিনি থেমে গেলেন। নরটনের অবস্থাও ভাল নয়। তবু তিনি অগ্রসর হলেন। একঘণ্টা চলে তিনি এসে পড়লেন দুর্গম এক তুষার-প্রণালীর সামনে। সামান্য একটু পা পিছলে গেলে অন্ততঃ দশ হাজার ফিট্ নীচে পড়ে মৃত্যু অবধারিত। নরটন তবু হটলেন না। অনেক চেষ্টায় সেটা পার হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর ক্ষমতাও শেষ হয়ে এসেছে। তাঁর মাথা ঘুরছিল, দৃষ্টিশক্তি প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পা দু'টো হয়ে উঠেছিল পাথরের মত ভারী। এই অবস্থায় ২৮,১২৬ ফিট্ উঁচুতে কয়েক মুহূর্ত তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। এভারেষ্ট কত কাছে! তাঁর মনে হ'ল পথ এখান থেকে অনেকটা সরল হয়ে গিয়েছে। হায় রে, দেহে যদি আর একটুও শক্তি থাকৃত! পরাজিত নরটন ফিরলেন। সমারভিল আর নরটন যখন উত্তর কলে পৌঁছুলেন তখন তাঁরা আধমরা। সমারভিল অত্যন্ত অসুস্থ, নরটন প্রায় অন্ধ।

এদিকে মেলরী কিন্তু কিছুতেই দমলেন না। বর্ষা নামবার আগে তিনি তাঁর শেষ চেষ্টায় অগ্রসর হলেন। সঙ্গে রইলেন তরুণ বয়স্ক আইরভিন। প্রথম রাত্রি তাঁরা কাটালেন পাঁচ নম্বর তাঁবুতে, দ্বিতীয় রাত্রি ছ' নম্বরে। নরটন আর সমারভিলের অবস্থা শুনে তাঁরা শ্বাসকষ্ট রোধ করবার জন্য আগেই অক্সিজেন ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন। এইখানে কুলীরা তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করল। নীচে গিয়ে তারা খবর দিল—দু'জনেই বেশ সুস্থ রয়েছেন।

এর পরে আর একজন মাত্র লোক ক্ষণকালের জন্যে তাঁদের দেখতে পান। তিনি অভিযানকারীদেরই একজন,—দলের ভূতত্ত্ববিদ্ ওডেল্। হিসেব মত ১৯২৪ সালের ৮ই জুন মেলরী ও আইরভিনের এভারেষ্ট পৌঁছুবার কথা। ঠিক সেদিনই সকালবেলা ওডেল কিছু খাবার সঙ্গে করে পাঁচ নম্বর তাঁবু থেকে ছ' নম্বর তাঁবুতে যাচ্ছিলেন। দিনটা ছিল বেশ গরম। বাতাসও ছিল না। কিন্তু চূড়োর চারিদিক্ আচ্ছন্ন করে ছিল ঘন কুয়াশার জাল। হঠাৎ ক্ষণিকের জন্যে কুয়াশা সরে গেল। ওডেল দেখলেন বহু উঁচুতে, চূড়ো থেকে আট শ' ফিটেরও কম দূরে, দু'জন লোককে অগ্রসর হ'তে দেখা যাচ্ছে। তাদের দেহগুলি দেখাচ্ছে অতি ক্ষুদ্র। ওডেল অবাক্ হয়ে দু'জনকে দেখছেন, এমন সময় আবার কুয়াশা এসে সব ঢেকে দিল। মেলরী এবং আইরভিনকে তারপর আর কেউ দেখে নি।

চূড়োর কাছাকাছি কোথাও বীর মেলরী আর আইরভিনের দেহ নিশ্চয়ই বরফে চাপা পড়ে রয়েছে। কখন, ঠিক কোথায় তাঁরা মৃত্যু বরণ করলেন তা কেউ

জানে না। এভারেষ্টে পৌঁছুবার আগেই, না ফেরবার পথে মৃত্যু এসে তাঁদের পথ চিরকালের মত রোধ ক'রে দাঁড়াল তাও আমরা জানি না। শুধু জানি—যেমন করে ওডেল তাঁদের দেখতে পেয়েছিলেন—বিরাট শৃঙ্গের নীচে বিন্দুর মত দেহ উচ্চতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে ব্যস্ত। এর পর আর সব রহস্যে ঢাকা।

সত্যিই কি এভারেষ্ট অজেয়?

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মালবাহী ঘোড়াটার পিঠে মাংস বেঁধে নিয়ে শিকারীরা আবার বেরিয়ে পড়লো। ক্রমে বেলা বাড়তে লাগলো; সূর্য্য মধ্যাকাশে এলে বিশ্রামের জন্য থামবে কিনা পরামর্শ চলছে, এমন সময়ে হঠাৎ জো শীষ দিয়ে উঠতেই বাকী দু'জন সচকিত হয়ে উঠলো।

"কী ব্যাপার, জো?"

"রেড্ ইণ্ডিয়ান!"

"য়্যাঁ! কোথায়?" হেন্‌রি উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলো।

সঙ্গে সঙ্গে ক্রুসোর কণ্ঠ থেকেও একটা চাপা উত্তেজিত ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গেলো। লাল-মানুষদের সে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। কেমন করে জানি না, সেও তাদের অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছে।

জো সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমে প'ড়ে মাটিতে কান পাতলো। মাটিতে কান পাতলে এমন অনেক কিছুই শুনতে পাওয়া যায় যা সাধারণতঃ শোনা যায় না।

"ওরা বাইসনের দলটাকে তাড়া ক'রছে।"—জো বললো।—"পনি ব'লেই মনে হচ্ছে ওদের। কান পাতলে তোমরাও ওদের চীৎকার স্পষ্ট শুনতে পাবে। এখন তোমরা কি করতে চাও বলো।"

"সে তো তুমিই ভালো জানো, জো!" ডিক বললো।

"হাঁ, তা তো বটেই!" হেনরি সায় দিলো।

"তা হ'লে শোনো। ঐ যে দূরে বালির ঢিবি দেখা যাচ্ছে, চলো ওখানে যাওয়া যাক। ওখান থেকে চুপি চুপি ওদের পেছন দিকে গিয়ে দেখবো ওরা কি ক'রছে। ওরা যদি পনি হয় তো সোজা ওদের কাছে চ'লে যাবো, আর তা যদি না হয় তো ওখানে ব'সে আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি চিন্তা করা যাবে।"

প্রায় দশ মিনিট ঘোড়া ছোটাবার পর ওরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছলো। বালির ঢিবির আড়ালে লুকিয়ে ওরা আগন্তুকদের লক্ষ্য ক'রতে লাগলো। নীচের সমতলভূমিতে অসংখ্য বাইসন দেখা যাচ্ছে; আতঙ্কে দিশেহারা হ'য়ে তারা ছোটাছুটি ক'রছে ইতস্ততঃ। তাদের বৃত্তাকারে ঘিরে প্রায় এক হাজার অশ্বারোহী রেড-ইণ্ডিয়ান তীর-ধনুক আর বর্শা নিয়ে বৃত্তের পরিধি সঙ্কীর্ণ ক'রতে ক'রতে এগিয়ে চলেছে। কোনো ভীত বাইসন বাইরের দিকে ছুটে আসতেই তারা আবার তাকে মাঝখানে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সেই ভীত, বিহ্বল বাইসনদের অনেকটা কাছে এসে রেড ইণ্ডিয়ানরা একযোগে তাদের আক্রমণ করলো। তারপর যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড শুরু হলো তা বর্ণনার অতীত। বর্শায় আহত হয়ে কোন কোন বাইসন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলো, কেউ বা ক্ষিপ্ত হ'য়ে রেড ইণ্ডিয়ানদের ঘোড়াগুলিকে আক্রমণ ক'রে ধরাশায়ী করলো। কত ঘোড়া আর বাইসন যে মারা পড়লো তার সংখ্যা নেই; অনেক মানুষও সাংঘাতিক জখম হ'লো।

এই নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড থেকে যে কয়েকটা বাইসন রক্তাক্ত দেহে কোন রকমে ওদের ব্যূহ ভেদ কর'তে সমর্থ হ'য়েছিলো তারাও অব্যাহতি পেলো না; বর্শা বা তীরের আঘাতে তারাও ক্রমে ক্রমে ভূপতিত হ'লো।

"এই আমাদের সুযোগ হেন্‌রী, ডিক! নির্ভয়ে আমার সঙ্গে এগিয়ে এসো। এমন কোন ভাব দেখিয়ো না যাতে ওরা আমাদের বন্ধুত্ব সম্বন্ধে কোন রকম সন্দেহ ক'রতে পারে; এবং, আর যা-ই করো, ভুলেও অস্ত্রের ব্যবহার ক'রো না। এসো আমার সঙ্গে!" বলে জো ঘোড়ার পিঠে চড়লো। ডিক আর হেনরিও তখনি সবেগে তার সঙ্গে ধেয়ে চললো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রেড ইণ্ডিয়ানরা ওদের দেখতে পেলো। সঙ্গে সঙ্গে তীর-ধনুক আর বর্শা নিয়ে ওরা প্রস্তুত হ'য়ে রইলো।

জো'র সন্ধানী দৃষ্টি সহজেই চিনে নিলে ওদের সর্দ্দারকে। একটুও ইতস্ততঃ না ক'রে ওরা পূর্ণবেগে তার কাছে ছুটে গিয়ে হঠাৎ ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়লো।

সর্দ্দার পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে রইলো। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, প্রায় উলঙ্গ। কয়লা--কালো ঘোড়াটার ওপর তার ব'সে থাকবার ভঙ্গী দেখে মনে হয়, খুব ছোটবেলা থেকেই সে ঘোড়ায় চড়ায় অভ্যস্ত।

জো পনি ভাষা জানতো। তাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য জো সর্দ্দারকে জানিয়ে দিলো। তাদের জন্য যে তারা উপহার-সামগ্রী এনেছে, তার কথাও জানাতে ভুললো না। কিন্তু সর্দ্দারের কথায়-বার্ত্তায় বেশ বোঝা যাচ্ছিলো যে সে তাদের ওপরে বিশেষ খুসি হয় নি। এই কথাবার্ত্তার মধ্যে দলের আর সবাইএকটু একটু করে তাদের ঘিরে ফেলেছে। তাদের জামা-কাপড়, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওরা যে ভাবে টানাটানি করতে লাগলো, জো তাতে বিশেষ চিন্তিত হয়ে উঠলো।

'মাহতাওয়া আশা করে ফ্যাকাশে-মুখোরা মিথ্যাবাদী নয়।" জো থামলে পর সর্দ্দার বললো, —"কিন্তু সন্ধি করতে সে চায় না। ফ্যাকাশে-মুখোরা অত্যন্ত লোভী, কিছুতেই তারা সন্তুষ্ট হয় না। দূরের পাহাড় দেখিয়ে দিয়ে তারা বলে ঐ পর্য্যন্ত যাবে, কিন্তু সেখানে গিয়েও তারা থামে না। মাহতাওয়া তাদের ভালো করেই চেনে।"

কথাগুলো জো'র কানে মৃত্যুদণ্ডের মত শোনালো; কারণ পনিরা যদি সন্ধি করতে না চায় তো তারা যে তাদের সকলকে হত্যা ক'রে মাথার চামড়া তুলে নেবে (১) এবং সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করবে জো তা ভালো করেই জানে। এর ওপরে হ'লো আর এক বিপদ্। একটা রেড ইণ্ডিয়ান হঠাৎ আচমকা হেনরির রাইফেলটা কেড়ে নিতেই ক্ষিপ্ত হেনরি তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলো, তাকে বাধা দিয়ে জো বললো, "শান্ত হও, হেনরি, এতে তুমি শুধু নিজের মৃত্যুই ডেকে আনবে।"

এমন সময় আর এক সর্দ্দার ঘোড়ায় চড়ে ওদের মধ্যে এসে উপস্থিত হ'লো। এই নতুন সর্দ্দার যে মাহতাওয়ার থেকে উচ্চপদস্থ, তা তার আচরণ এবং তার প্রতি অন্য সকলের ব্যবহার থেকেই স্পষ্ট বোঝা গেলো। মাহতাওয়ার মত অত বলিষ্ঠ না হ'লেও এর আকৃতিতে কমনীয়তার অভাব ছিল না।

"ফ্যাকাশে-মুখোদের দেশে কি শিকার পাওয়া যায় না যে তারা পনিদের দেশে এসেছে?" বড় সর্দ্দার প্রশ্ন করলে।

"আমরা শিকার করতে আসি নি; আমরা পনিদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্য এসেছি।" মাথা থেকে টুপি খুলে নিয়ে সদর্পে জো বললো। "সূর্য্য-ওঠা দেশের আরো দূরে যে নদী আছে, সেই নদীর দেশের বড় সর্দ্দার আমাদের পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ফ্যাকাশে-মুখো আর লাল-মুখোরা কেন বৃথা লড়াই করে? তারা তো ভাই ভাই। একই মনিতু (২) আকাশ থেকে দু' দলের ওপরে দৃষ্টি রাখেন। ফ্যাকাশে-মুখোদের যত মালা, বন্দুক, কম্বল, ছুরি, সিঁদুর আছে সত্ত তাদের দরকার নেই। লাল-মুখোদেরও অজস্র পশুর চামড়া আর পশুর লোম রয়েছে—যার

(১) যুদ্ধে জয়লাভ করলে উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা যুদ্ধজয়ের চিহ্নস্বরূপ শত্রুর মাথার খুলির ওপরের চামড়াটা চুল সমেত ছাড়িয়ে নেয়। একে 'স্কাল্প' করা বলে।

(২) রেড ইণ্ডিয়ানরা ঈশ্বরকে বলে 'মনিতু'।

বিনিময়ে ফ্যাকাশে-মুখোরা সে সব দিতে প্রস্তুত। ফ্যাকাশে-মুখোদের বড় সর্দ্দার আমাকে বলেছেন, লড়াইএর দরকার কি—এসো আমরা শান্তির ধূম পান করি।"

মালা, কম্বল ইত্যাদির কথা শুনে বড় সর্দ্দারের মুখ মুহূর্ত্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণেই সে-ভাব দমন করে কঠোর স্বরে সে বললো, "ফ্যাকাশে-মুখোরা মিথ্যা কথা বলছে। তারা এসেছে ব্যবসা করতে। স্যান্-ইত্-সা-রিশের চোখ খোলা আছে, সে দেখতে পায়। এই-গুলো তোমাদের জিনিষ না?" ব'লে সে মালবাহী ঘোড়াটার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রলো।

"ব্যবসায়ীরা কখনো তাদের মালপত্র নিয়ে শত্রুশিবিরে যায় না। স্যান্-ইত্-সা-রিশের বুদ্ধি আছে, সে সহজেই এ কথা বুঝবে। পনি-সর্দ্দারকে উপহার দেবার জন্যই আমরা জিনিষপত্র এনেছি। শান্তির ধূম পান করা হ'য়ে গেলে পরে আরো উপহার আসবে। ফ্যাকাশে-মুখোদের বড় সর্দ্দারের কাছে আমরা কি সংবাদ নিয়ে যাবো বলো?"

স্যান্-ইত্-সা-রিশ কতকটা শান্ত হ'লো। সে বললো, "এ তো মন্ত্রণা-সভা নয়, এখানে এ সব কথা হ'তে পারে না। ফ্যাকাশে-মুখোদের আমাদের শিবিরে যেতে হবে।"

এ প্রস্তাবে জো'র সানন্দেই রাজী হওয়ার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটু শক্ত হওয়া মন্দ নয়। সে বললো, "আমাদের রাইফেল ফিরে না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা যেতে পারি না। ফিরে গিয়ে যদি আমাদের বড় সর্দ্দারকে বলি যে পনিরা চোর, সে কি ভালো হবে?"

সর্দ্দার ক্রোধে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রলে।—"পনিরা চোর নয়, তারা বিশ্বাসী; তারা রাইফেলটা শুধু দেখবার জন্য নিয়েছিলো। রাইফেল ফেরত পাবে।"

সঙ্গে সঙ্গেই হেনরি তার রাইফেল ফেরৎ পেলে।

ওদের সঙ্গে শিবিরে যেতে যেতে ডিক দেখলো, কয়েক জন বীর (ও দেশে শিকারীদের 'বীর' আখ্যা দেওয়া হয়) মৃত বাইসনের রক্তমাখা কাঁচা হৃদ্‌পিণ্ড চিবোতে চিবোতে চলেছে। ঘৃণায় ডিকের সর্ব্বশরীর রি রি ক'রে উঠলো।

(ক্রমশঃ)

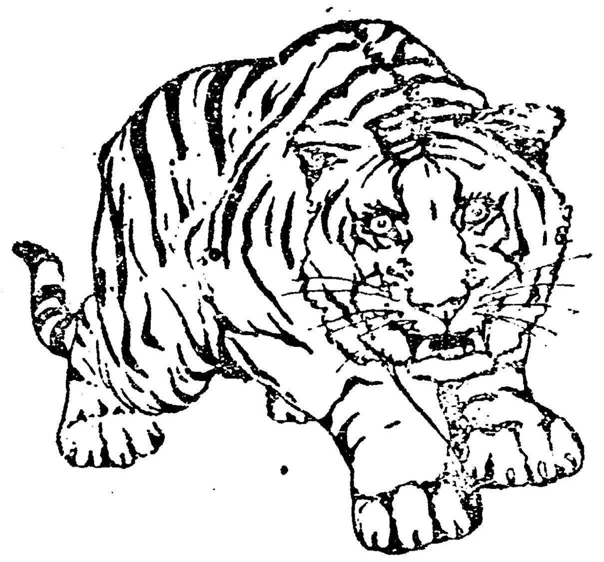

বিসর্জন

জনৈক পুরবাসী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চা আনতো ক্ষিতীন বাবুদের পাচক। 'বিশুদ্ধ কনৌজী ব্রাহ্মণ—কালো, মাথার চুলগুলি অপক্ক কদম-ছাঁটে ছাঁটা, তাতে একগোছা টিকি, অন্নপ্রাশন্ কি জন্ম থেকেই বাড়তে বাড়তে অত বড় হয়েছে। শরীর বেশ বলিষ্ঠ—"মকাই, বুট, ড়হর, সাতুর" যোগফল ; মুখে প্রাচীন কান্যকুব্জের পাথুরে ছাপ।

জঠরাগ্নিতে চা যে ঘৃতের কাজ করে তা 'বিসর্জনের মহড়া দিতে গিয়ে যেমন করে, যতটা বুঝলাম, এমন করে, এতটা আর কিছুতেই কোন দিনই বুঝি নি। এই জন্যই বোধ হয় আমাদের অক্রূর, মানে শ্রীপূর্ণ চক্রবর্ত্তী, যে ক'টি দিন দয়া করে মহড়া দিতে এসেছিলেন সে ক'টি দিনের বেশীর ভাগই এসেছিলেন ভরা পেটে পান চিবতে চিবতে। চা খাবার সঙ্গে সঙ্গেই পেটের ভেতর গড়্ গড়্ করে ছ্যাকরা গাড়ি ছুটতে সুরু করতো। ঐ গাড়ির শব্দেই বোধ হয়, পুরুত ঠাকুর হাঁক দিতেন "আর এক পেয়ালা দাও হে—"। ভাবটা এই, গাড়ীর চাকা জলে ডুবে নিঃশব্দে চলুক।

অক্রূরের পাশে বসে বলতাম, "ভাই রে, ক্ষিদেটা যে আরও বেড়ে উঠ্‌লো—"

অক্রূর চুক্ চুক্ শব্দে পান চিবতে চিবতে ভুঁড়িটা আরও বাড়িয়ে দিয়ে আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে চোখ দু'টি ছোট করে সান্ত্বনার সুরে বলতো, "হোঁ—হোঁ—।" তাতে পেটের আগুন মাথায় গিয়ে চড়তো। হাতখানা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নেপাল, মানে শ্রীউপেন মল্লিককে, বলতাম, "একটা সিগারেট দে—।"

সে চাঁদমুখে ফিক ফিক্ করে হাস্‌তে হাস্‌তে বলতো, "এই যে দাদা—"

এমন অমায়িক মানুষ কোথাও দেখি নি। হাইকোর্টের উকিল। ছবি দেখলেই বুঝ্‌তে পারা যায়, কেন ওকে হাইকোর্টে সবাই বলে "জামাইবাবু"। ওর রচিত হাস্যরসে ভরা কবিতাগুলো পড়তে পড়তে, শুনতে শুনতে মনে হয় ওর মনে রয়েছে হাস্য-মল্লিকার অফুরন্ত বন! এ সব তারি জমাট নির্যাস।

এই অবস্থায় সিগারেটের ধোঁয়া, চায়ের পেয়ালার ঠুং ঠাং আওয়াজ, কাশি, চাপা হাসি, ঈষৎ বিষাক্ত দংশনের মতো মন্তব্য ভরা ঘরখানিতে পুরুত ঠাকুরের সামনে হাতযোড় করে রাণী বলেন—"ঠাকুর—কি হবে ঠাকুর—?"

সুদীর্ঘ, সুপুষ্ট, সুপ্রাচীন অঙ্গুলিতে তুড়ি দিয়ে স্থূল কণ্ঠে পুরুত ঠাকুর বল্লেন, "জানেন তা মহামায়া! এই শুধু জানি—"

রাজা হুকুম দেন, "জনতা, ওঠ!" যেমন যাত্রার জুড়ি ওঠে আমরাও তেমনি এদিক্ ওদিক্ থেকে উঠে পড়ি। কেবল গান ধরি না।

একদিন দ্বিজুদা' প্রম্প্‌ট্ করতে লাগ্‌লো। আমি যে অংশে অভিনয় করেছিলাম, তার কথাগুলির মধ্যে এক জায়গায় আছে, "তোদের পায়ে কি কাঁটা ফুটেছিল যে—"

দ্বিজুদা' বললে, "তোদের পায়ে কি বাঁটা ফুটেছিল—? নেন্—নেন্—বল্লেন, তোদের পায়ে কি বাঁটা ফুটেছিল?"

কাঁটা ফুটলে জ্বালা করে, আর বাঁটা ফুট্‌লে যে হাসি—এ বোধ করি বলে

শ্রীযুক্ত কল্যাণকুমার রায় চৌধুরী

শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

দিতে হবে না। দ্বিজুদা' অপ্রস্তুত হয়ে শব্দটি ভাল করে দেখে একটু হেসে বলে, "কাঁটাই বটে!"

রিহার্সাল চলে। আর ঠিক সেই সময়েই বাকী সকলের মনে এমন সব "ইম্‌পর্ট্যান্ট" কথা ঠেলা দিতে থাকে যে পাশের লোকটিকে না বলে থাকতে পারে না। অভিনেতারা মাঝে মাঝে যেখানে খুশি সেখানে ইট-পাটকেলের মতো "ভয়েস থ্রো" করছেন, কেউ কিছু বলবার নেই। কারণ সবাই পাকা নট। বললেই বা শুনচে কে? কারো পিছনে এম্পায়ার ও রেডিও, কারো পিছনে শিশির বাবু ও বিশ্বভারতী, কারো পিছনে স্বর্গীয় ডি. এল. রায় ও স্বর্গীয় নির্মলেন্দু বাবু। এই

অবস্থায় "ইম্‌পর্ট্যাণ্ট" কথাগুলোও যে পাশের লোকটির কর্ণকুহরে "থ্রো" করবার ইচ্ছা হবে এবং তাই করাও হবে এতে আর আশ্চর্যের কি? ফলে হট্টমন্দির।

পুরুত ঠাকুর বলেন, "যদি এ রকম হট্টগোল হয়, আমি চললাম—" বলেই তাঁর লাঠিগাছটির দিকে হাত বাড়ান। তারপর বলেন, "এখানে সিগারেট খাওয়াও চল্‌তে পারে না। উই মাস্ট্ কীপ্ ডিসিপ্লিন।" বলে এদিক্ ওদিক্ তাকান।

কথাগুলি শুনেই গলায় ও নাকে তূলোর মতো ধোঁয়া জমে, কুণ্ডলী পাকিয়ে আটকে যায়। জানি না উনিই প্রকাশ্য সভায় ও সিনেমা-থিয়েটারে ধূমপান নিষিদ্ধ করবার মূলে আছেন কিনা। কারণ এই আইনটি ঐ ঘটনার পরেই বিধানসভায় বিধিবদ্ধ হয়েছে।

কথা কয়টি শুনেই সকলের আগে বাইরে বেরিয়ে যান রাজ-ভ্রাতা নক্ষত্র-রায়, মানে শ্রীসুনির্মল বসু। এসেই বলেন, "ওঁর যত আপত্তি আমার সিগারেট খাওয়ায়—"

জিজ্ঞেস করি, "কেন বলুন তো?"

মনে হয়, সুনির্মল বাবু "একদা পুরাকালে" মোটা-সোটা ছিলেন, এখন এমন রোগা হয়েচেন, গলার 'বগা' এমন ভাবে ঠেলে উঠেচে যে রাজরোষে পতিত ও নির্বাসিত রাজভ্রাতার কখন এমন হয় না। কারণ রাজ্যহীন রাজবংশের বহু বংশধর ও ধারিণীকে তো এখনও এপাড়ায়-ওপাড়ায় বাস করতে দেখি। তাঁদের কারো চেহারা তো এমন হ'তে দেখি নি! তবে আমরা সাধারণ মানুষ, রাজা-রাজড়ার কথা কীই বা বুঝি!

বলি, "আপনার স্বাস্থ্যের জন্যে বুঝি ওঁর আপত্তি?"

"না। উনি আমার পিতৃবন্ধু।" 'বলেই উদাস ভাবে তাকিয়ে সজোরে সিগারেটে টান দেন। সিগারেটের মুখ থেকে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে আসে।

ঘরের ভেতর থেকে তখন গম্ গম্ করতে করতে পুরুত ঠাকুরের কণ্ঠনিনাদ ছুটে আসে—"হাঃ—হাঃ—হা—আ—

আমি রক্ষা করিব তোমারে?"

নিজেদের মধ্যে বলাবলি করি. "যোগেনদা' ইজ্ ম্যাচলেস্। ওঁর কণ্ঠস্বর, চেহারা, হাব-ভাব সত্যিই ষ্টেজ-সুটিং—এখন শেষ অবধি উনি থাকলে হয়।"

কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন, "শেষ অবধি প্লে হবে তো?"

"হওয়াতেই হবে—" বলে নিজের মনকে উৎসাহ ও সাহস দি।

লোকের মনের কথা না জানতে পারায় সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। তার ওপর তা যদি রাজ-রাজড়াদের মনের কথা হয়! রাজসভায় যে সলা-পরামর্শ নেপথ্যে চলছিল তা আমরা জানতেই পারি নি।

শেষে একদিন কয়েকটি মহিলার—নামগুলি বিস্মৃতির ফাঁক দিয়ে একেবারে গলে গেছে—নাম ও গুণপণার—দৈহিক ও মানসিক—কথা শোনা যেতে লাগলো। তাঁরা নাকি এ যুগের কলকাতার এক একজন এক একটি পরম বিস্ময়। আমাদের ভিখারিণী ও অপর্ণাকে সরিয়ে তাঁদের দিয়ে অভিনয় করালে নাকি কলকাতা কোন্ ছার, সারা ভারত ভেঙ্গে পড়বে দেখ্‌তে। তাঁরা "ওখানে প্লে করেছেন", "সেখানে প্লে করেছেন", এবং যেখানেই প্লে করেছেন সেখানেই লোকে হাততালি দিয়েছে। প্রথমে মনে করেছিলাম, তাঁরা আমাদের দলে এসে ক্ষ্যান্তমণি, নিস্তারিণী হবেন। তাই পুলকিত হয়ে উঠেছিলাম। শেষে শোনা গেল, তাঁদের "ট্যালেণ্ট" অতটুকুতে কুলোবে না। তা অবশ্য সত্য। আধপো বাটিতে একপো "হনুমান"-মটর ভিজলে তাতে কি আঁটে?

শুনে বেচারী অর্পণা ও মহারাণীর মুখ তো ম্লান। কিন্তু আমরা জনতা, আমরা সাধারণ মানুষ, আমরাও শক্ত হয়ে দাঁড়ালাম। অবশ্য তাই বলে নিশান হাতে "আমাদের দাবী মানতে হবে" বল্‌তে বল্‌তে সারা ঘরে নৃত্য করে বেড়াতে লাগলাম না।

রাজসভার কয়েকজনও আমাদের কায়দায় ফেলবার চেষ্টায় রইলেন। শেষে একদিন আমাদের মধুচক্রে এসে বসলেন—মৌমাছি মৌমাছির চাষ করতে গেলে মৌমাছিকে ডেকে আন্‌তে হয়। সেই ভাবেই রাজামশাইরা কয়জনে মিলে তাঁকে নিয়ে এসে বসিয়ে দিলেন। লক্ষ্য, জয়সিংহের মধুময় অংশ অভিনয় করিয়ে মাধুর্য উপভোগ। কিন্তু তার আগেই হুলোহুলি শুরু হয়ে গেল। (ক্রমশঃ)

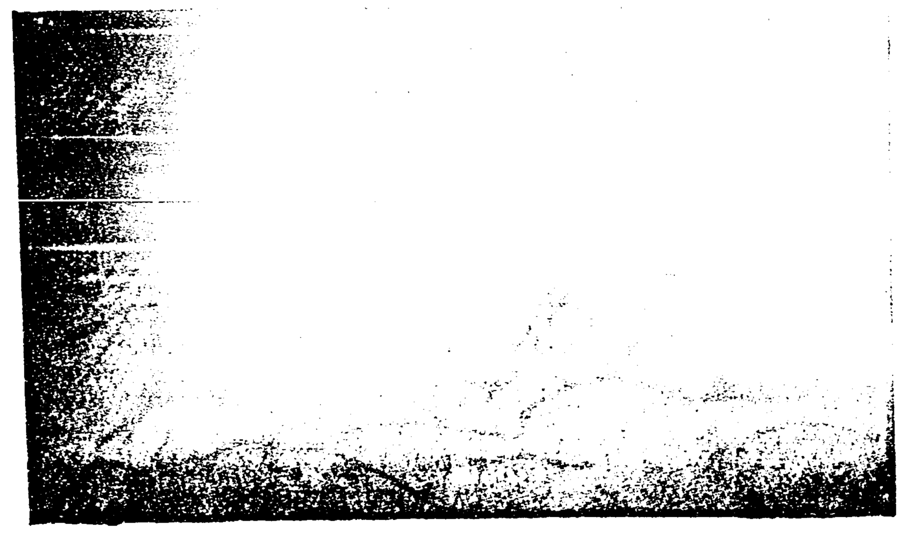

কলকাতার তৃতীয় টেষ্ট

শ্রীসুস্নাত গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতার বড়দিন জমে উঠলো এম. সি. সি. বনাম ভারতের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচকে ঘিরে। ইডেন গার্ডেনের ন্যাশন্যাল ক্রিকেট ক্লাব মাঠের অসমাপ্ত রঞ্জি স্টেডিয়াম উপ্‌চে উঠলো দর্শকদের ভীড়ে।

৩০শে ডিসেম্বরের পরিষ্কার রোদ-ঝরা শীতের সকাল। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক হাওয়ার্ড টসে জিতে গোড়াপত্তন করতে পাঠালেন রবার্টসন আর স্প্ নারকে—ফাদকার আর দিভেচার বোলিং-এর মুখোমুখি হ'তে। রমেশ দিভেচা অক্সফোর্ড-ব্লু, এই প্রথম টেস্টে নামলেন। উইকেটও তিনি প্রথম নিলেন—রবার্টসনকে ১৩ রানে ফাদকারের হাতে কট আউট করে। টম্ গ্রেভনী দলের সেরা ব্যাট-চালিয়ে, ইংল্যাণ্ডের উঠতি খেলোয়াড়দের মধ্যে তাঁর নামডাকই বেশী। তিনি এবার নামলেন। গ্রেভনীর দশ রানের সময়ে ভারত-সফরে তাঁর হাজার রান পূর্ণ হ'লো। কিন্তু লাঞ্চের ঠিক আগেই তিনি ২৪ রান করে দিভেচার বলে স্লিপে অমরনাথের হাতে আটকে গেলেন। লাঞ্চের পর নামলেন স্পুনার আর ওয়াটকিন্স। দু'জনেই ন্যাটা ব্যাটসম্যান। হাজারে ঘন ঘন বোলার বদলেও ফল পেলেন না। এঁরা দু'জনে সুযোগ বুঝে পেটালেও বিশেষ কোনো ঝুঁকি নিচ্ছিলেন না। তবে ৭১ রানের মাথায় স্প্ নার হঠাৎ আউট হলেন মানকাদের বলে পি, সেনের হাতে ক্যাচ্ তুলে। কেনিয়ন এলেন, কিন্তু তিন রান করেই মানকাদের বল লেগে পিটে মঞ্জরেকারের হাতে পাঠিয়ে তাঁবুতে ফিরে গেলেন। এবার জুটি বাঁধলেন পুল আর ওয়াটকিন্স। এঁরা দু'জনেই ঠুকঠাক করে দিনটা কাটিয়ে দিলেন। প্রথম দিনের একঘেয়ে নীরস খেলায় ইডেন গার্ডেনের নতুন গড়া অতিকায় স্কোর-বোর্ডে উঠলো মোটে ২১৭ রান।

দ্বিতীয় দিনের খেলাও তেমনি টিমে তেতালে চললো। যেন কে কত বেশী সময়ে কত কম রান তুলতে পারেন ইংল্যাণ্ডের ব্যাট্সম্যানদের মধ্যে তারই প্রতিযোগিতা চলছে। খেলায় হার এড়িয়ে ড্র করাটাই যেন প্রথম থেকে তাঁদের ইচ্ছে বলে মনে হ'লো। ভারতের বোলাররা নতুন বলেও বিশেষ কিছুই করতে পারলেন না। আর ফিল্ডাররাও তাঁদের ঐতিহ্য বজায় রাখলেন হাত থেকে সহজ বল ফস্কে। যাই হোক, ওয়াটকিন্স এক ঘণ্টার মধ্যেই ফাদকারের বলে পি, সেনের হাতে ধরা পড়লেন ৬৮ রান করে। লাঞ্চের আগে আর মোটে দু'টো

উইকেট পড়লো—পুল আর স্ট্যাথাম। দু'টোই ফাদকার নিলেন। পুল মন্দ খেলেন নি, ৫৫ রান তুলেছেন।

ইংল্যাণ্ডের ভালো ভালো ব্যাট্সম্যানেরা আউট হয়ে গেলে কি হবে, মাঝারি বা আনাড়িরাও আড়াইটে পর্য্যন্ত উইকেট আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ধৈর্য্যের জন্যে কোনো মেডেল থাকলে সকলেই একটা করে পেতেন। মানকাদ্ দু'টো উইকেট্ পেলেন, আর লীড্‌বিটার ৩৮ রান করে রান আউট হলেন। পি, সেন স্টাম্প করেছিলেন রিজওয়েকে। তাঁর উইকেট কীপিং উঁচুদরের হয়েছিল। বাংলার দর্শকেরা ন' ঘণ্টা পনের মিনিট ধরে ইংল্যাণ্ডের ৩৪২ রান তোলা দেখলো।

এর পর স্ট্যাথাম আর রিজওয়েরের বলে খেলতে নামলেন ভারতের ওপনিং জুটি পংকজ রায় ও ভিনু মানকাদ্। তাঁরা দু'জনেই ভালো খেলে দিনের শেষে যথাক্রমে ৪০ ও ২০ রান করে নট্ আউট রইলেন। কোন উইকেট না খুইয়ে ভারত তুললো ৬৫ রান।

কিন্তু খেলাটা যে ক্রিকেট এবং ক্রিকেট খেলার রং যে কত তাড়াতাড়ি বদ্‌লে যেতে পারে সেটা বোঝা গেল নতুন বছরের প্রথম সকালেই। বিনা উইকেটে ভারতের ৬৫ রানের কথা শুনে সেদিন যারা ভারতের ব্যাটিং দেখতে গেলো, তারা শুধু গেলো দলের ভাঙন দেখতে। আর মাত্র দু' রান করেই পংকজ রায়, আর দশ রান করেই পলি উম্রীগড় আউট হলেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই দু'টো উইকেট পড়লো—দু'টোই নিলেন রিজওয়ে। ট্যাটারসল বল করতে এসেই তাঁর প্রথম ওভারে হাজারে আর অমরনাথের উইকেট ফাঁক করে দিলেন। হাজারে পর পর দু'টো টেস্টে সেঞ্চুরী করবার পর তৃতীয় টেস্টে করলেন দু'রান। আর অমরনাথকে কষ্ট করে এক রানও করতে হয় নি। ৯৩ রানের মধ্যেই ভারতের চরটে দিক্‌পাল ব্যাট্সম্যান ফিরে গেলেন।

এর পর ভারত ফলো অন করবে কিনা তাই নিয়ে যখন জল্পনা-কল্পনা চলছে, তখন জুটি বাঁধলেন ফাদকার আর মানকাদ্। মানকাদ্ কিন্তু সেই প্রথম থেকে তখনও খেলে চলেছেন। তিনি দেখালেন যে, শুধু বোলিং-এই নয়, ব্যাটিংএও তাঁর সেই পুরানো কৃতিত্ব তিনি একেবারে হারিয়ে ফেলেন নি ; সেই অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতের ওপ্‌নিং ব্যাট্ মানকাদ্ তাঁর মধ্যে আবার ফিরে এসেছেন। ফাদকার-মানকাদ্ জুটি দৃঢ় হাতে ব্যাট্ চালিয়ে দলকে বাঁচালেন। লাঞ্চের পর কিন্তু মানকাদ্ আউট হলেন ৫৯টি দামী রান করে ; লিড্‌বিটারের বলে ট্যাটারসল তাঁকে লুফলেন।

তখনো ৫ উইকেটে কিন্তু ১৪৪এর বেশী রান ওঠে নি। এই সময়ে নামলেন তরুণ মঞ্জরেকার। মঞ্জরেকার ভালো খেলে দলের ও নির্বাচকদের মুখ রাখলেন। আগামী দিনের ভারতবর্ষের তিনি একজন সেরা ব্যাট-চালিয়ে। নতুন দিনের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলো তাঁর খেলায়। বিশেষ করে দলের মহারথীরা যেখানে ০, ২ বা ১০ রানে আউট হয়ে মুখ চূণ করে ফিরে গেছেন, সেখানে দৃঢ় পায়ে দাঁড়ানো আর বল পেটানো সোজা কথা নয়। মঞ্জরেকার চটপট রান্ তুলে ফাদকারকে ধরে ফেললেন। চা-এর পর, যখন তাঁদের মধ্যে কে আগে ৫০ রান্

তুলবেন তার জন্যে জোর প্রতিযোগিতা চলছে, তখন, ট্যাটারসলকে বেদম পেটাতে গিয়ে বোল্ড হয়ে ফিরলেন মঞ্জরেকার। ফাদকার ৭২ রানে নট আউট রইলেন গোপীনাথের সংগে জুটি বেঁধে। দিনের শেষে রান্ উঠলো ৬ উইকেটে ২৫৭।

পরের দিন আকাশ রইলো মেঘলা হয়ে। গোপীনাথ ১৯ রানে আউট হয়ে গেলেন। অবশ্য তাঁকে এর জন্যে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তিনি তখন জ্বর থেকে উঠেছেন। দিভেচা এসে মন্দ খেললেন না, বেশ পেটালেন খানিকক্ষণ। এই সময়ে বৃষ্টি পড়লো একটু। কিন্তু তাতে ক্ষতি হ'লো না খুব। দিভেচা ২৬ রানে আউট হ'লে গুপ্তে এসে কোন রকমে কয়েকটা বল ঠেকিয়ে শূন্য রানেই আউট হলেন। ফাদকার কিন্তু তখনো ধীর হাতে খেলে চলেছেন। এই সময়ে তিনি সেঞ্চুরি করলেন। মাঠের ত্রিশ হাজার দর্শক তাঁকে অভিনন্দন জানালে হাততালি দিয়ে, কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে, পট্কা ফাটিয়ে। দলের বিপদের মুখে অদ্ভুত দৃঢ়তা দেখিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে, তিনি এখনো একজন সত্যি চৌকস খেলোয়াড়।

নেহাৎ অলৌকিক কিছু না ঘটলে খেলা যে ড্র হবে সে বিষয়ে এখন কারো সন্দেহ ছিল না। কাজেই তখন খেলার একমাত্র আকর্ষণ ছিলো—ভারতবর্ষ ইংল্যাণ্ডের টোটালকে ছাড়িয়ে যেতে পারে কিনা। এবারে ফাদকার পেটাতে শুরু করলেন। ট্যাটারসলের বলকে প্রচণ্ড ভাবে পিটিয়ে তিনি সোজা দর্শকদের মাথার ওপরের সামিয়ানায় ফেল্লেন। পি. সেনই ভারতের টোটাল ইংল্যাণ্ডের ওপরে আনলেন। এর পরেই কিন্তু ফাদকার আবার পেটাতে গিয়ে আউট হওয়ায় ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হ'লো ৩৪৪ রানে—ইংল্যাণ্ডকে ছ' রানে ছাড়িয়ে।

ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নেমে ৫২ রানের মাথায় কিন্তু রবার্টসনকে হারালো। মানকাদের বলে তাঁকে ষ্টাম্প করলেন সেন। তখন তিনি সবে ২২। গ্রেভ্‌নি এবারেও খেলা দেখাতে পারলেন না, ২১ রান করে দিভেচার বল সেনের হাতে তুলে তিনি ফিরলেন। দিনের শেষে ছ' উইকেটে ইংল্যাণ্ডের ১০০ রানও উঠলো না। কিন্তু এটা বেশ বোঝা গেল যে, একটা আশ্চর্য কাণ্ড না ঘটলে ভারতের জিতবার আশা নেই। ক্রিকেটে আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে বটে, কিন্তু ইচ্ছেমতো তো আর ঘটে না!

শেষ দিনের শুরুতেই কিন্তু মাঠে অদ্ভুত চাঞ্চল্য দেখা দিলো। মিনিট পনেরোর মধ্যেই দিভেচা আর ফাদকার ওয়াটকিন্স (২) আর কেনিয়নের (০) উইকেট ছিট্‌কে দিলেন। তখন সবে ১০০ রান উঠেছে। দর্শকেরা অদ্ভুত কিছু ঘটবার আশায় যখন নড়েচড়ে বসলো, তখনই আবার অরম্ভ হ'লো ইংল্যাণ্ডের সেই চিরন্তন সময়-কাটানো ঢিমে তালে খেলা। লাঞ্চ পর্যন্ত এই রকম চললো। জয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে লাঞ্চের পর দর্শকেরা যখন স্প্‌নারের সেঞ্চুরি হ'লে হাততালি দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছে, তখন ৯২ রানের মাথায় স্প্‌নার মানকাদের বলে বোল্ড হয়ে ফিরলেন। এর পরে আর বেশী কিছু লেখবার নেই। হাওয়ার্ড আর পুল বাকী সময়টা কাটালেন। ভারতের ফিল্ডারদের হাতে কয়েকটা ক্যাচ ফস্কালো। পুল এরই মধ্যে চলনসই খেলে ৬৯ করলেন। চা-এর সময়ে ইংল্যাণ্ড ৫ উইকেটে ২৫২ রান করে দান ছেড়ে দিলো।

চা-এর পর যখন ভারত ব্যাট করতে নামলো, তখন পাঁচদিনের অসহ্য খেলায় বিরক্ত

দর্শকেরা দেখতে চাইলো একটু উজ্জ্বল ক্রিকেট, দেখতে চাইলো বেপরোয়া ব্যাটিং। শুধু সেইটুকুর জন্যেই দর্শকেরা তখনো বসে রইলো, কারণ খেলা তো আগেই ড্র হয়ে গেছে। কিন্তু পংকজ রায়ের এখনকার খেলা দেখে মনে হ'লো যেন তিনি দলের ভাঙনের মুখে ওপনিং ব্যাট করছেন। বোধ হয় ইংল্যাণ্ডের খেলার ছোঁয়াচ লাগায় তিনি প্রথম ইনিংসের পংকজ রায়কে হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু দর্শকদের নিরাশ হ'তে দিলেন না মানকাদ্। বলের পর বল বেপরোয়া পিটিয়ে তিনি রানের পর রান তুলতে লাগলেন। লিডবিটার যখন তৃতীয় টেস্টের শেষ বল করতে আসছেন, তখন ভারতের রান উঠেছে ৯৯। শেষ বলে মানকাদ্ ভারতের রান একশ'র কোঠায় তুলতে পারেন কিনা দেখবার জন্যে সমস্ত দর্শক যখন উত্তেজনায় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে, তখন মানকাদ্ শেষ বলটি বিদ্যুৎগতিতে বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে দেড় ঘণ্টায় ভারতের ১০৩ রান তুললেন, নিজে ৭১ রানে রইলেন অপরাজিত। খেলার শেষে এবারে কিন্তু উইকেট কাড়াকাড়ির ধূম পড়ে নি, কারণ এম্. সি. সি. থেকে নাকি এই নিয়ম শোধরাবার চেষ্টা চলছে।

ইডেন গার্ডেনের বুকে সবচেয়ে নীরস টেষ্ট খেলা এইভাবে ড্র হ'লো। ইংল্যাণ্ড যদি তাদের স্বভাব না শোধরায় তবে বাকী দু'টো টেষ্টও হয়তো এই রকম হবে। একটা ব্যাপার বেশ বোঝা গেলো, ব্যাটিংএ ভারত যতই শক্তিশালী হোক, উঠতি বা পড়তি বোলারদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে বিপক্ষকে চটপট আউট করতে পারে। যেদিন ভারত ভালো বোলার খুঁজে পাবে আর যেদিন ভালো ফিল্ডিং করতে শিখবে সেদিন ভারত ক্রিকেটে পৃথিবীর যে কোন দলের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারবে।

হিন্দী দোঁহা

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম্. এ, বি. এস্-সি

ইতিপূর্ব্বে তোমাদের কয়েকটী হিন্দী দোঁহা ও তাহার অনুবাদ শুনাইয়াছি। আজ আর কয়েকটি দিয়া শেষ করিব।

"ভাটকে ভালা বোলনা চলনা,
বহুড়ীকে ভালা চুপ,
ভেককে ভালা বর্ষা বাদর,
অজকে ভালা ধূপ।"

অনুবাদ :—ভাটের পক্ষে বেশী বেড়ান ও বেশী বলা ভাল। গৃহ-বধূর পক্ষে চুপ করিয়া থাকাই ভাল। বেঙের পক্ষে বর্ষা বাদল ভাল, ছাগলের পক্ষে রৌদ্র ভাল।

"প্রীত ন টুটে অন মিলে, উত্তম মন কি লাগ,
শত যুগ পানিমে রহে মিটে না চকমককে আগ।"

অনুবাদ :—ভাল মনের প্রীতি (ভালবাসা) অদর্শনে নষ্ট হয় না। শত যুগ জলের মধ্যে থাকিলেও চকমকি পাথরের অগ্নিনির্ম্মাণ-শক্তি নষ্ট হয় না।

"জল বীচ কুমুদ বসে, চন্দা বসে আকাশ,
যো জন যাকে হৃদ্ বসে, সো জন তাকো পাশ।"

অনুবাদ :—জলের উপর কুমুদ ফুল বসে, চন্দ্র আকাশে বসে। যে জন যাহার হৃদয়ে বসে সে জন তাহার পাশেই থাকে।

"যো যাকে পেয়ার লগে, সো তাকো করত বাখান,
জ্যায়সে বিষকে বিষ-মকখি মানত অমৃত সমান।"

অনুবাদ :—যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার গুণ বর্ণনা করে। যেমন বিষ-মক্ষিকা বিষকে অমৃত সমান মানে।

"যো প্রাণী পরবশ পরো, সো দুখ সহত অপার,
যূথপতি গজ হোই, সহেঁ বন্ধন অঙ্কুশ মার।"

অনুবাদ :—যে প্রাণী অত্যন্ত পরবশ সে অপার দুঃখ সহে। পোষা হাতী যূথপথি গজরাজ হইলেও বন্ধন ও অঙ্কুশের আঘাত সহ্য করে।

"তুলসী জগৎমে আইয়ে সবসে মিলিয়া ধায়,
ন জানে কোন ভেকসে নারায়ণ মিল যায়।"

অনুবাদ :—কবি তুলসীদাস জগতে আসিয়া সবারই সহিত মিলিয়া চলেন; জানেন না কোন্ বেশে নারায়ণ দেখা দিবেন।

অবন ঠাকুরের গল্প

শ্রীশেফালী চক্রবর্ত্তী

সেদিন ছিল ৭ই আগষ্ট, ২২শে শ্রাবণ।

সারা জগৎকে শোকসাগরে ভাসিয়ে ভারতের রবি সেদিন অস্তমিত। ধীর শান্ত পদক্ষেপে বুকভরা শোক নিয়ে দলে দলে লোক চলেছে ঠাকুর-বাড়ীর দিকে, তাদের প্রিয় কবিকে শেষ প্রণাম আর অর্ঘ্য জানাতে।

শ্বেত বস্ত্রে আর শ্বেত পুষ্পে আপাদমস্তক আবৃত কবি শুয়ে আছেন। মুখে তাঁর স্বর্গীয় হাসি। ঘরের সামনে অসংখ্য লোক, সবাই সজল চোখে প্রতীক্ষা করছে।

এমন সময়ে ধীরপদক্ষেপে ঘর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এলেন। সবাই চিনল, ইনি ভারতগৌরব অবনীন্দ্রনাথ। শান্ত, সৌম্য অথচ বেদনা-মলিন তাঁর মূর্ত্তি, কি যেন তিনি বলতে চান, বলতে পারছেন না। গলার স্বর যেন কিছুতেই বেরোতে চায় না। অবশেষে তিনি কয়েক জনকে এককোণে ডেকে নিয়ে বললেন—"আজ আমাদের বড় শোকের দিন, নয় কি? এত বড় শোক বাংলায় হয়ত আর আসে নি।" এই বলেই হঠাৎ কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর। জোর করে যেন তিনি একটু শক্তি আহরণ করে বললেন—"জানো, আজকে আমার জন্মদিন?" বলেই তিনি মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। তাঁর সমস্ত ক্রোধ যেন মৃত্যুর উপরে, আর সমস্ত অভিমান রবীন্দ্রনাথের উপরে।

কাজীর বিচার

শ্রীবিমলচন্দ্র সেন

এক ধনবান্ বণিকের একমাত্র পুত্র বিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল। তাহার পর বহুকাল আর তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বণিক মৃত্যুকালে সমস্ত ধনসম্পত্তি কাজীর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে এক ব্যক্তি আসিয়া মৃত বণিকের পুত্র হিসাবে ঐ সম্পত্তি দাবী করিয়া বসিল। তারপর ক্রমে ক্রমে আরও দুইজন দাবীদার আসিয়া জুটিল।

কাজী মহা ভাবনায় পড়িলেন। শেষে তাঁহার মাথায় এক বুদ্ধি আসিল। মৃত বণিকের পুত্র ভাল তীরন্দাজ ছিল। কাজী ঠিক করিলেন, ঐ ব্যাপারেরই সাহায্য লইয়া কৌশলে তিনি বিচার শেষ করিবেন। তিনি তখন মৃত বণিকের বিরাটকায় একখানি ছবি প্রস্তুত করাইয়া দাবীদারদের ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা

প্রত্যেকে এই লক্ষ্যভেদের পরীক্ষা দাও। দূর হইতে এই ছবিটির মাঝখানে তীর বিঁধাইতে হইবে।"

দাবীদার সব কয়জনই ভাল তীরন্দাজ, তাহাদের একজন তখনই ধনুক লইয়া পরীক্ষায় নামিয়া পড়িল। তাহার তীর ছবির বুকের কাছ দিয়া বাহির হইয়া গেল। দ্বিতীয় দাবীদারের তীর কিন্তু ছবির বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল।

কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তিকে ডাকা হইলে সে বলিল, "সম্পত্তি না পাই ক্ষতি নাই, কিন্তু পরমারাধ্য পিতৃদেবের বুকে আঘাত হানিতে পারিব না। তা হোক না সে ছবি। তার চেয়ে আরও অনেক দূরে ক্ষুদ্রতর অন্য ছবি রাখুন, তীরবিদ্ধ করিব।"

কাজীর আদেশে তাহাই করা হইল। যুবকও অবলীলাক্রমে সেই ক্ষুদ্র ছবির বক্ষ বিদ্ধ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিল।

তীক্ষ্ণধী ও সদ্বিচারক কাজী উহাকেই সম্পত্তির প্রকৃত অধিকারী সাব্যস্ত করিয়া সমস্ত সম্পত্তি দিয়া দিলেন।

খোস-খবর

মিসেস এলিস গ্রোভার হচ্ছেন লণ্ডন ব্যুরো অব্ এডমণ্টনের মেয়র। তাঁর বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ বছর। গত এগারো বছর ধরে তিনি ডাকপিয়নের কাজ করছেন, মেয়র হবার পরেও তা ছাড়েন নি। ভোর সাড়ে পাঁচটায় উঠে তিনি পিয়নের কাজে অর্থাৎ চিঠি বিলি করতে বেরোন। বিকেল ৫।।টা পর্যন্ত সে কাজ চলে। ফিরে এসে নিজে রান্না করেন, তার পর সন্ধ্যা হ'লে চলে যান টাউন হলে। তখন তাঁর কাজ হচ্ছে সভাসমিতি পরিচালনা করা আর মেয়রের অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ সব কাজ।

* * *

এই ঘটনাটি ঘটেছিল অল্প কিছুদিন আগে বিহারের এক গ্রামে। একটি চাষী-বৌ তার ১৬ মাস বয়সের ছেলেকে ক্ষেতের এক কোণে শুইয়ে রেখে স্বামীর সঙ্গে ক্ষেতের অন্য দিকে কাজ করছিল। হঠাৎ কোত্থেকে একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে এসে ছেলেটির ওপর ফণা তুলে ধরল। অবোধ শিশু, সাপটাকে মনে করল বুঝি কোন নতুন ধরণের খেলার সামগ্রী। সে সাপটাকে ধরে মনের আনন্দে তার সঙ্গে খেলা সুরু করে দিল। এর পর কোথা থেকে দু'টো বেজী এসে সাপটাকে তাড়া করায় সাপটা পালিয়ে যায়। শিশুটির কিন্তু কোনই ক্ষতি হয় নি। অনুমান, সে প্রায় ঝাড়া দু' ঘণ্টা সাপটার সঙ্গে খেলা করেছিল।

বীমা বা ইন্‌সিওরের কাহিনী তোমরা সবাই কিছু কিছু জান। আজকাল নানান্ রকমের বীমার চলন হয়েছে। ফ্রান্সের একটি নৃত্যশিল্পী তাঁর পা দু'খানি বীমা করে রেখেছেন। কোন কারণে তাঁর পা দু'টি জখম হ'লে তিনি আর নাচতে পারবেন না, তখন বীমা কোম্পানীকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর একজন বীমা করেছেন তাঁর নাক। ইনি হচ্ছেন গন্ধ-বিশেষজ্ঞ। গন্ধ শুঁকে শুঁকে ইনি বিভিন্ন গন্ধদ্রব্যের ভালোমন্দ বিচার করেন, কাজেই নাকই হচ্ছে তাঁর প্রধান সম্পদ্। এই নাকের ঘ্রাণশক্তি কোন রকমে নষ্ট হয়ে গেলে যাতে বীমা-কোম্পানীর কাছ থেকে তার ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় সেই জন্যই এই নাক বীমা।

আজব ছবি

(জাপানী গল্প)

শ্রীশান্তা দেবী

কিকিৎসুম হচ্ছে এক চাষা; জাপান দেশের এক অজ পাড়াগাঁয়ে তার বাড়ী। সহর থেকে অনেক দূরে—সভ্য জগতের কোন ছোঁয়াচই সেখানে পৌঁছয় নি। কিকিৎসুম সারা দিন ক্ষেতে কাজ করে, সন্ধ্যাবেলা বাড়ী এসে বৌএর সঙ্গে গল্প করে। বৌটিও দেখতে শুনতে খাসা, রাঁধতে-বাড়তেও ওস্তাদ্। কিকিৎসুম ভাবে তার বৌএর মত রূপে-গুণে লক্ষ্মী বুঝি গাঁয়ে আর নেই। বৌএর নাম লিলিৎসী।

মাঝে মাঝে স্বামীস্ত্রী মিলে গাঁয়ের বুড়ো পুরুত বঞ্জোর কাছে যায়। নানা রকম ধর্মকথা শোনে। বঞ্জোকে তারা ভারী ভক্তি করে।

একদিন, একদিন সহর থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন কি একটা কাজে তাদের গাঁয়ে। তাঁর সঙ্গে এসেছে তাঁর ছোট্ট মেয়েটি। মেয়েটির সঙ্গে ছিল ছোট্ট একটা আয়না, চলতে চলতে অসাবধানতায় আয়নাটা কখন পথে পড়ে গেছে তা কেউ টেরও পায় নি।

সন্ধ্যাবেলা কিকিৎসুম সেই পথে বাড়ী ফিরছিল, ঘাসের মধ্যে কি একটা জিনিষ চকচক করছে দেখে সে কৌতূহল ভরে সেটা তুলে নিল। নিয়েই অবাক, চারদিক ফ্রেমে মোড়া, একটি জোয়ান লোকের ছবি। ইতিপূর্ব্বে কিকিৎসুম কোন দিন আয়না দেখে নি, নামও শোনে নি। আগেই বলেছি, অত্যন্ত এক অজ পাড়াগাঁয়ে তাদের বাস—সে গ্রামে কেউ কোন দিন আয়না রাখার প্রয়োজনই বোধ করে নি, তার আয়না চিনবে কি করে?

অবাক্ হয়ে আয়নার দিকে চেয়ে চেয়ে কিকিৎসুমের হঠাৎ মনে হ'ল, 'তবে কি এটা

আমার বাবার ছবি ? ভগবান্ আমাকে এ ছবি দেবার জন্যই কি চুপি চুপি আকাশ থেকে এটা ফেলে দিয়েছেন !' নিশ্চয়ই তাই। দেখছ না, তার বাবা যখন মারা যান তখন তাঁর চেহারাও তো ছিল ঠিক এই রকম জোয়ান। তা ছাড়া, ঐ দেখ, ছবির গলায় রূপোর পদকটা পর্য্যন্ত তেমনি আঁটা রয়েছে। তার বাবাও তো সব সময়ে এই রকম একটা পদক পরে থাকতেন গলায়—এখন যেটা সে পরছে ! বিস্ময়ে, ভক্তিতে গদগদ হয়ে কিকিৎস্থম আয়নাটা তুলে নিল, তারপর নমস্কার ক'রে রুমালে জড়িয়ে জামার ভাঁজে রেখে দিল সযত্নে। মনে মনে ভাবল, এ ছবি কাউকে দেখান হবে না। ছবির কথা শুনলেই গাঁ-শুদ্ধ লোক দেখতে ছুটে আসবে, তাদের হাতের ময়লায় ছবিটা নিশ্চয়ই নোংরা হয়ে যাবে। তার বাবার ছবি সে ওভাবে নষ্ট হ'তে দেবে না। এমন কি লিলিৎসীকেও সে কিছু বলবে না। কারণ মেয়েদের পেটে কখনও কথা থাকে না। নিষেধ করলেও লিলিৎসী নিশ্চয়ই গাঁয়ের মেয়েদের কাছে ওর গল্প করবে—সব জানাজানি হয়ে যাবে।

বাড়ী ফিরে কিকিৎস্থম ছবিটা সন্তর্পণে একটা ফুলদানের আড়ালে লুকিয়ে রাখল। পর দিন ক্ষেতে কাজ করতে গিয়ে তার মন আর মানে না, কেবলই মনে পড়ে ছবিটার কথা। ওটা ঠিক জায়গায় আছে তো ! শেষে থাকতে না পেরে দুপুর বেলা সে একবার বাড়ী চলে এল ছবিটা দেখতে।

তাকে অসময়ে বাড়ী ফিরতে দেখে লিলিৎসী ব্যস্ত হয়ে বল্ল, "কি ব্যাপার ! অসুখ করল নাকি ?" কিকিৎস্থম থতমত খেয়ে বলল, "না, হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ায় একবার দেখতে এলাম তোমায়।"

"ঢং !" ব'লে সহাস্যে ঠোঁটটা উলটে লিলিৎসী কাজে মন দিল। মনে মনে যে একটু খুসী হ'ল না এমন নয়।

পরদিন আবার ঐ ব্যাপার। আজও কিকিৎস্থম বৌকে ঐ রকম একটা ধাপ্পা দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু চালাক মেয়ে লিলিৎসীর কেমন একটু খটকা লাগল। কিন্তু সে কিছু বলল না, ঠিক করল, তার পর দিনও যদি স্বামী ঐ রকম অসময়ে ক্ষেত থেকে চলে আসে তবে সে দেখা না দিয়ে আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখবে ও কি করে।

যা ভাবা তাই। পর দিনও কিকিৎস্থম এসে লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি দেখতে লাগল। লিলিৎসী আজ আর তার সামনে গেল না, আড়াল থেকে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করল। কিকিৎস্থম চলে গেলে সে ফুলদানের পেছন থেকে আয়নাখানা টেনে বার করল।

দেখেই তো তার চক্ষুস্থির। ফ্রেমে বাঁধা একটা মেয়ের ছবি !—তারই বয়সী হবে মেয়েটা। এই ছবি দেখবার জন্যই তবে কিকিৎস্থম রোজ দুপুরে কাজ ফাঁকি দিয়ে বাড়ী আসে ! রাগে, দুঃখে তার চোখ ফেটে জল এল। খানিকটা চুপ করে থেকে সে ছবির মেয়েটার খুঁত খুঁজে খুঁজে বার করতে লাগল। কী বিশ্রী ছিঁচকাঁদুনে মুখ মেয়েটার ! আবার কি বেহায়া ! ঠিক তারই মত ক'রে খোঁপা বেঁধেছে, পোষাকটাও পরেছে যেন তারই সঙ্গে রং মিলিয়ে ! থ্যাবড়া-নাকী, বেড়াল-চোখী মেয়েটাকে হাতের কাছে পেলে সে একবার দেখে নিত।

সন্ধ্যার পর কিকিৎস্থম বাড়ী আসতেই লিলিৎসী যেন ফেটে পড়ল। আয়নাটা একটানে

লুকানো জায়গা থেকে বার ক'রে বলল, "এই নাও তোমার সাধের ছবি। অমন একটা বেহায়া মেয়ের ছবি দেখবার জন্য রোজ রোজ কাজ ফেলে ছুটে আস, লজ্জা করে না তোমার ?"

কিকিৎস্থম রেগে বলল, "কি, আমার বাবাকে নিয়ে ঠাট্টা ! জান, ওটা আমার বাবার ছবি।"

"ন্যাকামি ক'র না; তোমার বাবা বুঝি ঐ রকম ক'রে খোঁপা বাঁধতেন, না তাঁর ঐ রকম মেয়েলি চেহারা ছিল !"

কিকিৎস্থম আয়নাটা কেড়ে নিয়ে দেখতে লাগল। কই, তার বাবারই তো ছবি ! খোঁপা আসবে কোত্থেকে ? মেয়েরা এত কথাও বলতে পারে বানিয়ে বানিয়ে !"

তার পরেই বেধে গেল স্বামীস্ত্রীতে খণ্ডযুদ্ধ।

ঠিক এমনি সময়ে দরজায় কে কড়া নাড়ল। কিকিৎস্থম দরজা খুলতেই দেখে গ্রামের পুরুত ঠাকুর বঞ্জো স্বয়ং দাঁড়িয়ে। এই পথেই তিনি যাচ্ছিলেন, ঘরের ভেতর গোলমাল শুনে কি হয়েছে জানতে এসেছেন। দু'জনেই তাঁর কাছে নালিশ জানাল।

পুরুত ঠাকুর সব শুনে বল্লেন, "কই, দেখি ছবিটা ?" তার পর অবাক্ হয়ে বললেন, "কী বলছ তোমরা ! এ যে দেখছি এক মহাপুরুষের ছবি ! দেখছ না কেমন লম্বা লম্বা দাড়ি, সৌম্য চেহারা ! মুখে-চোখে কেমন পাণ্ডিত্যের ছাপ ! আমাদের পরম সৌভাগ্য যে ভগবান্ এমন একজন সিদ্ধপুরুষের ছবি এ গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ ছবি ও ভাবে রাখলে চলবে না তো ! একে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে হবে। আমি এটা নিয়ে চললাম। মন্দিরে বেদীর পাশে এটিকে রাখতে হবে—আর প্রত্যহ ফুল, ধূপ-ধুনো দিয়ে একে শ্রদ্ধা জানাতে হবে।"

এই বলে পুরুত ঠাকুর আয়নাখানা নিয়ে চলে গেলেন।

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

১৯৫২ সন সুরু হ'ল। ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই সুযোগে। বছরে ইংরেজী বাংলা দু'টো নববর্ষে দু'বার ক'রে যদি এই সুযোগ পাওয়া যায় তবে মন্দ কি ?

রামধনুর বিলম্বে প্রকাশ তোমরা সকলেই যে খুশীমনে ক্ষমা ক'রে নিয়েছ এতে খুবই আনন্দ হচ্ছে। তোমাদের এই ভালবাসার প্রতিদান দিতে পারি সময় মত রামধনু বার করে। তার চেষ্টা করছি। তবে এবারেও বাধা পড়ল।

শ্রীশর্মিলা সরকার (কলিকাতা)—তোমার দীর্ঘ, সুন্দর চিঠিখানিতে তোমার সুন্দর মনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলাম। 'বিসর্জনের' লেখক সম্পর্কে তোমার মত অনেকেই প্রশ্ন করছেন। লেখক যখন নিজেকে 'জনৈক পুরবাসী' হিসাবেই পরিচিত করতে চান তখন আগেই নাম বলি কি করে? তবে লেখাটি শেষ হয়ে গেলে নাম প্রকাশের অনুমতি তিনি দিয়েছেন। এখন এইটুকু বলতে পারি যে তিনি ছোটদের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, তাঁর ভাষা এবং লেখার ভঙ্গী তাঁর নিজস্ব। কাজেই তাঁর ছদ্মবেশ উন্মোচনের ভার তোমাদের ওপরেই দিলাম, নাম প্রকাশিত হ'লে মিলিয়ে দেখ। মন্ত্রিবিভ্রাটের সমাধান যথা সময়ে জানতে পারবে। শ্রীনমিতা দাম (গৌহাটী) —গত মাসের রামধনু বিলম্বে প্রকাশের কারণ তো জেনেছ। তবে ইতিপূর্ব্বেও তোমার রামধনু পেতে দেরী হওয়ার সঙ্গত কারণ দেখছি না, এ সম্পর্কে ডাকবিভাগের সঙ্গে পত্রালাপ করছি। তোমার চিঠিখানা খুব ভাল লাগল। বিভূতিভূষণের বইএর নাম দিয়ে লেখা তোমার একটি রচনা আমাদের মনোনীত হয়ে আছে। লেখাটা একটু বড় হওয়ায় বেরোতে দেরী হচ্ছে, শীগ্রই দেবার চেষ্টা করব। শ্রীরণজিৎ ঘোষ (যাজন)—'পুরবাসী' সম্পর্কে তোমার প্রশ্নের জবাব ওপরে পাবে। শিবরাম বাবুর নতুন গল্প মাঘ সংখ্যায় যাচ্ছে। শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু মল্লিক (ফুলেশ্বর)—তোমার সক্রোধ চিঠিখানা পেয়ে খুবই অবাক্ হ'লাম। অফিস সংক্রান্ত চিঠিপত্রের জবাব সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া হয়; তোমার সে রকম কোন চিঠি এসে থাকলে নিশ্চয়ই তার জবাব পেয়েছ। ব্যক্তিগত চিঠি বা চিঠিপত্র বিভাগের জন্য সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠির জবাব সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া যায় না—কারণ এক সঙ্গে অনেক চিঠি জমা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে পক্ষপাতিত্বের কোন কথাই উঠতে পারে না। কবিতা, গল্প তো মনোনীত হ'লেও দীর্ঘকাল ফেলে রাখতে হয়। তুমি নতুন ব'লেই বোধ হয় এ সব খবর রাখ না। কবিতায় হাত কিন্তু তোমার এখনও বড় কাঁচা, আরও চর্চ্চা করে উন্নতি করতে পারলে তবেই ছাপবার কথা উঠতে পারে। তুমি রামধনু রাখতে না চাও তাতে কিছু বলবার নেই, কিন্তু ভুল বুঝ না আমাদের। আর একটা কথা মনে রেখ, রাগের মাথায় চিঠি লিখতে নেই কখনও। শ্রীমঞ্জুলা ও বাণী মজুমদার (বহরমপুর)—তোমাদের পরীক্ষার খবরে খুব খুসী হয়েছি। শ্রীসুলেখা ও মণিপ্রভা সিংহ (বোলপুর)—এবারের ৭ই পৌষের মেলার কথা লিখেছ। আরও খুলে লিখলে খুসী হব। শ্রীগোবাচাঁদ দত্ত (দিল্লী)—তোমার অনুরোধ মত কয়েকখানি ছোটদের হাসির নাটকের নাম দিলাম—৺সুকুমার রায়ের ঝালাপালা, শ্রীসুনির্মল বসুর বীর শিকারী, শহুরে মামা, কিপ্টে ঠাকুরদা, শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তীর পণ্ডিত বিদায়, বাজার করা হাজার ঠেলা, ৺মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের দমাদম্ দামোদর, শ্রীসুবোধ বসুর বুদ্ধির্যস্য, রামধনু-সম্পাদকের অয়েল পেণ্টিং।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। জয় হিন্দ। —ইতি রাঃ সঃ

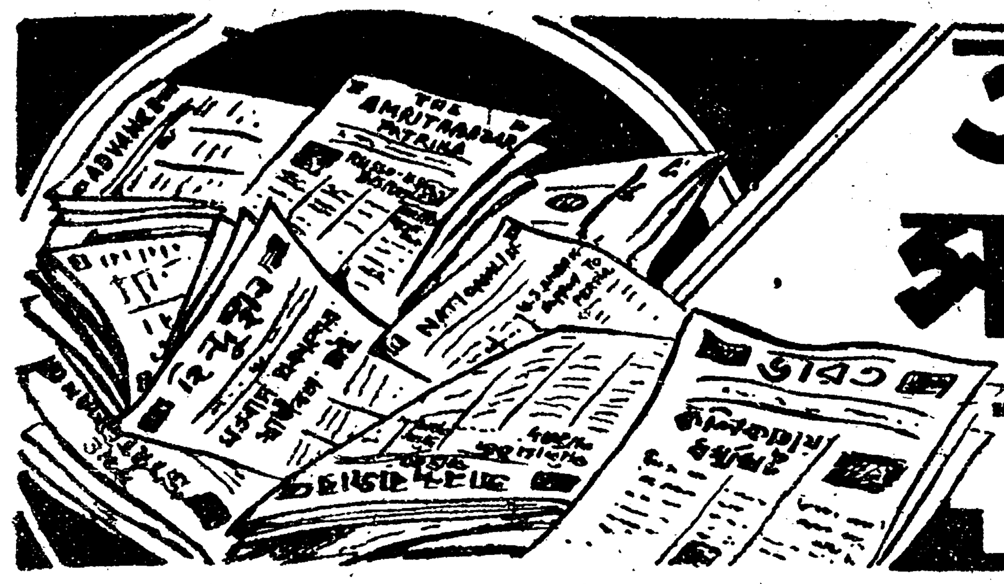

আমাদের সংবাদ পত্র বিভাগ

কলকাতায় বিজ্ঞান-কংগ্রেস

বড়দিনের কাছাকাছি সময়টায় সারা দেশ যুড়ে নানা রকম সম্মেলন, সভা-সমিতির ধুম পড়ে যায়, এবারেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এগুলির মধ্যে কলকাতায় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিপুল সমারোহের মধ্যে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের মূল সভাপতি হয়েছিলেন ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বিদেশ থেকেও নানা প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

পাটনায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

বড়দিনের ছুটীতে এবার পাটনায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয়ে গেল। এবারেও মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত। বিভিন্ন শাখায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী প্রভৃতি সভাপতিত্ব করেছিলেন। শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতি হয়েছিলেন মৌচাক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার। আগামী বছর থেকে এই সম্মেলন 'প্রবাসী' নাম ঘুচিয়ে বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন—এই নামে অভিহিত হবে ব'লে ঠিক হয়েছে।

খেলাধূলার খবর

কলকাতায় ইতিমধ্যে এম্. সি. সি. ক্রিকেট দলেরও পর পর দু'টি খেলা হয়ে গেল। ১ম খেলাটি হয়েছিল পশ্চিম বাংলা দলের সঙ্গে। এম্. সি. সি. দল এই খেলায় পশ্চিম বাংলাকে ইনিংসে পরাজিত করে। পশ্চিম বাংলা দলে শ্রীনির্ম্মল চ্যাটার্জি প্রশংসনীয় ব্যাটিং করেন। অধিনায়কত্ব করেন শ্রী সি. এস্. নাইডু। দর্শকেরা এঁর খেলা খুব উপভোগ করে।—ইনি এক ওভারেই ১৮ রান্ করেছিলেন; তার মধ্যে ২টি ছিল ওভার বাউণ্ডারী।

কলকাতায় এম্. সি. সি. দলের ২য় খেলা হ'ল টেষ্ট—ভারতের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড দলের ৩য় টেষ্ট। এই খেলাটিও অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। ইংল্যাণ্ড ১ম ইনিংস্এ করে ৩৪২, ভারত করে ৩৪৪। ২য় ইনিংস্এ ইংল্যাণ্ড ৫ উইকেট ২৫২ রান্ করে ডিক্লেয়ার করলে ভারতীয় দল কোন উইকেট না হারিয়ে ১০৩ রান্ করে।

নির্ব্বাচন

সমস্ত ভারত যুড়ে নির্ব্বাচনের সাড়া পড়ে গেছে। অনেক জায়গায় ভোট গ্রহণ ইতিমধ্যে শেষও হয়ে গেছে। এই সম্পর্কে অনেক মজার মজার কাণ্ডও ঘটতে দেখা গেছে। যেমন

ধর, কেউ কেউ ভোট দিতে এসে ব্যালট-বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে ধ্যানস্থ হয়েছে, কেউ-ব্যালট বাক্সে ভোট না দিয়ে কাগজখানা বাইরে দাঁড়ানো দু'টি বলদের গায়ে এঁটে দিয়েছে (জোড়া বলদ এবারকার কংগ্রেসের প্রতীক-চিহ্ন)। কেউ বা গাছের প্রতীক দেওয়া বাক্সে ভোট না দিয়ে গাছে চড়ে আগডালে ব্যালট পেপারটি লটকিয়ে দিতে ছাড়ে নি। আবার কেউ বা ব্যালট পেপারটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে প্রত্যেক প্রার্থীর বাক্সে একটি করে ফেলে দিয়ে এসেছে। কা'কে ভোট দিতে হয়, কেন ভোট দিতে হয়—এ সব তথ্য না জানায় অশিক্ষিত লোকেদের পক্ষে ভোট দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। যে দেশে শতকরা ৯০ জনের ওপর লেখাপড়ার ধার ধারে না—সে দেশে প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই ভোট দিতে যাওয়া একটা বিড়ম্বনা মাত্র।

ভাবীসাহিত্যিকের বৈঠক

চাঁদনী রাতে

কুমারী দীপালি সেনগুপ্তা

পলাশ-বনের শিরে ঝিল্‌মিল্‌ ঝিল্‌মিল্‌ জ্যোছনায় স্বপ্নিল আঁচলখানি—
সুনীল আকাশ ভরে পড়ে যেন ঝরে ঝরে স্নেহময়ী প্রকৃতির আশীষ-বাণী।
ছায়াময় তরুতলে, শ্যামল তৃণের কোলে বাজে রাখালের হাতে মধুর বাঁশী,
শুভ্র যূথিকা হাসে কুটীরের একপাশে, সমীর উতল তার সুবাসে ভাসি'।
সব অবসাদ-ধোয়া চাঁদের আলোর ছোঁয়া ঘুমায় স্বপনময়ী ধরার রাণী,
আকাশের নীলিমায় রূপা-মাখা সারা গায়—ঝিল্‌মিল্‌ চাঁদিমার চাঁদোয়াখানি।
শ্যামল ক্ষেতের কোলে আলিপনা তৃণদলে, নিশির শিশির ঝরে মধুর হেসে,
বাঁশীর স্বপন-সুর ভেসে যায় দূর দূর, বনতল, ধানক্ষেত, পাহাড়-দেশে।
সমীর ছোঁয়ায় ধীর দোলা লাগে ঝিরঝির্‌, জ্যোছনার লুকোচুরি তরুর শাখে,
আলোর তূলিকা দিয়ে কোন্‌ এ খেয়ালী মেয়ে রূপালী স্বপন-ছবি
আকাশে আঁকে।

শান্ত স্বপনভরা ঘুমায়ে পড়েছে ধরা, জেগেছে আলোকময়ী রাতের রাণী,
আলোছায়া স্বপ্নিল ঝিল্‌মিল্‌ ঝিল্‌মিল্‌ ধরণীর 'পরে পাতা আঁচলখানি।

ভ্রম সংশোধন: অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'নোপোয় মারে দই' গল্পটির লেখকের নাম শ্রীরুদ্রেন্দ্র কুমার সেন হইবে।

কার্ত্তিক মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

পুরস্কার পেলেন— শ্রীঅনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)
আর যাঁদের লেখা ভাল হয়েছে: শ্রীশক্তি চক্রবর্ত্তী (কৃষ্ণনগর), শ্রীসুখেন্দু দাশ (গৌহাটী), শ্রীউজ্জ্বলা সেনগুপ্তা (লক্ষ্ণৌ), শ্রীনন্দদুলাল ঘোষ (মেদিনীপুর)।

এ মাসের নূতন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

এবারে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা। একটি ছেলে খুব হাসছে, তার মুখটা এঁকে পাঠাও। যার ছবি আমাদের বিচারে সব চেয়ে ভাল হবে সে-ই পুরস্কার পাবে। ছবি সাধারণ পেন্সিলে, কালিকলমে, পেন্সিল-রংএ বা রংএর তূলিতে যেমন খুসী আঁকা চলবে। ৩০শে মাঘের মধ্যে সে ছবি রামধনু কার্য্যালয়ে পৌঁছান চাই। যে কেউ যোগ দিতে পারবে, কিন্তু প্রত্যেক ছবির সঙ্গে নীচের কুপনটি কেটে পূর্ণ করে পাঠাতে হবে। ছবি ফেরৎ নিতে হ'লে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ডাকটিকেট পাঠাতে হবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

মোমবাতি

উত্তরদাতাদের নাম:— সুনীলকুমার চৌধুরী (আরাপুর—মালদহ); মঞ্জুলা ও বাণী মজুমদার (বহরমপুর); টুলু, বুলু, দীপ্তি, নির্ম্মালা, চিত্রা, সুচরিত, বরুণ (মাধিপুরা); কর্ম্মমন্দির মণিমেলা (মধুতটী); টাটা, টুটু, টিটি, টিটো, টোটা, টৈটু (জামসেদপুর); বিভাসবিহারী বসু (পাটনা); রত্না, জয়ন্ত, স্বপ্না ও ছন্দা রায় (বাঁকীপুর); মঞ্জুশ্রী বসু, মা (ছাপরা)।

রামধনু নাম

ঠিকানা

পুঃ প্রঃ পৌঃ ৫৮

নূতন ধাঁধা

নীচে একখানা সাঙ্কেতিক চিঠি দেওয়া হয়েছে। ওর মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন মত শব্দ বদলে তার শব্দার্থ বা ভাবার্থ বসিয়ে নিতে পারলেই চিঠিখানা পড়া যাবে। চেষ্টা করে দেখ :—

তেলের আকাশচুল,

তোপ্রহার পাতা ক্ষুদ্র মুদ্রা বিশেষয়া হাল্কা নহে অকথা হইলাম। গরুপদবী বিশেষ রূপকথার প্রাণীভি-হীন ভিক্ষায় দড়ি মুখের অংশরিতে ধাতু বিশেষয় সে খরচ নহেজননী মনে আক্ষতত চরণইবেন। এ চেহারা হইদফা কালড়াই কি? ও বাঁশের ছেশীতরোধকেলেরা সযত্নেই শুলইয়াছি মনোতাপস। মাশেষকে মিলনা করিতে হাতী করিও। তৃণ বিশেষল সহিত একটি দিক্ দিও।

—ইতি

লাল পাখী বিশেষের ডাক (২ বার)।

কোল্ড ক্রীম অভ রোজেজ্

গোলাপ গন্ধ
প্রসাধন প্রলেপ

শীতের দৌরাত্ম্য হইতে হাত, পা, মুখ ও গাত্রচর্মের লাবণ্য রক্ষা করে। সৌন্দর্য সাধনার শ্রেষ্ঠ সহায় এবং শৌখিন সম্প্রদায়ের পরম বন্ধু।

✽

সুদৃশ্য আধারে ও টিউবে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ
কলিকাতা :: বোম্বাই :: কানপুর

পূব-আকাশের
দুয়ার খোলে কে ?

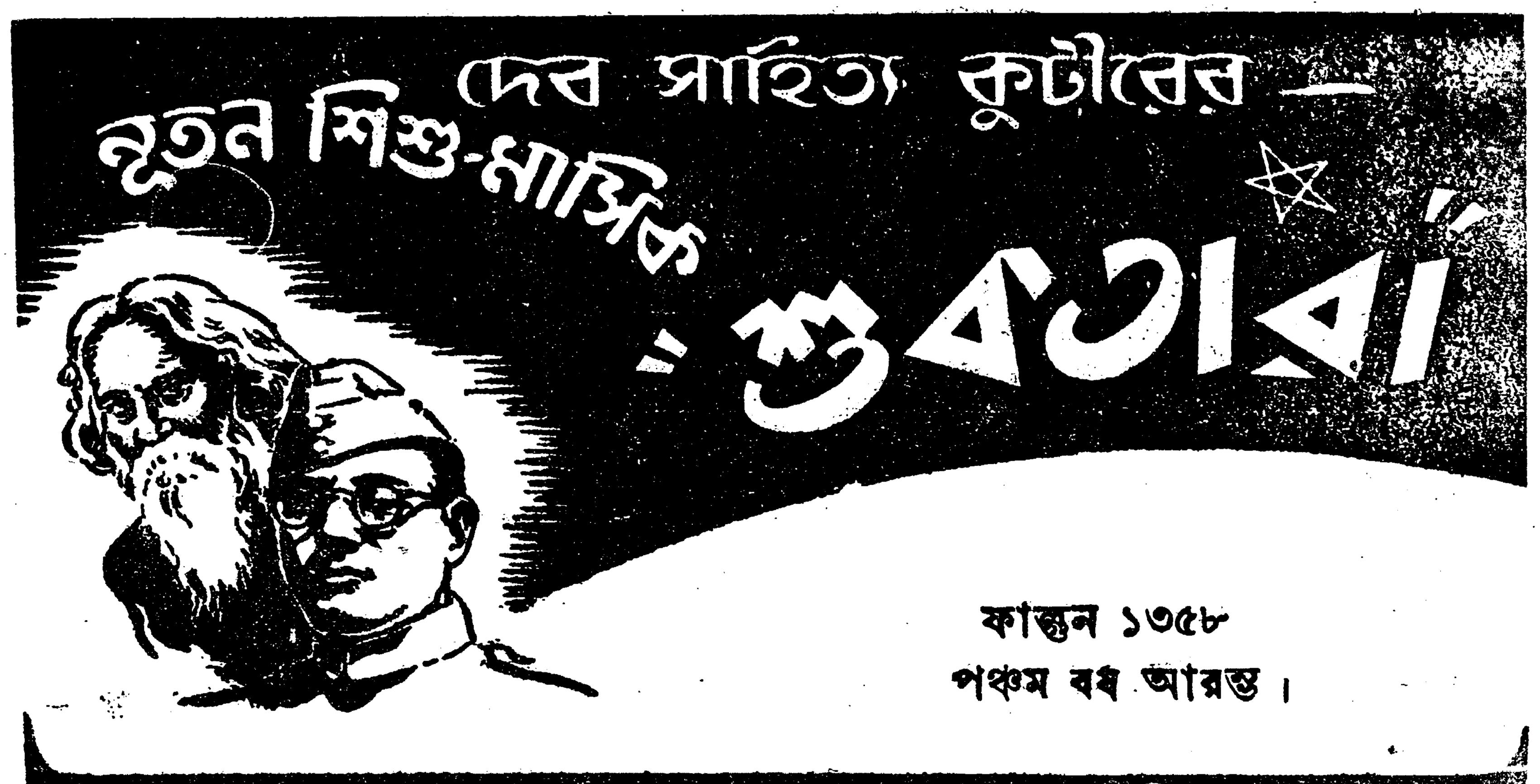

দেব সাহিত্য কুটীর
২২/৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা, ৯। ফোন-বিবি ৪৬৭

প্রতি মাসেই পুরস্কার !

["শুকতারা"র গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য]

আমরা স্থির করেছি যে, আগামী ফাল্গুন মাস হতেই আমরা প্রতিমাসে একটি করে প্রতিযোগিতা আহ্বান করবো. আর তা শুধু আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

প্রতিশ্রুতি

আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের অনেকেই "শুকতারা"র বহুল প্রচারের জন্য এতদিন নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করে আমাদের অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। কাজেই আমরা এখন হতে স্থির করেছি, যে কেহ পাঁচজন, গ্রাহক-গ্রাহিকা-সংগ্রহ করে দিবেন, তাঁকেই আমরা বিনামূল্যে—

এক বছরের জন্য গ্রাহক করে নিব।

—সম্পাদক, "শুকতারা"

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের		অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের	
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা	১৲	ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি	১।০
বিজ্ঞান-বুড়ো	১৲	পদ্মরাগ	১॥০
আকাশের গল্প	১।০	সোনার হরিণ	১॥০
আবিষ্কারের গল্প	৸০	নূতন পুরাণ	৸৵০
ধূমকেতু	৸০	হাস্য ও রহস্য	৸৵০
অয়েল পেন্টিং (নাটক)	।০	চায়ের ধোঁয়া	৸০
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১৲	দমাদম্ দামোদর (নাটক)	।৵০
শ্রীঅমলেন্দু সেনের দি লাষ্ট্ অব্ দি মোহিকান্স্	॥৵০	শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত অলিভার টুইষ্ট	॥৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি রসা রোড, কলিকাতা ২৫

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

রকমারিতায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

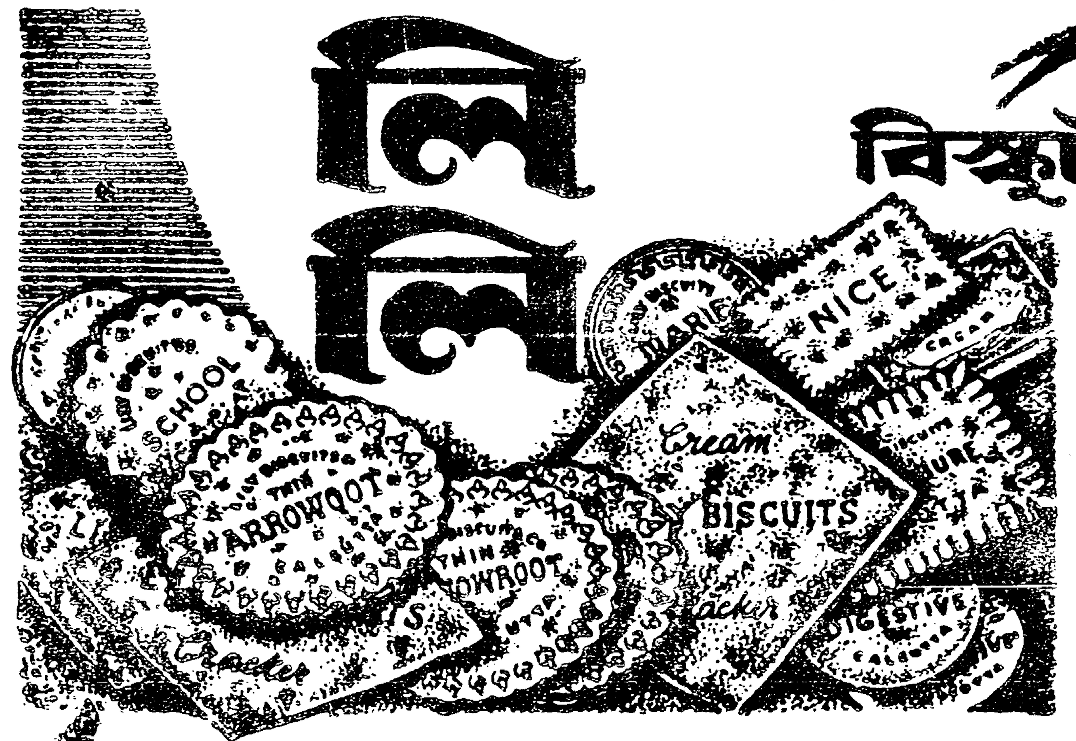

লিলি বিস্কুট

কয়েকটী মনোরম ও স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন ক্রীম, ক্যার্ণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ

৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

রামধনু

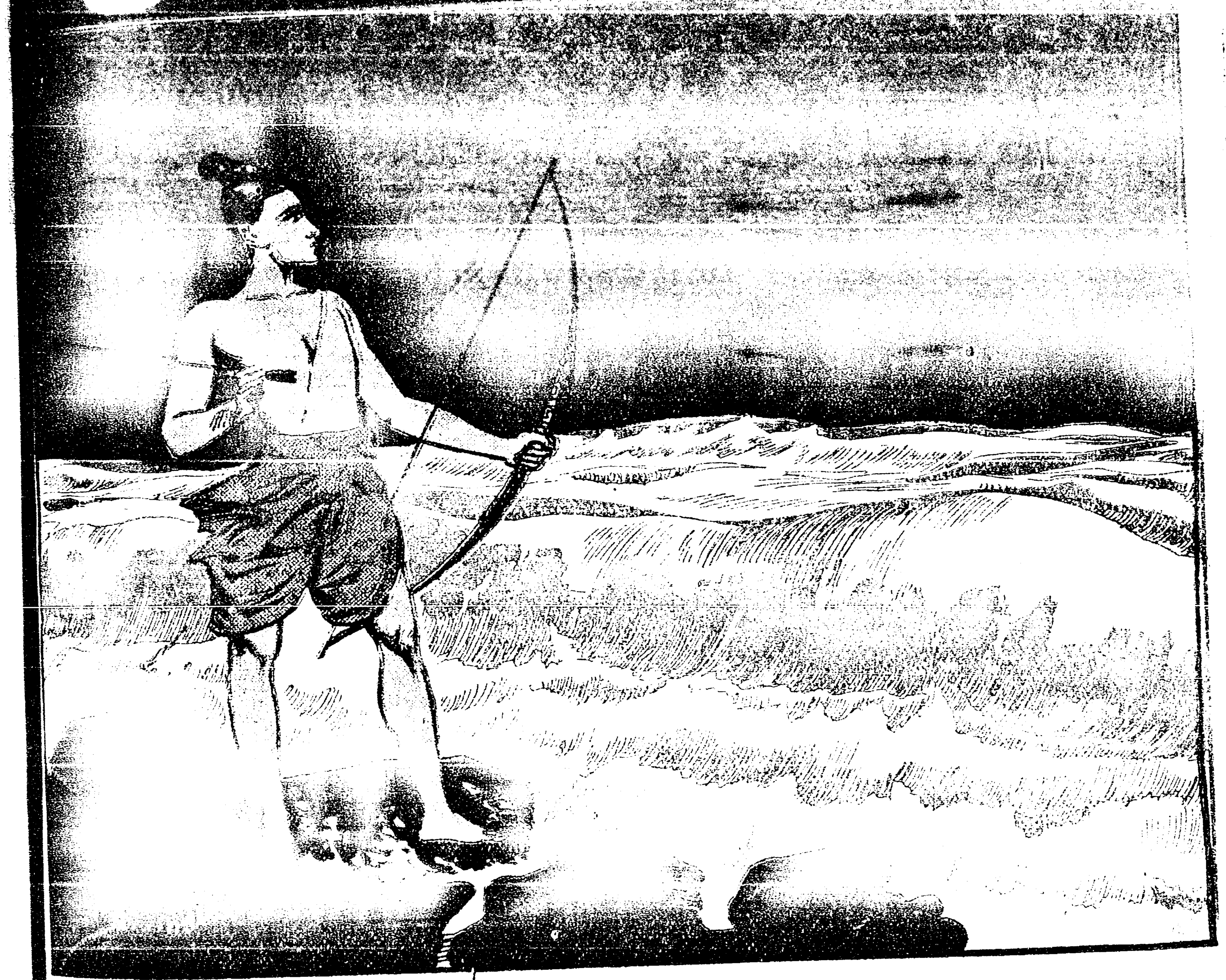

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম. এস-সি

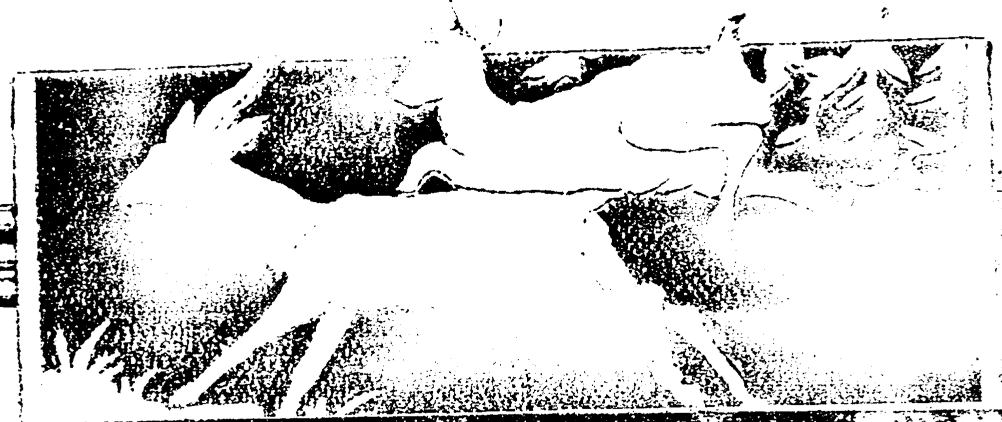

কার্য্যালয়ঃ
১৬, টাউনসেণ্ড রোড
কলিকাতা ২৫

চন্দ্রকুমার
জ্যোতিষ-গণনালয়

৯৭, হাজরা রোড,
কলিকাতা—২৬

হস্তরেখা বিশারদ, বাংলা ও হিন্দিতে
নির্ভুল কুষ্ঠী, ঠিকুজী এবং তান্ত্রিক
মতে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ কবচ
প্রস্তুতকারক

পণ্ডিত—শ্রীঅধীর রঞ্জন ভট্টাচার্য্য
তান্ত্রিকাচার্য্য জ্যোতিঃশাস্ত্রী

এজেন্ট চাই

রামধনু খুচরা বিক্রয়ের জন্য বাংলা ভারতের সমস্ত বড় বড় সহরে এজেন্ট চাই।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য
নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন—

ম্যানেজার, রামধনু
১৬, টাউনসেণ্ড রোড
কলিকাতা—২৫

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরঞ্জিত

২৪শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৫৮ { ১০ম সংখ্যা

বাণী-বন্দনা

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক

আয় মা দেবী বীণাপাণি, সোনার বাংলা দেশে,
হরেক রকম মূর্ত্তি নিয়ে আয় মা নানান্ বেশে।
প্রাচীন রূপে, নবীন ছাঁদে, প্রাচ্য কলার ঢঙে,
কোথাও শাদা নিষ্কলঙ্ক, কোথাও সোনার রঙে,
কোথাও চড়ি' হাঁসের পিঠে, কোথাও পদ্মটিতে,
বসে কিংবা দাঁড়িয়ে সটান, বঙ্কিম ভঙ্গীতে,
লক্ষ রূপের বাহার নিয়ে আয় মা সরস্বতী,
আমরা তোমায় করব বরণ হর্ষে সরস-মতি।
তোমার লাগি' গ'ড়বো মোরা হাজার রকম বেদী,
কোথাও রবে পৃষ্ঠদেশে পাহাড় সিলিং-ভেদী;

ডাইনে বাঁয়ে দেবদারু-বন, কিংবা শুধুই ঘাস,
কিংবা টবের পাতাবাহার, গাঁদাফুলের রাশ।
মুণ্ডু ঘিরে বিজ্‌লি বাতির সূর্য দেবো রচি',
হাঁসের মুখে দেবো আসল মৃণাল কচি কচি।
গর্ত খুঁড়ে বানিয়ে দেবো মানস-সরোবর,
তারই মধ্যে আসন তব গ'ড়ব মনোহর।
পুরুত্‌ মশাই দু'চার টাকা, গামছা দু'চারখান,
প্রসাদ হবে ঠাণ্ডা ফলের, ব্যবস্থা চা-পান
ডেকোরেটর সাজিয়ে দেবে প্রকাণ্ড মণ্ডপ,
পর্দা ঝালর চেয়ার টেবিল শতরঞ্চি শপ,
বিল্‌ হবে তার মোটা টাকার, বাড়বে ততই মান,
বৈকালেতে চলবে বেতার—আধুনিকের গান।
হয়তো প্রধান অতিথি কোন্‌ হবে তরুণ নেতা,
সাহিত্যিকের শ্যালক কোনো পাণ্ডা হবে সেথা,
চলবে সভা নৃত্যগীতের কিংবা প্রবন্ধাদি
পাঠ করিবেন লেখক কেহ, কণ্ঠ রাসভ-নাদী।
সন্ধ্যে বেলায় আরতি, মা, ক'রবো সবাই মোরা,
ধুনুচি হাতে নেচে নেচে লম্ফেঝম্ফে ঘোরা,—
আগুন খেলার জমক্‌ দেখে থমকে দাঁড়ায় সবে,—
অবাক্‌ চোখে ছেলেমেয়ে সবাই চেয়ে রবে।
আমরা যে মা নবযুগের ভক্ত সবাই বড়,
নতুনতর বাণী পূজায় তাই হয়েছি জড়।

ভালো ক'রে দেখ্‌ মা চেয়ে আমরা তোকেই জানি,
ছোট্ট তোমার প্রতিমাটিই মডেল বলে মানি।
তোরই ছাঁদের অনুকরণ কর্‌ছি সগৌরবে,
বোনের হাতে বীণা দিলেম সংগীত-উৎসবে।
হিমানী আর পাউডারেতে মুখখানিকে ঘ'ষে
একটু শাদার আমেজ্‌ লাগাই প্রলেপ দিয়ে ক'ষে।
বিবর্ণ সব বুকে জাগে রক্তবিহীন রঙ্‌,
মরাল-গ্রীবার মতই সরু শীর্ণ দেহের ঢঙ্‌।

শাড়ী-ব্লাউস্‌ চপ্পলেতে কত যে রঙ্‌ লাগে,
হিমালয়ের মেঘে যেন রামধনুটি জাগে।
মানস-সরে চলে যত তরল ঢেউয়ের খেলা,
উচ্ছ্বসিয়া ওঠে সবাই হেথায় সারা বেলা।
শুনতে কি পাও হাহা-হিহি মিহি গলার হাসি,
দেখতে কি পাও দেহে দেহে ঢেউ ওঠে উল্লাসি' ?
তোমার বীণায় স্তব্ধ হ'য়ে আছে যে সব তান,
তারা হেথায় মেয়ের হাতে পেয়েছে আজ প্রাণ!
কেবল তোমার গায়ত্রীটি কোথায় যে লুকালো—
পাই নে খুঁজে, দাও মা তবে একটুখানি আলো।
যে-আলোটি ঝলে, মাগো, হিমালয়ের শিরে,
সন্ধ্যাকাশে ধীরে মিলায় নীল সাগরের তীরে ;
তপোবনের হোমানলে পড়েছিলো ধরা,
যে-আলোকে লক্ষ তারার হৃদয়খানি গড়া,—
একটি শিখা দাও মা তার-ই, চিনবো জ্যোতির্ময়ে,
ভাই-বোনেরা জাগবে নতুন তিমির-হরণ জয়ে।

ত্র্যহস্পর্শ

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

যোগেশ দাস না যোগেশ দাশ—কী যেন নাম। এমন জমিয়েছে ঘন্‌টের সঙ্গে যে ঘন্‌টাও যেমন কাবু এদিকে ঘণ্টাও তেম্‌নি কাবার! দেড় ঘণ্টা হতে চললো তবু গল্প থামার নামটি নেই। এধারে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি, ঘন্‌টে-টা নিজের পয়সায় আমায় আজ সিনেমা দেখাবে বলেছিল, অথচ ছ'টা তো বাজ্‌তে চললো—ওঠার লক্ষণ নেই কারো। গল্পের এমন ঘটা, আর এম্‌নি জমাটি ভাব যে বায়স্কোপটাই আজ মাটি করবে দেখ্‌ছি!

শিকারের গল্প? শিকারের গল্প যে কী জিনিষ তা আমার জানা আছে। গুলি আর গুল্‌ নিয়ে কারবার শিকারীর। গুলিটা বেরয় বন্দুকের মুখ দিয়ে—যদি সত্যিই সে কখনো শিকারে গিয়ে থাকে। নইলে যা বেরয় তা স্রেফ্‌ গুল্‌—তার নিজের মুখ দিয়ে।

বোগেশের গুলক্কের সিন্নাপ্ এমন তেতো লাগছিলো আমার! আজগুবি শিকারকাহিনী ফেঁদে আমাদের বায়স্কোপ প্রোগ্রাম্‌টা গুলিয়ে দেবার তালেই ছিলো হতভাগা। শিকারের ঘণ্ট খেয়ে ঘণ্টেশ্বর সিংহের মুখে রা নেই—শুধু হাঁ। যেন আরো দাও আরো খাই—খাই খাই ভাব।

বোগেশ দাস, না কি বোগেশ দাশ—সে বলছিল—বেশ গরম হয়েই—

'...জানোয়ারটা তার আগের রাত্তিরে আমার এক সাঙ্যাত্‌কে সাবড়েছে—সেই দুদান্ত মানুষখেকো সিংহি। আর আমি তার ঠিক সাম্‌না সাম্‌নি—একেবারে মুখের উপর গিয়ে পড়েছি। এতক্ষণ ধরে যতো গুলি ছুড়েচি তার একটাও ওর গায়ে লাগে নি। এদিকে একটাও গুলি নেই আর আমার বন্দুকে। আমার আশেপাশেও কেউ নেই। সেই গহন জঙ্গলে আমি একা! কিন্তু তাই বলে কি আমার বুক একটুও কেঁপেছিল? আমি কি ডরিয়েছিলাম আদৌ?...'

বোগেশের সপ্রশ্ন কটাক্ষ—কিংবা সকটাক্ষ প্রশ্ন—আমাদের দু'জনের ওপর। ঘণ্টা হাঁ করে ছিল, আমি 'না' করতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু আমাদের হাঁ-না-র তোয়াক্কা না করেই সে বলে চলে—

'বলুন ঘণ্টেশ্বর বাবু! আপনি কি মনে করেন আমি দমে গেছলাম একটুও? আমার সাম্‌নে সেই উন্মত্ত সিংহ আর আমি নিরস্ত্র—অসহায়—একলা। অসহায়—কিন্তু তাই বলে কি ঘাব্‌ড়ে গেছলাম আমি?'

'আদৌ না। কেন ঘাবড়াবেন?' আমাকে বলতে হয়। 'আপনার বন্দুক যে ফাঁকা—সবটাই ফাক্কার—তাকে তো সেটা টের পেতে দেন নি? টের না পেলেই হোলো। অবোধ জন্তু—যদি ওরা না বুঝতে পারে যে আপনি বেকায়দায় পড়েছেন—আপনাকে কিছু বলবে না। ধাপ্পাবাজী দিয়ে ভোলান যায় সিংহিদের। আপনাকে আমি বলি নি বুঝি?' বলে আমি ঘণ্টেশ্বর সিংহের দিকে তাকাই—'ও, আপনাকে—মন্‌টে জানে, 'তবে ঘন্‌টেকে বলেছি কিনা মনে নেই। আফ্রিকাতে একবার—আফ্রিকা কোথায় জানেন তো? কাফ্রিদের দেশ। আফ্রিকা—রামনাথ বিশ্বাসের লেখা পড়লে টের পাবেন—সেই মুল্লুকে একবার আমি একলা—এক হাতে—এক হাতের কম্মো নয় এত বড় বাঘ! তেমন বাঘকে কেউ এক হাতে বাগাতে পারে না। এক হাতে নয়, দু' হাতেই। আমার এই দু' হাতে ধরে—পাছড়ে—গলা টিপে মেরে ফেলেছিলাম।'

'ভারী তোর হাতের জোর—না?' ঘণ্টা মাঝখান থেকে বলে। যে-কিনা এতক্ষণ হাঁ করে বোগেশের কাহিনী শুনছিল সেই-ঘণ্টাই আমার কথায় হাঁ-হাঁ করে ওঠে—'দেখি তো তোর হাতখানা? আস্তিন্‌টা গোটা তো! হাতের গুল্‌গুলো টিপে দেখি একবার।'

'সে আর কী দেখবি! সে-হাত কি আর আছে আমার? লিখতে লিখতে হাতের গুল সব আমার হাতের লেখায় চলে গেছে। নইলে এক্ষুনি তোকে দেখাতাম একহাত—এইখেনেই!' বলে বোগেশের গলদেশের দিকে সতৃষ্ণ নেত্রে তাকাই।

'আফ্রিকায় বাঘ নেই।' বোগেশ গোম্‌ড়া মুখে জানায়।—'কক্ষণো ছিল না।'

'সাধারণতঃ তারা থাকে না, তবে এটাকে আমি ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছলাম।' আমি প্রকাশ করি।

'ভারতবর্ষের কোন্‌খান থেকে?'

'সুন্দরবন থেকে—কোথায় আবার!' বোগেশের কথার জবাব দিই—'সুঁদরি কাঠ আর কেঁদো বাঘ আবার কোথায় মেলে? ঐ সুন্দরবনেই। মেলাই বাঘ! বাঘের মেলাই বলতে গেলে। সেখান থেকেই তাড়া করে—পাল-ছাড়া করে তাদের একটাকে আমি বোম্বাই পর্য্যন্ত নিয়ে যাই। শেষ পর্য্যন্ত বাঘটা গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আরব্য সাগরেই। আমার তাড়া খেয়ে।'

'আরব্য উপন্যাস!' বলেন বোগেশ দাস।

'কিন্তু জলে পড়লেই কি ছাড়ান্ আছে? আমিও ঝাঁপ দিলুম। তারপর উত্তাল সমুদ্রে অনেক নাকানি-চুবানি—লোনা জল খেয়ে আফ্রিকার উপকূলে গিয়ে উঠলাম। বাঘটা বেশী জল গিলে ফেলেছিল—আমার গলার চেয়ে ওর ফাঁদেলটা একটু বড় তো? লোনা জল পেটে গিয়ে যেমন ঢাউস তেম্‌নি নির্জীব হয়ে একেবারে নেতিয়ে পড়েছিল বেচারা।' বলে আমার কেদানির থেকে খানিকটা আমি নিজগুণেই বাদ দিই। 'তখন—তখন আর গলা টিপে মারা এমন আর শক্ত কি? টিউব টিপলে যেমন টুথপেস্‌ট্ বেরয় তেমনি আমার এক টিপুনিতেই ওর প্রাণপাখী বেরিয়ে গেল।'

যোগেশ দাশ—না কি, বোগেশ দাস—কিছু বলে না। গুম্ হয়ে থাকে।

'তবে হাঁ, বলতে পারেন—এমন বাঘ মারায় কোনো বাহাদুরি নেই। বলতে পারেন বটে। জলজ্যান্ত বাঘ তো নয়—জলমরা বাঘই, বলতে গেলে। জোলো—আধমরা বাঘ। এমন বাঘের গায়ে হাত দেয়া—ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করার মতই। তা, হাত না দিয়ে—গলায় পা দিয়েও মারতে পারতাম। আমি কেন, একটা আট বছরের ছেলেও এমন বাঘ পেলে ছেড়ে কথা বলত না। তা ঠিক।'

'রাখুন আপনার বাঘ!' বোগেশ বাবু রাগ করেন এবার—'অমন আধমরা বাঘ নয়, আপনার কাহিল নয়, কাবু নয়—জলজ্যান্ত আস্ত আস্ত বাঘ—ইয়া লম্বা—ইয়া চওড়া—এমন ছাতি—এইসা থাবা—হাঁড়ির মত হাঁ—অ্যাতো বড়ো ল্যাজ—এমন বহুৎ বাঘ আমি মেরেছি। খালি বাঘ নয়, বাঘ, ভালুক, সিংহ, হরিণ, হাতী, গণ্ডার, জলহস্তী, হি-হি-হিপ্-প্-পো-পো—'

'পটেমাস।' কথাটাকে আমিই পটাই—ওঁর হয়ে।

'হ্যাঁ, হিপ্-পো-পটেমাস্। চিতাবাঘ, জেব্রা, অজগর—কিছুই আমার বাদ নেই।'

'কাঠ বেড়ালী? কাঠ বেড়াল মেরেছেন? উচ্চিংড়ে?' জিজ্ঞেস করি আমি।—'আরশোলা, কোলাব্যাং, নেংটি ইঁদুর? এই সব শিকার করাই সব চেয়ে শক্ত।'

'তোমাদের পাশবিক ঝগড়া রাখবে?' ঘন্‌টা আমাদের বিতণ্ডায় যোগ দেয়—'শুনুন

যোগেশ বাবু, আমি নিজেও একবার বাঘের মুখে পড়েছিলাম। হুবহু সত্যি ঘটনা। সেই গল্প বলি শুনুন।'

'সত্যি?' কফি হাউসের ঘড়ির দিকে তাকাই! ছ'টা বাজতে ক'টা মিনিটই বাকি আর! সিনেমার ঘণ্টা বাজতে দেরি নেই, এদিকে ঘন্টার গল্পের ছটা সুরু হোলো।

'গল্পকারের সত্যি নয়।' বলে ঘন্টের আমার প্রতি কটাক্ষপাত—'সত্যিকারের গল্প। সেদিন ছিলো রবিবার, বড়দিনের মরশুম্। এমন দিনে লোকে ফূর্তি করতে বেরয়—ফূর্তি করে বেড়ায়। পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। বন্ধুদের বাড়ি যায়। ভালোমন্দ মুখে দেয়। এই রকম দিনে পড়বি তো পড়—আমি একেবারে বাঘের সম্মুখে গিয়ে পড়লাম। এক বিন্দু এর বানানো নয়—মিথ্যে নয়...।'

'বলেন কি!' যোগেশ বাবু বলেন। —'বাঘ দেখে খুব ভয় খেয়েছিলেন আপনি নিশ্চয়?'

'একটুও না। এর একটুখানিও আমি বাড়িয়ে বলছি নে। বাঘটা প্রথমে আমায় দেখতে পায় নি। পিঠ ফিরিয়ে ছিল। কিন্তু মুখ ঘুরোলেই একেবারে আমরা মুখোমুখি। বুঝে দেখুন কী অবস্থা...কেমন ব্যাপার! তা হলেও, আমি একপাও নড়লুম না, ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে—যতক্ষণ না বাঘটা আমায় দেখতে পায়। ওকে আমার সাম্‌না সাম্‌নি দেখি। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম।'

'বটে?' যোগেশ বলে। আমি কিছু বলি না।

'তারপর বাঘটা আস্তে আস্তে মুখ ফেরালো। তার ঘাড় ঘোরালো। আড় চোখে দেখতে পেলে আমায়। ঘুরে দাঁড়ালো তারপর। প্রকাণ্ড মাথা তার—আর ঐ---ঐ যা বলেছেন—হাঁড়ির মত একখানা হাঁ। বিশ জনের ভাত রাঁধবার মতন হাঁড়ি।'

'হাঁ হাঁ,—তারপর?' হাঁড়ির মুখে আমি চাপা দিতে যাই।

'আমাকে দেখে বাঘটা হালুম্ করে উঠলো—এমন একখানা হালুম্ যে চারধার কেঁপে উঠলো সেই আওয়াজে।'

'তখন বুঝি আপনার বন্দুক তুলে জানোয়ারটাকে গুলি করলেন?' জিজ্ঞেস করলো যোগেশ।

'বন্দুক ছিল না আমার।'

'ছুট্ লাগালেন তখন? পড়ি কি মরি করে—হন্তে হয়ে দে ছুট?' যোগেশকে বেশ উত্তেজিত দেখা যায়।

'না মশাই!' ঘন্টা আপনি বাজে—'লোককে বলতে শুনেছিলাম—কোনো হিংস্র জন্তুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে সে নাকি আক্রমণ করে না। কথাটা সত্যি কিনা পরখ করে দেখার ইচ্ছে হলো। তাই করলাম আমি। বাঘটা যেই না আমার দিকে এক পা এগিয়েছে, অম্‌নি আমি একদৃষ্টে—অপলক নেত্রে—তীব্র কটাক্ষে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার চোখের দিকে।'

'তারপর?' যোগেশ রুদ্ধ নিশ্বাসে বলে।

'বাঘটা থেমে গেল। এগুলো না আর এক পা। যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকলো।'

'মুগ্ধনেত্রে দেখতে লাগলো বুঝি তোকে?' আমি বলাম।—'তোর রূপসুধা পান করতে লাগলো?'

'আশ্চর্য্য! ভারী আশ্চর্য্য!' অবাক্ হয়ে যায় যোগেশ—'শোনা যায় বটে, কিন্তু এমনটা কখন দেখি নি। তাক্ করে বাঘ মারে বটে, কিন্তু স্রেফ্ তাকিয়ে বাঘ-শিকার—'

'শিকার কোথায়? শিকার তো আমি করি নি।' ঘণ্টা স্বীকার করে।

'শিকার না ঘণ্টা!' ঘণ্টার কথায় আমিও সায় দিই—'বাঘের দিকে খালি তাগ্ করে থাকা। তবে হাঁ, তাগ্-শিকার যদি বলো...'

'ত্যাগ স্বীকার? তা বললে তুই বলতে পারিস্। বাঘটাকে ত্যাগস্বীকার করতে আমি বাধ্য হলুম—না করে উপায় ছিল না—'

সে কথায় কান দেয় না যোগেশ দাস। তখনো সে নিজের বিস্ময় দমন করতে পারে নি। —'সত্যি, ভারী আশ্চয্যি! অবাক্ কাণ্ডই! কটাক্ষবাণে বাঘ মারা—'

'না না, মারি নি! মারা পড়ে নি বাঘটা। মারধোরের কোনো কথাই নেই।' ঘন্টা বলতে যায় বাধা দিয়ে—'শুধু চোখে চোখে চেয়ে থাকা—চোখাচোখি কেবল।'

'কিন্তু তাই কি কম আশ্চায্যি? কতক্ষণ অমন করে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা যায় বলুন? চিরকাল কিছু আপনি একটানা তাকিয়ে থাকতে পারেন না?'

'তা কি পারি? মিনিট কয়েক তাকাবার পরই আমি সিংহটাকে দেখতে গেলাম। বাঘটার পাশের খাঁচাতে।'—ঘন্টা গল্পের বারোটা বাজায়—'বেশিক্ষণ যে তাকাবো তার যো কি! ভিড়ের চোটে কি কোথাও একটু দাঁড়াতে দিচ্ছে? বলেছি না বড়দিনের হুজুগ? জু-গার্ডেনে তখন যা ভিড় মশাই!'

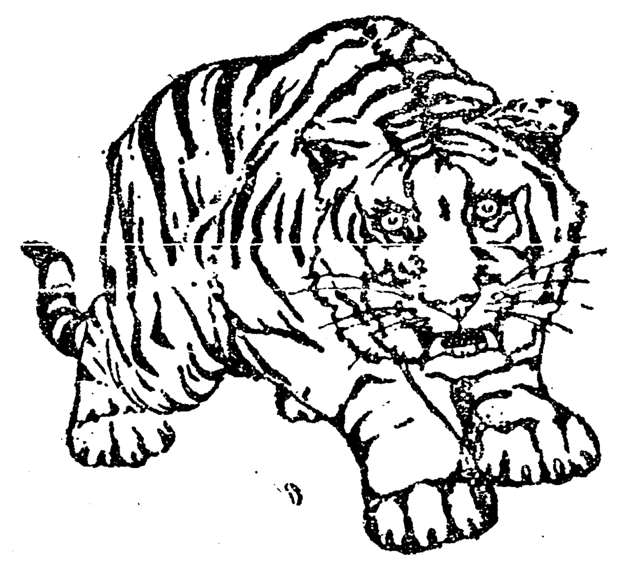

বিদ্যাপতি ঠাকুরের গান

শ্রীজয়দেব রায়, এম. এ, বি. কম্

বাংলা সাহিত্যের যাঁহারা গোড়াপত্তন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা কিন্তু কেহই খাঁটি বাংলায় কিছু লেখেন নাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং জয়দেব—ইঁহাদের তিনজনেরই কব্যরস আস্বাদন করিতে হইলে এখন আমাদের অভিধানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে; জয়দেব তো সংস্কৃত ভাষাতেই তাঁহার কাব্য লিখিয়াছেন, বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য বাংলা হইলেও প্রাকৃত স্তরের বাংলা এবং বিদ্যাপতি ঠাকুরের গান মৈথিলি ভাষাতে রচিত।

মৈথিলি ভাষা এখন প্রায় অচলিত হইয়া গিয়াছে। দ্বারভাঙ্গা জেলার কোন কোন অঞ্চলে এখনও যদিও এই ভাষায় লোকে কথা বলে, তাহা হইলেও সেই যুগের মৈথিলি ভাষা এখন মৃত ভাষার মধ্যেই গণ্য; কিন্তু একদিন এই মৈথিলি ভাষাই ছিল সারা ভারতের সাহিত্যের ভাষা; বাংলা দেশের সংস্কৃতি একদিন এই ভাষাকেই আশ্রয় করিয়া খাড়া হইয়া ছিল।

মিথিলা ছিল প্রাচীন যুগে শাস্ত্রশিক্ষার এবং বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্র; বাঙ্গালী ছাত্রেরা দলে দলে মিথিলা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া দেশে ফিরিত। তাহাদেরই একজন, বাংলার কাণা ছেলে রঘুনাথ শিরোমণি, পুঁথি কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়া বাংলা দেশে ন্যায়ের বিধান দিয়াছিলেন। দেশে ফিরিবার সময় কেবল শাস্ত্র নয়, মিথিলার সুললিত সঙ্গীতও তাঁহারা লইয়া আসিতেন। এইভাবেই বিদ্যাপতির মৈথিলি পদ বাংলার ঘরে ঘরে বহিয়া আসিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেব নিজে এই গান গাহিতেন, তাঁহার জীবনীতে উল্লেখ আছে—

"চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শ্রীগীতগোবিন্দ
এই তিন গীত করায় প্রভুর আনন্দ॥"

বাঙ্গালী কবিরা বিদ্যাপতির সেই গানের ভাষাকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই, সেই মৈথিলি ভাষার সঙ্গে বাংলাকে মিশাইয়া তাঁহারা এক অপরূপ গীতভাষা রচনা করিলেন। সেই ভাষার নাম হইল 'ব্রজ-বুলি' বা ব্রজের গানের ভাষা। গোবিন্দ-দাস, জ্ঞানদাস, রাইশেখর, শশিশেখর প্রভৃতি চৈতন্য-পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিরা সবাই এই ভাষাতেই তাঁহাদের মহাজন পদাবলী রচনা করিয়াছেন; এমন কি অতি আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথও তাঁহার প্রথম জীবনে 'ভানুসিংহের পদাবলী' নামে এই ব্রজবুলিতে গান রচনা করিয়াছিলেন—

"মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।"

বিদ্যাপতি ঠাকুরের অনুকরণে কেবল এই ভাষাই সৃষ্টি হয় নাই, বাংলার কবিরা তাঁহার আলঙ্কারিক বৈচিত্র্য, পদচাতুর্য্য, গীতিপদ্ধতি, উপমামালা, এমন কি বহু স্থলে তাঁহার মূল গানের ভাবও হুবহু আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন।

বিদ্যাপতি ঠাকুর মিথিলার রাজা শিবসিংহের রাজসভায় থাকিতেন, মহারাণী লছমী দেবী ছিলেন তাঁহার গানের অনুরাগী ভক্ত। তাঁহাদের লইয়া নানা গল্প মিথিলায় এখনও শোনা যায়। বিদ্যাপতি তাঁহার বহু গানে এই রাজারাণীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন—

"ভণই বিদ্যাপতি শুনু বর জৌবতি
ঈসভ লছমী সমানে।
রাজা শিবসিংঘ রূপনারায়ণ
লছিমা দেই পতি ভানে॥"

বিসপী নামে একটি গ্রামে কবির বাড়ী ছিল; পরে রাজা কবিকে ঐ গ্রামটি দান করেন। কয়েক পুরুষ ধরিয়া কবিরা ছিলেন মিথিলারাজের রাজমন্ত্রী এবং সভা-

কবি। কবি সংস্কৃত সাহিত্য এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে রীতিমত পণ্ডিত ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সেই কীর্ত্তিলতা এবং কীর্ত্তিভাষা নামে দুইটি কাব্যগ্রন্থ লেখেন। এইগুলির ভাষা ছিল সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের সংমিশ্রণ; কবি এই ভাষায় নামকরণ করেন 'অবহট্টা'। এক রকম তিনিই এই ভাষার স্রষ্টা। একটু বড় হইলে রাজা শিবসিংহ তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে রাজসভায় ডাকাইয়া রাজকবির আসন দান করেন। রাজা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন বিদ্যাপতি তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কবি নিজগ্রামে ফিরিয়া দেবারাধনায় এবং কাব্য রচনায় কাল কাটাইতে থাকেন। প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে তিনি যে দেশবিদেশে বিশেষ সম্মানীয় ছিলেন তাহা সুনিশ্চিত। মিথিলার সিংহাসনের পর পর তিনজন রাজা তাঁহাকে রাজগুরুর আসন দিয়াছিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার কাব্যের মূল সুরটি আনন্দের, বাংলা দেশের কবিদের মত বিরহের দুঃখ তাঁহার গানে নাই। তবে অনেক গানে ভগবৎভক্তির আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন—

"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুতমিতরমণীসমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমরপল
অব মঝু হব কোন কাজে॥"

অর্থাৎ গরম বালিরাশি যেমন জলবিন্দুকে নিঃশেষে শুষিয়া লয় আমাকেও সেই রকম তোমাকে ভোলার জন্যে পুত্র, বন্ধু এবং সংসার ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছে; এখন আমার মুক্তির উপায় কি?

বিদ্যাপতি কবি জয়দেবের কাব্যের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। বাংলার কবি চণ্ডীদাসের সহিতও এক সময়ে গঙ্গাতীরে তাঁহার দেখা হইয়াছিল। তাঁহারা নাকি উভয়েই উভয়ের কাব্যের প্রবল অনুরাগী ছিলেন। আধুনিক যুগে গ্রীয়ার্সন নামে একজন ইংরাজ পণ্ডিত মিথিলা দেশের নানা স্থানে ঘুরিয়া বিদ্যাপতির অনেক নতুন এবং প্রায় খাঁটি মৈথিলিতে লেখা পদ উদ্ধার করিয়াছেন।

রাঙারাখী

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

রামধনু-পাতে পড়েছি তোমার চিঠি,
পড়েছি সেদিন অপরূপ বিস্ময়ে।
চোখের সমুখে হাসিখুসি চাহনিটি
ভাসিয়া উঠিছে ফেলে-আসা স্মৃতি লয়ে।
এ কি চিঠি তুমি লিখিলে খেয়ালী কবি,
এ কি কল্পনা সরল-সহজ সুর!
পড়ি আর ভাবি উদাস নয়নে সবি—
যাত্রার পথ লাগে নাকো বন্ধুর।
কাছে ছিলে যবে পাই নি গভীর করে,
দূরে যেতে বুঝি আত্মার আত্মীয়।
আজ রহি রহি ব্যাকুলিত অন্তরে
বাণী উঠে তাই সুন্দর রমণীয়।
দিনে দিনে মোর স্নেহের কাঙাল মন
চেয়েছে এমনি প্রীতি আর ভালবাসা।
আজ অজান্তে এলো সে পরম ধন—
তবু যেন হায় পূর্ণ হোল না আশা।
করি নি কিছুই—বিনয়ে স্বীকার করি,
কোন্ গুণে তবু করিলে আমারে ঋণী?
স্বীয় সাধনার গৌরবে দিলে ভরি—
আজ সে যুগের একলব্যেরে স্মরি।
আশীর্ব্বাদের ধৃষ্টতা করি নাকো,
দাদা বলিয়াছ—ভাই ব'লে তাই ডাকি।
রাখিও স্মরণে যখন যেখানে থাকো
কবি-বন্ধুর মৈত্রীর রাঙারাখী।*

*অগ্রহায়ণের রামধনুতে প্রকাশিত শ্রীআদিত্য মিশ্রের চিঠির উত্তরে।

পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ছবি

১নং ছবি

২নং ছবি

নিয়মাবলী শেষের দিকে দেখ।

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

—আট—

জো'র বক্তৃতায় কোন কাজই হ'তো না যদি না তার সঙ্গে উপহারের সামগ্রী থাকতো। একে একে সেগুলো বের করে পনিদের লোলুপ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরতে ধরতে সে তাদের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করতে লাগলো।

"ফ্যাকাশে-মুখোদের বড় সর্দ্দার এই সব উপহার পনি-সর্দ্দারের জন্যে পাঠিয়েছেন।"—জো বললো,—"তিনি আরো বলেছেন, পানিরা যদি বন্ধুভাব বজায় রাখে, ফ্যাকাশে-মুখোদের ঘোড়া চুরি বন্ধ করে, তা হলে তিনি ভবিষ্যতে আরো অনেক উপহার পাঠাবেন।"

"বেশ, বেশ। বড় সর্দ্দারের বিচার-বুদ্ধি আছে। আমরা শান্তির ধূম পান করতে রাজী।"

যে সব বহু মূল্যবান্ বস্তু উপহার হিসাবে জো দেখালো সভ্য মানুষদের পক্ষে তা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। খেলো আয়না, রঙ-বেরঙের গলার মালা, সূচ, সস্তা কাঁচি-ছুরি, সিঁদূর, রঙিন কাপড় ইত্যাদি। পনিদের কাছে এ সব বস্তুর এত মূল্য হবার কারণ, এ সব পেতে হ'লে তাদের সভ্যদের দেশে যেতে হয়। সামান্য খেলো ছুরিও ওদের কাছে পরম মূল্যবান্, কারণ ওরা যে হাড়ের ছুরি ব্যবহার করে তার তুলনায় এ ছুরি অনেক উঁচুদরের জিনিষ!

সর্দ্দারকে কিছু উপহার-সামগ্রী দান ক'রে জো পুঁটলি বেঁধে ফেললো। ভবিষ্যতে আরো উপহার পাবার আশাতেই পনিরা সে যাত্রা সমস্ত উপহার-বস্তুর ওপরে জোর করলো না।

"বহমূল্য" উপহারগুলো ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে সর্দ্দার বললো, "ফ্যাকাশে-মুখোরা এখন ইচ্ছে করলে বীরদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে পারে, ঘুরে-ফিরে বেড়াতে পারে।"

"অত্যন্ত ঝানু লোকটা", জো বললো,—"ওকে আমি মোটেই বিশ্বাস করতে পারছি না। সমস্ত জিনিষপত্রগুলো নেবার জন্য আমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে ও।"

"যা বলেছো! দেখেছো, জিনিষপত্রগুলো দেখতে দেখতে ওর চোখ দু'টো কেমন জ্বলে জ্বলে উঠছিলো!" হেনরি বললো—"মাহতাওয়া ব্যাটা আরো শয়তান! ও যদি বড় সর্দ্দার হ'তো তো এতক্ষণে কখন ওরা আমাদের মাথার চামড়া খুলে নিতো।"

জো আর তার সঙ্গীরা তখন বীরদের সঙ্গে আলাপ করতে গেলো। বিশেষ বন্ধুর ভাব না দেখালেও পনিরা ওদের সঙ্গে কোনো রকম দুর্ব্যবহার করলো না। ওরাও পনিদের অদ্ভুত খেলাতে যোগ দিয়ে হৈ-হল্লা করতে লাগলো।

সেখান থেকে ওরা নদীর দিকে অগ্রসর হ'লো। হঠাৎ নারীকণ্ঠের আর্ত্ত চীৎকারে চমকে উঠলো ওরা। কান্নার শব্দটা আসছিলো নদীর দিক থেকেই। সঙ্গে সঙ্গে ওরা সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে দ্রুত এগিয়ে চললো। ক্রুসোও চললো ওদের সঙ্গে। নদীতীরে গিয়ে ওরা দেখলো একটা ছোট ছেলে জলে পড়ে খাবি খাচ্ছে আর তার মা তীরে দাঁড়িয়ে কোন রকম উপায় না দেখে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কাতর ভাবে কাঁদছে। ডিক ক্রুসোর দিকে তাকাতেই ক্রুসো সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

নদীটা পার্ব্বত্য এবং অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হ'লেও এর স্রোত প্রবল। এই জায়গাটায় বিশেষ ক'রে এর স্রোত ক্ষুরধার; কারণ যেখান থেকে নদীর জল প্রপাতের মতো এখানে পড়ছে সে জায়গাটা অত্যন্ত খাড়াই।

ছেলেটা যেখানে পড়ে গিয়েছে সে জায়গাটা ঠিক পাড়ের নীচেই, নদীর জল যেখানে সজোরে প্রপাতের মত পড়ছে সেখান থেকে মাত্র কয়েক হাতের ব্যবধানে। ক্রুসো জলে পড়েই সজোরে সাঁতরে গিয়ে ছেলেটার মাথার চুল কামড়ে ধরে জলের ওপরে টেনে তুললো; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জলের টানে প্রায় সেই প্রপাতের ওপরে গিয়ে পড়লো। জলের তোড়ে ছেলেটা ততক্ষণে তার মুখ থেকে আলগা হয়ে পড়েছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে চারিদিকে তাকাতেই ক্রুসো ডুবন্ত ছেলেটাকে দেখতে পেলো। আর এক মুহূর্ত্ত দেরী হ'লেই ছেলেটা প্রপাতের মুখে পড়ে প্রাণ হারাতো, কিন্তু দেখামাত্র ক্রুসো আবার তাকে চুল ধরে টেনে তুললো।

মৃতপ্রায় ছেলেকে ফিরে পেয়ে মায়ের সে কী আনন্দ! জো, হেনরি আর ডিকও ক্রুসোকে খুব আদর করতে লাগলো। ওদের আদরের আতিশয্যে ক্রুসোর অত্যন্ত অস্বস্তি হ'তে লাগলো। সে তো জানতো না যে ওরা তিনজনেই তাকে আপন ভাইয়ের মতো ভালোবাসে!

এরপর ওরা তাঁবুতে ফিরে এলো। পথে একটা ছোট ছেলে ওদের খবর দিলো, এবার ভোজনপর্ব্ব শুরু হবে। ওরা সব ওষুধ-চুরুট টানতে বসে গেছে, ফ্যাকাশে-মুখোরাও যেন এখুনি ওদের সঙ্গে যোগ দেয়।

'ওষুধ' কথাটা আমাদের ভাষায় যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, ওদের দেশে অত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। ওষুধ বলতে ওরা যা কিছু ভালো, যা কিছু বিস্ময়কর, যে কোনো ব্যাপারে কিছু মাত্র

বাহাদুরি আছে, সব কিছুই বোঝে। এই ভোজনপর্ব্বও ওষুধ, কারণ আজ শিকার ভালো পাওয়া গেছে ব'লে এর জন্য বিশেষ আয়োজন হয়েছে।

এর পর শুরু হ'লো খাওয়া। তেমন খাওয়া দেখা তো দূরের কথা, রূপকথার গল্পেও বোধ হয় ওরা কেউ কখনো শোনে নি। দলে পড়ে ওরাও এত বেশী খেয়ে ফেললো যে শেষ পর্য্যন্ত হাঁসফাঁস করতে লাগলো।

পরের দিন সকাল। জো, হেনরি আর ডিক বসে বসে নিজেদের অবস্থা চিন্তা করছে। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে জো বললো, "ব্যাপারটা মোটেই ভালো ঠেকছে না। সব থেকে শয়তান হলো ঐ মাহতাওয়া। হতভাগার উদ্দেশ্য হ'লো আমাদের সমস্ত মালপত্র হাত করা। যত দিন সে তা না করতে পারছে, আমাদের সহজে ছাড়বে না।"

"আর, হাত করবার পরই যে ছাড়বে, তেমন নিশ্চয়তাই বা কোথায়? এমন সুবিধেয় পেয়েও কি ও আমাদের মাথার চামড়া খুলে নেবার চেষ্টা করবে না?" হেনরি বললো।

"তা হ'লে কি হবে জো?" বিষণ্ণ স্বরে ডিক জিজ্ঞাসা করলো।

"পালানোই এখন একমাত্র উপায় দেখছি। তবু আমি একবার সান্-ইত-সা-রিশ্‌কে বলে দেখবো। ওকে যদি কোনো রকমে মাহ্‌তাওয়ার ওপরে বিরূপ করতে পারি তো হয়তো একটা উপায় হ'তে পারে।"

জো'র কথা শেষ হ'তে না হ'তেই খট্‌মট্‌ ক'রতে ক'রতে মাহ্‌তাওয়া এসে হাজির। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা কইলো না। হেন্‌রি ডিকের রাইফেলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো মাহ্‌তাওয়ার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না ক'রে। সে রাইফেলটার ওপরে মনোযোগ দিলো।

ডিকের রুপোলী রাইফেল পনিদের কাছে এক রীতিমত বিস্ময়কর বস্তু। ওরা তো রাইফেলটাকে 'ওষুধ' আখ্যাই দিয়ে দিয়েছে!

রাইফেলটার দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে মাহ্‌তাওয়া বললো, "মাহ্‌তাওয়া ঐ দু'-নলা বন্দুকটা চায়। তার বদলে সে তার সেরা ঘোড়াটা দিতে প্রস্তুত।"

"মাহ্‌তাওয়া'র দয়ার শরীর। কিন্তু ওর মালিক ওটা হাতছাড়া করতে রাজী নয়, কারণ তাকে অনেক দূর পথ যেতে হবে, পথে শিকার না করলে চলবে না।"—জো উত্তর করলো।

"শিকারের জন্য তো ও তীর-ধনুক ব্যবহার করতে পারে!"

"না, ও তীর-ধনুকের ব্যবহার জানে না। ও তো রেড্‌ ইণ্ডিয়ান নয়!"

রাগে মাহ্‌তাওয়ার মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে বললো, "ফ্যাকাশে-মুখোদের সাহস বড় বেড়ে গেছে দেখছি! তারা এখন মাহ্‌তাওয়ার হাতে। এমনিতে রাইফেলটা না দিলে সে জোর ক'রে ছিনিয়ে নেবে।" বলেই সে একলাফে গিয়ে হেন্‌রির হাতে থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিলো।

পনি ভাষা জানা না থাকায় হেন্‌রি ওদের কথাবার্ত্তা কিছুই বুঝতে পারে নি। এই

অতর্কিত আক্রমণের জন্য সে প্রস্তুত ছিলো না। সঙ্গে সঙ্গে সে সর্দারের ওপর লাফিয়ে প'ড়ে এক টানে রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে তাকে তাঁবুর বাইরে বের ক'রে দিলো।

মুহূর্ত্ত মধ্যে মাহ্‌তাওয়া ছুরি বাগিয়ে ধরে এমন চাৎকার করে উঠলো যে দশ-বারোটা পনি একসঙ্গে কোথা থেকে ছুটে এলো। পলক ফেলতে না ফেলতেই তারা হেন্‌রিকে ঘিরে ফেলে তার হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিলো। (ক্রমশ:)

সোনার বালুচরে

শ্রীঅশোক সেন, এম্‌. এ

— তিন —

উইল আমাদের জন্যে ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন; ঘরে ঢুকতেই তিনি আমার হাতখানা এমন ভাবে চেপে ধরলেন যে তাতে অমি ভয়ই পেলুম। আমার আশংকা সত্যি নয় তো? উনি বিশ্রী রকম রোগা হয়ে গেছেন, চোখ দু'টো অস্বাভাবিক ভাবে জ্বলছে। দু'-এক কথার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম—"পোকাটা আনিয়েছেন?"

আমার কথা শুনে তিনি লাল হয়ে উঠলেন, থতমত খেয়ে বল্লেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আনিয়েছি বই কি! পরের দিন ভোরেই আনিয়েছি। ওটাকে কিছুতেই আমি হাতছাড়া করব না। জুপ বেটা ঠিক চিনেছে ওটাকে।"

সভয়ে জিজ্ঞেস করলুম—"কেমন করে?"

"ওটাকে সে খাঁটি সোনার পোকা বলে বিশ্বাস করে।"

বলতে বলতে উইল তখুনি উঠে দাঁড়ালেন, তারপর কাচের আলমারী থেকে পোকাটাকে বের ক'রে নিয়ে এলেন। পোকাটা দেখতে সত্যি ভারি সুন্দর,—প্রাণিবিদ্‌দের কাছে নিশ্চয় এর খুব আদর হবে। পিঠের একদিকে দু'টো কালো গোল দাগ, আর একদিকে একটু লম্বা আর একটা দাগ। আঁশগুলি খুব শক্ত

চক্‌চকে—ঠিক যেন বার্নিশ করা সোনা। ওজনেও বেশ ভারী—জুপিটার সে কথা মিছে বলে নি।

"পোকাটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। অদৃষ্ট আর পোকা—এ দু'টি বিষয়ে তোমার মতামত শুনবার জন্যে তোমাকে খবর দিয়েছি।"

তাঁকে বাধা দিয়ে আমি চেঁচিয়ে বল্লুম—"আপনি বোধ হয় অসুস্থ, আপনার একটু সাবধান হওয়া দরকার—এখন শুতে যান। আপনি সেরে উঠুন,—আমি কয়েক দিন না হয় এখানে থেকে যাব।"

বাধা দিয়ে তিনি বল্লেন—"দেখ, বড় অশান্তিতে আছি আমি। পারবে এ অশান্তি দূর করতে? বলো, পারবে?"

"বলুন, আমার যা সাধ্য তা অবশ্য করব।"

"কাজটা খুব কঠিন নয়। জুপকে নিয়ে আমি শীগ্‌গিরই একটা অভিযানে বের হচ্ছি—ওপারে ঐ পাহাড়ের ভিতরে। আমাদের আরও একজন বিশ্বাসী সঙ্গী দরকার, তাই তোমার কথাই আগে মনে পড়ল। ফলাফল যাই হোক—তাতে কিছু এসে যাবে না; কিন্তু আমার এ অস্থিরতা এতে দূর হবে বলে মনে হয়।"

আমি বল্লুম—"আপনাদের কোন কাজে লাগলে আমি খুসিই হব। কিন্তু তার আগে জানতে চাই, এই হতচ্ছাড়া পোকাটার সঙ্গে আপনাদের ঐ অভিযানের কোন সম্পর্ক আছে কিনা।"

"হ্যাঁ, তা আছে।"

"তা হ'লে এ সব আজগুবি ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই।"

উইল খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "যদি একান্তই যেতে না চাও তবে আমাদের নিজেদেরই চেষ্টা করে দেখতে হবে।"

একটু ইতস্ততঃ করে বললাম, "কতক্ষণ ওখানে থাকতে চান আপনারা?"

"সম্ভবতঃ সারারাত। আমরা এখুনি রওনা হব—যেমন করেই হোক ভোর হবার আগে ফিরে আসব।"

"তা হ'লে দিব্যি করে বলুন, আপনার খেয়াল আর পোকা-পর্ব মিটে গেলে আপনি ফিরে আসবেন, আর আমার কথামত চলবেন? বলুন, চলবেন?"

উইল রাজী হলেন।

কি আর করি, একটা দুশ্চিন্তা নিয়ে ওঁদের সঙ্গে রওনা হলুম। তখন বেলা প্রায় চারটে। আমরা, অর্থাৎ আমি, উইল, জুপিটার আর কুকুরটি এগিয়ে

চললুম। জুপিটারের সঙ্গে ছিল কাস্তে আর কোদালগুলো। সে নিজেই ওগুলোকে নিয়ে যাবার ভার নিলে। অবশ্যি, আমার মনে হয় তার সাহেবকে খুশি করবার জন্যে নয়,—তাঁর ভয়ে। ঐ অস্ত্রগুলো তাঁর কাছ থেকে যত দূরে রাখা যায় ততই নিরাপদ। জুপিটার একরোখা। পথ চলতে চলতে তার মুখ দিয়ে মাত্র একটি কথাই মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল—"হতচ্ছাড়া পোকা!" আমার হাতে ছিল কয়েকটা লণ্ঠন, আর উইলের হাতে ঝুলছিল সুতোয় বাঁধা সোনালী পোকাটা। চলতে চলতে যাদুকরের মত সেটাকে দোল দিচ্ছিলেন তিনি। বন্ধুর মস্তিষ্ক-বিকৃতির এই পরিষ্কার লক্ষণ দেখে আমি চোখের জল সামলাতে পারলুম না।

যাই হোক, এ অবস্থায় তাঁর খেয়াল মত চলাই ভাল মনে করলুম, ভাবলুম পরে যদি তাঁর সুবুদ্ধি হয়। যেতে যেতে তাঁর কাছে জানতে চেয়েছি সত্যি কি উদ্দেশ্যে তিনি বেরিয়েছেন, কিন্তু জানতে পারি নি। অসম্ভব গম্ভীর হয়ে তিনি চলছিলেন। আমার সব প্রশ্নের জবাবে কেবল একটি কথা বলছেন, "দেখি কি হয়!" বাজে কথা বলবার মত তাঁর মনের অবস্থা ছিল না।

নৌকোতে ছোট নদী পার হয়ে এপারে এলুম, এগিয়ে চললুম সবাই সোজা উত্তর-পশ্চিম দিকে। কী সে জংগল! মানুষের পায়ের চিহ্ন কোথাও দেখতে পেলুম না। উইল বেশ স্থির পদক্ষেপে আগে আগে চলেছেন, "আর মাঝে মাঝে থামছেন। মনে হ'ল, আগে যে সব চিহ্ন মনে মনে ঠিক করে রেখে গিয়েছিলেন সে সবই এখন মিলিয়ে দেখছেন তিনি।

(ক্রমশঃ)

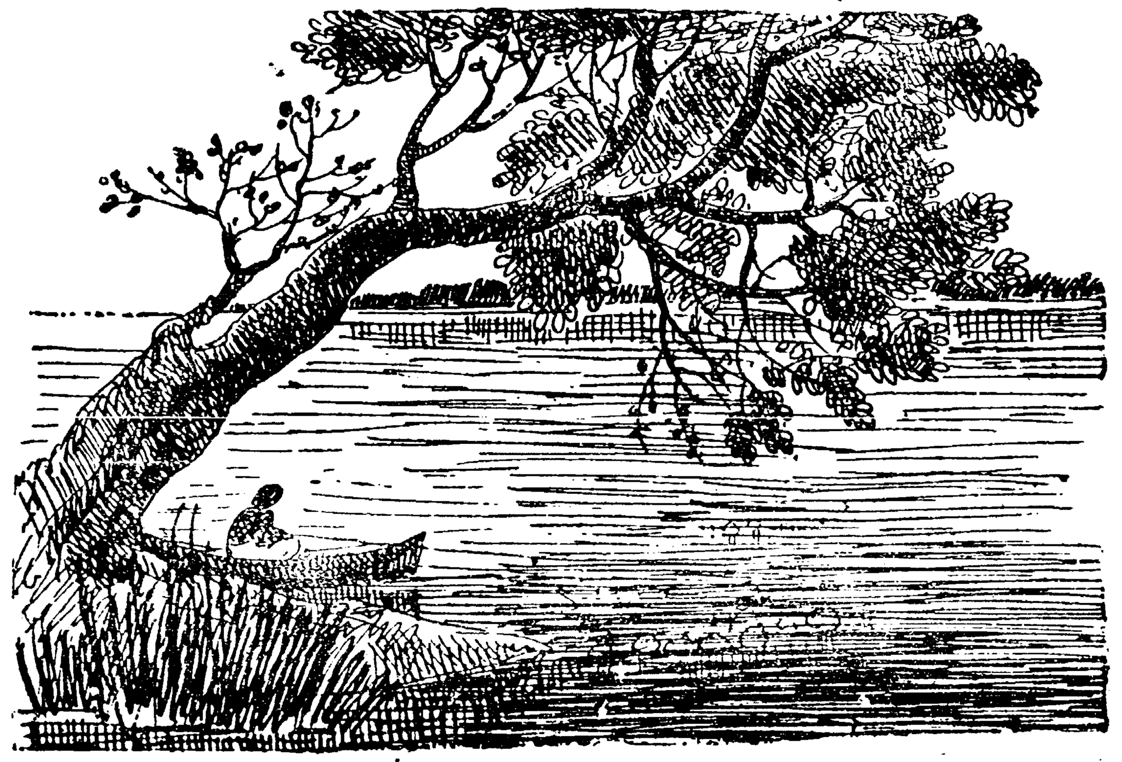

বিসর্জন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জনৈক পুরবাসী

যুদ্ধের আগেই সেনাপতি পলায়ন করেন, তার ওপর অমন দেহগৌরবে গরীয়ান বীরপুরুষ, এমন ব্যাপার কেউ দেখা তো দূরে থাকুক, শুনেচেন বলে তো আমার জানা নেই। জানা নেই এই কারণে যে, এমন একটা বিস্ময়কর ঘটনা কেউ দেখে থাকলে তার গল্প নিশ্চয়ই করতেন। আর, যেখানে যে ভাবেই এই গল্পটি করুন না কেন, কানে নিশ্চয়ই আসতো। কারণ গল্প, গুজব, গুল আর কথা কানে হাঁটে এবং হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হওয়া তো দূরের কথা আরও পুষ্ট হয়। আর সেই ভাবেই সাগর ডিঙোয়, পাহাড়পর্ব্বত পেরোয়, দুস্তর কালকেও জয় করে। আমাদের বিসর্জনের গোবিন্দমাণিক্যের সেনাপতি কিন্তু একদিন সত্যিই নিঃশব্দে পলায়ন করলেন। পলায়ন করেছিলেন বলেই, অর্থাৎ সত্যি তা ঘটেছিল বলেই আজ তার গল্পটা করতে পারচি। কেন পলায়ন করেছিলেন তা বলতে পারবো না। বানিয়ে কিছু বলার লেখার অভ্যেস আমার নেই। কারণ আমি পাকা শিল্পী নই। যারা লোকের নামে বানিয়ে বলে চারু-কলারসের বিচারে তারা পাকা শিল্পী বলে পরিগণিত হওয়াই উচিত। কোন কোন জায়গায় হয়ও। আবার কোন কোন জায়গায় সে জন্য— যাক্ সে কথা।

সেনাপতির পলায়নে আমাদের দশা যে কি হতে পারে তা পাঠক-পাঠিকারা আন্দাজ করে নিও। এদিকে হুলোহুলিটা বেশ জমে উঠেচে। সত্যি কথা বলতে কি, মৌমাছি-মশায় একবারও তাঁর হুল বার করেন নি, বরং মধু-খাওয়া মুখে যতদূর সম্ভব মধু ও মোম মাখিয়ে মোলায়েম করে বসেছিলেন। তাঁর যা কিছু কাজকর্ম করছিলেন আমাদের রাজামশাই, তাঁর পশ্চাতে পুরুত-ঠাকুর এবং—। আমরাও, বিশেষ করে এই হতভাগ্য পুরবাসী, রাজরোষ ও ব্রহ্মশাপের প্রত্যক্ষ তাপ থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে মৌমাছিটিকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিলাম। মাছিও ব্যাপার দেখে উড়্ উড়্ হয়ে উঠ্‌লো কিন্তু কর্তারা তার ডানা চেপে ধরে আমাদের সঙ্গে কত রকমের প্যাঁচ কষতে লাগলেন। এমনঃসময়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা সেনাপতি হাঁপাতে হাঁপাতে নিয়ে এলেন শ্রীআশিস্ ভট্টাচার্যকে এবং এসেই যা বললেন, তার সার কথা হচ্চে—একটুও বাড়িয়ে বলচি না কিন্তু—"অনেক কেল্লা ফতে করেচে এই লোকটি। আজ থেকে আমার পদে মহড়া দেবে এ।"

ভাল করে তাকিয়ে দেখবার অবসর তখন ছিল না। তাই বুঝতে পারলাম না তিনি যা দিয়ে গেলেন তা আশিস্ না অভিশাপ। কালো হলেও চেহারাটি বেশ, কিন্তু শরীরের গ্রন্থি-গুলো যেন খিল আঁটা। মুখের কথা ছাড়া আর সবই সোজাসুজি নড়াচড়া করে। ঘাড় যখন বেঁকে সোজাই বেঁকে। মাথা যখন নোয়ায় সোজাই নোয়ায়। বুঝলাম, সুদীর্ঘকালের কুচ্-কাওয়াজের ফল। মনে পড়চে না কোন্ দৈত্য না রাক্ষস ভূমিষ্ঠ হয়েই লড়াই শুরু করেছিল। ইনিও সৈনাপত্যে নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজামশাইদের দলে ভিড়ে গেলেন এবং আমাদের

বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন। কিন্তু বোঝা উচিত ছিল রঘুপতির কথায়—"সে কাল গিয়েছে"—এখন জনতার ঠেলায় গজদন্তমিনারবাসী দাম্ভিককেও সাধারণের দরজায় এসে নতশিরে হাত পেতে দাঁড়াতে হয়।

অবশেষে একদিন মৌমাছি চোঁ করে উড়ে গেল, মধুলোভে মহড়ায় "আর এল না" এবং সেই দর্শকবিজয়িনী মহিলা দু'টিও নেপথ্যেই রয়ে গেলেন, আমাদের নাট্যমঞ্চে আবির্ভূত হলেন না। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। অপর্ণা ও মহারাণীর মুখে হাসি ফুটলো, যেন কুমুদ-বনে চাঁদের আলো পড়লো। কর্তা মশাইরা ঢোঁক গিললেন, সেনাপতি রুষ্ট হয়ে মাঝে মাঝে হাতের পেশী দেখাতে ও কটমট করে চাইতে লাগলেন।

তবুও যথারীতি রিহার্শাল চলতে লাগ্‌লো। যাঁরা রোজ আসতেন না তাঁরা রোজ আসতেন না, যাঁরা আসতেন তাঁরাই আসতেন। তাঁদের নিয়েই রিহার্শাল সুষ্ঠুভাবে চল্‌তো। কারণ প্রথম থেকে মাঝ বরাবরই রিহার্শাল দেওয়া হ'ত। তার বেশী অর্থাৎ শেষ অবধি কোন দিনই দেওয়ার সময় ও অবসর হয়ে উঠতো না। সেদিকে রাজামশাইদের রাজদৃষ্টি আকর্ষণ করলে উত্তর দিতেন, "গোড়ার দিকটা যড়গত করলে শেষের দিকটা আপনিই হয়ে যাবে।" এ যেন গামছা। মুখপাতের ঠাস বুনুনি হলেই লেজপাতের জালিতেও সব ঢাকা পড়বে। যেন গয়লাবাড়ির দই। মাথাটা জমলেই হ'ল, তলায় ঘোল থাকলেও সবাই খেয়ে বলবে, "খাশা" এবং গোঁফেও একটু লাগিয়ে রাখবে।

একদিন কর্তাদের জিজ্ঞেস করলাম, "অপর্ণা আর জয়সিংহের গানের কি হবে?"

একদা বালিকাবয়সে অপর্ণা নাকি নৃত্যগীতপারদর্শিনী' ছিল। নৃত্যে যে পারদর্শিনী ছিল তা তার হস্তচালনা দেখেই বোঝা যেত। কিন্তু বিসর্জনে তার নাচার দরকার নেই, গানই তাকে গাইতে হবে। রাজা মশাই বললেন, "ভাবনা নেই। সব ভার আমার।" রাজসভায় গাইয়ে-বাজিয়ের আনাগোনা লেগেই আছে। তারা আবার যে-সে নয়, সব নিউ ও ওলড্‌ এম্পায়ার বা রেডিও-ফেরৎ। কারো বোন গান গেয়ে বাংলা মাৎ করে, কারো আর কেউ স্রেফ বাজিয়ে বাজার একচেটে করেচে। এ সব হ'ল সঙ্গীতকলাজগতের কথা। আমরা পুরবাসী, বাজনার মধ্যে জানি জয়ঢাক, ঢোল, কাঁসি, বঙাবঙ্‌ আর গুপী যন্ত্র। শ্রীখোল, শ্রীকরতাল কখন কখন দেখি বটে কিন্তু তাও ভক্তিরসে একেবারে চটচটে হয়ে। গানের মধ্যে, সুরের মধ্যে যা শুনি তা চলে বেশী রাত্রে মুদির দোকানে, মাঠে, নদীর ধারে, কি বাড়ির দরজায় ফকির-বোষ্টমের মুখে। আধুনিক গান মাত্রই আমাদের কাছে, "কলের গান"।

জয়সিংহ বললে, "আমি গাইতে পারি, কিন্তু গাইব না।"

বললাম, "তুমি মুখ নাড়বে। পেছন থেকে একজন গাইবে।"

"তার দরকার নেই। দরকার হ'লে আমিই গাইব। তবে গাইব না।"

কথাটা ভাল বুঝতে পারলাম না, তবে এটুকু বুঝলাম, আর ওকে ঘাঁটানো ঠিক হবে না। ও যদিও আমায় "দাদা" বলে তবুও হঠাৎ যদি বলে বসে "দাদা-ফাদা মানি না!"—ইদানীং কোন কারণে সেনাপতির সঙ্গে ওর "ঠাণ্ডা স্নায়ুযুদ্ধ" চলচে, কখন তা "গরম পেশীযুদ্ধে" পরিণত হয় কে জানে! কাজেই মনে মনে খুব একচোট হেসে চুপ করে রইলাম।

রাজামশাইয়ের মুখে শুনলাম আমাদের অক্রূরই একা সব গান গেয়ে ঠিক করে দেবে। এতে অবিশ্বাসেরও কিছু দেখা গেল না। কারণ যেখানেই পদাবলী কীর্তন ও গানের জলসা সেখানেই আমাদের অক্রূর। এ যেন গুড় আর পিঁপড়ে, মধু আর মৌমাছি, জিলেপি আর বোলতা, লজেঞ্চুস আর খুকু। এই থেকেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে—অক্রূরও যা গাইয়েও তাই। তবে অক্রূরের গান যে শুনি নি তা নয়। সে ঘরে বসে কাজ করতে করতে "শুনহ মাধব" বলে চিকণ সুরে গান ধরে, "রাধে—এ—এ—" বলে সুর টানে। তার সঙ্গে কেউ কেউ টেবিল বা বইয়ে টোকা দিয়ে অথবা মুখে শ্রীখোলের বোল তুলে—যেমন "ঘুম ঘুম" শব্দে—সঙ্গতও করে থাকে। কাজেই সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে রিহার্সাল দিতে লাগলেন। গরু কত বার জাবর কাটে জানা নেই, কিন্তু প্রথম দিকটা আমরা যতবার "রিহার্সাল" দিলাম তত বার যে নয় এটা নিশ্চয়। কারণ রিহার্সাল দিতে দিতে অন্যের পার্ট প্রত্যেকেরই মুখস্থ হয়ে গেল, কেবল মুখস্থ হ'ল না যার পার্ট তার নিজের। এদিকে মন্ত্রিহীন রাজসভা, চাঁদপালহীন দেওয়ানখানা, নিস্তারিণী ও ক্ষ্যান্তমণিহীন পুর-পল্লী, প্রহরী নেই, পাইক-পেয়াদাও খুঁজে পাওয়া যায় না, ধ্রুব সাজবার মতো খোকা-খুকুরও অভাব, প্রম্প্‌ট্‌ করবার মতো লোকই বা কোথায়? এ যেন নিম্নমধ্যবিত্তের সংসার। এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল "বিশ্বকাকা" শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু মন্ত্রিত্ব গ্রহণে সম্মত হয়েছেন। আরও খবর পাওয়া গেল, কি, খবরের কাগজের মতো খবরটি তৈরি করে মজলিশে ছেড়ে দেওয়া হ'ল জানি না, যে, "শ্রীঅখিলও অভিনয়ে যোগ দিতে রাজী আছেন, কিন্তু তাঁর একটি বড় পার্ট চাই।" হায় রবীন্দ্রনাথ! যে লেখনী একটা জয়সিংহ, একটা গোবিন্দমাণিক্য, একটা রঘুপতি এবং একমাত্র রাণী সৃষ্টি করেছে তা কি ঐ সবের ভূরি সৃষ্টি করতে পারতো না? তা হ'লে মৌমাছি, স্বপনবুড়ো ইত্যাদি যে যেখানে ছদ্মবেশী আছে সবাইকে এনে এক সঙ্গে কি কাণ্ডটাই না করে ফেলা যেত। হে মহাকবি! 'স'খের থিয়েটার ও 'স'খের অভিনেতাদের কথা কি তোমার একবারও মনে পড়লো না?

এই রকম অবস্থায় শ্রীগৌরীশঙ্কর রাজী হয়ে গেল চাঁদপাল হ'তে। অতঃপর নিস্তারিণী ও ক্ষ্যান্তমণি ছাড়াই যে আমাদের বেশ ভাল ভাবেই চল্‌তে পারে তা বুঝতে পারলাম। ওদের কথা বসিয়ে দেওয়া গেল নেপাল, কানু ও গণেশের মুখে। যেখানে ছিল আমার ননদের ছেলে সেখানে "ননদ"কে "শ্যালা" বানিয়ে লেখা হ'ল "আমার শ্যালার ছেলে।" কিন্তু নেপাল তার পারিবারিক শান্তির দিকে তাকিয়ে আর একটু এগিয়ে করলে—"আমার বন্ধুর শ্যালার ছেলে"! যা শত্রু পরে পরে।

এই সময়ে কার মাথা থেকে যেন বার হ'ল, "তিনকড়ি বাবুকে আনা যাক। তিনি একটু-আধটু দেখিয়ে দেবেন।" তিনকড়ি বাবু মানে শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্তী, বিখ্যাত অভিনেতা। ভবানীপুরে, ক্ষিতীন বাবুদের বাড়ির কাছেই থাকেন। এখন বয়স অনেক, নাট্যমঞ্চ থেকে বহুকাল অবসর গ্রহণ করেছেন।

অতঃপর একদিন তাঁর হাত ধরে ঘরে এনে বসানো হ'ল। এসেই বললেন, "আপনাদের আমি কি দেখাবো?"

সত্যিই তো! অনেকেরই "প্রকাণ্ড পিছন-জমি" (গ্রেট্ ব্যাকগ্রাউণ্ড), তা দেখে অত্যন্ত সাহসীরও বুক কাঁপে। তবে আমাদের পুরবাসীদের পিছন জমিই নেই। কাজেই তাঁর সামনে অভিনয় করতে আমাদের বুকের ভেতরে বসে কে যেন গুড়্গুড়ি টানতে লাগ্লো। তবুও "জয় মা ত্রিপুরেশ্বরী" বলে ঝুলে পড়লাম।

তিনি অবশ্য কোনদিনই কোন কথা কাউকে বললেন না। এমন মুখ করে, এমন মনোযোগ দিয়ে শুনতে ও দেখতে লাগলেন যে মনে হতে লাগলো, খুব উপভোগ করছেন। তাতে আমরাও উৎসাহিত হয়ে "ভয়েস থ্রোইং" "ভয়েস লুপিং" উচ্চারণ "কিলিং" আরম্ভ করে দিলাম। রাজা মশাই নির্বাসিত নক্ষত্ররায়ের চিঠিখানি হাতে করে অভিনয় করতে করতে ঘাড় নেড়ে বললেন—

"না—না—এর্র্র্র্চনা যাহারই হোক্—"

শুনেই তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি। না, দৃষ্টি বেশ পরিষ্কার। কিন্তু আবার সেই "এর্র্র্র্চনা"! মনে পড়লো "কিং ক্যান্ ডু নো রং"—যারা শুনবে তাদেরই ভুল।

একদিন চক্রবর্তী মশাই নেপালকে বললেন, "মশাই, আপনি 'বর্ন্ অ্যাকটর'।" পাঠক-পাঠিকারা যেন এ কথার এ অর্থ না করে যে, সে অভিনয় করতে করতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তা হ'লে "বর্ন্ পোয়েটরা" খাতা-পেনসিল হাতে, "বর্ন্ ফাইটাররা" তলোয়ার আস্ফালন করতে করতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, এই মানে করতে হয়।

আর একদিন জয়সিংহকে বললেন, "তোমার চেহারা সুন্দর। তুমি স্বভাবতঃই এই ভাবে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

চেহারা সুন্দর বললে কে না খুশি হয়? অমন যে কাক সেও ঐ একটি কথায় মুখের জিলিপি ফেলে দিয়ে শিয়ালকে গান শুনিয়েছিল। তার ওপর আমাদের জয়সিংহ সত্যিই প্রিয়দর্শন। কাজেই জয়সিংহের সিংহবিক্রম যে আরও বৃদ্ধি পাবে এ তো ধরা কথা।

আবার একদিন আমাদের পুরুত ঠাকুর বিনয় করে বললেন, "দাদা, দেখিয়ে দেবেন?"

তিনকড়ি বাবু ততোধিক বিনীত ভাবে উত্তর করলেন, "দাদা, আপনাকে আমি কি দেখাবো?"

বুঝতে পারলাম না, কে কার দাদা।

তবুও দেখালেন, "ফিরে দে—ফিরে দে—ব্রাহ্মণের অধিকার।"

দীপশিখা আজ স্তিমিতপ্রায়, কিন্তু ঐ একটি চমকেই বোঝা গেল, যখন পূর্ণ তেজে প্রজ্বলিত ছিল তখন ছিল কতখানি উজ্জ্বল। বৃদ্ধের উদাত্ত কণ্ঠস্বর রজনীর পল্লীর রুদ্ধ কবাটে কবাটে আঘাত করে কথাগুলিকে প্রতিধ্বনিত করতে লাগলো।

আবার একদিন আমাদের মহারাণীকে নির্দেশ দিলেন, ঠিক যেন এক ব্যথাকাতরা অভিমানাহতা নারী। কেবল বললেন না আমাদের কিছু। কারণ আমরা ছিলাম, "ইনকরিজবল! বেয়ন্ড্ রিপেয়ার!"

(ক্রমশঃ)

শ্বেতপাথরের দেশে

শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ, বি. এল্

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, বহু অর্থব্যয় ক'রে পৃথিবীর বহু দূর দেশের বহু দুর্গম জায়গা তিনি ঘুরে এসেছেন, কিন্তু

"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ঘাসের শীষের উপরে একটি শিশির-বিন্দু।"

আজকাল ইয়াংকিদের দেশ, বিলেত, ইয়োরোপ যার পকেটে পয়সা আছে সে-ই ঘুরে আসে, আর যাদের চিন্তার মানিব্যাগ ভারী কিন্তু টাকাপয়সার মানিব্যাগ হাল্কা তারা ইয়োরোপ-আমেরিকার ছবি দেখে—ম্যাপ দেখে আর দুঃখের চাপা নিঃশ্বাস ছাড়ে। কিন্তু কেন? যারা বাইরে ঘুরে এসেছে তাদেরও জিজ্ঞেস করি আর যারা যায় নি তাদেরও জিজ্ঞেস করি—নিজের দেশের জিনিষগুলি ভাল করে দেখেছ? এত বড় দেশ ভারতবর্ষ,—তার এত পুরোনো ইতিহাস—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পাঠান, মোঘল, ইংরেজ, ডাচ্, ফরাসী, কত রকম ধর্ম্ম ও দলের ছাপ ও কীর্ত্তি রয়েছে ছড়িয়ে কাশ্মীর থেকে কুমারিকা। তা হ'লে সে সব না দেখেই কেন রাতদিন স্কটল্যাণ্ড অব ইষ্ট আর সুইটজারল্যাণ্ড অব ইষ্ট নিয়ে গবেষণা। আগে 'ইষ্ট'টাই ভাল করে দেখি, তারপর বিলেত দেশটা মাটি না সোনারূপোর ভেবে বা দেখে নেবার চেষ্টা করা যেতে পারে। হিমালয়ের মত পাহাড় দুনিয়ায় আর কোথায় আছে? আর কোন্ দেশে তুষারধবল পাহাড় থেকে আরম্ভ করে অনন্ত সমুদ্র আর এত রকমারী দৃশ্য—এত রকমারী মানুষ—এত রকমারী ভাষা আছে?

পূজোর সময় ক'দিন দম নেবার জন্য এবারেও রওনা হলাম। উদ্দেশ্য, প্রথম যাব মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর, তারপর ওদিক্‌কার আরও কিছু কিছু জায়গা ঘুরে দেখব। অনেক বাঙ্গালী জব্বলপুরে, এ কথা সত্যি, কিন্তু এলাহাবাদ ষ্টেশনেও যখন বিবরণ চাইলাম, দেখলাম ঠিকঠাক্ বল্‌তে পারল না কেউই। বেশীর ভাগেরই অসীম অজ্ঞতা। যদিও হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে ভাব দেখা যাবে যেন—"জব্বলপুর? আরে ও ত' নখাগ্রে।"

আমার নিজের মনে হ'ল মধ্যপ্রদেশ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না—যুক্ত ঘামায়

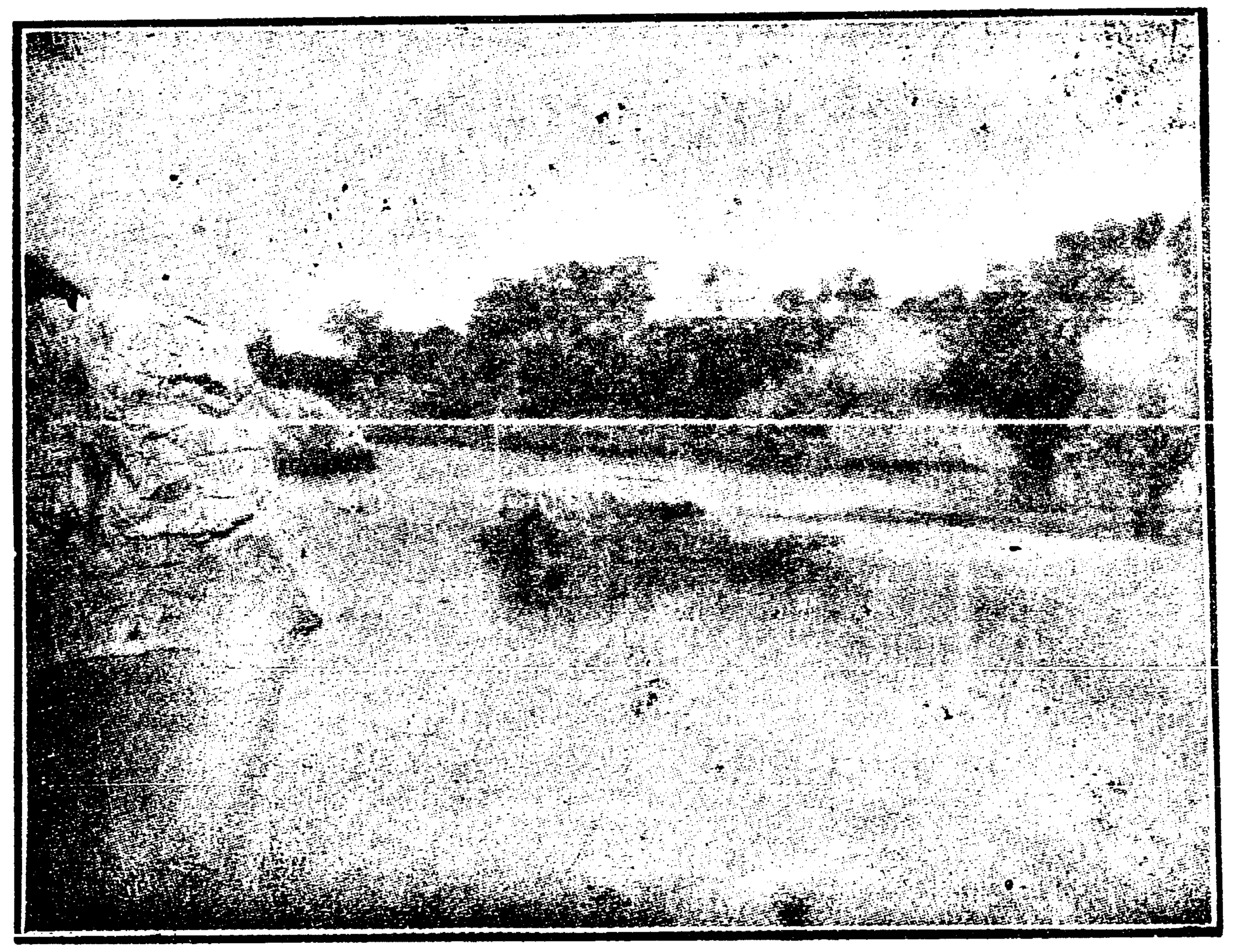

নর্ম্মদা

উত্তর ভারত কিংবা বোম্বাই, মাদ্রাজ নিয়ে। বোধ হয় সেজন্যই সেখানকার জীবনে অনেক শান্তি এবং অনেক স্থৈর্য্য রয়েছে।

কাজেই যারা ওদিক্‌টায় যাও নি বা গিয়েও ভাল করে দেখ নি তাদের জন্যই আজ লিখতে বসেছি।

কলকাতা থেকে রাত ৮টায় রওনা হ'লে এলাহাবাদ, নৈনি হয়ে মধ্যপ্রদেশে ই, আই, আর-এর বম্বে মেলে যাওয়া যায়। জব্বলপুর যেতে পথে পড়ল মাণিকপুর, কাটনী, সত্‌না প্রভৃতি মধ্যপ্রদেশের সহর বা ষ্টেশনগুলো। মাণিকপুর ষ্টেশনে

নেমে পড়লেন আমাদের এক বন্ধুবর তাঁর অনেক হৃষ্টপুষ্ট সন্তানসন্ততি সহ, কারণ তাঁরা যাবেন ওখান থেকে চিত্রকূট পাহাড় দেখতে। সেখানে আছে মন্দির আর রামচন্দ্র, সীতা সম্বন্ধে কিম্বদন্তী। কাটনীতে অনেক খনিজ সম্পদ্ ও ফ্যাক্টরী আছে। সত্‌নার জঙ্গলে শিকার করার জন্য এলাহাবাদের একদলও বন্দুক সমেত হৈহৈ করতে করতে নেমে গেল। মধ্যপ্রদেশে প্রচুর বন আছে, কাজেই শিকারীরদেরও ওখানে মহাস্ফূর্ত্তি। তার পরেই আমার গন্তব্যস্থান জব্বলপুর।

জব্বলপুরে বাহন প্রধানতঃ সাইকেল-রিক্স। বাদশাহী টঙ্গা সাইক্-স'র আক্রমণে প্রায় সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছে। অবশ্য ট্যাক্সি আছে কিন্তু তা কমই ব্যবহৃত হয়। সহর পরিক্রমায় বাস্ সার্ভিসও কাজে লাগে।

ওখানে গিয়ে প্যাগোডা হোটেলে মালপত্র রেখে বেরিয়ে পড়লাম। ওখানকার "বালীগঞ্জ" "নেপিয়ার টাউন" থেকে চল্‌লাম বাজারের দিকে। পথে চোখে পড়ল, প্রথম নম্বর—একই সাইকেল-আরোহী পূরো একটি পাঞ্জাবী পরিবার। সাইকেলের সিটে কর্ত্তা, ক্যারিয়ারে গিন্নী, সামনে রডের উপর ছেলে। যানবাহনের সমস্যা একেবারে ইংরেজী ভাষায় "সলভ্‌ড্"। প্রচুর পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী এখানে। তারপর দেখা গেল অনেকগুলো ক্লাব। যেমন সাউথ ইণ্ডিয়ান ক্লাব, গুজরাতী ক্লাব এবং পরিশেষে বেঙ্গলী ক্লাব। প্রদেশ হিসেবে ক্লাবের বিভাগটা চোখে কটু ঠেকে কিন্তু শুনলাম সর্ব্বপ্রাদেশিক কসমোপলিটন ক্লাবও আছে, আর ভাবের কোন অভাব নেই বিভিন্ন প্রাদেশিকদের মধ্যে।

পূজো সুরু হয়েছে। বেঙ্গলী ক্লাবে অজস্র বঙ্গসন্তান ও বঙ্গললনা। মনে হ'ল যেন বাগবাজারে বসেই পূজো দেখ্‌ছি। খালি ছোট ছোট ছেলেদের তুবড়ীর মত হিন্দি কানে গেল কিন্তু তার সবটুকু মস্তিষ্কে ঠিক গ্রহণ করতে সক্ষম হলাম না। কাছে আরও একটি পূজামণ্ডপ। শুনলাম সব সমেত এখানে ৬টি বাঙ্গালী পূজো হচ্ছে, অবশ্যি মাইল তিনেক দূরের ঘামাপুর এবং আরও দূরে খামারিয়া নিয়ে।

শুধু পূজোই নয়—প্রায় সব পূজোর সঙ্গেই ঐ উপলক্ষ্যে আনন্দ বিতরণের জন্য থিয়েটারেরও ব্যবস্থা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে পাঁচদিন। তিনটি দল, এক এক রাতে এক এক জায়গায় অভিনয় করছে, অনেকটা লীগ্ খেলার মত। থিয়েটারের ষ্ট্যাণ্ডার্ড কিন্তু ভালই মনে হ'ল। তবে আরম্ভ করতে রোজই দেড় থেকে দু' ঘণ্টা দেরী হ'ত এই যা। একদিন দেখলাম "সাজাহান"। মনে হ'ল সাজপোষাকটা আমাদের বাংলা দেশের মত আধা বঙ্গ আধা মোগল নয়—পাকাপোক্ত পশ্চিমী পোষাক। এ ছাড়া ছোট মেয়েদের 'দুর্গাদাস' অভিনয়ও বেশ উপভোগ্য মনে হ'ল।

এর ওপর লক্ষ্মীপুজোর রাতে 'ভ্যারাইটি' অর্থাৎ গান ও নাচ। বেশ ভাল ও ভদ্র। ধার-করা লোক দিয়ে নয়। তবে একজন ভদ্রলোক স্বরচিত "ও মা গঙ্গে এলি, নৌকায় গেলি" গান ক্রমাগত হেঁড়ে গলায় গেয়ে গেয়ে দর্শকদের ঘন ঘন হাততালিতেও ক্ষান্ত হ'তে চাইছিলেন না। জানি না তাঁর বয়স ৪৯ কিনা। বিজয়া সম্মিলনীতে সবাইকারই নিমন্ত্রণ। এ ছাড়া নূতন গিয়েও অনেক বাড়ীতেই মিষ্টিসমেত মধুর আপ্যায়ন। "বিদেশে ভ্রাম্যমান পূজ্যতে।"

এখানকার প্রতিমা নিরঞ্জন ব্যাপারটাও বেশ আনন্দদায়ক এবং মনে রাখবার মত। মিলিটারী কন্‌ভয়ের মত ৬টি প্রতিষ্ঠানের বোধ হয় গোটা আঠারো লরী— তা ছাড়া প্রাইভেট মোটরকারে উৎসাহী বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয় ও মহিলারা। দু'দিকে ছোট ছোট পাহাড়, ঝোপঝাড় ও মাঠ। তারই মধ্যে দিয়ে কন্‌ভয় চলেছে কলতানে চারিদিক্ উচ্চকিত করে। পথে সাগ্রহে দাঁড়িয়ে মহারাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদে গ্রাম্য লোকেরা। দুর্গাপূজা ঠিক ঐ প্রদেশীয় ব্যাপার না হ'লেও তাদের আনন্দ ও কৌতূহল প্রচুর দেখা গেল। মাঝে মাঝে দু'-একটি লরীতে অবাঙ্গালী দল "জয় কালী, জয় কালী" করতে করতে কালীমূর্ত্তি নিয়ে গেল। এইভাবে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করে নর্ম্মদার গোয়াড়ী ঘাটে পৌছান গেল। ঘাটটির পুণ্যস্থান হিসাবে খাতির আছে। কাশীর মত এখানেও বর্স্বার ব্যবস্থা রয়েছে তিলক কাটা বা কাপড়চোপড় রাখার জন্য। দৃশ্য অতি সুন্দর, কারণ নদীর দু'দিকে ভূমি উঁচু এবং পাহাড়ের পাশ দিয়ে নদী বেরিয়ে যাওয়ায় দৃশ্য আরও মনোরম মনে হয়। নদী খুব চওড়া না হলেও স্রোত প্রবল। চন্দ্রালোকেই বিসর্জ্জন হ'ল। অপ্রাকৃতিক আলোর সাহায্য না নেওয়াতে আধো-আলো আধো-ছায়া বেশ কবিত্ব-পূর্ণই মনে হয়।

ইতিমধ্যে কলকাতার একটি চতুষ্পদী (চারজন) দল এসে যোগদান করলেন। কাজেই, তাঁদেরই পাল্লায় পড়ে, তাড়াতাড়ি রওনা হলাম এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য শ্বেতপাথরের পাহাড় দেখ্‌তে। এই বিশ্ববিখ্যাত "মর্ম্মর-স্বপ্ন" দেখতে যত যায় দেশী লোক তার বোধ হয় ঢের বেশী যায় বিদেশী ট্যুরিষ্ট। ট্রেনে না গিয়ে আমরা বাসেই রওনা হলাম। একদিন আগে সিট্ রিজার্ভ করা সত্ত্বেও প্রাইভেট বাস্ কোম্পানী কিছু অসুবিধার সৃষ্টি করছিল গোড়ায় সিট্ না দিয়ে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমাদের কথার চাপে দিতে বাধ্য হ'ল। আমাদের যেতে হবে ভেড়া ঘাটে কিন্তু বাস্‌টি ছিল "পাঠান"-গামী। ভেড়া ঘাট থেকে কিছু দূরে আমাদের ছেড়ে দিল। সেখান থেকে দু' মাইল পদব্রজে গিয়ে আমরা বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ দেখতে

পেলাম একটি ব্রিজ, নর্ম্মদা নদী ও পাহাড়ের উপর বিশ্রামগৃহ। পথে বহু আতা ও আমলকীর গাছ; আমাদের একটি সহযাত্রী তা দেখে খুব উতলা হয়ে পড়লেন।

ওখানে দু'টি বিশ্রামগৃহ, একটি লোয়ার ও একটি আপার। ভীড় না থাকায় (পুজোয় বেশী ছুটি পশ্চিমে থাকে না, ওখানে দেওয়ালী হ'ল বড় উৎসব ও বড় ছুটী) আমরা আট জন ওপরের বাংলো দখল করলাম। অদূরে নর্ম্মদা প্রপাত কলকল স্বরে আহ্বান জানাচ্ছিল, কিন্তু সে কথা আগামী বারে বলব।

কানপুরে চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ

শ্রীঅমল কুমার মিত্র

রৌদ্র-উদ্ভাসিত শিশিরসিক্ত কানপুরের গ্রীন্ পার্ক মাঠে ১২ই জানুয়ারী সুরু হ'ল ইংল্যাণ্ড বনাম ভারতের চতুর্থ সরকারী টেষ্ট ম্যাচ। ভারতীয় একাদশে স্থান পেলেন—বিজয় হাজারে (অধিনায়ক), যোশী (উইকেট রক্ষক), পঙ্কজ রায়, ভিনু মানকড়, পলি উমরিগর, দাতু ফাদকার, হেমু আধিকারী, সি. এস. নাইডু, মঞ্জরেকার, এস. জি. সিন্ধে ও গোলাম আমেদ। দল বাছাই নিয়ে সমালোচনা করলেন অনেকেই। ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করলেন—নাইজেল হাওয়ার্ড (অধিনায়ক), স্পুনার (উইকেট রক্ষক), ট্যাটারসাল, হিল্টন, ষ্ট্যাথাম, লোসন, রবার্টসন, ওয়াটকিন্স, গ্রেভনী, রিজওয়ে ও পুল। হাজারে টসে জয়লাভ করে পঙ্কজ রায় ও ভিনু মানকড়কে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠালেন।

ভারতের সূচনা বেশ ভালই হ'ল। রান্-সংখ্যা ধীরে ধীরে উঠতে আরম্ভ করল। ৩৯ রান্ পর্য্যন্ত কোন দুর্ঘটনা ঘটল না; কিন্তু তারপরই সুরু হ'ল দারুণ বিপর্য্যয়। ভারতের সেরা সেরা ব্যাট্‌সম্যানেরা ট্যাটারসলের বুলেটের মত বলে একে একে অবনত মস্তকে প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে লাগলেন। ৩৯ রানেই মানকড়, উমরিগর ও হাজারে আউট হয়ে গেলেন।

ফাদকারও অল্প পরে ট্যাটারসলের বলে আউট হলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের আগে ট্যাটারসল ভারতের চারটী উইকেট মাত্র ১০ রানে দখল করলেন।

এদিকে ভারতের নাম-করা খেলোয়াড়েরা যখন একে একে আউট হতে লাগলেন, তরুণ খেলোয়াড় পঙ্কজ রায় তখন অবিচলিত ভাবে সুদৃঢ় দুর্গের মতন তাঁর দিকটা সামলাতে লাগলেন। মধ্যাহ্ন ভোজের অল্প পরেই মঞ্জরেকার ও অধিকারী আউট হয়ে গেলেন। সি, এস, নাইডু মাঠে নেমেই ঝড় বইয়ে দিলেন। তিনি মাত্র ২২ মিনিটে ২১ রান্ করে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন। তারপর যোশী ও গোলাম আমেদ বেশীক্ষণ টিকতে পারলেন না। পঙ্কজ রায় ১৬২ মিনিটে সবচেয়ে বেশী ৩৭ রান্ করে আউট হয়ে যাবার পর ভারতের প্রথম ইনিংস মাত্র ১২১ রানে শেষ হয়ে গেল। ট্যাটারসল ৪৮ রানে ৬টি ও হিল্টন ৩২ রানে ৪টি উইকেট দখল করে এই বিপর্য্যয় সম্ভব করলেন।

বেলা ২টা ৩৫ মিনিটের সময় ইংল্যাণ্ড ব্যাটিং শুরু করল। দিনের শেষে ৩ উইকেটে তাদের ৬৩ রান্ উঠল।

দ্বিতীয় দিনে ১৩৭ মিনিটে তাদের ১০০ রান্ পূর্ণ হ'ল। ওয়াটকিন্স কোন রকম আউট হবার সুযোগ না দিয়ে মাঠের চারিদিকে মারতে আরম্ভ করলেন। ১৫১ মিনিটে তিনি দলের সব চেয়ে বেশী ৬৬ রান্ তুললেন। ইংল্যাণ্ডের শেষ চারটি উইকেট মাত্র ২৯ রানে পড়ে গেল। গোলাম আমেদ ৭০ রানে ৫টি ও মানকড় ৫৪ রানে ৪টি উইকেট দখল করলেন। ইংল্যাণ্ড ১ম ইনিংসে ২০৩ রান করে ভারতের থেকে ৮২ রানে এগিয়ে রইল।

দ্বিতীয় দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের পরেই ভারতের ২য় ইনিংস অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ভাবে শুরু হ'ল। ৭ রানের মাথায় মানকড় এবং ৩৭ রানের সময় মঞ্জরেকার ও হাজারে পর পর আউট হয়ে গেলেন। ভারতের অধিনায়ক প্রথম বারের মত এবারেও কোন রান্ করতে পারলেন না। চা পানের পরেই রায় ও ফাদকার আউট হয়ে গেলেন। তারপর অধিকারী ও উমরিগর বেপরোয়া ব্যাট চালনা আরম্ভ করলেন। উমরিগড় হিল্টনের বলে পর পর বাউণ্ডারী ও ওভার বাউণ্ডারী মাড়লেন। দর্শকগণও বিশেষ উৎসাহিত হলেন। কিন্তু ১০২ রানের মাথায় উমরিগড় ৩৬ রান্ করে আউট হলেন। তারপর সি. এস.। দিনের শেষে দেখা গেল ভারতবর্ষ ৭ উইকেটে মাত্র ১২৫ রান্ তুলেছে। তৃতীয় দিনে হেমু অধিকারী একলাই সকল দিক্ সামলাতে লাগলেন; কিন্তু ৬০ রান্ করে তিনিও যখন আউট হয়ে গেলেন তখন দেখা গেল ভারতের মাত্র ১৫৭ রান্ উঠেছে এবং তারা ইংল্যাণ্ডের থেকে মাত্র ৭৫ রানে এগিয়ে আছে।

জয়লাভের জন্য মাত্র ৭৬ রান্ প্রয়োজন, খেলা শেষ হতে আড়াই দিন বাকী, এ অবস্থায় ইংল্যাণ্ড তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করল। মাত্র ১ রানের মাথায় স্পুনার আউট হয়ে গেলেন। দর্শকদের মুখে হাসি ফুটল। কিন্তু তাদের দিবাস্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল যখন দেখা গেল মাত্র ৫৫ মিনিটে ইংল্যাণ্ড ২ উইকেটে বিপক্ষ দলের রান্-সংখ্যা অতিক্রম করে গিয়েছে। ইংল্যাণ্ড ৫ দিনের খেলা মাত্র আড়াই দিনে শেষ করে ভারতকে টেষ্ট পর্য্যায়ে সর্ব্বপ্রথম পরাজিত করল, ৮ উইকেটে।

পাতালপুরীর দানব

(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

শ্রীগৌরী দেবী

মহারাজ বিদূরথ বেরিয়েছিলেন মৃগয়ায়। চলতে চলতে বনের মধ্যে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল একটা বিরাট গর্ত্ত। এত বড় গর্ত্ত পৃথিবীতে সাধারণতঃ দেখা যায় না। রাজা মনে মনে ভাবলেন কোন মানুষের বা জীবজন্তুর পক্ষে এত বড় গর্ত্ত তৈরী করা সম্ভব নয়, এ গর্ত্তের রহস্য বার করতেই হবে।

রাজা এদিক্ ওদিক্ সন্ধান করছেন, এমন সময় এক মুনি এসে হাজির। মুনিকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বল্লেন, "এ হচ্ছে পাতালে যাবার রাস্তা। কুজৃম্ভ নামে এক দানব এই গর্ত্ত তৈরী করেছে। এই দানব বড় সহজ দানব নয়। বিশ্বকর্ম্মার তৈরী শুনন্দ মুষল চুরি করে এনে এ মহা বলবান্ হয়ে পড়েছে। মুষলের বলে তার অসাধ্য প্রায় কিছুই নেই। মুনিঋষিরা তার অত্যাচারে সর্ব্বদা তটস্থ। দেবতারা পর্য্যন্ত একে সমীহ করে চলেন। মুষলের জোরে সে পৃথিবী বিদীর্ণ করে এই পথ তৈরী করেছে। এরই সাহায্যে সে সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে পাতালে গিয়ে লুকিয়ে থাকে।"

বিদূরথ শুনে বললেন, "এ দানবকে হারাতে হ'লে তা হ'লে তার মুষলটি ধ্বংস করা দরকার। আচ্ছা, মুষলটিকে অকর্ম্মণ্য করা যায় না কোন রকমে?"

মুনি বল্লেন, "বিশ্বকর্ম্মা যখন মুষলটি তৈরী করেন তখন এর প্রতাপের কথা ভেবে তিনি বোধ হয় বুঝেছিলেন, এ জিনিষ হাত-ছাড়া হয়ে দুষ্ট লোকের হাতে পড়লে অনেক অঘটন ঘটতে পারে। তাই ভেবেই তিনি এমন নিয়ম করেছিলেন যাতে এ মুষল মেয়েদের ছোঁয়া বারণ।—মেয়েরা ছুঁলেই সেদিনকার মত এর ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।" এই বলে মুনি চলে গেলেন।

মৃগয়া থেকে ফিরে এসে বিদূরথ তাঁর মন্ত্রীদের কাছে মুষল আর দানবের গল্প বললেন। রাজকন্যা মুদাবতী সেই সময়ে কাছেই ছিলেন, অলক্ষ্যে থেকে কথাটা তিনিও শুনলেন।

এর কয়েক দিন পরেই এক কাণ্ড ঘটল। রাজকন্যা সখীদের সঙ্গে উপবনে বেড়াতে গেছেন, হঠাৎ কোথা থেকে সেই দানব কুজৃম্ভ এসে তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল, তার পর সেই গর্ত্তের ভিতর দিয়ে পাতালে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখল।

যথা সময়ে রাজা বিদূরথের কানে সংবাদ গেল। তিনি তখনই তাঁর দুই

ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন দুষ্ট দানবের কাছ থেকে বোনকে উদ্ধার করে আনবার জন্য। কিন্তু মুষলের সামনে এগোয় কার সাধ্য? দানব রাজপুত্র দু'জনকেও বন্দী করে রাখল।

বিদূরথ রাগে, দুঃখে ঘোষণা করলেন, যে দানবকে হারিয়ে তাঁর মেয়ে আর ছেলেদের উদ্ধার করতে পারবে তাকে যথোচিত পুরস্কার তো দেবেনই, তাঁর মেয়ে মৃদাবতীকেও দান করবেন সেই বীরের হাতে। কিন্তু মুষলের ভয়ে কেউই এগিয়ে আসতে সাহস পেল না।

অবশেষে একদিন একটি যুবক এসে রাজাকে নমস্কার করে বল্লেন, "মহারাজ, আমি একবার চেষ্টা করে দেখব।"

যুবকের সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা দেখে বিদূরথ খুসি হয়েছিলেন, ব্যবহারে আরও মুগ্ধ হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?"

যুবক বলল, "আমি ভনন্দন রাজার পুত্র বৎসপ্রী।"

বিদূরথ আরও খুসি হয়ে বললেন, "ভনন্দন আমার বিশেষ বন্ধু। আশীর্ব্বাদ করি তুমি জয়-যুক্ত হও।"

কুমার বৎসপ্রী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সেই গর্ত্ত দিয়ে পাতালপুরীতে নেমে দানবের আড্ডায় গিয়ে হানা দিলেন। তাঁর ধনুকের টঙ্কারে পাতালপুরী কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দানব হুঙ্কার দিয়ে তেড়ে এল।

তারপর সুরু হ'ল যুদ্ধ। সে কি সহজ যুদ্ধ? দু'জনেই মহা পরাক্রমশালী; তিন দিন তিন রাত ধরে সমানে যুদ্ধ চলতে লাগল।

অবশেষে দানব আর থাকতে না পেরে মুষল আনবার জন্য তার অনুচরকে পাঠাল। পারতপক্ষে এ মুষল সে ব্যবহার করত না।

বিশ্বকর্ম্মার তৈরী মুষল, অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে তা নাড়াচাড়া করতে হয়। ব্যবহারের আগে তাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করে তবেই ব্যবহার করার নিয়ম। মুষলের ডাক পড়তেই অন্তঃপুরে তার অর্চ্চনা সুরু হ'ল রাজকন্যা মুদাবতীও এই চাইছিলেন। তিনি পূজোর সময় সেখানে গিয়ে হাজির হলেন, তারপর অত্যন্ত ভক্তির ভাব দেখিয়ে মুষলটিকে স্পর্শ করে প্রণাম করলেন। স্ত্রীলোকের স্পর্শে সেদিনকার মত মুষলের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু কেউ তা টের পেল না।

মুষল হাতে পেয়েই দানব বিপুল বিক্রমে তা নিয়ে বৎসপ্রীকে আক্রমণ করল। বৎসপ্রী সে মুষল অবলীলাক্রমে ঠেকিয়ে দিলেন।

কুজৃম্ভ একেবারে দমে গেল। বিশ্বকর্ম্মার এ মুষল কখনও ব্যর্থ হতে

পারে এ তার ধারণারও অতীত। সে তো আর জানত না বিশ্বকর্ম্মা কি নিয়ম করে দিয়েছেন, আর মুদাবতীও যে তা কাজে লাগিয়ে ওর ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছেন!

এর পর দানবকে কাবু করা আর বেশী কঠিন হ'ল না। দুষ্ট দানব ভয় পেয়ে ক্রমাগতই পিছু হঠতে লাগল। তারপর একটু পরেই বৎসপ্রী যখন ধনুকে অগ্নি-বাণ যুড়লেন তখন সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। কিন্তু রেহাই পেল না সে। ঝলকে ঝলকে আগুন ছড়িয়ে মুহূর্ত্তমধ্যে সেই বাণ গিয়ে তার শরীর বিদীর্ণ করে দিল।

তারপর? তারপর আর কি, বৎসপ্রী রাজপুত্রদের বন্ধন মুক্ত করে দিলেন। দুষ্ট দানব আরও যে সব লোককে—মুনিঋষিদের আটকে রেখেছিল তারাও মুক্তি পেল। রাজকন্যাকে নিয়ে সকলে মিলে বিদূরথের রাজ্যে ফিরে এলেন।

মহা ধুমধামে মুদাবতীর সঙ্গে বৎসপ্রীর বিয়ে হয়ে গেল। পরম গুণবতী ও সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে মনের আনন্দে বৎসপ্রী নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

—গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা—

ভগ্ন দেউল

শ্রীসীতা দাশগুপ্তা

ছায়াচ্ছন্ন ভগ্ন দেউল বৃক্ষলতায় ঘেরা,
ঝিল্লীমুখর শাখে শাখে ডাকে বিহঙ্গেরা;
চতুর্দ্দিকে বিরাজ করে শান্তি সুগম্ভীর,
নিম্নে বহে মধুমতীর অতল কালো নীর।
নাই দেবতা—নগরবাসী ভুলেও কেহ যায় না তাহার দ্বারে,
আপনা হতে ফুলের কোরক ঝরে পড়ে ভাঙ্গা বেদীর ধারে।
সেথায় বসে চোখেতে মোর ঘনিয়ে আসে কিসের স্বপ্নজাল,
বলি, তোমায় প্রণাম করি কালবিজয়ী হে মোর মহাকাল!
ধ্বংস তোমার মূর্ত্তি ধাতা, মূর্ত্ত তবু তুমি হেথা,—
শান্তি রূপে নিত্য আছ এ মন্দিরটি ঘিরে!
বিগ্রহহীন ভাঙ্গা দেউল মধুমতীর তীরে।

এগিয়ে চল্

শ্রীনির্ম্মলেন্দু সরকার

এগিয়ে চল্, এগিয়ে চল্,
এগিয়ে চল্ ভাই,
মোহের টানে পিছন ফিরে
তাকাস্ নে রে ভাই।
অন্ধকারের পর্দাটাকে
কেটে দু'ভাগ কর,
সবল হাতে বিজয়-ঝাণ্ডা
উঁচিয়ে তুলে ধর।
সমুখ পানে ছুটতে হবে—
আয় রে ছুটে আয়,
ভারত মাতা বহু আশায়
মোদের পানে চায়।
ওই শোন্ রে তূর্য্য নিনাদ
বাজে বিজয়-ভেরী,
সাড়া দে রে এ আহ্বানে,
চলবে নাকো দেরী।
প্রাণটা গেলে ভাবিস্ নেকো
বৃথাই অপচয়,
দেশের তরেই আত্মাহুতি
কিসের তবে ভয়?

বিজ্ঞানের গোয়েন্দাগিরি

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

চোর, জোচ্চোর, খুনী এবং আরও নানা ধরণের অপরাধীদের ধরবার জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য নেবার গল্প তোমরা এর আগে রামধনুতে পড়েছ। আমেরিকা যেমন বিজ্ঞানীর দেশ, তেমনি মারাত্মক অপরাধীদেরও দেশ। সেখানকার অনেক চোর-ডাকাতও রীতিমত শিক্ষিত, এবং, নানারকমবৈজ্ঞানিক কলাকৌশলেও অভ্যস্ত। তাই তাদের সঙ্গে আঁটতে হ'লে গোয়েন্দাদেরও উন্নততর বৈজ্ঞানিক কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। গোয়েন্দাগিরির কাজে বিজ্ঞানকে লাগাবার জন্য সেখানে নিয়মিত গবেষণা চলছে আর নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করা হচ্ছে। শুধু আমেরিকা কেন, পৃথিবীর অন্যান্য প্রগতিশীল দেশগুলোতেও এ নিয়ে রীতিমত চর্চ্চা চলছে। আমাদের দেশেও কিছু কিছু হচ্ছে।

ক্যামেরা আর অণুবীক্ষণ যন্ত্র—এই দু'টি হচ্ছে গোয়েন্দাগিরির কাজে বিজ্ঞানীর প্রধান সহায়। এর সঙ্গে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি, ইনফ্রা-রেড রশ্মি, এক্স-রে প্রভৃতি আরও নানা রকম ব্যাপারের সাহয্য নেওয়া হচ্ছে। যেমন ধর, জাল দলিল বা জাল কাগজপত্র ধরবার পক্ষে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে নিয়ে খুবই ফল পাওয়া গেছে। খালি চোখে যে জিনিষ অনুমান করাও অসম্ভব, এই আলোয় তোলা ফটোটাতে তা পরিষ্কার ধরা পড়ে যাচ্ছে। নীচে দেখ একটা জাল দলিলের ছবি। কাগজের আসল তারিখটি তুলে ফেলে তার ওপর আর একটা তারিখ বেমালুম বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, খালি চোখে ধরবার কোন উপায়ই ছিল না। কিন্তু আলট্রা-ভায়োলেট আলোর সাহায্যে ফটো তুলতেই পেছন দিকে অদৃশ্য তারিখ পরিষ্কার ফুটে বেরিয়েছে।

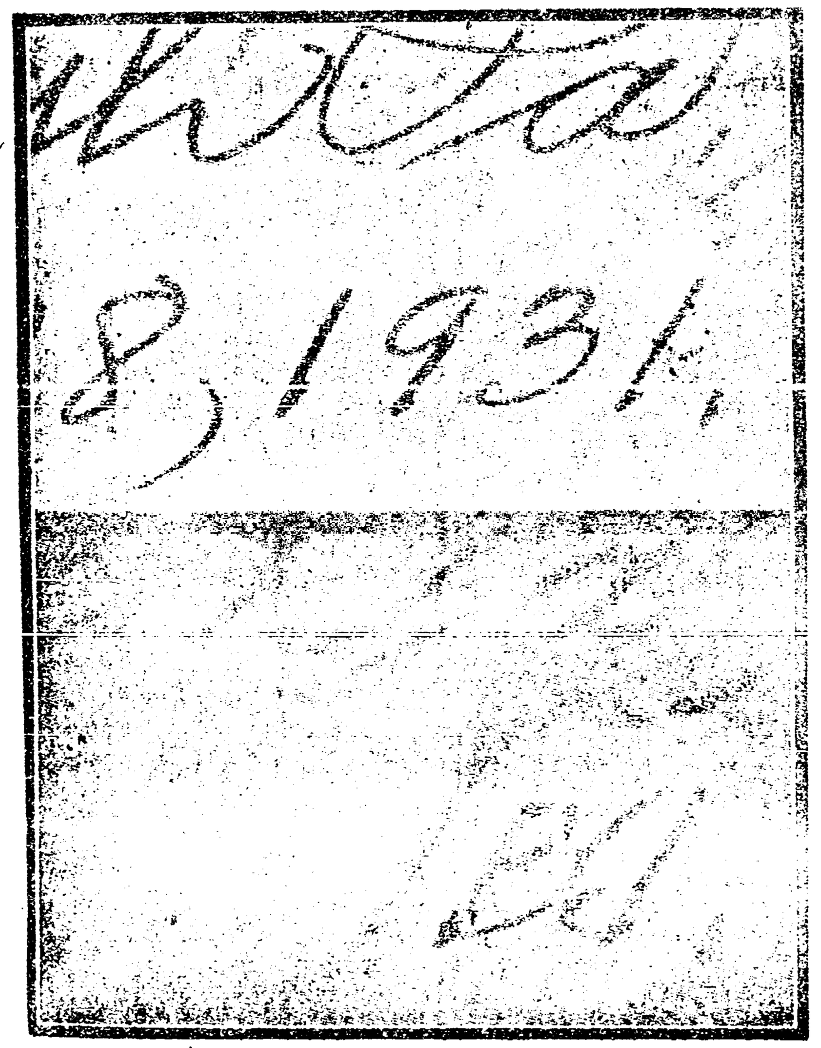

আলট্রা-ভায়োলেট আলোর সাহায্যে জাল দলিল আবিষ্কার

ছোটখাট ব্যাপারে এই বিজ্ঞান-গোয়েন্দাকে কি ভাবে কাজে লাগিয়ে ফল পাওয়া গেছে তার দু'-একটা গল্প তোমাদের বলব। এর সবগুলি গল্পই সত্যি, বিভিন্ন দেশের পুলিশ বিভাগের কর্ত্তারাই এ গল্প শুনিয়েছেন।

একবার একটি মোটর সাইকেলের (সাইড কারসমেত) সঙ্গে একটি মোটর কারের ভীষণ রকম সংঘর্ষ হ'ল। মোটর সাইকেলের আরোহী গুরুতর ভাবে জখম হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় রাস্তায় পড়ে, মোটর-চালক কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বিদ্যুতগতিতে মোটর হাঁকিয়ে পালিয়ে গেল।

তখন খোঁজ খোঁজ খোঁজ। কোথায় কোন্ গ্যারেজে ভাঙ্গা মোটরকার রয়েছে তারই খোঁজে ছুটল পুলিশের দল। অবশেষে একটা জখম-হওয়া মোটরের সন্ধান পাওয়া গেল কিন্তু মোটরের মালিক ঐ সংঘর্ষের কথা কোন মতেই স্বীকার করতে রাজী হ'ল না। এমন সব অকাট্য প্রমাণ দেখাতে লাগল যাতে

তাকে কোন মতেই সন্দেহ করা চলে না। তখন এলেন গোয়েন্দার দল। দু'টি ভাঙ্গা গাড়ীকে পাশাপাশি রেখে তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন ঠিক ঐ দু'টির মধ্যেই যে সংঘর্ষ হয়েছে তার কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু নাঃ, কোন প্রমাণই নেই। শুধু দেখা গেল, মোটর কারের কাচের সার্সির গায়ে এমন একটা লম্বা আঁচড়ের দাগ রয়েছে যা নাকি মোটর সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের ওপর বসানো একটী নাট্-এর ঘষায় হওয়া বিচিত্র নয়। গোয়েন্দারা তখনই সার্সিটা খুলে নিলেন—তারপর সেটা পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল ল্যাবরেটরীতে। বিজ্ঞানীরা প্রথমে সেটাকে নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে পরীক্ষা করলেন। দেখা গেল সার্সির গায়ে খুব সূক্ষ্ম কি সব গুঁড়ো লেগে আছে।

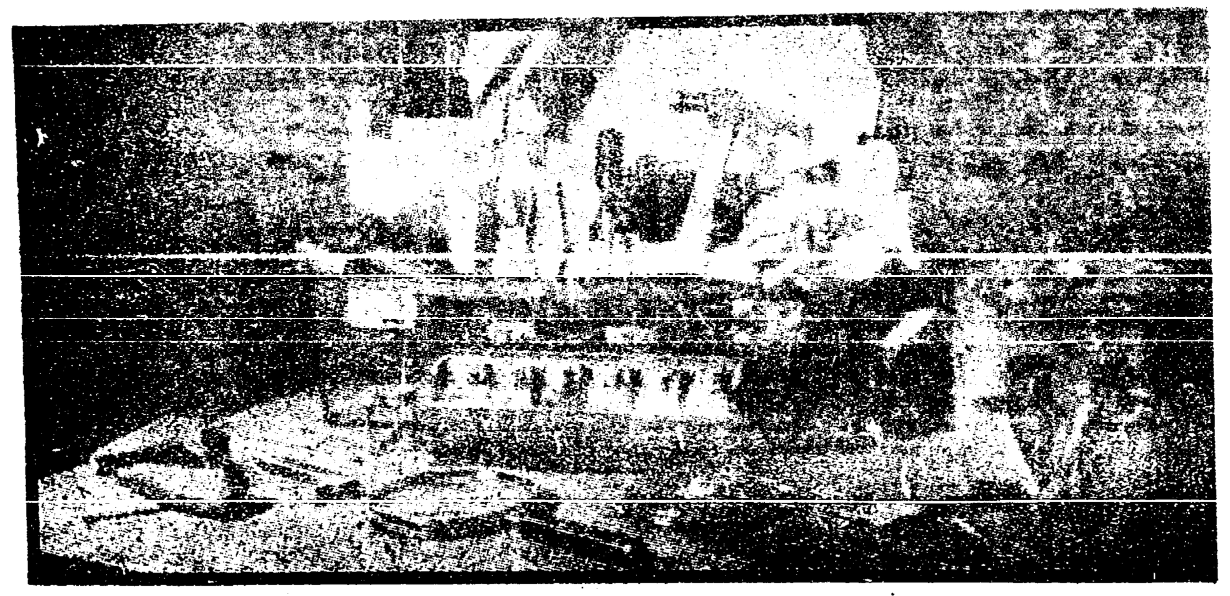

বিজ্ঞানী গোয়েন্দার সর্ব্বসময়ে ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতির বাক্স

সেই গুঁড়ো সাবধানে তুলে নিয়ে আবার পরীক্ষা করা হ'ল। তোমরা হয়তো জান, বিজ্ঞানীদের কাছে এমন সব যন্ত্র আছে যার সাহায্যে যে কোনও জিনিষের ভিতর কোন্ ধাতু বা অন্য কোন্ মৌলিক পদার্থ আছে তা বলে দেওয়া যায়। এই প্রণালীকে বলে স্পেক্‌ট্রোগ্রাফী। এই ভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেল ঐ গুঁড়োগুলো হচ্ছে নিকেল আর ক্রোমিয়ামের অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ো।

এর পর মোটর সাইকেলের হ্যাণ্ডেল থেকে সেই নাট্‌টি খুলে নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা করা হ'ল। দেখা গেল সেটির মাথাও ক্রোমিয়াম আর নিকেল দিয়েই তৈরী। শুধু তাই নয়, অণুবীক্ষণেই আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেল। সার্সির গায়ে যে আঁচড় রয়েছে তার মধ্যে কতকগুলি সমান্তরাল খাঁজ কাটা, আর হ্যাণ্ডেলের নাট্-এর গায়েও অবিকল সেই রকম কতকগুলি খাঁজ। অতি সূক্ষ্ম স্কেলে মেপে দেখা গেল দু'টির খাঁজই হুবহু সমান দূরে দূরে পড়েছে, অর্থাৎ একটার চাপে যে

আর একটার সৃষ্টি তাতে আর সন্দেহ থাকে না। এ গোয়েন্দা বিজ্ঞান, কাজেই এর হিসাবে ভুলচুক নেই। বলা বাহুল্য, এর পর অপরাধী দোষ স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল।

আর একটি ঘটনা শোন। এটি দুর্ঘটনা নয়—একেবারে খুনের ব্যাপার। যাকে খুন করা হয়েছিল সে একটি স্ত্রীলোক। পুলিশ অবশ্যি খোঁজ-খবর নিয়ে আসল অপরাধীকেই সন্দেহ করে কিন্তু সে নানা প্রমাণ দিয়ে ব্যাপারটাকে এমন ভাবে সাজায় যাতে মনে হয় স্ত্রীলোকটি হঠাৎ পা ফস্‌কে জলে পড়ে গিয়েছিল এবং জলে ডুবেই তার মৃত্যু হয়েছে। দীর্ঘ সময় জলের তলায় ডুবে থাকলে শরীরে যে সব লক্ষণ দেখা যায় স্ত্রীলোটিরও অবিকল তাই হয়েছিল এবং ডাক্তারেরাও সেই রকম অভিমত দিয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশের সন্দেহ তাতে দূর না হওয়ায় শেষে ডাক পড়ে বৈজ্ঞানিক গোয়েন্দার।

যেখানে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল সেখানে ছিল একটি ছোট নালা বা নর্দ্দমা। জল সেখানে ৭।৮ ইঞ্চির বেশী হবে না। অথচ ঘটনাচক্র দেখে সন্দেহ হ'ল এই নালার জলেই স্ত্রীলোকটিকে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। এ একমাত্র সম্ভব হতে পারে যদি কেউ মেয়েটির মুখ জোর করে সেই নালার মধ্যে চেপে রাখে। বৈজ্ঞানিক এসে মৃত স্ত্রীলোকটির ফুসফুস নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষায় দেখা গেল ফুসফুসের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম কতকগুলি জলজ উদ্ভিদের কুচি আর 'ডায়াটম্' জড় হয়ে আছে। খুব গভীর ভাবে নিঃশ্বাস টানলে ফুস্‌ফুসের যে অংশে ওগুলি পৌছান সম্ভব ঠিক সেইখানেই ওগুলিকে পাওয়া যাচ্ছে। ডায়াটম্ হচ্ছে এক রকম অতিক্ষুদ্র বীজাণু—না-প্রাণী না-উদ্ভিদ্ এমন একটি নিম্নস্তরের জীব। সাধারণতঃ নালা-খানার মধ্যেই ওদের পাওয়া যায়।

এর পর সেই নালার জল নিয়ে পরীক্ষা করা হ'ল। দেখা গেল, তার মধ্যে ঠিক যে যে জাতের ডায়াটম্ আর যে যে ধরণের জলজ-উদ্ভিদ্ পাওয়া যাচ্ছে স্ত্রীলোকটির শরীরেও হুবহু সেই সেই জিনিষ পাওয়া গেছে। অর্থাৎ স্ত্রীলোকটি যে অন্য কোথাও নয়, ঐ নালার জলেই প্রাণ হারিয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। আর ৭।৮ ইঞ্চি গভীর জলে কেউ,—বিশেষতঃ কোন প্রাপ্তবয়স্ক লোক, কখনই ডুবে মরতে পারে না যদি না কেউ জোর করে তার মুখটা তার মধ্যে চেপে ধরে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে মারে। অর্থাৎ, স্ত্রীলোকটির মৃত্যু যে সাধারণ দুর্ঘটনা থেকে হয় নি, সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত—এ বিষয়ে বিজ্ঞান অকাট্য প্রমাণ দিচ্ছে।

এর পর খুনী তার অপরাধ স্বীকার না করে আর পারে?

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

মাস কাবারের আগে এবারে তোমাদের হাতে কাগজ পৌঁছে দিতেই হবে—যে ভাবে হোক, তাই চিঠিটা সংক্ষেপে শেষ করব ঠিক করেছি। সারা ভারত যুড়ে যে বিরাট নির্ব্বাচন যজ্ঞ সংঘটিত হ'ল তা আমার মত তোমরাও চাক্ষুষ দেখেছ। এর ফলাফল দেশের ওপর কতখানি প্রভাব ফেলবে বলা যায় না, তবে নির্ব্বাচন উপলক্ষ্য ক'রে কাগজের বাজারে যে দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিয়েছিল আশা করি এইবার সেটার অবসান হবে,—আবার তোমাদের সামনে রামধনুকে ভাল কাগজে সাজিয়ে বার করতে পারব।

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নাকড়াকোন্দা)—তোমার বিয়ের নিমন্ত্রণ চিঠি পেয়ে খুব খুসী হলাম। সম্ভব হলে নিশ্চয়ই যেতাম। তোমাদের নতুন জীবন সুখের হোক এই কামনা করি। শ্রীঅশোক সেন (জলপাইগুড়ি)—তোমার চিঠিখানা ভাল লাগল। ধাঁধা কিন্তু আমরা কঠিন দেওয়ারই পক্ষপাতী। ধাঁধা নিয়ে যদি খুব খানিকটা 'নাজেহাল' না হওয়া গেল তা হলে আর ওর মধ্যে মজা রইল কি? এই কারণেই রামধনুর ধাঁধার উত্তরদাতার সংখ্যা কোন কোন কাগজের তুলনায় খুব কম। কিন্তু শুধু নাম ছাপানোর মধ্যেই তো বাহাদুরী নয়! শ্রীশিপ্রা কুণ্ডু (ইটাচুনা)—তোমার চিঠিখানি পেয়ে আমরা খুবই লজ্জিত। তবে রামধনু নিশ্চয়ই তুমি ভাল করে পড় না, তা হলে এ চিঠি লিখতে না। শ্রীসুশীলকুমার বসু (তেজপুর মণিমেলা)—তুমি ঠিকই লিখেছ, কিন্তু ঘটনাচক্রে অনেক সময় অনিচ্ছায়ও অনেক ত্রুটী এসে পড়তে পারে—এ কথা নিশ্চয়ই জান। তোমার প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করছি। শ্রীঅসীমা পাল (করিমগঞ্জ)—তোমার 'ব্যক্তিগত' চিঠির জবাবে শুভ কামনা জানাই। সরস্বতী পুজোয় হৈ-হৈ কোথায় না হয়? তবে আসল পূজোর চাইতে আড়ম্বরটাই যেন বেশী। আজকাল আবার তার সঙ্গে জুটেছে লাউড স্পীকারে হিন্দী সিনেমার সঙ্গীত। শ্রীরত্না রায় (বাঁকীপুর)—তোমাদের মাঘোৎসবের বর্ণনা পড়ে—বিশেষতঃ 'প্লে'র কথা শুনে, না দেখতে পাওয়ায় ভয়ানক দুঃখ হচ্ছে মনে। আজ এই পর্য্যন্ত। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নেই। জয় হিন্দ।—ইতি রাঃ সঃ

আমাদের সংবাদপত্র বিভাগ

নির্ব্বাচন পর্ব্ব

মহা সমারোহে স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্ব্বাচন শেষ হয়ে এল। এত বড় নির্ব্বাচন যেমন পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন জিনিষ, তেমনি এত সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাচনও কম কৃতিত্বের কথা নয়। সামান্য ত্রুটী-বিচ্যুতির কথা যা শোনা গেছে নির্ব্বাচনের বিরাটত্বের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তা নগণ্যই বলা যেতে পারে।

ফলাফল এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বেরোয় নি, তবে যতটা বেরিয়েছে তাতে কংগ্রেস দলই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজয়ী হয়েছে। কেন্দ্রীয় পালিয়ামেণ্টে কংগ্রেস দল থেকে যাঁরা নির্ব্বাচিত হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা অন্যান্য সব দলের নির্ব্বাচিত সদস্যের চাইতে বেশী হওয়ায় আপাততঃ পাঁচ বছরের জন্য কংগ্রেস দলই মন্ত্রিত্ব গঠন করবেন; পশ্চিম বাংলায় এবং আরও কতকগুলি রাজ্যের নির্ব্বাচনের ফলও হয়েছে ঐ রকম। তবে মাদ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, উড়িষ্যা প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেস-সদস্যদের চাইতে অন্যান্য দলের সদস্যের সংখ্যা (একত্র মিলিয়ে) বেশী হয়েছে। কাজেই ঐ সব রাজ্যে কারা মন্ত্রিত্ব গঠন করতে পারবেন তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না।

এবারকার নির্ব্বাচনের বিশেষত্ব—অনেক খ্যাতনামা নেতার পরাজয়। যেমন ধর কৃষক মজদুর প্রজা দলের আচার্য্য কৃপালনী, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রী প্রকাশম্ প্রভৃতি। কংগ্রেস দলেরও অনেক বড় বড় নেতা নির্ব্বাচিত হতে পারেন নি—বিশেষতঃ যাঁরা এতদিন মন্ত্রিত্বের গদীতে বসে ছিলেন তাঁরা। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীদের মধ্যে সাতজনই পরাজিত হয়েছেন। বিরোধী দলের মধ্যে সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হয়েছেন কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যেরা।

পঞ্চম টেষ্ট

কানপুরে চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংল্যাণ্ড দলের কাছে ৮ উইকেটে পরাজিত হবার পর সম্প্রতি মাদ্রাজের চিপক মাঠে এই দুই দলের ৫ম বা শেষ টেষ্ট ম্যাচ হয়ে গেছে। এবার ভারতবর্ষ পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ ভাল ভাবেই নিয়েছে—ইংল্যাণ্ড দলকে ১ ইনিংস ও ৮ রানে হারিয়ে। অফিসিয়াল টেষ্ট ম্যাচে ভারতীয় দলের এটাই প্রথম জয়লাভ। ভারতীয় দল ১ম ইনিংসএ করে ৪৫৭, ৯ উইকেটে। (পঙ্কজ রায় ১১১, উমরিগর ১৩০ নট আউট)। ইংল্যাণ্ড দল করে ১ম ইনিংসএ ২৬৬, ২য় ইনিংসএ ১৮৩। বোলিংএ মানকড় ও গোলাম আমেদ অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ইংল্যাণ্ডের নতুন রাণী

অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে ইংল্যাণ্ডের রাজা ৬ষ্ঠ জর্জ্জের মৃত্যু হয়েছে। কিছুদিন আগে তাঁর ফুসফুসে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল এবং তার পর তিনি প্রায় সেরেও উঠেছিলেন। হঠাৎ এ ভাবে যে তিনি চলে যাবেন তা কেউ ভাবে নি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর; ১৫ বছর তিনি রাজত্ব করেছিলেন।

রাজার ছেলে না থাকায় বড় মেয়ে '২য় এলিজাবেথ' এই নাম নিয়ে, ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসলেন। তাঁর বয়স এখন ২৬ বছর।

অগ্রহায়ণ মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রতিযোগিতার চরিত্রগুলি কোন্‌টা কোন্‌ বইএ আছে—

হুব্বা—মুক্তধারা, রামচরণ—চন্দ্রশেখর, পেঁচো—ঠাকুমার ঝুলি, উকুনে বুড়ী—টুনটুনির বই, বাস্থ—সোনার হরিণ, নীলাহীরা—ধূমকেতু, পুতু—খাতাঞ্চীর খাতা, করালী—যকের ধন, কাসিম—আলিবাবা, মাচ্‌—রবিন হুড, গুটিয়া দেও—হিন্দুস্থানী উপকথা, ঘুরঘুরি—আরো গল্প, ফ্যাগিন—অলিভার টুইষ্ট, পিপ্পল—ঠাকুমার ঝুলি, বক্সটেল—দি ব্ল্যাক টিউলিপ, নীলকমল—স্বর্ণলতা, চ্যালেঞ্জার—অজ্ঞাত জগৎ (দি লষ্ট ওয়াল্‌ড), জাভার্ট—লে মিজারেবল্‌, নেল্‌—ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ, নিডিয়া—দি লাষ্ট ডেজ অব পম্পেই, মাগোয়া—দি লাষ্ট অফ্‌ দি মোহিকান্‌স, সোলোমন্‌—পদ্মরাগ, ম্যাজাক্স—ইলিয়াড, পরাণ—চারু ও হারু, ঐন্দ্রিলা—বৃত্রসংহার, অনাথ বাবু—ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন। এ ছাড়া অন্য কোন কোন বইএও এর কোন কোন চরিত্র আছে। সেগুলির নাম যাঁরা পাঠিয়েছেন তাঁদেরটাও শুদ্ধ বলে ধরা হয়েছে।

সবচেয়ে শুদ্ধ উত্তর পাঠাবার জন্য পুরস্কার পেলেন—**শ্রীসুমিত্রা চক্রবর্ত্তী** (কলিকাতা-২৬)

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

চিঠিখানা এই রকম হবে :—

স্নেহের ব্যোমকেশ,

তোমার পত্র পাইয়া ভারী অবাক হইলাম। গোপাল পরীক্ষায় পাশ না করিতে পারায় সেজমামা মনে আঘাত পাইবেন। এরূপ হইবার কারণ কি? ও বংশের ছেলেপেলেরা সকলেই শুনিয়াছি মনোযোগী। মাসীমাকে ভাবনা করিতে বারণ করিও। কুশল সহ উত্তর দিও। —ইতি

রাঙ্গাকাকা।

উত্তরদাতাদের নাম :— বিভাসবিহারী বসু (পাটনা); অশোক সেন (জলপাইগুড়ি); সুনীলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌ); ঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান); রমা রায় (দিল্লী); আংশিক :—নিবেদিতা সেন (কলিকাতা-২৯); হেমজ্যোতিঃ (কলিকাতা-৩২); প্রতিমা, ভুলোদা, হাবুদা, সিতু, মামাবাবু, মামীমা, ছোটকু (পাটনা); রত্না, জয়ন্ত, স্বপ্না ও ছন্দা রায় (বাঁকীপুর); নির্ম্মলকুমার দত্ত (এলাহাবাদ); সুকুমারী বসু (কটক)।

নূতন ধাঁধা

"দাদু, তোমার বয়স কত?"

"তা অনেক, তোর বাবারই তো নাতি হয়ে গেছে!"

"তবু বল না?"

"আচ্ছা। তোর বাবার বয়সকে তোর বাবার বয়স দিয়ে গুণ কর। তারপর তোর কাকার বয়সকে তোর কাকার বয়স দিয়ে গুণ কর। এবার একটা থেকে আর একটা বাদ দে। এবারে যা দাঁড়াল তাই হচ্ছে আমার বয়স। আচ্ছা, আর একটু বলি। আমার বয়স হচ্ছে এমন একটা রাশি যা নাকি দু'টি সমান রাশির গুণফল। এবারে বল দেখি আমার বয়স কত?"

কোল্‌ড ক্রীম অভ রোজেজ

গোলাপ গন্ধ প্রসাধন প্রলেপ

শীতের দৌরাত্ম্য হইতে হাত, পা, মুখ ও গাত্রচর্মের লাবণ্য রক্ষা করে। সৌন্দর্য সাধনার শ্রেষ্ঠ সহায় এবং শৌখিন সম্প্রদায়ের পরম বন্ধু।

সুদৃশ্য আধারে ও টিউবে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওআর্কস লিঃ

কলিকাতা :: বোম্বাই :: কানপুর

এ মাসের নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

এ সংখ্যার ৪১৪ পৃষ্ঠায় যে দু'খানি ছবি দেওয়া হয়েছে সে দু'টির যে কোনটি অবলম্বন ক'রে তোমার ইচ্ছামত কিছু লিখে পাঠাও—গদ্যে কিংবা কবিতায়,—প্রবন্ধে কিংবা গল্পে। যার লেখা আমাদের বিচারে সব চেয়ে ভাল মনে হবে তাকেই পুরস্কার দেওয়া হবে। লেখা ২৯শে ফাল্গুনের মধ্যে রামধনু কার্যালয়ে পৌঁছান চাই। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে কিন্তু প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নীচেকার কুপনটি কেটে পূর্ণ করে পাঠাতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না।

রামধনু

নাম—

ঠিকানা—

পুঃ প্রঃ মাঃ ৫৮

পূব-আকাশের
দুয়ার খোলে কে ?

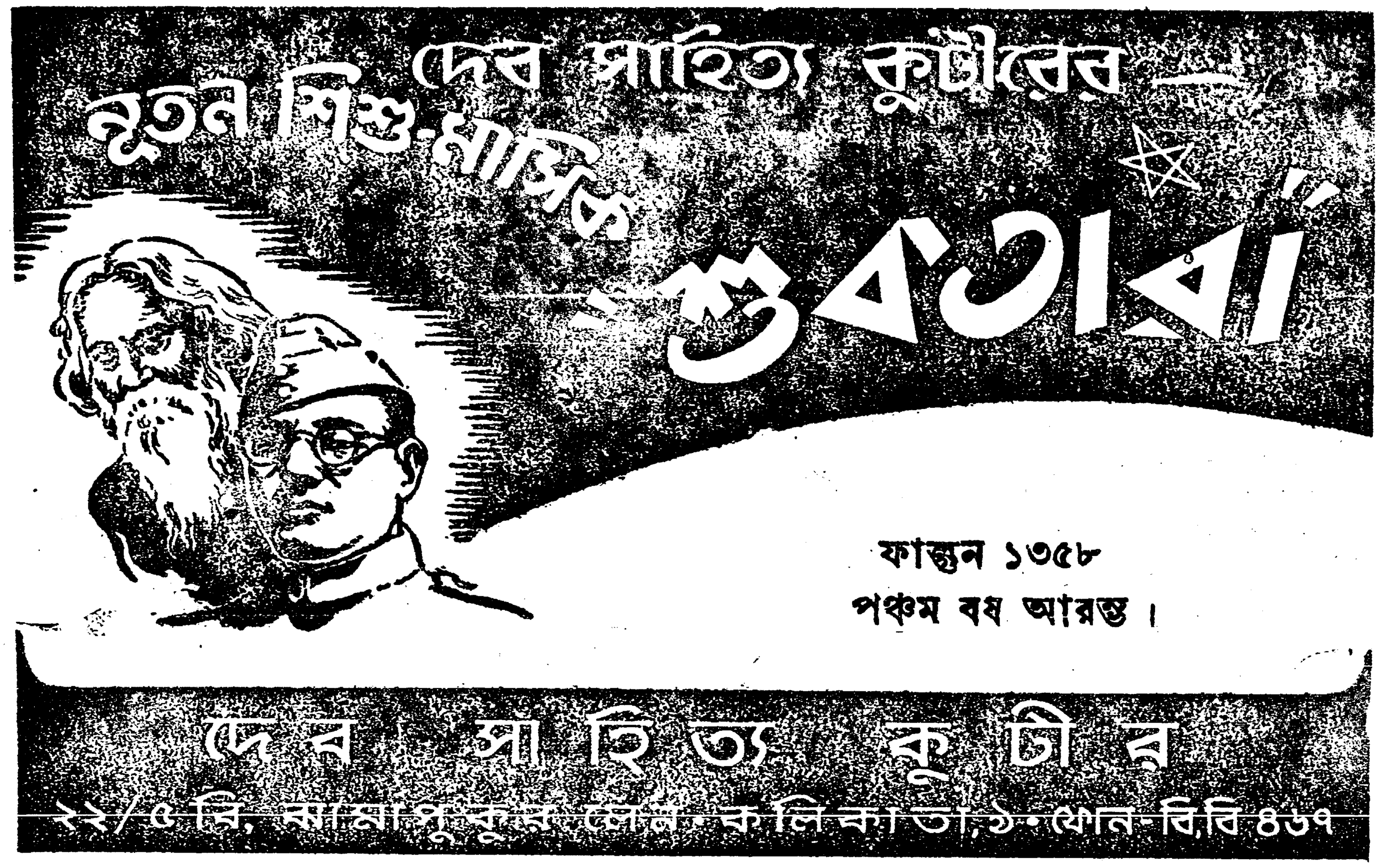

প্রতি মাসেই পুরস্কার !

["শুকতারা"র গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য]

আমরা স্থির করেছি যে, আগামী ফাল্গুন মাস হতেই আমরা প্রতিমাসে একটি করে প্রতিযোগিতা আহ্বান করবো, আর তা শুধু আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

প্রতিশ্রুতি

আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের অনেকেই "শুকতারা"র বহুল প্রচারের জন্য এতদিন নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করে আমাদের অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। কাজেই আমরা এখন হতে স্থির করেছি, যে কেহ পাঁচজন গ্রাহক-গ্রাহিকা-সংগ্রহ করে দিবেন, তাঁকেই আমরা বিনামূল্যে—

এক বছরের জন্য গ্রাহক করে নিব।

—সম্পাদক, "শুকতারা"

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

—পড়বার মত এবং অপরকে পড়াবার মত—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা	১৲
বিজ্ঞান-বুড়ো	১৲
আকাশের গল্প	১।০
আবিষ্কারের গল্প	৸০
ধূমকেতু	৸০
অয়েল পেন্টিং (নাটক)	।০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

ড্রাগনের দুঃস্বপ্ন	১৲

শ্রীঅমলেন্দু সেনের

দি লাষ্ট্ অব্ দি মোহিকান্স্	॥৵০

অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি	১।০
পদ্মরাগ	১॥০
সোনার হরিণ	১॥০
নূতন পুরাণ	৸৵০
হাস্য ও রহস্য	৸৵০
চায়ের ধোঁয়া	৸০
দমাদম্ দামোদর (নাটক)	।৵০

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত

অলিভার টুইষ্ট	॥৵০

ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, ১বি রসা রোড, কলিকাতা ২৫

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

রুচিমাধুর্য্যে, স্বাদে ও গুণে অনুপম

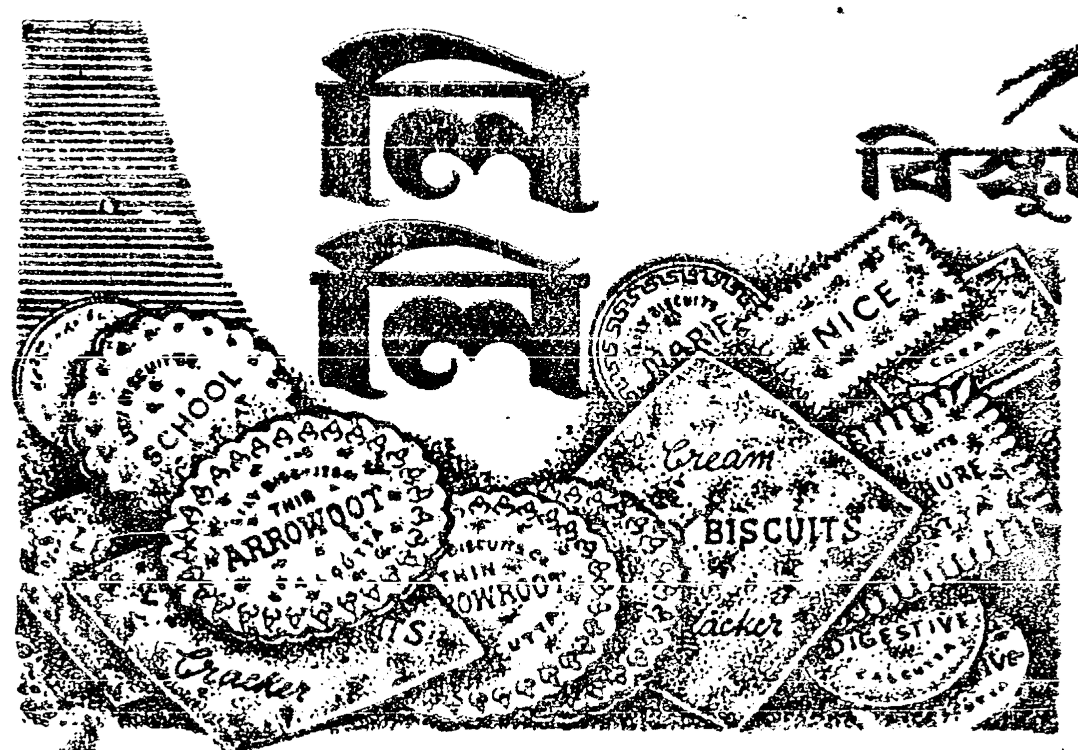

কয়েকটী মনোরম

ও

স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন-ক্রীম,
ক্যানিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম ইত্যাদি।

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ
৬ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা।

১৪শ বর্ষ ফাল্গুন, ১৩৫৮ ১১শ সংখ্যা

রামধনু

সম্পাদক— শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্, এস-সি.

বিক ৪৲
াসিক ২।০
তি সংখ্যা ।৵০

কার্য্যালয় :
১৬, টাউনসেণ্ড রোড,
কলিকাতা ২৫

সলোমন এণ্ড কোং

২৯ ষ্ট্রাণ্ড রোড (মোহতা হাউস) কলিকাতা-১

নানা প্রকার ডিজেল—কেরোসিন—পেট্রোল-ইঞ্জিন, হ্যাণ্ড ও পাওয়ার-পাম্প—গ্যালভানাইজ্‌ড টিউব প্রভৃতি আমদানী ও প্রস্তুতকারক।

সোল প্রোপ্রাইটার : নৃপেন ভট্টাচার্য্য

GRAM : 'AGRASTONS' • • • PHONE : BANK 4497

১৬৩ঃ টাউনসেণ্ড রোড ভবানীপুর, কলিকাতা [illegible] প্রেস হইতে

মোনালিসা
লেওনার্দো দা ভিঞ্চি অঙ্কিত
একখানি পৃথিবীবিখ্যাত চিত্র

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিমণ্ডিত

২৪শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৫৮ { ১১শ সংখ্যা

ঊর্ণনাভ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ঊর্ণনাভ, ওড়না তোমার
ফড়িঙ মারার জাল হে,
ফাঁদ পাতিয়া নিত্য মারো—
কংকই কি নাকাল হে!
মারবে যদি সোজাই মারো,
এতই কেন ফন্দী,
ফাঁসিতে এ লট্‌কানো যে
প্রথম ক'রে বন্দী।

মাকড়সা কয়, সভ্যতারি
মন্ত্রে মোদের দীক্ষা,
বৃহৎ মহৎ রাষ্ট্র এবং
মহাজনের শিক্ষা।

এ জঙ্গলের জঙ্গীদলের
ওই শোন জয়গানটা,
সবার চেয়ে বাহাদুরী
লওয়া প্রাণীর প্রাণটা।

দেখছ জাপান জার্ম্মানীতে
চলছে কি সব কাণ্ড,
সে সব ফাঁসি—এ সব চেয়ে
অনেক যে প্রকাণ্ড!
বলবে বন্য কূটনীতিবিদ
এ জাল দেখে 'ধন্য',
এ 'তোয়ালে' কে বুনেছে
বনদেবীর জন্য!

বিসর্জন

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জনৈক পুরবাসী

তখন জুলাই মাস। কোন কোন দিন সকালেও রিহার্শাল চলতে লাগ্‌লো এবং সপ্তাহে দু'দিনের জায়গায় তিন দিন, সন্ধ্যে সাতটার জায়গায় বিকেল পাঁচটায়ও রিহার্শালের ব্যবস্থা হয়ে গেল। এক একদিন বেশ জম্‌জম্‌ও করে। তবুও সন্দেহ, "শেষ অবধি হবে তো?" কারণ যত অনর্থের মূল ঐ অর্থের কথা মনে হলেই বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে ওঠে। আর, আমাদের পুরুত ঠাকুরও মাঝে মাঝে এমন মোচড় দেন যে, নিতান্ত গেঁয়ো পুরবাসীরা পর্যন্ত উত্যক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু সে কথা তাঁকে বলবার সাহস কারোই হয় না। তবুও এর-ওর-তার সঙ্গে মাঝে মাঝে খিটিমিটি বাধে। একদিন তো চাঁদপালের সঙ্গেই, অর্থাৎ দেওয়ান ও পুরুতে তর্কাতর্কি হতে হতে দেওয়ান দেওয়ানী ছেড়ে দিয়ে দেশান্তরী হ'ল। আমরা 'হায়! হায়!' করতে লাগলাম। আর একদিন বাধলো পরম অনুগত পুত্রসম জয়সিংহের সঙ্গে। তবে তা মিটেও গেল। যথারীতি রিহার্শাল চলতে লাগ্‌লো। এবং শেষ দিকটার মহড়া শুরু হ'ল।

শেষের দিকে আছে জয়সিংহের আত্মদানের দৃশ্য। তারপরও আছে কয়েকটি দৃশ্য।

কিন্তু আমরা স্থির করেছিলাম, ঐ বিয়োগান্ত দৃশ্যের পরেই যবনিকা টেনে দেব। এ কারণে স্বভাবতঃই দৃশ্যটিকে দর্শকগণের মনোমুগ্ধকর করে তুলবার চেষ্টা হতে লাগলো। একদিন জয়সিংহের মৃতদেহের ওপর পুরুত ঠাকুর "এ কি করিলি রে জয়সিংহ!"—বলে বিলাপ করতে করতে এমন স্বাভাবিক ভাবে আছাড় খেয়ে পড়লেন যে, বেচারী জয়সিংহের মনে হ'ল, সত্যিই তার মৃত্যু হয়েছে। সে আর উঠে নবদেহে চলে-ফিরে বেড়াতে পারবে না। তারপর সাত দিন তার পাঁজরায় ব্যথা রইলো। শোকে মানুষকে কি রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন করে!

এদিকে এই হতভাগ্য পুরবাসীটির একটি শিশুসাহিত্য-সম্মেলনের পরিকল্পনা ছিল যা দেশে এ পর্যন্ত হয় নি। প্রস্তাব করেছিলাম, অভিনয়টি হবে সেই সঙ্গে। সকলেই তাতে সম্মতও হয়েছিলেন। কিন্তু গোলমাল বাধালো, ঐ অর্থ। অভিনয়ে অনেক টাকার দরকার। কে দেবে? আশা ছিল, আমাদের গৌরী সেন ডাঃ জে. সি. মুখার্জ্জি তাঁর থলির দড়ি খুলে বলবেন, "এই যে নিন্।" কিন্তু তার পরিবর্তে বললেন, "থিয়েটারের জন্যে আমি টাকা দেব না।" উনি কার ছাত্র জানি না। থিয়েটারের নাম শুনলেই এমন চটে যান যে সেখানে অন্ন থাকতেই চান না। অথচ ডাক্তারদের থিয়েটার দেখা ও থিয়েটার করার দিকে প্রায়শঃই ঝোঁক থাকে এবং ভাব-প্রবণ নাটক হলে তো কথাই নেই। জানি না এটা মড়া ঘাঁটা ও কাটার স্বাভাবিক ফল কিনা।

এ অবস্থায় রাজামশাই অভয় দিলেন, "টাকা এসে যাবে। নিউ এম্পায়ারে প্লে করলে কয়েক হাজার টাকা উঠবে।" এমন সময় রব উঠলো বিশ্বভারতী ক'লকাতায় আসছে, নৃত্য-গীত-অভিনয় করে শহরবাসীর কাছ থেকে তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য টাকা তুলতে। 'বিসর্জন' নাটক অভিনয়ের অনুমতি তারা দেবে না। আজব শহর এই কলকাতা। এখানে হাজার হাজার লোক ভিক্ষা করে, হাজার হাজার লোক নিরক্ষর, হাজার হাজার লোক ফুটপাথে শুয়ে জীবন কাটায়, হাজার হাজার লোক বেকার, হাজার হাজার লোক অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, হাজার হাজার গৃহস্থ ক্লায়ক্লেশে দিনপাত করে থাকে। এখানে হাজার হাজার শিশু অর্থাভাবে যোগ্য খাদ্য পায় না, হাজার হাজার বালক-বালিকা সংসার প্রতিপালনের জন্য লেখা-পড়া না করে অর্থ উপায় করতে যায়। দারিদ্র্যের ও দারিদ্র্য থেকে উদ্ভূত সকল রকমের অপরাধ, পাপ ও কুৎসিত কাজ এখানকার সমাজ-জীবনে, নাগরিক-জীবনে নিশ্চিন্তে বাসা বেঁধে আছে। আর এরই পাশে রয়েছে রূপকথায় বর্ণিত ধনসম্পদ, বিলাসিতা, বড় বড় শিক্ষামন্দির ও দেবালয়। এখানেই হচ্ছে বিলাসে-ব্যসনে লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অপব্যয়। কাজেই এই শ্রেণীর চোখ-ধাঁধানো, মন-মাতানো কিছু করতে পারলেই কেবল মাত্র ফ্যাশানের খাতিরে এরা হাজার হাজার টাকা ব্যয় করবে। যাক সে কথা। আমার আলোচ্য বিষয়, আমাদের "বিসর্জন।" কিন্তু বিশ্বভারতীরও "বিসর্জন" নাট্যাভিনয় করবার কথা ছিল। আর অনুষ্ঠানটি হবার ব্যবস্থা হচ্ছিল আমরা যখন করবার মনস্থ করেছি কতকটা সেই সময়ে। কাজেই স্বার্থের সংঘাত দেখা দিল। আমরা যদি তাদের আগে অভিনয় করি, আবার ঐ নিউ এম্পায়ারে, তা হলে কলকাতার থিয়েটার-পাগল ফ্যাশান-দোরস্ত অধিবাসীদের সব টাকা যে লুটে নেব এ আশঙ্কা অপরপক্ষে হওয়াই স্বাভাবিক। আবার আমাদের দিক থেকেও ঠিক ঐ আশঙ্কাই হতে লাগলো। আমাদের

কর্তৃপক্ষ নিজেদের যতই অভিনয়-কুশলী মনে করুন না কেন, একটু যেন দমে গেলেন। যারা অভিনয় দেখতে আসবে তারা যে তাদের দেয় মূল্য ষোল আনা আদায় করতে চাইবে এ তো জানা কথা। তবুও একটা পরম ভরসা এই ছিল যে, যাঁরা অভিনয় করতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সাহিত্যিক এবং তাঁরা প্রত্যেকই শিক্ষিত বাঙ্গালী ও বাঙলার পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের কাছে অল্প-বিস্তর পরিচিত। কাজেই অনেকের মনেই যে আমাদের অভিনয় দেখবার কৌতূহল জাগবে, এ আশা এমন বেশী কিছু নয়। কিন্তু আমাদের কয়েক জন শুভানুধ্যায়ী রাম না হতে রামায়ণ গেয়ে বসলেন; বললেন, "কেউ আপনাদের থিয়েটার দেখতে আসবে না; আপনারা যতই বিজ্ঞাপন দিন না কেন।" এর ওপর শোনা গেল বিশ্ব-ভারতী কর্তৃপক্ষ আমাদের "বিসর্জন" অভিনয়ের অনুমতি দেবেন না। তা হলে তো সব ল্যাঠা চুকেই গেল! এত লাফালাফি, এত গলা-ফাটাফাটি, এত মনোমালিন্য—সবেরই "বিসর্জন" হয়ে যাবে। আমাদের রাজামশাই বাংলাদেশের উচ্চস্তরে বিশেষ পরিচিত। বিশ্বভারতী, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্রই তাঁর গতিবিধি। এমন কি বিশ্ববকাটেরাও নাকি তাঁকে খাতির করে চলে। অভিনয়ের অনুমতির জন্য তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু ওদিক্ থেকেও না দেবার কত বায়নাক্কা, কত হুমকি, কত 'আইন' এমন কি হাইকোর্ট পর্যন্ত দেখানো। শেষ অবধি অনুমতি পাওয়া গেল। কিন্তু অভিনয়ের খরচের টাকা কই? ও তো হ'ল খরচ করবার অনুমতি! খরচ করবো কি? ছেলেবেলায় যখন আলোয়ান, বাড়ির কারো শাড়ি বা নিজেদের পরনের কাপড় (তখন হাফপ্যাণ্ট ছিল না) টাঙিয়ে যাত্রাভিনয় করেছি. পাটের ফেঁসো দিয়ে গোঁফ-দাড়ি, ছোট ভাইবোনের পাশ-বালিশ মাকে "না বলে" এনে তা দিয়ে গদা, বাঁখারি দিয়ে তলোয়ার তৈরি করেছি, মুখে দোয়াতের কালি মেখে সুন্দর মুখখানি পুড়িয়েছি, খড়ির গুঁড়ো লাগিয়ে পাউডারের অভাব দূর করেছি, সর্বোপরি কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাস ওঝার বিনা অনুমতিতেই তাঁদের রচনা থেকে পালা চুরি করেছি —সে জন্য এটর্নিতে হাইকোর্টও দেখায় নি—এবং দর্শকদের জন্য চাটাই বা ভৃত্যের শয়নের তৈলাক্ত ছিন্ন মাদুরখানি গোপনে এনে গাছতলায় পেতে দিয়েছি, অভিনয় দেখবার জন্য আমাদের চেয়েও ছোট যারা তাদের জোর করে ধরে এনেছি, সেজন্য দু'-একটা চড়-চাপড়ও কষিয়েছি, ভবিষ্যতে কাঁচা আম, টোপা কুল, ছড়া তেঁতুল দেবার লোভ ও না দেবার ভয় দুই-ই দেখিয়েছি, কই, তখন তো অভিনয়ের খরচের জন্য টাকার ভাবনা ভাবতে হয় নি, টাকার দরকারও হয় নি! কিন্তু রঘুপতির কথায় আবার বলি, "সে কাল গিয়েছে। টাকা চাই, টাকা চাই-ই—"

কিন্তু কোথায় টাকা? এর ওপর রাজামশাইদের দৃষ্টি নিউ এম্পায়ারের দিকে। ওখানেই নাকি ওঁদের অভিনয়-কুশলতা খোলে ভাল। কারণ ওখানে সাধারণ দর্শকই মোটর গাড়ি, হাল ফ্যাশানের বাড়ি, রকমারি পোশাক ও শাড়ির মালিক। তারা আর্ট কি তা ভাল করেই বোঝে এবং একালের কলকাতার "সবচেয়ে প্রগতিশীল অঞ্চল" বালীগঞ্জবাসী। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের বই, নিউ এম্পায়ার ছাড়া আর কোথাও, মানে উত্তর কলিকাতার কোন নাট্যমঞ্চে,

অভিনীত হলে যে তাঁর ইজ্জৎ যাবে! উত্তরাঞ্চলের দর্শকেরা বিড়িওয়ালা, দোকানদার, মুদি। হায় প্রগতিশীলতা! সত্যেন দত্ত মানুষকে জিজ্ঞেস করে গেছেন—"পঞ্জরে তোর জাগছে কি ও, বন-মানুষের হাড়?" কাজেই ঐ যে প্রগতিশীলতা, ও হ'ল গিলটি, ঝুটা জরি। রবীন্দ্র-নাথের কথায় কেবল এইটুকুই বলি, "যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।" প্রগতি যে এই দিকেই পথ দেখায়। আমরা, পুরবাসীরা, একটু কম উচ্চাভিলাষী। টাকার অভাবের দিকে তাকিয়ে অভিলাষ সংযত করেই "রঙমহল" ও "স্টারের" প্রস্তাব করে বসলাম এবং যে কোন একটি সংগ্রহেরও চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু টাকার দুশ্চিন্তায় কিছুতেই আর সোয়াস্তি পাওয়া গেল না। মঞ্চের ভাড়ার জন্য কিছু আগাম দেওয়ার দরকার, এমন কি নিমন্ত্রণ পত্র ছাপবার জন্যও যে টাকা চাই!

এই অবস্থায় পুরুত ঠাকুর আবার কি কারণে যেন প্যাঁচ কষতে লাগলেন। "আমি পারবো না". "আমায় তোমরা বাদ দাও", "আমি বুড়া হইছি", "তোমরাই কর"—এমনি কত কথাই বলতে লাগলেন এবং এমন সময়ে মহড়ায় হাজির হতে লাগলেন যে, যার রক্তের চাপ বেশি নয় তারও রক্তের চাপ বেশি হয়ে গেল। সকলেই জনান্তিকে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন। তবুও প্রকাশ্যে বলবার মতো সাহস ও ভালমানুষ বলে পরিচয়টুকু নষ্ট করবার মতো দুর্বুদ্ধি কারো হ'ল না। শেষে একদিন অপ্রিয় সত্য কথাটি বলতে হ'ল আমাকেই। ফলে সব মূলেই "হাভাত" হবার যোগাড়। এই ঘটনার পরই ক্ষিতীন বাবুদের বাড়ি থেকে অর্ধচন্দ্র নয়, সসম্মানে বিদায় নিয়ে একপাল অনাথ পিতামাতার মতো আমরা যে-যার বাড়ি চলে এলাম।

লঙ্কার রাক্ষসেরা বড় আক্ষেপে বলেছিল—"মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী!"

কয়েক দিন কেটে গেল। এবার আর ক্ষিতীন বাবুর বাড়ীতে নয়, এর পর কারও বাড়ীতেই আর যাওয়া যায় না। কিন্তু আশ্রয়ও একটা চাই। এ সংসারে মহানুভব ব্যক্তিও আছেন। আশ্রয় দিলেন পরিষদ-সভাপতি শ্রীক্ষেত্রপালদাস ঘোষ। অবশ্য তাঁর বাড়িতে নয়, অন্যত্র। আশ্রয় তো পাওয়া গেল, কিন্তু টাকা আর আমাদের পুরুত ঠাকুর? তিনি না হলে যে পূজোই হবে না, "বিসর্জন" তো পরের কথা। পুরুত ঠাকুর না থাকলে পূজো করবে কে?"

সংসারে পূজা ও পূজারী কিছুরই অভাব নেই এবং কোন কালে তেমন কিছু ঘটবেও না। মানুষের স্বভাবেই ও দু'টি বর্তমান। নাম শোনা যেতে লাগলো হোম সাহেবের। রাজা মশাই বললেন, "তাঁকে যদি তোমরা নাও, অভিনয়ের খরচ বাবদ্ তাঁর কাছ থেকে হয়তো শ'খানেক টাকা চাঁদাও আদায় করা যেতে পারে।" কিন্তু আমাদের গোষ্ঠিপ্রিয়তার মাত্রাটা অতিরিক্তই। নূতন লোক, যাঁর সঙ্গে আমাদের মেলামেশা নেই, তাঁকে আনতে রাজমশাই ছাড়া আর কারোই তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। আগেই তো বলেছি, রাজামশাইয়ের গতি উচ্চস্তরের ঘেঁষা। হোম সাহেব হলেন শ্রীঅমল হোম। আমাদের ঐ পুরুতই ভাল। আমরা নিজেদের মধ্যে নানা কারণে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পারি তবুও সমষ্টিগত ভাবে কিছু করতে গেলেই প্রত্যেককে প্রয়োজনীয় মনে করি। অবশ্য, এ আমার ব্যক্তিগত অভিমত। কারণ ঠিক এর বিপরীত কাজ করতেও আমার কোনও কোনও সহকর্মীর বিবেকে এক সময় একটুও পীড়ার

উদয় হয় নি। তবে তা অতীতের কথা। কিন্তু জীবনে বেদনার দিনগুলিকেই মানুষ বেশি করে মনে রাখে, ভুলতে চায় না, পারেও না।

নূতন আশ্রয়ে এসে রিহার্শাল চলতে লাগলো, কিন্তু পুরুত ঠাকুর আর আসেন না। কত সাধ্য-সাধনা, কত অনুনয়-বিনয় করা হ'ল। সেকালে দুর্বাসার মতো কাঠখোট্টা ঋষিও শাপ দিয়ে বেচারী শকুন্তলার কাতর চাঁদমুখ, জলভরা পটল-চেরা চোখ দেখে ও কোকিলকণ্ঠের কান্না শুনে ভিজে গিয়ে একটা পাল্টা বরই দিয়ে ফেলেছিলেন। আমাদের মধ্যে ও-রকম কেউ ছিল না সত্যি, তাই বলে পুরুত ঠাকুরও তো দুর্বাসা ন'ন। তিনি তেমন ভিজলেন না। রাজামশাই টাকার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন, এমন কি "নিজ তহবিল হতে" কিছু আগামও দিতে তৎপর হলেন। প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীসুধীর সরকারকেও নিউ এম্পায়ার ভাড়া বাবদ শ' চারেক টাকা দিতে অনুরোধ করলেন। স্থির হ'ল চাঁদা তুলে টাকাগুলি পরিশোধ করা হবে। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের প্রতিদ্বন্দ্বী রঘুপতি তলে তলে "সব পণ্ড" করতে তৎপর হলেন। সুধীর বাবু শিশুসাহিত্য-পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি, বর্ত্তমানেও কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্য। কাজেই শিশুসাহিত্যিকগণের শক্তি ও নামের ওপর আস্থা স্থাপন করে অতগুলি টাকার দায়িত্ব নিতে সাহস পেলেন না। সকলেরই 'মুরোদ' তো তিনি সুদীর্ঘকাল ধরে দেখে আসছেন। কেবলই মনে হতে লাগলো এত চেষ্টা, এত সময় ব্যয়, এত আয়োজন সবই কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? এদিকে পশ্চিম বঙ্গ সরকারও আমোদ-কর থেকে আমাদের রেহাই দেবার অনুমতি দিয়েছেন। সবই কি বৃথা? পত্রিকাতেও তো আমাদের নাট্যাভিনয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এখন সব পণ্ড হলে যে নিদারুণ মনস্তাপ, অপযশ ও অসম্মান! কিন্তু আমরা ভুলে গেলাম আমরা যে বাংলাদেশের সাহিত্যিক।

এমন অবস্থার মধ্যে একদিন ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য শ্রীনরেন্দ্র দেবের আহ্বানে তাঁর সুসজ্জিত বৈঠকখানায় আমাদের ইতিকর্তব্য নির্ধারণার্থে একটি ছোট বৈঠক বসলো। কবিপত্নী কবি শ্রীরাধারাণী দেবীও সে বৈঠকে অনুগ্রহ করে উপস্থিত হলেন এবং সুমিষ্ট হিতোপদেশ দানে আমাদের যথোচিত নিরস্ত ও নিরুৎসাহ করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "সেদিন রেডিওতে যে রাজারাণী অভিনয় হয়েছে, আপনারা কি তত সুন্দর করতে পারবেন? আপনাদের এ চেষ্টা না করাই উচিত। যদি নিতান্ত অভিনয় করতেই হয় তো কলকাতার বাইরে গিয়ে অভিনয় করুন।" ইত্যাদি ইত্যাদি। রেডিওতে সব ও সবাই সুন্দর। ও যেন নন্দনের "আউট-হাউস।" যাই হোক, তিনি যে আমাদের কলকাতার বাইরে, কোন মাঠে গিয়ে অভিনয় করতে সৎপরামর্শ দিলেন না, এর জন্য আমরা নিজেদের সৌভাগ্যবান্ বলে মনে করলাম। বোঝা গেল, আমাদের শক্তির উপর সামান্য আস্থাও তাঁর আছে। রেডিওতে যাঁরা রাজারাণী অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আমাদের রাজামশাইও একজন। কিন্তু অপর্ণা ভিখারিণী বলেই এতটা উপদেশ পরিপাক করতে পারলে না।

বোঝা গেল, এই দোতলার ঘরেই "বিসর্জনের" বিসর্জন; এবং হ'লও তাই।

হাল্কা মনে সবেই নিচে এলাম। সৌজন্যবশে কবি ও কবিপত্নীও সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলেন। আমরা যে বিদায়ী অতিথি!

গৃহখানির সম্মুখে জনবিরল পথে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে কবিপত্নীকে বললাম, "বউদি, বিজয়ার নমস্কার।"

তিনি আশীর্বাদ করলেন কি অভিশাপ দিলেন জানি না, জানবার ইচ্ছাও হ'ল না। রজনীর স্বল্পালোকিত পথ দিয়ে বিমিশ্রভাবাক্রান্ত মনে গৃহের পথ ধরলাম।

[প্রথম অঙ্কের যবনিকা] (ক্রমশঃ)

ফাল্গুন

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

ফাগুন, তোমার রঙের আগুন দীপ্তি পায়
অশোক, পলাশ, শিমুল গাছের সব শাখায়।
পিক পাপিয়ায় কি সুর দিয়া
করলে মোহিত সবার হিয়া,
শ্যাম বানানী মুখর সুর-মূর্চ্ছনায়।

মুকুল-ছোঁওয়া ব্যাকুল হাওয়া বয় ধীরে;
চাঁদ ভেসে যায় বনসায়রের নীল নীরে।
লতায় পাতায় গাছে গাছে
আনন্দ যে ছড়িয়ে আছে,
বাঁশের বাঁশী বাজছে নদীর দুই তীরে।

সৌরভেতে ফাগুন তোমার কি গৌরব!
বক্ষে তোমার নানান্ ফুলের মহোৎসব।
ফুটছে বেলা, গোলাপ ফুটে,
কাজলা ভ্রমর গন্ধ লুটে,
মন ভোলাবার যাদু জান অসম্ভব।

সোনার বালুচরে

শ্রীঅশোক সেন, এম. এ

—চার—

প্রায় দু'ঘণ্টা হাঁটবার পর সূর্যাস্তের সময় হ'ল। ঠিক সেই সময়ে আমরা এক ভয়ানক জায়গায় এসে পড়লুম—এক দুর্গম পাহাড়ের চূড়ার কাছে একটা সমতল জায়গায় এসে দাঁড়ালুম। নীচু থেকে চূড়া পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটা গভীর বনজংগলে ভরা। মাঝে মাঝে পড়ে আছে বিরাট পাথর, মনে হচ্ছিল যেন মাটি থেকে আলগা হয়ে আছে। আর, অনেক জায়গায় সেগুলো গাছের সাথে আটকে আছে, নইলে হয়তো নীচে গভীর উপত্যকার মধ্যে গিয়ে পড়বে। চারিদিকের গভীর খাদের দিকে তাকালে মনে ভয় ও বিস্ময় জাগে। আমরা যেখানটায় অনেক কষ্টে গিয়ে দাঁড়ালুম সেখানটা ঘন কাঁটা-গাছে ভর্তি। জুপিটার সাহেবের কথামত কাস্তে দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে না দিলে আমাদের পক্ষে এগুনোই অসম্ভব হ'ত। রাস্তা কেটে এগোতে এগোতে আমরা এসে দাঁড়ালুম খুব উঁচু একটি ওক্ গাছের সামনে—তার আশে পাশে আছে আরো আট-দশটা ছোট গাছ। শাখা-প্রশাখায় বলো, আর আকারে বলো—সেই বড় ওক্ গাছের মনোহর সৌন্দর্য আমি কখনো ভুলবো না। আমরা গাছটার নিচে যেতেই উইল জুপিটারের দিকে তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে ঐ গাছটায় চড়তে পারবে কিনা। বুড়ো জুপ থতমত খেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, শেষে গাছটার গোড়ার চারিপাশে খুব ভাল করে দেখে বল্লে—"নিশ্চয়ই পারব। এমন কোন গাছ নেই যাতে জুপ চড়তে পারে না।"

"তা হলে চট্‌পট্ উঠে পড়্‌তো। অন্ধকার হয়ে গেলে কিছুই দেখতে পাব না।"

জুপিটার জিজ্ঞেস করলে—"কতটা উঠতে হবে, সাহেব?"

"আগে কিছুটা ওঠ্‌তো, তারপর বলছি কোন্‌দিকে যেতে হবে...হাঁ, হয়েছে, এবারে থাম্। এই পোকাটাকেও সঙ্গে নে।"

জুপ ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল—"আবার পোকাটাকে কেন? ওটাকে গাছের উপর এনে কি হবে?"

"সে কি জুপ! জাঁদরেল নিগ্রো তুই, আর তুই কিনা একটা মরা পোকাকে হাতে নিতে ভয় পচ্ছিস? এই সুতোটা ধরে তুলে নে। আর যদি না নিস, তা হ'লে এই শাবল দিয়ে তোর মাথা ফাটাব।"

জুপ লজ্জা পেয়ে হেসে বল্লে—"সে কি কথা। আপনি সব সময়ে এই বুড়োটাকে গালাগাল করেন। আমি কি সত্যি পারব না বলেছি? শুধু ঠাট্টা করছিলুম। হুঁঃ, আমি ভয় করব ঐ পোকাটাকে—ওটাকে আমি থোড়াই কেয়ার করি..." এই বলে অতি সাবধানে সে সুতোটার এক দিক্ ধরল, তারপর সেটাকে যথাসম্ভব তার কাছ থেকে দূরে রেখে উপরে উঠতে শুরু করল। শক্ত করে একটা ডাল ধরে সে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। দু'-একবার পা ফস্কে পড়েছিল আর কি। যা হোক, বহু কষ্টে প্রায় ষাট-সত্তর ফুট উঁচুতে এক ডালে গিয়ে পৌঁছে সে জিজ্ঞেস করলে,—"এবার কোন্ দিকে যাব?"

উইল বল্লেন—"এদিকের সবচেয়ে বড় ডালটাতে গিয়ে ওঠ্।"

জুপ তখনই তাঁর কথামত এগোতে লাগল। উঠ্‌তে উঠ্‌তে সে ডালপালার মধ্যে মিশে গেল—আর তাকে দেখতে পেলুম না। হঠাৎ তার কথা শোনা গেল—"আর কতটা উঠতে হবে?"

"কতটা উঠেছিস তুই?"

জুপ জবাব দিলে—"অনেক উঁচুতে। গাছের ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখতে পাচ্ছি।"

উইল বল্লেন—"থাক্, আকাশ দেখে আর কাজ নেই। বলি শোন্—নীচের দিকে তাকা। এদিকে তোর নীচে ক'টা ডাল ছাড়িয়েছিস?"

"এক-দুই-তিন চার-পাঁচ—পাঁচটা বড় ডাল পার হয়ে এসেছি।"

"তা হ'লে আর এক ডাল ওপরে ওঠ্।"

কয়েক মিনিট পরে আবার জুপিটারের গলা শোনা গেল—সে সপ্তম ডালে গিয়ে বসেছে।

এবার উইল উত্তেজিত হয়ে বল্লেন—"এখন ঐখানে বসে তুই তোর কাজ করে যাবি। যদি অদ্ভুত কিছু দেখিস্, আমাকে বলিস্।"

আমি ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের পাগলামি দেখছিলুম। এ সব দেখে আমার মনে কোন সন্দেহ রইল না যে উইলের মাথা খারাপ হয়েছে। এখন কি

করে এই ক্ষ্যাপাটাকে বাড়ী ফিরিয়ে নেওয়া যায় তাই ভাবছিলুম। হঠাৎ আবার শুনলুম : "এই ডালটায় উঠতে ভয় হচ্ছে—এটার সবটাই একেবারে মরা—ভেঙ্গে না পড়ি।"

"কি বললি, ডালটা একেবারেই মরা?" উইল ভারী গলায় জিজ্ঞেস করেন।

"একেবারে।"

ব্যস্ত হয়ে উইল বল্লেন—"তা হ'লে এখন কী করি?"

এবার কথা বলবার সুযোগ পেয়ে আমি বল্লুম—"কি করবেন? কেন, বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়ুন—চলুন, দেরী হয়ে যাচ্ছে। দিব্যির কথা মনে আছে তো?"

আমার কথায় কান না দিয়ে তিনি জুপিটারকে বল্লেন, "ডালটাকে ছুরি দিয়ে কেটে ভাল করে দেখ্ সত্যি ওটা পচা কিনা।"

"হ্যাঁ, পচাই তো! তবে একদম পচা নাও হতে পারে—আমি একলা হলে হয়তো ঠিক উঠতে পারি।"

"একলা মানে?"

"পোকাটার কথা বলছি—ওটা বড় ভারী। ওটাকে ফেলে দিয়ে আমি একা উঠলে হয়তো ডালটা ভাঙ্গবে না—একটা নিগ্রোর ভার সইতে পারবে।"

উইল চীৎকার করে উঠলেন—"ওরে হতভাগা, বাজে কথা বলবার জায়গা পাস্ না? পোকাটাকে ফেলে দিয়ে যদি উঠিস তা হ'লে নির্ঘাত তোর ঘাড় ভাঙ্গব। শোন্ জুপিটার, যা বলি শোন্।"

"হতভাগাকে আর ও-রকম করে বকবেন না।"

"শোন্ আমার কথা, পোকাটাকে নিয়ে তুই ঐ ডালের ওপর যতটা পারিস এগিয়ে যা। তা হ'লে নীচে নেমে এলেই তোকে একটা রূপোর ডলার বকশিশ দেব, বুঝলি?"

কথাটায় যেন যাদুমন্ত্রের মত কাজ হ'ল। জুপ নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। একটু পরেই তার চীৎকার শোনা গেল :—"ও—রে—বা—বা—রে!—এটা আবার কিরে?"

মনে হ'ল উইলের মুখ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "কি—কি—কি দেখে ভয় পেলি?"

"একটা মড়ার খুলি! কে যেন এটাকে পেরেক মেরে ডালের সঙ্গে আটকে রেখে গেছে। চিল-শকুনে এসে সবটুকু মাংস খেয়ে গেছে...।" (ক্রমশঃ)

বল তো এঁরা কারা?

এই সঙ্গে বাংলার তিন জন নাম-করা শিশুসাহিত্যিকের ছবি দেওয়া হ'ল। দেখ তো এঁদের চিনতে পার কিনা?

না পারলে শেষ পৃষ্ঠায় দেখ।

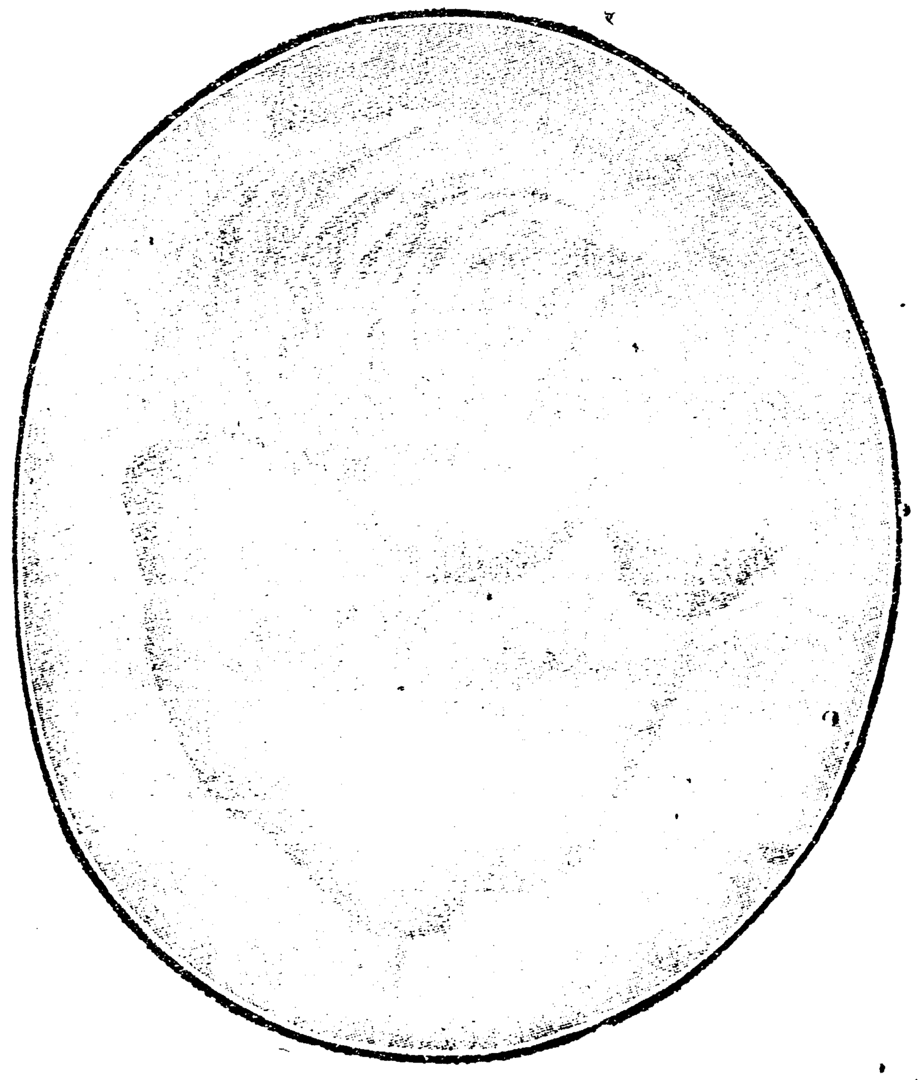

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

—নয়—

জো কিংবা ডিক এই আকস্মিক ব্যাপারে প্রথমটা হতভম্ব হ'য়ে গেছলো; কিন্তু পরক্ষণেই ডিক সে অবস্থা সামলে নিয়ে আক্রমণে উদ্যত হ'লো।

ডিককে বাধা দিয়ে জো বললো, "না ডিক, শান্ত হও। ও ভাবে মোটেই সুবিধে হবে না। হেনরির জন্যে ভয় ক'রো না; বড় সর্দ্দারের অনুমতি ভিন্ন ওরা তার কোনো অনিষ্ট ক'রতে পারবে না।"

হৈ-হল্লা একটু কমলে পর জো উঠে দাঁড়ালো। সকলকে উদ্দেশ ক'রে বললো, "পনি বীরেরা কি সবাই প্রতারক হ'য়ে পড়েছে? কিছুক্ষণ আগেই যাদের সঙ্গে শান্তির ধূমপান ক'রেছে তাদের ওপর আক্রমণ করছে কোন ধর্ম্মে? মাত্র তিনজন ফ্যাকাশ-মুখোদের দলবল নিয়ে আক্রমণ করতে লজ্জা করছে না? ফ্যাকাশে-মুখোরা যদি কোনো দোষ ক'রেই থাকে তো তার বিচার করবেন বড় সর্দ্দার। মাহ্‌তাওয়া ওষুধ-রাইফেলটা চায়, কিন্তু আমরা রাজী না হওয়া সত্ত্বেও সে জোর ক'রে নেবার চেষ্টা করছে। আমরা কি আমাদের বড় সর্দ্দারের কাছে ফিরে গিয়ে বলবো যে পনিরা সব চোর? ফ্যাকাশে-মুখোদের ছেলেপুলেরা যদি কখনো চুরি করে তা হ'লে কি তাদের বলবো, 'ছিঃ, চুরি করছো তোমরা? তোমরা কি পনি, যে চুরি করবে?' না, তা কি ভালো হবে? এখনো রাইফেলটা ফেরৎ দিলে আমরা ক্ষমা করতে পারি। তোমরা কি বলো?"

পনিদের মধ্যে সমর্থনসূচক গুঞ্জনধ্বনি উঠলো। এতে বোঝা গেল, মাহ্‌তাওয়া ওদের বিশেষ প্রিয়পাত্র নয়। কিন্তু চতুর মাহ্‌তাওয়া ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে সামনে লাফিয়ে এসে বললো, "ফ্যাকাশে-মুখোরা মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে বটে, কিন্তু এ ওদের বুজরুকী। ওরা কি পনিদের শত্রুদের সঙ্গে সদ্ভাব করতে যাচ্ছে না? তাদেরও ওরা কত কি জিনিষ

দেবে, আরো কত কি দেবার প্রতিশ্রুতি জানাবে। ওরা আসলে হ'লো গুপ্তচর। আমাদের কি রকম শক্তি তাই জানতে এসেছে। ওদের ছেড়ে দেওয়া কি উচিত হবে? না, তা হ'তেই পারে না। আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হ'লো ওদের মাথার চামড়া খুলে নেওয়া। একজন সর্দ্দারের গায়ে ওরা হাত তুলেছে! ওদের মালপত্র সব আমরা বাজেয়াপ্ত করবো।"

যারা মাহ্‌তাওয়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলো মালপত্রের লোভে এখন তারাও বেঁকে দাঁড়ালো। কিন্তু তাদের কোনো কথা বলবার সময় না দিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে জো বলে উঠলো, "মাহ্‌তাওয়া কে? ও কি বড় সর্দ্দার?" বলে ঘৃণিত দৃষ্টিতে সে মাহ্‌তাওয়ার দিকে তাকালো।

"ঠিক, ঠিক।"

তখন রেড্‌-ইণ্ডিয়ানরা তাদের সান্‌-ইত্‌-সা-রিশের কাছে নিয়ে গেলো। সর্দ্দারের সামান্য ইঙ্গিত মাত্র পেলেই যে রেড্‌ ইণ্ডিয়ানরা তাদের ওপরে লাফিয়ে পড়বে, এ খবর জো'র বেশ ভাল করেই জানা ছিলো। তাই যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করে সে সর্দ্দারের সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। অনেকক্ষণ পরে সর্দ্দারের মন টললো। সে হেন্‌রিকে মুক্ত ক'রে দিতে এবং রাইফেলটা ফিরিয়ে দিতে হুকুম দিলো।

সেদিন সন্ধ্যায় তিন বন্ধুতে অনেকক্ষণ ধরে পরামর্শ চললো। এখান থেকে অবিলম্বে পালাতে না পারলে যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এ বিষয়ে কারো সন্দেহ রইলো না। কিন্তু এখন কথা হ'লো, কি ভাবে পালানো যায়। ওদের চলাফেরার ওপরে অবশ্য কেউ কোন লক্ষ্য রাখছিলো না, কিন্তু ওদের ঘোড়া ছিলে একজন রেড ইণ্ডিয়ানের জিম্মায়। ঘোড়া আর মালপত্র না নিয়ে যে ওরা পালাতে পারবে না এ তারা ভালো ক'রেই জানতো এবং সেইজন্য ওদের নিজেদের ইচ্ছামত চলা-ফেরায় বাধা দেয় নি।

অনেক চিন্তা ক'রেও ওরা কোনো উপায় উদ্ভাবন করতে পারলো না। শেষ পর্য্যন্ত ডিক বললো, "আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। এসো আমার সঙ্গে, বলছি।"

ডিকের সঙ্গে ওরা হ্রদের তীরে গিয়ে বসলো। ডিক তার মতলবটা সকলকে জানাতেই ওরা তার সমর্থন করলো। তখন তারা একটা ক্যানো (ডিঙ্গির মত নৌকো) খুলে নিয়ে ক্রুসোকে সঙ্গে ক'রে বেয়ে চললো। অপর পারে এসে ওরা ক্যানো থেকে নামলো, তারপর ঝোপজঙ্গল ভেদ ক'রে হ্রদ আর মাঠের মাঝামাঝি এক স্থানে এসে বড় বড় গাছের আড়ালে একটা জায়গা বেছে নিলো। চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখলো, কেউ অনুসরণ করছে কিনা। তারপর জায়গাটা ভালো করে পরীক্ষা ক'রে নিয়ে ডিক বললো, "হাঁ, ঠিক হবে। আয় তো ক্রুসো!"

ডিকের আহ্বানে ক্রুসো একলাফে এসে হাজির।

"জায়গাটা চিনে রাখ্, শুঁকে রাখ ভালো ক'রে।"

জায়গাটার ওপর বার দুই ঘুরপাক খেয়ে ক্রুসো কয়েক বার আঘ্রাণ নিলো।

"ব্যস্ ব্যস্। ঠিক হয়েছে। চলো এবার কেল্লা যাক।"

"কিন্তু ডিক, আমরা কি ক্রুসোর উপর এতটা নির্ভর করতে পারবো?" হেন্‌রির কণ্ঠস্বরে সন্দেহ প্রকাশ পেলো।

"বেশ তো, তার পরীক্ষা চাও?" ব'লে ওখান থেকে বেশ কিছু দূরে চ'লে এসে একটা দস্তানা মাটিতে ফেলে দিয়ে ডিক ক্রুসোকে বললো, "এটা ওখানে নিয়ে যা তো!"

হুকুম তামিল করতে ক্রুসোর এক মুহূর্ত্তও সময় লাগলো না। ফিরে এসে ল্যাজ নাড়তে লাগলো সে।

"যা, আবার ওটা নিয়ে আয়।"

সঙ্গে সঙ্গে ডিকের দস্তানা তার হাতে এসে হাজির। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে ডিক বললো, "এবার হ'লো তো?"

"সত্যি ডিক, ক্রুসোর ওজনের সোনা দিলেও ওর উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হয় না।"—জো বললো।

"কুকুর নয় হে, কুকুর নয়; ক্রুসো মানুষ।"—হেনরি বললে। একমাত্র রাইফেল ছোঁড়া ভিন্ন এমন কোনো কাজ নেই ও পারে না!"

এতক্ষণে ওরা হ্রদ পার হয়ে ফিরে এসেছে। "এইবার, জো, তোমার কাজ। ঐ যে স্ত্রীলোকটি ব'সে রয়েছে, ওর ছেলেকেই ক্রুসো সেদিন জল থেকে উদ্ধার করেছিলো। আমাদের ঘোড়াগুলো ওরই স্বামীর তত্ত্বাবধানে রয়েছে। ওকে বুঝিয়ে ব'লে কাজ আদায় করার ভার তোমার।"

"বেশ, তাই হবে।"

ডিক আর হেন্‌রি তাঁবুর দিকে ফিরলো, আর জো অগ্রসর হ'লো স্ত্রীলোকটির দিকে। কাছে গিয়ে বললো, "পনি স্ত্রীলোকটি কি তার ছেলেকে ফিরে পাবার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছে?"

"হ্যাঁ, দিয়েছে। এবং ফ্যাকাশে-মুখোদের কাছেও সে কৃতজ্ঞ।"

কিছুক্ষণ চুপ্ ক'রে থেকে জো বললো, "পনি-সর্দ্দাররা ফ্যাকাশে-মুখোদের ভালোবাসে না; তাদের কয়েকজন তো তাদের ঘৃণাই করে!"

"কালো ফুল তা জানে, এবং সেজন্য সে দুঃখিত। সম্ভব হলে সে তাদের সাহায্য ক'রতে প্রস্তুত।" নিম্নস্বরে কথাগুলো ব'লে স্ত্রীলোকটি চকিতদৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো।

জো ইতস্ততঃ করতে লাগলো। মেয়েটিকে বিশ্বাসযোগ্য ব'লেই মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে সে সতর্ক ভাবে বললো, "কালো ফুলের কাছে যদি ফ্যাকাশে-মুখো মন খুলে কথা বলে তা হ'লে কি সে ফ্যাকাশে-মুখোকে সাহায্য করবে? তাতে কিন্তু তার দেশের লোকেরা তার ওপরে বিরূপ হবে।"

"ফ্যাকাশে-মুখোদের সাহায্য করতে কালো ফুল কোনো বাধাই মানবে না।"

কথাবার্ত্তায় সহজ স্বর এনে এবারে জো ফিসফিস ক'রে তাদের মতলব জানালো। শেষ

পর্য্যন্ত ঠিক হলো, কোনো দিন, কোনো নির্দ্দিষ্ট সময়ে মেয়েটি ঘোড়া চারটে নিয়ে হ্রদের অপর পারে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে রেখে আসবে। পাছে কেউ সন্দেহ করে তাই সে যাবার আগে ব'লে যাবে যে সে জ্বালানি কাঠের সন্ধানে যাচ্ছে। শিকারীরা না আসা পর্য্যন্ত সে অপেক্ষা করবে তাদের জন্য।

তখন জো নিশ্চিন্ত মনে শিবিরে ফিরে বন্ধুদের কাছে খবরটা জানিয়ে দিল।

(ক্রমশঃ)

শ্বেতপাথরের দেশে

শ্রীঅরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ, বি. এল্

জব্বলপুর বেড়াতে এসে কয়েকজন সঙ্গী সমেত নর্ম্মদার মর্ম্মরশৈল দেখতে এসেছি এবং একটি বিশ্রামগৃহে আশ্রয় নিয়েছি সে কথা তোমাদের এর আগের বারে বলেছি। বাংলোর চাপরাশীটি অনেক সাহেব-সুবোর তদারক করে বেশ চট্‌পটে, স্বভাবটিও ভদ্র; লর্ড মাউন্টব্যাটেন থেকে আরম্ভ করে 'সরকার', 'জী' ইত্যাদি নানা পর্য্যায়ের 'আদমীকে' পরিচর্য্যা করে অভিজ্ঞ। আগে তার বাপ ছিল ওখানকার চৌকিদার; সেও 'রিটায়ার' করে ওখানেই বসবাস করছে। শোনা গেল মন্ত্রীরা বা বড়লাট গেলে তাদের অর্থপ্রাপ্তি না হয়ে খাটুনিই বেশী হ'ত, কাজেই সেদিক্ দিয়ে বড়লাটের চেয়ে আমরা তাদের কাছে কিছু কম পছন্দের অভ্যাগত নই।

দল বেঁধে সহস্রযোগিনী মন্দির দেখে স্নান করতে গেলাম নর্ম্মদার প্রপাতে।

প্রপ্রাতটি প্রকাণ্ড না হলেও অতি সুন্দর—এবং "ধোঁয়াধার" নামে অভিহিত। কারণ প্রপাতের জল জোরে পড়ার দরুণ বিন্দু বিন্দু জল, সাধু ভাষায় যাকে বলে "শীকর-কণা", আকাশে লাফিয়ে উঠছে,—ধোঁয়ার আকারে। চমৎকার রোদে ওই প্রপাতেরই একটি শাখা-প্রপাতের জলে দল বেঁধে স্নান হ'ল। তাতে যে কি আনন্দ তা প্রকাশ করা কঠিন। দ্বিপ্রাহরিক রামপাখী ভোজনের পর আমরা পাহাড় ধরে নামতে সুরু করলাম মার্ব্বল রকের দিকে। পথে দেখা গেল স্তূপীকৃত সাদা সোপষ্টোনের গুঁড়ো, বোধ হয় ভবিষ্যতে পাউডারের আকৃতি নেবে সভ্য সহরে ব্যবহারের জন্য। খানিকটা নামার পর দেখা গেল পাথরের গায়ে মৌচাক।

নাগপুরের একটি দৃশ্য

আমাদের দলের একজন ছেলেবেলার ঢিল ছোঁড়ার অভ্যাস এখনও ছাড়তে না পারায় তাঁকে রীতিমত ধমক দিতে হ'ল,—সিগারেটওয়ালাদেরও শাসন করতে হ'ল। কারণ ১৮৫১ সালে একজন ইংরেজ এক্জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার এখানে এসে ঐ রকম করায় মৌমাছিদের আক্রমণের ফলে নাকি নর্ম্মদার জলে জীবন ত্যাগ করেন। ওপরে তাঁর সমাধিও রয়েছে।

নর্ম্মদার জলের ধারে সাদা ও কালো পাথর—স্লেট জাতীয়—গায়ে দিব্যি লেখা যায়। ওখানে একটি সাধু রয়েছেন একাকী, এবং সামান্য একটু জমি চাষ করাও চল্‌ছে দেখ্‌লাম। এবারে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে ঢিল ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা হ'ল এবং পূর্ব্বকথিত ভদ্রলোক দিব্যি নর্ম্মদা পার করে ওদিকের পাহাড়ে ঢিলের

ঠক্ শব্দ শোনালেন। ওখানেও কিন্তু সেরা শ্বেতপাথর দেখা হ'ল না, তার জন্য সন্ধ্যার পর চাঁদনী রাতে নর্ম্মদায় নৌকো করে আমরা বেরোলাম। প্রথমটায় দেখছি আর বলছি, "ওঃ, এই!"—কিন্তু তারপর নর্ম্মদা হয়ে এল অত্যন্ত সরু। দু'ধারে ঘনসন্নিবিষ্ট শুভ্র পাহাড়। চাঁদের আলোয় তার যে কী অপূর্ব্ব শোভা চোখে পড়ল, তা আর কি বল্‌ব। তারই আশেপাশের কম-সফেদ পাথরের সাথে খানিকটা জায়গায় শ্বেতমর্ম্মরের রং এর তফাৎ চোখ জুড়িয়ে দেয়। তারপর যেখানে পূর্ব্বকথিত সাধুর আড্ডা সে জায়গাটি পর্য্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এলাম। আবার সেই দু'ধারের ধবল পাথর দেখে 'দিল্ একদম খুস্-ভরপুর।' প্রকৃতির এ দৃশ্যের সঙ্গে মানুষের তৈরি কিছুরই তুলনা হয় না।

পরদিন গাছের পাড়া আতা ও শ্বেতপাথর ইত্যাদির একটি ঝুড়ি বহন করলেন প্রধানতঃ আমাদের দলের ওয়েট লিফটিং চ্যাম্পিয়ন শ্রীননী ঘোষ। ৩ মাইল হেঁটে ষ্টেশন, সেখান থেকে প্রত্যাবর্ত্তন—জব্বলপুর হোটেলে।

এর পর দল ভেঙ্গে পড়ল। আমি একদিন গেলাম বিকেলে মদনমহলে রাণী দুর্গাবতীর দুর্গ দেখতে। পাহাড়ের গায়ে একটি খুব বড় পাথরের উপর অবস্থিত দুর্গ—জান্‌লা দিয়ে দূরে দেখা যায় জব্বলপুর, এবং অন্য দিকে ঢেলা ঢেলা পাথরে ভরা রুক্ষ ভূমি ও পাহাড়। মানস-চোখে যেন আবার দেখতে পেলাম মহারাষ্ট্রীয় সেনানীর গিরি-অভিযান,—কল্পনায় যেন শুনতে পেলাম মহারাষ্ট্রীয় ঘোড়সওয়ারের খটাখট্ অশ্বক্ষুরধ্বনি! ওখানে অন্দরমহলের ভগ্নাবশেষ ও প্রসিদ্ধ "ব্যালান্সিং রক্" চোখে পড়ল। একটি পাথরের উপর আর একটি বড় পাথর অদ্ভুত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও এ পর্য্যন্ত কেউ নাড়াতে পারে নি।

সময় কম, কাজেই অন্যান্য দ্রষ্টব্য ক'টি তাড়াতাড়ি শেষ করে নাগপুর রওনা হলাম ১৭০ মাইল এক্সপ্রেস্ বাসে। সরকারী বাস্—মাথা পর্য্যন্ত গদি। কাজেই আরাম করে সেই "লোকবাহকে" (ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট) মনোরম গিরিশোভা, ক্ষেত-শোভা ও কমলালেবুর বাগান দেখ্‌তে দেখ্‌তে উঁচু-নীচু বেড়িয়ে পৌঁছে-গেলাম নাগপুর।

নাগপুর ধোঁয়াটে সহর, মিলে ভর্ত্তি। সাইকেল-রিক্সা প্রচুর। ভোঁসলার স্মৃতিচিহ্ন প্রায় নেই-ই—সেদিক্ দিয়ে মন তৃপ্ত হয় না। তা ছাড়া যখন জন পনেরো স্থানীয় লোককে ভোঁসলার নাম পর্য্যন্ত জানতে দেখলাম না তখন কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যচ্যুতি হয়েছিল। ভোঁসলার মহাল সহরের ভেতর অতি সাধারণ জমিদার-বাড়ীর মত

মনে হ'ল। খোঁজখবর করে ভোঁসলার গৃহ, মন্দির ও জলাশয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গেলাম 'সকরধারা' কথিত সহরের খানিকটা দূরে। সেখানে মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহ্য বেশী কিছু চোখে ঠেকল না—কিন্তু যখন দেউড়ি দিয়ে বেরিয়ে আস্‌ছি তখন কয়েকটি মুসলমান বৃদ্ধ ওখানকার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য আমাকে আদেশ করল। আমি ভেতরে গিয়ে দেখি জনৈকা বৃদ্ধা (পরিচয় হল "আম্মা" বলে) ধূপ দিচ্ছেন। তাঁর ইংরেজি প্রশ্নে আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ এবং সব ধর্ম্মই যে গোড়ায় এক এই উদারনৈতিক মতবাদ শুনে রুটি প্রসাদ দিলেন। খবরের কাগজে মুড়ে আমি সেই প্রসাদকে আজও সুরক্ষিত করে রেখে দিয়েছি। এ ছাড়া পীরের বসবার জায়গা এ সবও দৃষ্ট হ'ল। মাহলাটি কিন্তু বুদ্ধিমতী। বলা বাহুল্য আমাদের মন্দিরের মত এখানেও কিছু ভক্তির মাশুল দিয়ে এলাম।

নাগপুরে মহারাজ-বাগ (চিড়িয়াখানা সমেত বাগান) যাদুঘর, সিভিল্ লাইন্‌স্, আন্নামান্নী জলের ট্যাঙ্ক ও সুবৃহৎ মেডিক্যাল কলেজ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সকাল ৮টা নাগাদ বাসে রওনা হলাম রামটেক্; পৌঁছলাম ১০টা নাগাদ। রামটেক নাগপুর থেকে ২৬ মাইল প্রায় দূরে। ট্রেনেও সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসা যায়। নাগপুরে আসার সময় হায়দরাবাদ-প্রবাসী একটি এঞ্জিনীয়ার যুবকের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় ভদ্রলোক (বিনায়ক পোহালকার) তাঁর মাতামহ অবসর-প্রাপ্ত জজ্ দাদাসাহেবের ওখানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাকে পরিচয়-পত্র দিয়েছিলেন। রামটেকে গিয়ে তাঁর দরজায় হানা দিলাম। ভেতরে গিয়ে দেখি তিনি পূজো করছেন—খালি গায়ে অতি খাটো ধুতি পরে। বয়স ৭৬ মত হবে। আমাকে 'রোটি' খেয়ে তাঁর নিজের সাথেই যাওয়ার কথা বলতে আমি তখন রুটি আহারে নিবৃত্ত হলাম। বৃদ্ধ তখন একটি ম্যাট্রিক ক্লাসের নাতি জোগাড় করে আমার গাইড্ ঠিক করে দিলেন। ছেলেটি ভাল,—নাগপুর ছাড়া আর কোনও সহর দেখে নি, বোলচাল্ কলকাতার ছেলেদের মত শেখেন নি বটে. কিন্তু ভেতরটা বেশ খাঁটি আছে মনে হ'ল।

টঙ্গা যোগে ওখান থেকে মাইল চারেক দূরে খিন্‌সী ট্যাঙ্কে গেলাম। সেখানকার দৃশ্য খুব নয়নাভিরাম। নদীর জলকে বেঁধেছে দু'দিকে পাহাড়-শ্রেণী; সেই জল খাল দিয়ে বয়ে দু'দিকের ক্ষেতকে উর্ব্বর করছে। ফুরফুর করে হাওয়া আর পহাড়ের মাঝে অমন লেক্—দল থাকলে খাসা বনভোজন করা যায়। টঙ্গার ঘোড়ার পক্ষে অবশ্য ওই চড়াই ওঠা খুব আনন্দকর নয়—যদিও দু'দিকে অনেক পাহাড়-জঙ্গল এবং মনোহারী দৃশ্য রয়েছে। ফেরৎ পথে নাগার্জ্জুন

মন্দির থেকে কিছু দূরে টঙ্গা থাম্‌ল। আমরা আধ মাইল মত হেঁটে গিয়ে তারপর অত্যন্ত খাড়া সিঁড়ি দিয়ে (৫০০ ধাপ মত হবে) নাগার্জুন মন্দিরের ওপরে উঠে দেখি কড়া রোদে, বেশ "আতপে তাপিত" হয়েছি। তা ছাড়া জুতো সমেত পা দু'টোও জো লুইয়ের মত 'হেভি ওয়েট' ঠেকছিল। পূজারী কমণ্ডলুতে জল আহরণ করে বেঁকে বেঁকে উঠ্‌ছিলেন ওপরে—কিছু বিভূতিও দিলেন কপালে। দূরে পাহাড়শীর্ষে রামজীর মন্দিরও দেখা যাচ্ছিল।

ওখান থেকে নেমে যে ক্লান্তি এসেছিল তা কিন্তু ওখানকার শীতল হাওয়াই যেন উড়িয়ে নিল। আমরা চল্‌লাম অম্বরা জলাশয়ের দিকে। সেখানে সেই দীঘির গায়ে মন্দির, পাশে ছোট ছোট দোকান। একটি করে আতা এবং লোটার ঠাণ্ডা পানি পান করে রামজীর মন্দিরে যাবার জন্য আবার যেন নতুন করে উৎসাহ পেলাম। রামজীর মন্দির বেশ উঁচুতে কিন্তু অম্বরা দিয়ে সিঁড়ি ধীরে ধীরে উঠেছে, কাজেই অসুবিধা কম। শ্রীরামচন্দ্রের সেবক অমর মহাবীরেরা আমাদের অভ্যর্থনা করল। কিন্তু হাজার হলেও ওয়ার্দ্ধার সেবাশ্রম তো কাছাকাছিই কাজেই উভয় পক্ষই অহিংস ভাব দেখানোতে শান্তিপূর্ণ ভাবেই ওপরে পৌঁছে গেলাম। সেখানে রামজী, লছ্‌মনজী, সীতা, কৌশল্যা, মহাবীর ও দশরথের মূর্ত্তি ও মন্দির দর্শন করা গেল। রামজীর মন্দির পাহাড়ের ঠিক প্রান্তে ও শীর্ষে থাকায় অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে। নাগপুর থেকে ট্রেনে কল্‌কাতা রওনা হয়েও রামজীর মন্দির অন্য প্যাসেঞ্জারদের দেখিয়েছি। খানিকটা দুর্গের মত দেখ্‌তে, উঁচু দেওয়ালে ঢাকা।

ফেরার সময় সিঁড়ি পেলাম অনেক খাড়া—কিন্তু নামবার সময় তো তাতে পোয়া "বারো। ২॥টা নাগাদ হানা দিলাম দাদাসাহেবের গৃহে। সেখানে দাদাসাহেব টুল, কাপড়-কাচা সাবান, তোয়ালে, লোটায় পানি নিজে হাতে এনে দিলেন। তারপর তদীয় পত্নীর (মহারাষ্ট্রীয় পোষাকে অতীব সাদাসিধে মহিলা) সাথে বৃদ্ধের ঘুস্‌ঘাস্ আলোচনা। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি খাব। আমি বল্‌লাম 'যো আপ্ দেগা।' তখন তিনি ব্যাপারটা ফাঁস করলেন। তাঁরা দু'জনে ভাবছিলেন যে হয়ত আমি এমনই সৎ ব্রাহ্মণ যে স্বপাক ছাড়া কারও খাদ্য স্পর্শও না করতে পারি।

ছাড়পত্র পেয়ে জজ-গিন্নী পাথরের বাসনে ভাত, গঙ্গার বড় সংস্করণ (একটু ঝাল, একটু মিষ্টি) একরকম রুটি, ডাল, এক বাটি দহি ও পরিশেষে লাড্ডু দিয়ে এবং লোটা গেলাসে জল খাবার ব্যবস্থা করলেন। এমন খাঁটি ভারতীয়

পোষাক, ব্যবহার, আচার আজকাল তো আর দেখি না। আর বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার অতিথিপরায়ণতাও অনুভব করেছিলাম খুব। বৃদ্ধা অবশ্য ওরই এক ফাঁকে তাঁর নাতির খবর নিলেন এবং ফের আমাকে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন।

তারপর বৃদ্ধ মাথায় সাদা টুপি পরে খালি পায়ে আমাকে পৌঁছে দিলেন বাস্ আফিসে, যেখানে তাঁর ছেলে কাজ করে।

রামটেক ভাল লেগেছিল তার সুন্দর প্রকৃতিক দৃশ্যে, কিন্তু তারও বেশী একটি মহারাষ্ট্রীয় পরিবারের খাঁটি প্রাচ্য জীবনধারা দেখে ও হৃদয়বৃত্তির পরিচয় পেয়ে।

ছাপার জন্মকথা

শ্রীকল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে মুদ্রাযন্ত্র বা ছাপাখানার দান যে কত বড় তা বোধ হয় কল্পনা করাও কষ্টকর। কাজেই এই ছাপাখানার জন্মকথা সম্বন্ধে সকলেরই কৌতুহল জাগা স্বাভাবিক। যত দুর জানা গেছে, মুদ্রাযন্ত্রের আদি জন্মস্থান হ'লো চীনদেশ। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চীনে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। তবে তখন কাঠ খোদাই করে মুদ্রাংকন কার্য সম্পন্ন হ'তো। ফেঙ্ টাও নামে একজন রাজনৈতিক কর্মী সর্বপ্রথম এই মুদ্রণপদ্ধতি আবিষ্কার করেন। বিখ্যাত আবিষ্কারক এবং ঐতিহাসিক স্যর অরেলষ্টাইন মধ্য এসিয়ার মরুভূমির তলা থেকে যে সব মুদ্রিত চীনা কাগজ পান তার মধ্যে প্রাচীনতম যেটি সেটি হ'লো ৮৬৮ খৃষ্টাব্দের। এ কাগজটি যোল ফুট লম্বা। এটীতে মুদ্রিত আছে কতকগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের সূত্র এবং একটি ছবি। বিশেষজ্ঞেরা এবং গবেষকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে অন্ততঃ একশতাব্দী কাল খাটবার পরে চীনারা মুদ্রণ বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেছিল।

গুটেনবার্গ

এ ছাড়া, জাপানের প্রাচীন ইতিহাসের এক জায়গায় ৭৭০ খৃষ্টাব্দে চীন থেকে দশ লক্ষ

মুদ্রিত মন্ত্র আসার উল্লেখ আছে। এই সব মন্ত্র ছোট ছোট কাগজে ছাপান হ'তো। ঐ সময়কার এই ধরণের মন্ত্র-ছাপান একখানি কাগজ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাসে প্রথম মুদ্রিত কাগজ হিসেবে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

য়ুরোপে কিন্তু অনেকদিন পরে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে। সে প্রায় চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। তবে বর্তমানে যাঁকে মুদ্রাযন্ত্রের এবং মুদ্রণরীতির আদি পিতা বলে স্বীকৃতি জানান হয় সেই গুটেনবার্গের জন্মস্থান য়ুরোপে এবং ওদেশে তিনিই সর্বপ্রথম ধাতুনির্মিত টাইপ প্রবর্তন করে বই ছাপান।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গুটেনবার্গ টাইপের সাহায্যে মুদ্রণকার্য সম্পাদন করবার অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেন বটে, কিন্তু তাঁর এত টাকাপয়সা ছিল না যার দ্বারা তিনি ছাপার কল, টাইপ ইত্যাদি তৈরী করতে পারেন। তাই তিনি ফাউস্ট নামে এক স্যাকরার কাছ থেকে টাকা ধার করে পিটার স্কঙার নামে একজন ভালো কারিগরকে দিয়ে ছাঁচে তৈরী করে ধাতুনির্মিত টাইপ তৈরী করালেন এবং এই টাইপেই ছাপা হ'লো ল্যাটিন ভাষায় বাইবেল। এই বাইবেলই য়ুরোপের সর্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।

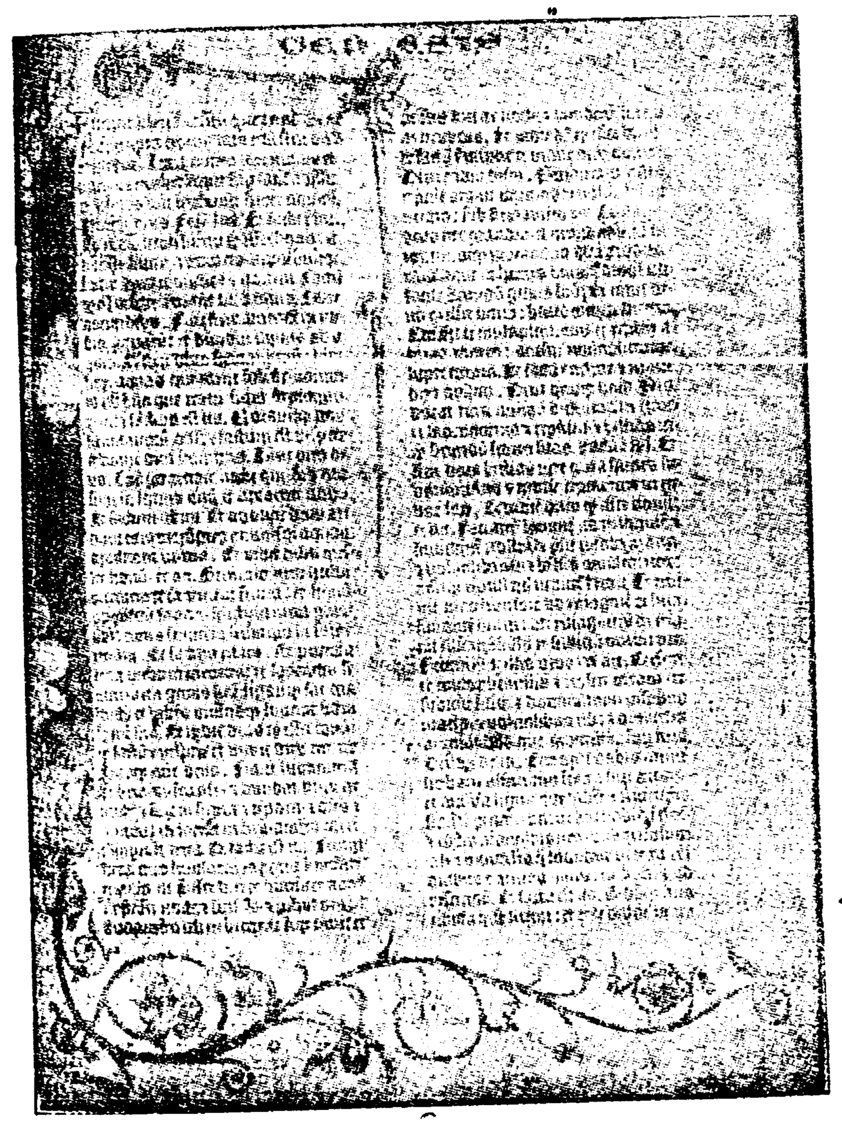

গুটেনবার্গের ছাপা সর্বপ্রথম মুদ্রিত বইএর একখানি পাতা

কিন্তু যিনি এই মুদ্রাযন্ত্রের ও মুদ্রণরীতির আবিষ্কর্তা এবং প্রবর্তক সেই গুটেনবার্গ অদৃষ্টের পরিহাসে জীবিত অবস্থায় তাঁর পরিশ্রমের কিছুই মুল্য পান নি। ধুর্ত ফাউস্ট তাঁকে যে টাকা ধার দিয়েছিল, তাঁর অসময়ে এসে সে টাকা চাইলো। কিন্তু গুটেনবার্গের হাতে তখন কিছুই ছিল না, কাজেই ঋণের সর্তানুযায়ী তাঁকে তাঁর সমস্ত ছাপাখানা ফাউষ্টকে দিয়ে দিতে হ'লো।

গুটেনবার্গের এ ধরণের বিপদ্‌কালে অবশ্যি ডক্তার হোমারী বলে একজন সদাশয় লোক নতুন একটা ছাপাখানা খোলার জন্য কিছু টাকা ধার দিয়েছিলেন, কিন্তু সে টাকা এত অল্প ছিল যে তার দ্বারা নতুন একটা ছাপাখানা খোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। হতভাগ্য গুটেনবার্গ ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারী লোকচক্ষুর অন্তরালে অনাদৃত অবস্থায় একাকী পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন, কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত মুদ্রাযন্ত্র ও মুদ্রণরীতি তাঁর পবিত্র স্মৃতি বহন করে আজ সারা পৃথিবীতে প্রচলিত।

এই হ'লো মুদ্রাযন্ত্রের ও মুদ্রণরীতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এইবার ভারতবর্ষে কি করে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হ'লো সে কথা বলি।

তখন ১৪৯৭ সাল। পর্তুগীজরা এদেশে সবে পদার্পণ করেছে, আর তাদের সংগে এসেছে দু'টো মুদ্রাযন্ত্র। পর্তুগীজরা যে অঞ্চলে ডেরা বাঁধলো সেই গোয়া অঞ্চলেই মুদ্রাযন্ত্র দু'টো স্থাপিত হয়। এদের মধ্যে একটি যন্ত্র থেকে পর্তুগীজ ভাষায় রোমান হরফে খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে একটি বই ছাপান হয় এবং ভারতবর্ষে এটিই প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।

ভারতীয় ভাষায় তখনো পর্যন্ত কোন বই ছাপান হয়নি। ভারতীয় ভাষায় প্রথম বই ছাপান হয় কোচীনে। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মালয়ালাম-তামিল ভাষায় একটি বই ছাপান হয়। বইটির নাম—"ক্রীষ্ট্যবন্নকনম্"—"ক্রিশ্চিয়ান ডক্‌ট্রিন" নামক বই-এর অনুবাদ। অনুবাদক জন গোনসালভেজ নামে একজন স্প্যানিশ পাদ্রী।

বাংলা দেশে হুগলী শহরে সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের ভাষাশিক্ষার সুবিধার জন্য হ্যাল্‌হেড নামে কোম্পানীরই একজন কর্মচারী সর্বপ্রথম "এ গ্রামার অব্ দি বেঙ্গলী ল্যাংগোয়েজ্" নামে ইংরাজিতে একখানি বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে তা ছাপান। এই বইএর অক্ষর তৈরী করেন উইলকিন্স নামে কোম্পানীর অপর এক কর্মচারী। এই উইলকিন্স আবার বাংলা মুদ্রণ-অক্ষরেরও স্রষ্টিকর্তা। ইনি নিজ হাতে কেটে বাংলার এক সেট হরফ তৈরী করেছিলেন এবং এই হরফ তৈরী করার প্রণালী শিখিয়ে দিয়েছিলেন দু'জন এ দেশী কারিকরকে। তারা হচ্ছে পঞ্চানন ও মনোহর কর্মকার, শ্রীরামপুরের অধিবাসী।

পরে শ্রীরামপুরে যখন উইলিয়ম কেরী প্রমুখ মিশনরীদের চেষ্টায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয় তখন তার অক্ষর তৈরী করে দিতেন এই পঞ্চানন ও মনোহর। বলা বাহুল্য, এখন যে বাংলা অক্ষর প্রচলিত, তা পঞ্চানন-মনোহরের তৈরী অক্ষরের আদর্শেই নির্মিত হয়ে থাকে। এ ভাবে আস্তে আস্তে সারা বাংলা দেশে ও ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন হয়।

পিশাচ-পুঁথির গল্প

শ্রীগৌরী দেবী

মহারাজ সাতবাহন ছিলেন মস্ত বড় রাজা, তাঁর ক্ষমতার কথা শুনে আশপাশের দশখানা রাজ্য তাঁকে সমীহ করে চলত। কিন্তু হ'লে কি হবে, রাজা মোটেই লেখাপড়া জানতেন না।

একদিন রাজা রাণীর সঙ্গে সরোবরে স্নান করছেন, স্নান করতে করতে মজা করবার জন্য তিনি জল নিয়ে রাণীর গায়ে ছিটোতে লাগলেন। রাণী ছিলেন খুব বিদুষী, তিনি ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি সংস্কৃতে বলে উঠলেন, "মোদকৈঃ পরিতাড়য়",—অর্থাৎ জল ছিটিও না। কিন্তু মূর্খ রাজা মনে করলেন তিনি বুঝি মোদক খেতে চাইছেন। তিনি পরিচারককে কয়েকটা নাড়ু (মোদক) নিয়ে আসবার হুকুম দিলেন।

মোদক দেখে তো রাণী হেসেই খুন। বললেন, "ছি ছি, মহারাজ, এই সামান্য সংস্কৃতটাও ধরতে পারলে না? মোদকৈঃ হচ্ছে—মা উদকৈঃ। উদক মানে জল, তাও জান না?"

রাণীর বিদ্রূপে রাজার মনে বড় আঘাত লাগল। তিনি ঠিক করলেন আর লোকের কাছে মুখ দেখাবেন না। মূর্খ হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে অনাহারে জীবন ত্যাগ করাও ভাল। তিনি ঘরে গিয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন।

এদিকে রাজকার্য্য বন্ধ হওয়ায় রাজ্যে নানা রকম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। মন্ত্রীরা কয়েক দিন কাজ চালাবার পর বুঝলেন, এ ভাবে চলতে পারে না। শেষে তাঁদের দু'জন,—গুণাঢ্য আর সর্ব্ববর্ম্মা, ঠিক করলেন অন্তঃপুরে গিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করবেন।

রাজা প্রথমে কোন কথাই বলতে চান না; শেষে মন্ত্রীরা অনেক অনুনয়-বিনয় করলে সব কথা খুলে বললেন। বললেন, "রাণী পর্য্যন্ত যাকে মূর্খ বলে ঠাট্টা করে তার বেঁচে থেকে লাভ? যদি কোন দিন ভাল সংস্কৃত শিখতে পারি তবেই আমি লোকসমাজে মুখ দেখাতে পারব। কিন্তু তা কি সম্ভব?"

তখন মন্ত্রী গুণাঢ্য বললেন, "মহারাজ, ভাল করে ভাষা শিখতে গেলে প্রথমেই ব্যাকরণ শিখতে হবে। বারো বছরের কম সময়ে ব্যাকরণ আয়ত্ত করা

কঠিন। তবে আমি অক্লান্ত পরিশ্রম করে আপনাকে ছ' বছরে তা শিখিয়ে দিতে পারি।"

এ কথা শুনে মন্ত্রী সর্ব্ববর্ম্মা সহাস্যে বললেন, "আপনি অদ্ভুত কথা বলছেন! মহারাজের মত সুখী লোকের পক্ষে ছ' বছর ব্যাকরণ শিখবার জন্য ব্যয় করা অসম্ভব। অত দিন কেন লাগবে, আমি ওঁকে ছ' মাসে সমস্ত ব্যাকরণ শিখিয়ে দেব প্রতিজ্ঞা করছি।"

শুনে গুণাঢ্য বললেন, "বেশ, আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, আপনি যদি তা পারেন তা হলে আমি সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং দেশজ—এই তিনটি ভাষাই এক সঙ্গে ত্যাগ করব।"

সর্ব্ববর্ম্মাও বললেন, "আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, যদি তা না পারি তবে বারো বছর কাল আপনার পাদুকা মাথায় বয়ে নিয়ে বেড়াব।"

সর্ব্ববর্ম্মা ছিলেন কুমার কার্ত্তিকেয়ের ভারী ভক্ত। বাড়ী গিয়ে তিনি একমনে কার্ত্তিকের আরাধনা সুরু করে ছিলেন—"হে দেব, আমার মুখ রক্ষা কর, আমার প্রতিজ্ঞা যেন আমি পূর্ণ করতে পারি।" কুমার কার্ত্তিকেয় ভক্তের এ আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারলেন না, তিনি এসে সর্ব্ববর্ম্মাকে একটি সহজ সূত্র বলে দিলেন—বললেন, "এর নাম কলাপ! এর সাহায্যে তুমি ছ' মাসে রাজাকে ব্যাকরণ শেখাতে পারবে।"

কলাপের সাহায্যে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্ববর্ম্মা সেই অসম্ভব কাজ সম্ভব করলেন—ছ' মাসের মধ্যে রাজা সাতবাহন সংস্কৃত ব্যাকরণে সুপণ্ডিত হয়ে উঠলেন। রাণী তো অবাক্।

এদিকে গুণাঢ্যকেও তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখতে হবে। সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং দেশজ—তিনটি ভাষাই তাঁকে ত্যাগ করতে হ'ল। কাজেই তাঁর আর কারো সঙ্গে কথা বলার উপায় রইল না। দিনের পর দিন তিনি মৌন ব্রত অবলম্বন ক'রে কাটাতে লাগলেন; শেষে এক দিন মনের দুঃখে বনে চলে গেলেন।

সেই বনে বাস করত একদল পিশাচ। গুণাঢ্য একদিন শুনলেন তারা নিজেদের মধ্যে পিশাচ ভাষায় কি সব আলোচনা করছে। তাঁর কৌতূহল হ'ল। তিনি মন দিয়ে তাদের কথা শুনতে লাগলেন। তাঁর ছিল অসম্ভব মেধা, অল্প ক্ষণের চেষ্টাতেই তিনি পিশাচদের ভাষা একটু একটু শিখে ফেললেন। এই ভাবে কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি পিশাচ ভাষা আয়ত্ত করে ফেললেন।

গুণাঢ্য বনেই রয়ে গেলেন। বনের মধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির।

তিনি সেখানে পূজো দিতে যান। একদিন গুণাঢ্য স্বপ্ন দেখলেন, দেবী বলছেন, "এই বনে কাণভূতি নামে এক পিশাচ বাস করে, তার সঙ্গে দেখা কর।" আদেশ পেয়ে গুণাঢ্য পিশাচকে খুঁজে, বার করলেন, তারপর তাকে দেবীর আদেশের কথা বললেন। কাণভূতি তাঁর মুখে পিশাচ ভাষা শুনে তো অবাক্। গুণাঢ্য তখন তাকে সব কথা খুলে বললেন। শুনে কাণভূতি বললে, "দেখুন আমিও আসলে পিশাচ নই। আমি একজন যক্ষ। কুবেরের শাপে পিশাচ হয়ে এই বনে বাস করছি। আপনাকে আমি কয়েকটি গল্প শোনাব। সেই গল্প বললেই আমার নির্ব্বাসন দণ্ড শেষ হবে, আর আপনিও আপনার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারবেন। ঐ গল্প জগতে প্রচার করলে আপনারও মুক্তি হবে।" এই বলে কাণভূতি গুণাঢ্যকে গল্প বলতে সুরু করল, গুণাঢ্যও সঙ্গে সঙ্গে পিশাচ ভাষায় সেগুলি লিখে নিতে লাগলেন। বনের ভিতর কালি পাওয়া গেল না, গুণাঢ্য নিজের রক্ত দিয়ে সে অভাব পূর্ণ করলেন। কিন্তু লেখাও কি সহজ কাজ? পূরো সাত লক্ষ শ্লোক লিখবার পর তবে সে গল্প শেষ হ'ল।

এইবার গুণাঢ্যের সমস্ত কথা মনে পড়ল। আসলে তিনিও মানুষ ন'ন—তাঁর আসল নাম মাল্যবান্। শিবের গণেদের একজন তিনি। তিনি এবং আর একজন গণ, পুষ্পদন্ত, পার্ব্বতীর শাপে মানুষ হয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। দোষটা অবশ্য ছিল পুষ্পদন্তেরই। ব্যাপারটা হয়েছিল এই: মহাদেব পার্ব্বতীকে এই গল্প বলছিলেন, আর নন্দীকে বলে দিয়েছিলেন গল্প বলার সময় যেন কেউ সেখানে না যায়। পুষ্পদন্ত নন্দীর কথা গ্রাহ্য না ক'রে লুকিয়ে সে গল্প শোনে, তার পর বাড়ী গিয়ে তার বৌ জয়াকে তা বলে। জয়া ভাবল এমন একটা গল্প দেবী পার্ব্বতীকে না বললে কেমন হয়। জয়া গিয়ে পার্ব্বতীর কাছে সে গল্প বলতেই পার্ব্বতী তো অবাক্। এই মাত্র শিব বললেন, এ গল্প তিনি ছাড়া কেউ শোনে নি অথচ জয়া জানল কি করে! শিব কি তা হলে তাঁকে ঠকালেন? পর্ব্বতী তখনই চললেন শিবের কাছে বোঝাপড়া করতে। সব শুনে শিবের কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। পুষ্পদন্তের লুকিয়ে শোনার কথা তিনি দেবীকে জানালেন। তখন দেবী রাগ করে পুষ্পদন্তকে শাপ দিলেন—"তুমি পৃথিবীতে গিয়ে মানুষ হয়ে জন্মাও।" তখন মাল্যবান্ পুষ্পদন্তের হয়ে পার্ব্বতীকে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। দেবী রেগে তাকেও শাপ দিলেন—মানুষ হয়ে জন্মাতে। তারপর অবশ্যি দেবীর রাগ পড়ে যায় এবং তিনি তাদের মুক্তির উপায় বলে দেন। কাণ-

ভূতিকে এ গল্প বললে পুষ্পদন্তের মুক্তি হবে আর কাণভূতির কাছে এ গল্প শুনে জগতে প্রচার করলে মাল্যবানের মুক্তি হবে।

এর পর মাল্যবান্ গুণাঢ্য হয়ে এবং পুষ্পদন্ত বররুচি এই নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেন। বররুচি বড় হয়ে মগধের মন্ত্রী হলেন এবং ঘটনাচক্রে কাণভূতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাকে এ গল্প শুনিয়ে মুক্তি পেলেন। এবার গুণাঢ্যের পালা। গল্পটি প্রচার করতে পারলে তিনিও শিবলোকে ফিরে যেতে পারবেন।

কিন্তু কি ভাবে প্রচার করা যায়? অনেক ভেবে গুণাঢ্য ঠিক করলেন, শ্লোকগুলি তিনি মহারাজ সাতবাহনের কাছে পাঠিয়ে দেবেন এবং অনুরোধ করবেন তিনি যাতে এগুলি প্রচারের ভার নেন।

গুণাঢ্য একজন শিষ্য দিয়ে শ্লোকগুলি রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু একেবারে সাত লক্ষ শ্লোক, তাও আবার পিশাচ ভাষায় লেখা, এবং রক্ত দিয়ে লেখা! রাজা দেখে খুসী হলেন না মোটেই; তিনি বাজে বলে সেগুলি ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন।

এর কিছুদিন পরেই রাজা কিন্তু পড়লেন অসুখে। বৈদ্য এসে পরীক্ষা করে বলল, ঐ অসুখের কারণ আর কিছু না, শুকনো মাংস। শুকনো মাংস খেয়ে খেয়ে রাজার এ অসুখ হয়েছে। তখনই ডেকে আনা হ'ল কিরাতদের, যারা ঐ সব মাংস রাজার জন্য শিকার করে আনত। তারা হাত জোড় করে বলল, "মহারাজ, আমাদের কোনো অপরাধ নেই। বনের মধ্যে একজন সাধুপুরুষ এসেছেন। তিনি প্রকাণ্ড এক অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে তার সামনে বিরাট এক পুঁথি খুলে রোজ পড়েন, আর তা থেকে একটি একটি করে পাতা, পড়া হলেই, আগুনে ফেলে দেন। কি আছে তার মধ্যে কে জানে, কিন্তু তাই শুনবার জন্যে বনের সমস্ত পশুপাখী খাওয়াদাওয়া ছেড়ে সেখানে গিয়ে বসে থাকে। ও ভাবে বসে থেকে থেকে তাদের সকলের শরীর শুকিয়ে গেছে। এই কারণেই ঐ সব পশু শিকার করে যে মাংস পাওয়া যাচ্ছে তা এমন শুকনো।

এই আশ্চর্য্য কাহিনী শুনে রাজা আর স্থির থাকতে পারলেন না, তখনই সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে সেই বনে গিয়ে হাজির হলেন। গিয়ে দেখেন, তাঁরই নিরুদ্দিষ্ট মন্ত্রী গুণাঢ্য আগুনের সামনে বসে পুঁথি পড়ছেন আর তা থেকে একটি একটি করে পাতা ছিঁড়ে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করছেন। রাজা তাড়াতাড়ি তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "এ কি কাণ্ড করছেন আপনি?"

গুণাঢ্য তখন গোড়া থেকে—পার্ব্বতীর অভিশাপ থেকে সুরু করে সমস্ত

কথা রাজাকে বললেন। শুনে রাজা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে বললেন, "যা হবার হয়েছে, এখন বাকি পুঁথিগুলি আমাকে দিয়ে দিন।"

গুণাঢ্য বললেন, "কিন্তু সাত লক্ষ শ্লোকের ছ' লক্ষই যে আমি পুড়িয়ে ফেলেছি। এক লক্ষ মাত্র বাকি আছে। যাই হোক, তাই আমি আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। শ্লোকগুলি পিশাচ ভাষায় লেখা, কিন্তু তাতে কিছু এসে যাবে না, আমার শিষ্যেরা আপনাকে তা ভাল করে বুঝিয়ে দেবে।" এই বলে তিনি পুঁথির বাকি অংশ রাজার হাতে দিয়ে দিলেন।

এই একলক্ষ শ্লোকের পুঁথির নাম দেওয়া হ'ল 'বৃহৎ কথা'। পরবর্ত্তী কালে এরই সারাংশ নিয়ে এক বিরাট গল্পের সমুদ্র তৈরী করা হ'ল—যার নাম দেওয়া হ'ল 'কথাসরিৎ সাগর'।

পেন্ ফ্রেণ্ড

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্.এস্-সি

মাননীয় চকমকি সম্পাদক সমীপেষু— কলিকাতা, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪

প্রিয় সম্পাদক মশাই, এ মাসের চকমকিতে আপনারা যে লেখনী-বন্ধু বিভাগটি বার করেছেন সেজন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অপরিচিত কারো সঙ্গে আলাপ করতে আমার এত ভালো লাগে! দয়া করে আমাকে কয়েকটি অজানা বন্ধুর ঠিকানা পাঠাবেন। বাংলা দেশের বাইরের হওয়া চাই। যেমন ধরুন পাটনার বা এলাহাবাদের বা লক্ষ্ণৌয়ের। আপনার চিঠির আশায় রইলাম। ইতি—শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বটব্যাল। (গ্রাহক নং ৩২৫২)

বাঁকীপুর ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪

পূজনীয় দাদাভাই,

আপনাকে দাদাভাই বলে সম্বোধন করছি বলে চটবেন না নিশ্চয়ই। সম্পাদকদের সাথে আত্মীয়তা পাতাতে আমার খুব ভাল লাগে। আমাদের একটি মামাবাবু ছিলেন, কিন্তু তিনি কাগজ বন্ধ করে দেওয়ায় তাঁকে আর পাচ্ছি না। তাই আমার খুব ইচ্ছে আপনি আমার দাদাভাই হ'ন। ভাল কথা, এ মাসের চকমকিতে আপনারা 'পেন ফ্রেণ্ড' বলে যে বিভাগটি খুলেছেন আমাকে তার সভ্য করে নেবেন। বাংলার বাইরে থাকি, তাই বাংগালী ছেলেদের সঙ্গে ভাব করতে খুব সাধ। সেই রকম বন্ধু চাই আমার। আর একটা মজার কথা বলে চিঠি শেষ করি। আমার একটি ছোট বোন আছে, ভারী বোকা। সে একটু একটু ইংরেজী

শিখেছে। ও ভেবেছিল, যে পেন্ মানে ব্যথা—এও সেই পেন্। ওর ধারণা—যে বন্দু মনে ব্যথা দেয় সেই হ'ল পেন্ ফ্রেণ্ড। এ নিয়ে আবার তক্ করতে চায়। যাক্, আজ এই পর্য্যন্ত। মাঝে মাঝে কিন্তু দাদাভাইকে বিরক্ত করব। ইতি—শ্রীনন্দদুলাল চট্টোরাজ। (গ্রাহক নং ৫৬০২)

এলাহাবাদ, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪

চকমকি সম্পাদক সমীপেষু,

আপনাদের পেন্-ফ্রেণ্ড বিভাগের সদস্য করে নেবেন। খুব মজার মজার বন্ধু চাই, অনেকগুলি। ইতি—বটকৃষ্ট বিশ্বাস (গ্রাহক নং ৫৬০২)

কলকাতা ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪

বন্ধুবরেষু—

তুমি আমাকে চিনবে না, আমিও তোমাকে চিনি না। কিন্তু আজ থেকে আমরা বন্ধুত্ব পাতাচ্ছি। কেমন মজার! নয়? চকমকি সম্পাদক আমার অনুরোধ মত তোমার নাম-ঠিকানা পাঠিয়েছেন আমার কাছে। আরও কয়েক জনের নাম পেয়েছি। তাদের কাছেও চিঠি দেব। তুমি কোন্ ক্লাসে পড়—বিকেলে কি কর—কি খেলতে ভালবাস, সব লিখ। জান, আমরা আসছে সপ্তাহে এখানে একটা থিয়েটার করছি। আমি সেনাপতির পার্ট নিয়েছি। আমার তলোয়ারও তৈরী হয়ে গেছে। থিয়েটার হয়ে গেলে সব খুলে লিখব। ভালবাসা জেন।

ইতি—তোমার নতুন বন্ধু গোবিন্দ বটব্যাল।

বাঁকিপুর, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪

ভাই গবিন্দ,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব মজা লাগল। আমিও বন্ধুত্ব পাতাচ্ছি। আমি কখনও বাংগলা-দেশ দেখি নি, তাই তোমাদের মত ছেলেদের চিঠি পেলে খুব ভাল লাগে। এখানে আমাদের বন্দুদের মধ্যে কিছু কিছু বাংগালী আছে—কিন্তু তারাও সব আমারই মত, বেশীর ভাগই বাংগলা দেশ দেখে নি। আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। কাল আমরা ক্লাসের ছেলেরা মিলে নদীর ওপারে পিক্‌নিক করতে যাব। তোমারও নেম্‌তন্ন রইল। হুস্ করে উড়ে চলে এস না। 'এটা কলি না হয়ে সত্য যুগ হ'লে নিশ্চয়ই পারতে, নয় কি? ইতি নতুন বন্দু নন্দদুলাল।

প্রিয় গোবিন্দ, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪, লুকারগঞ্জ, এলাহাবাদ।

তোমার চিঠি পেলাম। বন্ধু হব বৈ কি! তুমি দেখতে কি রকম জানি না। আমি সব বন্ধুদের চেহারার খবর আগে নেই। আমার একটি বন্ধু আছে তার নাম বাবুলাল। সে উঁচুতে চার ফুট, কিন্তু এরই মধ্যে তার গোঁফ বেরিয়ে গেছে। তাকে দেখলেই হাসি পাবে। আবার সত্যেন বলে বন্ধুটি খুব লম্বা-চওড়া জোয়ান। কিন্তু ও যখন হাসে তখন মাড়ি বেরিয়ে পড়ে আর সেই সঙ্গে ছাঁৎলা-পড়া দাঁত! দাঁত মাজে না কখনও। আমার আরও অনেক পেন ফ্রেণ্ড আছে আমেরিকায়, জাপানে, মিশরে, চীনে। জাপানী বন্ধুটির নাম হারাগরু। ওর ভাইএর নাম গরুচোরা। আর চীনে বন্ধুটির নাম বোচাং। যাক্ প্রথম চিঠি লম্বা লিখতে নেই। আজ উঠি, খাবার সময় হ'ল। আটে শূন্য ৮০। Eতি বটকেষ্ট।

ভাই নন্দদুলাল, কলকাতা, ১৫ই আষাঢ়, ১৩৫৫

কাল তোর চিঠি পেলাম। এক বছরের ওপর তোর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, দু'জনে দু'জনকে কত চিঠি দিয়েছি, অথচ আজ পর্য্যন্ত কেউ কাউকে দেখি নি। ভারী মজা লাগে ভাবতে। একবার কলকাতায় চলে আয় না? তোকে দোতলা বাস্ দেখিয়ে দেব, আর বাংলা সিনেমা। পরীক্ষা তো হয়ে গেছে, গরমের ছুটীতে বসে বসে কি করবি? সত্যি, চলে আয়, মুখোমুখি বসে গল্প করি দু'জনে। ইতি বন্ধু গোবিন্দ।

ভাই গবিন্দ, বাঁকিপুর, ১৮ই আষাঢ়, ১৩৫৫

তোর চিঠি পেয়ে মনের মধ্যে কত কথাই ভেসে উঠছে! বাস্তবিক আমরা এতদিনের বন্দু—দু'জনের নাড়ীনক্ষত্র চেনা হয়ে গেছে দু'জনের, অথচ মুখ চেনা হয় নি কারো! কলকাতায় যাওয়া কি আমার অসাধ? কিন্তু ভাই গবিন্দ, কোন সম্ভাবনা নেই এখন। বাড়ীতে ও কথা তুললে সিক্ উড়িয়ে দেয়, বলে সময় হলে ঠিক যাবি। ভাল কথা, তোকে একটা কথা লিখছি। লুকারগঞ্জের বটকেষ্টর সঙ্গে তোর নিশ্চয়ই আলাপ হয়েছে, মানে চিঠিতে। চকমকির সম্পাদক আমাকেও ওর ঠিকানা দিয়েছিলেন। ভারী জাঁহাবাজ ছেলে ও। পয়লা নম্বরের গুল্‌বাজ্। ও কি লিখেছে শুনলে আর ওর সঙ্গে কথা কইতে চাইবি না। তাই কিছু লিখলাম না, শুধু সাবধান করে দিলাম। ইতি বন্দু নন্দ।

বলি ওহে গোবিন্দচন্দর, এলাহাবাদ, ২৫শে আষাঢ়, ১৩৫৫

শুনলাম তোমরা খুব লায়েক হয়ে পড়েছ। চকমকি সম্পাদককে আমার নামে বোধ হয় তুমিই লাগিয়েছ। আর এও আমার ধারণা পাটনার ওই নন্দ ছোঁড়াটাই তোমার মাথা খাচ্ছে। আমাকে ও 'বটা' বলে লিখেছে। নেহাৎ বন্ধু বলেছি বলে এবার কিছু বললাম না, কিন্তু ভবিষ্যতে সাবধান করে দিচ্ছি। সাবধান সাবধান। —ইতি বটকেষ্ট।

ভাই নন্দ, কলকাতা, ১লা শ্রাবণ, ১৩৫৫

তোকে আমি সব চেয়ে প্রাণের বন্ধু ব'লে মনে করি, তাই এই সঙ্গে বটকেষ্টর সব কথা খুলে লিখলাম। জানিস, ও আমাকে কি রকম শাসিয়ে চিঠি দিয়েছে। পড়ে রাগে আমার গা কাঁপছিল। বন্ধু বন্ধু বলে চেঁচালেই বন্ধু হয় না—সত্যিকার বন্ধু ক' জন হতে পারে? দু' জনের মনে কতখানি যোগ থাকলে তা সম্ভব হয় তা কেবল তোর মত বন্ধু পেলে বোঝা যায়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সংসারে বটকেষ্টও যেমন আছে, তেমনি নন্দদুলালও এক-আধটি রয়েছে। প্রীতিসম্ভাষণ জানিস। আজ বড় তাড়াতড়ি। —তোরই গোবিন্দ।

বাঁকিপুর, ২রা শ্রাবণ, ১৩৫৫, বিকেল ৪॥টা।

অভিন্নহৃদয়েষু—

ভাই গবিন্দ, তোর চিঠিখানা পেয়ে মনে এত আনন্দ হ'ল যে তা প্রকাশ করার ভাষা নেই। আকাশ যদি কাগজ হ'ত সমুদ্র যদি কালি হ'ত আর তালগাছ যদি কলম হ'ত তা হলেও তা লিখে কুলোনো যেত না। ইস্কুলে যাবার পথে পিয়ন তোর চিঠিটা দিয়েছিল, বাড়ী এসে জামা-কাপড় না ছেড়েই জবাব লিখছি। কিছু খাই নি এখনও। ছোড়দিটা ঠাট্টা করতে

এসেছিল, তাকে ম্যায়সা এক দাবড়ি দিয়েছি যে সে রেগেমেগে বাবার কাছে নালিশ করতে গেছে। তা করুক গে, এই ফাঁকে চিঠিটা তো লিখে নিই। ওদের বন্ধুত্ব তো শুধু সাজ দেখাবার বন্ধুত্ব! জানিস, ওরা যে গল্প করে তারও বিষয়বস্তু হচ্ছে শুধু শাড়ী আর ব্লাউজ।

বটা, মানে বটকেষ্ট, (ওকে আজ কাল আমরা বটাই বলি)—ওর কথা আর বলিস না। অত বড় মর্কট দুনিয়ায় দু'টি নেই। কি মনে করে ও নিজেকে? নামেই বিশ্বাস, আসলে ওকে মোটেই বিশ্বাস করা যায় না। ভাগ্যিস তোর মত বন্দু পেয়েছিলাম, নইলে ওদের কথা ভাবলে বন্দুত্বের ওপরেই ঘেন্না ধরে যায়। আমার ১০০ × অশেষ প্রীতি নিস।

—ইতি তোর প্রাণের বন্দু নন্দদুলাল।

ভাই নন্দ, কলকাতা, ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৫৫

অনেক দিন পরে তোকে চিঠি লিখছি। বোধ হয় খুব বিরক্ত এবং দুঃখিতও হয়েছিস। কিন্তু ভাই, সব কথা শুনলে নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবি। আমি এতদিন কলকাতায় ছিলাম না, মাসতুত দিদির বিয়েতে বিষ্টুপুর গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বিয়ের হট্টগোলে চিঠি লিখবার সুযোগ পাই নি, আর পোষ্ট আফিসটাও বাড়ী থেকে এত দূরে ছিল! যাই হোক, একটা মজার ঘটনার কথা বলি। ৫ই শ্রাবণ সকালে আমরা হাওড়া থেকে বিষ্টুপুর রওনা হয়েছিলাম। বেলা দু'টোর সময় আমরা আসানসোলে পৌছলাম। কি একটা কারণে গাড়ী ছাড়তে খুব দেরী হ'ল। ঠিক ঐ সময়ে একদল লোক হৈ-হৈ করতে করতে এসে আমাদের কামরায় উঠল। গাড়ীতে এমনি বেশ ভীড় ছিল, তার ওপর এরা আসায় খুবই কষ্ট হ'ল। লোকগুলোর সঙ্গে একটা আমাদের বয়সী ছোকরা ছিল, তাকে যদি দেখতিস! ইয়া মোটকা, পেটটা নাদার মত, মুখখানা ঠিক যেন কোলা ব্যাঙ। চলেও ঠিক ব্যাঙের মত থপ্ থপ্ ক'রে। তার ওপর কথাবার্ত্তাও কইতে শেখে নি। এসেই আমার সঙ্গে জায়গা নিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে দিল। আমিও বাবা 'দর্জ্জি-পাড়ার ছেলে, ও সব পাশ্চমে ছেলেদের থোড়াই কেয়ার করি, তা কোলা ব্যাঙই হোক আর হাতীর বাচ্চাই হোক। কথায় কথায় খুব একচোট লেগে গেল। জানিস তো আমি আজকাল গুবরেদা'দের আখড়ায় বক্সিং শিখছি; আর সামলাতে পারলাম না, দিলাম ছোঁড়ার নাকের ওপর জো লুইএর একখানা রাম ঘুঁষি। কোলা ব্যাঙের থ্যাবড়া নাক থেবড়ে যেন মুখের সঙ্গে মিশে গেল। মার খেয়ে ব্যাটা কোথায় ঠাণ্ডা হবি, তা না উল্টে তেড়ে এল। তখন তাকে ধরে এইসা এক রাম পটকান্ দিলাম যে বাপ বাপ ব'লে বাছাধনকে একেবারে শুয়ে পড়তে হ'ল। ট্রেনের লোকেরা বাধা না দিলে সেদিন দেখিয়ে দিতাম কা'কে বলে দর্জ্জিপাড়ার ছেলে। শুনে মনে মনে তোরও খুব স্ফূর্ত্তি হচ্ছে নিশ্চয়ই! তুই কাছে থাকলে কি মজাটাই না হ'ত—কোলাব্যাঙের অবস্থা দেখে! আরও অনেক কথা পেটে জমা হয়ে আছে, পরের বারে লিখব। ভালবাসা নিস। ইতি তোর অভিন্নহৃদয় বন্ধু গোবিন্দ।

ভাই গবিন্দ, বাঁকিপুর, ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৫৫

অনেক দিন পরে চিঠি লিখছি। হয়তো চটছিস খুব, কিন্তু সব কথা শুনলে নিশ্চয়ই কিছু

মনে করবি না। আমি এতদিন বাঁকিপুরে ছিলাম না, এই প্রথম তোদের বাংগলা দেশে গিয়েছিলাম। অবশ্যি কলকাতায় নয়, কলকাতায় গেলে কি আর তোর সঙ্গে দেখা না করতাম! গিয়েছিলাম বাঁকড়ো, আমার পিসতুত ভাই বদনদা'র বিয়েতে বরযাত্তর। হট্টগোলে চিঠি দেবার সময় পাই নি, আর পোষ্টাপিসটাও এত দূরে ছিল বিয়েবাড়ী থেকে! যাই হোক, একটা মজার ঘটনার কথা শোন। তোদের বাংগলা দেশটা—বিশেষতঃ ওখানকার ছোঁড়াগুলো যে অমন তা জানতাম না। অবশ্যি কলকাতা বাদ।

৫ই শ্রাবণ বেলা ২টোর সময় আসানসোলে আমাদের গাড়ী বদল করতে হ'ল। গাড়ীতে উঠে দেখি ভীষণ ভীড়, লোকের ঠেলায় প্রাণ যায়। কিন্তু ওরই মধ্যে আমারই বয়সী একটা ছেলে দিব্যি পা ছড়িয়ে আরাম করে বসেছে। শুয়েছে বললেও ভুল হবে না। লম্বা টিংটিঙে চেহারা, বাংগলা ৫ দেখেছিস তো, মুখখানা হুবহু যেন একটানা বাংগলা ৫। গায়ের রং ঠিক গোসাপের মত। তার ওপর কথাবার্ত্তাও কইতে শেখে নি। বসবার জায়গা চাইতেই আমার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসল। আমিও বাবা বাঁকিপুরের ছেলে, ও সব বাংগালী-ফাংগালী থোড়াই কেয়ার করি, তা বাংগলা পাঁচই হোক আর পঞ্চাশই হোক (অবশ্যি তোর কথা বাদ)। কথায় কথায় খুব একচোট লেগে গেল। জানিস তো, আমি আবার ভজন সিংএর আখড়ায় কুশ্তি শিখছি! আর থাকতে পারলাম না, দিলাম ছোঁড়ার কানপটীতে কিং কঙের এক থাবড়া। বাংগলা পাঁচ চ্যাপটা হয়ে চম্‌চমের মত হয়ে গেল। মার খেয়ে বেটা কোথায় ঠাণ্ডা হবি তা না উল্টে তেড়ে এল। তখন তাকে ধরে এইসা এক মোগলাই প্যাচ লাগালাম যে বাছাধনকে আর খানিকক্ষণ উঠতে হ'ল না। ট্রেনের লোকেরা না থামিয়ে দিলে সেদিন দেখিয়ে দিতাম কা'কে বলে বাঁকিপুরের ছেলে। রাগ করিস না গবিন্দ, তোদের বাংগালী ছেলেগুলো একদম্ কিস্‌সু না। অবশ্যি তুই বাদে। তুই থাকলে পঞ্চুলালের অবস্থা দেখে তুইও নিশ্চয়ই হাসতিস। আরও অনেক কথা পেটে জমে আছে, পরে লিখব। ভালবাসা নিস। ইতি—

তোর অভিন্নহৃদয় বন্দু নন্দদুলাল।

চকমকি সম্পাদক সমীপেষু— এলাহাবাদ, ২১শে শ্রাবণ, ১৩৫৫

অনুগ্রহ করে এ মাস থেকে আমার নামটা আপনাদের গ্রাহক-তালিকা থেকে কেটে দেবেন। —ইতি শ্রীবটকেষ্ট বিশ্বাস (গ্রাঃ নং ৫৬০২)

সম্পাদক, চকমকি, কলিকাতা, ২১শে শ্রাবণ, ১৩৫৫

মহাশয়, অনুগ্রহ করে এ মাস থেকে আমার নামটা আপনাদের গ্রাহক-তালিকা থেকে কেটে দেবেন। —ইতি শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বটব্যাল (গ্রাহক নং ৩২৫২)

চকমকি সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু— বাঁকিপুর, ২১শে শ্রাবণ, ১৩৫৫

মহাশয়, অনুগ্রহ করে এ মাস থেকে আমার নামটা আপনাদের গ্রাহক-তালিকা থেকে কেটে দেবেন। —ইতি শ্রীনন্দদুলাল চট্টোরাজ। (গ্রাহক নং ৪৬০২)

দেখি তুমি কেমন খবর রাখ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন নীচে দেওয়া হ'ল। নিজেরা এগুলির জবাব দেবার চেষ্টা কর, তারপর পাঁচমিশেলীর শেষে দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ।

১। নীচের লাইনগুলি কোন্‌টা কার লেখা ?—

(ক) 'যদি কুমড়োর মত চালে ধ'রে র'ত পান্‌তোয়া শত শত।'

(খ) 'বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোনারূপোর নয়।'

(গ) 'ভুলু বাবু বসি পাশের ঘরেতে নামতা পড়েন উচ্চস্বরেতে।'

(ঘ) 'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।'

(ঙ) 'ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।'

(চ) 'শুয়ে শুয়ে মোরা দেখিব আকাশ—আকাশ মস্ত বড়।'

(ছ) 'বালুর ফরাস পাতা ঢালু ঐ চরটি, তারই নীচে ছায়া ঘেরা মুংরির ঘরটি।'

(জ) 'স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে।'

(ঝ) 'আমি নিতান্ত একা, একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল।'

(ঞ) 'তখন চৌদ্দ পার হইয়া পনেরয় পড়িয়াছি—আমাকে কাপুরুষ? ঝপাৎ করিয়া দাঁড় জলে ফেলিয়া প্রাণপণে টান দিলাম।'

২। এই বইগুলি কোন্‌টা কার লেখা ?—

(১) স্বর্ণলতা (২) মৃণালিনী (৩) রক্তকরবী (৪) বুড়ো আংলা (৫) ভোম্বল সর্দ্দার (৬) বৈকুণ্ঠের খাতা (৭) নূতন পুরাণ (৮) ছাড়পত্র (৯) মেঘদূতের মর্ত্ত্যে আগমন (১০) অভ্র আবীর।

৩। এই লেখকদের আসল নাম কি ?—

(ক) পরশুরাম (খ) বীরবল (গ) বনফুল (ঘ) ভানুসিংহ (ঙ) স্বপনবুড়ো (চ) ইন্দিরা দেবী (ঔপন্যাসিক) (ছ) প্র. না. বি।

৪। (ক) গুপ্তকবি, কান্তকবি, স্বভাবকবি আর পল্লীকবি বলতে সাধারণতঃ কাদেরকে বোঝায় ?

(খ) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস কোন্‌টা ?

(গ) পশ্চিম বাংলা সরকারের রবীন্দ্র-পুরস্কার পেয়েছে কোন্ কোন্ উপন্যাস ?

(ঘ) 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকার নাম প্রবাসী হ'ল কেন ?

(ঙ) কোন্ বাঙ্গালী লেখক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা না দিয়েও সম্মান-সূচক এম্. এ উপাধি পেয়েছিলেন ?—কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ?

নানা কথা

এইচ্. জি. ওয়েল্‌স্ একজন বিশ্ববিখ্যাত লেখক ও ঔপন্যাসিক। তাঁর বাড়ী ছিল ইংল্যাণ্ডে। কয়েক বছর হ'ল তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বছর ত্রিশেক আগে একবার একখানি আমেরিকান্ পত্রিকা তাঁর কাছে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় ৬ জন লোকের নাম জানতে চেয়েছিল। এইচ্. জি. ওয়েল্‌স্ এই ৬ জনের নাম করে বলেছিলেন এঁরাই, তাঁর মতে, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। নামগুলি হচ্ছে—যীশু খৃষ্ট, গৌতম বুদ্ধ, য়্যারিষ্টটল্, সম্রাট্ অশোক, রজার বেকন্ এবং আব্রাহাম লিঙ্কন। লক্ষ্য করবার জিনিষ—এই ৬ জনের মধ্যে ২ জনই, অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশই, ভারতের লোক। বাকি ক'জনের একজন ইহুদী, একজন গ্রীক, একজন ইংরেজ ও একজন আমেরিকান্।

* * * *

কতকগুলো ছোটখাট জিনিষ আছে—যাদের নতুনের চাইতে পুরোনোর দাম অনেক বেশী। যেমন পুরোনো ঘি (কবিরাজী ওষুধ হিসাবে), পুরোনো তেঁতুল। ইয়োরোপে পুরোনো মদেরও খুব দাম। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে সেই রকম হচ্ছে চীজ্ বা পনীর। এমন কি সেখানে যে পরিবারে খুব পুরোনো পনীর সংরক্ষিত থাকে তাকে খুব পুরোনো ও সম্ভ্রান্ত বংশ বলে মনে করা হয়। সেখানে অনেক পরিবারে ফরাসী বিপ্লবের সময়কার পনীরও এখন পর্য্যন্ত সংরক্ষিত আছে। বড় বড় ক্রিয়াকর্ম্মে—বিশেষ করে ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠানে ঐ পনীর ব্যবহার করা হয়।

বুলবুলির লড়াই

একশ' দেড়শ' বছর বা তারও আগে আমাদের দেশে বুলবুল পোষার খুব বাতিক ছিল। এমন কি তখনকার দিনে যুবকেরা বিকেলে যখন বেড়াতে বেরোত তখন অনেকেরই হাতে কিংবা কাঁধে একটা করে পোষা বুলবুল থাকত। এই বুলবুল-গুলি শুধু গানই করত না, লড়াইএও খুব ওস্তাদ্ ছিল। দু'টো পাখী একত্র ছেড়ে দিলেই ঘাড় ফুলিয়ে মাথা নীচু করে পরস্পর ঠোকরা-ঠুকরি সুরু করে দিত।

এই বুলবুলির লড়াই তখন এ দেশে খুব বড় একটা তামাসার ব্যাপার বলে লোকে মনে করত। কলকাতার নানা জায়গায় এই রকম লড়াইয়ের আখড়া ছিল, প্রত্যহ শত শত লোক এই লড়াই দেখবার জন্য সে সব জায়গায় জড় হ'ত। অনেক সৌখীন বড় লোক নিজেদের বাড়ীতেও এই রকম লড়াইএর আড্ডা বসাতেন। প্রচুর অর্থব্যয় হ'ত তাতে। শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা এমন বাড়াবাড়ি হয়ে ওঠে যে সেকালের কবিরা এ নিয়ে গান বেঁধেছিলেন—

"দুর্গাপূজা ঘণ্টা নেড়ে, খোকা হলে বাজে ঢাক,
কাকাতুয়া ছেড়ে দিয়ে খাঁচায় পূরলে কিনা কাক।
বিষয়কর্ম্ম গোল্লায় গেল লড়িয়ে কেবল বুলবুলি,
প্রকৃতি বিকৃতি হয়ে হায়, মারা গেল লোকগুলি।"

৪৭৪ পৃষ্ঠার প্রশ্নের উত্তর

১। (ক) রজনীকান্ত সেন (খ) দ্বিজেন্দ্রলাল (গ) রবীন্দ্রনাথ (ঘ) কালিদাস রায় (ঙ) নজরুল ইসলাম (চ) বুদ্ধদেব বসু (ছ) সুনির্মল বসু (জ) রবীন্দ্রনাথ (ঝ) বঙ্কিমচন্দ্র (ঞ) শরৎচন্দ্র। ২। (১) তারক গঙ্গোপাধ্যায় (২) বঙ্কিমচন্দ্র (৩) রবীন্দ্রনাথ (৪) অবনীন্দ্রনাথ (৫) খগেন্দ্রনাথ মিত্র (৬) রবীন্দ্রনাথ (৭) মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (৮) সুকান্ত ভট্টাচার্য্য (৯) হেমেন্দ্রকুমার রায় (১০) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ৩। (ক) রাজশেখর বসু (খ) প্রথম চৌধুরী (গ) ধলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (ঘ) রবীন্দ্রনাথ (ঙ) অখিল নিয়োগী (চ) স্বরূপা দেবী (ছ) প্রমথনাথ বিশী। ৪। (ক) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রজনীকান্ত সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, কুমুদরঞ্জন মল্লিক। (খ) দুর্গেশনন্দিনী (গ) জাগরী, ইছামতী। (ঘ) বাংলার বাইরে এলাহাবাদ থেকে প্রথম বেরোত বলে। (ঙ) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

চিঠিপত্র

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

আজ পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিনে এই চিঠি লিখতে বসেছি। আজকের দিনে তোমরাও নিশ্চয়ই তাঁকে স্মরণ করছ।

রামধনুর কাছেও আজকের দিনটি স্মরণীয়। রামধনুর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যেরও আজ জন্মদিন। তাঁর বয়স আজ ৮২ বছর পূর্ণ হ'ল। এখনও তিনি রামধনুকে তেমনি ভালবাসেন এবং মাঝে মাঝে লেখা দিয়ে উৎসাহিত করেন।

শ্রীদীপালী সেনগুপ্তা (কালাপাহাড়)—তোমার দীর্ঘ চিঠিখানি খুবই উপভোগ্য। আসামের লোকাচার বা গ্রাম্য উৎসব সম্বন্ধে এখানকার লোকেরা খুব কমই জানে। এ সম্বন্ধে ছোট ছোট প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া দরকার। আগামী বছর রামধনুর রজত-জয়ন্তী বর্ষ। তার জন্য আয়োজন নিশ্চয়ই করা হবে। মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে তুমি যে পুরোনো রামধনুর গল্পটার কথা লিখেছ সেটির রচয়িতা রামধনুর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। তাঁর রচিত "নূতন পুরাণ" বইএ গল্পটি আছে। বইটির প্রকাশক ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ (১বি, রসা রোড, কলিকাতা)। শ্রীমঞ্জুশ্রী বসু (ছাপরা)—আশা করি তোমাদের বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা এত দিনে হয়ে গেছে, এবং তুমিও খুব ভাল পরীক্ষা দিয়েছ। শ্রীঅশোক চৌধুরী (নবদ্বীপ)—তোমার ক্ষোভপূর্ণ পত্র পেয়েছি। তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করা কি আমাদের অসাধ? তবে অনেক সময় প্রতিকূল ঘটনা এসে বাধা দেয়। দেখি, আগামী বছরে কি করা যায়। তোমার চিঠিতে কিন্তু বড্ড কাটাকাটি, হাতের লেখাও আরও ভাল করবার চেষ্টা করবে। তোমার দাদামশাইএর (পূজনীয় ৺নলিনীমোহন সান্যাল) ৯২ বছর বয়সেও হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মত। সে সব চিঠি আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি। শ্রীনিবেদিতা সেন (কলিকাতা ২৯)—তোমার দাদা যে গ্রাহক থাকবেনই, তা আমি তাঁকে কি করে বারণ করি? ভাইবোনেই তোমরা এর মীমাংসা ক'রে নিও; কিংবা, তোমার দাদা রাজী হ'লে, দু'জনে একসঙ্গেও গ্রাহক থাকতে পার, তাতে কোন বাধা নেই। শ্রীঅসীম ঘোষ (পাটনা)—টেবল টেনিস সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ লিখবার ভার নিয়েছিলেন, কিন্তু সময় মত লিখতে না পারায় পত্রিকা প্রকাশে দেরী হবার ভয়ে এবারে আর ওটা দেওয়া গেল না। শ্রীঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান)—প্রতিযোগিতার লেখা নিজেকেই লিখতে হবে বৈকি, তা না হ'লে আর প্রতিযোগিতা হবে কি করে? 'ইচ্ছেমত' মানে—গদ্যে পদ্যে, গল্পে প্রবন্ধে—যেমন ইচ্ছে লেখা যাবে। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। জয় হিন্দ—ইতি

রাঃ সঃ

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

সমস্ত পাকিস্তানের তুই তৃতীয়াংশ লোকের মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা, তাই বাংলা ভাষাভাষী পাকিস্তানীরা বাংলাকে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ভাবেই পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার জন্য দাবী জানিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের বড়-কর্ত্তারা, যাঁদের অধিকাংশই পশ্চিম পাকিস্তান-বাসী, এ প্রস্তাব আমলে আনছিলেন না। সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন সাহেব ঢাকার এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দ্দু। বলা বাহুল্য বাঙ্গালীরা এ রকম গণতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা মানতে রাজী হন নি। উর্দ্দুকে তাঁরা তাচ্ছিল্য করেন নি, কিন্তু বাংলা ভাষাকেও উর্দ্দুর সঙ্গে সমান মর্য্যাদা দিতে হবে এই তাঁদের দাবী। কারণ পূর্ব্বপাকিস্তানের অধিকাংশ লোকই উর্দ্দু ভাষা বোঝেও না, সে ভাষায় কথাও বলে না। এই দাবীর প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের সহানুভূতি না পেয়ে সম্প্রতি তাই পূর্ব্ববঙ্গে প্রবল গণ-আন্দোলন সুরু হয়েছে। বিশেষ করে ছাত্রেরা এ বিষয়ে এগিয়ে এসেছে। ও পক্ষ থেকেও গুলি চলেছে এবং তাতে অনেকে নিহত হয়েছে; কিন্তু তাতে আন্দোলন বেড়েছে ছাড়া কমে নি। মাতৃভাষার মর্য্যাদা রক্ষায় পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের এই আত্মদান ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পরলোকে ন্যুট হামসান্

নরওয়ের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ন্যুট্ হামসান সম্প্রতি ৯২ বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। অত্যন্ত সাধারণ অবস্থার লোকও প্রতিভা-বলে পৃথিবীতে কত বড় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে পারেন ন্যুট হামসানের জীবনে তা দেখা গেছে। পৃথিবীর অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। যখন তিনি ঐ পুরস্কার পান তখন তিনি ছিলেন একজন ট্রামের কণ্ডাক্টার। ন্যুট হামসানের লেখা 'দি গ্রোথ্ অব্ দি সয়েল', 'হাঙ্গার', 'প্যান্' প্রভৃতি বই বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে।

স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র নন্দী

সম্প্রতি অপরিণত বয়সে কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী পরলোক গমন করেছেন। শ্রীশচন্দ্র ছিলেন বাংলার দানবীর ৺মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পুত্র। নিজেও তিনি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ধরে বাংলার নানা প্রতিষ্ঠান ও আইন সভা প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ বছর তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও সভাপতি হয়েছিলেন।

এম্. সি. সি'র শেষ খেলা

ভারত ভ্রমণ শেষ করে ফিরবার পথে ইংল্যাণ্ডের এম্. সি. সি ক্রিকেট দল সিংহলে কয়েকটি ম্যাচ্ খেলে। তার মধ্যে একটি ছিল কমনওয়েল্থের বাছাই করা দলের সঙ্গে। এই খেলাটিতে তারা শোচনীয় ভাবে ইনিংস্এ পরাজিত হয়েছে। আর একটি খেলায় সিংহল দলকে তারা ইনিংস্এ পরাজিত করেছে।

---

৪৫৩ পৃষ্ঠার ছবি

৺সুবিনয় রায়, ৺যোগীন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

পৌষ মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

সব চেয়ে ভাল ছবির জন্য পুরস্কার পেলেন—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বাগচী (কলিকাতা-৪)। আর যাঁদের ছবি ভাল হয়েছে:—শ্রীদীপালী সেনগুপ্তা (কালাপাহাড়), শ্রীনির্ম্মলেন্দু সরকার (ভাগলপুর), শ্রীমালবিকা দত্ত (করিমগঞ্জ), শ্রীসুবীর চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)।

এ মাসের নতুন পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

যদি ভারতবর্ষের বাইরে কোথাও গিয়ে তোমাকে থাকতে হয় তা হ'লে এই দেশগুলির কোনটা তুমি বেছে নেবে? এদের মধ্যে তোমার সব চেয়ে পছন্দ মত দেশটির নাম আগে লিখবে, তার পর ২য়, ৩য় এই ভাবে লিখে সব চেয়ে কম পছন্দ যেটি সেটির নাম লিখবে সকলের শেষে, অর্থাৎ ২০তম। সকলের তালিকা মিলিয়ে (ভোট নিয়ে) আমরা একটা তালিকা তৈরী করব। যার তালিকা সেই তালিকার সব চেয়ে কাছাকাছি হবে সেই পুরস্কার পাবে।

তালিকা ১৬ই চৈত্রের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌছান চাই। যে কেউ প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে কিন্তু প্রত্যেক লেখার সঙ্গেই নীচের কুপনটি কেটে পূর্ণ করে পাঠাতে হবে, নইলে তা গ্রাহ্য হবে না। দেশগুলির নাম:— ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইট্জারল্যাণ্ড, জার্ম্মেনী, ইটালি, রাশিয়া, তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান, চীন, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিশর, নরওয়ে, সুইডেন, গ্রীস।

রামধনু

নাম—

ঠিকানা—

পুঃ প্রঃ ফাঃ ৫৮

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

৮১ বছর

উত্তরদাতাদের নাম ঃ— মণ্টু, আরতি, মুক্তি, ডলি, মিনতি সিংহ (মুজঃফরপুর) ; রত্না, স্বপ্না, জয়ন্ত ও ছন্দা রায় (বাঁকীপুর) ; সলিল সেন, কাজল সেন, স্বপ্না সেন (কলিকাতা ২৯) ; অমল মিত্র, সত্য ভট্টাচার্য্য ও পানবাজার মণিমেলার মণিরা (গৌহাটী); অনিল, সুনীল, নন্দ, হাবু, বাবলু (আরাপুর—মালদহ) ; সত্যেন্দ্র মজুমদার (এলাহাবাদ) ; নিভা ও ইভা (নিউদিল্লী) ; কমলরাণী মিত্র (নাগপুর) ।

নূতন ধাঁধা

আমাদের তিন ভাইবোনের বয়স একত্র করলে আমার এখনকার বয়সের তিনগুণ হয়। আমার বয়স যখন আমার দিদির বয়সের সমান হবে তখন আমার ছোট ভাইটির বয়স আমার এখনকার বয়সের সমান হবে, আর দিদির বয়স হবে আমার ভাইএর এখনকার বয়সের দ্বিগুণ। তা হ'লে বল দেখি আমাদের কার বয়স কত ?

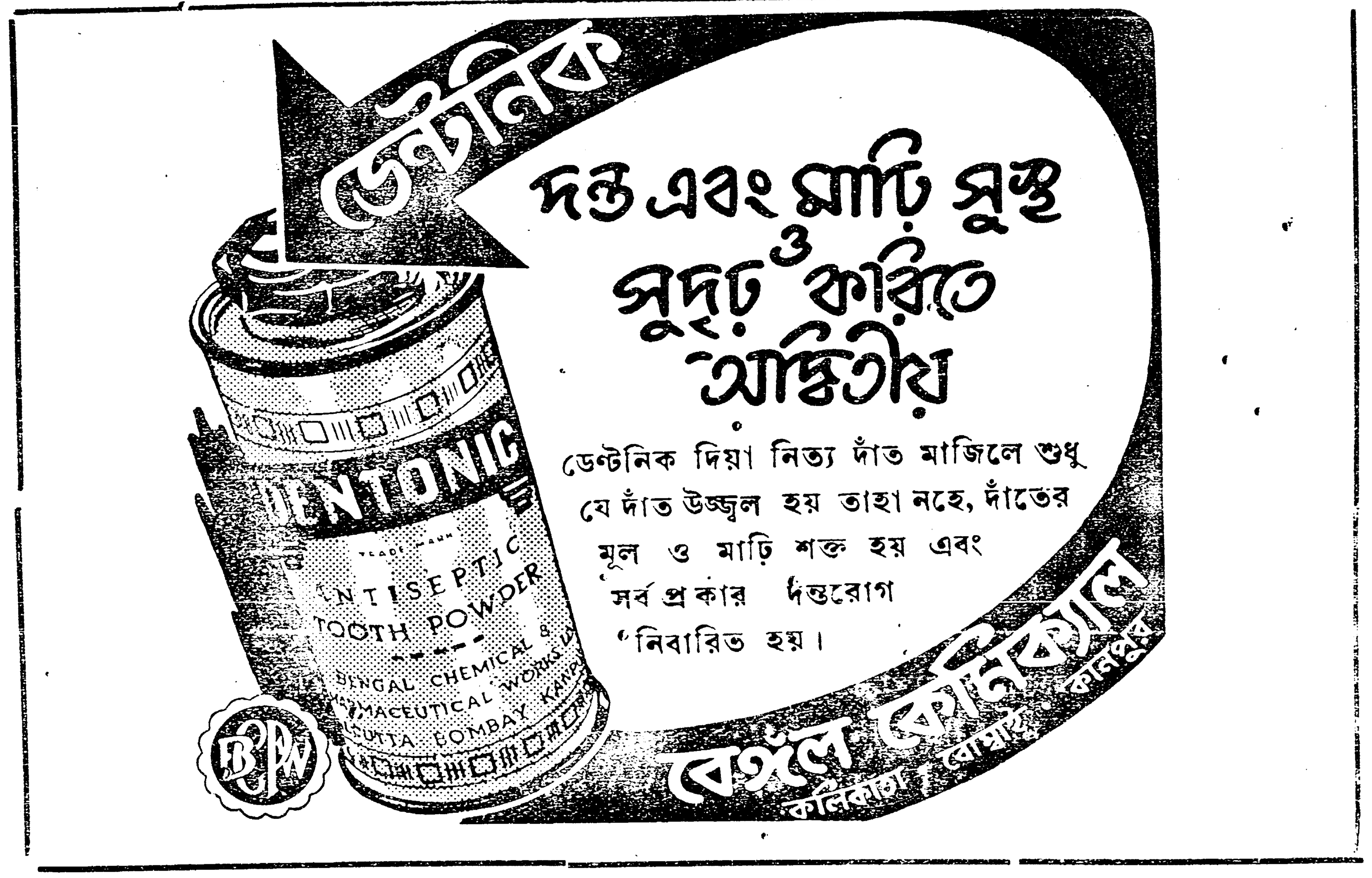

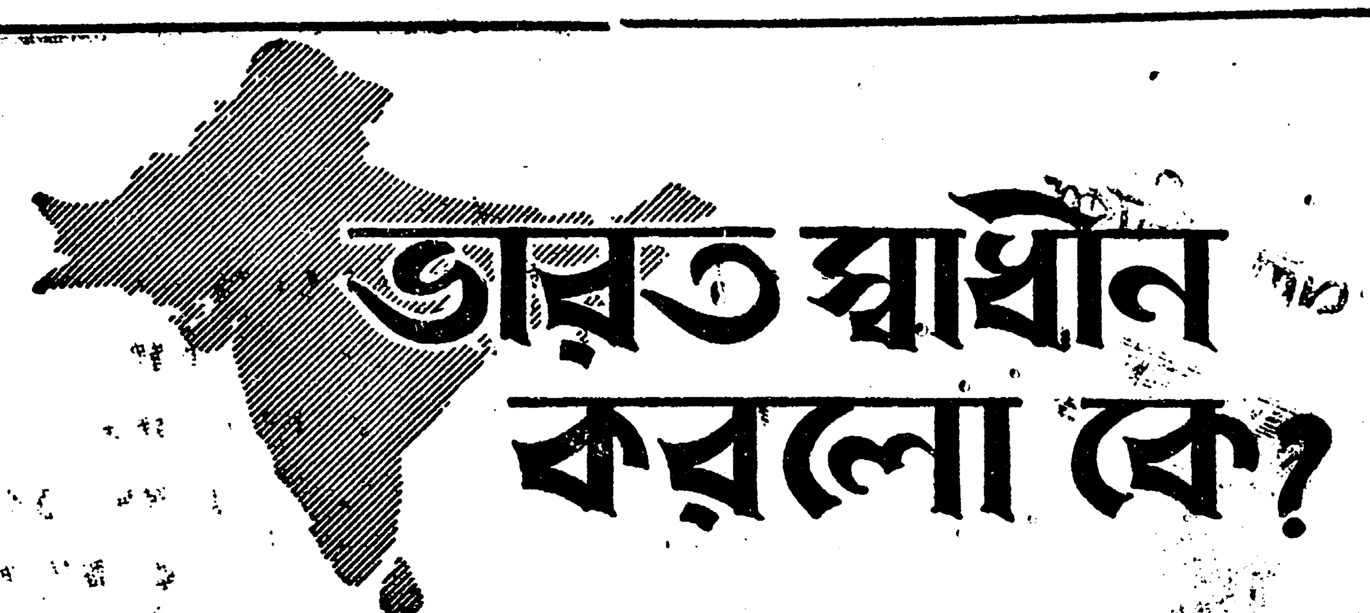

ভারত স্বাধীন করলো কে?

[অমর বীর সিরিজ]

নেতাজী সুভাষ—মূল্য ১॥০ টাকা

১। ক্ষুদিরাম ॥০
২। কানাইলাল ॥০
৩। সত্যেন বসু ॥০
৪। সূর্য্যসেন ॥০
৫। বাঘা যতীন ॥০
৬ মাতঙ্গিনী হাজরা ॥০
৭। ভগৎসিং ॥০
৮। বীর সাভারকর ॥০
৯। শ্রীঅরবিন্দ ॥০

সত্যাশ্রয়ী বাপুজী—মূল্য ২৲ টাকা

এই ফাল্গুনে পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ হইল!

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় শৈলজানন্দ মুখার্জ্জি, সুনির্ম্মল বসু, প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকগণ ইহাতে লিখিবেন।

প্রতি সংখ্যা ।৵০, সডাক বার্ষিক ৪৲
শুকতারার প্রতি সংখ্যায়ই পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।

"শুকতারা"

দেব সাহিত্য কুটীর
২২/৫বি, ঝামাপুকুর লেন • কলিকাতা.৯.

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

ভবিষ্যৎ

যদি মনে হয় সময়টা ভাল যাচ্ছে না, নানা অসুবিধা। কোষ্টি বা হাতটা দেখাবার ইচ্ছে মনে জাগে, আমার নিকট আসতে পারেন। তবে আসবার পূর্ব্বে পত্র লিখে দিন ঠিক করে আসা ভালো—সকাল-১০টা হইতে ১১টা—অথবা সন্ধ্যা-৬টা হইতে ৯টা। রবিবার বেলা-১০টা হইতে ১টা।

শ্রীমণি মজুমদার
৯, কাশী ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬
(ছাতুবাবুর বাজারের নিকট)

আসিবার সময় এই পত্রিকাটি সঙ্গে আনিবেন।

জ্যোতিষ ও তন্ত্র শিক্ষা মন্দির।

পণ্ডিত শ্রীনিশিকান্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রী
তন্ত্রবাগীশ

৩০ নং মহিম হালদার ষ্ট্রীট,
পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা

Regd. No. C—1641

লিলি বিস্কুট

রকমারিতায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

লি লি বিস্কুট

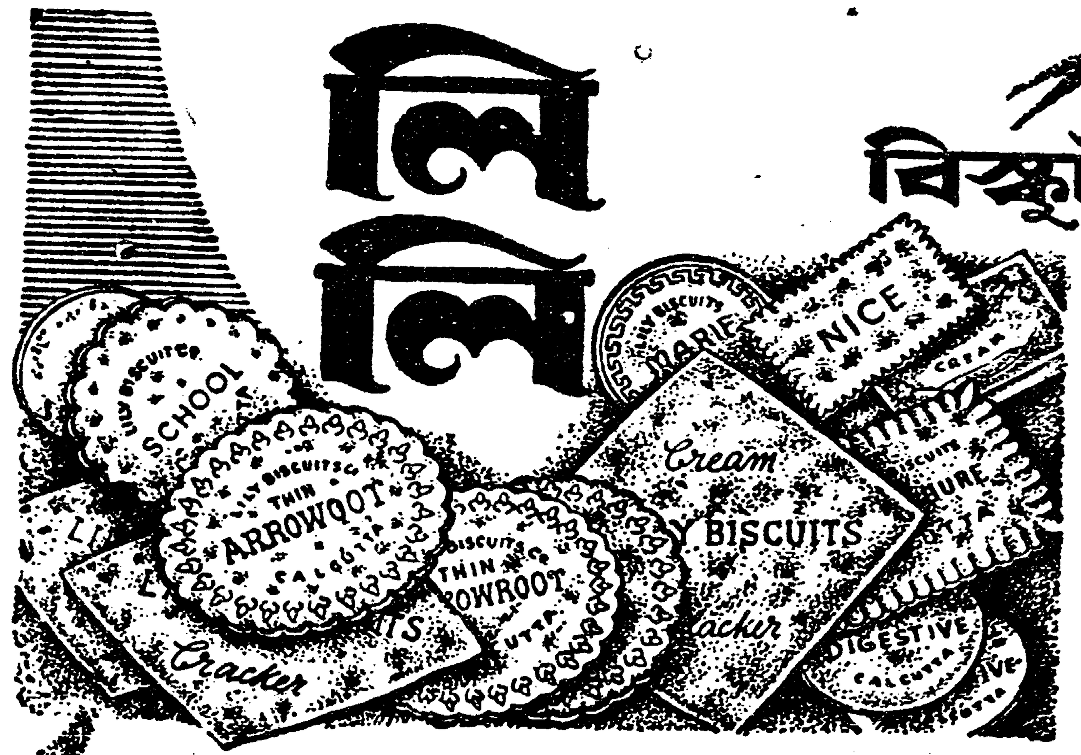

কয়েকটী মনোরম

ও

স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন-ক্রীম,
ক্যার্ণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ
৩ রমাকান্ত সেন লেন, কলিকাতা

রামধনু

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্, এস-সি,

বার্ষিক ৪৲
ষাণ্মাসিক ২৷০
প্রতি সংখ্যা ।৵০

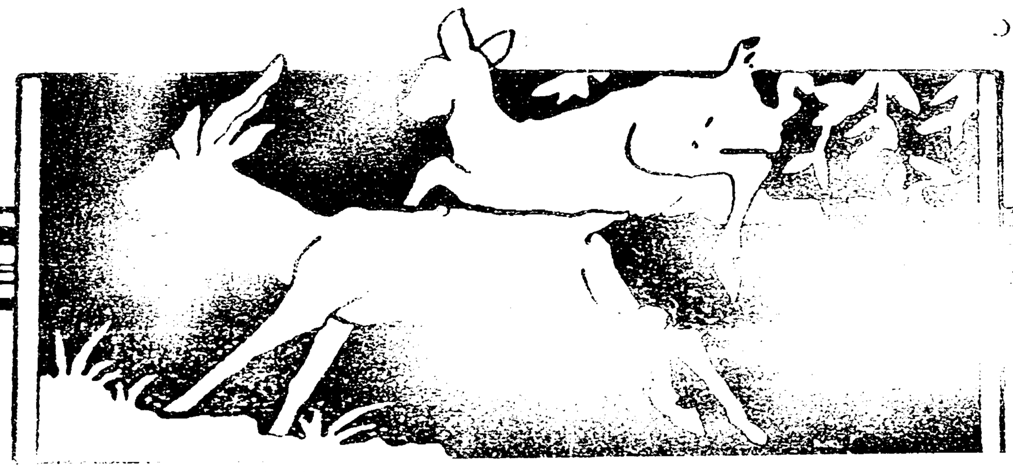

কার্য্যালয় :
১৬, টাউনসেণ্ড রোড,
কলিকাতা-২৫

সলোমন এণ্ড কোং

২৯ ষ্ট্রাণ্ড রোড (মোহতা হাউস) কলিকাতা-১

নানা প্রকার ডিজেল—কেরোসিন—পেট্রোল-
ইঞ্জিন, হ্যাণ্ড ও পাওয়ার-পাম্প—গ্যালভানাইজ ্ড
টিউব প্রভৃতি আমদানী ও প্রস্তুতকারক।

সোল প্রোপ্রাইটার: নৃপেন ভট্টাচার্য্য

GRAM : 'AGRASTONS' • • • PHONE : BANK 4497

ভারত অয়েল মিলের

১৬নং টাউনসেণ্ড রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, কালীতারা প্রেস হইতে
শ্রী[illegible]নারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

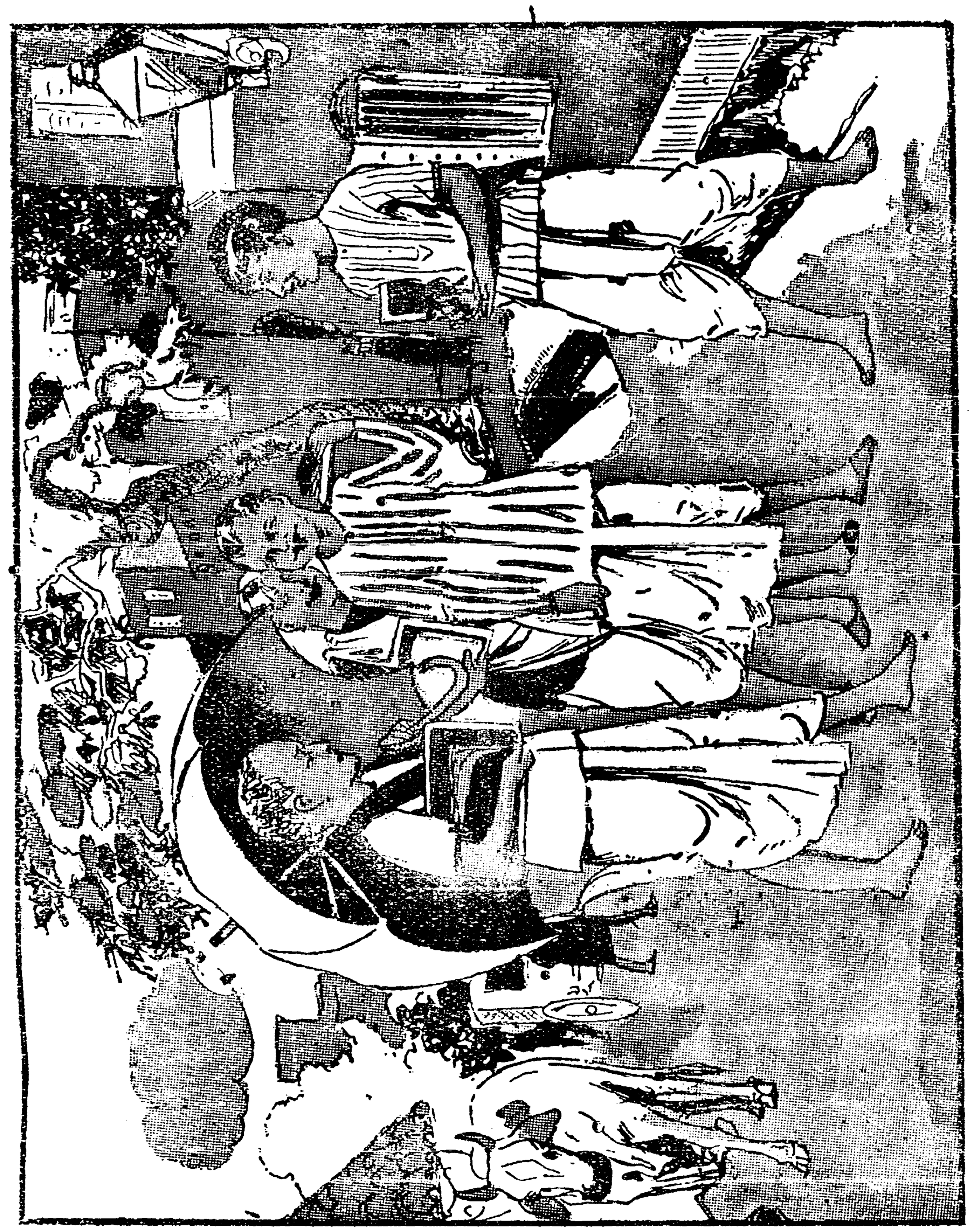

পাঠশালার ছুটির পরে

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ও ৺অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিরক্ষিত

২৪শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৫৮ { ১২শ সংখ্যা

ভীমরুল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভীমরুল, ভীমরুল,
ভীম বটে তুমি ভীষণ ভয়াল,
বিষাক্ত তব হুল।
তুমি বিন্ধন শক্তির অধিকারী,
তুমি যন্ত্রণা, জ্বালা দিতে পার ভারী,
মধুপের দলে মুহূর্ত্তে পারো
তাড়াইতে বিলকুল।

দুর্জ্জনে ভরা মধুহীন তব চাক,
রক্তবীজের ঝাঁকের কেবল জাঁক,
ভ্রমর হটাও, কিন্তু কই তো
ফোটাতে পার না ফুল?

গর্জ্জনে তুমি বুঝি সবাকার সেরা,
দুর্জ্জয় করে গ'ড়ে তোলো তব ডেরা,
কোন্ পথে আসি আগুন—কিন্তু
ভেঙে দেয় সর্ব ভুল্।

সোনার বালুচরে

শ্রীঅশোক সেন, এম্. এ

—পাঁচ—

জুপের কথা শুনে অমি তো অবাক্। কিন্তু উইলের ভাব দেখে তা মনে হ'ল না—বরঞ্চ একটু আগ্রহের সঙ্গেই তিনি বললেন, "খুলি? ঠিক আছে। আচ্ছা, এখন যা বলি ঠিক তাই করবি, বুঝলি? খুলির বাঁ চোখটা দেখ্ তো।"

"কোন্টা বাঁ চোখ কেমন করে বুঝব?"

"আরে আহাম্মক, তোর বাঁ হাত ডান হাত চিনিস তো?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা আর জানি নে!—এই তো আমার বাঁ হাত—যে হাত দিয়ে কাঠ কাটি।"

"ঠিক বলছিস, তুই তো আবার বেঁয়ো; তা হ'লে তোর বাঁ হাত যেদিকে সেই দিকে তোর বাঁ চোখ। এখন নিশ্চয়ই খুলির বাঁ চোখ, বাঁ তার বাঁ চোখ যেখানে ছিল সে জায়গাটা, বের করতে পারবি। পেয়েছিস?"

কিছুক্ষণ চুপচাপ গেল, শেষে জুপিটার বল্লে, "আচ্ছা, খুলির বাঁ হাতের দিকে কি তার বাঁ চোখ হবে? কিন্তু ওটার যে কোন হাতই নেই! যাক্ গে, এই যে পেয়েছি বাঁ চোখ। এখন কি করতে হবে?"

"এখন বাঁ চোখের মধ্যে দিয়ে পোকাটাকে ঝুলিয়ে দিবি—যতটা সুতো যায়; কিন্তু সাবধান, সুতোটা যেন হাত থেকে ফস্কে না যায়।"

"এ তো সোজা কাজ—এই তো পোকাটা, আর এই হ'ল বাঁ চোখের ফুটো—ব্যস্, চেয়ে দেখুন, ঐ যে পোকাটা ঝুলছে।"

কথাবার্তার সময়ে জুপের শরীরের কোন অংশ দেখা যাচ্ছিল না; কিন্তু পোকাটাকে ঝুলিয়ে দেওয়া মাত্রই সেটাকে দেখতে পেলুম—সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিটুকু পোকাটার উপর পড়ে ওটাকে একতাল সোনার মতন দেখাচ্ছিল। পোকাটা শূন্যে ঝুলছিল—ছেড়ে দিলে ঠিক আমাদের পায়ের কাছে এসে পড়তো। উইল তখুনি কাস্তে দিয়ে পোকাটার ঠিক তলায় একটা গোলাকার দাগ কাটলেন—সেটার পরিধি হবে তিন-চার গজ। জুপিটারকে সুতো ছেড়ে দিয়ে নীচে নেমে আসতে বললেন।

যেখানটায় পোকাটা পড়ল উইল ঠিক সেই জায়গায় খুব হিসেব করে একটা কাঠি পুঁতে পকেট থেকে মাপবার ফিতেটা বার করলেন। কাঠি থেকে গাছের গোড়ার খুব কাছে একটা জায়গায় ফিতেটা আটকিয়ে কাঠি ও গাছের গোড়ার সোজা লাইনে আরও পঞ্চাশ ফুট ফিতেটাকে টেনে নিলেন। জুপিটার কাস্তে দিয়ে কাঁটাগুলো পরিষ্কার করতে লাগল। সেই নতুন জায়গায় আর একটা কাঠি পোঁতা হ'ল—সেটাকে কেন্দ্র করে প্রায় চার ফুট পরিধির আর একটা গোল দাগ দেওয়া হ'ল। তারপর উইল একখানা কোদাল নিজে নিলেন, একখানা জুপিটারকে ও আর একখানা আমাকে দিয়ে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি জায়গাটা খুঁড়তে বললেন।

সত্যি কথা বলতে কি, এই ধরণের কাজে আমার কোনদিনই আগ্রহ নেই—এখনো রাজী হতুম না; তখন বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম—সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে। কিন্তু রেহাই পাবার কোন উপায় দেখলুম না। আবার, উইলকে এ অবস্থায় চটাতেও সাহস হ'ল না। জুপিটারের সাহায্য পেলে না হয় একবার দেখতুম ক্ষ্যাপাটাকে বাড়ী ফিরিয়ে নেওয়া যায় কিনা; কিন্তু নিগ্রোটার মতিগতি দেখে ভরসা পেলুম না। এ অঞ্চলে মাটির নীচে লুকানো ধনরত্ন সম্বন্ধে অনেক গল্প চলতি আছে সত্যি, কিন্তু উইলের মত শিক্ষিত লোক যে সে সব বিশ্বাস করতে পারেন তা কখনো ভাবি নি। সোনালী পোকাটা পাবার পর থেকে তাঁর সে ধারণা যেন আরো বদ্ধমূল হয়েছে। জুপিটার তো সব সময়ে মন্ত্র জপছে,—"একেবারে খাঁটি সোনার পোকা।" তাতেও হয়তো ওঁর মনটা আরো নরম হয়ে থাকবে। পাগল হবার আগে মানুষ অনেক কিছুই ভাবে আর বিশ্বাস করে। আশ্চর্য হবার কি আছে?

কিন্তু আমি এ কি মুস্কিলে পড়লুম! নিতান্ত নিরুপায় হয়েই খুঁড়তে শুরু করলুম। তা হ'লে অন্ততঃ চোখে দেখেও যদি ওঁর ভুল ভাঙ্গে।

লণ্ঠন জ্বালানো হ'ল। আমরা উঠে-পড়ে সবাই কাজে লেগে গেলুম। সে এক বিচিত্র দৃশ্য! এখন যদি কেউ এসে আমাদের এ অবস্থায় দেখে তা হলে তার মনে অনেক রকম সন্দেহই জাগতে পারে। কারো মুখে কোন কথা নেই। অসুবিধা হচ্ছিল কুকুরটাকে নিয়ে—ঘেউ ঘেউ শব্দে সে জানিয়ে দিচ্ছিল আমাদের কাজে তারও খুব আগ্রহ আছে। শেষে এমন একগুঁয়ের মত ডাকতে আরম্ভ করলে যে আমাদের, মানে উইলের, ভয় হ'ল পাছে ওর শব্দে কেউ এদিকে এসে পড়ে। আমি অবশ্য তাতে সব চেয়ে বেশী খুসি হব—কারণ তা হ'লে উইলকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাবার সুবিধা হবে। কুকুরটা শেষে এমন সোরগোল বাধালো যে জুপিটারকে তার কাজ ফেলে উঠে আসতে হ'ল। একটা দড়ি দিয়ে সে তার মুখটা বেঁধে দিয়ে এল।

পাঁচ ফুট খুঁড়বার পরও গুপ্তধনের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। আমার কিন্তু বেশ মজা লাগছিল—এবার হয়তো তামাসা চুকে যাবে। উইল চিন্তিত হলেন, কপালের ঘাম মুছে আবার কাজে লাগলেন। আমরা চার হাত পরিধির সবটা জায়গা নিয়ে খুঁড়ছিলুম, এবার জায়গাটা আর একটু বাড়িয়ে আরও দু'ফুট গভীর করা হ'ল। তবুও কিছু পাওয়া গেল না। বেচারী উইল ওঁর জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছিল। নিরাশ হয়ে তিনি গর্ত থেকে বেরিয়ে এলেন—কোট গায়ে দেবার জন্যে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন। আমি কোন কথা বললুম না। জুপিটার তার মনিবের ইশারায় যন্ত্রপাতিগুলো গোছাতে লাগল। তারপর কুকুরটাকে খুলে দিয়ে আমরা গম্ভীর মুখে এগিয়ে চললুম।

কয়েক পা যেতে না যেতে উইলের হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল, তিনি ফিরে দাঁড়ালেন, তার পর ছুটে গিয়ে জুপিটারের কলার টেনে ধরলেন। নিগ্রোটা ভয়ে কাঁপতে লাগল, হাত থেকে কোদালগুলো ফেলে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

দাঁত কিড়মিড় করে উইল বল্লেন—"ওরে হতভাগা শয়তান, ঠিক করে আমার কথার জবাব দে। বল্ তোর বাঁ চোখ কোন্টা?"

জুপ ভয়ে প্রায় কেঁদে ফেলে বল্লে—"কেন, এই তো আমার বাঁ চোখ!" সঙ্গে সঙ্গে তার ডান চোখে হাত রেখে দেখিয়ে দিলে—বেশ শক্ত করেই হাত রাখলে, যাতে তার মনিবের ভুল না হয়।

"ঠিক, যা ভেবেছি তাই"—উইল আনন্দে দিশেহারা হয়ে লাফালাফি শুরু করে দিলেন। নিগ্রোটা অবাক হয়ে একবার আমার দিকে, আর একবার উইলের দিকে তাকাতে লাগল।

শেষে স্থির হয়ে উইল বল্লেন—"চলো, ফিরে যাই, আমাদের কাজ এখনো শেষ হয় নি।" এই বলে তিনি আবার আমাদের নিয়ে বড় ওক্ গাছটার দিকে চললেন।

ওখানে গিয়ে জুপিটারকে ডেকে বল্লেন—"আচ্ছা, বল্ তো, খুলিটার মুখটা কি উপুড় করা ছিল, না বাইরের দিকে করে আটকানো ছিল?"

জুপিটার বল্লে—"মুখটা বাইরের দিকেই ছিল, তাতে পাখীদের ঠোকরানোর খুব সুবিধা হয়েছিল।"

"তা হ'লে তুই এই চোখ, না ঐ চোখের ভিতর দিয়ে পোকটাকে ফেলেছিলি?" এই বলে উইল জুপের দু'চোখে হাত দিলেন।

"এই চোখে—বাঁ চোখে—ঠিক আপনি যা বলছেন।" এবারও নিগ্রো তার ডান চোখটা দেখালো।

"হয়েছে, ওতেই হবে, এবার আবার চেষ্টা করে দেখবো।"

এ সব দেখেশুনে বোধ হ'ল, ওঁর পাগলামোর মধ্যেও একটা অর্থ আছে—বেশ ভেবে-চিন্তেই যেন সব কিছু করে যাচ্ছেন। পোকাটা যেখানে পড়েছিল উইল এবার সেখান থেকে কাঠিটা আরো প্রায় ইঞ্চি তিনেক পশ্চিম দিকে সরিয়ে পুঁতলেন। আবার আগের মত মাপবার ফিতেটা গাছের

গোড়ার খুব কাছ থেকে সেই কাঠিটা পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে সোজা আরো পঞ্চাশ ফুট বাড়িয়ে একটা জায়গা দেখালেন, সেখানটা আমাদের পূর্বেকার গর্ত থেকে আরও কয়েক গজ দূরে।

সেই নতুন জায়গাটার চারিপাশে আগের চেয়ে একটু বড় আর একটা গোলাকার দাগ কাটা হ'ল। আমরাও আবার কোদাল নিয়ে কাজ শুরু করলুম; খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম সত্যি, কিন্তু কেন জানি নে, এখন আর এ কাজে তেমন অনিচ্ছা রইল না, বরঞ্চ একটু উৎসাহই পেলুম। আগেই বলেছি, এ সব পাগলামোর মধ্যে যেন বেশ একটা উদ্দেশ্য আছে, লক্ষ্য করছিলুম; তাই বোধ করি ব্যাপারটাকে একেবারে আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতে পারলুম না। এবার নতুন উৎসাহে মাটি খুঁড়তে লেগে গেলুম। উন্মুখ হয়ে রইলুম গুপ্তধনের আশায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে মাটি কাটা চলল। হঠাৎ আবার কুকুরটার বিকট চীৎকারে আমরা থমকে গেলুম। প্রথমে ভাবলুম হয়তো মনের আনন্দে ও চেঁচাচ্ছে, কিন্তু শেষে মনে হ'ল, ভয় পেয়ে ডাকছে না তো! জুপিটার আবার তার মুখ বেঁধে দেবার জন্যে কাছে যেতেই সে ভীষণ বাধা দিলে, গর্তের মধ্যে লাফ দিয়ে পড়ে থাবা দিয়ে খানিকটা মাটি উপড়ে দিলে। এর পরে যা চোখে পড়ল তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একরাশ হাড়—প্রায় পুরো দু'টো মানুষের কংকাল। ভয়ে আমি আঁৎকে উঠলাম। (ক্রমশঃ)

গাছপালাতেও কথা বলে

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্ত্তী

গাছেও কথা বলে—ওষুধেও কথা বলে। অবশ্য মানুষে কথা বলার যে অর্থ,—এদের কথা বলার সে অর্থ নয়। জয়ন্ত কবিরাজের "ওষুধে কথা বলে" বললে বুঝতে হবে,—তাঁর ওষুধের ফল একেবারে হাতে হাতে ফলে।

গাছ-গাছড়ায় কথা বলে কথাটির অর্থও তাই। অনেক গাছ-গাছড়ার শিকড়, পাতা, ছাল, ফুল বা ফল বিশেষ বিশেষ রোগে অব্যর্থ ফল দেয়। রামায়ণেও আছে, বিশল্যকরণী আর 'মৃতসঞ্জীবনীর' গুণেই লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়েও প্রাণ হারান নি।

ওদেশে ইংরেজ সুসভ্য হওয়ারও আগে আমাদের দেশে আয়ুর্বেদ নামক চিকিৎসা-শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। বেশীর ভাগ গাছ-গাছড়া দিয়েই এই চিকিৎসার প্রচলন ছিল। আমরা যাকে কবিরাজী চিকিৎসা বলি, তা এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতেই হয়ে আসছে।

ইংরেজ এদেশে আসার আগে কবিরাজী চিকিৎসা চলত এখানে। তার পর ইংরেজী মতে ডাক্তারের উদ্ভব হ'ল— আমরাও ক্রমে ক্রমে গাছ-গাছড়াকে ভুলে গেলাম। এটা যে একমাত্র পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণেরই ফল তা নয়,— আমাদের অলসতা এবং অজ্ঞতাও এর অন্যতম কারণ। গাছ-গাছড়ার পাতা ও মূল বা ছাল সংগ্রহ করা একটা ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার। কাজেই আমরা "রেডি মেড্" শিশি-বোতলের ওষুধ কিনে নির্ঝঞ্ঝাট হ'লাম।

কিন্তু এর মধ্যে আবার কোন কোন বুদ্ধিমান্ লোক দেখলেন, এদেশের কোন কোন গাছ গাছড়ার ফলও অসাধারণ। অতএব তাঁরা তৈরী করলেন, "এক্সট্রাক্ট অব্ কালমেঘ", বাসক সিরাপ, অর্জ্জুনাসব—এই সব। আমরা ভুলেই গেলাম যে, কালমেঘের পাতার রসই ঐ এক্সট্রাক্ট অব্ কালমেঘ, বাসকের পাতার রসই বাসক সিরাপ, এবং অর্জ্জুন বৃক্ষের ছাল থেকেই অর্জ্জুনাসব।

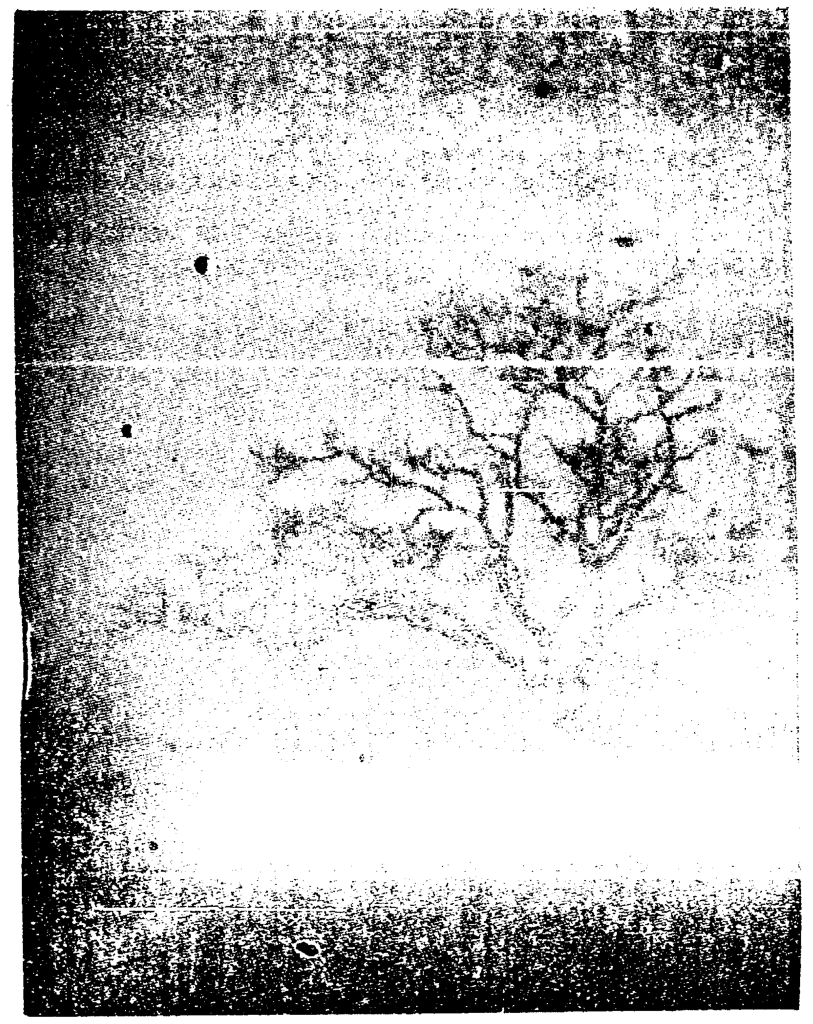
এই সব গাছের ছাল বা পাতা থেকেই আসে নানা রকম ওষুধ

আকান্দির পাতা, দিগ্বিজয়ীর পাতা অথবা ডাকাতে লতার গুণ কে না জানে? মচকে যাওয়া কি থেঁতলে যাওয়া অঙ্গে কাঁচা তেঁতুল পোড়া হলুদ বাটা ও চূণের সঙ্গে মিশিয়ে গরম করে লাগিয়ে দিলে অব্যর্থ ফল পাওয়া যায়।

বাটালী ব্যবহার করতে গিয়ে হাতের আঙ্গুল কেটে দু' ফাঁক হয়ে গেছে এমন ছুতোর মিস্ত্রীকেও দেখা গেছে, ডাকাতে লতার পাতার রস দিয়ে ঐ জায়গায় বেঁধে দেওয়ায় দু'দিন পরে সেটা যোড়া লেগে গেছে—পাকে নি, পূঁয হয় নি বা যন্ত্রণাদায়ক হয় নি ঐ ক্ষতস্থানটা।

কিন্তু এই গাছগুলি তো সব নয়। অনেক বুদ্ধিমানের বুদ্ধির বাইরেও অনেক গাছপালার ক্ষমতা রয়ে গিয়েছে—যা হয়ত জানে যাযাবরেরা কি জংলী মানুষেরা।

জানত আমাদের কৃষ্ণনগরের মহম্মদ। একটা ছেঁড়া কম্বল গায়ে, ধুলো-বালি-মাখা ধুতি পরা, হাতে একটা শাবল,—ক্বচিৎ কখনও মহম্মদকে দেখা যেত মনুষ্যবসতির মধ্যে। সহরের সমস্ত কবিরাজের গাছ-গাছড়া যোগান দিয়ে যেত সে। গাছপালার কথা একবার তুললে মহম্মদ শতমুখ হয়ে বলে যেত: "গাছে ফুল ফুটলে সে নাচে, হাততালি দেয়—এ সব আপনারা মানবেন না বাবু, কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি। গাছে দুঃখকষ্ট বোঝে, গাছ হাসে, কাঁদে, কথা বলতে চায়।" বনে বনে মহম্মদের দিন কাট্‌তো। কোম্পানীর বাগানে বন্ধুবান্ধব নিয়ে যদি যাও বেড়াতে—কি পিকনিক্ করতে, তা হ'লে হঠাৎ দেখবে ঝোপ-জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে মহম্মদ—হাতে তার গাছের চারা, লতাপাতা—এই সব। তোমার যদি কিছুমাত্র অনুসন্ধিৎসা থাকে তার সম্বন্ধে, সে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে—এটার নাম ভূমিকুষ্মাণ্ড, এর গুণ এই। এটার নাম শতমূল, এটা বেরালা, এটা শ্বেত পুনর্নবা এটা কন্টিকারী, এটা কালমেঘ—এই সব।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

মহম্মদ ওয়ার্ডসওয়ার্থও পড়ে নি, কালিদাসও পড়ে নি। জগদীশচন্দ্র কি আবিষ্কার করেছিলেন, সে খবর সে রাখে না; অথচ মহম্মদ বলে, "মানুষের চেয়ে গাছপালা আমাদের বেশী দরদী। সন্ধ্যায় গাছ ঘুমোয়, ভোরের আলোয় সে জাগে; গাছের শুধু প্রাণই নেই বাবু, মরমীও গাছ খুব।"

ভূতুড়ে বাড়ী

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

"খুন, খুন—বাঁচান—বাঁচান!"

চমকে উঠল পরিতোষ। তারপর ব্যস্তভাবে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটল। রাস্তার ডান দিকে একটা আম-কাঁঠালের বাগান, সেদিক থেকেই আসছিল শব্দটা। অনেকবার যাতায়াত করেছে পরিতোষ এ পথে, কিন্তু এ রকম ঘটনার সম্মুখীন সে কোনদিন হয় নি। তা ছাড়া এদিকে যে কোন লোকালয় আছে তা সে কোনদিন ধারণাই করে নি।

বাগান পেরিয়ে চোখে পড়ল একতলা একখানা হল্‌দে রং-এর বাড়ী। সামনে ছোট ফুলের বাগান। এ বাড়ীতেই ঘট্‌ছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড, পরিতোষের কোন সন্দেহই রইল না। ভাববার সময় নেই; মুহূর্ত্ত মধ্যে সে দৌড়ে হাজির হ'ল সেই বাড়ীর ফটকটার সামনে। আশ্চর্য্য, একটি ২২।২৩ বছরের মেয়ে একটা ফুলগাছের গোড়া থেকে জঞ্জল পরিষ্কার করছিল। এত বড় একটা ব্যাপার ঘটতে চলেছে এ বাড়ীতে, অথচ এ মেয়েটির যেন কোন খেয়ালই নেই! কালা নাকি মেয়েটা? পরিতোষ সশব্দে ফটকটা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। এবারে মেয়েটি তাকাল পরিতোষের দিকে। মনে হ'ল, সে যেন বেশ খানিকটা বিস্মিত হয়েছে পরিতোষকে দেখে। তবে সে মুখে ভয়ের কোন চিহ্ন ছিল না।

পরিতোষই জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা, একটু আগে এদিকে কোন আর্ত্ত চীৎকার আপনি শোনেন নি?"

মেয়েটি এবার যার পর নাই বিস্মিত হ'ল, বললে, "কই, না তো!"

পরিতোষও বিস্মিত কম হয় নি। বললে, "কিন্তু আমি কি তবে ভুল শুনলাম?"

মেয়েটি হাসলে, বললে, "ভুলই আপনি শুনেছেন। কিন্তু সেটা কি?"

"কে যেন কাকে খুন করছে—আর্ত্তকণ্ঠে কার যেন সাহায্যের আবেদন! আমি একটু আগেই শুন্‌তে পেয়েছিলাম—খুন,—খুন—বাঁচান—বাঁচান!"

মেয়েটি আবার হাসলে, বললে, "আপনারই মনের ভুল। কারণ এদিকটায় অন্য কোন লোকজন আছে বলে তো জানি না। এ বাড়ীতে থাকি আমি ও আমার বাবা। বাবা রোগা মানুষ, সব সময় শুয়েই থাকেন। কোন চাকর-বাকরও নেই আমাদের; কাজেই কে আর কাকে খুন করবে এখানে?"

মেয়েটি হাসলে আবার। পরিতোষের মনে হ'ল, এবারকার হাসিটা বিদ্রূপ-মাখানো।

বাড়ী এসে অন্যান্য দিনের মতই চলতে লাগল দিনের কাজগুলো, কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও পরিতোষ চিন্তাটা মনে থেকে তাড়াতে পারল না।

পরের দিন সকালে প্রাতভ্রমণ সেরে বাড়ী ফিরবার সময় ইচ্ছা করেই পরিতোষ ঘুর পথ ধরলে ও পথটা এড়িয়ে চলবার জন্য। কিন্তু তা পারলে না। কোন্ অদৃশ্য শক্তি যেন

জোর করে তার পা দু'টোকে ও পথেই চালিয়ে নিলে। বাগানটার কাছে আসতেই সমস্ত শরীরটা পরিতোষের হঠাৎ কেঁপে উঠল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আগের দিনকার সেই আর্ত্ত কণ্ঠস্বর তার কানে প্রবেশ করল। পরিতোষ ঠিকই লক্ষ্য করলে যে শব্দটা ঠিক ও-বাড়ীর ভিতর থেকেই আস্‌ছে। হাতের ঘড়িতে সময়টা দেখে নিলে—সওয়া সাতটা। আগের দিনেও সে ঠিক এই সময়েই শুনেছিল শব্দটা!

ফটকের সামনে আজও সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা। মেয়েটি জিজ্ঞেস করলে, "কি, আজ আবার ঐ রকম কোনও আর্ত্ত কণ্ঠস্বরে সাহায্যের আবেদন শুনে আসেন নি তো?" মেয়েটির মুখে বিদ্রূপের চিহ্ন।

পরিতোষ হাসলে না, বললে, "আমি আজও শুনেছি সেই কণ্ঠস্বর—খুন, খুন—বাঁচান—বাঁচান! আপনি কিছু শোনেন নি আজও?"

মেয়েটির মুখ থেকে এবার হাসি মিলিয়ে গেল; বললে, "না, আমি কোন শব্দই শুনি নি তো!"

আর কোন কথা না বলেই ফিরে এল পরিতোষ। আশ্চর্য্য, আজও সেই একই শব্দ একই দিক্ থেকে আসছে, গত কালকার চাইতে স্পষ্টভাবে। অথচ মেয়েটি কিছু শুনতে পেল না!

পরদিন পরিতোষ ঠিক করলে আজ আর সে বেড়াতে যাবে না। ঘড়িতে সাতটা বেজে গেছে এই মাত্র। সেদিনকার খবরের কাগজটার উপর চোখ বুলোতে লাগলো পরিতোষ। ঐ খুনের খবরটা হয়তো কাগজে বেরিয়েছে। না, নেই তো! হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়লো—সাতটা বেজে দশ হ'য়ে গেছে। পরিতোষের কি যেন হ'ল—পেছন থেকে কে যেন তাকে তাড়া করেছে। একটু পরেই সে লক্ষ্য করল, সে সেই বাগানটার কাছাকাছি প্রায় পৌছে গেছে পাঁচ মিনিটের মধ্যে। তার পরেই তার কানে গেল, "খুন, খুন—বাঁচান, বাঁচান!"

এর পর আর সন্দেহ বৃথা। হয় পরিতোষের মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে, না হয় ঘটনাটার মধ্যে কোন রহস্য আছে। পরিতোষ ঠিক করলে, কোন মনস্তাত্ত্বিকের সঙ্গে আলাপ করা তার একান্তই প্রয়োজন। মাস খানেক হ'ল ষ্টেশনের কাছে ডক্টর মহলানবিশের সাইন বোর্ডটা তার চোখে পড়েছে। ভদ্রলোক নাকি মস্ত বড় মনস্তাত্ত্বিক—বিলাত-আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। অল্প কিছু দিন আগে এখানে এসেছেন। লোকটি বড় একটা কারোর সঙ্গে মেশেন না। থাকেন একাই—কোন পরিজন তাঁর নেই। তবে এই অল্পদিনের মধ্যেই মানসিক চিকিৎসায় নাকি বেশ নাম করেছেন। তা ছাড়া পরলোকতত্ত্ব নিয়েও নাকি খুব চর্চ্চা করেন তিনি। তাঁর সঙ্গেই আলাপ করা ঠিক করলে পরিতোষ।

ডক্টর মহলানবিশ বিশেষ আগ্রহ সহকারে সব শুনলেন। শেষে বললেন, "আশ্চর্য্য ব্যাপারই বটে! তবে আপনার জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।"

পরের দিনই তিনি ঐ বাড়ীটা সম্বন্ধে কতকগুলি খবর সংগ্রহ করে পরিতোষকে জানালেন।

কয়েক বছর আগে ও বাড়ীটা তৈরী করান কলকাতার এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোক

কয়েক মাস কেবল ও বাড়ীটায় বাস করেই বিক্রী করে দেন। তার পর যিনি বাড়ীটা কিনলেন তিনি সস্ত্রীক ওখানে বাস করতে থাকেন। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া তাঁদের অন্য কেউ ছিল না। স্ত্রী দেখতে ছিলেন খুব সুন্দরী। তাঁরা বড় একটা বাইরে কারুর সঙ্গে মিশতেন না। হঠাৎ সকলের অলক্ষ্যে ভদ্রলোক সস্ত্রীক একদিন এখান থেকে চলে যান। তারপর বাইরে থেকে বাড়ীটা বিক্রী করবার চেষ্টা করেন। তাঁর হ'য়ে একজন লোক এখানে আসে এবং কিছু কিছু আসবাবপত্র বিক্রী করে যায়। এ প্রায় ছ'মাস আগেকার কথা। শেষ পর্য্যন্ত বাড়ীটা কিনলেন এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। তিনি এখানে মাত্র পনের দিন ছিলেন। তারপর তিনিও চলে যান বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে। বর্ত্তমানে যিনি ও বাড়ীটায় ভাড়াটে আছেন তাঁর নাম মিষ্টার মৈত্র—অবসরপ্রাপ্ত এক অধ্যাপক, এবং তাঁরই একমাত্র কন্যা। মিঃ মৈত্র রুগ্ন এবং সব সময়ে শুয়েই কাটান। আরও একটা কথা এ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। বাড়ীটার দ্বিতীয় মালিক তাঁর স্ত্রীকে নাকি গলা টিপে মেরে ফেলেছিলেন। অবশ্যি এরও কোন প্রমাণ নেই।

গল্প শেষ করে ডাক্তার মহলানবিশ জিজ্ঞেস করেন পরিতোষকে, "আপনি ভূত বিশ্বাস করেন? বা অন্য কোন অশরীরী আত্মা?"

পরিতোষ বললে, "না, তবে বর্ত্তমানে আমার যা অবস্থা তাতে অশরীরী কোন আত্মায় বিশ্বাস করা ছাড়া তো গত্যন্তর দেখছি না!"

ডক্টর মহলানবিশ বললেন, "কথাটা অনেকটা সত্যি। কারণ অধিকাংশ লোকে বিশ্বাস করে না বলে ভূত যে নেই তা তো বলা যায় না। যেমন ধরুন, বৃহস্পতি গ্রহের যে চন্দ্র আছে তা তো খালি চোখে খুব কম লোকেই দেখতে পায়। সেজন্যে কি আমরা বলতে পারি, যে, যারা দেখে তারা ভুল দেখে?"

পরিতোষ আপত্তি তুললে, বললে, "কিন্তু বৃহস্পতির চন্দ্র আছে, তা তো বৈজ্ঞানিক সত্য।"

ডক্টর মহলানবিশ হাসলেন, বললেন, "বৈজ্ঞানিক সত্যেরও তো পরিবর্ত্তন হয়, পরিতোষ বাবু!"

হঠাৎ উভয়ে লক্ষ্য করলেন, ঘরে ঢুকছে সেই মেয়েটি,—অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মিঃ মৈত্রের মেয়ে, যার সঙ্গে পরিতোষের দু'-তিন বার দেখা হ'য়েছে। মেয়েটির পোষাক-পরিচ্ছদে পরিপাট্যের অভাব—চোখমুখ যেন গর্ত্তে বসে গিয়েছে—চুল অবিন্যস্ত।

কোনরূপ ভূমিকা না করেই মেয়েটি বললে, "আপনারা আমাকে বাঁচান।" বড় করুণ তার দৃষ্টি।

গত পরশু রাতে, মেয়েটি বললে, সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে। একটি অপরূপ সুন্দরী মহিলা যেন মেয়েটির ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাতে অদ্ভুত হালকা সবুজ রংএর একটা ছোট ফুলদান। অমন অদ্ভুত রং সে কখনও দেখে নি। ফুলদানটা নেড়ে নেড়ে মহিলাটি যেন কি বলবার চেষ্টা করছেন কিন্তু বলতে পারছেন না। তারপর মহিলাটি এবং ফুলদান দুই-ই মিলিয়ে গেল। একটু পরেই মেয়েটি শুনতে পেল এক আর্ত্তনাদ—"খুন, খুন—বাঁচান, বাঁচান!" এর পর তার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

পরের দিন সকালে বাড়ীটার একটা ঘরে আবর্জ্জনার মধ্যে সে জড়ান একখানা কাগজ পায়। আশ্চর্য্যের ব্যাপার, যে, সে কাগজখানায় একটি মহিলা এবং একটি সবুজ ফুলদানের ছবি আছে। যদিও ছবিটি ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে, কিন্তু মিস্ মৈত্র হলফ্ করে বলতে পারে যে সে স্বপ্নে ঠিক এই মহিলাটি এবং ঐই ফুলদানটিই দেখেছে।

জড়ান কাগজখানা পরীক্ষা করতে করতে ডক্টর মহলানবিশ বললেন, "অদ্ভুত! ফুলদানটা দেখে ওর নক্সাটা চীনদেশীয় বলে মনে হয়।"

'চীন দেশীয়' কথাটা শুনেই পরিতোষ ঝুঁকে পড়ল ছবিটার উপর। বললে, "ঠিক, চীন দেশীয় নক্সাই এটা। ঠিক এ রকম একটা ফুলদান আমিও দেখেছি।"

আগ্রহভরে বললেন্ ডক্টর মহলানবিশ, "কোথায় দেখেছেন এ রকম ফুলদান আপনি?"

পরিতোষ বললে, "আমার কাকার সংগ্রহশালায়। কাকার আছে প্রচুর টাকা। আর তাঁর একমাত্র বাতিক হ'ল দেশবিদেশ থেকে নানা রকম ঐতিহাসিক এবং দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান্ জিনিষ সংগ্রহ করা।"

"আপনি দেখাতে পারেন সেই ফুলদানটা?" ডক্টর মহলানবিশের উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর।

পরিতোষ বললে, "এখন তা সম্ভব নয়। কাকা বর্ত্তমানে বাংলা দেশে নেই, কবে আসবেন তাও বলা যায় না।"

ডক্টর মহলানবিশ বললেন, "কিন্তু ঐ ফুলদানটা তিনি নিশ্চয়ই সঙ্গে নিয়ে যান নি! ওটা পেলে রহস্যের সমাধান হ'ত বলে আমার বিশ্বাস।"

পরিতোষ একটু ইতস্ততঃ করে বললে, "ফুলদানটা কোথায় আছে তা অবশ্যি আমি জানি। কাকার অন্যান্য সংগৃহীত জিনিসের সঙ্গেই একটা ঘরে সেটা রয়েছে। আর তার চাবিটাও আমারই কাছে আছে। কিন্তু কাকার অনুমতি ছাড়া সে ঘর খোলার হুকুম নেই। খুব কড়া নির্দ্দেশ!"

ডক্টর মহলানবিশ বললেন, "আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না সেজন্যে। আপনার এ রকম একটা বিপদের সময় ফুলদানটা একবার দেখালে তিনি নিশ্চয়ই কিছু বলবেন না।"

পরিতোষ রাজী হ'ল শেষ পর্য্যন্ত।

মিঃ মৈত্রের মেয়েকে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। ডক্টর মহলানবিশ তাকে বলে দিলেন যে রাত দশটা নাগাদ তিনি এবং পরিতোষ তাদের বাড়ীতে যাচ্ছেন।

রাত দশটার একটু আগেই পরিতোষ ডাক্তার মহলানবিশকে নিয়ে রওনা হ'ল। এদিকটা এমনিতেই খুব নির্জ্জন, রাত্রে তো কথাই নেই। পরিতোষের হাতে সেই সবুজ ফুলদানটা। কড়া নাড়তেই সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। মিস্ মৈত্র বললেন, "বাবা ঘুমুচ্ছেন চিলেকোঠার ঘরে। তাঁকে আমি কিছুই জানতে দিতে চাই না। এটা ভূতুড়ে বাড়ী এ কথা বললে তাঁর স্বাস্থ্যের এ অবস্থায় ক্ষতি হ'তে পারে।"

তিনজনে একটা বড় ঘরে প্রবেশ করলেন। মাঝখানে একটা টেবিলের উপর রাখা হ'ল সেই ফুলদানটা। তার পর তিনজনে তিনখানা চেয়ার টেনে বসলেন।

ডক্টর মহলানবিশ বললেন, "কোন অশরীরী আত্মার অস্তিত্ব যদি এ বাড়ীতে থাকে তবে তার সঙ্গে নিশ্চয়ই এ সবুজ ফুলদানটার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। কারণ এ বাড়ীর দ্বিতীয় মালিক যখন এ বাড়ীর কিছু আসবাব নীলামে বিক্রী করেছিলেন তখনই পরিতোষ বাবুর কাকা এটা কিনেছিলেন। পরিতোষ বাবু বলছেন, তাঁর কাকা এটা প্রায় দু' মাস আগে কিনেছিলেন। সুতরাং সে অশরীরী আত্মা আমাদের তিনজনার যে কোন একজনার উপর ভর করতে পারে। তা হ'লেই আমরা সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারব।"

পরিতোষ বললে, "অশরীরী আত্মা আমাদের কারোর উপর ভর না করতেও তো পারে!"

"তা ঠিক। তবে ব্যাপার কি জানেন, এ ব্যাপারটা হ'ল বিদ্যুতের মত। কোন জিনিষের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে, আবার কোন কোন পদার্থ অপরিবাহী। কাজেই আশা করা যাচ্ছে, ফল আমরা লাভ করবই। কোন ভয়ের কারণ নেই।"

ঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হ'ল। গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে—শুধু শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দই শোনা যাচ্ছিল। পরিতোষের সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল।

ডক্টর মহলানবিশ বললেন, "ভয়ের কোন কারণ নেই। মনটাকে যতদূর সম্ভব চিন্তামুক্ত রাখুন।"

আবার নিস্তব্ধতা। মিনিটের পর মিনিট অতিবাহিত হ'য়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মিস্ মৈত্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেল অন্ধকারের ভেতর থেকে,—"মনে হচ্ছে বিপদ্ ঘনিয়ে আসছে চারিদিক্ থেকে।" তার স্বর ভীত, কম্পিত ও মৃদু।

ডক্টর মহলানবিশ শুধু বললেন, "মন থেকে সব রকম ভয় মুছে ফেলে দিন—মনটাকে যতদূর সম্ভব চিন্তামুক্ত রাখুন।"

অন্ধকারটা যেন হাতে ছোঁয়া যায়, মনে হ'ল পরিতোষের কাছে। ভয়াবহ শূন্যতা বিরাজ করছে যেন! একটা বড় রকমের বিপদ্ যেন ঘনিয়ে আসছে। হঠাৎ কিসের একটা তীব্র গন্ধ নাকে এল! কেমন যেন দম আটকে আসছে পরিতোষের। তার অনুভূতিগুলো যেন ক্রমে নিস্তেজ হ'য়ে যাচ্ছে! কথা বলবার চেষ্টা করলে পরিতোষ, কিন্তু কোন স্বর ফুটল না—গলাটা যেন শুকিয়ে একেবারে কাঠ হ'য়ে গেছে।

* * * *

চোখ মেলে চাইলে পরিতোষ। ঘামে তার সমস্ত শরীর ভিজে গেছে। আম-কাঁঠালের বাগানটার মধ্যে একটা খোলা জায়গায় পড়ে আছে পরিতোষ। হাত-ঘড়িতে দেখল বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা। আস্তে আস্তে মনে পড়ল গত রাত্রের ঘটনা। তাড়াতাড়ি ছুটল সে একতলা বাড়ীটার দিকে। আশ্চর্য্য, বাড়ীটার দরজায় ঝুলছে একটা মস্ত বড় তালা।

নিজের বাড়ী ঢুকতেই দেখা হ'য়ে গেল কাকার সঙ্গে। পরিতোষ জিজ্ঞেস করলে, "কখন ফিরলেন আপনি?"

"ফিরেছি কাল রাতে। কিন্তু তোমার কি ব্যাপার বল তো? সমস্ত রাত, তার পর আজ এই একটা পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে তুমি? চাকরটাও তো কিছুই বলতে পারলে না!" কাকা বললেন।

পরিতোষ সব প্রকাশ করল কাকার কাছে। কাকা বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, "তাদের ভাগ্যে যে কি ঘটেছে তা একমাত্র ভগবান্ই জানেন! কিন্তু সবুজ ফুলদানটা কোথায়?"

"তা তো বলতে পারছি না!" বললে পরিতোষ।

"বলতে পারছ না মানে?" লাফিয়ে উঠলেন কাকা চেয়ার ছেড়ে।—"বল কি তুমি! ওটাই যে আমার সংগ্রহশালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন। কত কষ্টে আর কত টাকা ব্যয় করে ও জিনিষটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম জান? প্রাচীন চীনশিল্পের অদ্ভুত নিদর্শন ওটি। পৃথিবীতে ওর আর যুড়ি নেই। কত বার ওটা চুরির চেষ্টা হয়েছে। এই সেদিনও ওটার জন্য একজন পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন আমাকে! কিন্তু তাতেও আমি দেই নি।"

পরিতোষ আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ডক্টর মহলানবিশ ও মিস্ মৈত্রকে খুঁজে বের করতেই হবে—তা যেমন করেই হোক্। ছুটে গেল পরিতোষ দরজার দিকে। কিন্তু বাধা পেল। পরিতোষের চাকর একটা চিঠি নিয়ে এসেছে। খাম ছিঁড়তেই বেরিয়ে পড়ল একখানা ছোট্ট চিঠি:

প্রিয় পরিতোষ বাবু,

এতক্ষণে, আশা করি, তোমার ভূত ছেড়ে গেছে। অনেক দিনের চেষ্টায়ও যা সম্ভব হয় নি সেই ফুলদানটা যে এত সহজে তোমাকে বোকা বনিয়ে আদায় করতে পারব তা ভাবি নি। এ বিষয়ে অবশ্যি আমার চাইতে তোমাদের মিস্ মৈত্রের কৃতিত্বও কম নয়। বোধ হয় বুঝতে পারছ, আমাদের তুমি যা মনে করেছিলে তা আমরা কেউ নই। আসল পরিচয় দেব অত বড় বোকাও নই আমরা। যাই হোক, আমাদের পেছনে ধাওয়া করে বা পুলিশে খবর দিয়ে লাভ নেই; কেননা, এ চিঠি যখন তোমার হাতে পৌছবে তখন আমরা বহু দূরে চলে গেছি। আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জেন।

—ইতি তোমাদের 'আত্মার উদ্ধারকর্ত্তা' ওরফে ডাক্তার মহলানবিশ।

মনসামঙ্গলের গল্প

শ্রীজয়দেব রায়, এম্. এ, বি. কম্

মা মনসার গান শুনেছ? শোন নি? তা শুনবে কেমন করে—গ্রামে তো যাও না। পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে সারা বর্ষাকাল ধরেই তো এই দেবীর গান হয়। মনসার গল্প বা চাঁদসদাগর-বেহুলার কাহিনী জানে না এমন লোক সেখানে কমই দেখতে পাওয়া যায়।

এক কালে বাংলা সাহিত্যে-গল্প বলতে এই সব গল্পই বুঝত লোকে। মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলই ছিল সব চেয়ে প্রসিদ্ধ। পূর্ববঙ্গের গ্রামে বড সাপের ভয়। চারিদিকে জলজঙ্গল আর তার মধ্যে সাঁপের আড্ডা। প্রতি বছরই বর্ষায় বহু লোক সর্পাঘাতে প্রাণ হারায়। সে যুগের বাংলার গ্রামে তো দূরের কথা—আজও সুসভ্য বৈজ্ঞানিক জগতে সাপের কামড়ের খুব ভাল কোন প্রতিষেধক ওষুধ বেরোয় নি। মানুষ যেখানে সম্পূর্ণভাবে দৈবের কৃপায়, যেখানে রক্ষা পাবার আর কোন আশ্রয় নেই, সেখানে দৈব মহিমার ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর কি উপায় আছে? বাংলা দেশের সাধারণ মানুষ তাই সেদিন করযোড়ে আশ্রয়

নিয়েছিল সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার কাছে। সারা বর্ষাকাল গ্রামে গ্রামে গান হ'ত—মা মনসার ভাসান। দেশবাসী মনে করত মা মনসা খুসি থাকলে সাপের হাত থেকে বাঁচা যাবে হয়তো।

কোন একজন কবি নয়, সে সময়কার দেশের প্রায় সমস্ত কবিরই কাব্যের বিষয় ছিল সেই একই চাঁদ সদাগর-বেহুলার গল্প। এ পর্য্যন্ত ১০৮ জন বিভিন্ন কবির রচিত পৃথক্ পৃথক্ মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবি অবশ্য দু'জন—বিজয়গুপ্ত আর নারায়ণদেব। তবে সর্বপ্রথম যে কবি এ গল্প নিয়ে তাঁর কাব্য সুরু করেন সেই কানা হরিদত্তের নাম এঁরা সবাই ভক্তিভরে স্মরণ করেছেন—

"প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে॥"

মনসামঙ্গলের গল্পটি এখানে সংক্ষেপে বলে নি:

চাঁদ সদাগর ছিলেন একজন শিব-উপাসক। অতি সামান্য কারণে মনসা কর্ত্তৃক তিনি অভিশপ্ত হয়ে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করেন। চাঁদ সদাগর মর্ত্ত্যজীবনে তাঁর পূর্ব লাঞ্ছনার কথা ভোলেন নি, এ জীবনেও তিনি মনসার পূজো করতে চাইলেন না। তাই তাঁর স্ত্রী সনকা যখন মনসার ঘট পেতে পূজো করছিলেন, পদাঘাতে তিনি তা ভেঙ্গে দিলেন।

মনসার এত বড অপমানের কথা স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারত না। চাঁদের হাতে অপদস্থ হয়ে মনসা এবার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু করলেন। এমনি বিধিলিপি যে যতদিন না চাঁদ সদাগর নিজ হাতে তাঁর পূজো করেন মর্ত্ত্যে ততদিন তাঁর পূজো প্রচারের কোন উপায় নেই। তাই ছলে, বলে, কৌশলে চাঁদের কাছ থেকে পূজো আদায়ের জন্যে মা মনসা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

মনসা নানাভাবে তখন থেকে চাঁদকে বিপন্ন করতে লাগলেন। তাঁর ধন-সম্পদ্ নাশ করলেন, বাণিজ্যতরী ডুবালেন, ঘরবাড়ী পোড়ালেন; তাঁর মানসম্মান নষ্ট করলেন। সবার ওপর চাঁদের ছয় ছয়টি উপযুক্ত পুত্রের প্রাণ নিলেন, তবু চাঁদকে জয় করতে পারলেন না।

রোদনধ্বনিতে চাঁদের ঘর ভরে গেল; অভিশাপে, আক্ষেপে অস্থির হয়ে পড়লেন তিনি; কিন্তু তবু তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ হ'ল না, মনসার পূজা করতে তিনি রাজী হলেন না। "শেষে জন্মাইলেন লখিন্দর।" বাবা-মা'র সবে ধন নীলমণি ঐ একমাত্র ছেলে সম্বল।

চাঁদ গেলেন আবার বাণিজ্যে সিংহলে—নতুন আশার বাঁধ বেঁধেছেন মনে। মনসা বল্‌লেন একবার অন্ততঃ আমার পূজো করে যাও—

"মোর তরে ফুলজল দেও একবার।"

চাঁদ তাচ্ছিল্য ভরে বল্‌লেন—"যে হাতে আমি 'শিবের পূজো করেছি সে হাতে আমি তোমার পূজো কর্‌বো না।" বাণিজ্যের পথে চাঁদের ভরা তরী ডুবে গেল, বহুকষ্টে প্রাণ নিয়ে তিনি তীরে উঠ্‌লেন ; বহু লাঞ্ছনা-অপমান সহ্য করে ভিখারী চাঁদ দেশে ফিরলেন।

মনসা জানালেন—বিয়ের রাতে লখিন্দরকে সাপে কামড়াবে। উজানী নগরের সায়বেণের মেয়ে বেহুলার সঙ্গে লখিন্দরের বিয়ে ঠিক হ'ল। চাঁদ গড়লেন লোহার বাসর ঘর, সাপ ঢুক্‌বার কোন ছিদ্র রাখলেন না। তবু নিয়তির অমোঘ ইঙ্গিতে বাসর ঘরে বিয়ের রাতে লখিন্দরকে সাপে কামড়াল।

সাপের কামড়ের মরা তো পোড়ান হয় না, ভেলায় করে লখিন্দরকে তাই ভাসিয়ে দেওয়া হ'ল। নববধূ বেহুলা সবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে মরা স্বামী কোলে করে গাঙ্গুরের জলে ভাস্‌লেন। তারপর বেহুলা সতীত্বের জোরে, সাহস ও কর্ম্ম-কুশলতায় বহু বিপদ্ হতে নিজেকে এবং সঙ্গে মৃত স্বামীর গলিত শবদেহ বাঁচিয়ে স্বর্গে গিয়ে হাজির হলেন। মনসার কাছে বেহুলা তাঁর স্বামীর প্রাণ ফিরে চাইলেন। শিব শেষে তাঁদের মধ্যে আপোষ করে দিলেন—ঠিক হ'ল চাঁদ একবার মাত্র মনসার পূজো করবেন। সেই কড়ারে বেহুলা তাঁর পতির, চাঁদের অন্য পুত্রদের প্রাণ ফিরিয়ে আনলেন। সেই সঙ্গে চাঁদের সপ্তডিঙ্গা বোঝাই ধনরত্ন সবই আবার ফিরে এল।

চাঁদের প্রতিজ্ঞা কিন্তু তখনও অটল ; কিন্তু স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ, আত্মীয়-স্বজন, সবার ওপর বেহুলার অনুরোধে তিনি বাঁ হাতে মনসার পূজো করতে রাজী হলেন। চাঁদও তো মানুষ! স্নেহের কাছে সবারই পরাজয় হয়। এই ভাবে মর্ত্ত্যে মনসার পূজো প্রচারিত হ'ল।

চাঁদ সদাগর-বেহুলার গল্পটি মনসামঙ্গলের মূল গল্প হ'লেও এটিই কিন্তু একমাত্র কাহিনী নয়। তখনকার দিনে তো উপন্যাস রচনার প্রথা ছিল না—এই মঙ্গল কাব্যগুলিই পাঠকদের উপন্যাসের পিপাসা মেটাত। তাই বাস্তবতা সৃষ্টির জন্যে বেহুলার গল্প ছাড়া কথা প্রসঙ্গে বহু ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী এর মধ্যে এসেছে। সেগুলোর মধ্যে শঙ্কর গারড়ীর উপাখ্যান, ঝালুমালুর উপাখ্যান, নেতা ধোপানীর উপাখ্যান, পরীক্ষিতের উপাখ্যান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে নেতা ধোপানীর গল্পটা শোন :

বেহুলা যখন ভেলা ভাসিয়ে চলেছেন, এ রকম সময়ে একদা নেতা ধোপানীর ঘাটে এসে ভিড়লেন। নেতা স্বর্গের দেবদেবীর কাপড় কাচছিল, তার ছোট ছেলেটা বার বার তাকে বিরক্ত করছিল। প্রথম প্রথম তার আবদার নেতা রাখছিল, কিন্তু স্বর্গের দেবদেবীদের কাপড় কাচ্‌ছে সে, ছেলের জন্যে তাঁদের হয়তো দেরী হয়ে যেতে পারে। তাই শেষে বিরক্ত হয়ে কাপড়ের সঙ্গে এক আছাড়ে ছেলেকেও সে মেরে ফেলে দিল ; তারপর সুস্থির হয়ে কাজ করে চল্‌ল। যাবার সময় ছেলেকে আবার কি এক মন্ত্রে বাঁচিয়ে ঘরে নিয়ে গেল। বেহুলা বুঝলেন, নেতা মরা বাঁচানোর মন্ত্র জানে ; তিনি সটান তার পা জড়িয়ে ধরিলেন। নেতা সমস্ত শুনে বল্‌ল—"আমি মরা বাঁচানোর মন্ত্র জানি বটে, কিন্তু মনসার শাপে তোমার স্বামী মরেছেন, তিনি যদি রাগ করেন?" এই বলে নেতাই সঙ্গে করে তাঁকে মহাদেবের কাছে নিয়ে গেল।

এই রকম অনেক ছোট ছোট গল্প মনসামঙ্গলে আছে। এর মধ্যে কিছুটা ইতিহাসও থাকতে পারে। সে সময়ে বৈদিক এবং পৌরাণিক শৈবধর্ম বা শিবের পূজো অপেক্ষা লোকে ভয়ে-ভক্তিতে নানা লৌকিক দেব-দেবীর পূজো আরম্ভ করেছিল—এ গল্প হ'তে সেটা বোঝা যায়। আর একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সে সময়ে সমাজে বৈশ্যদের বা বণিক্‌দের বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল।

মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে নাম-করা হলেন কবি বিজয়গুপ্ত। বাখরগঞ্জ জেলায় ফুল্লশ্রী গ্রামে তাঁর বাস ছিল। তাঁর রচনার, ছন্দ প্রভৃতি অতি সুন্দর ; এক জায়গায়, যেখানে শিবের গুনগান করা হচ্ছে, সেখান থেকে একটু শোন :

"কপালে চান্দের ফোঁটা আকাশে পরশে জটা,
বাম কান্ধে লোহার ত্রিশূল।
বলদে চড়িয়া যায় শিঙা ডমরু বাজায়
দুই কর্ণে ধুতুরার ফুল ॥
গলায় হাড়ের মালা পিন্ধন বাঘের ছালা,
সকল শরীর ভস্মময়।
হৃদয়ে ফোঁপায় ফণী তার শিরে জ্বলে মণি
তাহারে দেখিতে করে ভয় ॥"

নারায়ণদেবের মনসামঙ্গলের ভাষা খুব প্রাচীন। কবি মৈমনসিং জেলার বোরগ্রামে বাস করতেন। তিনি কি ভাবে তাঁর কাব্য লিখ্‌তে সুরু করেন তা' বলেছেন :

"তৎপরে পদ্মা মোরে দেখাইলা স্বপন।
কবিত্বের আশা মোর সেহি ত কারণ ॥
গুণীর সাক্ষাতে আমি কি বলিব বাণী।
কোকিল সাক্ষাতে যেন কাকে করে ধ্বনি ॥
মুনি-মুখে শুনিয়াছি সৃষ্টির পত্তন।
পদ্মাপুরাণ কথা শুন জ্ঞানিজন ॥".

এ ছাড়া আর আর নাম-করা মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে আছেন বিপ্রদাস কেতকাদাস—ক্ষেমানন্দ, দ্বিজ বংশীদাস, ষষ্ঠীবর দত্ত, জীবন মৈত্র প্রভৃতি। মনসামঙ্গলের মত করুণ কাহিনী বাঙ্গালী কি করে এত ভালবেসেছিল ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে।

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

—দশ—

ইতিমধ্যে তিন বন্ধু পরম নিশ্চিন্ত মনে রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে বাস করতে লোগলা এবং ওদের ব্যবহারে রেড ইণ্ডিয়ানরা যাতে কোনো রকম সন্দেহ ক'রতে না পারে সে দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে ভুললো না। ইতিমধ্যে ডিক রোজ তাদের মালপত্র কিছু কিছু ক'রে কোটের আড়ালে লুকিয়ে নির্জ্জনে নিয়ে গিয়ে একটুকরো কাপড়ে বেঁধে ক্রুসোকে দিয়ে যথাস্থানে

পাঠিয়ে দিতে লাগলো। জিনিষপত্র এ ভাবে নিয়ে যাবার ফলে যে জায়গাটা খালি হয়ে যাচ্ছিল বাইসনের পরিত্যক্ত চামড়া দিয়ে ডিক তা ভরে দিতে লাগলো। ফলে কেউই কিছু টের পেলো না। এ ভাবে একটু একটু করে সমস্ত মালপত্র যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো।

ইতিমধ্যে অবশ্য জো একেবারে হাল ছাড়ে নি; সর্দ্দারকে সে অনেক রকম ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, অনেক অনুনয় ক'রেছে কিন্তু সর্দ্দারও শেষ পর্য্যন্ত লোভ সামলাতে পারে নি। ফ্যাকাশে-মুখোদের সঙ্গে শান্তির ধূম পান করেছে বলেই তার বিবেক ওদের হত্যা করার পরামর্শে সায় দিচ্ছিলো না; কিন্তু ওদের মালপত্র এবং ঘোড়াগুলো হাত-ছাড়া করা তার অভিপ্রায় নয়।

শেষ পর্য্যন্ত ওদের পালাবার দিন এলো। অন্ধকার রাত্রি। নিশ্চিন্ত মনে শীষ দিতে দিতে ওরা হ্রদের দিকে অগ্রসর হ'লো, যেন প্রতি দিনের অভ্যাস মত এমনি বেড়াতে বেরিয়েছে। মাহ্‌তাওয়া কিন্তু, কেমন ক'রে জানি না, ওদের ওপরে সন্দেহ ক'রে ওদের পেছু পেছু চললো। ওকে দেখে জো নিরুৎসাহ কণ্ঠে বললো, "হতভাগা কেমন ক'রে জানি না সন্দেহ ক'রেছে! যা-ই হোক, চলো এগিয়ে যাই।"

"হতভাগার কপালে শেষ পর্য্যন্ত মরণই আছে দেখছি!" দাঁতে দাঁত চেপে হেন্‌রি চাপা গলায় বললো।

যেন কিছু হয় নি, এমন ভাব বজায় রেখে ওরা গল্প ক'রতে ক'রতে পথ চলতে লাগলো। শীষ দিতে দিতে হ্রদের তীরে গিয়ে একটা ক্যানো খুলে নিয়ে ওরা তাতে বসলো।

মাহ্‌তাওয়াও অপর একটা ক্যানোয় ক'রে ওদের অনুসরণ করলো। সে জানতো, ফ্যাকাশে-মুখোরা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কারণ বন্দুকের শব্দ হ'লেই গ্রামের সকলে শুনতে পাবে। সে নিশ্চিন্ত মনে ওদের নৌকোর কাছে এগিয়ে গেলো।

"ফ্যাকাশে-মুখোরা অনেক দেরীতে শিকারে যায় দেখছি!"—সে বললো।

"শিকারে নয়, আমরা চাঁদের আলো ভালোবাসি। ঘণ্টা খানেক পরেই চাঁদ উঠবে; আমরা অনেকক্ষণ ধ'রে চাঁদের আলো উপভোগ করবো।"

"পনি-সর্দ্দারও চাঁদের আলো ভালোবাসে। সেও ফ্যাকাশে-মুখোদের সঙ্গে যাবে।"

"বেশ তো, আসুক না সেও।" —জো নির্লিপ্ত স্বরে বললো।

ওদের স্বচ্ছন্দভাব দেখে সর্দ্দার একটু আশ্চর্য্য হ'লো। যাই হোক, ওপারে নেমে ওদের সঙ্গে কিছুদূর পর্য্যন্ত গিয়ে সে বললো, "ফ্যাকাশে-মুখোরা একাই যাক, মাহ্‌তাওয়া তাঁবুতে ফিরবে।"

এর উত্তরে জো অতর্কিত ভাবে ওর গলা টিপে ধরলো। হঠাৎ আক্রান্ত হ'য়ে মাহ্‌তাওয়া চীৎকার ক'রতে যাচ্ছিলো, কিন্তু জো'র হাতের আঙুল ততক্ষণে তার কণ্ঠরোধ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে মাহ্‌তাওয়া ছুরি বের করতে উদ্যত হ'লো, কিন্তু হেন্‌রি বিদ্যুৎগতিতে তার দু'হাত পেছন থেকে জড়িয়ে ধ'রে মুহূর্ত্ত মধ্যে কাবু ক'রে ফেললো তাকে। ততক্ষণে ডিক একটা রুমাল তার মুখে এঁটে বেঁধে দিয়েছে। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে দু' মিনিটও লাগলো না। তারপর ওর ছুরি আর টম্যাহক কেড়ে নিয়ে হেন্‌রি আর জো ওকে ধ'রে নিয়ে যেতে লাগলো।

কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি ক'রে মাহ্‌তাওয়া যখন দেখলো সে বৃথাই শক্তিক্ষয় করছে, তখন সে হতাশ হ'য়ে ক্ষান্ত হ'লো।

প্রান্তরের কাছে ওকে নিয়ে গিয়ে ওরা তার মুখের বাঁধন খুলে দিলো, কারণ এত দূর থেকে চীৎকার ক'রলে সে শব্দ যে গ্রামে পৌঁছবে না, এ তারা জানতো।

"এবার ওকে মেরে ফেলি, কেমন ?" হেনরির হাত নিষ্‌পিষ্‌ করছে।

"না না, ওকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে আমরা চ'লে যাবো।"—জো বললো।

"কিন্তু তা হ'লেও তো ও না খেতে পেয়ে মারা যাবে। তার চেয়ে বরং—"

"সে ওর কপাল। তবে আমার মনে হয়, দু'-একদিনের মধ্যেই গ্রামের কেউ না কেউ ওকে দেখতে পাবে। আর ওর শরীরে যা চর্বি আছে, তাতে দু'-তিন দিন না খেয়েও স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারবে। একমাত্র আপত্তি হ'লো, ওকে বাঁধবার জন্য যেটুকু দড়ি দরকার সেটুকুও আমাদের উদ্বৃত্ত নেই। কিন্তু তার আর উপায় কি!"

"উপায় আছে জো, উপায় আছে। আমি উপায় করছি। ওকে একটা গাছে উঠতে বলো তো!"

"কেন ডিক ?"

"শোনো-ই না যা বলছি!"

সর্দ্দারকে গাছে ওঠার হুকুম দিতে সে আশ্চর্য্য হ'লো। কিন্তু হুকুম তামিল না ক'রে উপায় কি ? একলাফে গাছে উঠে পড়লো সে। তখন ডিক বললে, "ক্রুসো, ওকে পাহারা দে।"

গাছের ওপরে মাহ্‌তাওয়ার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সঙ্গে সঙ্গে ক্রুসো গাছটার তলায় গিয়ে বসলো। তারপর তার দু' সারি তীক্ষ্ণ দাঁতের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে, মেঘগর্জ্জনের মত শব্দ ক'রে সে মাহ্‌তাওয়াকে বুঝিয়ে দিলো যে পালাবার চেষ্টা করা আর সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ডেকে আনা একই কথা।

পনি-মেয়েটি কথা রেখেছিলো। ঘোড়াগুলো যথাস্থানেই ছিলো। ক্রুসোকে পাহারায় রেখে ওরা সেখানে গিয়ে মালপত্র ঘোড়ায় চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

কিছুদূর পর্য্যন্ত গিয়ে ডিক থেমে দাঁড়ালো। তারপর দু'টো আঙুল মুখে দিয়ে তীক্ষ্ণ শীষ দিয়ে উঠলো।

অনেক দূর থেকে আসা সেই শীষ ক্রুসোর কানে প্রবেশ করতেই সে তীরবেগে শব্দ লক্ষ্য ক'রে ছুটে চললো। মাহ্‌তাওয়াও মুহূর্ত্তমাত্র দেরী না করে প্রাণপণে চীৎকার ক'রতে ক'রতে গ্রামের দিকে ছুটতে লাগলো।

এর প্রায় দশ মিনিটের মধ্যেই রেড ইণ্ডিয়ানরা দলে দলে ওদের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। (ক্রমশঃ)

বিসর্জন

[দ্বিতীয় অঙ্ক]

(প্রথম দৃশ্য)

জনৈক পুরবাসী

[পরবর্তী অঙ্কের দৃশ্যপট উত্তোলিত হবার আগে ঐকতান-বাদন, "পান-বিড়ি-সিগ্‌রেট", "সলটেড্‌ বাদাম"—অর্থাৎ নুন-মাখানো বাসি চীনেবাদাম ভাজা—"চাই চানাচুর"; "লিমনেড চাই, লিমনেড্‌", "চা বিস্কুট", দর্শকগণের নানা কণ্ঠে বুকনি, টিপ্পনি, হাসি, চীৎকার, পদশব্দ, সুগন্ধ ইত্যাদি নাট্যদর্শনের বিরতির মধ্যে যে অঙ্গটি থাকে আমার এই নাট্যের বিরতিতে তার কিছুই নেই এবং সে-সবের আয়োজনের উপায়ও নেই। আমার এই নাট্য দুই অঙ্কে সমাপ্ত। আর, এ নাটের গুরু আমিও নই এবং অঙ্ক দু'টির মাঝে বিরতিও অনেকখানি। এত অনেক যে তার মধ্যে যে-সব ঘটনা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের জীবনে ঘটেছে সে-সবের বর্ণনার মতো শক্তিশালী লেখনী আমার নয়। প্রত্যেক মানুষের জীবনই এক-একখানি উপন্যাস। তার পৃষ্ঠাসংখ্যা হাজার হাজার, ঘটনা ও রঙের সমাবেশও বহু। মানুষের জীবনের একটি দিনের কাহিনীই লিখতে বা বলতে গেলে হয় বিস্তর। আবার, বহির্লোকের ঘটনাবলীকেও ছাপিয়ে যায় মনোলোকের ঘটনাপ্রবাহ। কাজেই বিরতির বিবরণ দিতে পারলাম না। কেবল এইটুকু বলবো, বিসর্জনের শেষ নেই, আগমনীও অন্তহীন; হাসি-অশ্রুর এই তরঙ্গে জীবন নিত্য দোলায়মান। তাই যে ঘরে এক সন্ধ্যায় বিসর্জন হয়েছিল ঠিক সেই ঘরে না হ'লেও তারই পাশে সেই দোতলায় রাজবাড়িতে আবার এক সন্ধ্যায় আগমনীর বাজনা বেজে উঠ্‌লো। কিন্তু এ বাজনা জয়ঢাক বা ঢোল-কাঁসি অথবা শানাইয়ের নয়, কাচের গেলাসে রক্তিম পানীয়ে—সাদা অথে ভাসমান বরফের টুকরোর। কাজেই আওয়াজটুকু হচ্ছিল, টুং টাং।]

উপস্থিত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের হাতেই একটি করে শীতল পানীয়ের গেলাস। সকলেই চেয়ারে উপবিষ্ট। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। পাথরের ঠাণ্ডা মেজেয় পায়ের কাছে একটি লাল রঙের লোমশ কুকুর শুয়ে আছে। সেদিন গরমও পড়েছিল খুব। ১৯৫১ সালের গরমের কথা ইতিহাসের রোজনামচায় উঠেছে কিনা জানি না, তবে আমাদের "বিসর্জনের" আগমনীর কাহিনীতে তার জায়গা একেবারে পাকা। কারণ সেই গরমেই আমরা মাথা বরফের চেয়েও

ঠাণ্ডা করে সিদ্ধান্ত করলাম, “বিসর্জন” অভিনয় করবোই। কারণ “বিসর্জনে” আমরা অভ্যস্ত।

আমাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটি উঠে ঘুরে শুল। শোনা আছে, কুকুর—বিলাতী কুকুর বুদ্ধিমান্ প্রাণী; দেশী কুকুরের কাণ্ডকারখানা তো লোকে দু’বেলা দেখ্ছে। তাই ওর এমন একটি নামকরণ করেছে যাতে জাতটির পৌরুষকে তো অস্বীকার করা হয়েছেই, এমন কি গায়ে, মাথায় যে লোমগুলি আছে সেগুলিকেও ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয় নি! কাজেই সে যদি ঘুরে শুতো তা হ’লে মনে খটকা লাগতো না। কিন্তু বিলাতী কুকুরের ঘুরে শোয়াতে চিন্তিত না হয়ে থাকা গেল না। আর ঠিক তখনই কথা উঠলো, “কিন্তু চাঁদপাল? চাঁদপাল কে হবে?”

“আর রঘুপতি?”

“গণেশ? গণেশ হবে কে?”

কে যেন বললেন, “রঘুপতি তো তৈরিই আছে। চল, সকলে মিলে তাঁকে পাকৃড়াও করা যাক্ তো।”

“কিন্তু তিনি এখন ঢাকায়।”

জিজ্ঞেস করলাম, “রিহার্সাল দেওয়া হবে কোথায়?’

“কেন, যেখানে দেওয়া হচ্ছিল সেখানে।”

“মানে, ক্ষিতীন বাবুদের বাড়ীতে?”

কুকুরটি উঠে দাঁড়িয়ে একটু এদিক্-ওদিক ঘুরলো। এর-ওর মুখের দিকে একবার করে তাকালো। পশুরা নাকি হাসতে পারে না, পারলে ফিক্ করে হেসে ফেলতো।

ঠিক তখনই ক্ষিতীন বাবু মৃদু হাস্যে, মৃদু কণ্ঠে বললেন, “আমার ওখানে—”

ক্ষেত্রপাল বাবু বললেন, “না না, আমার সেই জায়গাতেই হবে। আমি বলে দেব।”

এমন সময় তাঁকে তাঁর বাড়ি থেকে চাকর ডাকতে এল। লোকটি বলিষ্ঠ, কৃষ্ণবর্ণ, গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জী, কাপড়খানি ফেরতা দিয়ে পরা। সেই সুসজ্জিত, সুপরিচ্ছন্ন পরিবেশে অতগুলি ভদ্রলোকের মধ্যে লোকটিকে দেখে কুকুরটির সুরুচিবোধে বোধ হয় আলোড়ন উঠলো। সে ভীষণ হুঙ্কার করে তাকে তেড়ে গেল। লোকটিও তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি-পথে অদৃশ্য!

গৃহস্বামীর আহ্বানে কুকুরটি রুদ্ধরোষে বার দুই ফোঁস ফোঁস শব্দে নিঃশ্বাস

ফেলে যেন ভৃত্যটির অপ্রীতিকর গাত্রগন্ধ তার মার্জিত নাসিকা থেকে বার করে দিল। তার ক্রিয়াকলাপে বোঝা গেল, সে কেবল বুদ্ধিমান্ নয়, চাকরও তাড়ায় এবং মার্জিতরুচি। আর চোর তাড়ানো তো কুকুর জাতির প্রকৃতিগত গুণ। তবে অপরিচিত ব্যক্তিমাত্রই বাড়ী ঢুকলে তাকে চোর জ্ঞানে চীৎকার করে এই যা দোষ।

রাজামশাই বললেন, “গণেশ আর চাঁদপাল যোগাড় হয়ে যাবে। তোমরা আর যারা আছে তাদের খবর দাও।”

অতঃপর রাজসভা ভঙ্গ হ’ল। আমরা নেমে এলাম। যাঁরা রাজভক্ত ও রাজা মশাইয়ের প্রিয়পাত্র তাঁরা তখনও রয়ে গেলেন। (ক্রমশঃ)

তিন বোন

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

মিনি।
নোলাতে জল ঝরে মেয়ের দেখলে পরে চিনি।
চাঁদের দেশে যাবার তরে
দাদুর কাছে বায়না ধরে,
গুব্‌রে-পোকা দেখলে আবার ভিরমি যাবেন তিনি।
মিনি।

জুলু।
একে চন্দর লিখতে গিয়ে নয়ন ঢুলু ঢুলু।
খেলনা-শালে কি আহ্লাদে
বিনি দুধের পায়েস রাঁধে;—
আজ বুঝি তার মেয়ের বিয়ে, দিচ্ছে সে তাই উলু।
জুলু।

সোনা।
ঐ যে দেখো, ভিজে-বেড়াল করছে আনাগোনা।
মেঝেয় আমের আচার ফেলে
মিষ্টি মাসী বাইরে গেলে,
খামচে খানিক, মার কাছে গে’ দেখবে পশম বোনা।
সোনা।

কলা খাও

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি

রামধনুতে একবার একটা ধাঁধা বেরিয়েছিল—

"কাঁচা খাও পাকা খাও, খাইতে রসাল,
আমি যদি খেতে বলি চটে হও লাল।"

উত্তরটি অবশ্যি খুব সহজ, কিন্তু অদ্ভুত নয় কি? চলতি কথায় 'কলা খাও' বললে বুঝতে হবে কিচ্ছুই পাচ্ছ না তুমি; অর্থাৎ কলা জিনিষটার মধ্যে যেন কিছুই সার পদার্থ নেই। জানি না, কোন্ যুগে কি ভাবে কথাটার চলতি হ'ল, কিন্তু এমন অন্তঃসারশূন্য কথাও বোধ হয় বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় নেই। কারণ কলার মত সারবান্ পদার্থ খাবারের মধ্যে কমই আছে।

আমাদের দেশে যত রকম ফল আছে তার মধ্যে আমই হয়তো সবচেয়ে জনপ্রিয়, কিন্তু কলার মত পুষ্টিকর বোধ হয় আর কোনোটাই নয়। এমন কি, আজকালকার কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, যদি একটি লোক সারাজীবন আর কিছু না খেয়ে একমাত্র কলা খেয়ে থাকে তা হ'লেও তার সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার বা পুষ্টির কোন রকম ব্যাঘাত হবে না। জীবনধারণের ও দেহপুষ্টির প্রায় যাবতীয় উপাদানই এই ফলটির মধ্যে আছে। তা ছাড়া কলার চাষও খুব সহজ। এক বিঘে জমিতে কলার চাষ করলে যা আয় দেয়, অন্য কোন ফসলের চাষ করলে তা হয় না। দামেও পড়ে সস্তা। এবং, আর একটা মস্ত সুবিধে, কলার চাষ বারো মাসই চলতে পারে—যত্ন করলে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সব সময়েই কলা ফলে।

ভাল পাকা কলা তো দেবভোগ্য জিনিষ। হিন্দুদের পূজাপার্ব্বণে, নৈবেদ্যে এটি একটি অপরিহার্য্য বস্তু। কলাগাছটিই তো মাঙ্গলিক চিহ্ন। পাকা কলা খেতেও তেমনি চমৎকার। কাঁচা কলাও তরকারি হিসেবে এ দেশে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। জিনিষটি অত্যন্ত পুষ্টিকর—এবং রুগ্ন লোকেরাও নিশ্চিন্তে খেয়ে থাকে। কাঁচকলার ঝোল পেটের পক্ষে খুব ভাল। তা ছাড়া কাঁচকলাকে মুখরোচক করার জন্যও নানা উপায় বেরিয়েছে ওস্তাদ্ রাঁধুনিদের কল্যাণে। যেমন ধর, কাঁচকলার মাখন, কাঁচকলার গুলি-কাবাব ইত্যাদি। অনেক জায়গায় কাঁচকলার ময়দা দিয়ে রুটি তৈরী করেও খায় লোকে, এবং সে রুটিও নাকি বেশ সুস্বাদু। প্রক্রিয়াটি শোন:

কাঁচকলার খোসা ফেলে দিয়ে ভিতরের অংশটা টুকরো টুকরো করে কেটে কয়েক দিন রোদে শুকুতে দিতে হয়। তার পর, শুকিয়ে মচমচে হয়ে গেলে, সেগুলি খুব মিহি ক'রে গুঁড়িয়ে ছাঁকনিতে ছেঁকে নিলেই হ'ল। এরই নাম, কলার ময়দা।

পাকা কলা তো এমনিই খায় লোকে। তা ছাড়া দুধ বা দইএর সঙ্গে চিঁড়ে দিয়ে মেখে খেলে তা হ'ল ভট্চাযি্য মশাইদের ভাষায় "ফলার"। কলার বড়া, কলার মালপো, কলার কাষ্টার্ড ইত্যাদি হরেক রকম খাবারও করা যেতে পারে কলা দিয়ে। আফ্রিকার কোন কোন দেশে কলা থেকে নানা রকম মদ তৈরী করা হয়—সে-দেশী লোকদের তা নাকি খুবই প্রিয়। কলা থেকে ভিনিগারও তৈরী হয় কোন কোন দেশে। প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপে কলাই হচ্ছে লোকের প্রধান খাদ্য। খুব বড় জাতের কলা হয় সেখানে—এক একটা কম ক'রে দু' ফুট লম্বা আর বেড়েও তেমনি। মালয়ে এক জাতের কলা হয়—সেগুলি এত বড় যে একটা কলা দিয়ে তিন জন জোয়ান লোকের পেট ভরিয়ে দেওয়া যায়। মিশরেও খুব উঁচু জাতের কলা জন্মে। যেমন ধর, কমলা রংএর কলা। এগুলি খুব সুগন্ধি বলে অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি হয়। আমাদের দেশের "অগ্নীশ্বর" নামে টুকটুকে লাল কলা, সিঙ্গাপুরের কাঁচকলার রংএর সবুজ মিষ্টি কলা—এ সব তো তোমরাও দেখেছ এবং হামেশাই খাচ্ছ।

এ ছাড়া মোচার ঘণ্ট আর থোড় ছেঁচকি তো অমাদের প্রায় নিত্যকার খাদ্য-তালিকার অঙ্গ। মোচা হচ্ছে গিয়ে কলার ফুল, আর থোড় হচ্ছে কলার কাণ্ডের ভিতরকার অংশ। কলা একবার ফললে পরে সে গাছে আর কলা ধরে না। তখন তাকে কেটে ফেলে ভিতরকার অংশ বার করে নেওয়া হয়। অবশ্য ততদিন তার আশপাশ দিয়ে মাটিতে আবার নতুন কলাগাছ বেরিয়ে যাওয়ায় এতে ক্ষতি হয় না কিছু।

কলাগাছের প্রায় কোন অংশই ফেলা হয় না। কলাপাতা থালা হিসাবে সর্ব্বদাই ব্যবহার করা হচ্ছে—বিশেষ করে নেমন্তন্ন-বাড়ীতে তো ও প্রায় অপরিহার্য্য। আফ্রিকার অনেক জায়গায় কলাপাতা দিয়ে ঘরের চাল তৈরী করা হয়, ছাতার বদলেও ব্যবহার করে জংলীরা। কলাগাছের খোলও আমাদের দেশে বাসন হিসাবে ব্যবহার করা হয়—বিশেষতঃ শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে। পূর্ব্ববঙ্গে কলাগাছ দিয়ে ভেলা তৈরী করে নৌকোর মত ব্যবহার করারও খুব রেওয়াজ আছে। বর্ষাকালে সেখানে সব ডুবে যায়। এ-বাড়ী ও-বাড়ী যেতে হ'লেও নৌকো লাগে। গরীব লোকেরা তাই অনেক সময় কলাগাছ দিয়ে ভেলা তৈরী করে নৌকোর অভাব পূর্ণ করে। কলার "এঁটের" ক্ষার-জল দিয়ে লবণের কাজ চালায় অনেকে। আসামের কোন কোন জায়গায় তরকারিতে নুন না দিয়ে ঐ ক্ষারজল ব্যবহার করা হয়। এ দেশে সাবান আমদানী হবার আগে কাপড়-চোপড় কাচতে হ'লে লোকেরা সকলেই প্রায় কলার ক্ষার ব্যবহার করত। কলাগাছের খোলা পুড়িয়ে এই ক্ষার তৈরী করা হ'ত। চমৎকার সাবানের কাজ চলত তা দিয়ে। এ ছাড়া নানা রকম ওষুধেও কলার ব্যবহার ছিল এবং এখনও আছে।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন কলার মধ্যে শতকরা ৭০।৭৫ ভাগ অংশই খাবার উপযোগী। চাটিম, মর্ত্তমান প্রভৃতি কতকগুলি কলায় আরও বেশী—৮০।৮৫ ভাগ। কাঁচ-

কলার মধ্যে পাঁচ ভাগের একভাগই হচ্ছে শ্বেতসার বা ষ্টার্চ। কলা পাকলে এই শ্বেতসার চিনিতে পরিণত হয়। তাই পাকা কলা এত মিষ্টি লাগে। এ ছাড়া কলার মধ্যে প্রোটিন এবং তেল বা চর্বি জাতীয় পদার্থও খানিকটা ক'রে থাকে। শরীরের ভাল রকম পুষ্টির জন্য এর সব ক'টিরই প্রয়োজন।

শুধু প্রোটিন, চর্ব্বি আর শ্বেতসারই নয়, কলার মধ্যে কতকগুলি ধাতব পদার্থও থাকে যা নাকি শরীরের গঠনের জন্য অত্যন্ত দরকারী বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। কলা পুড়িয়ে যে ছাই পাওয়া যায় তা নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা করলে দেখা যাবে তার মধ্যে রয়েছে লোহা, তামা, ম্যাঙ্গানীজ্, ক্যালসিয়াম, পোটাসিয়াম্, সোডিয়াম্, ম্যাগনেসিয়াম্ ইত্যাদি ধাতু। এ ছাড়া গন্ধক, ফসফরাস, আয়োডিন প্রভৃতি আরও কয়েকটি মৌলিক পদার্থও কলার মধ্যে পাবে। এর সবগুলিই শরীরের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয়। তামা, লোহা, ম্যাঙ্গানীজ এবং কলার ভেতরকার চিনি শরীরের রক্ত বাড়াতে সাহায্য করে, রক্ত পরিষ্কারও রাখে।

কলার আর একটা মস্ত গুণ হচ্ছে ওর ভিটামিন-সম্পদ্। ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি, ভিটামিন-সি, ভিটামিন-জি, ভিটামিন-ই—সবই পাওয়া যায় কলার মধ্যে, এবং কোন কোনটা খুব বেশী মাত্রায়। শিশুদের পক্ষে যে ভিটামিন-এ পরম প্রয়োজনীয় তা হয়তো শুনেছ। ভিটামিন-বি, সিও কম উপকারী নয়।

এমন অনেক খাদ্য আছে যার ভিতর প্রচুর ভিটামিন আছে কিন্তু রান্না করলে বা সিদ্ধ করলে তার অনেকখানিই নষ্ট হয়ে যায়। যেমন ধর আলু, দুধ, শাকশব্জি ইত্যাদি। কলার বেলায় কিন্তু সে আশঙ্কা নেই, কারণ পাকা কলা কাঁচাই খাওয়া হয়, সিদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না। এই কারণে দুধ আর কলা একত্রে একটি আদর্শ খাদ্য বলা যেতে পারে। দুধের মধ্যে যে সব জিনিষ কম পরিমাণে পাওয়া যায় কলা সেগুলো পুষিয়ে দেয়। তা ছাড়া কলার তাপমানও—বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে "ক্যালরিফিক্ ভ্যালু"—খুব বেশী। আগুন জ্বালিয়ে রাখতে গেলে যেমন কয়লার দরকার তেমনি শরীরকে টিকিয়ে রাখতেও ইন্ধন দরকার। এই ইন্ধন হিসাবে কলা খুব কার্য্যকরী। এই জন্যই কলা খেলে কাজ করবার শক্তি বেশ বাড়ে।

কলার গন্ধ তোমরা পছন্দ কর কি? আমার তো খুব ভাল লাগে। সিরাপ্ খেতে গেলে আমি ব্যানানা সিরাপই খুঁজি আগে। 'ব্যানানা' হচ্ছে কলার ইংরেজি নাম। কলার এই সুমিষ্ট গন্ধের কারণ হচ্ছে 'এমাইল্ এসিটেট্' নামে একরকম সুগন্ধি—যা কলা পাকবার সময়ে তার মধ্যে জমতে থাকে। কাঁচা কলা কেটে এনে ঘরে পাকালে কিন্তু এ জিনিষটি তেমন জন্মাতে পারে না—সে কলায় সুমিষ্ট গন্ধও তাই পাওয়া যায় না। গাছ থেকে কখন কলা পাড়তে হবে তা অভিজ্ঞতা থেকে ঠিক করতে হয়। ঈষৎ হলদে রং দেখা না দিলে কলার কাঁদি কাটা উচিত নয়।

যে সব জায়গা ঈষৎ স্যাঁতসেঁতে কিন্তু বেশ গরম সেখানেই কলার চাষ ভাল হয়। এজন্য বিলাতে কলা বড় একটা হয় না। অবশ্যি আজকাল কলার উপযোগী কৃত্রিম আবহাওয়া তৈরী করে সেখানেও কলার চাষ সুরু হয়েছে। কোন কোন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ কলার উপকারিতা দেখিয়ে এ বিষয়ে জোর তদ্বির সুরু করেছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এদিক্ দিয়ে আরও এগিয়ে গেছে।

আগে সেখানে একদম কলা পাওয়া যেত না, অল্প কয়েক বছরের চেষ্টায় এখন সেখানে প্রতি বছর কোটি কোটি কাঁদি কলা ফলানো হচ্ছে।

কলা সম্বন্ধে আর একটা মজার কথা বলে আজ কলার গল্প শেষ করি। কলার খোসা কি সাংঘাতিক চীজ তোমরা নিশ্চয়ই জান। রাস্তায় কলার খোসায় পা হড়কে কত অঘটন যে ঘটতে দেখা গেছে তার ঠিক নেই। তোমরা, যারা শিবরাম বাবুর 'কলকতার হালচাল' বইখানা পড়েছ, তারা সেই বিখ্যাত দু'ভাই হর্ষবর্দ্ধন-গোবর্দ্ধনের কলার খোসায় চেপে চৌরঙ্গী ভ্রমণের কথা নিশ্চয়ই ভোল নি? কাজেই নিজেরা কলা খেয়ে তার খোসাটি যেখানে সেখানে তো ফেলবে না-ই, উপরন্তু রাস্তার কোথাও কলার খোসা পড়ে থাকতে দেখলে সাবাধানে পা দিয়ে ঠেলে সেটাকে নিরাপদ জায়গায় ফেলে দেবে। এটির নাম পৌরবোধ—"সিভিক সেন্স"। তবে অবশ্যি সব জিনিষেরই দোষের সঙ্গে কিছু কিছু গুণ থাকে, কলার খোসাতেও আছে। গুণটি হচ্ছে—এর জীবাণু প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, খোসাশুদ্ধ কলাকে কোন জীবাণু-ভর্ত্তি তরল পদার্থে ডুবিয়ে দিলেও খোসা ভেদ করে সে জীবাণু শাসের ভিতরে ঢুকতে পারে না। অর্থাৎ খোসা যদি অক্ষত থাকে তবে সে কলার ভিতর, রোগের বীজাণু ঢোকার আশঙ্কা নেই বললেই চলে। কথাটা বড় হেলা-ফেলার নয়। অবশ্যি আস্ত কলা সম্বন্ধেই কথাটা খাটে, কাটা বা খোসা-ছাড়ানো কলা সম্বন্ধে নয়।

বোম্বাইএ বিশ্ব টেবল-টেনিস প্রতিযোগিতা

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী

গত ফেব্রুয়ারী মাসে বম্বেতে নিখিল বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। যে কোনো খেলার বিশ্ব-প্রতিযোগিতা ভারতবর্ষে বোধ হয় এই প্রথম।

এ বছরের খেলা কয়েকটি কারণে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথমতঃ

এতদিন টেবিল-টেনিস ইয়োরোপের খেলা বলেই পরিচিত হয়ে আসছিলো (যদিও একবার আমেরিকা এই খেলায় জয়লাভ করে)। কিন্তু এবার এসিয়া থেকে বহু দেশ এই খেলায় যোগদান করে। আর, দ্বিতীয়তঃ, জাপানের অপূর্ব্ব নৈপুণ্য। জাপানের টেবল-টেনিস সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চ ধারণা কারো ছিলো না, কিন্তু একাদিক্রমে পুরুষদের সিঙ্গ্‌লস, পুরুষদের ডাবল্‌স্‌, মহিলাদের ডাবল্‌স্‌ এবং কর্বিলন কাপ (মহিলা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা) জয় ক'রে জাপান সমালোচকদের স্তব্ধ ক'রে দিয়েছে।

গত বছরের পুরুষদের সিঙ্গ্‌লস বিজয়ী জনি লীচ, রিচার্ড বার্গম্যান (ইংল্যাণ্ড), কক্‌জিয়ান, সিডো (হাঙ্গেরী), এ্যামুরেতি, রুথফ্‌ট্‌ (ফ্রান্স) রেইস্‌ম্যান, কার্টল্যাণ্ড (আমেরিকা),—এদের মধ্যে থেকেই যে একজন এবারে বিজয়ী হবে, এ বিষয়ে কারো সন্দেহ মাত্র ছিলো না। এদের মধ্যে আবার রিচার্ড বার্গম্যানেরই বিজয়ী হবার সম্ভাবনা ছিলো সবার থেকে বেশী।

পুরুষদের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সোয়েথ্‌লিং কাপের খেলা ক্রমেই অগ্রসর হ'তে লাগলো। সমস্ত দেশ দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে লীগ্‌ প্রথায় এই খেলা হয়। প্রথম ভাগে পর পর স্থান অধিকার করলো হাঙ্গেরী, হংকং, ভিয়েৎনাম, সিঙ্গাপুর, ব্রেজিল, চিলি এবং সব শেষে আফগানিস্থান; আর অন্য ভাগে করলো ইংলণ্ড, জাপান, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ, জার্মানী, পোর্টুগাল, কম্বোডিয়া, আর সব শেষে পাকিস্তান।

ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্স ও জাপান তীব্র প্রতিযোগিতা করেছিলো। ফ্রান্সের সঙ্গে খেলায় ইংলণ্ডের বার্গম্যান তিনটি ম্যাচেই জয়লাভ করেন এবং ফ্রান্সের হগেনর তিনটি ম্যাচেই পরাজয় বরণ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইংলণ্ডের জনি লীচ সেদিন এ্যামুরেতি ও রুথফ্‌ট্‌ উভয়ের কাছেই পরাজিত হ'ন। জাপানের সঙ্গে খেলাতে ইংলণ্ড ৫-২ স্কোরে জয়লাভ করে। সেদিনের খেলায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য হলো বার্গম্যানের ওপরে সাতোর জয়লাভ এবং ফুজির সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উভয়ে একটা করে গেম পাবার পর শেষ গেমে ফুজি ২০-১৫ পয়েন্টে অগ্রগামী ছিলেন, অর্থাৎ আর এক পয়েন্ট পেলেই তিনি বার্গম্যানকে পরাজিত করেন; কিন্তু সে এক পয়েন্ট আর তাঁর হলো না। অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখিয়ে বার্গম্যান এই প্রায়-হেরে-যাওয়া গেমে জয়লাভ করলেন। ফলাফল হ'ল এই রকম:—সিমন্‌স হারালেন হায়াষিকে (১-০), বার্গম্যান হারলেন সাতোর কাছে (১-১), লীচ হারালেন ফুজিকে (২-১) বার্গম্যান হারালেন হায়াষীকে (৩-১), সিমন্‌স্‌ হারালেন ফুজিকে (৪-১), লীচ হারলেন সাতোর কাছে (৪-২) বার্গম্যান হারালেন ফুজিকে (৫-২)। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের কাছে ৫-১ স্কোরে হারলেও সে খেলায় উল্লেখযোগ্য হলো এখনকার বিশ্ববিজয়ী খেলোয়াড় লীচের ওপরে ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় থিরুভেঙ্গড়মের জয়লাভ। ভারতের জয়ন্ত ও শিবরামন সেদিন ভালো খেলতে পারেন নি।

অপর ভাগে হাঙ্গেরীর সঙ্গে কেউই বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে নি। সেদিনের খেলায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য হয়েছিলো চুন্‌-চিন-সিঙ্‌এর কাছে সিডোর পরাজয়।

ইংলণ্ড আর হাঙ্গেরীর মধ্যে চূড়ান্ত বিজয়ী নির্ব্বাচনের জন্য এর পরে খেলা হয়। অভাবনীয় উত্তেজনার মধ্যে হাঙ্গেরী শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করে। সেদিনের খেলাতেও সব থেকে উল্লেখযোগ্য হলো বার্গম্যানের তিনটি খেলাতেই ষ্ট্রেট সেটে জয়লাভ। হাঙ্গেরীর জাপেজী আর ইংলণ্ডের সিমন্‌সের মধ্যে শেষ খেলা হয় এবং সেই খেলায় জাপেজী জয়লাভ করায় হাঙ্গেরী সোয়েথ্‌লিং কাপ্‌ লাভ করে এ খেলা দর্শকদের বহুদিন মনে থাকবে। দ্বিতীয় খেলায় কক্‌জিয়াঁনের সঙ্গে খেলতে খেলতে বেচারা সিমন্‌সের হঠাৎ পা মচকে যায় এবং ফলে তাঁকে পরবর্ত্তী খেলায় সিডোকে ওয়াক্‌ওভার দিতে বাধ্য হ'তে হয়। ইংলণ্ড ৪-৩ স্কোরে অগ্রগামী ছিলো, কিন্তু অষ্টম ম্যাচে সিডো লীচকে পরাজিত করায় চূড়ান্ত খেলার জন্য খোঁড়াতে খোঁড়াতেই তাঁকে খেলতে হ'ল। জনতা এতক্ষণ হাঙ্গেরীর পক্ষ সমর্থন করছিলো, কারণ তারা সর্ব্বদাই পেছিয়ে পড়ছিলো। কিন্তু অসুস্থ সিনমস্‌ জাপেজীর বিরুদ্ধে নামতেই সমস্ত দর্শকবৃন্দ তাঁর পক্ষ অবলম্বন করল। অসুস্থ অবস্থাতেও সিমন্‌স্‌ অপূর্ব্ব খেলা দেখালেন। প্রথম গেমে ২০-১৫তে অগ্রগামী থেকেও বেচারা শেষ পর্য্যন্ত গেমটা হেরে যান। দ্বিতীয় গেম্‌ সিমন্‌স্‌ সহজেই লাভ করেন এবং শেষ গেমেরও মাঝামাঝি পর্য্যন্ত তাঁর পয়েন্ট বেশী ছিলো। তার পরেই সুরু হ'লো এক অপূর্ব্ব উত্তেজনাময় খেলা। জাপেজী ১৪-১১ পয়েন্টে এবং পরে ১৬-১৪ পয়েন্টে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সিমন্‌স্‌ আবার তাঁকে ধরে ফেললেন। কিন্তু এর পরে আর সিমন্‌স্‌-আর একটা পয়েন্টও পেলেন না, ইংলণ্ড ৫-৪ স্কোরে হাঙ্গেরীর কাছে পরাজয় বরণ করলো। সুস্থ থাকলে সিমন্‌স্‌ হয়তো সহজেই জাপেজীকে পরাজিত করতে পারিতেন।

সোয়েথ্‌লিং কাপের এই খেলার ফলাফল লক্ষ্য করলে বুঝবে, সাতো সব

ক'টি খেলাতেই জয়লাভ করেছেন। তার পর ভালো ফলাফল হলো বার্গমানের। বার্গম্যান কেবল মাত্র সাতো'র কাছে পরাজয় বরণ করেছেন, বাকী-সকল দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই হারিয়েছেন। এর পর কে ভালো তা' বলা কঠিন, কারণ হাঙ্গেরী অন্য ভাগে থাকায় তার সঙ্গে জাপানের এবং ফ্রান্সের খেলা হয় নি। এজন্য জোর ক'রে কিছু বলা কঠিন।

ভারতবর্ষ অন্যান্য বছরের থেকে এবারে ভালো খেলেছে। ভারতবর্ষের খেলোয়াড়দের মধ্যে থিরুভেঙ্গড়ম্ জনি লীচ্‌কে হারিয়ে এবং কল্যাণ জয়ন্ত ফুজিকে হারিয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। জাপানের বিরুদ্ধে জয়ন্ত দে-ও খুব ভালো খেলেছিলেন এবং সাতোর সঙ্গে চূড়ান্ত খেলায়ও তিনি খুব সামান্যর জন্যই পরাজিত হ'ন।

অন্যান্য খেলার— বিশেষতঃ মেয়েদের খেলার বিবরণ বারান্তরে বল্‌ব।

বেডসার—যমজ ভ্রাতৃদ্বয়

শ্রীঅমলকুমার মিত্র, বি. এ

তোমাদের মধ্যে যারা খেলাধূলার খবর রাখতে ভালবাস তারা নিশ্চয় ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেটের যমজ বেডসার ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম শুনে থাকবে। এই দুই যমজ ভাইয়ের নাম এরিক ও এলেক। এঁরা শুধু ক্রিকেট খেলার জন্যই বিখ্যাত ন'ন, দু'জনের চেহারায় আশ্চর্য্য সাদৃশ্য থাকার দরুণ তাঁরা যে সব মজার মজার কাণ্ড করে বসেন সে জন্যও বিখ্যাত হয়েছেন। তোমাদের মত বয়সে স্কুলে তাঁরা একই নম্বর পেতেন। অঙ্কে একই রকম ভুল করতেন, রচনাতে একই রকম শব্দ-অলঙ্কার ব্যবহার করতেন। মাষ্টার মশাইরা, দুই ভাইয়ে নকল করছে ভেবে, ধরবার শত চেষ্টা করেও হিমসিম খেয়ে যেতেন। দুই ভাই হলের দুই কোণায় বসে পরীক্ষা দিতেন, নকল করবেন কি করে? কিন্তু মাষ্টার মশাইরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতেন না যে ওঁরা নকল করেন না।

তাঁরা যখন আরও ছোট ছিলেন—একেবারে মার কোলের শিশু যখন তাঁরা,—মা হয়তো এরিককে ভুল করে দু'বার দুধ খাওয়ালেন, এলেক একবারও পেলেন না। ঠিক যেন সেই 'হাসিরাশি' বইএর রামু আর শ্যামু।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এলেক ছিলেন ইটালীতে। সেখানে তাঁর জনডিস্ হ'ল। পাঁচ সপ্তাহ যেতে না যেতে এরিকও ঐ একই রোগের কবলে পড়লেন। এলেক তাঁর ভাইকে দেখতে মিলিটারী হাসপাতালে গেলেন। তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে যাবেন, এমন সময় নার্স দৌড়ে এসে তাঁকে একটা ধমক দিলেন—"আপনি এর মধ্যেই হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিয়েছেন! যান—শীগ্‌গির গিয়ে শুয়ে পড়ুন,।" তারপর এলেকের দিকে আর একবার ভাল করে তাকিয়ে বললেন, "কিন্তু আপনাকে দেখে তো বেশ সুস্থ—সবল বলেই মনে হচ্ছে। আপনি কি করে এত তাড়াতাড়ি সেরে উঠলেন?"

আর একদিনের ঘটনা। ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। দু'ভাই একই দলে খেলছেন। আম্পায়ার জ্যাক হব্‌স্। বিপক্ষ দলে তখন ব্যাট করছেন ফ্রাঙ্ক উলি। তোমরা নিশ্চয়ই জান, ক্রিকেট খেলায় বোলারকে এক ওভারে ছ'টা করে বল দিতে দেওয়া হয়। জ্যাক হব্‌স্ ভুল করে তিনটি বল এরিককে ও তিনটি বল এলেককে করতে দিলেন। ফ্র্যাঙ্ক উলি বিভিন্ন বলের বিভিন্ন গতি দেখে বেশ থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন।

দুই ভাই ইংল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করে অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়েছেন। প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলা হবে সিডনীতে। দু'জনে ঠিক করলেন খেলার আগে সেলুনে গিয়ে চুল ছাঁটতে হবে। এরিক আগে গিয়ে চুল ছেঁটে আসার কিছুক্ষণ পরে এলেক গেলেন। তাঁকে দেখেই নাপিত চোখ ছানাবড়া করে বলে উঠলেন, "এর মধ্যেই আপনার চুল এত বড় হয়ে গেল!" এলেক মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, "সে আপনার তেলের গুণেই, নাপিত ভায়া!"

একরাত্রির ঘটনা

শ্রীভাগবতদাস বরাট

বিখ্যাত বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীনের অপূর্ব্ব সাহসিকতা ও বীরত্বের নানা কাহিনী আমরা সকলেই কিছু না কিছু শুনেছি কিন্তু তাঁর রহস্যপ্রিয়তার কাহিনী হয়ত সকলের জানা নেই। সেই গল্প একটি বলি।

তখন বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। যতীন্দ্রনাথ কোন দরকারে বাড়ী ফিরে যাচ্ছিলেন। শিয়ালদহে রাত দশটার পর ঢাকা মেল ধরে রাত দু'টোর সময় তিনি কুষ্টিয়ায় নামলেন। যতীন্দ্রনাথ যখন শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেন ধরেন সেই সময় তিনি একজন গোয়েন্দা পুলিশকে তাঁর অনুসরণ করতে লক্ষ্য করেছিলেন। পুলিশটিকে তিনি কিন্তু আগের থেকেই চিনতেন। ভদ্রলোক কুষ্টিয়ার একজন মোক্তার, ওরফে, যতীন্দ্রনাথের প্রিয় ভজাদা'র আপন শ্যালক। ছায়ার মত গোয়েন্দা পুলিশটি যতীন্দ্রনাথের পিছু পিছু অনুসরণ করে চলেছেন। যতীন্দ্রনাথ যেদিকে যান, পুলিশ ভদ্রলোকও সেদিকে যান। মহামুস্কিল! কিছুতেই তাঁকে

এড়াতে পারেন না তিনি। যতীন্দ্রনাথ আপন মনেই হাসেন। ভাবেন, চাকরির কি মোহ!

রাত গভীর। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। সূচীভেদ্য নিবিড় অন্ধকার। যেন পৃথিবীর বক্ষে একটা মসী-কালো যবনিকা। জাগতিক অভিনয় দিনান্তে শেষ হ'য়ে গেছে,—এ যেন তার নিশানা। যতীন্দ্রনাথ যাবেন নদীর অপর পারে 'কেয়া' গ্রামে। নির্জ্জন পথঘাট, শ্মশানের মতই নীরব। যতীন্দ্রনাথ কি ভাবলেন, তারপর কেয়া গ্রামের পথ না ধরে সটান আমলাপাড়ায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। গোয়েন্দা পুলিশটিও লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে চললেন।

হঠাৎ একটি বাড়ীর সামনে যতীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর "ভজাদা', ভজাদা" বলে চীৎকার সুরু করলেন। বাঘা যতীনের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ভজাদা'র পরিচয় ছিল। ঘুম ভাঙ্গতেই তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। তারপর যতীন্দ্রনাথকে দেখে বললেন, "এ কি, যতীন যে! খবর কি? এত রাত্রে!"

যতীন্দ্রনাথ সহাস্যে উত্তর দিলেন, "তোমার বেশ আক্কেল, ভজাদা'! আপনার বড় কুটুমকে অন্ধকার রাতে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছ! ভদ্রলোক তো প্রাণের ভয়ে আমার শরণ নিয়ে পেছনে পেছনে ঘোরাঘুরি করছেন। নাও, খাতির করে বাড়ীতে নিয়ে যাও। কথার শেষে যতীন্দ্রনাথ পিছনের পুলিশ ভদ্রলোকটিকে উদ্দেশ করে বললেন, "ও মশাই, এদিকে আসুন। কুটুম-বাড়ী, এতে লজ্জার কি!"

অস্পষ্ট আলোকে একজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কাছে আসতেই ভজাদা' চিনতে পারলেন, ভদ্রলোক তাঁরই আপন শ্যালক।

যতীন্দ্রনাথ ততক্ষণে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়েছেন।

সাত ভাই চম্পা

রূপকথায় এমন অনেক গল্প পাওয়া যায় যার চরিত্রগুলির নাম সত্যিকার জগৎ থেকে নেওয়া। ঐতিহাসিক ঘটনা বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নামের সঙ্গে জড়িত করে গল্প বা রূপকথা রচনা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই চলে আসছে। 'সাত ভাই চম্পা'র গল্প তোমরা প্রত্যেকেই শুনেছ। অনেকে মনে করেন এই গল্পের নামাকরণও ঐ রকম ঐতিহাসিক বা কিম্বদন্তী-মূলক নাম থেকে নেওয়া হয়েছে,—যদিও সেখানে ভাইদের নয়, বোনটির নামই চম্পা।

কপোতাক্ষ নদীর ধারে ব্রাহ্মণনগরের রাজা ছিলেন মুকুট রায়। তাঁর ছিল সাত ছেলে আর এক মেয়ে চম্পাবতী। এই চম্পাবতীই নাকি ঐ রূপকথার গল্পের বোন। আর সাত রাজপুত্র তাঁর সাত ভাই।

গাথা-সাহিত্যে বড়খাঁ গাজী নামে এক পরাক্রান্ত মুসলমান রাজার কাহিনী পাওয়া যায়। এই গাজী ব্রাহ্মণনগর আক্রমণ ক'রে অধিকার করেন। রাজা মুকুট রায় পরাজিত হয়ে সপরিবারে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং কন্যা চম্পাবতীর সঙ্গে বড়খাঁ গাজীর বিবাহ দেন। এর মধ্যে অবশ্যি কতখানি ঐতিহাসিক সত্য আছে বলা কঠিন। কারণ কিম্বদন্তী মাত্রই ইতিহাস নয়।

গাথা-সাহিত্যে এই গাজীকে নানা রকম আলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে বলা হয়েছে। সুপ্রসিদ্ধ 'রায়মঙ্গল' কাব্যে এবং "কালুগাজী ও চম্পাবতী" নামে একখানা প্রাচীন গাথায় এঁর সম্বন্ধে আরও অনেক গল্প আছে।

তুমি কি জান

নীচের কথাগুলি আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি কিন্তু ওর আসল অর্থ হয়তো অনেকেই জানি না। এগুলি শিখে রাখলে মন্দ কি?

অকাল কুষ্মাণ্ড—অপদার্থ, মূর্খ, গোঁয়ার লোকদের—যাদের দ্বারা সমাজ বা পরিবারের মাথা নীচু হয়, তাদেরকেই গালাগালি দিয়ে এই নামে অভিহিত করা হয়। মহাভারতে আছে, রাণী গান্ধারী অসময়ে কুষ্মাণ্ড অর্থাৎ কুমড়োর মত অদ্ভুত আকারের একটি সন্তান প্রসব করেছিলেন। সেই অদ্ভুত কুষ্মাণ্ডাকৃতি বস্তুটি থেকেই দুর্য্যোধন প্রভৃতি একশ'টি ছেলের জন্ম হয়। এই ছেলেরা কেউই সদ্‌গুণশালী ছিল না—তাদেরই দোষে কুরুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। আবার, যে কুমড়ো অকালে ফলে তা দিয়ে দেবপূজা প্রভৃতি কোন কাজই হয় না। এ জন্যও অপদার্থ অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হয়।

হাতে পাঁজি মঙ্গল বার—হাতের কাছে উপায় থাকতে তা না দেখে অন্যের পরামর্শ নিতে গেলে এই কথাটি ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ আমরা পাঁজি বা পঞ্জিকা দেখে কি বার কি তিথি—এ সব ঠিক করি। সেই পঞ্জিকা আমার হাতে ধরে রেখে আমি যদি অপরকে জিজ্ঞাসা করতে যাই মঙ্গল বার কবে, তবে তা অদ্ভুত শোনাবে না কি?

কালাপানির রহস্য

শ্রীশান্তা দেবী

ক্যাপটেন মেলরী জীবনের পঞ্চাশ বছরই জাহাজে জাহাজে কাটিয়েছেন। ধরতে গেলে জলেরই বাসিন্দা তিনি। সমুদ্রের অভিজ্ঞতাও তাঁর অপরিসীম। লোকটি এদিকেও বেশ গল্পবাজ। কাজেই তিনি যখন অবসর নিয়ে ছুটি কাটাতে আমাদের এই ছোট্ট সহরে এসে বাস করতে লাগলেন তখন তাঁকে নিয়ে আমাদের সান্ধ্য আড্ডাগুলি ভালই জমত।

সেদিন সারা দিন মেঘলা হয়ে আছে; শীতও বেশ একটু পড়েছে। কিন্তু আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় হাজিরার কমতি হয় নি। ক্যাপটেন মেলরী আগুনের ধারটিতে গিয়ে বসেছেন, আমরাও ওভারকোট মুড়িসুড়ি দিয়ে বসেছি।

কফির পেয়ালায় লম্বা এক চুমুক টেনে জ্যাক বল্‌ল, "এমন দিনে ভূতের গল্প শুনতে বেশ লাগে। ক্যাপটেন নিশ্চয়ই কোন-না-কোন দিন ভূতের পাল্লায় পড়েছেন, আজ তারই একটা গল্প বলুন।"

"ঠিক ভূত নয়, তবে আমি একবার এক ভূতুড়ে জাহাজের পাল্লায় পড়েছিলাম।"—মেলরী জবাব দিলেন।

"কি রকম—কি রকম?"—আমরা সাগ্রহে চেয়ারগুলো একটু এগিয়ে নিলাম তাঁর দিকে। মেলরী সুরু করলেন :

"বহু দিনের কথা। আমি তখন সবে জাহাজে চাকরী নিয়ে ঢুকেছি। আমাদের জাহাজখানা তখন মেলবোর্ণ থেকে সিঙ্গাপুর যাতায়াত করত। আমি জাহাজে ঢুকবার আগে ঐ অঞ্চলে একটা ঘটনা ঘটেছিল, আমার নাবিক-বন্ধুরা প্রায়ই তার গল্প করত। 'ঈগল' নামে একখানা জাহাজ অষ্ট্রেলিয়া থেকে রওনা হবার পর মাঝ সমুদ্রে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। জাহাজখানা যে সমুদ্রে ডোবে নি সে বিষয়ে প্রায় সকলেই নিঃসন্দেহ ছিল। সে সময়ে বা তার আগে-পরে ও অঞ্চলে কোন ঝড়ের কথাও কেউ শোনে নি। সমুদ্র সে সময়ে খুবই শান্ত থাকে। নিখোঁজ হবার ২।৩ দিন আগে সুমাত্রা নামে আর একখানি মাল-টানা জাহাজের সঙ্গে ঈগলের দেখা হয়। সুমাত্রার নাবিকেরা বলে, ঈগলের ভিতর নাকি অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের এক সিন্দুক বোঝাই সোনা আসছিল, কি জন্য তা অবশ্যি কেউই জানে না। এর কয়েকদিন পরে সেই সুমাত্রাই একটি মুমূর্ষু লোককে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে। একটুকরো ভাঙ্গা কাঠের ওপর লোকটা ভাসছিল, তার সর্ব্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন। লোকটি বেশীক্ষণ বাঁচে নি—শুধু মারা যাবার আগে জানিয়ে যায় যে সে ঐ ঈগল জাহাজেরই একজন লস্কর।

এর পর আর সবটাই রহস্যে ঢাকা।

তারপর প্রায় ৩।৪ বছর কেটে গেছে। জাহাজে আমার এক সহকর্মী ছিল,—গ্রীগরী। খুব অল্প দিনের মধ্যেই তার সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর অন্য নাবিকেরা যখন যে যার বিছানায় শুয়ে পড়ত গ্রীগরী তখন প্রায়ই আমাকে ডেকে নিয়ে জাহাজের নির্জ্জন ডেকের ওপর ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে নানা গল্প করত। গ্রীগরী বলত সে ভূত বিশ্বাস করে এবং এই রকম গভীর রাত্রে নানা অশরীরী আত্মা সমুদ্রের ওপর ঘুরে বেড়ায়। অথচ এই সময় ডেকের ওপর একটু না বেড়িয়েও সে থাকতে পারে না। তাই আমাকে সে সঙ্গী হবার জন্য ডেকেছে। দু'জন থাকলে আবার ভয় কিসের!

সেদিনও এই রকম আমরা ডেকের ওপর পায়চারী করছিলাম। সেদিন ছিল পূর্ণিমা, চাঁদের আলো হাজার টুকরো হয়ে সমুদ্রের বুকে যেন ফেটে পড়েছে। হঠাৎ দেখি, গ্রীগরীর মুখ শুকিয়ে কাগজের মত হয়ে গেছে। কোন কথা না বলে সে শুধু সামনের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দিল।

যে দৃশ্য দেখলাম তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। হঠাৎ দেখলাম অদ্ভুত চেহারার বিরাট একখানা জাহাজ তীব্রগতিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। অদ্ভুত এই জন্য যে জাহাজখানা একদম তোবড়ানো, তার মাস্তুলগুলো সব ভাঙ্গা। তা ছাড়া তার সারা গায়ে নানারকম সামুদ্রিক শ্যাওলা এবং জলজ উদ্ভিদ লেগে রয়েছে; তার মধ্যে অসংখ্য শামুক-ঝিনুক জড়ানো। মনে হ'ল জাহাজটা যেন অনেক দিন সমুদ্রের তলায় ডুবে ছিল, সেই

অবস্থাতেই সেটা উঠে এসেছে। জাহাজটা আর একটু কাছে আসতেই মনে হ'ল দূরে তার রেলিং ধরে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার জামা-কাপড় শতছিন্ন, সমস্ত মুখ চুল-দাড়িতে ছেয়ে গেছে।

প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হতে লাগল এখনই বুঝি জাহাজটা তীরবেগে ছুটতে ছুটতে হুমড়ি খেয়ে আমাদের জাহাজের ওপর পড়বে। ভয়ে আমার হাত-পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল, সমস্ত শরীর যেন অসাড় হয়ে গেছে, মুখ দিয়ে একটা কথা বার করতে পারলাম না আমি। গ্রীগরীর অবস্থাও আমারই মত।

কিন্তু আশ্চর্য্য, পর মুহূর্ত্তে সে জাহাজ সেই আরোহী সমেত কোথায় মিলিয়ে গেল! একটু সম্বিৎ ফিরে পেতেই দেখলাম সামনে সমুদ্রের জলে চাঁদের আলো তেমনি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে।

সেই রাত্রেই আচমকা সমুদ্রে বিরাট ঝড় উঠল। অমন ভীষণ ঝড় আমার জীবনে আমি খুব কমই দেখেছি। আমাদের জাহাজের লস্করেরা বহু চেষ্টা করেও জাহাজের গতি আয়ত্তে রাখতে পারল না, নির্দ্দিষ্ট পথ ছেড়ে জাহাজ ঝড়ের তালে, অজানা সমুদ্রে ভেসে চলল।

দু'দিন দু'রাত্রি পরে ঝড় থামল। আমরাও, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এইবার লক্ষ্য করলাম, আমাদের জাহাজ যেখানে এসে থেমেছে সেখানটা খুব গভীর নয়—এবং তারই কিছু দূরে জলের তলা থেকে ওপর দিকে মাথা খাড়া করে আছে এক অতিকায় ডুবো-পাহাড়ের চূড়ো। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, একটা বিরাট হাঙ্গর যেন হাঁ করে জাহাজ গিলবার জন্য ওৎ পেতে রয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে কোন কোন জায়গায় এ রকম ডুবো-পাহাড়ের কথা আমরা জানতাম। নাবিকেরা একে বলে ভূতুড়ে পাহাড়। কোন জাহাজ চলতে চলতে এই রকম কোন পাহাড়ের ওপর এসে পড়লে আর তার রক্ষা নেই! আমাদের বরাত খুবই ভাল যে আমাদের জাহাজটা ওর ওপর গিয়ে উঠবার আগেই থামানো গেছে।

জাহাজ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল। ভূতুড়ে পাহাড় সম্বন্ধে অনেক লোকের কাছেই অনেক কথা বহু দিন থেকে শুনে আসছি। কাজেই ও সম্বন্ধে আমার বরাবরই একটা কৌতূহল ছিল। আমি ঠিক করলাম, চুপি চুপি একটা বোট নিয়ে পাহাড়টা একটু ঘুরে দেখে আসব। কাউকে জানাব না, এমন কি গ্রীগরীকেও না। ওর যা ভূতের ভয়!

সকলের অজ্ঞানতে জাহাজ থেকে ছোট্ট একটা বোট খুলে নিয়ে জলে নেমে পড়লাম। জল খুব কম, সহজেই পাহাড় ঘুরে ও-পাশে হাজির হওয়া গেল। কিন্তু সেখানে গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। দেখলাম আমার চোখের সামনে ঝড়ের আগে দেখা সেই ভূতুড়ে জাহাজটি দাঁড়িয়ে আছে। মাস্তুলগুলো ভাঙ্গাচোরা, তোবড়ানো সারা গায়ে নানরকম সামুদ্রিক শ্যাওলা আর জলজ উদ্ভিদ লেগে রয়েছে। তার সঙ্গে আটকে রয়েছে অসংখ্য শামুক-ঝিনুক। চিনতে আমার একটুও ভুল হ'ল না। ভয় কাকে বলে আমি কোন দিনই জানি না, কিন্তু তবু আমার বুকটা হঠাৎ কেমন ছম্ ছম্ করে উঠল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। একটা অদম্য কৌতূহল আমাকে চেপে বসল। রহস্য আমাকে ভেদ করতেই হবে।

পা বাড়িয়ে দেখলাম এবার হেঁটেই জলের ওপর দিয়ে যাওয়া যাবে। বোট সেইখানে রেখে আমি জাহাজটার দিকে এগিয়ে গেলাম, এবং একটু পরেই লক্ষ্য করলাম—আবছা হ'লেও জাহাজের নামটা স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে—"ঈগল"।

এই তবে সেই নিখোঁজ জাহাজ ঈগল! বোধ হয় ডুবো-পাহাড়ে ধাক্কা লেগেই তার এই দশা। কিন্তু পথ ছেড়ে এখানে এ এল কি করে?

ধীরে ধীরে ঈগলের ভিতর প্রবেশ করলাম। ডেকের ওপর এত শ্যাওলা জমাট হয়ে আছে যে পা যেন কাদার মত বসে যাচ্ছিল। যাই হোক, কোন রকমে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। কিন্তু ওপরে উঠেই যা চোখে পড়ল তাতে আমারও বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। ঝড়ের আগে ভূতুড়ে জাহাজে চকিতের জন্য যে নরমূর্ত্তি চোখে পড়েছিল, ঠিক সেই মূর্ত্তি আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেই শতছিন্ন পোষাক, চুল-দাড়িতে সমস্ত মুখ ছেয়ে আছে। আমাকে দেখে সেও প্রথমটা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারপর অবাক্ হয়ে বল্‌ল, "তুমি এখানে কি চাও? আমাকে ধরতে এসেছ? তিন বছর ধরে আমি এখানে রয়েছি। জাহাজের খাবার কবে শেষ হয়ে গেছে। তিন বছর আমি শুধু সমুদ্রের কাঁকড়া খেয়ে আছি। আমাকে ধরবে তুমি!" তার পরই অট্টহাস্যে সে ফেটে পড়ল। মনে হ'ল বহুকাল কথা না বলায় তার গলার স্বরে যেন মরচে পড়ে গেছে।

আমার বিস্ময়ের ভাব দেখে লোকটি কি যেন ভেবে নিল। তারপর বল্‌ল, "ওঃ, তুমি বুঝি সেই সোনার সিন্ধুকের খবর রাখ না? আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে।"

লোকটি যে প্রেতাত্মা নয় সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম, তাই তার পেছন পেছন এগিয়ে গেলাম। তা ছাড়া ওর চাইতে আমার গায়ের জোরও বেশী। লোকটি একটি কেবিনের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। দেখলাম, সামনে একটা প্রকাণ্ড লোহার সিন্ধুক। ডালা খুলতেই চোখে পড়ল তার মধ্যে স্তূপীকৃত সোনার চাকতি। লোকটি বলতে লাগল, "এখন বোধ হয় আমাকে চিনতে পারছ? আমার নাম ডি'মেলো। ঈগল জাহাজের নাম শুনেছ? আমি সেই ঈগলের একজন নাবিক। এই সোনার জন্য আমি জাহাজের সমস্ত লোককে খুন করেছি। তাদের কেটে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছি। তারপর জাহাজ নিয়ে পালাবার সময় এই ভূতুড়ে পাহাড় আমার সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ করে দিয়েছে। কিন্তু আমি মরি নি, এ সোনাও ছাড়ি নি। যক্ষের মত আমি এ সোনা দিনরাত আগলে আছি। এ ছেড়ে আমি সভ্য জগতেও আর ফিরে যেতে চাই না। আর তুমি এসেছ বাগড়া দিতে? আজ তোমাকেও"—বলতে বলতে সেই পাগল আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁড়াশীর মত দু'হাত দিয়ে সজোরে আমার গলা টিপে ধরল। আচমকা আক্রান্ত হয়ে আমি বাধা দেবার কোনই সুযোগ পেলাম না, পর মুহূর্ত্তে সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম।

জ্ঞান হ'লে দেখলাম আমি আমাদের নিজেদের জাহাজে শুয়ে আছি। গ্রীগরী আমার ওপর ঝুঁকে রয়েছে। জাহাজের ক্যাপটেন এবং কয়েকজন নাবিকও রয়েছে। গ্রীগরীর কাছেই বাকি সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারলাম। অনেকক্ষণ আমাকে না দেখে এবং একখানি বোট নেই দেখে ওরা আমার খোঁজে জলে নেমে পড়ে, তারপর খুঁজতে খুঁজতে ঈগল জাহাজে গিয়ে উঠে।

ঠিক যে মুহূর্ত্তে ডি'মেলো আমার গলা টিপে ধরেছিল ঠিক সেই সময়ে ওরা কেবিনে ঢুকে পড়ে। ডি'মেলো ওদের দেখে এত উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে তাইতেই তার হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। ওরা আমাকে উদ্ধার করে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।"

"কিন্তু ঈগল জাহাজ আর তার সেই মহামূল্য সোনার সিন্ধুক কি চিরকাল ওখানেই পড়ে রইল?"—আমরা জানতে চাইলাম।

"ওখানে নয়, সমুদ্রের তলায়।" ক্যাপটেন মেলরী বললেন। "এ অঞ্চলের সমুদ্রতলে ভূমিকম্প একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ছোটখাট ভূমিকম্পে অবশ্য কিছু হয় না, কিন্তু বড়দরের ভূমিকম্পে অনেক কিছুই হতে পারে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। হঠাৎ একটা বিরাট ভূমিকম্পে ডুবো-পাহাড় এবং ডি'মেলো সমেত ঈগল সমুদ্রের তলায় চলে যায় এবং জল বেড়ে ওঠায় আমাদের জাহাজটাও মুক্তি পেয়ে ভেসে উঠবার সুযোগ পায়।"

ক্যাপটেন মেলরী আবার চুপ করলেন।

"কিন্তু একটা রহস্য তবু রয়ে গেল।"—জ্যাক বল্‌ল।—"ঈগল জাহাজটাকে অমন ভূতুড়ে জাহাজের মত করে আসতে দেখা গিয়েছিল কেন, আর কি করেই বা তা আপনি মিলিয়ে গেল এ তো বোঝা গেল না!"

"ও রকম হয়। মরুভূমিতে মরীচিকা কেমন করে হয় জান ত'? গরম দেশের সমুদ্রেও ঐ রকম মরীচিকা দেখা দিতে পারে। ওক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল। আসলে ঈগল তার নিজের জায়গাতেই ছিল। বহুদূর থেকে মরীচিকায় তাকে আমরা ঐ ভাবে দেখতে পেয়েছিলাম। তবে দু'দিন পরে ভাসতে ভাসতে আবার ঠিক সেইখানে গিয়ে তারই কাছে হাজির হওয়া ব্যাপারটা অবশ্য ছিল সম্পূর্ণ দৈবের ব্যাপার।" *

* বিদেশী গল্পের ছায়া নিয়ে।

—প্রতিদান—

শ্রীঅহিভূষণ চৌধুরী

তপ্ত মাটির বুকের 'পরে ছোট্ট চারা গাছ,—
হাওয়ায় কাঁপে কোমল তাহার চিকণ-কচি কায়া;
ছোট্ট, তবু মাটির কাছে ঋণী—সে তা' জানে,
মাটিরে তাই সাধ্য-মতো দিয়েছে সে ছায়া।

চিত্রশালা

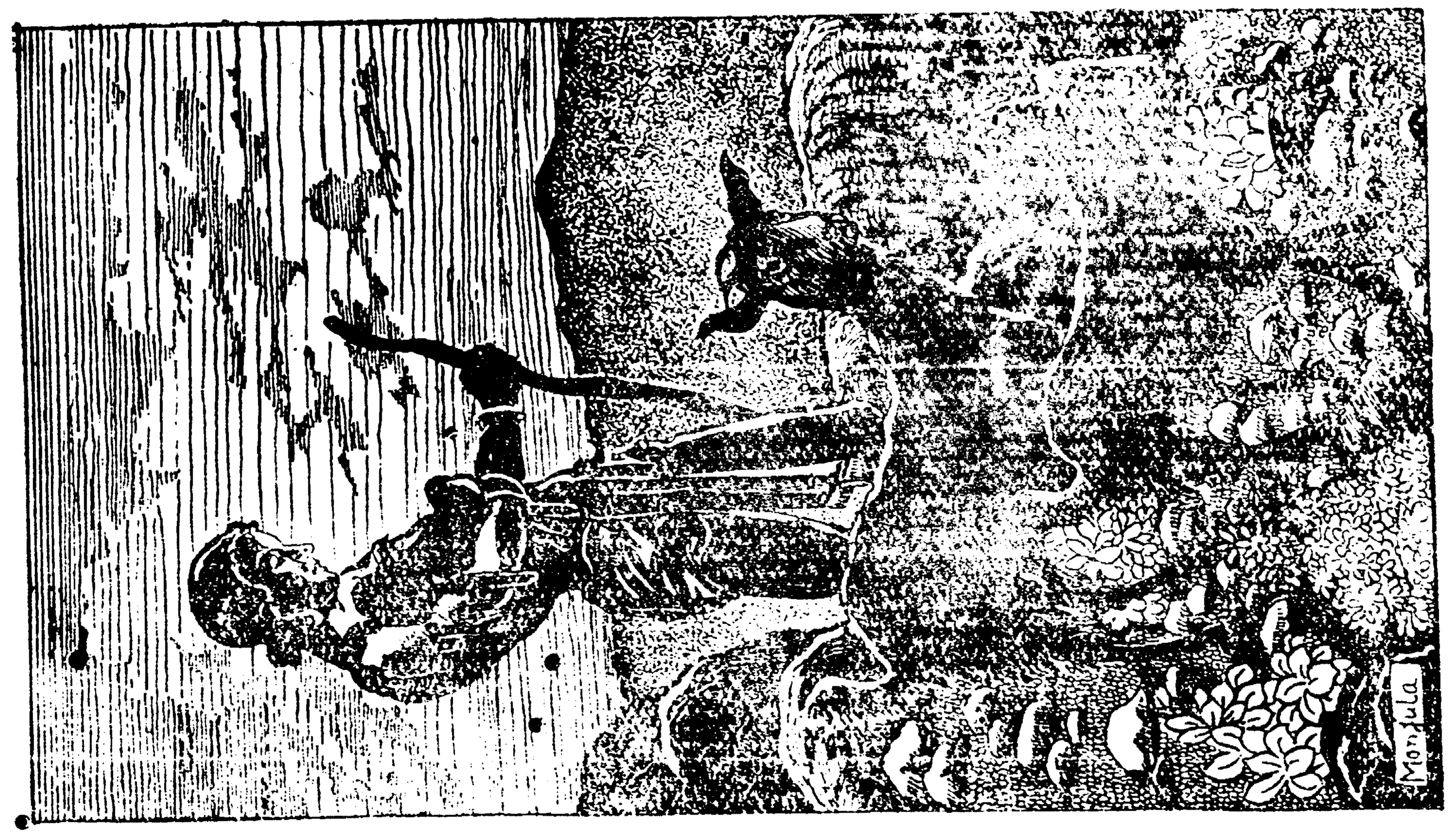

প্রত্যাবর্তন

বাঁশী

আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

এই সংখ্যার সঙ্গে রামধনুর বয়স ২৪ বছর পূর্ণ হ'ল। আসছে মাস থেকে সুরু হবে রামধনুর রজত-জয়ন্তী বর্ষ। বাংলা দেশে ছোটদের পত্রিকার মধ্যে এ পর্য্যন্ত এ সৌভাগ্য আর মাত্র দু'টি পত্রিকার জুটেছে। কাজেই তোমরা, যারা রামধনুকে ভালবাস, তারা নিশ্চয়ই খুব খুসী হবে।

রজত-জয়ন্তী বর্ষে আমরা কি আয়োজন করছি তা জানবার জন্য তোমরা আগ্রহ দেখিয়েছ। স্বভাবতঃই আমরা এই বছরটিকে শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা দিয়ে—রূপসজ্জা দিয়ে স্মরণীয় করে রাখবার চেষ্টা করব। লেখক ও শিল্পীরা এদিক্ দিয়ে তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। এ ছাড়া এই বছরে আমরা একটি বিশেষ রজত-জয়ন্তী সংখ্যা প্রকাশ করব বলে ঠিক করেছি। সেটিও যাতে নানা বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ হয় তার চেষ্টা চলছে। তোমাদের স্নেহ-ভালবাসা রামধনুর এই নতুন যাত্রাপথে তাকে নতুন প্রেরণা দেবে এ ভরসা আমাদের আছে।

• শ্রীঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান)—ধাঁধার উত্তর ঠিক ঠিক দেওয়া সত্বেও তোমার নাম বেরোয় নি, নিশ্চয়ই এ খুব অন্যায় কথা। তুমি বোধ হয় পুরস্কার-প্রতিযোগিতার লেখার সঙ্গে ধাঁধার উত্তর একত্র পাঠিয়েছিলে, তাই ওটি প্রথমোক্ত ফাইলের সঙ্গে চলে গিয়ে এই বিভ্রাট বাধিয়েছে। এবারে আমরা খুব সাবধান হয়েছি। এর প্রমাণ স্বরূপ প্রথমেই তোমার নাম দেখতে পাবে।

• শ্রীবাণী মজুমদার (বহরমপুর)—তোমার দিদি, রামধনুর অন্যতম গ্রাহিকা শ্রীমতী মঞ্জুলা মজুমদারের শুভবিবাহের নিমন্ত্রণ পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি। আশীর্ব্বাদ এবং শুভেচ্ছা নিশ্চয়ই জানাব। ওদের যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ হোক এই কামনা করি। শ্রীরত্না দেবী (বাঁকিপুর)—তোমার প্লেনে দার্জিলিং যাওয়ার

রমণীয় অভিজ্ঞতা আরও বিস্তারিত করে জানালে আমরাও হয়তো তা উপভোগ করতে পারি। শ্রীহরিচরণ ভাদুড়ী (গয়া)—ভাদুড়ী শব্দটির উৎপত্তি কি করে হ'ল অন্ততঃ তোমার জানা উচিত। ভাদুড়িয়া পরগণার লোকদের ঐ নামে অভিহিত করা হ'ত। তার পর অবশ্যি তাদের বংশধরেরা সারা বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়ে,—বিশেষতঃ বরেন্দ্রভূমে। শ্রীমুকুলরাণী মণ্ডল (মেদিনীপুর)—তোমার সুন্দরবনে নৌকোয় বসে লেখা সুন্দর চিঠিখানি পেয়ে খুব মজা লাগল। সুন্দরবনের চাক্ষুষ দেখা অভিজ্ঞতা লিখে পাঠালে নিশ্চয়ই আরও ভাল লাগবে। গতবারে তোমার ধাঁধার জবাবটা গাণিতিক হিসাবে ঠিক হ'লেও ধাঁধার হিসাবে ঠিক হয় নি। ৯ বছরে কেউ নিজে দাদু হয় আর ৫ বছরে বাবা হয় এ রকম অদ্ভুত কথা কখনও শুনেছ ? শ্রীবেণু ঘোষ (কাটিহার)—বিহারীদের দোল খেলার যে বিবরণ দিয়েছ তা আমাদের কাছে নতুন। এখানে তো এক বেলার মধ্যেই যা কিছু শেষ হয়ে যায়। 'রামধনুর ভাইবোনদের উদ্দেশে পাঠানো তোমার আবীর তাদের কাছে ছড়িয়ে দিলাম। আরও হুঁশিয়ার না হ'লে কি ধাঁধার জবাব দেওয়া যায় ?

আগেই বলেছি, রামধনুতে ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠকে তোমাদের অনেক লেখা মনোনীত হয়ে অপেক্ষা করছে। তার কয়েকটির নাম এখানে দিলাম :—কর্ত্তব্যপালন, চিঠি—নমিতা দাম, নতুন বর্ষ—অঞ্জন দত্ত, প্রশ্ন সমাধান—অশোক চৌধুরী, আগমনী—কল্যাণ সেনগুপ্ত, স্বাধীনতার পথে, কয়লা-খনির চিঠি—জয়ন্ত দাশ, ওঠো, জাগো—প্রকৃতি পণ্ডিত, শারদীয়া—দীপালি সেনগুপ্তা, শ্রাবণের ঝরণা—অমলা মুখোপাধ্যায়, কারে এত ভালবাসি-নির্মলেন্দু সরকার। এ ছাড়া আরও অনেক আছে। আস্তে আস্তে সেগুলোর নাম দেব। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেন। জয় হিন্দ—ইতি রাঃ সঃ

মাঘ মাসের পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল

সব চেয়ে ভালো লেখার জন্য পুরস্কার পেলেন শ্রীঅরুন্ধতী মিত্র (নিউ দিল্লী)। আর যাঁদের লেখা ভালো হয়েছে :—শ্রীসুনীতি চৌধুরী (ভাণ্ডারহাটি), শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল (রঙ্গিলাবাদ), শ্রীদেবব্রত চৌধুরী (কলিকাতা-২৬), শ্রীমিহির বসু (এলাহাবাদ)।

আসছে বছর

সুসাহিত্যিক শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর রচিত ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লেখা আর একখানি নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস রামধনুতে সুরু হবে।

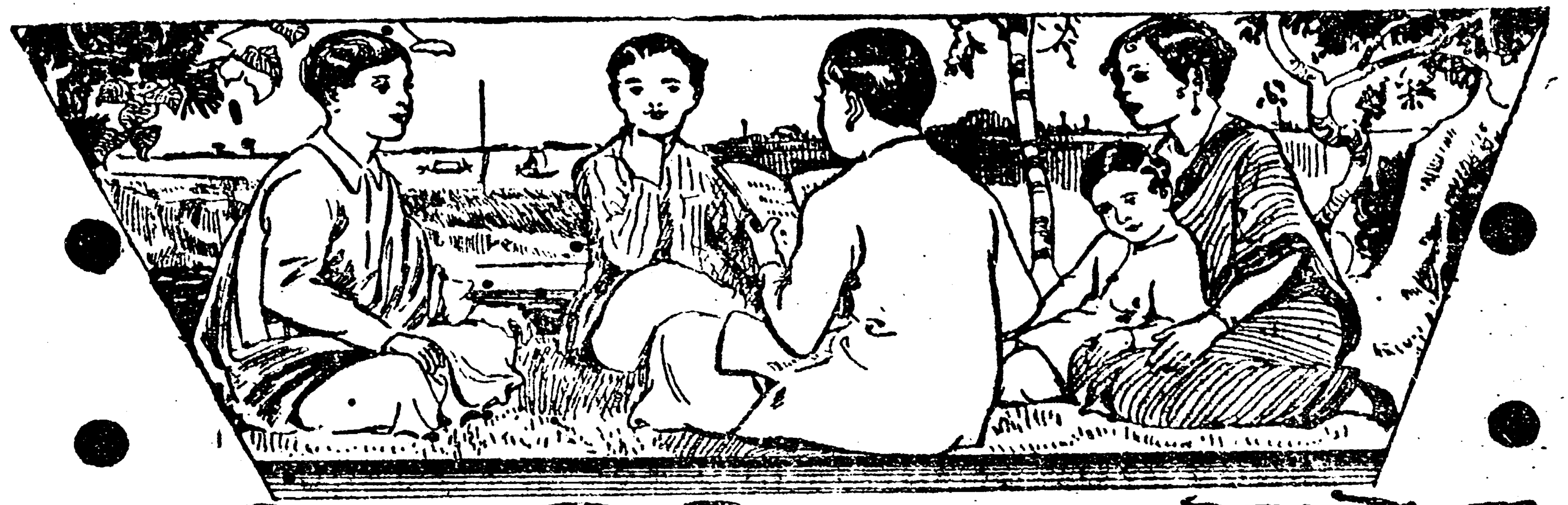

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

খুকুর ব্যথা

শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বল্ না দিদি, পুতুলটা মোর
কয় না কেন কথা,
চুপ্‌টি ক'রে বসেই থাকে
যথায় রাখি তথা।
আদর ক'রে কতই না হায়
বোঝাই আমি ওরে,
তবুও দিদি, পুতুল আমার
কয় না কথা, খায় না খাবার,
কি জানি ভাই কি হয়েছে,
বুঝ্‌বো কেমন ক'রে ?
ভেবে ভেবে চোখের পাতা
আসছে আমার ভিজে ;
বল্ না দিদি, বল্ না মোরে—
একটা লজেন্স দেব তোরে,
সারবে সে হায় কেমন ক'রে,
করব এখন কি যে !

কৃষ্ণচূড়া

শ্রীজয়ন্তকুমার দাশ

কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায় রঙ লেগেছে ;
চৈত্র দিনের জ্যোৎস্না রাতে
কোন মায়াময় মধুবাতে,
কিসের মধুর সুবাস হানি' ফুল জেগেছে।
সবুজ বুনে দেখছি চেয়ে কিসের মেলা ;
গাছে গাছে পুষ্পকলি
কিসের কথা যায় গো বলি,
ভ্রমর সনে করবে কি সে আজকে খেলা ?
তারায় ভরা ঝিকিমিকি জ্যোৎস্না-রাতে,
পিকবধূ কোন্ ফুলের সনে
কূজন করে আপন মনে,
কৃষ্ণচূড়া ঝরে বুঝি মদির বাতে।
হারিয়ে-যাওয়া কোন সে ছোঁয়াচ লাগে মনে ;
মোর বিরহী মর্ম কথা
নতুন করে পায় বারতা,
ব্যাকুলিত কৃষ্ণচূড়ার সুবাস সনে।

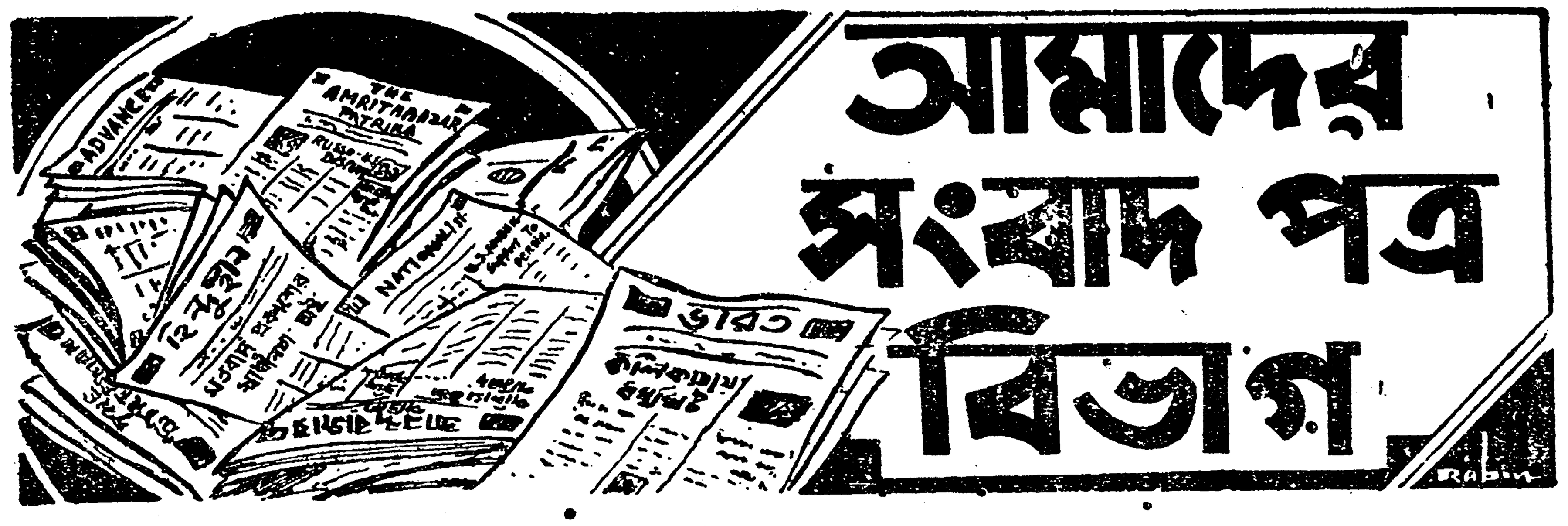

রণজী প্রতিযোগিতা

এ বছরের রণজী ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। ফাইনালে বোম্বাই দল হোলকার দলকে ৫৩১ রানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ান হবার গৌরব অর্জ্জন করল। গত ১৮ বছরের খেলায় এইবার নিয়ে তারা ৬ষ্ঠ বার বিজয়ী হ'ল। রান্‌-সংখ্যা উঠেছিল বোম্বাই-এর ১ম ইনিংস্‌এ ৫৯৬, ২য় ইনিংস্‌এ ৪৪২ (৫ উইকেট, ডিঃ)। হোলকারের ১ম ইনিংসএ ৪১০, কিন্তু ২য় ইনিংস্‌এ মাত্র ৯৭। বোম্বাই দলের অধিনায়কত্ব করেন মন্ত্রী, আর হোলকার দলের সি. কে. নাইডু। তোমরা নিশ্চই জান, প্রতি বছর সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।

মোটর সাইকেলে পাঁচ হাজার মাইল

সম্প্রতি ২টি জার্মান্‌ ছাত্র জার্মেনী থেকে মোটর সাইকেলে করে ঘুরতে ঘুরতে কলকাতায় এসে হাজির হয়েছেন। এঁরা দু'জনেই অর্থ-নীতির ছাত্র—ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য এখানে এসেছেন। ঠিক এক বছর আগে এঁরা রওনা হ'ন এবং পথের খরচ পথেই উপার্জ্জন করতে করতে অগ্রসর হতে থাকেন। দু'জনই গাইতে জানেন, ছবিও আঁকতে পারেন ভালই। ওরই সাহায্যে ওঁদের খরচ চলে। পথে ওঁরা নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতাও অর্জ্জন করেছেন। দক্ষিণ ইটালি এবং গ্রীসে গুপ্তচর সন্দেহে ওঁদের কয়েকদিন আটকেও রাখা হয়; শেষ পর্য্যন্ত অবশ্যি ছাড়া পান। এঁদের দু'জনেরই বয়স পঁচিশের নীচে।

কৃত্রিম বৃষ্টি

কৃত্রিম উপায়ে আকাশের মেঘ থেকে কি করে বৃষ্টি আনা যায় সে গল্প তোমরা এর আগে শুনেছ। সম্প্রতি আমাদের দেশেও এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সুরু হয়েছে। যাদবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ডাঃ এস্‌. কে. ব্যানার্জি বেলুনের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র লাগিয়ে এবং তা থেকে শুকনো কার্বন ডাই-অক্সাইড, সিলভার আয়োডাইড ইত্যাদি রাসায়নিক মশলা ছিটিয়ে এ ব্যাপারে নাকি অনেকখানি কৃতকার্য্য হয়েছেন।

ছোট্ট ছেলের ছোট্ট সহর

ব্রাদার ভিনসেণ্ট নামে এক ভদ্রলোক সিঙ্গাপুর সহরের কাছে একটি ছোট্ট নতুন সহর

গড়ে তুলেছেন। এই সহরের বাসিন্দারা সকলেই ছোট ছেলে—তাদের সকলেরই বয়স ৭ থেকে ১৭র মধ্যে। সাধারণতঃ যে সব দুষ্টু ছেলেরা শাসনের কড়াকড়ি মানতে চায় না এ সহরটি তাদেরই জন্য। ব্রাদার ভিনসেণ্টের বিশ্বাস, ছেলেদের ওপর অযথা কড়া না হয়ে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের ভার সম্পূর্ণ তাদের ওপর ছেড়ে দিলে তারা সহজেই মানুষ হয়ে উঠতে পারে। এই সহর চালাবার যাবতীয় কাজের ভার ছেলেদের ওপর। যে ছেলেটি সহরের মেয়র হয়েছে তার বয়স ১৭ বছর। ডানপিটে বলে তার খুব নাম ছিল, কিন্তু দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ার পর ছেলেটি নাকি আশ্চর্য্য রকম প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে।

—বিশেষ দ্রষ্টব্য—

এই সংখ্যার সঙ্গে রামধনুর ২৪শ বছর পূর্ণ হ'ল। আগামী বৈশাখ থেকে সুরু হবে রামধনুর ২৫শ বর্ষ বা রজত জয়ন্তী বর্ষ। বলা বাহুল্য রামধনুর জীবনের এই স্মরণীয় বৎসরে তাকে রচনাসম্পদে ও রূপসম্পদে যথাসাধ্য বৈচিত্র্যপূর্ণ করবার চেষ্টা করা হবে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ বছরে যাঁরা রামধনুর গ্রাহক আছেন ১৩৫৯-এর স্মরণীয় বৎসরে তাঁরা সকলেই গ্রাহক থাকবেন। গ্রাহক-গ্রাহিকারা অনুগ্রহ করে আগামী ২৫শে চৈত্রের মধ্যে তাঁদের বার্ষিক চাঁদা চার টাকা (৪৲) কিংবা ষাণ্মাসিক চাঁদা দু' টাকা চার আনা (২।০) মনি অর্ডারে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আর যদি কোন বিশেষ কারণে কারও পক্ষে গ্রাহক থাকা একান্তই অসম্ভব হয় তবে তিনিও অনুগ্রহ করে ২৫শে চৈত্রের মধ্যে আমাদের অতি অবশ্য সে কথা জানিয়ে দেবেন। ঐ তারিখের মধ্যে কারও চাঁদা বা চিঠি না পেলে আমরা, তাঁর সম্মতি আছে ধরে নিয়ে, বৈশাখ সংখ্যা তাঁর কাছে ভি. পি. তে পাঠাব। আশা করি তাঁরা সে ভি. পি. ফেরৎ দিয়ে আমাদের অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করাবেন না।

ডাকঘরের নতুন নিয়মে গত বছরের চাইতে এ বছর ভি. পি. মাশুল অনেক বেড়ে গেছে। অর্থাৎ ভি. পি. তে রামধনু নিলে ৪৲ স্থলে ৪।।০ এবং ২।০ স্থলে ২৸০ লাগবে। মনি অর্ডার করলে মাত্র ৪৵০ বা ২।৵০তেই হবে। তা ছাড়া ভি. পি. তে পত্রিকা যেতে অনেক সময় অত্যন্ত সময় লাগে। সুতরাং মনি অর্ডারে আগাম চাঁদা পাঠানোই সব দিক দিয়ে সুবিধাজনক।

স্থানীয় গ্রাহকেরা ইচ্ছা করলে আমাদের কার্য্যালয়ে বা শাখা কার্য্যালয়ে (ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ—১বি, রসা রোড, কলিকাতা ২৫) হাতে হাতে টাকা জমা দিতে পারেন। পুরোনো গ্রাহকেরা মনি অর্ডারের কুপনে বা হাতে টাকা জমা দেবার সময় গ্রাহক নং অবশ্যই উল্লেখ করবেন।

আর একটা সুসংবাদ এই সুযোগে দিচ্ছি। গ্রাহক-গ্রাহিকারা যাতে তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে তাঁদের প্রিয় রামধনু ঠিক মত প্রচার করতে পারেন সেজন্য আমরা ঠিক করেছি যিনি একসঙ্গে তিন জন সম্পূর্ণ নতুন (অর্থাৎ যিনি আগে কোন দিন গ্রাহক ছিলেন না) বার্ষিক বা ষাণ্মাসিক গ্রাহক করে দিতে পারবেন তাঁকে তদনুযায়ী এক বছর বা ৬ মাসের জন্য সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে রামধনু সরবরাহ করা হবে।

চিঠিপত্র বা চাঁদা নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে হবে :—ম্যানেজার, রামধনু ; ১৬, টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা ২৫

মনোরঞ্জন স্মৃতি পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

রামধনুর পরলোকগত সম্পাদক অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতি স্মরণ ক'রে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতার বিষয়—"বর্ত্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন বাংলা শিশুমাসিক পত্রগুলি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিরপেক্ষ আলোচনা।" রামধনুর যে কোন গ্রাহক বা গ্রাহিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে। যারা আগামী বছর অর্থাৎ ১৩৫৯ সালে নতুন গ্রাহক হবে তাদেরও এতে যোগ দিতে বাধা নেই। প্রত্যেক লেখার সঙ্গে প্রতিযোগীর নাম, ঠিকানা এবং নিজের গ্রাহক নং লিখে রামধনু-সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। লেখা ৩১শে বৈশাখ, ১৩৫৯ তারিখের মধ্যে রামধনু কার্য্যালয়ে পৌছান চাই। সবচেয়ে ভালো লেখার জন্য একটি রৌপ্য পদক দেওয়া হবে। আমাদের বিচারই চূড়ান্ত ব'লে ধরা হবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

আমার বয়স ১৬ বছর, আমার দিদির বয়স ২০ বছর এবং আমার ছোট ভাইটির বয়স ১২ বছর। (আরও কয়েক রকম শুদ্ধ উত্তর হতে পারে।)

উত্তরদাতাদের নাম :—ঝর্ণা চৌধুরী (বর্দ্ধমান) ; গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ইম্ফল); নিবেদিতা সেন (কলিকাতা ২৯) ; অমলকুমার মিত্র, সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য ও উজ্জ্বলা (গৌহাটী); চট্টলা মণিমেলার মণিরা (গৌহাটী) ; দীপ্তি ও দীপালি সেনগুপ্তা (কালাপাহাড়); সুখেন্দু ও শরদিন্দুবিকাশ দাশ (গৌহাটী), আসাম মণিমেলা পরিষদের সভ্যবৃন্দ ; মেজদা, নির্ম্মলেন্দু ও

জিতেন সরকার (ভাগলপুর) ; হেমেন, নথু, চাঁদু, মন্টু, টুলু, লক্ষ্মী, তপু, তুতুল, বেবী ; নন্দা ভৌমিক (মেদিনীপুর) ; সত্যরঞ্জন বসু (লক্ষ্ণৌ); হাসি দাশগুপ্ত (পাটনা) ; নরেন্দ্র ও পুষ্প (বনারস)।

নূতন ধাঁধা

রায় বাবুদের গেঞ্জীর কারখানায় অনেক লোক কাজ করে। রায় বাবু ঠিক করলেন, এবার দোলের দিন তাঁর কারখানার প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে তিনি কিছু কিছু বখশিস্ দেবেন এবং তার পরিমাণ হবে সবাইকার সমান।

দোলের দিন ১৪ জন লোক অনুপস্থিত রইল। তাই রায় বাবু যারা উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যেই টাকাটা সমান ভাবে ভাগ করে দিলেন। সবাইকে দেওয়া হ'লে দেখা গেল এজন্য তাঁর মোট ৭৮৮৫ খরচ হয়েছে। তা হলে তাঁর কারখানায় সব শুদ্ধ কতজন লোক কাজ করে বলতে পার ?

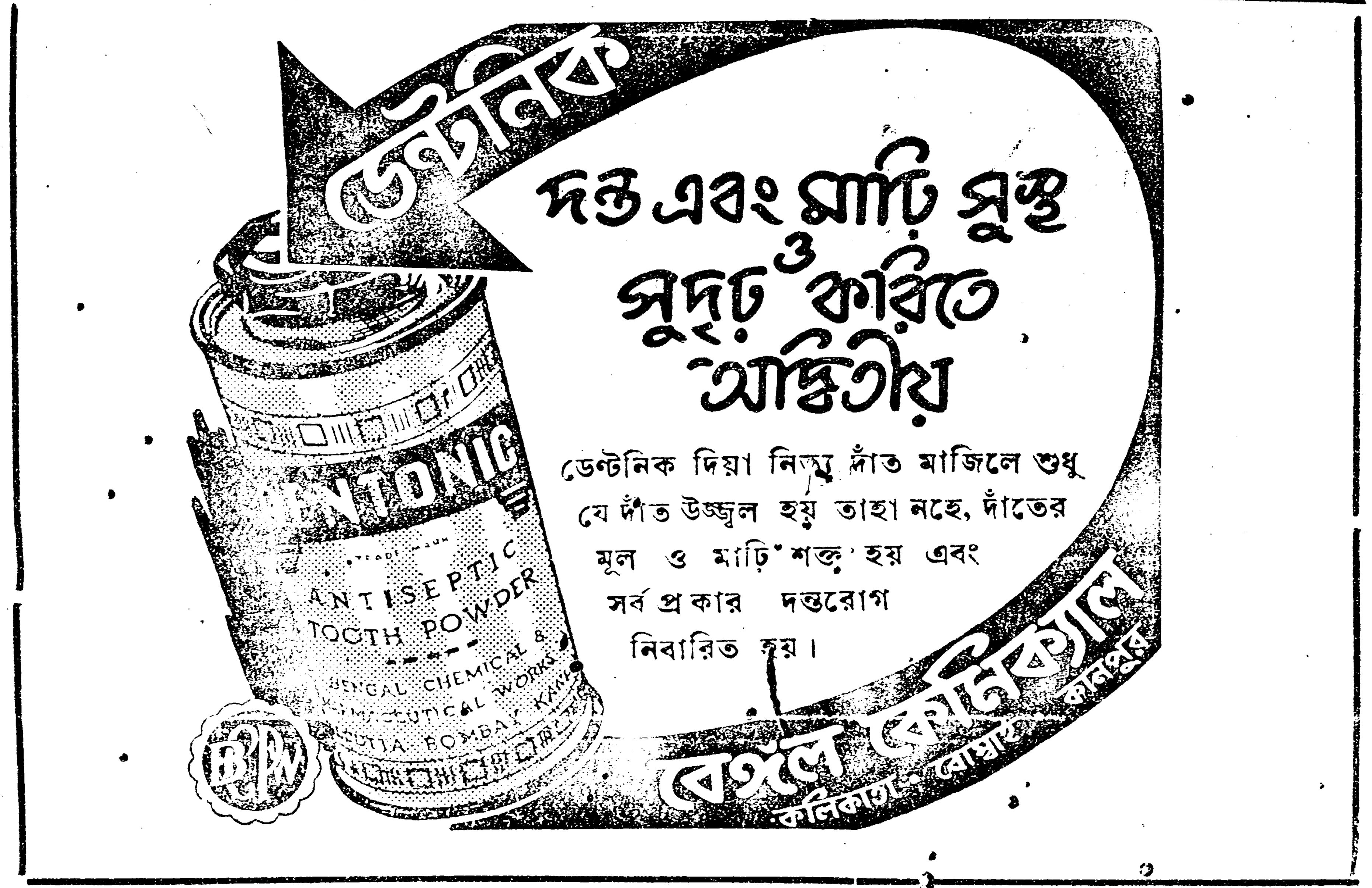

ভারত স্বাধীন করলো কে?

[অমর বীর সিরিজ]

নেতাজী সুভাষ—মূল্য ১॥০ টাকা

১।	ক্ষুদিরাম	॥০
২।	কানাইলাল	॥০
৩।	সত্যেন বসু	॥০
৪।	সূর্য্যসেন	॥০
৫।	বাঘা যতীন	॥০
৬।	মাতঙ্গিনী হাজরা	॥০
৭।	ভগৎসিং	॥০
৮।	বীর সাভারকর	॥০
৯।	শ্রীঅরবিন্দ	॥০

সত্যাশ্রয়ী বাপুজী—মূল্য ২৲ টাকা

এই ফাল্গুনে পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ হইল !

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় শৈলজানন্দ মুখার্জ্জি, সুনির্ম্মল বসু, প্রভৃতি বিখ্যাত সাহিত্যিকগণ ইহাতে লিখিবেন।

প্রতি সংখ্যা ।৵০, সডাক বার্ষিক ৪৲
শুকতারার প্রতি সংখ্যায়ই পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।

দেব সাহিত্য কুটীর
২২/৫বি, ঝামাপুকুর লেন • কলিকাতা.৯.

ডোঙ্গরের বালামৃত শিশুদের পুষ্টিকর ঔষধ

ভবিষ্যৎ

যদি মনে হয় সময়টা ভাল যাচ্ছে না, নানা অসুবিধা। কোষ্ঠি বা হাতটা দেখাবার ইচ্ছে মনে জাগে, আমার নিকট আসতে পারেন। তবে আসবার পূর্ব্বে পত্র লিখে দিন ঠিক করে আসা ভালো—সকাল-১০টা হইতে ১১টা—অথবা সন্ধ্যা-৬টা হইতে ৯টা। রবিবার বেলা-১০টা হইতে ১টা।

শ্রীমণি মজুমদার
৯, কাশী ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬
(ছাতুবাবুর বাজারের নিকট.)

আসিবার সময় এই পত্রিকাটি সঙ্গে আনিবেন।

জ্যোতিষ ও তন্ত্র শিক্ষা মন্দির।

পণ্ডিত শ্রীনিশিকান্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রী
তন্ত্রবাগীশ

৩০ নং মহিম হালদার ষ্ট্রীট,
পোঃ কালীঘাট, কলিকাতা

লিলি বিস্কুট

রকমারিতায়, স্বাদে ও গুণে অনুপম

লিলি বিস্কুট

কয়েকটী মনোরম

ও

স্বাস্থ্যকর বিস্কুট

থিন এরারুট, ম্যারী, বোষ্টন-ক্রীম,
ক্যার্ণিভ্যাল, ফ্রুটস্ ক্রীম্ ইত্যাদি

লিলি বিস্কুট কোং লিঃ
৩ রমাকন্ত সেন লেন, কলিকাতা